বারুইপুরের
ইতিহাস

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

বারুইপুরের ইতিহাস

বারুইপুর
পৌরসভা

বারুইপুরের ইতিহাস

সম্পাদনা

ইরা চ্যাটার্জ্জী

মনোরঞ্জন পুরকাইত

বারুইপুর পৌরসভা

বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

কলকাতা ৭০০১৪৪

BARUIPURER ITIHAS

AN ANTHOLOGY OF ESSAYS ON HISTORY ARCHAEOLOGY, ANTHROPOLOGY, PEOPLE'S LANGUAGE, EDUCATION, LAND, RIVER, FOLKCULTURE, LITERATURE ETC. OF BARUIPUR

Edited By Ira Chatterjee, Chair Person
Monoranjan Purkait, Councillor

গ্রন্থস্বত্ব — বারুইপুর পৌরসভা

প্রথম প্রকাশ — মার্চ ২০০৫

প্রকাশক — বিশ্বনাথ দত্ত, প্রধান করণিক
বারুইপুর পৌরসভা
বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১৪৪

প্রকাশনা সহায়তায় — বিপদবারণ সরকার

প্রচ্ছদ — শম্ভু ভট্টাচার্য্য,

বর্ণসংস্থাপন — প্রতীক দাস, অসীম সিনহা, চিন্ময় ঘোষ

মুদ্রক — ভোলা সামন্ত, স্বপন সামন্ত
ইমেজ, গোলপুকুর, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

মুদ্রন সহায়তা — বাদল মণ্ডল, দেবাশীষ নস্কর

বিনিময় — একশত পঞ্চাশ টাকা

বারুইপুর থানার
নাগরিকবৃন্দের উদ্দেশে

শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়
বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র
পূজন চক্রবর্তী

এই পুস্তক প্রকাশে এঁদের অবদান
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁদের
আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বারুইপুর পৌরসভা

উপদেষ্টামণ্ডলী

সূচীপত্র

আলোকচিত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন

কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, পূজন চক্রবর্তী, শক্তি রায়চৌধুরী, তাপস চৌধুরী, শৌভিক ঘোষ (রাধা স্টুডিও), অভিষেক নস্কর, শিবশঙ্কর সরকার ও মুরাদ মিস্ত্রী ।
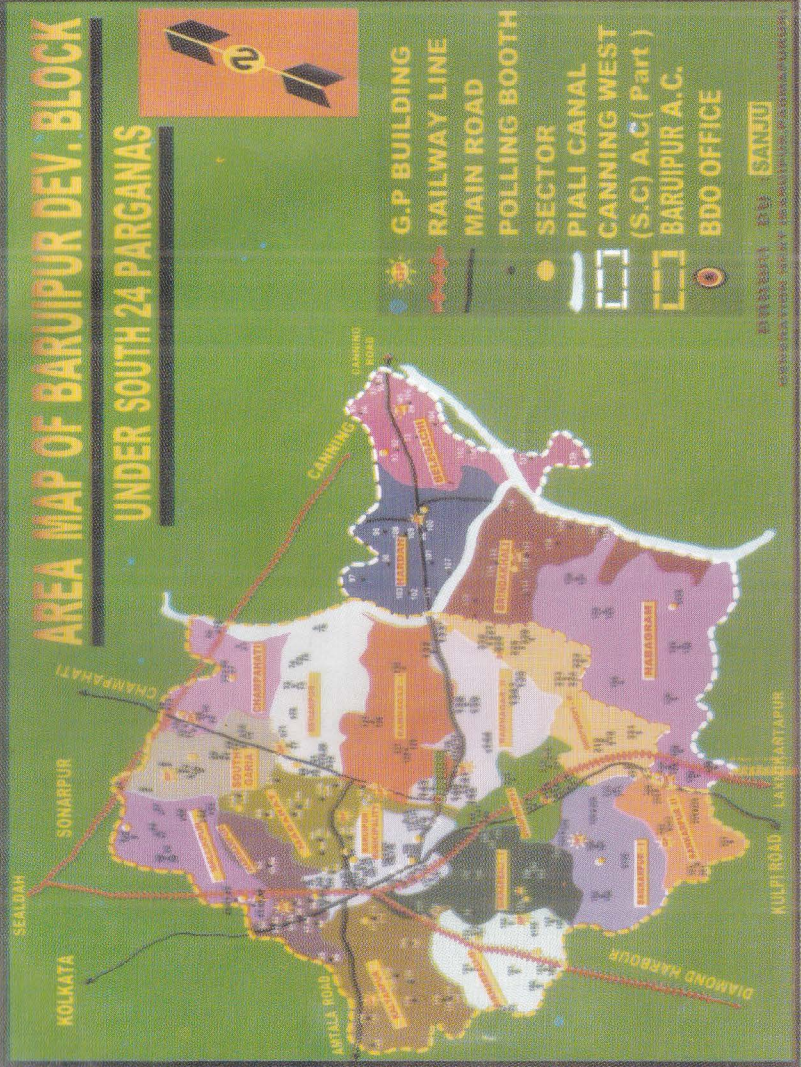
বারুইপুর থানার মানচিত্র
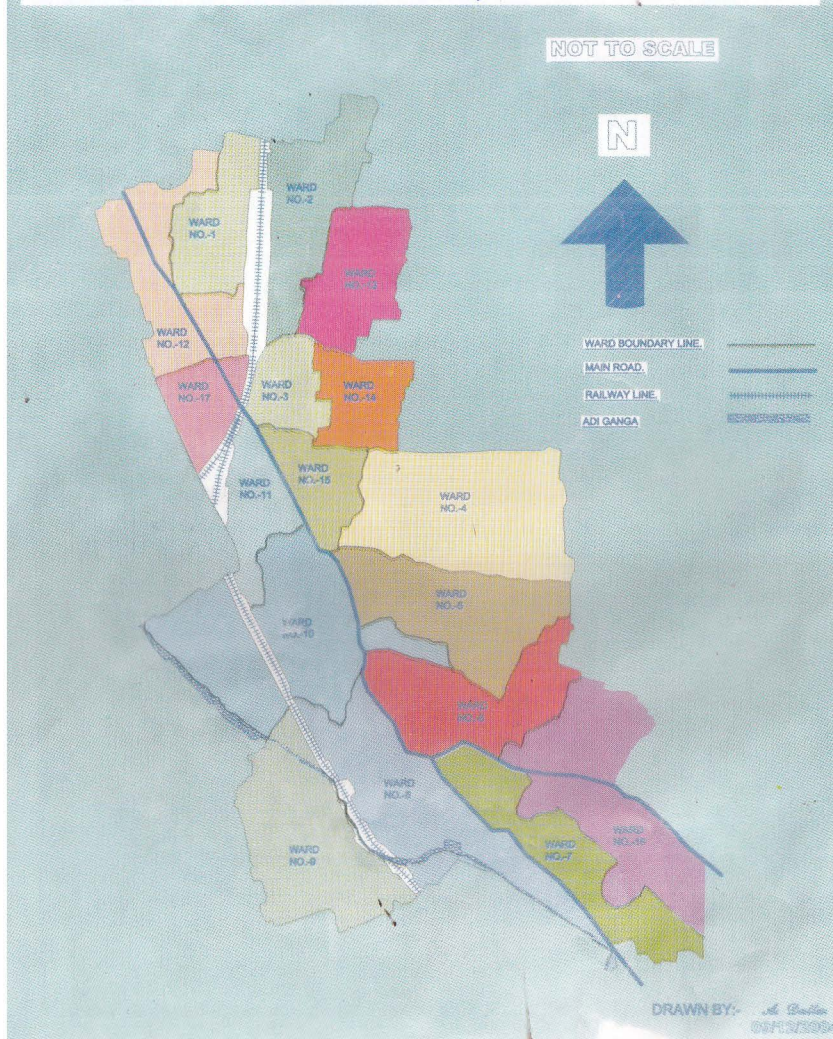
বারুইপুর পৌরসভা এলাকার মানচিত্র

বারুইপুর পৌরসভার পৌরবোর্ড (২০০০-২০০৫)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ

তপতী নস্কর
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১

সুপ্রভা ব্যানার্জী
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-২
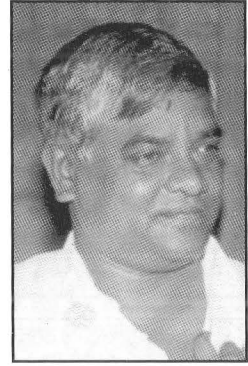
হাফিজুর রহমান
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৩

নির্মল পাল
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৪

ইলা বসু
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৬

মিলু গুহঠাকুরতা
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৫
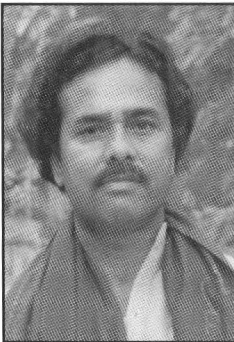
দুলাল হালদার
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৭

মিতা দত্ত
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৮
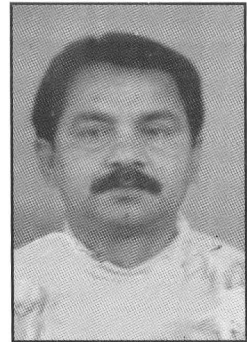
সুভাষ রায়চৌধুরী
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-৯

শৈলেন ঘোষ
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১০

বকুল মণ্ডল
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১১

ইরা চ্যাটার্জ্জী
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১২

মনোরমা মণ্ডল
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১৩

অমল দাস
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১৪
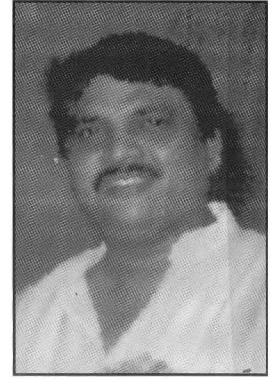
স্বপন কুমার মণ্ডল
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১৫
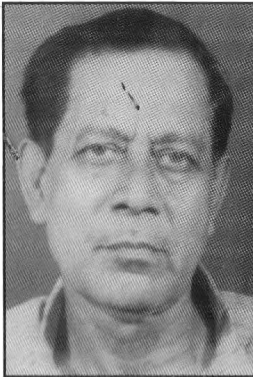
মৃণাল চক্রবর্তী
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১৬
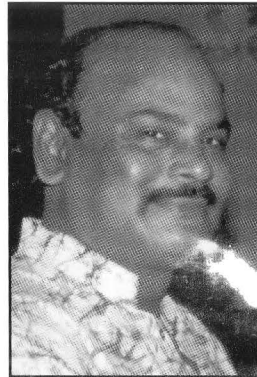
মনোরঞ্জন পুরকাইত
কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং-১৭

'বারুইপুরের ইতিহাস'-প্রসঙ্গে

দেশ-কাল-পাত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইতিহাস। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন - "আমি যখন বাংলাদেশের ইতিহাস লিখি তখন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচিত না হইলে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে।" আমরা 'বারুইপুরের ইতিহাস' রচনার মাধ্যমে সেই কাজটি করার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপকরণগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা ইতিহাসবিদ্ নই । ইতিহাস গবেষক বা ঐতিহাসিকও নই। সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চা প্রাত্যহিক দিনলিপির বিশেষ অংশবিশেষ। সাহিত্যের পথে চলতে চলতে অনুসন্ধিৎসু মনে স্থান পেল অনুসন্ধানের নেশা। অনুসন্ধানে উঠে এলো চমকপ্রদ ইতিহাসের বিশাল রত্নভাণ্ডার। বারুইপুর ঐতিহাসিক সম্পদের আকরভূমি। যা আমাদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করলো। কথা হলো পৌরপ্রতিনিধিগণের সাথে। তাঁরা গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনলেন। সম্মত হলেন। বর্তমান পৌরবোর্ডের সমস্ত পৌরপ্রতিনিধিগণ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করলেন আমাদের পরিকল্পনা। আলোচনা হল শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র, হেমেন মজুমদার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ডঃ উত্তম দাশ, ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, মৃত্যুঞ্জয় সেন, পরেশ মণ্ডল, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুজন চক্রবর্তী, অরূপ ভদ্র, হাফিজুর রহমান প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের সাথে। তাঁরাও উৎসাহিত করলেন বারুইপুরের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হওয়ার জন্য। শুরু হল 'বারুইপুরের ইতিহাস' রচনার কাজ।

অতীতের কথা না-জানলে ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ানো যায় না। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম থানা বারুইপুরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে, তার অতীতকে জানতে আগ্রহী হয়ে বারুইপুরের ইতিহাস গ্রন্থরচনার উদ্যোগ গ্রহণ করল বারুইপুর পৌরসভা। পুরসভাটি ১৩৪ বছরের প্রাচীন। অতএব তার জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে আছে কত স্মৃতি, কত গান, কত কথা ও জীবনের ইতিহাস; অবাক বিস্ময়ে ভাবতে হয় কত না সমৃদ্ধ ছিল এই অঞ্চল!

বারুইপুর ঐতিহ্যশালী মহকুমা-শহর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রবেশপথ। আদিগঙ্গা- বিধৌত এই ভূখণ্ড নানা কারণে গৌরবমণ্ডিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদস্পর্শে ধন্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঋষি অরবিন্দ, মতান্তরে স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনোবা ভাবে, পদ্মজা নাইডু, মাদার টেরিজা প্রমুখ মহাপুরুষ ও মহানারীর স্মৃতি-বিজড়িত বারুইপুর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্মস্থান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

এম. এন. রায়, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তিকালে নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসের মত অনেক বিখ্যাত মানুষ এখানে স্বল্পদিন হলেও বাস করেছেন। সেই স্মৃতি বারুইপুরবাসীর মনে আজও অমলীন। জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরী সপরিবারে রাজপুর থেকে এখানে এসে বসবাস করেন ও গড়ে তোলেন বিভিন্ন সমাজ।

স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, পুরাতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, লৌকিক দেবদেবী, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বারুইপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখানকার সংগীত, নাটক, যাত্রাপালা, যোগাযোগব্যবস্থা, ক্রীড়া, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা, শ্মশান, হাট-বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পূজা-পার্বণ-মেলা, পত্রপত্রিকা, নদী, ফুল ও ফল অনন্য সম্পদ হিসাবে সমাদৃত। এই সব বিষয়ের অতীত কথা এবং বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারা বিশ্বে অগ্রগতির ঢেউ। সেই ঢেউয়ের পরশ লাগছে বারুইপুরে। বাড়ছে শহর, ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। হারিয়ে যাচ্ছে বারুইপুরের নিজস্ব সম্পদ পানের বরজ, আম, জাম, লকেট, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল আর আনারসের বন, মৌমাছির গুনগুন গান, ফুলের ম ম গন্ধ আর গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি।

আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত আটিসারা গ্রামের (যার বর্তমান নাম বারুইপুর) চারপাশে ছড়ানো সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে আজও আমরা দেখতে পাই 'দেবী আনন্দময়ী'র জাগ্রত বিগ্রহ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ফাদার লঙের বারুইপুর বিবরণীতেই বোধহয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার প্রথম সংবাদ জনগণ জানতে পেরেছিলেন। বহুদিন কেটে গেল — আজ পুনরায় 'বারুইপুর' মহকুমার মর্যাদা পেয়েছে। এখানকার আদি পানব্যবসায়ী 'বারুই' সম্প্রদায়ের নাম অনুসারে এ-অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'বারুইপুর' — তবে কবে যে তারা এখানে প্রথম বসবাস শুরু করেছিল তার হদিস কে দেবে? তবে মধ্যযুগে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কবি বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদসদাগরের আদিগঙ্গার স্রোত ধরে বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে বারুইপুরের উল্লেখ আছে — "বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে"। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন হুসেন শাহ্ — অতএব পাঁচশ বছর পূর্বেই বারুইপুরের নামকরণ হয়ে গিয়েছে, একথা বলা যায়। এ সম্পর্কে প্রয়াত লেখক ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ও শক্তি রায়চৌধুরী ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছেন।

অতীতকে মুছে ফেলে ভবিষ্যৎ নয়। অতীতের গর্বের সম্পদে যে মরচে ধরেছে শুধু সেটাকে মুছে সোনালী অতীতের সোনালী কথা জানানোর জন্য ব্রতী হয়েছি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর শ্রদ্ধাভাজন লেখকগণের তথ্যমূলক মূল্যবান রচনা এই উদ্যোগকে মহার্ঘ্য করেছে।

গঙ্গার পলিসমৃদ্ধ বারুইপুরের উর্বরমাটিতে জন্মেছেন কত উজ্জ্বল প্রতিভা — তাঁদেরকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনলেন অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার দত্ত, মানিকচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, সাগর চট্টোপাধ্যায়, সদ্যপ্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র, ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, ডঃ দেবব্রত নস্কর, ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার, জীবন মণ্ডল, সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, পূর্ণেন্দু ঘোষ, এম.এ. মান্নান, অদিতি দাস, নরনারায়ণ পূততুণ্ড, রথীন দেব, কৃষ্ণকলি মুৎসুদ্দী প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিক ও অতীত অনুসন্ধানীরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রকৃতি, নদনদী ও

জঙ্গলে ভরা এই পরিবেশে গড়ে উঠেছিল — জেলে, মাঝি, বেদে সম্প্রদায়। তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তৃত ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনায় বর্তমান গ্রন্থ হয়েছে সমৃদ্ধ।

কীভাবে সময় চলে যায় বোঝাই যায় না! কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায় না। কিন্তু রেখে যায় তার পদচিহ্ন। মাননীয় লেখকমহোদয়গণের লেখার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বারুইপুরের অতীত ইতিহাসের কথায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, গর্বিত হয়েছি।

অতীত, বর্তমান আর আগামী দিনের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আমাদের সীমাবদ্ধতা আমরা জানি। ইতিহাসের শেষ বলে কিছু নেই। তার বিশালতা অন্তহীন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সবার আন্তরিক সহযোগিতায় যা পারলাম তা হয়তো আগামীদিনের পাথেয় হিসাবে কাজ করবে।

সহযোগিতা পেয়েছি, অসহযোগিতাও পেয়েছি অনেক। তবুও 'বারুইপুরের ইতিহাস' আলোর মুখ দেখলো। এ গৌরব সবার। সুধী প্রাক্তন সাংসদ, বর্তমান সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলারগণ, শ্রদ্ধাভাজন লেখকবৃন্দ, পৌরকর্মচারীগণ, তথ্য পরিবেশনকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কার্যালয়ের বিভাগীয় আধিকারিকগণ, আলোকচিত্রিগণ, প্রচ্ছদ শিল্পীসহ মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং আরো যাঁরা সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। বারুইপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

যাঁর ঋণ আন্তরিকভাবে স্বীকার করি, তিনি হলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শক্তি রায়চৌধুরী। এই গ্রন্থপ্রকাশের প্রাথমিক পরিকল্পনা পর্ব থেকে শেষপর্যন্ত নিরলসভাবে সিংহভাগ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে দুরূহ কাজকে সহজতর করে দিয়েছেন। কাউন্সিলার স্বপনকুমার মণ্ডল ও মিলু গুহঠাকুরতার উৎসাহ ও পরিকল্পনা 'বারুইপুরের ইতিহাস' প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

সাধ্যমত চেষ্টা করেও বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। পৃথিবীর সবকিছুই ত্রুটিমুক্ত নয়। 'বারুইপুরের ইতিহাস' সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত — তা দাবি করছি না। পরবর্তী সংস্করণে সেই খেদ নিরসনের জন্য উদ্যোগী হওয়ার ইচ্ছা রইল। শুধু চাই আপনাদের আশীর্বাদ ও আন্তরিক সহযোগিতা। ধন্যবাদান্তে —

বারুইপুর
২৭.০২.২০০৫

ইরা চ্যাটার্জ্জী
মনোরঞ্জন পুরকাইত

একনজরে বারুইপুর

অবস্থান ঃ বিষুব রেখার কৌনিক দূরত্বে অক্ষাংশ ২০° ৩০' ৪৫'' ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ২৫'৩৫'' ডিগ্রি।

আয়তন ঃ ২১২. ৪৮ বর্গ কিঃ মিঃ। পৌরএলাকার আয়তন ঃ ৯. ০৭ বর্গ কিঃ মিঃ। পৌর এলাকার হোল্ডিং ৯৬০৮ টি।

আবহাওয়া ঃ ১.৭৫ মিঃ মিঃ বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ঃ সর্বোচ্চ ৪০° সর্ব নিম্ন ০৭°। বার্ষিক বৃষ্টিপাত - ১৭৫০ মিলিমিটার। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮২ সেন্ট্রিগ্রেড।

মৌজার সংখ্যা ঃ ১৩৮ টি। গ্রামের সংখ্যা ঃ ৩০৮ টি। পৌরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ঃ ১৭টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৯টি।

মোট জনসংখ্যা ঃ ৩, ৫১, ৫৬৯ জন। পৌর এলাকার জনসংখ্যা ঃ ৪৪, ৯৬৪ জন।

মোট পুরুষ সংখ্যা ঃ ১, ৯৩, ৩৭৩ জন। পৌর এলাকার পুরুষ সংখ্যা ঃ ২২, ৯৮০ জন।

মোট মহিলা সংখ্যা ঃ ১, ৫৮, ১৯৬ জন। পৌর এলাকায় মহিলা সংখ্যা ঃ ২১, ৯৮৪ জন।

তপঃ জাতির সংখ্যা ১, ৪৯, ৪২৭ জন। পৌঃ এঃ তপঃ জাতি সংখ্যা ঃ ১৪, ৭২০ জন।

তপঃ জাতি পুরুষ ঃ ৯৩, ২০৯ জন। পৌঃ এঃ তপঃ জাতির পুরুষ ঃ ৮, ৯৭২ জন।

তপঃ জাতি মহিলা ঃ ৫৬, ২১৮ জন। পৌঃ এঃ তপঃ জাতি মহিলা ঃ ৫, ৭৪৮ জন।

দৈনিক বাজার ঃ ১৬ টি। পৌর এলাকায় দৈনিক বাজার ঃ ২ টি।

হাটের সংখ্যা ঃ ৫ টি। পৌর এলাকায় হাটের সংখ্যা ঃ ১ টি।

সমবায় কেন্দ্র ঃ ৭৫ টি। পৌর এলাকায় সমবায় কেন্দ্র ঃ ৪ টি।

ব্যাঙ্ক ঃ ১৮ টি। পৌর এলাকায় ব্যাঙ্ক ঃ ৮ টি।

সিনেমা হল ঃ ৫ টি। পৌর এলাকায় সিনেমা হল ঃ ৩ টি।

ভি. ডি. ও হল ঃ ১টি। পৌর এলাকায় অডিটোরিয়াম ঃ ১ টি।

ছোট শিল্প কেন্দ্র ঃ ১২৭০ টি। পৌর এলাকায় শিল্প কেন্দ্র ঃ ২৩৫ টি।

পোষ্ট অফিস ঃ ৪৯ টি। পৌর এলাকায় পোষ্ট অফিস ঃ ১ টি।

শাখা পোষ্ট অফিস ঃ ৪৪৬। পৌর এলাকায় শাখা পোষ্ট অফিস ঃ ১ টি।

কৃষি জমি

মোট কৃষি জমি ২, ৬০০ হেক্টর। ভেষ্টেড কৃষি জমি ১৫২২. ৫১ একর।

মোট বনাঞ্চল জমি ১০০ হেক্টর। ভেষ্টেড অন্যান জমি ৮৩৫. ০৩ একর।

মোট বাস্তু জমি ঃ ১৪, ৭৫০ হেক্টর। বর্গাদার ৭২৬২ জন।

মোট বাগান জমি ঃ ১৮৫০ হেক্টর। পাট্টাদার ঃ ৪১৭৪ জন।

মোট মৎস এলাকা ঃ ১৫০০ হেক্টর ।	ভুমিহীন পরিবার ঃ ৪৭১৪ জন ।
কৃষি শ্রমিক ঃ ২৩, ৭২০ জন ।	গৃহহীন পরিবার ঃ ৭৪২ জন ।
পুরুষ শ্রমিক ঃ ২১, ২৬৩ জন।	মহিলা শ্রমিক ঃ ২,৪৬৭ জন ।
মৎস চাষি পরিবার ঃ ১৩২০ জন।	দিন মজুর ঃ ৩৫, ৪২০ জন ।

স্বাস্থ্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্ কেন্দ্র ঃ ৩ টি ।	পৌর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ১ টি ।
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ১৯ টি ।	পৌর এলাকায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ৩ টি ।
নার্সিং হোম ঃ ১৩ টি ।	পৌর এলাকায় নার্সিং হোম ঃ ৯ টি ।

সরকারী দাতব্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ১ টি ।

সেচ

মোট খাল ঃ- ৩ টি	মোট পুকুর - ২৩২৫ টি
মোট সেচের অঞ্চল - ৪৪৭৫ হেক্টর	

শিক্ষা

শিক্ষার হার - ৪৫°/。,	পৌরএলাকার শিক্ষার হার ঃ ৮৫°/。,
মোট মহাবিদ্যালয় ঃ ২ টি	
মোট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৯ টি	পৌর এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২ টি।
মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ- ২৩ টি	পৌর এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪ টি।
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ- ১৫৩ টি	পৌর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭ টি ।
মোট জুনিয়ার হাই স্কুল ঃ - ৩ টি	মাদ্রাসা ২ টি
মোট বেসিক স্কুল ঃ- ১৭ টি	
গ্রামীণ গ্রন্থাগার ঃ ৮ টি	শহর গ্রন্থাগার ঃ- ২ টি ।
মোট স্বাক্ষরতার অনুপাত ঃ ৭৮. ৭৯°/。	পৌঃ এঃ স্বাক্ষরতার অনুপাত ঃ ৯৩. ৬৪ °/。
পুরুষ স্বাঃ অনুপাত ঃ ৬০. ০৯°/。	পৌঃ এঃ পুরুষের স্বাঃ অনুঃ ঃ ৮৯.৪৫ °/。
মহিলা স্বাঃ অনুপাত ঃ ৬৯. ৭৭°/。	পৌঃ এঃ মহিলা স্বাঃ অনুঃ ঃ ৯১. ৬১ °/。
স্বাক্ষরতা কেন্দ্র ১৯৮ টি ।	পৌঃ এঃ স্বাক্ষরতা কেন্দ্র ঃ ১০২ টি ।

পানীয় জল

গভীর নলকূপ ঃ- ৬১৮ টি	পৌর এলাকায় গভীর নলকূপ - ৭১ টি
পাইপ এর মাধ্যমে জল বন্টন ৩৬ টি	পৌর এলাকায় অগভীর নলকূপ - ১৩ টি
বুস্টার স্টেশন - ২ টি	পৌঃএঃ পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ ৫০কিমি

পৌর এলাকায় বিধায়ক অরুপ ভদ্র
প্রদত্ত অর্থে জলের গাড়ি - ৩ টি

খেলাধূলা

মোট খেলার মাঠ ঃ ১২টি

জিমনাসিয়াম কেন্দ্র ঃ ১ টি

জেলা ক্রীড়া সংঘ অনুঃ ক্লাব ঃ- ২৬ টি

পৌর এলাকায় খেলায় মাঠ ঃ- ৪ টি

পৌর এলাকায় সাঁতার শিক্ষার স্থান ঃ ১ টি

পৌর এলাকায় পার্ক - ৫ টি

পৌঃ এঃ জেলা ক্রীড়াসংঘ অনুমোদিত ক্লাব ১০টি

রাস্তা

মোট রাস্তা ঃ- ৩৪১ কিঃ মিঃ

পাকা রাস্তা ঃ- ১৩৮ কিঃ মিঃ

কাঁচা রাস্তা ঃ - ১২৯ কিঃ মিঃ

সেমি পাকা রাস্তা ঃ- ৭৪ কিঃ মিঃ

পৌর সভার নিজস্ব রাস্তা ৯৬ কিঃ মিঃ

জেলা পরিষদের রাস্তা ৫২ কিঃ মিঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা ২৪৫ কিঃ মিঃ

পি. ডব্লু. ডি (পূর্ত দপ্তর)রাস্তা ৩৬ কিঃমিঃ

গ্রামীণ এলাকায়

পাকা রাস্তা ঃ ৭৮ কিঃ মিঃ

সেমি পাকা রাস্তা ঃ ৫৬ কিঃ মিঃ

কাঁচা রাস্তা ১১১ কিঃ মিঃ

পৌর এলাকায় পাকা রাস্তা ৬০ কিঃ মিঃ

পৌর এলাকায় কাঁচা রাস্তা ১৮ কিঃ মিঃ

পৌর এলাকায় সেমি পাকা রাস্তা ১৮ কিঃ মিঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেল ষ্টেশন ঃ ১০ টি

বাস রুট ঃ ৪ টি

ট্রেকার রুট ঃ ১টি

অটো রুট ঃ- ১৩ টি

পৌর এলাকায় রেল ষ্টেশন ২ টি

পৌর এলাকায় বাস রুট ২ টি ।

পৌর এলাকায় ট্রেকার রুট ২ টি

পৌর এলাকায় অটো রুট ১২ টি

পৌঃ এঃ বেসরকারী মটরগাড়ী ষ্ট্যান্ড ১টি। পৌর এলাকায় ভ্যান ও রিক্সা ষ্ট্যান্ড ১৬ টি ।

দুরাভাষ

দুরভাষ কেন্দ্র ঃ ২ টি

পৌর এলাকায় দুরাভাষ কেন্দ্র ২ টি

বেসরকারী দুরাভাষ কেন্দ্র ৩ টি ।

বিদ্যুৎ

বৈদ্যুতিকরণ - ১৩৬ টি মৌজায় পৌর এলাকায় রাস্তায় আলো ঃ ৩৮৮৯ টি

বৈদ্যুতিক সংযোগ ঃ ৩৭,৫৪০

কারখানার জন্য ঃ ২৫৪

গৃহে ব্যবহারের জন্য ঃ ৩২,৭৩১

ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য ঃ ৪৩৪২

ফল পেয়ারা, লিচু ও লকেট ফল উৎপাদনের জন্য বারুইপুর কে শুধু এই প্রদেশের ফল উৎপাদনের জন্য ব্লক হিসাবে যেমন চিহ্নিত করা হয় না ভারতবর্ষে অন্যতম ব্লক হিসাবে চিহ্নিত।

উৎপাদিত "পেয়ারা" বিক্রয় হয় আনুমানিক ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা।

উৎপাদিত "লকেট ফল" - কাশ্মীর ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় না।

উৎপাদিত "লিচু" - এই রাজ্যের মধ্যে সবার সেরা, বাৎসরিক বিক্রয় আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা।

শিল্প

গ্রামীণ শিল্প ঃ ১,৬৪৪ হস্ত শিল্প ঃ ২৮৩১

সংগঠণ

মোট সংগঠন ১২৬ টি পৌর এলাকায় সংগঠন ৪৮ টি

মহিলা সমিতি ঃ ৩ টি পৌর এলাকায় মহিলা সমিতি ১ টি

তথ্য সংগ্রহ

ব্লক উন্নয়ণ দপ্তর, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বারুইপুর পৌরসভা, মহকুমা দপ্তর আর. টি. এ (আলিপুর), রেল দপ্তর, জেলাপরিষদ, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তর পূর্ত দপ্তর, লোকগণনা - ২০০১, ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর, সেচ দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তর।

বারুইপুরকে জানুন

১। বারুইপুরের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মন্দির। বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে দোলমঞ্চ। এর প্রতিষ্ঠা ১৩৭৩ শকাব্দ (খৃঃ ১৪৫১)।

২। বারুইপুরে প্রথম বাজার বসে খৃঃ ১৭০০ । সাপ্তাহিক হাট রবিবার ও বুধবার।

৩। বারুইপুরে সর্বপ্রাচীন বিদ্যালয় খৃষ্টান মিশনারীদের 'সেন্ট পিটারস' স্কুল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। সল্ট এজেন্ট মিঃ প্লাইডেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরে এর সঙ্গে ১৮২৩ সালে খৃষ্ট-ভজনালয় যুক্ত হয়।

৪। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে বিলেত যাত্রার সময় বাংলার জমিদারদের তরফ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য যে আবেদন পত্রটি নিয়ে যান তাতে বারুইপুরের জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বাক্ষর করেছিলেন।

৫। বারুইপুরের প্রথম গীর্জা গোলপুকুরে স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালে ।

৬। আটঘরার বাজার বসে ১৮৫০ সালে।

৭। রামনগর বাজার বসে ১৮৫২ সালে। প্রতি বুধবার ও শনিবার হাট বসে ।

৮। শংকরপুর হাট বসে ১৮৫২ সালে। শনিবার ও বুধবার হাট বসে ।

৯। সূর্যপুর হাট বসে ১৮৫২ সালে। প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার হাট বসে ।

১০। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় বারুইপুরের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রামনগর গ্রামে, খৃঃ ১৮৫৫।

১১। বারুইপুর থানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৭ সালে। বর্তমান পুরাতন বাজারের কাছে পুরাতন থানা নামে পরিচিত।

১২। ১৮৫৮ সালে বারুইপুর হাই ক্লাস ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন রাজকুমার রায়চৌধুরী।

১৩। ২৯শে অক্টোবর ১৮৫৮ সালে বারুইপুর মহকুমা গঠিত হয়। প্রথম মহকুমা শাসক স্যার স্টুয়ার্ট ক্যালভিন বেলী। যিনি পরে বাংলার গভর্নর ছিলেন। ১৮৮৩ সালে বারুইপুর মহকুমা বিলুপ্ত হয়।

১৪। বেলেঘাটা থেকে চম্পাহাটি পর্যন্ত ট্রেন চলে ২রা জানুয়ারী, ১৮৬২ সালে। (পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়)।

১৫। বারুইপুর রাসমাঠে ১২৭৬, ১২৭৮, ও ১২৭৯ বঙ্গাব্দে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার অধ্যক্ষ ছিলেন রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী।

১৬। বারুইপুরে প্রথম আদালত '১৮৬২ মানিকতলা মুনসেফী বিচারালয় বারুইপুর'।

১৭। ১৮৬৮ সালে বারুইপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে একটি টাউন কমিটি গঠণ করেন প্রেসিডেন্সী কমিশনার।

১৮। ১৮৬৯ সালে ২২শে মার্চ বারুইপুর পৌরসভার পৌরবোর্ড গঠিত হয়।

১৯। বারুইপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা 'আর্যোদয়'। সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহ, ১৮৭১ সালে। তারপর 'বারুইপুর চিকিৎসা তত্ত্ব' - সম্পাদনা করেন ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস, ১৮৭৩ সালে ও'আর্যপ্রতিভা' - সম্পাদনা করেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বৈশাখ, খৃঃ ১৮৭৭ ।

২০। বারুইপুরে সর্বপ্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়, ১৮৮২ সালে। বর্তমানে এটি 'যদুনাথ নন্দী হাসপাতাল' নামে পরিচিত। রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন ।

২১। সোনাপুর (সোনারপুর) থেকে বারুইপুর পর্যন্ত ট্রেন চলে ১০ই জুলাই, ১৮৮২ সালে। প্রথম ট্রেন এসে পৌছায় সকাল ৭-৪৫ মিঃ।

২২। বারুইপুর থেকে মগরাহাট পর্যন্ত ট্রেন লাইন ১৮৮৩ সালে সম্প্রসারিত হয়।মগরাহাট থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত ট্রেন চলে ২৫শে এপ্রিল ১৮৮৩ সালে।

২৩। বালিগঞ্জ থেকে বজবজ পর্যন্ত ট্রেন চলে ১লা এপ্রিল, ১৮৯০ সালে।

২৪। চম্পাহাটি বাজার বসে ১৯১২ সালে।

২৫। বারুইপুর সরকার (কাছারী) বাজার বসে ১৯১৯ সালে। (বর্তমানে এটি পৌরবাজার)

২৬। বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত ট্রেন লাইনের ভিত্তি প্রস্তর ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে স্থাপন করা হয়। ১৯২৮ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রথম ট্রেন চলে ও এই লাইনের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয় ১৭ই জুন ১৯৬৬ সাল রবিবার থেকে।

২৭। ধপ্‌ধপিতে বাজার বসে ১৯২৭ সালে।

২৮। বারুইপুরে প্রথম সিনেমা হল - 'শো হাউস', স্থাপিত হয় ১৯৪১ সালে।

২৯। 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা ক্রীড়া সংঘের' প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮ সালে। প্রথম সম্পাদক সুশীলকৃষ্ণ দত্ত। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, বারুইপুর।

৩০। বারুইপুরে প্রথম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় - 'রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়', প্রতিষ্ঠা ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮ সালে, সরকারি অনুমোদন পায় ১লা জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে।

৩১। বারুইপুরে প্রথম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫২ সালে।

- বারুইপুরে বিদ্যুৎ আসে ২৬ শে মে ১৯৫৩ সালে ।

৩২। উত্তরভাগের 'সোনারপুর -আড়াপাঁচ পাম্পিং স্টেশন' চালু হয় ৩১শে মে ১৯৫৩ সালে। উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সেদিনের ছিল এটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম পাম্পিং স্টেশন।

৩৩। বারুইপুর ব্লক আধিকারিক দপ্তর ১৯৫৬ সালে হয়। প্রথম আধিকারিক কে. বি. চৌধুরী।

৩৪। ফুলতলায় শিল্প উপনগরী 'পিয়ালী টাউন' এর প্রতিষ্ঠা ৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে। উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

৩৫। বারুইপুরে দূরভাষ চালু হয় ১৯৫৮ সালে।

৩৬। বারুইপুর - ক্যানিং রোডে পিয়ালি নদীর সেতু নির্ম্মাণ হয় ১৯৫৯ সালে। লম্বা ১২৫ ফুট, খরচ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

৩৭। বারুইপুরে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষালয় 'দক্ষিণায়ন'। ১৯৬২-১৯৬৭ রামনগর গ্রামে । প্রথম সম্পাদক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

৩৮। বারুইপুর থানায় প্রথম কলেজ, 'সুশীল কর কলেজ' স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালে চম্পাহাটিতে ।

৩৯। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য 'বিপ্লবী নিকেতনে'-এর প্রতিষ্ঠা করা হয় ২রা অকটোবর ১৯৬৮ সালে, সাউথ গড়িয়ায়।

৪০। বারুইপুরের প্রথম সংগ্রহশালা - 'কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা' ১৯৬৯ সালে, রামনগর গ্রামে।

৪১। ১৯৭১ সালে জুলাই মাসে গ্রামীণ হাসপাতাল গঠিত হয়। জমি ১২ বিঘা। ২০ টি শয্যা নিয়ে এর সূচনা।

৪২। উত্তরভাগে 'পিয়ালী জলাধার ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প' প্রতিষ্ঠা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ সাল। উদ্বোধক রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াস। ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয় হয়। প্রায় ১৫০ ফুট চওড়া ও ৪ মাইল লম্বা মজাখাল সংস্কার করে মিষ্টি জলের আধার করা হয় কৃষি কাজের জন্য।

৪৩। বারুইপুর রবীন্দ্র ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয় ১৪ ই মার্চ ১৯৭৪ সালে। এবং উদ্বোধন হয় ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে।

৪৪। [illegible]ইপুরে সর্ববৃহৎ লৌকিক দেবতার মন্দির ধপধপি গ্রামে 'দক্ষিণরায়ের মন্দির'।

৪৫। কুলতলির ৬৪টি দ্বার বিশিষ্ট স্লুইস গেট প্রতিষ্ঠা ২৩শে জুন ১৯৭৯ সালে। উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

৪৬। বারুইপুর কেন্দ্রে দ্বিতীয় কলেজ পুরন্দরপুর, স্থাপিত ১৯৮১ সালে। 'বারুইপুর কলেজ' নামে পরিচিত ।

৪৭। দক্ষিণ ২৪পরগণায় প্রথম শিশুসাহিত্যের সংগঠন 'দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ' গঠিত হয় ১৫ই আগষ্ট ১৯৯৩ সালে । প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক - মনোরঞ্জন পুরকাইত।

৪৮। ১লা জানুয়ারী ১৯৯৬ সাল থেকে পুনরায় বারুইপুর মহকুমা হয়। ৫৭৮ / পি. এ. আর (এ . আর) ২৯.১২.৯৫। নব পর্যায় প্রথম মহকুমা শাসক হন সঞ্জয়কুমার বাগুই ।

৪৯। বারুইপুর মহকুমা পুলিশ দপ্তর গঠিত হয় ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে ।

৫০। প্রথম লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪পরগণা ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয় সাল ১৯৯৮, ২৬শে জানুয়ারী, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক - শক্তি রায়চৌধুরী।

৫১। বারুইপুরে প্রথম বইমেলা শুরু হয় ডাকবাংলো মাঠে ১৯৯৮ সালে। প্রথম কার্যকরী সভাপতি - ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক।

৫২। ৭ই এপ্রিল ১৯৯৮ সালে ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির বারুইপুর মহকুমা শাখা গঠিত হয়।

৫৩। বারুইপুরে মহকুমা হাসপাতাল গঠিত হয় ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে।

- বারুইপুর ফায়ার ব্রিগেড স্থাপিত হয় ২০০০ সালের ৬ই ডিসেম্বর ।

৫৪। বারুইপুর মহকুমা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠিত হয় ২০০৩ সালে।

বারুইপুরে যাঁরা বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন ঃ

মহকুমা শাসক

	নাম			
১)	সুজয়কুমার বাগুই	১ - ১- ১৯৯৬	থেকে	২৯-০১-১৯৯৬ পর্যন্ত
২)	সুনিলকুমার দন্ডপাত	২৯ - ১ - ১৯৯৬	ঐ	১৫ - ০৪ - ১৯৯৮ ”
৩)	আরফান আলি বিশ্বাস	১৫ - ৪ - ১৯৯৮	ঐ	২২ - ০৩ - ২০০২
৪)	অমলকুমার দাস	২২ - ৩ - ২০০২	ঐ	৩১ - ১০ - ২০০৩
৫)	সঞ্জীব গুহরায়	- ৩১ - ১০ - ২০০৩	ঐ	২৪ - ১১ - ২০০৩
৬)	অসীমকুমার ভট্টাচার্য	- ২৪ - ১১ - ২০০৩	ঐ	
৭)	শর্মিষ্ঠা দাস		ঐ	

ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিক

	নাম			
১)	কে. বি. চৌধুরী	১৯৫৬	থেকে	১৯৫৮
২)	এ. কে. বসু	১৯৫৮		১৯৫৯
৩)	এন. কে. গুপ্ত	১৯৬৫		১৯৬৮
৪)	জে. এন. রায়	১৯৬২		১৯৬৪
৫)	পি. কে. গুপ্ত	১৯৬৫		১৯৬৮
৬)	এস. মুখার্জী	১৯৬৮		১৯৭১
৭)	এস. পি. দাশগুপ্ত	১৯৭২		১৯৭৮
৮)	বি. কে. সাহা	১৯৭৮		১৯৮১
৯)	এস. কে. বিশ্বাস	১৯৮১		১৯৮৬
১০)	পি. কে. জানা	২. ৫. ৮৬		১০. ৯. ৮৭

১১)	এস. কে. সরকার	১৯৮৭	১৯৮৯
১২)	এ. চৌধুরী	১. ৫. ৯২	২১. ৭. ৯২
১৩)	এস. কে. মিত্র	১৯৯২	১৯৯৫
১৪)	সুজাতা ছেত্রী ব্যানার্জী	১৯৯৫	১৯৯৬
১৫)	আফজল আহমেদ	১৯৯৬	১৯৯৭
১৬)	জাবেদ নেহাল	১৯৯৭	১৯৯৯
১৭)	পি. কে. বারি	১৯৯৯	২০০০
১৮)	রবিকর পালিত	২০০০	২০০৪
১৯)	তানবির আফজল	৮. ৩. ২০০৪	৩১. ৮. ২০০৪

৩১. ৮. ২০০৪ থেকে সহকারী ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিক দ্বায়িত্বে

লোকসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি

১)	রেণু চক্রবর্তী	১৯৫২, ১৯৫৭
২)	কংসারী হালদার	১৯৬২
৩)	জ্যোতির্ময় বসু	১৯৬৭, ১৯৭২
৪)	সোমনাথ চ্যাটার্জী	১৯৭৮, ১৯৮৩
৫)	মমতা ব্যানার্জী	১৯৮৮
৬)	মালিনী ভট্টাচার্য	১৯৯০, ১৯৯৫
৭)	কৃষ্ণা বসু	১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০,
৮)	সুজন চক্রবর্তী	২০০৪

বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি

১)	ললিতকুমার সিংহ, আব্বাস সুকুর	১৯৫২
২)	খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, গঙ্গাধর নস্কর -	১৯৫৭
৩)	শক্তিকুমার সরকার	১৯৬২
৪)	কুমুদরঞ্জন মন্ডল	১৯৬৭, ১৯৬৯
৫)	বিমল মিস্ত্রি	১৯৭১
৬)	ললিতমোহন গায়েন	১৯৭২
৭)	হেমেন মজুমদার	১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭
৮)	শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়	১৯৯১, ১৯৯৬
৯)	সুজন চক্রবর্তী	১৯৯৮-এর উপনির্বাচনে।
১০)	অরুপ ভদ্র	২০০১

বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

১) ডাঃ সুশীল লস্কর — ১৯৬৫
২) প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী — ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩
৩) অনাথবন্ধু চ্যাটার্জী — ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮
৪) পদ্মা মন্ডল — ১৯৯৮ থেকে ২০০৩
৫) রানু মজুমদার — ২০০৩ থেকে।

বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি

১) অমর মণ্ডল — ১৯৬৫
২) পাঁচুগোপাল মারিক — ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮
৩) দেবপ্রসাদ সিংহ — ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩
৪) মোঃ ইসমাইল বৈদ্য — ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮
৫) অনাথবন্ধু চ্যাটার্জী — ১৯৯৮ থেকে ২০০৩
৬) জগাইচন্দ্র সরদার — ২০০৩ থেকে

বিভিন্ন সময় পৌরপ্রধানগণ

১)	রাজকুমার রায়চৌধুরী	১৮৬৯		
২)	মহেশ ঘোষ	১৮৭৮		
৩)	প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী	১৮৮০		
৪)	ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	১৮৯৪		
৫)	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯০২, ১৯০৪	থেকে	১৯০৮
৬)	দুর্গাদাস রায়চৌধুরী	১৯০৩	থেকে	১৯০৪,
		১৯০৮	থেকে	১৯১৫
৭)	শিবদাস রায়চৌধুরী	১৯১৮		১৯২৪
৮)	সুবোধনাথ দত্ত	১৯২৫		
৯)	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	১৯৩০		১৯৩২
১০)	হরেন্দ্রনাথ পাঠক	১৯৩২		১৯৩৬
		১৯৩৯		১৯৪২
		১৯৫৬		১৯৫৮
১১)	শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯৩৬		১৯৩৯
১২)	শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯৪২		১৯৫৬
১৩)	শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৮		১৯৬৮
১৪)	ললিতকুমার রায়চৌধুরী	১৯৬৮		১৯৭৮

১৫)	মৃনাল চক্রবর্তী	১৯৮১		১৯৯৪
১৬)	রবীন্দ্রনাথ সেন	১৯৯৪		২০০০
১৭)	ইরা চ্যাটার্জী	২০০০		

বিভিন্ন সময় উপ-পৌরপ্রধানগণ

১)	ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	১৮৯১		
২)	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৮৯৫		
৩)	হরিদাস রায়চৌধুরী	১৯১৬	থেকে	১৯২০
৪)	রমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯২০		১৯২৫
৫)	ডাঃ পুলিনকুমার রায়চৌধুরী	১৯২৫		১৯২৬
৬)	অজিত ব্যানার্জী	১৯২৬		১৯৩৪
৭)	অনাথবন্ধু গাঙ্গুলী	১৯৩৬		১৯৩৯
৮)	হরিদাস মণ্ডল	১৯৩৯		১৯৪২
৯)	বলাই ঘোষ	১৯৪২		১৯৫২
১০)	সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	১৯৫২		১৯৫৮
১১)	ললিতকুমার রায়চৌধুরী	১৯৫৮		১৯৬২
১২)	হারানচন্দ্র অধিকারী	১৯৬৮		১৯৭৮
১৩)	তপন ভট্টাচার্য	১৯৮১		১৯৮৫
১৪)	দেবেশ চক্রবর্তী	১৯৮৬		১৯৯০
১৫)	প্রশান্ত অধিকারী	১৯৯০		১৯৯৪
১৬)	শৈলেন ঘোষ	১৯৯৪		২০০০
১৭)	হাফিজুর রহমান	২০০০		

(তথ্য, যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে)

Baruipur Town - Population Growth

Year	Persons	Decadal variation	% of variation	Ratio per centum
1901	4217			100.00
1911	6375	+2158	+ 51.17	151.17
1921	5114	1261	19.78	121.27
1931	6483	+ 1369	+ 26.77	153.73
1941	7130	+ 647	+ 9.98	169.08
1951	9238	+ 2108	+ 29.57	219.07
1961	13608	+ 4370	+ 47.30	322.69
1971	20501	+ 6893	+ 50.65	486.15
1981	27081	+ 6580	+ 32.10	642.19
1991	37659	+10578	+ 39.06	893.03
2001	44964	+ 7305	+ 19.40	1066.26

Source : Census Hand Book 1991

Passengrs Movement*

Month	Daily tickets No. of tickets issued for Lakshmikanta	/ Diamond	Season tickets No. of tickets issued for Lakshmikanta	/ Diamond
January	14008	19688	152	239
February	14080	18367	153	229
March	15237	21008	189	284
April	15526	21316	171	236
May	25685	20910	151	201
June	12821	17448	174	260
July	11257	15904	176	229
August	12168	15740	183	266

Passengrs Movement (Cont.)

September	11798	15780	114	177
October	12740	16659	176	259
November	12177	14487	192	231
December	11789	15429	176	192

* Data collected from the station Master, Baruipur Junction, Eastern Railway for the Year 1998
* Lakshmikantapur & Diamond Harbour

Movement of fruit vendors (Towards Calcutta direction)

Month	Daily tickets (60Kg./ ticket) No. of tickets	Season tickets (60Kg./ ticket) No. of tickets	Fruit traffic Booking Quantity (Quintal)	Amount (Rs.)
January	7924	122	11	210
February	7342	122	16	808
March	9552	126	2.4	40
April	11472	140	5	113
May	13678	145	16.5	185
June	9706	138	6	99
July	15184	265	9.2	153
August	14926	204	31.4	584
September	9402	127	40.75	771
October	8707	111	46.26	817
November	9492	130	11.6	160
December	8488	135	18.4	312

* Data collected from the station Master, Baruipur Junction, Eastern Railway for the Year 1998
* Lakshmikantapur & Diamond Harbour

বারুইপুরকে জানুন (সংযোজন)

১। মতান্তরে গাজীবাবা প্রথমে বারুইপুর থানার কুড়ালি সাহাপুর গ্রামে আস্তানা করেছিলেন। পরে ক্যানিং থানার ঘুটিয়ারী শরিফে আস্তানা করেন এবং সেখানে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

২। ১৮৬৪ সালের ৫ই মার্চ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর পদে যোগ দিতে বারুইপুরে আসেন। এখানে তিনি ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫ বছর ৯ মাস ৯ দিন ছিলেন। তিনি এসেছিলেন নৌকাযোগে।

৩। বারুইপুর থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ করেন। ১৮৬৫তে দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৪। ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯-এর মধ্যে কোন এক সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি মামলার সওয়াল করতে বারুইপুরে আসেন।

৫। ১৯০৮ সালে বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষ অমৃতলাল মারিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখের উদ্যোগে বারুইপুর কোর্টের নিকট বর্তমান কুল্‌পি রোডের উপর রাজনৈতিক জনসভা সংগঠিত করেন।

৬। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনবন্ধু এন্ড্রুজ মহোদয়ের সঙ্গে বাসন্তী হয়ে গোসাবা গিয়েছিলেন। ফেরার পথে চম্পাহাটি রেল স্টেশনে তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়।

৭। বারুইপুর কাছারীবাজারের জামে মসজিদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে।

৮। সাধারণ পাঠাগার (পুরাতন বাজার) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালে।

৯। ১৮২২সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর বারুইপুরে আসেন।

১০। পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের একমাত্র নিজস্ব সভাঘর – দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এ্যাসোসিয়েশন-এর 'বিপিন বিহারী হল' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি - ডাঃ বিপিন বিহারী ঘোষ, সম্পাদক ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সনৎকুমার ঘোষ এবং ডাঃ বলরাম রায়চৌধুরী এইসভা ঘর নির্মাণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১১। গ্রামীণ ক্যান্সার কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় বাংলা ১লা বৈশাখ ১৩৯৩ সালে।

১২। সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় - ১লা নভেম্বর ১৯৭৯ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, সম্পাদক হেমেন মজুমদার।

১৩। কমলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৮ সালে। বারুইপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন ক্লাব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১৯৩৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী।

১৪। আর. সি. স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১লা জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে।

১৫। লোকনাথ কটন মিলস্‌ চালু হয় ১৯৫৭ সালে।

১৬। কৃষ্ণা গ্লাস চালু হয় ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী।

১৭। ভারতীয়া (বেসকো) চালু হয় ১৯৬৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।

১৮। বারুইপুরে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠন হয় ১৯৬২ সালে।

১৯। 'শিল্প-বাণিজ্য মেলা' শুরু হয় ২০০৪ সালে নিউ ইণ্ডিয়ান মাঠে। উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

২০। 'বারুইপুর থানা সম্মিলিত নববর্ষ উৎসব'- প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সাল থেকে আজও চলছে।

২১। 'বারুইপুর কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি' - স্থাপিত ঃ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

২২। 'ভাষাদিবস উদ্‌যাপন সমিতি', বারুইপুর - প্রতিষ্ঠা একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

২৩। বেঙ্গল কেমিষ্ট এ্যাণ্ড ড্রাগিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন (বি.সি.ডি.এ.)-বারুইপুর শাখা প্রতিষ্ঠা আগষ্ট ১৯৮৬।

২৪। আই. এম. এ. বারুইপুর শাখার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৭ সালে।

২৫। বারুইপুর ব্যবসায়ী সমিতি ১৩৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৬। কম্পিউটার চালিত রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টার-এর উদ্বোধন হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫। উদ্বোধন করেন সাংসদ ডঃ সুজন চক্রবর্তি ও বিধায়ক অরূপ ভদ্র।

(তথ্য সরবরাহ ঃ অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন পুরকাইত, শক্তি রায়চৌধুরী, অমলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, অজয় ঘোষ, রঞ্জন নস্কর, সমর মুখার্জী, স্বপন দাস, মানোয়ার ইমাম (সাংবাদিক, বাংলাদেশ)

উন্নতি দেবী

চৈত্রমেলায় প্রতিষ্ঠিত উন্নতি দেবী

এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয়, গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয়, পীরের মহিমাসূচকও নয় এই মেলার উদ্দিষ্টা দেবী তন্ত্রোক্তা নন - পুরাণোক্তা নন। ইহার নাম "উন্নতি।" উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই – তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা। তাঁহারও দশহস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে – প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য! "উদ্যম" নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এইসব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত ভল্ল দ্বারা দৈত্যপতি "পরবশ্যতার" বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ কম্পিত জ্বরজ্বর, পরাস্ত প্রায় তথাপি কি আশ্চর্য্য! হারিয়াও হারিতেছে না, – মরিয়াও মরিতেছে না!" (বারুইপুর চৈত্রমেলায় ১৮৭২ খৃঃ মনোমোহন বসুর ভাষণ হতে) – বক্তৃতামালা হতে সংকলিত ।
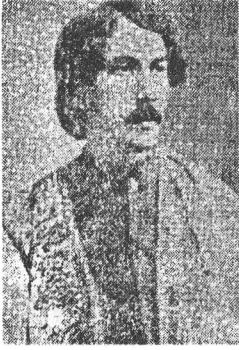
কেন্দ্রীয় চৈত্রমেলার সংগঠক
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

চৈত্রমেলার প্রতিষ্ঠাতা
'ন্যাশণ্যাল' নবগোপাল মিত্র
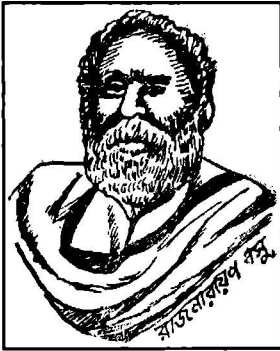
চৈত্রমেলার স্বাপ্নিক
রাজনারায়ন বসু

কেন্দ্রীয় চৈত্রমেলার সম্পাদক
গনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

বারুইপুরে উন্নতিদেবীর ভাষ্যকার
মনোমোহন বসু

বারুইপুরের ইতিহাস

ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য

ভূমিকা

কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে।।
হুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত।।

কালচক্র ঘুরে চলেছে। তার সঙ্গে আমরাও ।—

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর মীরজাফর নবাব হবার চার নম্বর চুক্তি অনুযায়ী কলকাতা থেকে কুলপী পর্যন্ত ২৪টি পরগণা ইংরেজের হাতে তুলে দেয়। ২৪ পরগণা জেলার জন্মের সূত্রপাত হলো।

তারপর অনেক ভাঙ্গন-গড়ন । শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে ১৯৮৬ সালে ১লা মার্চ বৃহৎ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনিক কারণে ভেঙে দু'টুকরো হল। আমাদের দিকেরটার নাম্ হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

এই দক্ষিণ ২৪ পরগণার বুকেই প্রাচীন আদিগঙ্গাতীরে, ডায়মণ্ডহারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইনের সংযোগস্থলে বারুইপুর – আগে ছিল গ্রাম, এখন আধা শহর। ৪০ বছর আগে ছিল ৫টি রিক্শা, ৫জন ডাক্তার, কাঁচা রাস্তা, বিদ্যুৎহীন, একটি মাত্র ওষুধের দোকান দেবেন্দ্র মিশ্রের সুলভ ফার্মেসী, স্টেশনে একটিমাত্র ভাড়া যাবার ঘোড়ার গাড়ী। আর এখন কি ? – আপনারাই দেখছেন। আরও ৪০ বছর পরে কি হবে! – আমাদের নাতিনাতনীরা দেখবে। ভাবীকাল দ্রুত এগিয়ে আসছে। এখানে বলে নিই– এদিকে রেল চালু হল কবে ? ১৮৬২ তে ক্যানিং লাইন, ১৮৮২-তে ডায়মণ্ডহারবার লাইন, ১৯২৮-এ লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন।

একটু প্রাচীন স্মৃতি

৭০ বছর আগে – ৭/৮ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় যাই – বালিগঞ্জ ষ্টেশনের পশ্চিমে বাঁশঝাড় দেখেছি, তার মধ্যে শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ১২ বছর বয়সে মালঞ্চ বাজারে বাজার করেছি চারটে বড় বাগদা চিংড়ি চার আনা (২৫পঃ)। আট আনায় (৫০পঃ) মাছ আনাজ সমেত একটি মাঝারী পরিবারের দুদিনের বাজার হয়ে যেত। তখন চালের মন ও কাপড়ের জোড়া আড়াই টাকা। বাতাবী লেবু পেড়ে ফুটবল খেলতুম, কারণ, একটা ফুটবলের দাম ৫/৬ টাকা। তখন এসব অঞ্চলে গ্রামের অর্দ্ধেকটাই বনজঙ্গলে ভরা। কত গাছপালা –

ভূত-ভৈরবী, ঘৃতকুমারী, আপাং, লজ্জাবতী, যজ্ঞডুমুর, পদ্মবিছুটি, রাংচিতা, ছোট্ট আমরুল-সে সব উদ্ভিদ আর আছে কি ? আছে কি ভুঁড়ো ও খ্যাঁকশিয়াল (যারা যামঘোষ –যামিনী ঘোষণা করে), গুয়ে-হাঁড়কেল, প্রচুর দাঁড়া ও হেলে সাপ, সোড়েল, ভোঁদড়, বাঘরোলরা ? প্রায়ই গঙ্গায় কুমীর এসে পড়ত; কোথা থেকে আসত, আবার কোথায় চলে যেত, কে জানে! এসব প্রাচীন স্মৃতি আজ মনে করিয়ে দেয়–

"হায় এ ধরায় কত অনন্ত

বরষে বরষে শীত বসন্ত

সুখে দুখে ভরি দিক দিগন্ত

হাসিয়া গিয়াছে ভাসি।"

বারুইপুরের প্রাচীনত্ব

মধ্যযুগে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয় (দেবদেবীর মহিমাসূচক)। প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া গ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস পিপলাই-এর রচিত মনসা-মঙ্গলে প্রথম বারুইপুরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। যথা –

'কালীঘাটে চাঁদরাজা কালীকা পূজিয়া।

চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।

ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ।।

তার আগে এস্থানের কি নাম ছিল জানা যায় না। তবে ২৪ পরগণার জন্মের আগে মুসলমান যুগে এ অঞ্চল সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর আগে হিন্দুযুগে সমতট, বঙ্গাল ও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে আমাদের বর্তমান ২৪ পরগণার ভৌগোলিক সীমা ছিল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বংশীয় এক বীর বাঙ্গালী জাতি বাস করত – যাদের ভয়ে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার এদিকে আসেননি। এই জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি সেদিন সম্ভবত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম আশ্রিত ছিল। কিন্তু তাদের স্বর্ণমুদ্রার গায়ে সমুদ্রগামী জাহাজের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ, – অর্থাৎ সে যুগের নৌসাধনোদ্যত সমুদ্রশায়ী বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর আজ – কোথায় সে আদিগঙ্গা ? কোথায় সে সরস্বতী? তারা মৃত।

'সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা,

তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি ।।'

এ জেলার পশ্চিমে হরিনারায়ণপুর, মধ্যে আটঘরা ও উত্তরে চন্দ্রকেতুগড়ের (বেড়াচাঁপা) মাটির তলায় পাওয়া গেছে অপরূপ শিল্পযুষমামণ্ডিত প্রচুর পোড়ামাটির যক্ষিণীমূর্তি, ছেলেদের মাটির খেলনা, চাকা দেওয়া গাড়ী, দেয়ালে টাঙ্গানোর মুণ্ডমূর্তি, পোড়ামাটির কর্ণকুণ্ডল, মাল্যদানা, বুদ্ধমূর্তি, তামার পয়সা প্রভৃতি। এ সবই সেই ইতিহাসের অন্ধকারে ঢাকা খৃষ্টপূর্বকালের বাঙ্গালী গঙ্গারিডিদের স্মৃতিচিহ্ন। বারুইপুর মিউজিয়মে এসব সংগৃহীত আছে।

এদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখুন – সেই দু'হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের হাতের স্পর্শ পাবেন।

দঃ ২৪ পরগণার সুবিখ্যাত প্রাচীন গাঙ্গেয় বন্দর সম্ভবত সাগরদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে আদিগঙ্গা তীরে অবস্থিত ছিল। সে বন্দর এখন সমুদ্রগর্ভে। এখান থেকে বাঙ্গালী বণিক তার নানা পণ্য নিয়ে একদিকে সুদূর গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলে অন্যদিকে, সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করতে যেত।

আদিগঙ্গা নদী

প্রায় দু-হাজার বছরের প্রাচীন নদী। দঃ ২৪ পরগণার বুক ফুঁড়ে একদিন বিশাল আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত কলকাতা থেকে সাগর দ্বীপ পেরিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। আজ সেই পুণ্য নদী মজে গিয়ে ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা প্রভৃতি বড় বড় পুষ্করিণীতে পরিণত হয়েছে।

প্রতাপাদিত্যের কথা

চম্পাহাটি পেরিয়ে চন্দনেশ্বরের কিছু আগে প্রতাপনগর বলে এক গ্রাম এখনও প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বহন করছে। তিনি ছিলেন যশোর-খুলনা ২৪ পরগণার এক প্রতাপশালী বারভুঁইয়া। তাঁর ছিল বিশাল নৌ ও সৈন্যবাহিনী। এখন যেসব হিন্দু-মুসলমান এখানে ঢালী, সেপাই পাইক প্রভৃতি পদবী নিয়ে বাস করছে, তাদের পূর্বপুরুষ ছিল প্রতাপের সৈন্যবাহিনীভুক্ত। এরা ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-ডোম সৈন্যরা অতিশয় সাহসী ও বীর সৈন্য ছিল। মনে আছে কি ছোটবেলার আগডুম বাগডুম খেলার কথা ? প্রথম দু-লাইন প্রতাপাদিত্যের ডোমসৈন্যসজ্জার কথা বলছে —

"আগে ডোম, বাঁয়ে ডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে, ঢাল- মেগর- ঘাগর বাজে (রণবাদ্য)"

১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হলে আদিগঙ্গাতীরস্থ দঃ ২৪ পরগণার সমৃদ্ধ অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে। মগ পোর্তুগীজ দস্যুর দল নৌকাযোগে আদিগঙ্গা দিয়ে বারে বারে এসব অঞ্চলে লুটপাট করতে আরম্ভ করে, লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। দঃ ২৪ পরগণার এ অঞ্চল 'মগের মুলুক' হয়ে দাঁড়ালো। লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলো। চারদিক বনে-জঙ্গলে ভরে গেল – আসমুদ্র কলকাতা বন হয়ে গেল। সেই বনময় কলকাতায় ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট এক ঘোর বর্ষার দিনে জোব চার্ণক এসে তার জাহাজ ভেড়ালো। কলকাতার মাটিতে নেমে সে ইংলণ্ডের পতাকা ওড়ালো। সেদিন কি সে ভেবেছিল ঐ পতাকা একদিন সারা ভারতবর্ষে উড়বে ?

শ্রীচৈতন্যের আগমন

ঐ সময়ের আর এক কাহিনী। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য পুরী যাবার পথে আমাদের এই আদিগঙ্গার তীর ধরে সপার্ষদ হরিনাম করতে করতে পুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন। ঐ সময় একরাত্রি তিনি বারুইপুরে তাঁর শিষ্য অনন্ত সাধুর গৃহে ছিলেন। সারারাত্রি আদিগঙ্গার ঘাটে বসে কীর্তন করেছিলেন, সেই ঘাটের নাম এখন কীর্তন খোলা ঘাট (বারুইপুর শ্মশানের কাছে)। সম্প্রতি বারুইপুর পুরাতন বাজারের এক গৃহে অনন্ত সাধুর পূজিত গৌর-

নিতাইয়ের দারুমূর্তি পাওয়া গেছে। পুরাতন বাজারে ঐ স্থানে মন্দির নির্মাণ করে ঐ বিগ্রহ এখন পূজিত হচ্ছে। ঐ স্থানের নাম মহাপ্রভুতলা। ৫০০ বছর আগে ঐ স্থানে সম্ভবত বর্তমান বারুইপুরের বাইরে আটিসারা বলে এক গ্রাম ছিল। কারণ, ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত -বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে আছে –

'হেন মতে প্রভুতত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে।।
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্ত নাম।।
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়।"

এই সময় বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু তারা চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব হয়ে গেল, যে ধর্ম 'আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল'। যবন হরিদাসও বৈষ্ণব ছিল। এখনও গঙ্গাতীরস্থ অনেক গ্রামে তখন থেকেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের হরিসভা আছে। আমার জন্মগ্রাম মাহীনগরে নাপিতপাড়ায় এবং পাশের গ্রাম মালঞ্চে চাঁড়ালপাড়ায় এখনও হরিসভা আছে। মনে হয়, তখন থেকেই হরি সম্পর্কিত বহু-নাম এখনকার বহুলোকের ও গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। যথা – হরিহরপুর, গোবিন্দপুর, কেশবপুর, কৃষ্ণপুর, হরিপুর, মাধবপুর, যাদবপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, মথুরাপুর, গদা-মথুরা প্রভৃতি।

বারুইপুরের আশেপাশে

শাসন – দক্ষিণে শাসন গ্রাম প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রাম। ১৯২৩ সালে দঃ গোবিন্দপুর গ্রামে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের এক তাম্রশাসন পাওয়া যায় – লেখাটি সংস্কৃতে। তাতে রাজা ব্যাসদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণকে বিড্ডর-শাসন নামে গ্রাম দান করেছেন। গ্রামের চতুঃসীমা বর্ণনায় আছে – পূর্বে অর্দ্ধসীমা জাহ্নবী এবং উত্তরে ধর্মনগরী। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ননিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ নীহার রায় প্রমুখ দিকপাল ঐতিহাসিকরা ঐ গ্রাম হাওড়া জেলার বেতড় (ব্যাটরা) বলে স্থির করেন। আমাদের মজিলপুরের খেতাব-বিহীন ঐতিহাসিক কালিদাস দত্তের ঐ কথাটি মনঃপূত হয়নি। তিনি এই শাসন গ্রামের চারধারে ঘুরে দেখেন – গ্রামের পূর্বে অর্দ্ধসীমা মজা আদিগঙ্গা (জাহ্নবী) এবং উত্তরে ধামনগর (ধর্মনগরী) বলে এক গ্রাম রয়েছে। এই সীমাই ছিল তাম্রশাসনে। তাছাড়া হাওড়ার গঙ্গা আদিগঙ্গা নয়, সরস্বতীর মজাখাতে বহতা নদী। শেষ পর্যন্ত কালিদাসবাবুর অনুমানই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। শাসনে সুসাহিত্যিক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন (১৮৪২-১৯১৬)।

কল্যাণপুর – পশ্চিমে এই বৃহৎ গ্রাম। আদিগঙ্গাতীরে কল্যাণ-মাধবের (বিষ্ণু) মন্দির ছিল - তার নামেই গ্রামের নাম। কাশীরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' আছে –

"মালঞ্চ রহিল দূর বাহিল কল্যাণপুর
কল্যাণ-মাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল।।"

ডিহিমেদনমল্ল – উত্তর দিকে এই গ্রাম। ২৪ পরগণার একটি পরগণার নাম মেদনমল্ল পরগণা। ডিহি অর্থে গ্রাম, মেদনমল্ল এক প্রাচীন গ্রামের নাম। ঐ গ্রামের নাম থেকেই সম্ভবত পরগণা তার নাম পেয়েছে, যেমন প্রাচীন কলিকাতা গ্রাম থেকে কলিকাতা পরগণার নাম হয়েছে।

আটঘরা – বারুইপুরের পূর্বে কবে আটটি ঘর নিয়ে আটঘরা গ্রামের পত্তন হয়েছিল, জানি না, এখন হাজার ঘরেরও বেশী। দু'হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে এটি এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় দুশো বছর আগে নেতাজীদের পূর্বপুরুষ মহিপতি বসু (সুবুদ্ধি খাঁ) মাহীনগর অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁর নামেই মহীনগর বা মাহীনগর। তাঁর পৌত্র গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ) পুরন্দরপুর জায়গীর পেয়েছিলেন। গোপীনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দ বসুর নামে গোবিন্দপুর। কনিষ্ঠভ্রাতা বল্লভ বসু বা বুড়ো মল্লিকের নামে মল্লিকপুর। মালঞ্চ ছিল ওদের পুষ্পবাটি। বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত সুবুদ্ধিপুর গ্রাম সুবুদ্ধি খাঁর জায়গীর যেখানে বর্তমান লেখকের বাড়ী। সুতরাং মহীপতির গ্রামে এই লেখকের জন্ম এবং মৃত্যুও হবে মহীপতি বা সুবুদ্ধি খাঁর গ্রামে। মহীপতি তাঁর ললাট লিখন।

বর্তমান বারুইপুর (গত ১৫০ বছর)

এখানকার জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার একটি প্রাচীন ও অভিজাত পরিবার। এঁদের পূর্বপুরুষ রাজপুরের রাজবল্লভ দত্ত, পরে বিখ্যাত মদন দত্ত, যিনি নাকি ঘুটিয়ারী শরীফের পীরমোবারক গাজীর কৃপায় মেদনমল্ল পরগণার বিরাট জমিদারী লাভ করেন। রাজা মদন রায়ের নামে রাজপুর সিদ্ধান্তটি নানা বিতর্কমূলক হয়েছে। যদি বলি, রাজপুরে আগত প্রথম পুরুষ রাজবল্লভ রায়ের নামে রাজপুর-তাতে ক্ষতি কি ? রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী রাজপুর থেকে বারুইপুরে এসে বাস করেন এবং বারুইপুরের উন্নতিকল্পে নানা জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বহু উচ্চ শ্রেণীর মানুষ এখানে বসবাস করেন। এঁরা প্রথমে দত্ত, পরে রায়, শেষে রায়চৌধুরী পদবী গ্রহণ করেন।

বারুইপুরের স্কুলে প্রতিষ্ঠায় জমিদার রাজেন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান প্রচুর। সম্ভবত ১৮৫৮ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ইতিপূর্বে মিশনারীদের চেষ্টায় ১৮২০ সালে চার্চের সঙ্গে (বর্তমান হাসপাতালের কাছে) একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভবত ইহাই দঃ ২৪ পরগণার প্রাচীনতম স্কুল। ১৮৫৮–১৮৮৩ সালে বারুইপুর মহকুমা ছিল এবং দঃ ২৪ পরগণার নীলচাষের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। বর্তমান রবীন্দ্রভবনের সামনে বড়কুঠি বলে যে দ্বিতল বাড়ী আছে, উহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীলচাষের কেন্দ্র ছিল। পরে এই বাড়ী দ্বারকানাথ ঠাকুর ক্রয় করেন এবং তার কাছ থেকে রায়চৌধুরীরা কিনে নেন। বারুইপুরের নীল সে সময় উৎকৃষ্ট নীল ছিল।

নীল বিদ্রোহ

নীলচাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারের ফলে ১৮৫৯ সালে প্রথম বাংলায় নীলবিদ্রোহের শুরু। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ নাটক লেখেন – যা সেদিন জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও তেমনি জনপ্রিয়। চারিদিকে কৃষকবিদ্রোহের গান ছড়িয়ে পড়লো –

"ওভাই, নীলবাঁদরে সোনার বাংলা করলো ছারখার,
ওভাই, প্রাণ বাঁচানো ভার।
অকালেতে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার,
ওভাই, প্রাণ বাঁচানো ভার।"

বারুইপুরে বঙ্কিম ও মাইকেল

এর পরেই দেখতে পাই ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুরের মহকুমা শাসক। তিনি তখনকার দিনের বড় সাহিত্যিকও বটে। ১৮৬৫তে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী 'বারুইপুর' থেকেই প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৬তে 'কপালকুণ্ডলা'। তাই 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' অথবা 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ', – এই রমণীয় কাব্যকথা বারুইপুরের মাটিই প্রথম নীরবে শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। জনশ্রুতি, বঙ্কিমচন্দ্র উপরিউক্ত ঐ নীলকুঠির বাড়ীতেই বাস করতেন এবং যে টেবিলে তিনি লিখতেন তা এখনও ঐ বাড়ীতে আছে। ১৮৬৭ সালে মাইকেল মধুসূদন কোন একটি মামলায় ব্যারিস্টার হিসাবে বারুইপুরে আসেন। কোর্টে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সেদিন মিলন হল –'তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে স্নিগ্ধদৃষ্টির, গদ্যের সঙ্গে পদ্যের, বঙ্কিমের সঙ্গে মধুসূদনের।'

হিন্দুমেলা

ঐ ১৮৬৭ সালেই কলকাতায় জাতীয়তার প্রতীক হিন্দুমেলা নবগোপাল মিত্রের সম্পাদকত্বে এবং বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু, মজিলপুরের শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতার দ্বিজেন্দ্রলাল ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, বিপিন পাল, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তিকালে জমিদার রাজেন্দ্র রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় বারুইপুরে এই হিন্দুমেলা ১৮৬৯, ১৮৭১, ১৮৭২ সালে রাসমাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মনোমোহন বসু রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তার একটি অংশ –

'তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হলো দেশের কি দুর্দিন।'

১৯০৮ সাল – বারুইপুরে কাছারী বাজারে অমৃতলাল মারিকের গৃহাঙ্গনে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে এক রাজনৈতিক সভা হয়। সভায় এম. এন. রায়, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, সাতকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবক নেতা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তিকালে এঁরাই ছিলেন দঃ ২৪ পরগণার সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক।

রায়চৌধুরীদের রাস ও রথের মেলা এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মেলা।

বারুই থেকে বারুইপুর নামকরণ

বারুই অর্থে পানচাষী। যদিও দু-একটা বরজ এখনও দেখা যায়, আগে পানচাষ প্রচুর ছিল। তবে এ অঞ্চলে এখনও সরবেড়ে, তসরালা প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর পানচাষ দেখা যায়। এ ছাড়া আম, লিচু, পেয়ারা বারুইপুরের উৎকৃষ্ট ফল। এর মধ্যে পেয়ারা এদেশের ফল নয়- মধ্যযুগে পোর্তুগীজরা আলু, আতা, আনারস ও পেঁপের সঙ্গে পেয়ারাও এদেশে এনেছিল।

বারুইপুরের ইতিহাস (গত ৫০ বছরের কথা)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কলকাতার রাস্তায় 'একটু ফ্যান দাও মা' বলতে বলতে ৫০ হাজার কৃষকের মৃত্যু হল। তারা কিন্তু খাবারের দোকান লুট করেনি কারণ, তারা জানতো সেটা অন্যায় ও পাপ। আজ ৫০ বছরের মধ্যে পাপপুণ্যের বোধ অনেক পাল্টে গেছে।

১৯৪৬-এর দাঙ্গায় কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেল – পাড়ার বেকার ছেলেরা আমাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এলো। এখনও তারাই আমাদের শাসন করে, আবার রক্ষাও করে।

দুশো বছরের পরাধীনতার পর আমরা ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা পেলুম। কংগ্রেস বল্লো, আমরা এনেছি, বিপ্লবীরা বল্লো, তারা – নেতাজী সুভাষ এখন কোথায় কে জানে!

ইতিমধ্যে দেশের জিনিসের দাম বেড়েছে। ভেবেছিলাম, যুদ্ধ শেষে আবার দাম কমে যাবে, কিন্তু হায়রে দুরাশা, দাম ক্রমশ বেড়েই চল্লো। সেদিন অন্নের সঙ্গে বস্ত্রেরও অভাব, বস্ত্রমন্ত্রী বল্লেন, 'হাফপ্যান্ট পরো'। আমরা এতদিনে ধুতি ছেড়ে ফুলপ্যান্ট পরতেই আরম্ভ করেছি– এলো হাওয়াই শার্ট, মেয়েরা শাড়ী ছেড়ে সালোয়ার–কামিজ পরছে। যুদ্ধের সময়েই রেশন ব্যাগ উঠেছে এবং রেশনের দোকানে লাইন চালু হয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে । মেয়েরা ঘোমটা তুলে দিলো, শহরে চাকরি করতে বের হল, আমাদের ধাক্কা দিয়ে, ট্রাম-বাসে উঠতে লাগলো। লেডিজ্ সীট, লেডিজ্ কামরা চালু হল। মধ্যবিত্ত অবলুপ্ত – সুতরাং রেলের ইন্টার ক্লাসও উঠে গেল। এলো নানা রুটের বাস – ছাদভর্তি মানুষ। বারুইপুরে শুধু মিনিবাস এখনও হলো না।

বাংলা ভাগ হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবাংলায় চলে এলো, ছড়িয়ে পড়লো কলকাতার আশেপাশে।

বারুইপুর শুধু দর্শক নয়, এই পরিবর্তনেরও অংশভাগী। স্বাধীনতার ঠিক আগে স্টেশানের কাছে যে জমির দাম ছিল ৫০ টাকা কাঠা, সেই দাম বাড়তে বাড়তে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে কাঠা পিছু ৫০ হাজার টাকা। সাম্প্রতিক কালে জমিও দুষ্প্রাপ্য। দিল্লী থেকে কোটি কোটি টাকার ছাপানো নোট আমাদের হাতে ঘুরছে।

শেষ পর্যন্ত গত বছরে আমরা শুনলাম, ভারতবর্ষ নাকি হঠাৎ ভিখারী হয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রের গচ্ছিত টন টন সোনা বন্ধক দিয়ে বৈদেশিক টাকা ধার করতে লাগলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে দেশ নতজানু – তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। কথা উঠলো – দেশের সার্বভৌমত্ব আছে তো ? কি জানি,আমরা জনসাধারণ রাজনীতি বা অর্থনীতির কিছুই ঠিক বুঝি না। আমাদের দেশের কি রোগ হয়েছে কে জানে ? – তবে নানান ধরনের ট্যাক্সের ব্যাপারে সুকুমার রায়ের 'একুশে আইন' কবিতাটি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। আর বুঝতে পারছি, গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংসার আর চলবে না।

গত ২৫/৩০ বছরে বারুইপুরে আর কাঁচা রাস্তা নেই– সব পীচের রাস্তা, লোডশেডিং বাদে প্রচুর বিদ্যুৎ, ওষুধ, কাপড় আর খাবারের দোকানের অন্ত নেই। ৫০/৬০ জন শুধু এম.বি.বি. এস. ডাক্তার, রিক্সা ৩০০, অটো এসে গেছে, বারুইপুর লোক্যাল ট্রেন বেশকিছু হয়েছে, কয়লার ইঞ্জিন উঠে গেছে, কোয়ালিটি ও রলিক আইসক্রীমের দোকান হয়েছে। আই-এম-এর বাড়ীতে বাচ্ছাদের টীকা ও ক্যানসার ইউনিট, মিউজিয়ম, রবীন্দ্রভবন, জেলা ক্রীড়া সংঘ, কলেজ সব হয়েছে।

আজ আমাদের অভাব কিছু নেই। — অভাব শুধু অর্থের, অন্ন আর বস্ত্রের, শিক্ষিত যুবক-যুবতীর যা হয় একটা চাকরীর। অভাব সেই মিলিত শক্তির – যা এই দ্রুত ঊর্ধমুখী দামকে ঠেকাতে পারে। কে সামনে এসে দাঁড়াবে ? কে আমাদের নেতৃত্ব দেবে ? আদর্শ লুণ্ঠিত – কোথাও কোন আলো নেই, অসীম অন্ধকার।

আনন্দমঠের শেষে বঙ্কিমের সেই আর্তনাদ কানে আসে – "হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবনানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি ?"

উপসংহার

সব শেষ কথা। আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করি – সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মহাভারতের আমলে ভীমসেন এই নিম্নবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী ম্লেচ্ছ জাতিদের জয় করেন (হাড়ি, ডোম, কাওরা, বাগদী প্রভৃতি আদিম বাঙ্গালী)। আড়াই হাজার বছর আগে মৌর্যযুগে এ দেশ বীরগঙ্গারিডিদের দেশ, আমরা তখন জৈন ও বৌদ্ধ, গুপ্তযুগে আমরা অনেকে হিন্দু, বাঙ্গালী রাজা শশাঙ্কের আমলে (৭ম শতক) এ ভূমি গৌড়ের অধীন, শশাঙ্ক শিবভক্ত ছিলেন, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাল-সেন যুগে এই দক্ষিণাঞ্চল বৌদ্ধ পাল রাজা ও হিন্দু সেন রাজাদের কীর্ত্তি-ভূমি, মধ্যযুগে ছশো বছর ধরে মুসলমান রাজত্বকালে সুন্দরবন সহ ২৪ পরগণার প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছে, দুশো বছরের ইংরেজ শাসনকালে নব নব আবিষ্কারের নানা অবদানে এবং এ অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামীসহ অজস্র মনীষীর জন্মগ্রহণের ফলে দঃ ২৪ পরগণার প্রচুর অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালেও আমরা পেছিয়ে নেই। বারুইপুরে ২৪ পরগণার নাট্য, প্রত্নতত্ত্ব ও লোক-সংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেছে, জেলার ইতিহাস সম্মেলনে আমরা ব্রতী হয়েছি। বারুইপুরের আশেপাশে রামনগর ও রাজপুরে আমরা জেলা সাহিত্য সম্মেলন করেছি। ৩০ বছর আগে বারুইপুরের 'সোমপ্রকাশ সাহিত্যপত্রিকা এবং পরবর্তীকালে অনুরূপ অসংখ্য পত্রপত্রিকার সৃষ্টির ফলে এ অঞ্চল এক

সারস্বত সাধনার পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককথায়, আজ বারুইপুর অঞ্চল অসামান্য সংস্কৃতির দ্যুতিতে ঝলমল করছে। আধপেটা খেয়ে কৃশতনু, তবু আমরা কবিতা লিখি, কবিতা শুনি। তাতেই আমাদের আনন্দ।

শুধু সংস্কৃতির ঐতিহ্য নয়, নানা মনীষীর ও মহাপুরুষের পদধূলিপূত এই বারুইপুর ও আশেপাশের মাটিতে আজ জীবনসায়াহ্নে একটি প্রণাম রেখে গেলুম।

"মাটিতে জন্ম নিলাম,
মাটি তাই রক্তে মিশেছে,
এই মাটিরই গান গেয়ে,
ভাই জীবন কেটেছে"।

(১৯৯২ শারদীয় দক্ষিণ প্রান্তিক হইতে সংকলিত)

"আমি আশীর্ব্বাদ করছি এই বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে তুমি আমাদের সাক্ষাৎ দর্শন পাবে — আমরা দুই ভাই তোমার প্রেমে চির আবধ্য থাকবো।" — প্রভু অনন্ত আচার্য্য কে এই প্রবোধ দিয়ে কটকী ঘাট থেকে ছত্রভোগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু — আটিসারা

বারুইপুর ঃ অতীত ও বর্তমান

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

'কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও।
কথা কও, কথা কও । ...."

কবিগুরুর এই মন্ত্রে আমিও আজ আহ্বান করছি অতীতকে – 'কথা কও, কথা কও ।' মৌন মূক হে অতীত ; কে কোথায় আছ সাড়া দাও, মুখর হও। শোনাও তোমার জীবন-সঙ্গীত!

প্রিয় বন্ধু শ্রী পিয়ারী লাল দত্তের (মুনসেফ, বারুইপুর আদালত) অনুরোধ, বারুইপুরের অতীত ও বর্তমান কাহিনী শোনাতে হবে। অক্ষমতা সত্ত্বেও 'না' করতে পারলাম না। কারণ, স্নেহের রজ্জুতে বড় শক্ত কোরে ইনি বেঁধে ফেলেছেন, কিন্তু লিখি কোথা থেকে ? সেই অনাদি অতীতের প্রসূতি গৃহ কোথাও আছে কি ? আছে কি তেমন কোনো বৃদ্ধ তাপস, যে আমার উত্তর দেবে ? তার ওপর বারুইপুর এমন একটা কী জায়গা যে, তাকে নিয়ে একটা ইতিহাস তৈরী হবে ? কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক রাজার রাজধানী ? তাও না। কৈ, এমন কোনো কীর্তির পরিচয় তো আপাত দেখতে পাচ্ছি না, যার আছে সর্বভারতীয় পরিচিতি। তা হলে কী লিখব ? কাকে নিয়ে লিখব, জানি না। তবু বন্ধুবরের অনুরোধ রক্ষায় বেরিয়ে পড়তে হলো। দেখি কোথায় আছে সেই পরশপাথর, যাকে পেলে আমরা সোনা হয়ে উঠতে পারি ?

আছে একজন; বোধ হয় শ'তিনেক বছরের বৃদ্ধ, স্থাণু হয়ে আছে বারুইপুর আদালতের কাছে দাঁড়িয়ে কালের সাক্ষী হ'য়ে; কিন্তু সে কেবল নিশ্চলই নয়, নির্বাকও। নাম তার শিরিশ গাছ। বর্তমান আদালতের অদূরে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধ'রে সে কেবল আদালতের বাদী-বিবাদীর হাসি কান্নার কড়চা তৈরী কোরে যাছে ! এর পাতার মর্মরে কত কথা ভেসে বেড়ায়, কত মানুষের সুখ দুঃখ পুঞ্জিত ও বিচিত্র কাহিনী শাখায়-প্রশাখায় সে ধ'রে রেখেছে, কে তার হিসেব রাখে! যার কান আছে, সে শুনতে পায়; কিন্তু আমার তো নেই! তাহলে উপায় ?

তাই চলে যাই আদিগঙ্গার তীরে 'সদাব্রত ঘাটে' কথিত আছে সে ঘাটে একদিন বারুইপুরের জমিদার দূর্গাচরণ চৌধুরী এক লক্ষ বিঘা জমি দান কোরে 'সদাব্রত' উদ্যাপন করেছিলেন।কিন্তু আজ নেই তার কুলুকুলু ধ্বনি, শৈবাল দামে ভরে আছে, আজ সে বদ্ধ জলাশয়। যেটুকুবা প্রবাহ ছিলো, নবাব আলিবর্দি ও টালি সাহেবের চেষ্টায় সেটুকুও আজ স্তব্ধ। কে শোনাবে তার জীবনসঙ্গীত ? একটা মূক বৃক্ষ যা পারে না, একটা নদী কি তা পারে ? পারে বোধ হয়। দিনাবসানে সন্ধ্যার সমাগমে, শান্ত-স্নিগ্ধ মলয়ানিলে এর তীরে গিয়ে বসলে আজও শোনা যায়, ভগীরথের সেই শঙ্খধ্বনি, যা তীরবর্তী মন্দিরে মন্দিরে আজ ৪/৫ হাজার বছর ধ'রে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চলেছে। গঙ্গার গর্ভ আজ শুকিয়ে গেলেও

তাঁর সন্তানদের ভক্তিনীরে বুক তার ভরিয়ে রেখেছে। এরা ভোলেনি সেই তপস্বী ভগীরথকে যিনি কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার কল্পে সেই রাজমহল থেকে খাল কেটে –দক্ষিণবঙ্গে প্রবাহিত কোরে ঊষর, অনুর্বর অঞ্চলকে শ্যাম শোভায় সজীব কোরে তুলেছিলেন। সে আজ ৪/৫ হাজার বছর আগের কথা এই গঙ্গারই বুকে পাল তুলে কতনা জাহাজ পাড়ি জমাত দেশ দেশান্তরে। চাঁদ সদাগরের ১৪ ডিঙ্গি এই পথেই তো ঘরে ফিরছিলো সিংহল – পাটনা থেকে বাণিজ্য কোরে। মা মনসার কোপে ডিঙ্গিগুলো সবই ডুবলো কালীদহে আর শিঙ্গাদহে। কি আশ্চর্য, দহ দুটি আর কোথাও নয়, ক্ষীণকায়া হ'য়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে ধপধপি গ্রামের কাছে আলিপুর গ্রামে। আজকের নাম তার 'চাঁদ (চাঁদো) খালি'। চাঁদ সদাগরই নিজের নামটা বুঝি নিজেই রেখে গেছেন। এই চাঁদখালির দই কিন্তু বড়ই বিখ্যাত। একবার খেলে কেউ ভুলবে না। আজ তা অবলুপ্ত

চলে আসি ওখান থেকে উত্তরে মহাপ্রভুর মন্দিরে, পুরোনো বাজারের দক্ষিণে। কান পেতে শুনি বৈষ্ণবদের কীর্তন। মনে পড়ে যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা। ১৫১০খৃঃ অব্দ। মহাপ্রভু নদীয়ার শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে আদিগঙ্গার তীর ধ'রে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দুই মৃণালভুজ উর্দ্ধে তুলে হরিনাম করতে করতে পদব্রজে সপারিষদ্ এগিয়ে আসছেন আটিসারা গ্রামের কুটিরবাসী বৈষ্ণব অনন্ত পণ্ডিতের কাছে। এলেন, প্রেমাশ্রুতে উভয়ে উভয়কে সিক্ত করলেন এবং একরাত্রি পণ্ডিতের সঙ্গে কীর্তনেও কাটালেন। কীর্তনের আসরটি বসেছিল নাকি অদূরের ঐ শ্মশানে, আজ যার নাম 'কীর্তনখোলা।' কেউ বলেন আবার ওখানে নাকি কীর্তনের খোল বাজাতে বাজাতে ভেঙে গিয়েছিলো' তাই তার ঐ নাম। এও শোনা যায় এর কাছে যে 'কটকি পুকুর'টা আছে, মহাপ্রভু নাকি ওখানে স্নান কোরে কটক অর্থাৎ নীলাচলের উদ্দেশ্যে দ্বারীর জাঙ্গলে'র পথ ধ'রে চক্রতীর্থ হয়ে নৌকায় ডায়মণ্ডহারবার নদী পেরিয়ে মেদিনীপুরে 'নরঘাটে' নেমে ধাবিত হন প্রভু জগন্নাথের উদ্দেশ্যে। তাঁর পূত পাদস্পর্শে কত না বৈষ্ণবতীর্থ গড়ে উঠছে গঙ্গার ধারে ধারে। সব জায়গায় তাঁর স্মারক চিহ্ন আছে, নেই কেবল আটিসারার মন্দিরে। কাউকে জিজ্ঞাসা না করলে বুঝতেই পারতাম না যে, এই সেই আটি সারা আর এই সেই শ্রীচৈতন্যের স্পর্শধন্য অনন্ত পণ্ডিতের আবাসস্থল। আমরা ভক্তির চর্চা করি, ইতিহাসের নয়। ভক্তিতে ভগবান মেলে, ইতিহাসে বুঝি মেলে না। তাই আমরা ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দেবতা চাই ! মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের দেবতারে খুঁজি। ফলে দেবতা হন বিমুখ আর মানুষ হয় বীতরাগ। যাক সে কথা।

চলে আসি পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে পাকা রাস্তায়। বাজারের উত্তরে অটুট দোল মঞ্চটা দেখে অবাক হয়ে যাই। চূড়ায় উঠি। একি ? চূড়ার পূবদিকে দেখি ক্ষোদিত আছে '১৩৭৩ সক অব্দ, ক্ত।'' অর্থাৎ শকাব্দ; খৃষ্টাব্দে হয় ১৪৫১। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কে করলো এই মন্দির ? মহাপ্রভু এলেন তো এর ৫৯ বছর পর আর বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা তখন তো জমিদারই হননি, বারুইপুরেও আসেননি, আছেন তাঁরা রাজপুরের আদি বসতিতে। তাহলে কে বা কারা করলো এই দোলমঞ্চ ? সে কথার উত্তর আজও মেলেনি।

এগিয়ে চলি কাছারী বাজারের দিকে। একি সেই বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, যার কথা লেখা

আছে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে (খৃঃ ১৬৮৬) ঃ "সাধু ঘাট পাছে করি /সূর্য্যপুর বাহে তরী/চাপাইল বারুইপুরে আসি। বিশেষ মহিমা বুঝি/বিশালাক্ষী দেবী পূজি/ বাহে তরী সাধুগুণ রাশি।।" ?

আর একটু এগিয়ে কল্যাণপুরে গিয়ে দেখি ঐ রায়মঙ্গল কাব্যের এই চরণের প্রতিমূর্তিঃ "মালঞ্চ রহিল দূর/ বাহিয়া কল্যাণপুর/কল্যাণ মাধব প্রণমিল/ বাহিলেক যত গ্রামকি কাজ করিয়া নাম/বড়দহ ঘাটে উত্তরিল।।"

এগিয়ে যত চলেছি, কৌতূহলও তত বাড়ছে। কে জানে এত কথা বারুইপুরের পেটে ছিলো। এই সেই পুরন্দরপুর গ্রাম। কোদালিয়া তথা ভারতের গৌরব রবি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ মহীপতি বসুর নামানুসারে যে গ্রামের নাম আজ মাহিনগর, তাঁর পৌত্র গোপীনাথ বসু ছিলেন খৃঃ ১৪৯৪ অব্দের বাংলার স্বাধীন ও জনপ্রিয় নবাব হুসেন শা-র প্রধান রাজস্ব সচিব ও নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ। গোপীনাথ নবাবের কাছ থেকে 'পুরন্দর খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। যে গ্রামে তিনি অবসর জীবনযাপন করেছিলেন সেই গ্রামের নামই আজ পুরন্দরপুর ; আর তাঁর বাকী দু'ভায়ের স্মৃতিধন্য দুখানি গ্রাম গোবিন্দ বসুর নামানুসারে গোবিন্দপুর । আর সুন্দরবর বসু যিনি ঐ নবাব দরবার থেকে 'বল্লভ খাঁ মল্লিক' উপাধি পান, তাঁরই স্মৃতিধন্য গ্রাম মল্লিকপুর এবং মল্লিকপুর রেলওয়ে স্টেশন। এবং পার্শ্ববর্তী সোনারপুর থানার 'মালঞ্চ' গ্রামখানি ছিলো গোবিন্দ বোসের পুষ্পবাটিকা। এ যেন রম্য উপন্যাস পড়ছি। ভাবছি, কেমন ছিলো সেদিন আর কেমন হলো আজ। কিন্তু বাকী তো আরো আছে।

সুভাষগ্রাম স্টেশনে নেমে চলে গেলাম পূর্বদিকে বারুইপুর থানার সীমান্ত গ্রাম 'পেটুয়া'য়। অবাক হ'য়ে দেখি 'মশীদ তলায়' পাঠান আমলের এক দ্বিতল মসজিদ; যার চূড়াটাকে সংলগ্ন বটের ঝুরিতে রেখে নীচের তলাটা মাটির গর্ভে ঘুমিয়ে পড়েছে। শত শত বছর ধ'রে কত শত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা কোরে কেমন ভাবে দুলে চলেছে সে এক অপার বিস্ময়। অবশ্য পুরন্দরপুরের আর বিড়লা গ্রামের মন্দিরের মধ্যেও কম কথা লুকিয়ে নেই।

এমনি অবাক হয়েছিলাম, এই থানার পূর্ব সীমান্ত গ্রাম উত্তর বেলেগাছিতে গিয়ে। মজা বিদ্যাধরী নদীর বাঁধের ধারে স্লুইস গেটের কাছে। চারিদিক ফাঁকা কেবল ধূ ধূ মাঠ। যাকে বলে বাদা। মনুষ্য বসতিহীন বিস্তীর্ণ এই এলাকার মধ্যে কী কোরে এলো মানুষের এত কবর? এ যে কবরখানা ! শতাধিক কবরের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে মাটির গৃহস্থালির সাজ-সজ্জা–চেরাগ, কল্কে, খেলনা-ঘোড়া, থালা, গেলাস রঙ বেরঙের খোলামকুচি আরো কত কী। কারা আনলো এসব ? তবে কি এই সেই 'বেলের জঙ্গল' – যেখানে বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজী ঢাকা থেকে এসে প্রথম আস্তানা গেড়েছিলেন খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে ? খুব সম্ভব তাই। দক্ষিণে ধপধপি গ্রামের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মন্দিরের কথা বাদ যাবেই বা কেন ? ভয়ংকর সুন্দর এমন বন দেবতার কল্পনা আর কি দ্বিতীয় কোথাও আছে? এমন যে কত দেখলাম, তা সব বলতে গেলে তো একটা বই হয়ে যায়। সুতরাং প্রসঙ্গটার ইতি এখানেই টানি। কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'—

কালের সাক্ষী হয়ে যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত যে সব ক্ষুধিত পাষাণ মুক্তির প্রতীক্ষায় সেখানে অধীর আগ্রহে দিন গুণছে, পরবর্তী অভিযান আমার মাটির সেই অভ্যন্তরে। আগে যা পেয়েছি , তা সবই মাটির ওপরে। যদিও তার সঞ্চয় নিতান্ত অপ্রতুল নয়, সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিক ইতিহাসের পক্ষে। কিন্তু বসুধার গভীরে যে গভীর কথা আছে, যার মর্মবেদনায় কাতর কবি বলে উঠেছেন – "তব সঞ্চার শুনেছি আমার/মর্মের মাঝখানে, কত দিবসের কত সঞ্চয়/ রেখে যাও মোর প্রাণে।"

বাস্তবিকই তাই। বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেলো সীতাকুণ্ড ও আটঘরা নামে পাশাপাশি দুটি গ্রামে এসে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে গ্রাম দুটির অবদানের কথা শোনা ছিলো ; কিন্তু তার রূপ যে অত বিশাল ও দূরবিস্তৃত, তাতো জানা ছিলো না। সেন-পাল-গুপ্ত-কুষাণ ও মৌর্য যুগ ছাড়িয়ে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এখানকার মাঠে-ঘাটে আর শোভা পাচ্ছে বহু মিউজিয়ামে এবং কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আগে জানতাম বহুলোক, প্রচার করে গেছেন, এ সব অঞ্চলে আদৌ তার কোনো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত কোরে সম্প্রতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছে আটঘরাতে একটি টেরাকোটা বৌদ্ধ শ্রমণ মূর্তি বোধি বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন আর একটি পাওয়া গেছে মথুরাপুর থানার কংকণদীঘিতে টেরাকোটা বুদ্ধমূর্তি। (জৈন মূর্তির সন্ধান দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তো বেশ কিছু পাওয়া গেছে) তা ব্যাপারটা বোধ হয় অসম্ভব কিছু নয়। 'সংযুক্ত নিকায়' অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধদেব কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন। 'বোধিসত্ত্বকল্পলতা'তেও বলা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধ ছ'মাস কাল পুন্ড্রবর্ধন দেশে বাস করেছিলেন। উয়াং চুয়াঙ-এর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায়, বুদ্ধ তিন মাস পুন্ড্রবর্ধনে এবং সাত দিন সমতটে ও কর্ণসুবর্ণে (কান সোনা) বাস করেছিলেন। ঐ চীনা পরিব্রাজক সমতটে বহু বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। আর আমাদের এই বারুইপুরও ঐ প্রাচীন সমতট ও পুন্ড্রবর্ধন এই দুটির মধ্যেই পড়ে । তাহলে আটঘরাও কংকণদীঘিতে পাওয়া টেরাকোটায় বুদ্ধমূর্তিকে তো আর অগ্রাহ্য করতে পারিনে।

সীতাকুণ্ড গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সীতা-মার মন্দিরের আশেপাশে যেসব কাহিনী, কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, সে সবের পর্যালোচনা করলে মনে হয়, একদা যশোহর জেলার কাগজ পুকুরিয়া গ্রামের রাজা রামচন্দ্র খাঁর সঙ্গে বুঝিবা একটা সম্পর্ক ছিলো। মন্দিরের পূর্বে-পশ্চিমে ফাঁসি পোতা, শূলী পোতা, চার পাশ ইঁট দিয়ে বাঁধানো সামনের দীঘি, নিরামিষ পুকুর, চাল ধোওয়া পুকুর ইত্যাদি নিদর্শনগুলি রাজন্য শক্তির পরিচয়ই বহন করছে। উল্লেখ্য যে, যশোহর জেলায় ও সুন্দরবনে এই নামেরই কতকগুলি পুকুর আছে।

তাছাড়া, এই সীতাকুণ্ড–আটঘরায় পাওয়া বেশ কিছু বিষ্ণুমূর্তির রামনগর গ্রামে(খুব সম্ভব) একটি জৈন বিদ্যাদেবীর প্রস্তর মূর্তি, চঙ্গোগ্রামের গুপ্তযুগের কিছু ইঁটের চত্বরও ক্ষুদ্রাকার গণেশ, সূর্য ও মহিষাসুরমর্দিনীর প্রস্তরমূর্তি, গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিনির্মিত বিড়লা ও পুরন্দরপুর মঠের মন্দির ঐ সীতাকুণ্ড গ্রামের ছাটুইপাড়ায় জোড়াবাংলার মন্দির,

বেনিয়াডাঙ্গার মন্দির ইত্যাদি প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মেলে, যা দেখলে বারুইপুর সম্বন্ধে আগের ধারণা বদলে দেয়। এ সব নিদর্শন মাটির অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে এই থানার দুটি মিউজিয়ামে– রামনগরে 'কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা'য় ও বারুইপুরের 'সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা'য়, পঃ বঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকারের মিউজিয়ামে এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সুসজ্জিত হয়ে নিজ নিজ আত্মপরিচয় দিতে আমাদের কেবলি আহ্বান করছে। কেবল বারুইপুর অঞ্চলের নয়, সুন্দরবন সভ্যতার বিপুল নিদর্শন সম্ভার এ সব ছাড়া বহু মিউজিয়ামে, ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে, আমরা ক'জন তার হিসেব রাখি। মোট কথা, এ অঞ্চলটার প্রাচীনতাকে কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যে কারণে যায় না, তার আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পরাক্রমশালী গঙ্গারিডিদের কাহিনী।

নন্দ ও মৌর্য রাজাদের রাজত্বকালের গঙ্গারিডিদের শেষ রাজা ধননন্দ, যিনি নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন তাদের রাজধানী ২৪ পরগণা সাগরদ্বীপেই হোক আর চন্দ্রকেতু গড়েই হোক কিংবা বিহারের পাটলিপুত্রেই হোক তাদের চতুরঙ্গ সেনা–২লক্ষ পদাতিক, ৮০ হাজার অশ্বারোহী, ৮ হাজার সামরিক রথ ও ৬ হাজার রণহস্তী যে এইসব অঞ্চল দিয়েই যাতায়াত করতো এবং এসব অঞ্চলের মানুষও যে সেকালে ঐ সব যোদ্ধাদের দলেও ছিলো, একথা অবশ্যই ধ'রে নেওয়া যায়। আর এই বিপুল রণসম্ভার দেখে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার যে এদিকটা জয় করার আশা ত্যাগ কোরে এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটালেন, একথা কেউ কেউ বলে থাকেন ; কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিত । অবশ্য এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

তারপর পাল রাজারা, সেন রাজারা অনেক কাল এদেশে রাজত্ব করলেন। সেন রাজারা প্রথমে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের এনে বসালেন। সুন্দরবনের অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে এই অঞ্চলের কথাই বলি। সুন্দরবনের ২২ নং লাট এবং এই থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষণসেন দেবের দুখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদান সনন্দ (তাম্রশাসন) থেকে জানা যায় যে, বাংলায় মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজাদের শাসনকালে আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ প্রদেশে, তৎকালীন শাসন বিভাগ বর্ধমানভুক্তি আর পূর্বতীরস্থ প্রদেশে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

দক্ষিণ গোবিন্দপুরে পাওয়া পূর্বোক্ত তাম্রশাসন বাণীতে দেখা যায়, এর দ্বারা মহারাজা লক্ষণ সেনদেবের বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত 'বেতড্ড চতুরক' নামক শাসন বিভাগে গঙ্গাতীরবর্তী 'বিড্ডর শাসন' নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। এতে ঐ গ্রামের চতুঃসীমা দেওয়া হয়েছে ঃ উত্তরে ধর্মনগরী সীমা (ধামনগর), পূর্বে, জাহ্নবী অর্ধসীমা দক্ষিনে – লেংঘদেব মণ্ডপীসীমা ও পশ্চিমে – ডালিম্বক্ষেত্র সীমা। বলাবাহুল্য, এই থানার মধ্যে শাসন' নামে একটি গ্রাম ও রেলওয়ে স্টেশন, ঐ বিড্ডর শাসনেরই সংক্ষিপ্ত নাম।

অতঃপর এলো মুসলিম রাজত্ব। তুর্কি, পাঠান, মুঘল একে একে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলো। ২৩শে জুন, ১৭৫৭ সালে বৃহস্পতিবারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ও ৩০শে জুন ১৭৫৭ তারিখে রক্তাক্ত মৃতদেহ কবরস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের

পরাধীনতার সূচনা হলো, নামে মাত্র নবাব নিমকহারাম মিরজাফরের হাত থেকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৭ সালে ২৪টা পরগনা জায়গীর নিয়ে হলো ২৪ পরগণা জেলার সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে হলো পরাধীন ভারতের দুর্ভোগেরও সূচনা। এতদিন আরাকানী মগ আর পর্তুগীজ বোম্বেটের অতি ভয়ানক বর্বর অত্যাচারে দক্ষিণ বাংলা প্রায় ৫শ বছর ধ'রে যে ভাবে উৎখাত হয়ে যাচ্ছিলো, শ্মশানে পরিণত হচ্ছিলো গ্রামের পর গ্রাম; ইংরেজ শাসনে সেটা দূরীভূত হলেও নোতুন কোরে নোতুন অত্যাচার আবার শুরু হলো। সে এক অন্য ইতিহাস। বারুইপুরের কথাই বলি।

(৩)

বারুইপুর

এবার বারুইপুরের নিজস্ব পরিচয়টা না দিলে নয় দেখছি। নামটার উৎপত্তিই বা কী ও নামটার বয়সই বা কত ?

বারুইপুর নামটার উৎপত্তি অবশ্যই বারুই থেকে। পান ব্যবসায়ী বারুই সম্প্রদায়ের বাস এককালে অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায়, নামটা হলো বারুইপুর। এই সম্প্রদায়ের বাস দুধনই ও মদারাট গ্রামে সবচেয়ে বেশী আছে। তবে মনে হয়, দত্তপাড়ার পাশে বসবাসকারী বারুইরা এখানে এই সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দা। এবং এইটাই ছিলো সম্ভবত আদি বারুইপুর। তারপর, নানা কারণে কলকাতা নামটা যেমন ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে ঠিক তেমনি বারুইপুরও। আটিসারা, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, পদ্মপুকুর, বলবলিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট ছোট জায়গা ঘিরে প্রচুর গ্রাম নাম ছিলো, সে নামগুলিকে আত্মসাৎ করে বারুইপুর আজ দক্ষিণবঙ্গের একটি উজ্জ্বল নাম। বর্তমানে রাজধানী বিশেষ।

এই নাম কতদিনের প্রাচীন, সঠিকভাবে সে কথা বলার উপায় নেই; তবে নামটির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ দেখা যায়, খৃঃ ১৪৯৫ অব্দে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসাবিজয়' পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছে —

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পুজিয়া।

চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।

ধনস্থান এড়াইল কুতূহলে।

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে।।

হুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিত ত্বরিত।

ছত্র ভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত।।"

কিন্তু মনে রাখতে হবে নামের পত্তনটা বিপ্রদাস করেন নি। এঁর অন্তত ৫০ বছর আগেও নামটা নিশ্চয়ই ছিল। যে ২৪টা পরগণা নিয়ে এই '২৪পরগণা' জেলার সৃষ্টি তার অন্যতম প্রধান পরগণা মেদন মল্লের অন্তর্গত এই বারুইপুর। তিনটি থানা— বারুইপুর, সোনারপুর

ও ক্যানিং থানার উত্তরাংশ নিয়ে এই পরগণা [Pergunnan Meydumul Pergunnah Meydunmul is bounded on the North by Pergunnah Khaspur and Calcutta, South by Pergunnah Boredhatti, East by Pergunnah Pyeghatte and Soonderbans and West by Pergunnah Magoorah. The Biddiadhuri River devides it from pergunnah Pyeghatte, Tolly's canal from Pergunnah Khaspur and Calcutta with the exception of four villages situated to the north of it and the Gunga nullah devides it from Pergunnah Megoorah with the exception of one village of the latter Pergunnah, situated on the left bank" -- Statistical and Geagraphical Report of the 24 Pergunnahs District -- by Major Ralph Smith, 1857] স্মিথ সাহেবের রিপোর্ট (১৮৫৭) অনুযায়ী সেদিনের এই পরগণার ঘর-বাড়ীর সংখ্যা ছিলো – "১২০৮০১টি এবং প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ছিলো ৪১,২১৯ জন।"

এই মেদনমল্ল পরগণার নামকরণ কেমন কোরে হলো, এখনও তা জানা যায়নি; যদিও তা নিয়ে অনেকে অনেক রকম উদ্ভট কল্পনা করেছেন। পরগণা হিসেবে এই নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, খৃঃ ১৫৮৬ অব্দে আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে। উড়িষ্যার প্রতাপশালী রাজা, যিনি মেদিনীপুর জেলার একটা বিস্তীর্ণ অংশ খৃঃ ১৫২৪ অব্দে জয় কোরে নিজ নামে ঐ জেলার নামকরণ করেন বোলে একটি মত আছে, সেই মেদিনীমল্ল রায়ের সঙ্গে ২৪ পরগণার মেদনমল্লের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, আজও তা গবেষণা সাপেক্ষ। কারণ রাজ্যসীমা ক্যানিং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮২৮ বর্গমাইল বারুইপুর থানা। এর উত্তরে সোনারপুর, দক্ষিণে জয়নগর, পূর্বে ক্যানিং ও পশ্চিমে বিষ্ণুপুর থানা। মোট গ্রামের সংখ্যা ১৪০ বা ১৪৩ টি। বারুইপুর মূলকেন্দ্রে (proper) সাবেক দিনে পাড়া ছিলো – বারুইপাড়া, শাঁখারীপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, পালপাড়া, পোদপাড়া, শুঁড়ীপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি ৮/১০টি। বর্তমানে কিছু পাড়া ও ২/১টি নোতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। যেমন - দক্ষিণরায় পাড়া, বংকিমনগর, অরবিন্দ নগর প্রভৃতি।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রায়ই কথা বলতেন – 'নদীতে যখন নৌকা যায়, বড় একটা কেউ টের পায় না; কিন্তু জাহাজ যখন যায়— ? অর্থাৎ বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব কোথাও ঘটলে, চাঞ্চল্য সেখানে দেখা দেবেই। বারুইপুরেও তাই হয়েছিলো। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের পর থেকেই যেন নবজাগরণ ঘটলো এই বারুইপুরে। কেবল বারুইপুরেই অবশ্য নয়, সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এবং সমগ্র বাংলায় তান্ত্রিক আচার-বিচার সর্বস্ব, ব্যাভিচারে মগ্ন, জরাগ্রস্ত সমাজের ওপর চৈতন্যদেবের সাম্যবাদের ভাব-বন্যা সমগ্র বাংলার সাথে এ-অঞ্চলকেও প্লাবিত করলো।

বলা বাহুল্য, বারুইপুরের সাংস্কৃতিক জাগরণের কিছু আগে ১৬শ শতাব্দীর সূচনা থেকেই জেগে উঠেছিলো পার্শ্ববর্তী গ্রাম হরিনাভি, রাজপুর, কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগর এবং দক্ষিণে জয়নগর-মজিলপুরে। রাজপুর গ্রাম তো তখনকার দিনে 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' নামে আখ্যা

লাভই করেছিলো। তারও ঢের আগে বোড়াল গ্রামের জাগৃতি। এই গ্রামগুলির ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই প্রাধান্য তাই মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা কথা। ২৪ পরগণার এই মধ্যযুগীয় সভ্যতা, এর সুপ্রাচীন সভ্যতা, যা এর প্রত্ন বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে দেখা যায়, তার ধারক বা বাহক নয় আজকের যুগ। নানা কারণে তার ধারাবাহিকতা অবলুপ্ত হয়েছে। তাই এখানকার মানুষ সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। লোকায়তিক তান্ত্রিক ধর্ম, শৈব বা বৌদ্ধ ধর্মের বাতাবরণ এবং পীর-গাজী-বনবিবি-দক্ষিণরায়-মঙ্গলচণ্ডীর পরিমণ্ডলে এখানকার মানুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'য়ে বুঁদ হয়ে বসেছিলো এবং এখানেও বেশ কিছু আছে। বৈদিক ধর্মের ছোঁয়া লাগলো ১৬শ শতাব্দী নাগাদ মহাপ্রভুর সাম্যবাদের পথ ধরে। যাক সেসব অনেক কথা। মোট কথা, শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম ব্যক্তি যিনি বারুইপুরেও প্রাণের জোয়ার আনলেন।

আটিসারা গ্রামকে কেন্দ্র কোরে তার আশপাশের কয়েকখানি গ্রাম তখন বৈষ্ণব ভাবধারায় প্লাবিত। রাজপুরের জমিদার রাজা মদন রায়ের বংশধররা সেই ভাবধারায় অবগাহন করলেন। (এই বংশ এখনও মূলতঃ বৈষ্ণব) তাঁদের মধ্যে দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী আটিসারার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হলেন। তাই তিনি নিজ গ্রাম রাজপুরের গঙ্গার ঘাটে 'সদাব্রত' উদ্‌যাপন না কোরে বারুইপুরের ঘাটেই করলেন। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলেন বারুইপুরে। প্রাসাদও নির্মাণ করলেন আটিসারার অতি কাছে। হাঁটাপথে ৫ মিনিট।

একটা কথা। 'হরপার্বতীমঙ্গল' ও 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের বর্ণনানুযায়ী দুর্গাচরণ-ই বারুইপুরে প্রথম আসেন ব'লে ধ'রে নেওয়া হয় ; কিন্তু তাঁর পৌত্র রাজা রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর প্রথম আগমনের পক্ষেও প্রাচীন দলীল দস্তাবেজ ও ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। দুর্গাচরণ এলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে রাজবল্লভই ১৭৯০ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারীর পাট্টাখানি সঙ্গে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে বারুইপুরের রাসমাঠের উত্তর সংলগ্ন প্রাসাদে বাস করতে থাকেন আনুঃ খৃঃ ১৭৯০ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে। যে জন্য প্রাসাদটির নাম 'দুর্গাচরণ ভবন' না হ'য়ে হলো 'রাজবল্লভ ভবন'। এঁদের জমিদারী আগে অনেক জায়গায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছিলো, মেদনমল্ল ও পেঁচাকুলী এই দুই পরগণায়।

রাজবল্লভ বারুইপুরে এসে প্রথমেই পিতামহ দুর্গাচরণের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন। কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এনে বারুইপুর ও তার আশপাশের গ্রামে নিষ্কর, ব্রহ্মত্র, মহাত্রাণ প্রভৃতি শর্তে বসবাস করিয়ে সমাজ স্থাপন করলেন। দুর্গাচরণ যশোহর জেলার ধুলিয়াপুর গ্রাম থেকেও ব্রাহ্মণ আনেন। মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুৎ গ্রাম থেকে আনান পাঠকদের। এই পাঠকবংশেই বারুইপুর আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল হরেন্দ্রনাথ পাঠকের জন্ম। কেবল বারুইপুরেই নয়, অন্যান্য গ্রাম যেমন— রামনগর, ধপধপি, শাসন, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি রাজবল্লভের প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণে নানা স্থান থেকে এসে ভরে ওঠে। রাজবল্লভ কেবল ব্রাহ্মণ বসিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, সংস্কৃত চর্চার জন্য টোল প্রতিষ্ঠাও করেন। জমিদারি থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিটি টোলের জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো। বৃত্তির নাম ছিলো 'চৌবাড়ী।'

রামনগর গ্রামের টোলের অধ্যাপকরা তিনপুরুষ ধ'রে– রামলোচন তর্কবাগীশ পুত্র দুর্গারাম শিরোমণি– পুত্র রামহরি তর্কালংকার এই চৌবাড়ী ভোগ করেছেন। এমন অনেক গ্রামেই ছিলো।

কেবল হিন্দু বসিয়েই ক্ষান্ত হলেন না রাজা রাজবল্লভ। পীরত্র, খৃষ্টত্র দিয়ে বিস্তার জমিতে বিস্তর মুসলমান ও খৃষ্টানদের তিনি বসিয়েছিলেন, তা সেটেলমেন্ট রেকর্ড এবং ১৮৭২সালের আদমসুমারি দেখলে বোঝা যায়। ক্রমে রায়চৌধুরীদের জমিদারী মেদনমল্ল পরগণা ধনে-জনে ভ'রে উঠতে লাগলো। মঠ-মন্দির, মসজিদ, গীর্জা দিকে দিকে মাথা তুললো; রাজবল্লভের সময়েই ইংরেজদের নজর পড়লো বারুইপুরের ওপর। এবার আমরা সেই সংকটময় অধ্যায়ে অগ্রসর হবো।

বাংলায় তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। বৃটিশসরকার তখনো হয়নি। বেনিয়া ইংরেজদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো দক্ষিণ ২৪ পরগণার দিকে। এদিকে নুন আর নীল বড় ভালো জন্মায়। ওরা ঠিক করলেন, ব্যবসাটা নেটিভ হিদেনদের হাতে যেতে দেবেন না, নিজেরাই করবেন। পিছনে তাঁদের রাজশক্তি অতএব ভয় কী ?

কিন্তু ঘাঁটিটা কোথায় করা যায়? এখনকার মত সেদিন এত রাস্তাঘাট ছিলো না। পদ্মপুকুর থেকে আমতলার রাস্তা সেদিন একটা মেঠো পথ। বারুইপুর বাজার থেকে কুলপি রোডও সেদিন ছিলো না। দক্ষিণাঞ্চলে যাবার একটিমাত্র প্রাচীন রাজপথ ছিলো তার নাম 'দ্বারীর জাঙ্গাল।' হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। এই পথ ধ'রেই শ্রীচৈতন্যদেব চক্রতীর্থে গিয়েছিলেন, পূর্বেই বলেছি। কিন্তু ১৮শ/১৯শ শতাব্দীতে সে পথের চিহ্ন অবলুপ্ত। কোনো কোনো গ্রামের মধ্যে তার একটুআধটু চিহ্ন আজও দেখা যায়। কাজেই দক্ষিণে যাবার রাস্তা বারুইপুরের পর আর নেই। একটি কুল-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জয়নগরের মিত্র-বংশের ২০তম পুরুষ মধুসূদন মিত্র মহাশয় ভূমিদান কোরে বিষ্ণুপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত এই রাস্তাটি তৈরী কোরে দেন। ইনি ছিলেন জয়নগরের ১২শ মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনজনের মধ্যে একজন।"

আর ক্যানিং রাস্তা? এটা তৈরী হয় আনুঃ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে। শোনা যায়, ক্যানিং যাবার জন্যে প্রথমে তোড়জোড় হয়, সীতাকুণ্ড থেকে চিত্রশালী, পুঁড়ি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে পিয়ালি নদী পর্যন্ত একটি রাস্তার। কাঁচা রাস্তা তৈরীও হয় এবং আজও সে রাস্তা আছে। পরে বারুইপুরের জমিদার দেবেন্দ্র রায়চৌধুরী ও রামনগরের জমিদার কৈলাস ঘোষের যৌথ উদ্যোগে মিলিত হয়ে ঐ রাস্তাটি বাতিল কোরে বর্তমান ক্যানিং রোড, পিয়ালি নদী পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটি নিজেরা ভূমিদান কোরে তৈরী করেন। পিয়ালির পরপার থেকে প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন বর্তমান রাস্তার অদূরে আজও দেখা যায়। ১৮৪৭/৪৮ সালের 'থাক জরিপে'র ম্যাপে এসব রাস্তার চিহ্ন ছিলো না। আর রেলপথ তো তখন দূর-অস্ত। কাজেই একমাত্র ভরসা আদিগঙ্গা। জোয়ার ভাঁটা না-খেললেও জল তখনো বেশ ছিলো। নৌকা নিয়ে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা ছিলো না। বারুইপুরও তখন বেশ বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমত বারুইপুরের বিখ্যাত নীল দ্বিতীয় উন্নত পরিবেশ, তৃতীয়ত অন্যত্র ঘাঁটি স্থাপনের উপায়হীনতা – প্রভৃতি কারণে ইংরেজরা এখানেই ঘাঁটি গাড়লেন।

নীলচাষ হতো অনেক জায়গায়। বারুইপুরের রাসমাঠের কাছে পরবর্তীকালে যেটি জমিদারদের বাজী পোড়ানোর মাঠ' নামে পরিচিত হয়, ওটির আসল নাম, নীলক্ষেত। আজ সেটা ঘরবাড়ীতে পূর্ণ। শাঁখারীপুকুর গ্রামে কয়ালপাড়ার কাছে নীলচাষ হতো এবং নীলকর সাহেবরা বাস করতেন। সাহেবদের গোটা কতক পাকা কবর আজও আছে জঙ্গলের মধ্যে।

বেগমপুর গ্রামে ছিলো নীলকর সাহেবদের পত্নীদের স্বতন্ত্র একটি আস্তানা। মেমদের বলতো বেগম। তাই থেকে বেগমপুর। এই গ্রামের 'দারোগার পুকুর'টি ছিলো নাকি জনৈক নীলকর পুলিশের বাসস্থান। দক্ষিণাঞ্চলের কাটানদীঘি ছত্রভোগ, গাজীপুর (ডায়মণ্ডহারবার) প্রভৃতি জায়গাতেও প্রচুর নীল উৎপন্ন হতো। ১৭৯৪ সালের ১৩ই (বা ১৬ই) জানুয়ারী তারিখের কোম্পানির গেজেটে বলা হয়েছে "We understand that the best Indigo delivered on contract for the last year has been manufactured by Messrs, Win and Thos. Scott of Gezipore and by Mr. Gwilt of Barrypore." এতে আরও বলা হয়েছে ঃ– 'গত বৎসর চুক্তি অনুযায়ী যাঁরা নীল চাষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গাজিপুরের (ডায়মণ্ডহারবার) ....টমাস্‌স্কট এবং বারুইপুরের মিঃ গিলটের সরবরাহ উৎকৃষ্ট হয়েছিলো।

বর্তমানে 'রবীন্দ্রভবনের' সম্মুখস্থ বড়কুঠির পিছনে নীলকর সাহেবরা একটা খাল কেটে অদূরবর্তী আদিগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত করেন। এই কাটাখাল দিয়ে তাঁরা নৌকাযোগে বারুইপুর থেকে দক্ষিণে ছত্রভোগ, কাটানদীঘি প্রভৃতি স্থানে নীল-কারখানায় যাতায়াত করতেন। সাম্প্রতিক উপনিবেশ 'বংকিম নগরী'তে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে রাস্তার বামদিকে কাটা খালটি আর তার গোটাদুই পাকা সোপান, যদিও খালটি আজ পুকুরে পরিণত। আর এই নীলচাষ করাতে নীলকর সাহেবদের শ্যামচাঁদ (মুরুলি মাছের চাবুক) কৃষকদের কত রক্ত ঝরিয়েছে, সে সবের প্রচুর রক্তাক্ত কাহিনী নানা গ্রন্থে লেখা আছে।

কেবল নীলেই শেষ নয়। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি কার্যালয় স্থাপন করেন। তার মধ্যে নিমক মহলের সদর দপ্তরখানা আর একটি চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য। নিমক মহলের ঐ দপ্তরখানার তৎকালীন প্রধান ইংরেজ কর্মচারী প্লাউডেন সাহেব (Mr. T. Chichele Plowden) ইংরেজি আদর্শে একটি স্কুল স্থাপন করলেন। পরে এটি ১৮২০ সালে খৃষ্টান মিশনের অধীনে চলে যায়।

পূর্বোক্ত নিমক মহলের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন Mr. Stuart Colvin Baley, I.C.S. পরে ইনি Sir উপাধি পান। বারুইপুরে যখন প্রথম মহকুমা হয় (১৮৫৮) এই কলভিন ছিলেন প্রথম মহকুমা শাসক।পরে ইনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর হয়েছিলেন।

এই বড়কুঠিটার একটু ইতিহাস আছে। কুঠিটা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইংরেজরা তাদের নুন ও নীল ব্যবসার জন্যে কুঠিটা তৈরী করে। শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী রচিত (১৯৪৫) এই বাড়ীর পারিবারিক ইতিহাসে লেখা আছে, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এ বাড়ীর তৎকালীন মালিক [...The office, quarters, warehouse

etc. were located in a building then owned by the late Dwaraka nath Tagore..."] পরে ১৮৬০ সালের কাছাকাছি লেখকের পিতামহ রাজকুমার রায়চৌধুরী দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রাসমাঠের পুরোনো বাড়ী থেকে উঠে এসে এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। দ্বারকানাথ ১৮২৩ সালে এখানে নিমক মহলের দেওয়ান হ'য়ে আসেন। বয়স তখন ২৪।

এতদিন পর্যন্ত বেশ চলছিলো। নুন কর এলো, নীলকর এলো, ব্যবসা করলো ও শিকড়ও গাড়লো। জমিদাররা সেদিন কিছু বললো না। কোনো সংঘাত এ পর্যন্ত হয়নি। হলো ধর্ম নিয়ে। খৃষ্টধর্ম প্রচার নিয়ে ক্ষমার অবতার মহান যীশুর নামেই কালি মাখাতে লাগলো যীশুভক্ত পাদ্রীরা।

(৫)

খৃষ্টধর্ম প্রচার সমিতি ২৪ পরগণা জেলায় ১৮২৩ সাল থেকে তাঁদের কাজ শুরু করেন আর বারুইপুরে তাঁদের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৩ সালে। রেভারেন্ড সি.ই.ডিব্রারেজ (১৮৩২-৭১) নামে একজন ইংরেজ অন্যতম প্রধান ধর্মপ্রচারক বর্তমান গীর্জা সংলগ্ন সমগ্র জায়গাটি (২নং ওয়ার্ড) জমিদার রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে ১৮৩৫ সাল নাগাদ গীর্জা নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৮৪৬ সালে। মধ্যে এখানে একটা Auxiliary Hospitalও কিছুদিনের জন্য হয়েছিলো। তাছাড়া একটা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। 'St Peter's School' নামে সেটা আজও চলছে।

'খৃষ্টাবাণী প্রচার সঙ্ঘ' (Society for the Propagation of the Gospel) ইতিপূর্বে রেভাঃ ডব্লিউ মরটন নামে এক ইংরেজ পাদ্রীর নেতৃত্বে টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, পাঁটুরি, গড়িয়া এবং বোড়াল গ্রাম্য স্কুলের সঙ্গে প্রচার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সময়েই মিঃ প্লাউডেন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার এই সঙ্ঘের ওপর ন্যস্ত হয়। ধর্ম প্রচারের কাজ এবার জোর কদমে চলতে থাকে। ইচ্ছেটা যেন এদেশে কোথাও আর অন্ধকার থাকবে না, সব দিব্য জ্যোতিতে ভরে দেবে। কিন্তু ফল হলো, বিপরীত।

সজিনাবেড়িয়া গ্রামে হিন্দু থেকে খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত দুই ব্যক্তিকে দিয়ে শিবমন্দির ভেঙে গীর্জায় রূপান্তরিত করা হলো। পরের বছরে মগরাহাটের অন্তর্গত বিরিয়ানি গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী নিজ ধর্ম পরিত্যাগ কোরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলো। ফলে স্থানীয় একজন মুসলমান জমিদার এই ধর্মত্যাগীদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। জমিদারের প্রজা উচ্ছেদ প্রতিরোধের জন্য সঙ্ঘ একটা মৌজাই (Hamle) কিনে নিলেন আর মগরাহাট পর্যন্ত রেলওয়ে স্টেশন পত্তনের জন্য উদ্যোগী হন।

১৮৪৪ সালে ঝাঁঝরা, ১৮৪৬ সালে বারুইপুর এবং মগরাহাটে পাকা গীর্জা তৈরী হলো। এই সময়ে বারুইপুর মগরাহাট অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তরে আলতাবেড়িয়া থেকে সরাসরি ৪০ মাইল দক্ষিণে খুরি (খাঁড়ি?) অবধি ৫৪টা গ্রামের মধ্যে ১৪৪৩ জনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হলো। ১৮৫৩ সালে টালিগঞ্জ ঝাঁঝরা প্রভৃতি এলাকায় খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ছিলো ১০৩১ এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিষ্য ছিলো ৬০৯ জন।

দুর্গাদাস ভবন
সাউথগড়িয়া
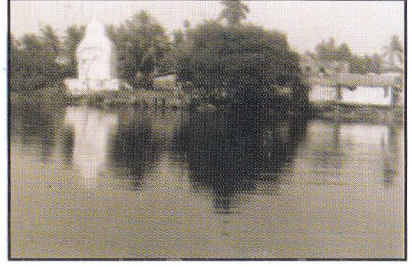
কোষাঘাট, বারুইপুর

দ্বারীর জাঙ্গাল
ধপধপি

সদাব্রত ঘাট
বারুইপুর

জামে মসজিদ
কাছারী বাজার, বারুইপুর

শীতলা মন্দির
শিখরবালি
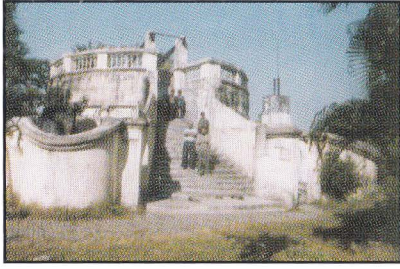
গণিমা পানীয় জলের কূপ
মল্লিকপুর
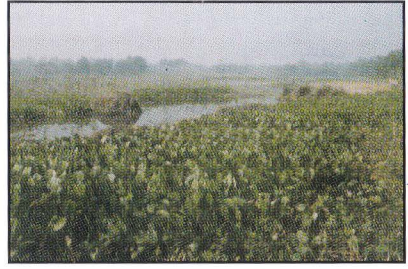
কালীদহ
আলিপুর (সূর্যপুর)
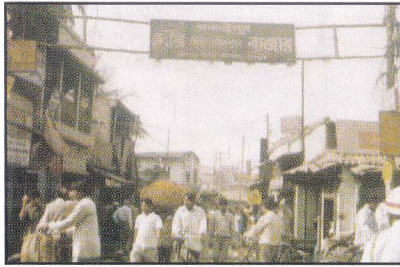
বারুইপুর পৌরবাজার

জগাতিঘাটা
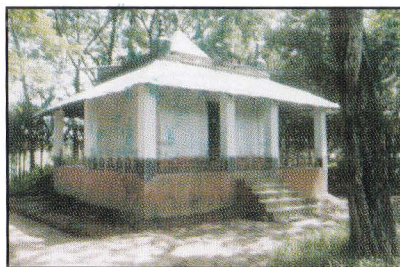
দেওয়ান গাজীর মাজার
সীতাকুণ্ড

আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ জল প্রকল্প
শুলিপোতা গেট

যদুনাথ নন্দী হাসপাতাল

বারুইপুর রেলস্টেশন

জেলা ক্রীড়াসংঘ ভবন

বি.ডি.ও অফিস
বারুইপুর

বারুইপুর পোস্টঅফিস

বারুইপুর মহকুমা হস্‌পিটাল

বারুইপুর পৌরসভা ভবন
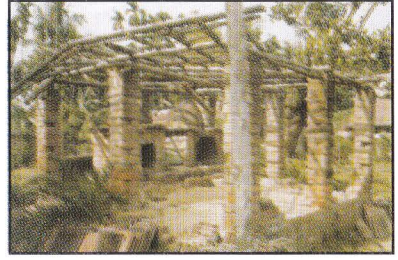
রক্তিম গাজীর মাজার
মাঝেরহাট, মদারাট

পিয়ালী নদী, উত্তরভাগ

রাজবল্লভ ভবন
বারুইপুর

অঘোর নস্করের বাড়ি
ধপধপি

দুর্গাদালান
বড়কুঠি
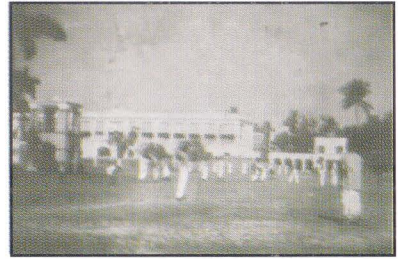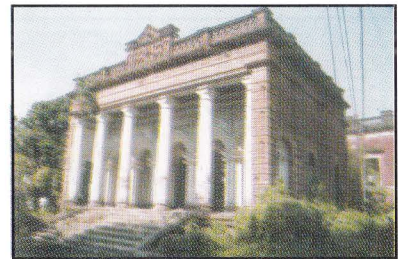
এর কুড়ি বছর আগে এই এলাকার আঁধার মাণিক গীর্জার দু'জন ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের স্থানীয় একদল হিন্দু অধিবাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘেরাও করেছিলো, নেতৃত্বে ছিলো একজন ধর্মত্যাগী খৃষ্টান। আরেকটি ঘটনায় দেখা যায়, জনৈক ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করার ফলে মিশন ভবনটি হিন্দুদের দ্বারা দুদিন অবরুদ্ধ হয়েছিলো । স্থানীয় জমিদারের সাহায্যে ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। পাদ্রীদের কয়েকটা কুটির আগুনে পুড়েছিলো আর মিশন ভবনটা পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেলো।

পাদ্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন – রেভাঃ ডি. জোনস্ (১৮২৯-৫৩) আর রেভাঃ সি. ই. ড্রিবারেজ (১৮৩২-৭১) ছিলেন মিশনের অতি উৎসাহী পাদ্রী। এঁদের জন্যেই যেমন এই মিশনের উন্নতি সম্প্রসারিত হলো দক্ষিণাঞ্চলে ২৫/৩০ টি গ্রামে তেমনি অতি উৎসাহী ও হিন্দুদের প্রতি যুগুপসক না হতেন, তাহলে হয়তো মিশনের ক্ষতি এমন কোরে হতো না। বারুদ অনেক দিন থেকেই জমছিলো। সহসা একটি ঘটনায় সেই বারুদের স্তূপ যেন বিস্ফোরিত হলো।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, ঐ দু'জন পাদ্রীর উদ্যোগে জনৈক ব্রাহ্মণকে নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র সহ পরিবারবর্গের অজ্ঞাতে দীক্ষিত হ'য়ে এই গীর্জায় চলে আসে। কিছুদিন পরে তার স্ত্রী আছে জানতে পেরে , সেই স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পাদ্রীরা ব্রাহ্মণকে প্ররোচিত করেন এবং ব্রাহ্মণও পত্নীকে তার বাপের বাড়ী যাবার নাম কোরে গীর্জায় এনে তোলে। গীর্জায় এসে ব্রাহ্মণী তো অবাক। স্বামীকে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক ব'লে ক্রোধে অগ্নিশিখার মত জ্বলতে রইলেন এবং অনশনে – তিনদিন কাটালেন।

গীর্জায় প্রত্যহ দুধ দিতে আসে এমন এক গোয়ালিনীর সাহায্যে লুকিয়ে একদিন পার্শ্ববর্তী জমিদার বাড়ীতে গিয়ে রাজা রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর মায়ের শরণাপন্না হন এবং রাজমাতার আদেশে পুত্র রাজবল্লভ বেলেঘাটার (কলকাতা) বাড়ী থেকে এসে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে গীর্জা অবরোধ কোরে সেই ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার কোরে মায়ের অনশন ভঙ্গ করেন। এই নিয়ে পাদ্রীরা সদর আদালতে মামলা করেন এবং সেই মামলাতে পাদ্রীরা হেরে যান। বলা বাহুল্য, জমিদারের পাইকেরা সেদিন গীর্জাকে অক্ষত রাখেনি এবং পাদ্রীরাও অক্ষত থাকেননি। সম্ভবত এই জেলায় রাজবল্লভই প্রথম ব্যক্তি, যার হাতে দুষ্টু ইংরেজ প্রহৃত হয়। সেই থেকে বহুকাল যাবৎ এই খৃষ্টধর্ম প্রচার কেন্দ্রের ওপর স্থানীয় মানুষের ভালো আস্থা ছিলো না। এই সব পাদ্রীদের কবর আজও দেখা যায় বারুইপুর পুরোনো বাজারের ভেতর দিকে শাসন স্টেশনে যাওয়ার পথে পশ্চিম ধারে গোটাদুই।

এতক্ষণ ধ'রে আমরা বারুইপুরের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধের আলোচনা করলাম। এবার শেষার্ধের পর্বে অগ্রসর হবো; সে পর্ব বড় উজ্জ্বল।

(৬)

আইন আদালত

ভারতের মানচিত্রে বারুইপুরের অবস্থানটির কথা বলা হয়নি। এর অবস্থানটি হচ্ছে,

বিষুবরেখার কৌণিক দূরত্বে অক্ষাংশে ২২°৩০´ ৪৫´´ এবং দ্রাঘিমাংসে ৮৮° ২৫´ ৩৫´´ । হান্টার সাহেবের রিপোর্ট বলছে (১৮৭৫) সেদিন বারুইপুরের জমীর পরিমাণ ছিলো ৩,৪৭১ একর বা ৫.৪২ বর্গমাইল। এই আয়তনটা বজায় ছিলো ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। তারপর কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

কেবলমাত্র চব্বিশ পরগণা জেলায় নয়, সমগ্র অবিভক্ত বাংলার মধ্যে সর্বপ্রথম আদালত বসে খুব সম্ভবতঃ এই বারুইপুরে খৃঃ ১৮৬২ অব্দে। বারুইপুরের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। কলকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাও ১৮৬২ সালে।

১৮৫৮ অব্দে যে ক'টি মহকুমার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে বারুইপুরও আছে বটে; কিন্তু সে সব মহকুমা ছিলো রাজস্ব বিভাগের বিভাজন, Fiscal Division ফিসক্যাল ডিভিসন রাজস্ব-আদায় যার মুখ্য উদ্দেশ্য বা বিষয়। তার জন্য মহকুমা পিছু একজন কোরে কালেক্টার নিযুক্ত হতো। এই বছরই মিঃ স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী কালেক্টর নিযুক্ত হন। বেলী সাহেব বারুইপুরে আসেন সল্ট এজেন্ট হয়ে। পরে কালেক্টর তারপর বাংলার গভর্ণর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম আদালতটি বসে কোথায়? সমাধান দুরূহ। বহুদিনের লালিত জনশ্রুতি এই যে, প্রথম আদালত বসে বারুইপুরের বর্তমান সাব-ডিভিশনাল পোষ্টাফিসের পিছনে পৌর-সভা ও 'বাংলো' বাড়ীর মাঝখানে একতলা বাড়ীটা আজও দেখা যায়– যেটা পুরোনো পোষ্টাফিস' নামে পরিচিত, সেইখানে। ঘরের মধ্যে বিচারকের বসার মত বেদী ছিলো, পিছনে লম্বা কুঠুরি, উত্তর দেয়ালে জেল-গরাদের মত লম্বা লম্বা জানালা আজও আছে, যেটা কয়েদখানা ব'লে অনুমান করা হয় এবং উত্তরে 'উকিলপাড়া'; যেখানে উকিলদের বাসস্থান ও জেলখানা ছিলো ব'লে প্রবল জনশ্রুতি; এতদঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসকে পুষ্ট কোরে এসেছে সেইখানে। নিদর্শনগুলি আজও বিদ্যমান।

কিন্তু অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত দুখানি প্রাচীন দলীলের সিল-মোহর এই সব ধারণাকে নস্যাৎ কোরে দিয়েছে। প্রথমটি পাওয়া গেছে কলকাতার আলিপুর কোর্টের রেকর্ডরুম থেকে। সিল-মোহরের ছাপে পরিষ্কার লেখা আছে, 'মানিকতলা মুনসেফী বিচারালয়। ১৮৬২' । বারুইপুর চৌকি। দ্বিতীয়টি পাওয়া গেছে, 'রামনগর কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালায়। এটার সাল হচ্ছে ১৮৬৭। দুটিরই মাঝে বৃটিশ রাজমুকুট ক্রাউনের ছাপ। ইংরেজ সরকারের অধীনে কলকাতার হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা ১৮৬২ সাল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মানিকতলাটি বারুইপুরের মধ্যে কোথায়। বর্তমানে ঐ নামে কোনো গ্রাম নেই। আগে থাকলেও আজ সে কোনো নামের তলায় চাপা পড়ে আছে। তবুও হাইকোর্টের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'মানিকতলা মুনসেফী বিচারালয়ের' প্রতিষ্ঠা বারুইপুরকে আলাদা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বহু অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্থানীয় প্রবীণ মানুষদের স্মৃতি রোমন্থনে প্রকাশ, মানিকতলা হচ্ছে, বর্তমান পদ্মপুকুর গ্রামের মধ্যে, যার কেন্দ্রস্থানটি ছিলো, প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্বর্গত অর্ধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা। খুব সম্ভবত এইখানে বসে বারুইপুর তথা বঙ্গ প্রদেশের প্রথম মুনসেফী আদালত। আজ আর তার কোনো স্মৃতিচিহ্নই অবশিষ্ট নেই।

কাল স্রোতে মুছে গেছে– সেই স্মৃতির আলপনা। স্থানটি হচ্ছে কুল্‌পি রোড— আমতলা রোডের তেমাথার পূর্বে। আর মানিকতলা যদি এখানেই হয়, তাহলে পুরোনো পোস্টাফিসে বসেছিলো প্রথম আদালত, জনশ্রুতির এই দাবী নাকচ হ'য়ে যায়। হয়তোবা এমনই হয়েছিলো, এখানে ছিলো কয়েদঘর (লকআপ), কালক্রমে সেটি জনমানসে আদালতের রূপ গ্রহণ করে।

থানা কিন্তু বর্তমান স্থানে মানে কোর্টের পাশে ছিলো না। প্রথম থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, বর্তমানে 'পুরোনো থানা' নামে অতি পরিচিত স্থানে। ১৮৫৮ সালের আগে বারুইপুরে থানা ছিলো এ প্রমাণ আছে। জায়গাটা হলো বারুইপুরের রাসমাঠ থেকে আন্দাজ দু'শ গজ পূর্বে ক্যানিং রোডের দক্ষিণ পাশে, এই রকম জনশ্রুতি। একসময় সেখানে বালতির কারখানা হয়েছিলো। উত্তরে বৈদ্যপাড়া রোড, দক্ষিণে ধপধপি রোড। এরই উত্তরে ছিলো নাকি রেজেষ্ট্রী অফিস। ১৮৮২ সালে বারুইপুর রেজেষ্ট্রি অফিসের লিখিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। জনশ্রুতি সত্য হলে বাড়িটা এখনও অটুট আছে। তারপর এই রেজেষ্ট্রী অফিস কিছুদিনের জন্যে চলে যায় কাছারী বাজারের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের কাছে। অতঃপর নানা ঘাটের জল খেয়ে বর্তমান স্থানে বারুইপুর কোর্টের সামনে স্থিতু হয়েছে।

থানা সম্বন্ধে কিছু জানার কথা আছে। পুরোনো নথিপত্র থেকে এমন কিছু খবর আছে, যা শুনলে আমরা না হোক, যাঁরা আজ সেপাই (Constable) এর চাকরি করছেন, তাঁরা হাসবেন এবং নিশ্চয়ই ভাববেন, না বাবা, এখন বেশ আছি।

বারুইপুরে থানা বসেছিলো, ঐখানে গত শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে, কলকাতা মহনগরীর প্রায় সাথে সাথে। সেদিনের ইংরেজ সরকার দেশের আইনশৃংখলা বজায় রাখার জন্য তৎকালীন প্রচলিত মুঘল অথবা জমিদারদের প্রবর্তিত পুলিশী প্রশাসন থেকে পৃথক একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। খৃঃ ১৭০৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রমবর্ধমান নগরীতে এবং মফঃস্বলের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলিতে দিবারাত্রি পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা কেমন কোরে চালু করা যায়, তা নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনার পর স্থির হয়, প্রত্যেকটি চৌকিতে (থানা) ১ জন সর্দার পাইক, ৪৫ জন পাইক, ২ জন চোবদার (Chobdars of secptre bearers) এবং ২০ জন লোয়ালাকে নিয়ে কলকাতা পুলিশের সূত্রপাত। ক্রমে এই প্রথা মফঃস্বলেও পরিব্যাপ্ত হয়।

প্রথম যুগের এই পুলিশ বাহিনীকে আগুন নেভানো আর জঞ্জাল সাফাই করতে হতো। এছাড়া, তাদের কাজ ছিলো চুরি-ডাকাতির প্রতিরোধ করা। ১৭২০ সালে জনৈক ইংরেজ জমিদার, সম্ভবত তাঁর নাম ছিলো ফ্রেক, তিনি এ দেশীয় প্রতিনিধির কথা উপলব্ধি করলেন এবং সেই অনুযায়ী বাবু গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হলেন।

১৯০০–১৯১১ সাল পর্যন্ত বারুইপুর থানায় ছিলো চৌকিদার ১১৭ জন ও দফাদার ১২জন মাত্র।

২৪পরগণা জেলায় আগে ছিলো দুটি প্রশাসনিক বিভাগ– আলিপুর বিভাগ ও বারাসত

বিভাগ। দুই বিভাগের প্রশাসনিক কার্যভার ছিলো পৃথক ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ন্যস্ত। এরমধ্যে আলিপুর বিভাগ ছিলো খাস দখলে এবং নদীয়া ও যশোহর জেলা থেকে ১৮৩৪ সালে হস্তান্তরিত কয়েকটা পরগণা সমেত বারাসাত বিভাগের যৌথ ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকারূপে নির্দিষ্ট ছিলো।

১৮৬১ সালে এই যৌথ ম্যাজিস্ট্রেসি বাতিল করা হয় এবং সমগ্র জেলাটাকে ৮টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়।

যথা– (১) ডায়মণ্ডহারবার (২) বারুইপুর (৩) আলিপুর (৪) দমদম (৫) ব্যারাকপুর (৬) বারাসাত (৭) বসিরহাট ও (৮) সাতক্ষীরা (বর্তমানে 'বাংলাদেশে')।

এই সব মহকুমা গঠিত হবার আগেই কিন্তু বারুইপুরে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়, ২৯শে অক্টোবর ১৮৫৮ সালে। বারুইপুরেই ছিলো মহকুমা সদর। পূর্বেই বলেছি, এখানে প্রথম মহকুমা শাসক হন মিঃ স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী নামে একজন ইউরোপীয়ান। পরে ইনি হন বাংলার গভর্ণর। বারুইপুর মহকুমাটি পুলিশের প্রধান কর্মকেন্দ্রও ছিলো। এই মহকুমার পরমায়ু ছিলো ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত। তারপর আলিপুর সদর আদালতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ ২৫ বৎসর ছিলো এই রাজস্ব বিভাগীয় মহকুমা।

বারুইপুর মহকুমার অধীনে ছিলো ৪টি থানা ঃ বারুইপুর, প্রতাপনগর, জয়নগর ও মাতলা (মাতলার নাম পরে ক্যানিং হয়)।

আর সব থানা বাদ দিয়ে কেবল বারুইপুরের কথাটা বলি।

৪টে থানা মিলিয়ে এই মহকুমার আয়তন ছিলো মোট ৪৪৯ বর্গ মাইল। গ্রামের সংখ্যা ছিলো ৬৩২টি, ঘর-বাড়ী ছিলো ৩৩৮৫১ টি এবং মোট লোকসংখ্যা ছিলো ১৯৬৪১০; যার মধ্যে ১,৩২,১০২ জন বা ৬৭.৩ শতাংশ ছিলো হিন্দু, ৬৩,৩৭৬ জন বা ৩২.৩ শতাংশ মুসলমান, ৬৩৬ জন বা ৩ শতাংশ খৃষ্টান এবং ৩০৬ জন বা ১ শতাংশ হচ্ছে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়। সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ছিলো ৫২.৭ শতাংশ। প্রতি বর্গমাইলে মানুষের গড়পড়তা বসতি ছিলো মাত্র ৪৩৭ জন, ইত্যাদি।

১৮৭০ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত এখানে জেনারেল পুলিশের ম্যাজেস্‌টেরিয়াল আদালত ছিলো, যার পুলিশের সংখ্যা ছিলো ১১৯ জন, গ্রামরক্ষক বাহিনী ছিলো ৩৮৯ জন। ফৌজদারী মামলার বিচার এখানে কিছুকাল হয়েছিলো।

রাজস্বের হার

শালি জমির খাজনা ছিলো বিঘা প্রতি ১টাকা ৪ আনা থেকে ২টাকা ৮ আনা। পাট জমির জন্য ৩টাকা থেকে ৩টাকা ৪ আনা বিঘা প্রতি। আখের ক্ষেত, পান বাগান (বরজ), শাক-সব্জির ক্ষেত ও তামাক ক্ষেতের জন্যও বিঘা প্রতি ছিলো ঐ রকম ৩টাকা থেকে ৩ টাকা চার আনা। (এই হিসাব ১৮৭৫ সালের)

মানিকতলার এই আদালত কক্ষেই একদিন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হলো, এক আকাশে দুই সূর্যের মিলন। অনুমান ১৮৭৬ সালের ঘটনাটি ঘটেছিল জুন-জুলাই-এ। এই বছরেই তিনি প্রথম আইন ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। বারুইপুরের আদালত কক্ষ। বিচারকের আসনে তরুণ বিচারক; বুদ্ধিদীপ্ত, গম্ভীর মুখশ্রী। পাতলা ২টি চাপা ঠোঁটে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে, পদমর্যাদার গুরুত্বে গম্ভীরতর।

মামলা চলছে। সওয়াল কোরে চলেছেন, বিখ্যাত একজন আইনজীবী। বাঙালি ব্যারিষ্টার। পোষাকেআশাকে, হাবভাবে, কথাবার্তায় যেন খাঁটি ইংরেজ। এক নজরে মনে হয় যেন একটি স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতিভা। বিচারকের অপেক্ষা বয়সে ১৪ বছরের বড়।

বয়সে নবীন হ'লেও বিচারক বেশ কড়া ধাতের ব'লে পরিচিত। বিচক্ষণতা এবং ন্যায় নিষ্ঠার জন্যে বহু গল্পগুজব লোকের মুখে মুখে ফেরে; হাবভাবে একটা ডোন্ট্ কেয়ারি আদল'তো আছে তার ওপর আবার সম্পূর্ণ নোতুন আঙ্গিকে কী এক কাহিনী লিখে বিপ্লবের ঢেউ তুলেছেন সারা বাংলার বিদগ্ধ সমাজে।

এ হেন বাঘা হাকিমও আজ বেশ বিচলিত। কেননা, সওয়াল করছেন যে-আইনজীবী তিনিও মূর্তিমান বিপ্লব। স্বধর্মত্যাগী, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধমক খাওয়া, পরিবার-পরিজনের বন্ধনমুক্ত। আবার বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব এক ছন্দে কাব্যরচনা কোরে বাংলাসাহিত্যে মহাবিপ্লব ঘটিয়েছেন। সারা দেশের সাংস্কৃতিক গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে তিনি তখন দেদীপ্যমান।

তাই বলছিলাম, সেদিন এক আকাশে দুই সূর্যের মিলন ঘটেছিলো। এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিলো এই বারুইপুরে। বিচারকের আসনে সেদিন ছিলেন বাংলার নবোদিত সূর্য, বাংলাভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাসস্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৭/৬/১৮৩৮-২৯/৬/১৮৭৩)। মানিকতলার এই আদালতে বাংলার নবজাগরণের এই দুই বিপ্লবী পথিকৃতের মহামিলন ঘটেছিলো আজ থেকে প্রায় ১১৬—১১৮ বছর আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সেই স্থানটি আজও বাঙালির অন্যতম তীর্থস্থানে পরিণত হলো না। কেবল ত.ই নয়, সামান্য একটা স্মৃতিফলকও নেই! ইতিহাসের প্রতি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা যে !

বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর জেলার (মতান্তরে সাতক্ষীরা – খুলনা) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার পর বারুইপুরে তিনি বদলি হয়ে এলেন ১৮৬৪ সালের ৫ই মার্চ মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে। এই বছরেই ২৪শে অক্টোবর বারুইপুর থেকে গেলেন ডায়মণ্ডহারবারে। তারপর ১৮৬৬ সালে ৫ই মার্চ আবার তিনি ফিরে এলেন, বারুইপুরে। পরবর্তী বছরে (১৮৬৭) ১৪ই অগাষ্ট তারিখে এলেন আলিপুরে। আবার এখান থেকে ফিরে আসেন ১৮৬৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর। এরপর এই বছরের ১৫ই ডিসেম্বর বারুইপুর ত্যাগ কোরে তিনি চলে যান মুর্শিদাবাদে। বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারকের জীবন মোট ৫ বছর ৯মাস ৯দিন। ১৮৯১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু বারুইপুরে তাঁর "সুবর্ণময় দিনগুলির" কথা ভোলেননি। তিনি লিখে গেছেন "যেদিন বারুইপুর হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করি, আমার জীবনের

প্রথম অঙ্কের ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অঙ্কের যবনিকা সেদিন পতিত হয়। আমার জীবন এমন দিন আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই''

উল্লেখ্য যে, বারুইপুরের মানিকতলা আদালতের জেল্লা তখন প্রচুর। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি হতো এই মানিকতলার আদালতে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত হাকিম পেয়ে এ দেশের মানুষ যেন বর্তে গিয়েছিলো। ১৮৬৪ সালের ৫ই মার্চ থেকে ১৮৬৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬ বছরের তার হাতের মামলার রায় আজও আলিপুর জজকোর্টের রেকর্ডরুমে জমে আছে এবং ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মামলার রায় সম্পর্কে অনেকানেক রোমাঞ্চকর ও বুদ্ধিদীপ্ত গল্প-কাহিনী পাওয়া যায়; তার মধ্যে বারুইপুরে একটি মামলার রায় নমুনা স্বরূপ মাত্র বলছি ঃ 'প্রত্যক্ষদর্শীর বারুইপুর পরিদর্শনঃ' ....বারুইপুর আদালতে একটি ডাকাইতি মকদ্দমার রোমাঞ্চকর রায়পর্ব সমাধা হইয়াছে। .....শ্রীযুক্ত বাবু বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐ রায়টিকে 'রোমাঞ্চকর আখ্যা দিবার কারণ হইতেছে, ঐ ডাকাইতি মকদ্দমায় ধৃত ডাকাইতটির সহিত, ডাকাইতটি যাহার নেতৃত্বে ধৃত হইয়াছিল, সেই পুলিশপুঙ্গবটিরও সমুচিত শাস্তি বিধান হইয়াছে। উক্ত পুলিশপুঙ্গব ধৃত ডাকাইতটিকে অন্যায়ভাবে প্রচণ্ড পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন অভিযোগ সপ্রমাণ হওয়ায় স্বনামধন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় অভিযুক্ত পুলিশপুঙ্গবের সমুচিত শাস্তিবিধানে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই' (সম্বাদ প্রভাকর, ১২ই মে ১৮৬৫)।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেকটার, রেজিষ্ট্রার ও পুলিশের রূপে। তখনও পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের পদ সৃষ্টি হয়নি। এখানে বসেই তিনি লেখা শেষ করেন বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। প্রকাশিত হয় ১৮৬৫তে। ১৮৬৭তে 'কপালকুণ্ডলা।' এখান থেকেই প্রকাশিত হয়।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহ নিয়ে দুটি ভিন্ন মত দেখা যায়। একটি হচ্ছে, গঙ্গাতীরে সদাব্রত ঘাটের পাশে 'কালাপাহাড়' নামক স্থানে একটি বাংলোতে। অপর মত হচ্ছে .... পূর্বোক্ত 'বড়কুঠি'-সংলগ্ন 'গিরীন্দ্র নিকেতনে'র দ্বিতলে। কোন্‌টি ঠিক, সে উত্তর অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে এই নিকেতনের গৃহস্বামী বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত বলে শ্বেত পাথরের একটা টেবিল ও কাঁচের সুদৃশ্য একটি মস্যাধার দেখিয়েছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, এই 'বড়কুঠির' বড় কর্ত্তা রাজকুমার রায়চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিলো (এবং সেইজন্য এই কুঠিতেই তার বাসস্থান সম্ভব) – তা একটি ঘটনায় প্রমাণিত।

ঘটনার কাহিনীটা বলেছেন, মজিলপুরের জমিদার বাড়ির কালীনাথ দত্ত। ইনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুর থেকে বদলি হওয়া পর্যন্ত তাঁর সেরেস্তাদার। কাজেই খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার তাঁর সুযোগ হয়েছিলো। কাহিনীটা তাঁর ভাষাতেই বলি – 'একদিন মধ্যাহ্নে (সম্ভবতঃ ১৮৬৪/৬৫ সাল) হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যে থামিয়া গেল। কিন্তু, থামিতে না থামিতে ভয়ংকর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪/৫ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারিতে সংবাদ দিল, রাজকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে। শুনিবামাত্র বংকিম বাবু কাছারির সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর

বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। রাজকুমার বাবু সেদিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন (সম্ভবত সোনারপুর থেকে ক্যানিং, লাইনে) ।.....আমরা বজ্রাহত বাটিতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদ্‌রী সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বংকিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশ চন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন।

এসময়ে বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগর নিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৩৩-৯৭) সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অল্প স্বল্প চিকিৎসা ব্যবসাও চালাইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কোন একবৎসর তিনি কলেজের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অণুবীক্ষণ যন্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ পান। বংকিমবাবুর সহিত মহেশ বাবুর আলাপ হওয়াতে মহেশবাবু সেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি দিন কতকের জন্য বংকিম বাবুর ব্যবহারার্থে প্রদান করেন।

.... রামনগরে লোক প্রেরণ ও কলিকাতা হইতে ভার ডাক্তার আনিবার জন্য অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। একদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্রও দন্ডদ্বয়ের মধ্যে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবকটির চৈতন্যোদয়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বংকিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না।'

'১৮৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর এক ভীষণ সাইক্লোনের ফলে ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, মুড়াগাছা, টেঙ্গরী, বিচি, করঞ্জলি, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মণিরতট প্রভৃতি গ্রামগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কয়েক হাজার লোক মারা যায়। এই গ্রামগুলি ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ত্রাণকার্য্যের সুবিধার জন্য বংকিমবাবু কিছুদিন ডায়ামণ্ডহারবারে বদলী হন; ডায়মন্ডহারবার থেকে হেমচন্দ্র কর বারুইপুরে আসেন। হেমবাবু মজিলপুরে অবস্থান করিয়া ত্রাণকার্য্য দেখাশোনা করিতেন; আর বংকিমবাবু ডায়মণ্ডহারবার থেকে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের আদালতে এই একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর ১৮৮৩ সালে বারুইপুরে মহকুমার বিলুপ্তি ও আলিপুর সদরের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু রয়ে গেল মুন্সেফি আদালত। যা আজও ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

বারুইপুরের আদালত প্রাঙ্গনেণ যখন এসে পড়েছি, তখন এর স্বধর্মের বাইরে আরেকটা দিকের কথা না বললে এর ইতিহাস কেবল অসম্পূর্ণ নয়, লেখকের কর্তব্য-চ্যুতিও ঘটবে। বারুইপুর কোর্টের সংলগ্ন 'বার এসোসিয়েশন স্থাপিত হল ১৮৮৭ সালে। মালিক বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ অমৃতলাল মারিক যিনি নিজেও একজন উকিল ছিলেন তিনি বর্তমান বারের জমি দান করেছিলেন, শুধু দান নয় আর্থিক দিক দিয়ে ধনী এই বার-এর সভ্যদের চাঁদা দিতে হয় না এক পয়সাও। সেদিক দিয়ে এরা অনন্য।

সাবেক দিনের মতো এখানকার আইনজীবীরা ও নিজ নিজ ব্যবসার বাইরে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হ'য়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভালো রকম একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সুশীলবাবুর নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এখানে অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের আগমন – বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিরোধে। তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৯০৮ সাল, সোমবার। তখন ইনি সুরাট আন্দোলনের হিরো। বক্তৃতা মঞ্চটি হবার কথা ছিলো জমিদার বাড়ীর সামনে রাসমাঠে; কিন্তু তাঁদের আপত্তিতে ওখানে না হ'য়ে হলো গিয়ে বর্তমান আদালতের বিপরীত দিকে মারিকবাবুদের বাড়ীর সামনে। প্রায় তিন হাজার মানুষ সেই সভায় উপস্থিত। সেদিনের লোকসংখ্যার অনুপাতে 'বিশাল জনতা' বলতেই হয়। সেই জনতার সামনে থেকে একে একে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বাগ্মী বিপিন পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী-বাগ্মী-মনীষী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শ্রোতারূপে এবং স্বেচ্ছাসেবক রূপে উপস্থিত ছিলেন – ভূপেন চ্যাটার্জী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), অমৃতলাল মারিক, হরেন্দ্রনাথ পাঠক, শ্রীকালীচরণ ঘোষ ও শ্রী অমরনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও অনেকে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন পরবর্তী জীবনে প্রখ্যাত বিপ্লবী ও কালীচরণ বাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত ইতিহাস লেখক। হরেন্দ্রনাথ এই আদালতে-র প্রসিদ্ধ উকিল ও অমরনাথ সমাজ সেবক। আর এই মহতী জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন এই আদালতের উকিল ময়দা গ্রাম নিবাসী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই সাফল্য মণ্ডিত সভার ফলশ্রুতি স্বরূপ জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংকল্প গ্রহণ ও মদারাটের ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দীয়ত জমীতে ১৯০৯ সালে মদারাট পপুলার একাডেমীর পত্তন। এই একাডেমীতে বারুইপুর কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে অনেকেই অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সেবা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বারুইপুর কোর্টের উকিলদেরও কিছু ভূমিকা ছিলো, দেশাত্মবোধ ছিলো, কেবলই পয়সার পিছনে তাঁরা ছুটতেন না। এঁরা ছিলেন আদালতের গৌরব। আদালতের মহিমা আরও বর্ধিত হয়েছিলো তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তিকালে ব্রজবিদেহী শ্রী শ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী– মহারাজ), ফণী ব্রহ্ম ও দানবীর ডঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন দেশবরেণ্য আইনজীবী আলিপুর কোর্ট থেকে বর্তমান আদালতে মামলা-উপলক্ষে আগমনে। এই আদালতের প্রবীণ উকিল স্বর্গত রজনী চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা, এঁরা নাকি এসেছিলেন পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির সঙ্গে ঐ কোম্পানির এক পাওনাদারের মামলার সওয়াল করতে। কে কোন্ পক্ষে ছিলেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে তারাদাস চৌধুরী দাঁড়িয়েছিলেন, ওঁদের দুজনের বিরুদ্ধে। রজনী বাবু বলেছিলেন, ডঃ রাসবিহারী ঘোষের জুনিয়ার ফণী ব্রহ্ম ও তারাদাসের জুনিয়ার ছিলেন তিনি নিজে।

এই তারাদাস চৌধুরী, পরে যিনি হন মহান বৈষ্ণব সাধক, ব্রজবিদেহী শ্রী শ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজ, এই মহাত্মার সঙ্গে এ অঞ্চলের নিবিড় পরিচয় ছিলো। কেবল বারুইপুর কোর্টে ওকালতি করা নয়, জয়নগর মিত্র ইনস্টিটিউশানেও দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর রামনগর গ্রামের সরকারপাড়ায় অনেককে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন।

শেষ করার আগে বলি – বারুইপুর সম্পর্কে অনেক ধারণা, এ একটি অর্বাচীন জনপদ এবং

ইংরেজ আমলেই এর প্রতিষ্ঠা তথা বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সবটা তা নয়। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে, কলকাতা থেকে মাত্র ১৬ মাইল দূরত্বের এই বারুইপুরের যোগাযোগ নীলকুঠি, খৃষ্টান মিশন, আদালত, রেজেষ্ট্রী অফিস প্রভৃতি নোতুন নোতুন প্রশাসনিক প্রয়োজনে সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এককথায় ভুল নেই। আমরা আগে দেখেছি, বারুইপুরের জমিদার দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী এবং তাঁর পৌত্র রাজা রাজবল্লভ রায়চৌধুরী এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠার পর অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিলো। বলতে দ্বিধা নেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম হরিনাভি-রাজপুর-কোদালিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আধুনিক শিক্ষায় বারুইপুর অঞ্চল তখন পিছিয়ে; প্রমাণ ? হান্টার সাহেবের (১৮৭৫) রিপোর্ট দেখুন। বলছে, সরকার অনুমোদিত এন্ট্রান্স পরীক্ষার স্কুল সে সময়ে বারুইপুরে ছিলো ১টি আর হরিনাভিতে ৪টি ও জয়নগরে ৫টি আর কলেজ তো হলো সেদিন, ১৯৮১-তে আশ্চর্য এই, হান্টার সাহেব (১৮৭৫) বারুইপুরের পর যেক'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের নাম করেছেন সেগুলি হলো ঃ বাঁশড়া, মলঙ্গ, উত্তরভাগ, রামনগর, বৈকণ্ঠপুর এবং করিমাবাদ (কামরাবাদ)। এগুলি যদি সেদিনের উন্নত গ্রাম হয়, তাহলে অনুন্নত গ্রামগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তারপর এলেন খৃষ্টান মিশনারীরা। নানা বিরোধের পর সমন্বয় ঘটলো। ব্যবসায়ের স্বার্থে হলেও ইংরেজ প্রথম ট্রেন নিয়ে এলো বারুইপুর পর্যন্ত ১৮৮২ সালের ১০ই জুলাই। সঙ্গে নিয়ে এলো রাজধানীর 'বাবুকালচার'। সেই কালচার সম্প্রসারিত কোরে বারুইপুর থেকে ট্রেন ছুটলো ডায়মণ্ডহারবারে পরের বছরে ১৮৮৩ সালে আর ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৮ সালে গেল লক্ষ্মীকান্তপুরে।

১৮৬২তে আদালত প্রতিষ্ঠা বারুইপুরের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কোনো অঞ্চলে আদালত প্রতিষ্ঠা, যেমন সে-অঞ্চলের লোকসংখ্যা এবং তার সঙ্গে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা স্বতঃই মনে পড়ে, তেমনি মনে পড়ে এ অঞ্চলের মানুষ লাঠির যুগ থেকে বিচারের যুগে প্রথম এসে পড়েছিলো, এই আদলতেরই প্রভাবে। আইন-আদালত-আইনজীবীদের সংস্পর্শে মানুষ যেমন মামলাবাজ হ'তে পারে, তেমনি পাশব শক্তি থেকে যুক্তির শক্তিতে উত্তরণ ঘটে। বারুইপুর অঞ্চলে তাই ঘটেছিলো।

বারুইপুরের গর্বের বস্তু মুন্সেফী আদালত। বাংলার সর্বপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই আদলতের বাহু সম্প্রসারিত হয়ে আছে ৬টি থানায়– বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর, ক্যানিং, বাসন্তী ও কুলতলি থানা পর্যন্ত এত বিস্তৃত এলাকার মধ্যে তিন মুন্সেফের এই আদলত আর সামাল দিতে পারছে না। তাছাড়া, ফৌজদারি মামলার জন্যে জয়নগর, কুলতলি ও বাসন্তী এলাকার মানুষকে এই রকেটের যুগেও চাল-চিড়ে বেঁধে নিয়ে দুদিনের পথ ধ'রে আলিপুরে আজও যেতে হয়। তাই বারুইপুর আজ সব রকমে প্রস্তুত হ'য়ে বলছে, এখানে আবার মহকুমা হোক ! বর্তমান আইনজীবীর ও তাঁদের প্রায় ৯৮ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বার এসোসিয়েশন ও এগিয়ে এসেছেন। এই দাবি নিয়ে। তাঁদের পিছনে আছে অগণিত জনসাধারনের আকাঙ্খা। বিচার তারা পেতে চায় হাতের কাছে। মুনসেফ কোর্টের ১২০ বছরের আনন্দ উৎসবের সঙ্গে ধ্বনিত হোক ১০০ বছর আগে উঠে যাওয়া সাবডিভিসনের নবজাগরণের পদধ্বনি। গর্বের

সঙ্গে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধ্যে বারুইপুর আজ রাজধানী বিশেষ।

আদমসুমারির রিপোর্ট

খৃঃ ১৮৪৭/৪৮ সালে সমগ্র ২৪ পরগণা জেলায় 'থাক জরিপ' হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকটি মৌজার (প্রথম) মানচিত্র প্রস্তুত হয়। সরকারি মহাফেজখানার সংরক্ষিত 'কুনকুইনাল' রেকর্ডে মানচিত্রগুলি আছে। তার মধ্যে বারুইপুরের মানচিত্রের শিরোভাগে লেখা পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ঃ

'বারুইপুরে (মূলকেন্দ্র) মোট লোকসংখ্যা ২,৭৫০ জন। তারমধ্যে হিন্দু ২,১৮৮, মুসলমান ৫৬২ জন। পাকা বাড়ী ৫৫ ও কাঁচা বাড়ী ৫৫২ টি।

বৃটিশ রাজত্বে প্রথম আদমসুমারি হয় ১৮৭২ সালে। সে গণনা ছিলো মুখ্যত জেলা ভিত্তিক। "১৯০০-১৯১১"; এই সময়কালের মধ্যে প্রথম থানা ভিত্তিক গণনা হয়। তদনুযায়ী কেবল বারুইপুর মৌজার (Bengal District Gezetteer অনুযায়ী) ঃ-

আয়তন– ৯৫ বর্গমাইল

২। সহর – ১টি

৩। গ্রামের সংখ্যা – ১৬৯

৪। লোক সংখ্যা– সর্বমোট–১,০০,৩০৯ জন।
তন্মধ্যে –
পৌর এলাকায় (Urban)
৬,৩৭৫
গ্রাম্য এলাকায় ৯৩,২৩৪

৫। বসতির সংখ্যা – ১৮,৫৭৬ টি

৬। প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা – ১,০৫৬ জন

৭। ১৯০২ সালের পূর্বেকার গণনা অনুযায়ী—
মোট জনসংখ্যা ঃ—
১৮৮১ সালে – ৭৫,৮৩০ জন
১৮৯১ সালে – ৮৬, ৭৬৮ জন
১৯০১ সালে – ৮০,২১০ জন

৮। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত লোক সংখ্যা
বৃদ্ধির গড় অনুপাত ১০.৪৯ জন।

৯। শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯০০-১৯১১)
হিন্দু – মোট ৯,০৬১ জন
তন্মধ্যে —
পুরুষ – ৮, ৫৭৩ জন
স্ত্রী – ৪৪৬ জন
মুসলমান। মোট ২,৮২৯ জন

পুরুষ ২,৭৮৫ জন
স্ত্রী – ৪৪ জন

১০। ১৯৭১ সালের গণনানুসারে ঃ- বারুইপুর ব্লক।
আয়তন – ৮২০৮ বর্গমাইল।
অঞ্চলের সংখ্যা – ১২ টি
মৌজা – ১৩৮
সড়ক –
পাকা – ৫১ মাইল
কাঁচা – ২২১ মাইল

১১। লোক সংখ্যা —
পৌর এলাকায় – ২০,৪৯৬ জন
গ্রাম এলাকায় – ১,৭০,৯২৫ জন
মোট এলাকায় – ১,৯১,৪২১ জন
তন্মধ্যে – পৌর এলাকায় ঃ-
পুরুষ – ১০,৬৬০ জন
স্ত্রী – ৯,৮৩৬ জন
সাক্ষর – ১২,৫৪১ জন
নিরক্ষর – ৭,৯৬৬ জন
গ্রাম এলাকায় ঃ-
পুরুষ – ৮৭,৮৫৬ জন
স্ত্রী – ৮৫, ০৮৯ জন
সাক্ষর – ৪৭,৭৭০ জন
নিরক্ষর – ১,২৫, ১৫৫ জন
সর্বমোট –
পৌর এলাকায় ঃ–
পুরুষ –৯৮,৪৪৬ জন
স্ত্রী – ৯২,৯২৫ জন
সাক্ষর – ৬০,৩১১ জন
নিরক্ষর – ১,৩১,১২১ জন

১২। মোট লাইব্রেরী – ১২ টি
(তন্মধ্যে একটি টাউন লাইব্রেরী)

১৩। ক্লাব ও নৈশ বিদ্যালয় – ২০টি

১৪। বিদ্যালয় মোট – ১৬৩ টি
তন্মধ্যে –
প্রাথমিক বিদ্যালয় – ১৪০টি

জুনিয়ার হাই – ৮টি
উচ্চবিদ্যালয় – ৮ টি
উচ্চতর মাধ্যমিক – ৭টি

১৫। মহিলা সমিতি – ৭টি
১৬। স্বাস্থ্য কেন্দ্র – ৪টি
১৭। সিনেমা হাউস – ৪ টি
১৮। বড় শিল্প – ৩ টি
১৯। কটন মিল – ১টি
২০। যাত্রা ক্লাব – ৫ টি
২১। পৌর সভা – ১৮৬৭ সালে।

প্রথম চেয়ারম্যান খুব সম্ভবতঃ স্থানীয় জমিদার
রাজকুমার রায়চৌধুরী এর একতলা পাকা ঘর
নির্মাণ ১৯০১ সালে
ওয়ার্ড – ১১টি
আয়তন – ৩৫০ বর্গমাইল

২২। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ঃ-

উত্তরভাগস্থিত 'সোনারপুর আড়াপাঁচ পাম্পিং
স্টেশন।' ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত। তৎকালীন
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ৩১শে মে,
১৯৫৩ সালে উদ্‌বোধিত।
ও
'পিয়ালি টাউন' নামে ফুলতলায় শিল্প উপনগরীর পত্তন।
৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮ তাং-এ ঐ মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উদ্‌বোধিত।

Centenary Celebration of Baruipur muunsif Court, 1984' Souvenir থেকে অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রী কালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বারুইপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে পানচাষী বারুইজাতির বাস আছে। প্রবাদ তজ্জন্যই এই গ্রামটি বারুই নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদী ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। উহা তখন কালীঘাট হইতে ক্রমশঃ বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর বা নাচানগাছা, মুলটি, দক্ষিণ বারাসত, জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ও ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করতঃ সাগরদ্বীপের দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িত। আজিও বারুইপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে উহার মজা গর্ভ কোথাও নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, আবার কোথাও বা সঙ্কীর্ণ খালের আকারে বিদ্যমান আছে। উহারই উপর বারুইপুরের বর্ত্তমান হিন্দু শবদাহ ক্ষেত্র কীর্ত্তনখোলা অবস্থিত।

আদিগঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটির প্রাচীন ইতিবৃত্ত এখনও সংকলিত হয় নাই। সুন্দরবনের অন্তর্গত ২২নম্বর লট ও দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের দুইখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদান সনন্দ (তাম্রশাসন) হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, সেন রাজাগণের শাসনকালে, উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ, তৎকালীন শাসন বিভাগ, বর্দ্ধমানভূক্তি ও পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভূক্তির অধীন ছিল।

দক্ষিণ গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত উল্লিখিত তাম্রশাসনখানিতে আরও দেখা যায় যে, মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমানভূক্তির অন্তর্ভূক্ত বেতড্ড চতুরক নামক শাসন বিভাগে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিড্ডর-শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। উহাতে ঐ গ্রামে নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা আছে।

উত্তরে – ধর্ম্মনগরী সীমা।

পূর্ব্বে – জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।

দক্ষিণে– লেংঘ দেঘ মণ্ডপী সীমা।

পশ্চিমে – ডালিমক্ষেত্র সীমা।

বর্ত্তমান সময় বারুইপুরের সংলগ্ন ও বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন শাসন গ্রামের উত্তরে ধর্ম্মনগর নামে একটি প্রাচীন জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর শুষ্ক খাদ আছে। ঐ গ্রামটির শাসন নাম এবং উহার উত্তর ও পূর্ব্বসীমার সহিত উল্লিখিত তাম্রপট্ট লিপিতে বর্ণিত গ্রামটির ঐ দুই দিকের সীমার ঐক্য দেখিলে ঐ জনপদটিই সেনরাজগণের আমলে বিড্ডর-শাসন অথবা উহার অংশ ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বারুইপুরের নাম এনাগাং প্রাক্ মুসলমান যুগের কোন লিপি বা গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে, ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসানে, চাঁদ সওদাগরের আদি গঙ্গাপথে সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা ঃ

'কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পূজিয়া ।

চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া ।।

ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ।।

হুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।

ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত ।।'

উক্ত গ্রন্থ রচনার ৭৮ বৎসর পরে, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, বৃন্দাবনদাসের শ্রী চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। উহা পাঠে বোধ হয়, সেই সময় বারুইপুরের কিয়দংশ আটিসারা নামেও অভিহিত হইত। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রী শ্রী চৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে পার্ষদগণসহ ছত্রভোগপথে নীলাচল গমনকালে উক্ত আটিসারায় জনৈক বৈষ্ণবভক্ত শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে যাপন করেন। উহা এইরূপ

হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে

উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে ।।

সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।

আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ।।

রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।

কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়।।

সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তণ প্রসঙ্গে।

আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে।।

শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি ।

প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।।

এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।

আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতুহলে।।

কিছুদিন পূর্ব্বে বারুইপুর বাজারের সান্নিধ্যে, মজাগঙ্গা তীরে, শ্রী অনন্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দারুময় বিগ্রহ একটি গৃহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিগ্রহ দুইটির গঠনপদ্ধতি, আকার ও ভাবভঙ্গীর সহিত শ্রী শ্রী চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবকালে কালনা ও নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ বিগ্রহগুলির সাদৃশ্য দেখিলে, উহাদের গঠনকাল যে ঐ সময় তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহা ভিন্ন ঐ স্থানটিতে যে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের ভিটা ছিলো তাহারও অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে কারণ সেখানে বরানগর পাঠবাড়ী আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধুনা ঐ মঠ ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অতি অল্পপরিসর স্থান আটিসারা নামে অভিহিত। কিন্তু শ্রী চৈতন্য ভাগবতকার আটিসারাকে একটি নগর ও গ্রাম বলিয়াছেন। উহা হইতে আটিসারা জনপদ যে, ঐ সময় আকারে বড় ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে বর্ত্তমান বারুইপুরের কিয়দংশ উহার অন্তর্গত থাকা সম্ভব।

এই সকল প্রাচীন বিবরণে বারুইপুর ও উহার পার্শ্ববর্তী ভূভাগের উক্ত প্রকার উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই। অধুনা বারুইপুর মেদনমল্ল পরগণার অধীন। মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-সৌকর্য্যার্থ যে সমস্ত পরগণা নামক বিভাগের সৃষ্টি হয় উহাও তন্মধ্যে একটি। আইন-ই-আকবরীতে প্রকাশিত রাজা তোডরমল্লের জবানবন্দীতে উহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিত আছে যে, ঐ সময় উহার নানাস্থলে জঙ্গল ছিল এবং বারুইপুরের জমিদার চৌধুরীবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে উহা সনন্দ পান। তখন তাঁহাদের নিবাস ছিল রাজপুরে। সেখানে তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ রাজা মদন রায়কে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে, (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) মুঘল শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় ঢাকাতে ধরিয়া লইয়া যান।

সেই সময় বাশড়াতে শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেখানে সেই জঙ্গল-মধ্যে মোবারক গাজী নামে একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন ফকির থাকিতেন। রাজা মদন রায় তখন নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার দৈবশক্তিবলে ঢাকার দরবার হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করতঃ শিরোপা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। গাজী সাহেবের গান নামক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লোকগাথায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাশড়াতে এখনও গাজী সাহেবের আস্তানা আছে। ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের দক্ষিণ বিভাগের ক্যানিং শাখায় ঘুঁটিয়ারি সরিফ ষ্টেশনের সান্নিধ্যে বাশড়ায় ঐ আস্তানায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার স্মরণার্থে একটি মেলা হয় এবং উহাতে বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময় সেখানে গাজী স্যাহেবের গানও হয়। প্রবাদ, ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মদন রায়ই গাজী সাহেবকে সর্ব্বত্র প্রচার করেন হান্টার সাহেবের গ্রন্থে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই

" In gratitute to Mobrak Gazi the zeminder wished to erect a mosque in the Jungles of Basra for his residence, but the was prevented in

dream. He then ordered that every village should have an altar dedicated to Mobrak Gazi, the king of forests and wild beasts. These alter of Mobrak Gazi are common in every village in the vicinity of jungles, not only in Maidanmal, but in all the fiscal Divisions adjoining the Sundarbans."

কবি রামচন্দ্র রচিত হরপার্ব্বতী মঙ্গল নামক একখানি পুরাতন পুথিতেও পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে উহাতে আরও দেখা যায় যে, রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী রাজপুর হইতে প্রথমে বারুইপুরে আসিয়া বসবাস করেন ও সেখানে বহু ভূমি দান করিয়া সমাজ স্থাপন করেন। হরপার্ব্বতী মঙ্গলের ঐ অংশ এইরূপ ঃ

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদন মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রী মদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বন মাঝে দেখা দিল তায় ।।
সঙ্গেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন কয়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
দত্তকুল সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতিরব
কায়স্থ কুলের অধিকারী ।।
বৃত্তভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গ শ্রী দুর্গাচরণ।।
সহায় আনন্দময়ী সর্ব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজ স্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী।।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী বারুইপুরে ঐ প্রকার সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সূত্রপাত করেন এবং তাহার ফলেই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের বাসহেতু ক্রমশঃ এই স্থানটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তজ্জন্য উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ঈষ্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে নিমকমহলের সদর দপ্তরখানা ও একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ১। নিমকমহলের উক্ত দপ্তরখানার তৎকালীন প্রধান শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী প্লাউভেন ঐ সময় এখানে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী আদর্শে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়টি পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের খ্রীষ্টান মিশনের অধীন হইয়া যায়।

ঐ সময় হইতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের জুলুম ও অত্যাচারে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অশান্তির সূত্রপাত হয় ও উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানেও নীলচাষ হইত ও নীল প্রস্তুত করিবার বহু গৃহাদি ছিল। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ছত্রভোগ ও কাঁটানদীঘী প্রভৃতি গ্রামে ঐরূপ গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণেরও ঐ সময় সদরস্থান ছিল বারুইপুরে। অধুনা বারুইপুরের সদর রাস্তার উপর একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যে বড়কুঠি নামে যে অট্টালিকাটি আছে উহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কার্য্যালয় ও আবাসস্থান। তজ্জন্য তৎকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় উৎপন্ন নীল বারুইপুরের নীল নামে অভিহিত হইত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারেও উহার বেশ চাহিদা ছিল। ১৭৯৪খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের কোম্পানীর গেজেটে উহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় ঃ

"We understand that the best Indigo delivered on contact for the last year has been manufactured by Measra. Win and the Scott of Gazipore and by Mr. Gwilt of Barrypore.

প্রাচীন বিবরণাদিতে উল্লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরাও ঐ সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে সকল স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন তন্মধ্যেও বারুইপুরের কেন্দ্রটি প্রধান ছিল। সে কারণ এখানে সর্ব্বপ্রথম একটি ইষ্টকের বৃহৎ গীর্জ্জাও নির্মিত হয়। উহার মধ্যে ৬/৭ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারিত ২। উহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। উহা ভিন্ন ঐ সময় মৃত দুই জন ইংরেজ পাদ্রীর গোরস্থানও আজিও শাসনে যাইবার পথে দেখা যায়।

উপরোক্ত কারণে বহুদিন হইতে চব্বিশ পরগণায় বারুইপুরের গুরুত্ব থাকায় ইংরেজ সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবর বারুইপুর, প্রতাপনগর, জয়নগর ও মাতলা বা (ক্যানিং) এই চারিটি থানা লইয়া একটি মহকুমা গঠন করতঃ উহারও সদরস্থান এখানে স্থাপন করেন। উহা বারুইপুর মহকুমা নামে প্রসিদ্ধ হয় ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। তজ্জন্য এখানে মহকুমা হাকিমের আদালত ও মহকুমার পুলিশের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। সার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী, পরে যিনি বঙ্গদেশের ছোটলাট হন, এই মহকুমার প্রথম মহকুমা শাসক ছিলেন। তাঁহার পরে এখানে যে কয়জন বাঙালী মহকুমা শাসক আসেন তন্মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি এখানে অনেকদিন ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় এখানকার পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনীও ঐ সময় এখানে লিখিত হয়।

মজিলপুর নিবাসী সাধক ও সাহিত্যিক কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় উহার উল্লেখ আছে। তিনি তখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বারুইপুরে থাকিতেন। কিরূপে তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয় ও কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় বারুইপুরে আদালতে বিচারকার্য্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিতেন তাহার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

'বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। তখন ইংরাজি ১৮৬৮ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবর সাইক্লোন (cyclone) –এ ডায়মণ্ডহারবার, কুল্পি, মুড়াগাছা, টেঙ্গরা বিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মনিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়। এই দৈবদুর্ঘটনায় প্রদেশস্থ বহুসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিত হৃদয় হইয়া কয়েকজন ধনশালী পার্শী,কতিপয় ইংরাজ কর্ম্মচারী ও প্রদেশের জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্য দান করিয়া সত্তরই একটি প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন পূর্ব্বক ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েকখানা পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি সঙ্গে আমাকে লোকের দুর্ভিক্ষ ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ববর্তী টেঙ্গরা বিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে বহুসংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে এবং পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যেও বনে জঙ্গলে বৃক্ষোপরি ও ভূতলেও ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, দেখিলাম। আমি ৩/৪ দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মত প্রত্যেক পরিবারকে বন্টন করিয়ে দিয়া মজিলপুরে ফিরিয়া আসিলাম এবং বঙ্কিমবাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম ও দ্রব্যাদির হিসাব দিলাম। তিনি আমার কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষকার্যের আধিক্য প্রযুক্ত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ভার অল্পদিনের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং ডায়মণ্ডহারবার হইতে বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভারপ্রাপ্ত হইলেন ও দুর্ভিক্ষকার্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষ কার্যে বঙ্কিমবাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম হেমবাবুকে সেরূপ করিতে লাগিলাম। সাইক্লোন প্রযুক্ত কেবল এই দুই মহকুমাই (বারুইপুর ও ডায়মণ্ডহারবার) দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়াছিল।

এ সময় ১৮৮৪ সালের নুতন রেজিষ্টরি আইন অনুসারে মহকুমায় নুতন রেজিষ্টরি অফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার (বারুইপুরের) নুতন রেজি ষ্টরি অফিসের হেডক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাভাবিক দয়ারচিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম।

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমনকি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-room-এ প্রস্থান করিতেন এবং চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া ফিরিতেন না।

কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সময় অবস্থানকালের আরও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারী কার্যে গভীর ভাবে নিযুক্ত থাকিলেও তখন উহার চাপে তাঁহার সাহিত্যসাধনার কোন ত্রুটি ঘটিত না। উহার প্রতি তিনি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন তাহা তাঁহার আদালতের কার্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বোক্তরূপ উল্লেখ হইতে জানা যায়। তিনি বারুইপুরে প্রত্যহ আদালতের বিচার ও তৎকালীন মহকুমা শাসকের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও রাত্রে নিয়মিতভাবে চারি ঘন্টাকাল অধ্যয়ন করিতেন। কালীনাথ বাবু উহারও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেনঃ

"আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন কিম্বা সে সময় আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোন পুস্তকবিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম তিনি শ্রবণ করিতেন এবং স্থলবিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭।। হইতে ১১।। পর্যন্ত তাহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই Light Reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে, তাহাতে Progresive development of thiecies বিষয়ে লেখা ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল থাকায় উক্তরূপে গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণ ব্যতীত সময় সময় সুবিধা পাইলেই হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করিতেন। কালীনাথবাবু এবিষয়েও যাহা বারুইপুরে প্রত্যক্ষ করেন তাহার উল্লেখ এইরূপ ঃ

"এ সময় বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগরনিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়া অল্প স্বল্প চিকিৎসা ব্যবসাও চালাইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এক সুবিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কোন এক বৎসর তিনি কলেজের পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অণুবীক্ষণযন্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশবাবুর আলাপ-হওয়াতে মহেশবাবু সেই অণুবীক্ষণটি দিনকতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহার করিবার জন্য প্রদান করেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই অণুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্যসঙ্গী থাকিতাম।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকালে বারুইপুরের পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। উহা ভিন্ন তিনি তখন বারুইপুরের অধিবাসীদেরও বিপদে আপদে

যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। উহারও একটা উদাহরণ কালীনাথবাবুর রচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও পরিহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে

কালীনাথবাবু লিখিতেছেন ঃ-

'একদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যে থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪/৫ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারিতে সংবাদ দিল রাজকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে। শুনিবামাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারির সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। আমরা বজ্রাহতের বাটীতে গিয়া দেখিলাম .... নীচের ঘরে তিনটি লোক একটি মাদুরে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল। সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে। ......রাজকুমার বাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরে মধ্যস্থানে মুধারতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার সেদিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন। ..... আমরা বজ্রাঘাত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরিসাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্ত্র বিজ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ও ইতিমধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবকটির চৈতন্যদয়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না।''

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ের পরেও অনেকদিন বারুইপুরে ছিলেন। উহারও উল্লেখ কালীনাথবাবুর উক্ত রচনায় পাওয়া যায়। উহা এই ঃ-

''আমি আমার নূতন কার্য্যে বারাসাতে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বারুইপুরে ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ই তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। আদালতের কার্য্যের সময়ও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।''

''যেদিন বারুইপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করি, আমার জীবনের প্রথম অংকের ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অংকের যবনিকা পতিত হয়। এমন দিন আমার জীবনে আর ফিরিয়া আসে নাই।'

– বংকিম চন্দ্র

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বারুইপুর

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

ভারতের মুক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম যে অহিংস ও সহিংস – এই দুটি পথ ধরেই এগিয়ে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বারুইপুরের আন্দোলন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অহিংসই থেকে গেছে। গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে তাঁরা ছিলেন অবিচল। বহু দেশপ্রেমিকের রক্ত ঝরেছে, তাঁরা জেল খেটেছেন, নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু কেউ-ই অহিংস পথ পরিত্যাগ করেননি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সে সব বীরগাথা বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয়েছে, লেখা হয়নি বারুইপুরের সেই সব অশ্রুঝরা কাহিনী। বিক্ষিপ্ত ভাবে কোনো কোনো ঘটনার কথা কিছু কিছু পত্রিকায় লেখা হলেও সম্পূর্ণ একখানি ইতিবৃত্ত এখনও লেখা হলো না। এটা দুঃখের কথা। বর্তমান লেখকেরও পূর্ণতার দাবী নেই। ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তাই কেবল সকল প্রকার আন্দোলন ও তার পরিপ্রেক্ষিত গুলির আভাসমাত্র দিয়ে নিবৃত্ত হতে হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ৮৩ বর্গমাইল (প্রায় ১২৫ বর্গ কিমি) 'বারুইপুর' নামের বয়স অনেক। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসামঙ্গল'-এ নামটির প্রথম উল্লেখ পাই। কিন্তু সে ইতিহাসের কথা থাক। সে ইতিহাস বহু-বিস্তৃত। তার কথা অন্যত্র লিখেছি। [১]

আজ যে-ইতিহাসের কথা লিখতে বসেছি, সেটা হলো, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বারুইপুরের (থানা অঞ্চল) ভূমিকা। সর্বাগ্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা সংগ্রামের বহ্নি-তরঙ্গকে কোনো আঞ্চলিক সীমারেখায় টেনে রাখা অবাস্তব। অঞ্চলে অঞ্চলে আদানপ্রদানের মাধ্যমেই তা প্রজ্বলিত হয়। বিশেষ কোনো অঞ্চল তার দাবীদার হতে পারে না।

কিন্তু কোথা থেকে আরম্ভ করব ? প্রদীপ জ্বলার আগে সলতে পাকানো আছে না ? অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে থেকেই। বিপ্লবের যজ্ঞবেদীতে হুতাশন প্রজ্বালনের সমিধ সংগ্রহ করে গেছেন পূর্বসূরি নেতৃবৃন্দ। সংক্ষেপে সেই ইতিবৃত্তটা আগে বলি। তারও আগে একটা কথা জেনে রাখা ভালো – সারা দেশের মধ্যে যেখানে যত প্রকার বিপ্লব-বহ্নি উত্থিত হয়েছে, যেমন – নীলকর আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তন্তুবায় আন্দোলন, সহিংস-অহিংস নরম ও চরমপন্থী স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি। তার প্রায় সবকটির উত্তাপ এসে পড়েছে চাংড়িপোতা– বারুইপুর–জয়নগরে। বজবজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তিকালে মহানায়ক সুভাষচন্দ্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ঢেউ (১৮৫৭) এসে লেগেছিল বারুইপুর থানার সিপাইদের মধ্যেও। 'লালবাজারের ইতিহাস' থেকে জানা যায়, সেদিনের সার্ভিস কন্ডাকট রুল অনুযায়ী জঞ্জাল সাফাই, আগুন নেভানোর কাজ তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। থানাটি তখন ছিল যেখানে, সেখানকার আজকের নাম 'পুরানো থানা' অবস্থানটি ছিল 'থানাপুকুর'-এর পূর্বতীরে। তার

সামনে, পাকা রাস্তার উত্তরে ছিল রেজিস্ট্রী অফিস। মনে হয়, এ অঞ্চলের মতিগতির মন্দ গতি দেখে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের থানাটি চলে যায় বর্তমান স্থানে, বারুইপুর রেল স্টেশনের (স্থাপিত ১৮৮২) কাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দশকের মধ্যেই বারুইপুর তথা (সম্ভবত) পঃ বাংলায় ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুন্সেফ আদালতটিও বারুইপুর, কুলপী রোড এবং আমতলা রোডের সংযোগ স্থলের পূর্বে 'মানিকতলা' (অধুনা ব্যানার্জী পাড়া) থেকে স্থানান্তরিত হয়ে থানার কাছেই চলে আসে। রেল স্টেশন, থানা ও আদালত এক লপ্তে এনে ফেলা হয় প্রশাসনিক প্রয়োজনেই।

একথা অসত্য নয় যে, সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ পরাধীনতার গ্লানি যেভাবে অনুভব করেছিল, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ ততখানি করেনি। নিম্নবর্গের মানুষ তখন – 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ/ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।' সেজন্য রণক্ষেত্রে তাদের দেখা বড় একটা পাইনি।

ইংরেজদের সম্পর্কে বারুইপুরবাসীদের প্রথম চোখ খুলল ১৮২০ সাল নাগাদ স্থানীয় খৃষ্টান গীর্জাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের পর থেকে। শেষ ঘটনাটি ঘটে, এক ব্রাহ্মণকে খৃষ্টান করার পর তার পত্নীকে ছলনায় ভুলিয়ে এনে গীর্জার মধ্যে আটকে রেখে যে কেলেঙ্কারীটা সেদিনকার পাদ্রী সাহেবরা করেছিলেন, তা এ-অঞ্চলের মানুষকে ইংরেজ-চরিত্র সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিল। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যাবার পর স্থানীয় জমিদার রাজা রাজবল্লভ রায় সেদিন যদি ঐ পাদ্রীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা না করতেন, তাহলে আরো কত যে অনর্থ ঘটতো, তা কে জানে। (দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে খুব সম্ভবত এটাই হ'ল প্রথম দুষ্ট ইংরেজদের লাঞ্ছনার ঘটনা)।

এর পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলেন নীলকর সাহেবরা।

দঃ ২৪ পরগণায় নীল চাষের প্রধান কার্যালয় ছিল বারুইপুর। নাম ছিল, 'বারুইপুর কন্‌সারন্‌স' (Baruipore Concerns) । সেই হেড কোয়ার্টারটা ছিল, বর্তমানের 'বড়কুঠি', রবীন্দ্রভবনের সম্মুখস্থ ভবন। বাড়িটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিমক মহলেরও হেড কোয়ার্টার ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৪ বছর বয়সে নিমক মহলের দেওয়ান হয়ে বাড়িটা তৈরী করেন। পরে রাজ কুমার রায়চৌধুরী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে খরিদ করেন। নীলকরদের আরেকটি কার্যালয় ছিল বর্তমান 'বারুইপুর স্কুল'-এর (স্থাপিত ১৮৫৮) স্কাই লাইটওয়ালা ঘরটি। বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে নীল চাষ হতো। নীল পচানো লোহার বালতি ৬০/৭০ বছর আগেও পড়ে থাকতে দেখা গেছে। স্থানটির নাম আজও 'নীলক্ষেত'। বারুইপুরের নীল ২৪ পরগণার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সরকারী নথিপত্রে স্থান পেল। নীল চাষ এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ল বেগমপুর, শাঁখারীপুকুর এবং দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে। নীল চাষে জমির মালিকদের ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছিল। নীল চাষের চেয়ে ফসল উৎপাদন যথেষ্ট লাভজনক ছিল। স্বেচ্ছায় সারা বাংলার মধ্যে কেউ নীল চাষ করেনি, ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ও'ম্যালি সাহেবের গেজেটীয়ারে (১৯১৪) দেখা যায়, নীল চাষকে ও ধর্মান্তরকরণকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন অঞ্চলে সংঘর্ষ হলেও বারুইপুর এলাকায় সংঘর্ষের

কোন খবর নেই।[২] ১৮৬৪-তে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর মুনসেফ আদালতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার হয়ে খুলনা থেকে এলেন, আশ্রয় নিলেন ঐ বড়কুঠিতে। বসে বসে তিনি সব দেখলেন। দেখলেন, নীল চাষের ফলে কেমন করে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দেখলেন, প্রতিকারহীন ব্যবস্থাপনায় তাদের নীরব অশ্রুপাত। এরই মাঝে তাঁর অসমাপ্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করে এখানে বসেই প্রকাশ করে ফেললেন, ১৮৬৫তে। যাই হোক, এসবের মধ্যে দিয়েই এখানকার মানুষ তিতিবিরক্ত হয়েই ছিল। জমছিল ক্রোধ। কিন্তু প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না। এবার পেলো। রাসমাঠে বসলো 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা'।

'স্বজাতীয়দের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন করার, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে' ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যার সূচনা তার দু'বছর বাদে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে রাসমাঠে অনুষ্ঠিত হলো সেই যুগান্তকারী 'হিন্দুমেলা'। ১২৭৬, ১২৭৮ ও ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীষ্টাব্দ যথাক্রমে ১৮৬৯, ১৮৭১ ও ১৮৭২) এই তিন বছর জাতীয়তাবোধ (Patriotism) উন্মেষের আয়োজন চলল। ১২৭৭-এ বন্ধের কারণ জানা যায় না। দ্বিতীয় বৎসরে (১২৭৮) প্রধান বক্তা মনোমোহন বসুর অভিনন্দন পরিকল্পনায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ দশভুজা দেবী দুর্গার অনুকরণে রণমূর্তি 'উন্নতিদেবী'র উদ্‌ভাবনা এক চমকপ্রদ আবিষ্কার। এই ঐতিহাসিক মেলার পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় জমিদার বাড়ির রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ও জনৈক যুবক নবগোপাল বসু ছিলেন সহঃ সম্পাদক। এই সভায় মাখনলাল বিদ্যাবাগীশের কিন্নর কণ্ঠে গীত পূর্বোক্ত মনোমোহন বসু রচিত গান – 'দিনের দিন সবে দীন হ'য়ে পরাধীন – 'বহুকাল ধ'রে এ অঞ্চলের লোকের মুখে ঘুরে বেড়াত।

জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ইন্ডিয়ান লীগ', 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও এই 'হিন্দুমেলা'ই ছিল কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতের জাতীয় চেতনা প্রকাশের কার্যকরী সংগঠন। দেশের উচ্চতম পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছিলেন এর সংগঠক। এই মেলা সম্পর্কে আর একটি উল্লেখ্য সংবাদ হলো, মারাঠী ব্রাহ্মণ প্রখ্যাত বিপ্লবী সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) পরবর্তিকালে, সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ মেশানো 'হিন্দুমেলা'র পরিবর্তে 'ভারতমেলা'র প্রস্তাব দেন। সম্ভবত, প্রস্তাবটি কার্যকর করার আগেই এর আয়ু ফুরায় - এই রাসমাঠেই অনুষ্ঠিত ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' নামক অপকীর্তিকে অবলম্বন করে স্বদেশী মেলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্ব শেষ হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনে যে ধারা-বদল হলো, তার ঢেউ এসে লাগল বারুইপুরে। যুব ছাত্রদল হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরোভাগে রয়েছেন নারিকেল-ডাঙ্গা নিবাসী বারুইপুর কোর্টের উকিল সুশীল ঘোষ। মিছিল চলেছে। সমস্বরে নিনাদিত হচ্ছে– 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান!' যাবে তারা বারুইপুরের পুরোনো বাজারে। সেখানে হবে প্রতিবাদ সভা। সভার শেষে আরম্ভ হবে বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য আন্দোলন, সেই আন্দোলন উপলক্ষে যে প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল তা হুবহু তুলে দেওয়া হল।

১৯০৫ সাল সভা করার জন্য জমিদার দুর্গাদাস রায়চৌধুরীকে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের

জুন মাস পর্যন্ত আত্মগোপন করে বেনারসে থাকতে হয়েছিল। ঠিক এই বছরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনে যে ধারার বদল হলো তার ঢেউ এসে লাগল বারুইপুরে প্রতিবাদ সভা কিন্তু হলো না, বাধা এলো স্থানীয় সেই জমিদার বাড়ি থেকে যে বাড়ীর রাজা রাজবল্লভ রায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধ্যে প্রথম ইংরেজ পাদ্রীদের পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিল। যে বাড়ির রাজেন্দ্র রায়চৌধুরী প্রধান পৃষ্ঠপোষকতার ব্রিটীশ বিরোধী হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র কয়েকদিন আগে জমিদার দুর্গাদাস রায়চৌধুরী যে ব্রিটীশ বিরোধী সভায় সভাপতি হবার জন্য বারুইপুর ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই জমিদার বাড়ী থেকেই এবার বাধা এলো-ব্রিটীশ বিরোধী কাজ চলবে না। স্বদেশী কর্মিগণ অপমানিত হয়ে ফিরে গেল। পরে অবশ্য বেনারস থেকে ফিরে জমিদার দুর্গাদাস রায়চৌধুরী ব্যাপারটা মিটিয়ে নেন স্বদেশী কর্মীদের সাথে।

"বন্দে মাতরম্"

মহাশয় !

বিদেশীয় দ্রব্যের যথাসম্ভব ব্যবহার ত্যাগ ও স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার এবং স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধন উদ্দেশে আগামী ১৫ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ন ৪ চারি ঘটিকার সময়, বারুইপুর গ্রামে আমাদিগের "রাস মাঠে", একটী মহতী সভার অধিবেশ হইবে। সভাস্থলে বঙ্গের সুকৃতি-সন্তান বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু ও কলিকাতার কতিপয় মহাত্মার আগমন হইবে। উক্ত সভায় মহাশয়দিগের আগমন ও সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিনীত নিবেদক,
শ্রী দুর্গাদাস রায় চৌধুরী

বারুইপুর
সন ১৩১২ সাল,
১০ই আশ্বিন
১৯০৫

লেখক এটি বিপ্লবী নিশিকান্ত সরকারের বাড়ী থেকে উদ্ধার করেন। অতঃপর এলো ১৯০৮ সাল। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুবিখ্যাত বিপ্লবী সপার্ষদ অরবিন্দ ঘোষের বারুইপুরে অশ্বশকটে আগমন। ব্রিটিশ-বিরোধী একটি জনসভা হবে। কথা ছিল এই মহতী সভা অনুষ্ঠিত হবে রাসমাঠে। প্রধান উদ্যোক্তা পূর্বোক্ত উকিল সুশীল ঘোষ। পূর্ব অভিজ্ঞতা বশত রাসমাঠে

করতে ভরসা পেলেন না। হ'ল গিয়ে বর্তমান বারুইপুরের মুন্‌সেফ কোর্টের পশ্চিমে 'কুলপী রোড'-এর পাশে মারিক বাবুদের বাড়ীর সামনে। সভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ই এপ্রিল, সোমবার ১৯০৮ সালে। সভাপতি ময়দা নিবাসী (থানা জয়নগর) এই কোর্টেরই উকিল মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পর্বে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। পরে বিপিন পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত দেশনেতাগণ। শ্রোতারূপে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য্য (এম.এন.রায় প্রমুখ)। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন কোদালিয়ার কালীচরণ ঘোষ (জাগরণ ও বিস্ফোরণ, দ্য রোল অব্ অনার প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা), বারুইপুর নিবাসী হরেন্দ্রনাথ পাঠক (লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল), উকিলপাড়ার অমরনাথ ভট্টাচার্য্য (সমাজ সেবক) প্রমুখ আরো অনেকে। প্রধানত এই তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলছি পরবর্তী বক্তারা বাংলায় বললেও অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় বক্তৃতা দিতে অক্ষম ব'লে ক্ষমা চাইলেন। পরে ইংরেজীতেই ভাষণ দেন এবং বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দেন বিপিন পাল। শ্রী শ্রী সারদা মায়ের শিষ্য পূর্বোক্ত অমরনাথ বলেছিলেন 'আমাদের বয়স তখন অল্প। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে মঞ্চের দুপাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জনসমাগম হয়েছিল হাজার তিনেকের মতো।' সেদিনকার লোকসংখ্যার অনুপাতে ভালই বলতে হবে। অরবিন্দ ঘোষের সেদিনের বক্তৃতা দু-একটি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। সেই দীর্ঘবক্তৃতার সার কথাটি হলো প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কী ? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কি শেষ কথা ? এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ড উপনিষদের সেই বিখ্যাত রূপক গল্পটি বলেছিলেন – গাছের উঁচু ডালে বসে-থাকা পরমাত্মারূপী পাখী সুখ-দুঃখের অতীত অমৃত রস পান করছে আর নীচু ডালে বসা জীবাত্মারূপী পাখী যাবতীয় দুঃখের ভাগী হচ্ছে ইত্যাদি। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বারুইপুর থেকে চলে যান হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায়, এবং এই বছরেই মে মাসে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

সে কথা থাক। বারুইপুরের কথা বলি। অরবিন্দ, বিপিন পাল, প্রমুখ বিপ্লবীরা যেখানে দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি কামনায় দেশবাসীদের ডাক দিয়ে স্থানটিকে তীর্থে পরিণত করেছিলেন, আজও, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ পঃবঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দ্বিতীয়বার 'বারুইপুর মহকুমা' হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন স্মারক চিহ্নিত হয়নি। তাই বারুইপুরের অধিকাংশ মানুষ জানে না,সেদিন মুক্তিযজ্ঞের হোমাগ্নির শিখাটি কত দূর ও কোথায় উঠেছিল। 'পিতৃঋণ' স্বীকারে এতই আমাদের অনীহা!

এই হোমাগ্নির উত্তাপে উদ্দীপিত হয়ে একদল মানুষ 'স্বাধীন চেতনা সম্পন্ন ও স্বদেশী ভাবাপন্ন, শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত জমির ওপর ১৯০৯ সালে পত্তন করলেন মদারাট গ্রামে 'মদারাট পপুলার একাডেমী'। বারুইপুর কোর্টের উকিলবাবুরা বিনা বেতনে পড়াতে ছুটতেন এই 'স্বদেশী বিদ্যালয়'-এ।

এর পর থেকে বারুইপুরে প্রায় সর্বতোমুখী জাগরণ ঘটলো। বারুইপুর, শাসন, কল্যাণপুর, সাউথ গড়িয়া, রামনগর, ধপধপি, কুমারহাট প্রভৃতি গ্রামের যুবকবৃন্দ তেরঙ্গা পতাকা হাতে

নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে বারুইপুরের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। কথায় আছে, 'গুরু মেলে লাখে, লাখে শিষ্য মেলে এক'। বারুইপুর সম্পর্কেও কথাটি খাঁটি সত্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সর্ববঙ্গীয় বা সর্বভারতীয় নেতা বলতে যা বোঝায়, তা হয়তো ও অঞ্চলে জন্মান নি; কিন্তু বেশ কিছু খাঁটি চেলার জন্ম বারুইপুর যে দিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেই সব চেলা তথা সৈনিকদের কথা বলার আগে এ অঞ্চলের যিনি প্রথম রণগুরু তাঁর নামটা তো প্রথমেই করতে হয়। বারুইপুর সহ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণার আন্দোলনকে যিনি সর্বশক্তি দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এখানকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন ওতপ্রোতভাবে, তিনি হচ্ছেন, বারুইপুর থেকে ৫/৬ কি.মি. দূরবর্তী উত্তরের গ্রাম 'মাহীনগর'-এর সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল বিপ্লবী নন, ভালো একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও ছিলেন। এখানে আপামর জনসাধারণের কাছে অমায়িক ব্যবহার-গুণে অচিরেই 'সাতকড়ি' থেকে 'সাতুদা'য় পরিণত হলেন, চলে এলেন সবার হৃদয়-মন্দিরে। বারুইপুর কোর্টের দক্ষিণে আছে একটা মসজিদ। তার বিপরীতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সাতুদা খুললেন একটা ডাক্তারখানা। পশার প্রতিপত্তির জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। রোগী এলে চুপি চুপি বলতেন, 'বাপু, মায়ের হাতের শেকলটা আগে কাটো দেখি। তাহ'লেই ওসব রোগ-টোগ আপনিই সেরে যাবে। মায়ের হাতে বড্ড ব্যথা।' রোগীরা এ সব বুঝতে না পেরে ফিরে যেত। আসলে ডাক্তারীর তলে তলে চলতো স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা প্ল্যান-প্রোগ্রাম। 'ক্রমে ক্রমে বার্তা রটে গেল গ্রামে।' যথার্থ একজন আদর্শবাদী নেতাকে পেয়ে, ক্রমশ এসে মিলিত হলেন অমূল্য মুখার্জী (সালেপুর), মদারাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজয়বাবু, ফণী মুখার্জী, নলিনী মুখার্জী, নলিনী হালদার (ডিহি মেদনমল্ল), মদারাটের ডাঃ দেবেন মিস্ত্রী প্রমুখ আরো অনেকে। অত্যন্ত গোপন আড্ডা। কারণ পাশেই থানা। কী সাহস! এই আড্ডার পরিপোষণে গৌরী সেনের ভূমিকা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন উকিল শিবদাস মারিক (যাঁর বাড়ীর সামনে অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতামঞ্চ হয়)।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে তখন মুখ্যত দুটি দল। অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি। বারুইপুরের এঁরা ছিলেন যুগান্তর পার্টির। এ সব হচ্ছে ১৯২১ সালের কথা। অত্যল্প কালের মধ্যে দল সুসংগঠিত হলো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বারুইপুরে প্রথম কংগ্রেস কার্যালয় স্থাপিত হলো 'কাছারী বাজার' -এর কাছে কুলপী রোডের পশ্চিমে মসজিদের বিপরীতে একটি ঘরে, যেখানে 'রূপাঞ্জলী বস্ত্রালয়' নামে একটা সাইনবোর্ড এক সময় ঝোলানো থাকতো। এই ঘরে এসে জমায়েত হতেন সাতু'দা ছাড়া, হরিকুমার চক্রবর্তী সহ পূর্বোক্ত বিপ্লবীরা। এম.এন. রায়ও আসতেন মাঝে মাঝে। এইখানে 'সাধন সঙ্ঘ' নামে একটি উপদল গঠিত হলো। এইখান থেকেই তরুণদল লাভা স্রোতের মতন ছুটে বেড়িয়েছেন পরাধীন দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির উদ্দেশ্যে। কারণ, এঁরা তখন 'মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রণক্ষেত্র প্রসারিত করেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন, সাতকড়ি, হরিকুমার। আর.এম.এন.রায় প্রসারিত করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

কিন্তু হলো না। ১৯৩১ সালে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ড সাহেব ঐ কংগ্রেস কার্যালয়ে হানা দিলেন। অফিসঘর তছনছ করলেন। কিন্তু কারুকে ধরতে পারলেন না। আগে থেকে আভাস পেয়ে তরুণ কর্মীদল পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছেন ঐ মদারাটের 'পপুলার একাডেমী'তে। তখন ওটা বড়ই নিরাপদ স্থান।

এর পর আরম্ভ হলো 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি'। সুভাষচন্দ্র বসুর উষ্ণ সান্নিধ্যে এসে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র (এঁর প্রথম দীক্ষাগুরু, বসন্ত মজুমদারের বিপ্লবী পত্নী প্রভা মজুমদার) নতুন করে প্রাণ পেলেন। Bengal Volunteers -এর ক্যাপ্টেন হলেন। সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি পরিক্রমা করতে লাগলেন। মাথায় (ক্যাপ) সাদা রঙের হ্যাট, পরনে সাদা প্যান্ট ও সার্ট, দীর্ঘ ৬ ফুট ঋজু দেহে রেসের ঘোড়ার মতো পদক্ষেপ, মাঠে-ময়দানে প্যারেড করানো সে সব দৃশ্য এই লেখকের চোখে এখনও ভাসছে। অকালে পত্নী-বিয়োগ ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে, দেশের শৃংখল-মুক্তির জন্য পুলিশের লাঠির আঘাত মাথায় নিয়ে, জেল খেটে, সাংসারিক জীবনের সুখ-শান্তিকে ছিন্নভিন্ন করে যে ত্যাগস্বীকার তিনি করেছেন (সৌভাগ্যক্রমে আজও তিনি জীবিত আছেন), স্বদেশভূমি সে কথা কতখানি মনে রেখেছে, জানি না, তবে মহাকালের সোনার তরীতে নিশ্চয়ই তা ঠাঁই পেয়েছে। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সাতুদার নেতৃত্বে সদলবলে ডাঃ দেবেন মিশ্রের বারুইপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে ১৯২১ সালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, এর ফলে প্রহার ও পরে জেল খাটা। সবই চলল; কিন্তু পাল্টা আঘাত কেউ দেয়নি। কারণ, এঁরা সব অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্ষুদ্র একটি থানার অনুপাতে নির্যাতিতের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যতগুলি নাম পেয়েছি, সংক্ষেপে তার গ্রামওয়ারী তালিকাটি উপস্থিত করছি –

গ্রাম-ডিহি মেদনমল্ল। ফণী মুখোপাধ্যায়, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী হালদার, নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্সি জেলে ছ'মাস), নারায়ণ দাস গায়েন ও হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

গ্রাম মদারাট। ডাঃ দেবেন্দ্র মিশ্র, তুলসী পাল (প্রেসিডেন্সি জেলে ৩ মাস জেল খাটার ফলে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু , সম্ভবত ১০৩২-এ) ও বিজয় বসু (শিক্ষক, মদারাট পপুলার একাডেমী) প্রমুখ।

গ্রাম শাসন। অধ্যাপক রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্সি জেলে তিন মাস হাজতবাস), পূর্ণ ব্যানার্জী (বহরমপুর জেলে ছ'মাস), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ছ'মাস জেল) ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বেচ্ছাসেবক)।

গ্রাম বারুইপুর। সতীশ দাস, দত্তপাড়া (হিজলি জেলে ছ'মাস); নফরচন্দ্র দাস (পরে বৈষ্ণবভক্ত, 'বাবাজী' উপাধি গ্রহণ। কিছুদিন হাজতবাসের পর মুক্তিলাভ) ও অপূর্ব দত্ত, বৈদ্য পাড়া (স্বেচ্ছাসেবক) প্রমুখ।

গ্রাম খোদার বাজার। মহঃ বাবুরালি ও তৎপুত্র এম.আবদুল্লা প্রমুখ।

গ্রাম মামুদপুর। বঙ্কিম বৈদ্য।

গ্রাম কল্যাণপুর; বিষ্ণুপদ নস্কর (বঙ্কিম বৈদ্যের ভগ্নিপতি); জ্যোতির্ময় রায়, নিহাটা; অনুকূল মণ্ডল; প্রতাপ মণ্ডল ও খগেন্দ্র নস্কর (ইনি রিপন কলেজে ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর পার্টিতে কিছুকাল স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন)।

গ্রাম টংতলা। পুলিন নস্কর ও বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় (সি.ডি.মুভমেন্টের জন্য ছ'মাস জেল)।

গ্রাম সাউথ গরিয়া। এই গ্রামটির কথা মনে উঠলে যে-দুটি নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তাঁরা হলেন বঙ্গ-বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয় অনুজ কর্মীদের কাছে, মণিদা। বহু কীর্তি ইনি রেখে গেছেন। দল গঠনে ও পরিচালনার কাজে ইনি প্রায় আধখানা বাংলা ঘুরে বেড়িয়েছেন। দিনের পর দিন মণি-দার বাড়ীতে গিয়ে বহু ঘটনার ও বহু বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তোলা তাঁর আলোকচিত্র দেখেছি। এ ছাড়া, এই গ্রামের আন্নাকালী দাস ও তাঁর ভাই হরিপদ দাস (বিখ্যাত দুই ফুটবলার), পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (১ ও ২নং), শৈলেন ঘোষাল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাপতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নামের সঙ্গে মিশে আছে বহু রক্তঝরা কাহিনী।

গ্রাম ধপধপি। প্রদ্যোৎ ঘোষ (ইনি কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ স্টিভেনস্ হত্যার অন্যতম আসামী, ডাঃ সুনীতি চৌধুরী (এম.ডি-র স্বামী), জিতেন ঘোষ (বটু)। বটু-দা ছিলেন ব্যায়াম পুষ্ট, বলিষ্ঠদেহী। শোনা যায়, ইনি না কি কলকাতার রাস্তায় এক সাহেব সার্জেন্টকে কী এক অপরাধে একটি মাত্র চপেটাঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। পুলিশ বটুদার টিকির নাগাল পায়নি। এই জিতেন ঘোষ ও প্রদ্যোৎ ঘোষ কারাজীবনেই কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন, এবং খুব সম্ভবত বারুইপুরের মধ্যে ধপধপিতেই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি এঁরাই গঠন করেন। তবে এঁদের কর্ম তথা রণক্ষেত্র ছিল প্রধানত কলকাতা।

গ্রাম রামনগর। শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার) সাতকড়িবাবুর নেতৃত্বে কিছুকাল কাজ করেন। তবে এঁর বিপ্লব মন্ত্রে প্রথম দীক্ষা আদীশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে। নিশিকান্ত সরকার প্রধানত লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলনে প্রেসিডেন্সি ও হিজলী জেলে ছ'মাস কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। শ্রী সুশান্ত (নিতাই) সরকার (স্বেচ্ছাসেবক)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার বাংলার সব রকমের নৌকা আটকের আদেশ জারী করলে পর নৌজীবীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। উত্তরভাগ গ্রামের অরুণচন্দ্র মণ্ডল (একদা বিখ্যাত 'অরুণ অপেরা' নামক যাত্রাপার্টির মালিক) ও উক্ত সুশান্ত সরকারের যুগ্ম নেতৃত্বে পিয়ালী নদীর তটে উত্তরভাগ ঘাটে সদলবলে হাজির হয়ে দিনের পর দিন বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পুলিশদের হটিয়ে বহু নৌকা মুক্ত করেন। ফলে পুলিশি নির্যাতন তাঁদের সইতে হয়।

বিপ্লবী ললিত সিংহের নিবাস ক্যানিং থানায় (ডকের ঘাট) হলেও তাঁর ঘাঁটি ছিল এই অঞ্চলে। ডাঃ দেবেন মিশ্রের সহকর্মী। ইনি মিঃ ওয়াট্সন হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে

প্রেসিডেন্সি জেলে দীর্ঘকাল ঘানি টেনেছেন। সাতু-দার শিষ্যরূপে ডাঃ মিশ্র কয়েকজন সুযোগ্য সহকর্মী পেয়েছিলেন। যেমন– উক্ত বঙ্কিম বৈদ্য (সহঃ অধিনায়ক), অপেক্ষাকৃত তরুণ দলে দীনেশ মজুমদার (বসিরহাট), জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (দঃ জগদ্দল), সুনীল চ্যাটার্জী (বহড়ু), সন্তোষ ভট্টাচার্য ও তাঁর ভাই ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য (মাহীনগর) ও মিলন মৈত্র (মালঞ্চ) প্রমুখ কয়েকজন টগ্‌বগে যুবক। লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন কোন কোন স্থানে সহ্যের মাত্র অতিক্রম করেছিল। যেমন, কালিকাপুর রেল স্টেশনর কাছে, উত্তরভাগে। মজিলপুরের হাবু দত্ত এখানে এসে নুন তৈরী করে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। পুলিশ কিন্তু কোথাও পাল্টা আঘাত পায়নি।

কাকে ছেড়ে কার কথা বলি ? যাঁরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগদান না দিয়ে, মিটিং-মিছিলে না গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বদেশ চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁদের অবদানটাই বা কম কিসের ? ঠিক তেমনি একজন নীরব কর্মী ছিলেন কুমারহাট গ্রামের মতিলাল কর্মকার। গান্ধীবাদী এই বিশিষ্ট কর্মী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, স্বকীয় উদ্যোগে স্বকীয় কুটির শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা নিজ বাস্তুভিটায় স্থাপন করেন। এই ব্যবসার নীতি হলো না-লাভ, না-ক্ষতি। এই কারখানায় নির্মিত, নিজ পুত্র ভবানীচরণের নামানুসারে 'ভবানী স্প্রীং ডাম্বেল' এবং আরো নানাবিধ ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করে শারীরচর্চায় প্রেরণা যোগাতেন। বর্তমান লেখকও সেই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উপকৃত। জানি না, প্রতিষ্ঠানটি আজও বেঁচে আছে কি না, তবে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।

এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি আন্দোলন উত্থিত হয়েছিল, সেটি চরখা আন্দোলন। বিদেশী পণ্য বর্জনের গোত্রভুক্ত। চরখার সুতো কেটে কাপড় বুনতে হবে। রামনগরের মিত্রপাড়ায় শৈলেন্দ্রকুমার মিত্রের বাড়ীতে, তদীয় ভাগ্নে সুধাংশু কুমার দে-র উদ্যোগে ৮/১০ খানা চরখা এসে পড়ল। 'সূত্রযজ্ঞ' শুরু হলো। সীতাকুণ্ডু গ্রামে জনৈক মুসলমান যুবক তাঁত বসালেন। কাপড়, গামছা তৈরী হ'ল। এই লেখকও একখানা খদ্দরের কাপড় ঐ তাঁতে বুনিয়েছিল। ভিজে কাপড়টা নিঙড়োতে না পেরে ও পথে আর যাইনি। 'ফুলতলা'য় পাওয়ারলুম বসার আগে পর্যন্ত সীতাকুণ্ডুর সেই তাঁতটি চালু ছিল। সূত্রযজ্ঞটি অবশ্য আরো কয়েক জায়গায় হয়েছিল।

বোধ হয়, সর্বশেষ আন্দোলন হয় রামনগর গ্রামে ১৯৪৫ সালে। প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী 'হেদো'র মাঠে। বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে হাজারখানেক মানুষের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জমিদার বাড়ীর (কৈলাস ভবন) সুধাংশু কুমার ঘোষ (এম.এ. বি. এল.)। প্রধান বক্তা ছিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর জনৈক সৈনিক। দুঃখের বিষয়, নামটা বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি। এমন কি এই সভার যিনি প্রধান উদ্যোক্তা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের সেদিনের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক সুধাংশুকুমার মল্লিকও পারেননি মনে করতে। এই লেখকের ছিল ঘোষকের ভূমিকা।

বারুইপুরের আর একটি গর্বের বিষয় ব'লে আমার কথা শেষ করছি। সেটি হচ্ছে, 'বিপ্লবী

নিকেতন'-এর প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো, অসহায়, পঙ্গু, বার্ধক্যের ভারে ক্লিষ্ট মুক্তি সংগ্রামীদের অস্তাচলগামী জীবনের শেষ দিনগুলি একটু নিশ্চিন্ত স্বস্তিতে, সেবা শুশ্রূষার মধ্যে রেখে দেওয়া। সরকারী উদ্যোগে প্রথমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোনারপুর থানার রাজপুর গ্রামে। তারপর, অনেক টালবাহানার পর এটি উঠে আসে সাউথ গড়িয়ায়। জমিদার যদুনাথ ব্যানার্জীদের চারতলা বাড়ীটি যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে অধিগ্রহণ করে ১৯৬৮ সালের ২রা অক্টোবর, এই 'বিপ্লবী নিকেতন'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা হয়। এই তীর্থের উদ্বোধন করেন সেদিনের পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর।

আমার কথা কি ফুরোল? আপাতত। কে জানে কত কথা, কত ঘটনা হয়তো অনুক্ত রয়ে গেল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার ভার রইল উত্তরসূরিদের ওপর। পরিশেষে দু-একটি কথা ব'লে বিদায় নিচ্ছি। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এ অঞ্চলে কোন নারীকর্মীর দেখা পাইনি। আরেকটি পরিতাপের বিষয়, বারুইপুর অঞ্চলে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, বরেণ্য পুরুষদের জন্মগ্রহণে বহু স্থান পবিত্রও হয়েছে। সে সব আজ তীর্থে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। তা তো হয়ইনি; পরন্তু সে সব স্থানে এমন কোন স্মারকলিপি নেই, যা দেখে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হবে। সর্বোপরি দুঃখের বিষয়, যে সব বিপ্লবী দেশের মুক্তি যজ্ঞের হোমানলে আত্মাহুতি দিয়ে ওপারে চলে গেছেন কিংবা এখনও কেউ কেউ অস্তাচলের দিকে পা বাড়িয়ে বসে আছেন, যতদূর জানি, বারুইপুরের মধ্যে কোন স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈনিককে আজও সম্বর্ধিত করা হয়নি। 'পিতৃঋণ' স্বীকারে আমাদের এমনই অনীহা! তা ছাড়া ইতিহাসের প্রতি এই 'আত্মবিস্মৃত জাতি'র ঔদাসীন্য আমাদের লজ্জা, এ আমাদের পাপ!

তথ্যসূত্র ঃ-

১। বারুইপুর হিন্দুমেলা – গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ।

সম্পাদক তারাপদ পাল, ১৯৭২।

২। হিন্দুমেলা – যোগেশচন্দ্র বাগল। মুক্তির সন্ধানে ভারত, কংগ্রেস পূর্বযুগ, ১৯৭২–পৃঃ৩২৭।

৩। মাতৃ আশীর্বাদে বিশ্বাস – কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বঙ্গের রত্নমালা, ১৩১৭।

সাক্ষাৎকার ঃ-

১। উকিল হরেন্দ্রকুমার পাঠক (১৮৮৯–১৯৮১), বারুইপুর, ১৯৭৩ সাল।

২। সমাজসেবী অমরনাথ ভট্টাচার্য্য (১৮৯১–১৯৮৩) , বারুইপুর, ১৯৭৩ সাল।

৩। বিপ্লবী ডাঃ দেবেন্দ্র মিশ্র (জন্ম ১৯০২), মদারাট, ১৯৭৬ সাল।

৪। নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন চটোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০০), রামনগর, ১৯৬৯ সাল।

৫। খগেন্দ্রনাথ নস্কর (জন্ম ১৯০০) কল্যাণপুর, ১৯৭৬ সাল।

এছাড়া ডবলু, ডবলু হান্টার এবং ও'ম্যালি সাহেবদ্বয়ের গেজেটিয়ার প্রভৃতি।

বারুইপুর নাম-এর উৎপত্তি ও পৌরসভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শক্তি রায়চৌধুরী

বারুইপুর নামটি হালের। তার আগেও দক্ষিণবঙ্গের এই স্থানটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তার নাম ছিল পৃথক। আটিসারা, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, পদ্মপুকুর, বলবন ইত্যাদি ছোট ছোট জায়গা ঘিরে প্রচুর গ্রাম নাম ছিল, সেই নামগুলিকে প্রায় আত্মসাৎ করে বারুইপুর আজ দক্ষিণবঙ্গের একটি উজ্জ্বল স্থান।

মুসলিম আমলে গঠিত ২৪ টি পরগণার অন্যতম মেদনমল্ল পরগণার মধ্যে বারুইপুরের অবস্থান। ভারতের মানচিত্রে যাহার ভৌগলিক অবস্থানটি হলো, বিষুবরেখার কৌনিক দূরত্ব অক্ষাংশে – ২২° ৩০' ৪৫'' এবং দ্রাঘিমাংশে ৮৮'৩৫° ।

নাম যাইহোক, সুদূর অতীতেও বারুইপুরের অবস্থান ছিল। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও ছিল। গাঙ্গেয় পাললিক মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত বলে এই অঞ্চল নেহাত অর্বাচীন নয়। এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকাতল থেকে দু'হাজার বছরেরও আগেকার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । এখানে যে একদিন লোকবসতি ছিল এবং এস্থান যে নানা দিক থেকে খুব সমৃদ্ধ ছিল, তার প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে ।

সাগরের মোহনায় বলে অবস্থিত বলে এই অঞ্চল প্রচন্ড ঝড়ে, তুমুল জলোচ্ছাসে এবং ভয়ঙ্কর ভুমিকম্পে যেমন বারবার ভুগর্ভে বসে গিয়েছে তেমনি হিংস্র জন্তুর আক্রমনে এবং মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে এ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে।

বারুইপুর গ্রাম নামটি কতদিনের প্রাচীন, সঠিক ভাবে সেকথা বলার উপায় নেই। এইস্থান নামটির প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রীঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই (চক্রবর্তী) র 'মনসা বিজয়' কাব্যে –

> "কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পুজিয়া।
> চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
> ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
> বাহিল বারুইপুর মহাকলাহলে।।"

এরপর এই অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে, ১৫৪০খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল —

> "হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
> উত্তরিলা আসি আটিসারার নগরীতে ।।
> সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
> আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্তনাম।।"

আটিসারা গ্রামে শ্রী অনন্তঠাকুরের গৃহটি বর্তমানে বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে ৮ নং ওয়ার্ডে শাঁখারী পাড়ায় অবস্থিত।

১৫৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ ভিতর রচিত কবি কঙ্কনমুকুন্দর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে এই অঞ্চলের কিছু গ্রামের নাম উল্লেখ আছে –

"তীরের প্রয়াণ যেন চলে তরীবর।
তাহার মেলানী বাহে মাইনগর।।
বৈষ্ণবঘাটা নাচনগাছা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া
ডাহিনে মেদনমল্ল বামে বীরখানা।
কেটুয়ালের কটকটি নদী জুড়্যাকেনা।।"

উপরোক্ত কাব্য থেকে আমরা নাচনগাছা ও মেদনমল্ল পরগণার অবস্থান জানতে পারি।

নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৭৬ থেকে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেছিলেন 'রায়মঙ্গল' কাব্যটি। এই কাব্যেও এ অঞ্চলের গ্রামের নাম উল্লেখ আছে –

"অকুল পবনে ডিঙ্গা চলিন গুণধাম।
পুজিয়া কল্যাণপুর প্রভু বলরাম।।
গগনে আওয়াজ হয় মহা কুতুহলে।
তাহার মেলান গেল ডিহি মেদননল্ল।।"

রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল অষ্টাদশ শতকের রচনা। গ্রন্থটি খণ্ডিত। গ্রন্থে রায়গাজী যুদ্ধ, বতা বাউলের কাহিনী ও পুষ্পদেব বণিকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পুষ্পদত্ত বণিকের বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে এসেছে এই অঞ্চলের গ্রাম নাম –

কল্যাণপুরে পুজিয়া করি মকর স্নান
শিঙ্গীকাড়া বাদ্যে সবদ তৎপার।।
বারিপুরি বিশালক্ষ্মী পুজি কুতুহলে।।"

দ্বিজ রঘুনন্দনের পঞ্চাননমঙ্গল রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই কাব্যে পঞ্চানন ঠাকুরের 'বারাঝরা' আনার জন্য রাজপুত্র গুনবীর যাত্রা করেছে নৌ-পথে অমূল্যপাটনে এই বারুইপুর গ্রাম অতিক্রম করে –

"বাহ্ বাহ্ বলে তবে রাজার নন্দন।
বোড়ালের ত্রিপুরার বন্দিল চরণ।।
বোড়ালের ত্রিপুরার চরণ বন্দিয়া।
বাঁকুইপুরেতে শিশু উত্তরিল গিয়া।।
বিশালনয়নী তারে চরণ বন্দিয়া।"

১৭২৬ খ্রীঃ কবি অযোধ্যারাম রচনা করেন 'সত্যপীরেরা পাঁচালী'। এই কাব্যে রত্নাকর সওদাগরের বানিজ্য যাত্রা উপলক্ষে এই অঞ্চলের গ্রামনাম এসেছে –

'সাকু বানুমরে ভাঁটা বাইল বৈষ্ণবঘাটা
বারুইপুর করিল পশ্চাৎ
বারাশত গ্রামে গিয়া নানা উপাচার দিয়া
পুজা দৈল অনাদি বিশ্বনাথ।।''

একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা কাব্যগীতাদিতে বারুইপুর ও সন্নিহিতগ্রাম নামগুলি উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এই স্থানগুলি খুবই প্রাচীন। বারুইপুর মেদনমল্ল পরগণায় অবস্থিত। ১৫৩৩ -৩৮ এর সময় বাংলার অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ শাহ নিকট থেকে কৃষ্ণদাস দত্ত জায়গীর পান মেদনমল্ল পরগণার। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজা মানসিংহ ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ বাংলা শাসন কর্তা হন। তিনি গুরু কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে ৬টি পরগণা জায়গীর দান করেন। এই ছয়টি পরগণা হলো (১) খাসপুর, (২) মাগুরা, (৩) পাইকান, (৪) আনোয়ারপুর, (৫) হাতিয়ার, (৬) গড় (অর্ধাংশ), কলিকাতার অর্ধাংশ এবং ১৬০৬ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর-এর নিকট থেকে নদিয়ার রাজা পুরস্কারস্বরূপ ১৪টি পরগণা পান। সেখানে মিদুইমুল (মেদনমল্ল) পরগণার নাম নেই। অথচ ১৫৮২ খ্রীঃ সম্রাট আকবরের সময় তার হিন্দু সেনাপতি তেঢরমল বাংলা সুবাতে প্রথম জরীপ করেন। যে জরীপের নাম ''আসলি-জমা-তুমার''। এই জারিপের বর্ণনা দিয়েছেন সম্রাটের মন্ত্রি আবুল ফজল তাঁর সুবিখ্যাত ''আইন-ই-আকবরিতে''। এই গ্রন্থে প্রথম জানা যায়-মেদনমল্ল পরগণা সরকার সাত গাঁওর অধীনে যাহার খাজনা ছিল ১,৮৬,২৪২ আকবরশাহীদাম। এখান থেকে প্রমাণ হয় মানসিংহ বা দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর মেদনমল্ল পরগণার জমিদারী বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের বা নদীয়ার রাজপরিবারকে দিতেপারেন নি। কারণ তাঁদের সহিত কৃষ্ণদাস দত্তের পরিবারের সু-সম্পর্ক ছিল। এসব না জেনে কোন কোন নবঐতিহাসিক প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন – যে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে বা বাঘের সহিত লড়াই করে প্রতাপাদিত্যের প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে প্রতাপাদিত্যের বন্ধু, ভগ্নিপতি ও সেনানায়ক মদন রায়ের নামঅনুসারে মেদনমল্ল পরগণা নাম হইয়াছে। তিনি হয়তো জানেন না মল্ল উপাধি প্রাপ্ত মদনমোহন ছিলেন মিত্র বংশীয়।

তিনি আরো প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মদন রায়ের নামানুসারে রাজপুরের নাম হয়। ইহাও সর্বৈব মিথ্যা ও ভ্রান্ত কারণ মদন রায়ের পিতা রাজবল্লভ দত্ত ''রায়'' উপাধি পান। শাহজাদা সুজা যখন বাংলা র নবাব ছিলেন সেই সময় অর্থাৎ ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে তখনই রাজপুর গ্রামটি গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে রায়চৌধুরী বাড়ীর ''কুলগাঁথায়'' কি বলা আছে তা আমরা দেখি —

জগদীশ তদীয় সুত
রাজবল্লভ তাঁর পুত

অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকারী
বিশেষ বদান্য গুণে
গৌড়রাজ সুজা সসম্মানে
"রায়ো" পধি দেন যত্ন করি।
দান কীর্ত্তি বহুদূর
বর্তমান রাজপুর
তদীয় নামেতে সৃষ্ট হয়।

কেহ তাহা না দেখিয়া ইতিহাসের অপব্যাখ্যা দিতেছেন।

কবি রামচন্দ্র মুখটি মেদনমল্ল পরগণায় জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর নির্দেশে দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, 'হরপার্বতী মঙ্গল' ও 'দুর্গামঙ্গল'।

হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদন-মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বনমাঝে দেখা দিলা তায়।
দত্তকুল-সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রী দুর্গাচরণ।।
সহায় আনন্দময়ী সব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী 'শ্রীমতী' যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান কতভুমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী।।
তস্য পুত্র গুণধাম শ্রীকালীশঙ্কর নাম
অল্পকালে হইল লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয় শ্রীরাজবল্লভ হয়
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর।।
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য ধরা আবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রাম।
অধিকার ইঙ্গরাজী কেহ করি কারসাজী

কিছু গ্রাম করায় নিলাম।
আর মধ্যে বাসস্থান হরিনাভি সমাখ্যান
কিনিলেন দুর্গারম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি গুরুদেব দ্বিজে ভক্তি
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর।।
উভয়ত গুণ যোগী কিন্তু যার বৃত্তিভোগী
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ।
কবীন্দ্র মাতামহকুল ইষ্ট যার অনুকুল
পিতৃপরিচয় কিছু শুন।।
মুখুটী বিখ্যাত কুলে মেলবদ্ধযার কুলে
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ কানাই ঠাকুর-বংশ
আদান প্রদান সব ভাল।।
তিন কুল ভঙ্গ নিজ মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি তাহাতে সন্তান চারি
রামধন তৃতীয় সন্তান।।
তদঙ্গজ রামচন্দ্র ইষ্ট চরণারবিন্দ
একান্ত হৃদয় মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত রচিল বিনয়যুত
সম্প্রতি নিবাস হরিনাভি।।"

'হারপার্ব্বতী মঙ্গলের' গ্রন্থকারের আত্নপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র মুখুটী বারুইপুরের জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর আদেশে এই গ্রন্থ্ রচনা করেন। বারুইপুরের জমিদার রাজবল্লভ রায়ের পিতামহ হইতেছেন, রাজা মদন রায়। এই মদন রায় মোবারক গাজীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এইটুকু পরিচয় হরপার্ব্বতী মঙ্গল হইতে পাইয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে দুর্গামঙ্গল কাব্যটিও তুলে দেওয়া হল ....

"মদনমল্ল অধিপতি ছিল মদন রায়।
দেবানুগৃহীত রায় কি বলিব তায়।
দান্ত, শান্ত, সুশীল, সুধীর, সুগভীর।
যাহা হইতে মামারক গাজীর জাহির।।
তাহার বন্দন পাঁচ কনিষ্ঠ শ্রীরাম।

জমিদারী হৈল তাঁর দেখি গুণগ্রাম।
তাঁহ্বার তনয় দুর্গাচরন চৌধুরী।
অদ্যাপ্পি তাঁহার গুণ সবে স্মরে ঝুরি।
প্রায় অধিকার তাঁর ব্রাহ্মাণের সাৎ।
আনন্দে আনন্দময়ী তাঁহার সাক্ষাৎ।
তার পুত্র কালীশঙ্কর সুশীল সুধীর।।
পিতৃত্বুল্য পুত্র বটে - চতুর সুস্থির।।
অল্পকালে অবনী ত্যাজিলে মহাশয়।
শ্রীরাজবল্লভ রায় তাঁহার তনয়।।
শৌর্য্যবীর্য্য গাম্ভীর্য্য সুচার্য্য সুপ্রতাপে।
শত্রুগ্গণ সশঙ্কিত সারা অঙ্গ কাঁপে।
নবাবের অধিকার লইয়া ইংরাজ।
কলিকাতা কোম্পানীর হইল সমাজ।।
রাজস্ব দেখিয়া বাকী নীলামে হুকুম
খাজনা তলবে বড় লেগে গেল ধুম।।
ওজরু করিয়া রায় না দিল খাজনা।
নীলামে খরিদ কৈল দুর্গারাম কর।
গ্রন্থবাড়ে গুণাগুণ বলিতে সকল।
কবি কেশরী কহে শ্রী দুর্গামঙ্গল।।

উপরে উদ্ধৃত রচনায় দুর্গাচরণই যে আনন্দময়ী (কালী) প্রতিষ্ঠাতা তা 'দুর্গামঙ্গল ও 'হরপার্ব্বতী মঙ্গল' উভয় পুঁথিতেই বলা হয়েছে। বারুইপুরে ছিল রায়চৌধুরীদের সদর কাছারী রাজধানী বলে যা 'হরপার্বতী মঙ্গল' পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। হরিনাভির নিত্যধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (অধ্যক্ষ সম্পাদক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) (১৩৪০ সাল) যা লিখেছেন তার থেকে কিছু অংশ তলে দেওয়া হল ১১৫৭ সালে দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে ব্রহ্মাত্তর দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবী আনন্দ ময়ের মন্দির রাজপুরে ছিল। উপরোক্ত দুর্গামঙ্গলের পরিস্কার লেখা আছে, মদন মদন রায়ের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ দুর্গাচরণ রায়। এই দুর্গা মঙ্গলের এক জায়গায় আছে...... 'নবাবের অধিকার লইল ইংরাজ। কলিকাতা কোম্পানির হইল সমাজ।' অর্থৎ ঐ খৃঃ ১৭৬৫ সালের কথা, যে সময় এদেশে ইংরাজে রাজতুর সুচনায় সূত্রপাত হোল।

কাব্যের বর্ণনানুযায়ী দুর্গাচরণই বারুইপুরে প্রথম আসেন বলে ধরে নেওয়া হয়।

কিন্তু তাঁর পৌত্র রাজা রাজবল্লভ রায়চৌধুরী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টাখানি সঙ্গে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে বারুইপুরে এসে বসবাস করেন এবং পিতামহ দুর্গাচরণের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন। কিছু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এনে নিস্কর, ব্রাহ্মত্র, মহাত্রান প্রভৃতি সর্তে বসবাস করিয়ে সমাজ স্থাপন করেন। কেবল হিন্দু বসিয়েই ক্ষান্ত হলেন না রাজবল্লভ। পীরত্র, খ্রীষ্টত্র দিয়ে বিস্তর জমিতে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের তিনি বসিয়ে ছিলেন তা সেটেলমেন্ট রেকর্ড এবং ১৮৭২ সালের আদমসুমারী দেখলে বোঝা যায়।

বারুইপুর নামটির উৎপত্তি কি বারুই থেকে? পান ব্যবসায়ী বারুই সম্প্রদায়ের বাস এখানে দুই, তিনটি স্থানে ছিল বা এখনো আছে। এই সম্প্রদায়ের বাস দুধনই ও মদারাট গ্রামে সবচেয়ে বেশী আছে। তবে মনে হয় বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে বারুইপাড়ায় এই সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দা। অনেকেই মনে করেন এটাই ছিল সম্ভবতঃ আদি বারুইপুর। আর একদল গবেষক মনে করেন, লৌকি দেবতা বারা ঠাকুরের নাম থেকে বারুইপুর নামের উৎপত্তি। বারাঠাকুরের পূর্ণ মুর্তি হয় না। এঁর মুন্ড মুর্তি প্রায় ক্ষেত্রে একজোড়া একত্রে পূজিত হয়। এই মুন্ডমুর্চি ঘটের অনুরূপ। পার্থক্য এই ঘটের উপর একভাগ উঁচু দিকে বাড়ানো ও পাতার আকৃতি। এই অংশটাই দেবতার মুকুট। মুকুটের উপর বনের লতাপাতা ফুল আঁকা থাকে। মুকুটের ঠিক নীচে বা ঘটের গোলাকার অংশে চোখ, মুখ কান ইত্যাদি উৎকীর্ন ও আঁকা হয়। বারুইপুর সহ এই অঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চলে কোথাও কোথাও পৌষ সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ মুন্ডমুর্তিতে ইহাই পুজা হয়। ঘরের বাহিরে কোনও গাছ তলায়, মাঠে, জলাশয়ের ধারে, গৃহস্তের নির্জন জমিতে বারাঠাকুরের পূজো হয়। মূর্তিটি বা মুর্তিদুটি সারা বছরই সেখানে পড়িয়া থাকে। এতক্ষন বারা ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম শুধুমাত্র দেবতাটি রূপ-লক্ষণ, পূজার সময়টি আপনাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য। বারা শব্দের ধ্বনি সাদৃশ্যমূলক শব্দে বারি। বারি - ঘট, কলসী। পুর শব্দের অর্থ - নগর অর্থাৎ বারা শব্দার্থক ধ্বনি সাদৃশ্য থেকে এই স্থানের নাম বারিপুর বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন।

প্রথম- সূত্র অনুযায়ী বারুই জীবিদের নাম থেকে ও দ্বিতীয়- সূত্র অনুযায়ী বারাঠাকুরের নাম থেকে বারুইপুর নামের উৎপত্তি। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায় পৌরাণিক কাব্যগুলি থেকে যে সব গ্রামের নাম পাওয়া গেছে সেই গ্রাম নাম অনুযায়ী — বিশালক্ষ্মী মায়ের কথা এসেছে — তা হলে স্থানের নাম বিশালক্ষ্মী তলা হল না কেন? কেনই বা কল্যানমাধবের নাম অনুসারে সমগ্র বারুইপুরটা কল্যানপুর হলো না? কিংবা শ্রী চৈতন্যদেবের আগমনের পর এই সব অঞ্চল বৈষ্ণব ভাবধারায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আটিসরা গ্রামে রাত্রি যাপন করেছিলেন, বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে আটিসারা একটি পবিত্র তীর্থ কেন্দ্র, তা হলেও বারুইপুরের নাম আটিসারাও হলো না কেন কিংবা আটঘরা, বারুইপুরের পূর্বে কবে আটটি ঘর নিয়ে আট ঘরা গ্রামের পত্তন হয়েছিল তা জানিনা। -

- তবে দু হাজার খ্রীষ্টপুর্বাব্দে এটি আন্তর্জাতিক বানিজ্য কেন্দ্র ছিল। তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আটঘরা গ্রাম থেকে শুঙ্গ, মৌর্য, পাল, সেন যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে – তবে স্থানটির নাম আটঘরা না হয়ে বারুইপুর হলো কিংবা প্রবল প্রতাপশালি জমিদার মেদনমল্ল পরগণার অধিকারী রাজবল্লভ রায় তার নাম অনুসারে স্থানটির নাম রাজপুর বা রায়পুর হল না কেন বা তার পিতামহ দুর্গাচরণ রায় যিনি এতদ্ঞ্চলের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাম অনুসারে দুর্গাপুর বা হলো না কেন শুধু মাত্র একটি জাতির অধিক বাসের জন্য যদি বারুইপুর নাম হয়ে থাকে তবে গঙ্গায়িডি জাতির জন্য গঙ্গানগর বা সেই রকম কিছু হলোই না বা কেন?

পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বহু মানুষ বারুইপুরকে চেনে ফলের দৌলতে। এখানকার আম, লিচু, পেয়ারা, লকেট ফলের খ্যাতি সর্ব্বভারতীয়। এছাড়াও কালোজাম, গোলাপজাম, সবেদা, জামরুল, আনারস, কলা, পেঁপে, নোনা, আতা, বেল, ডাব, ডালিম, শশা, পানিফল, শাঁখালু, তরমুজ প্রভৃতি ফলের উৎপাদন হয় বারুইপুরে। বারুইপুর মুলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সর্বত্র বাসিন্দাদের মুখে 'বারিপুর' বা 'বারাইপুর' উচ্চারিত হয়। হতে পারে এগুলি বারুইপুর শব্দের উচ্চারণের তারতম্য যাকে বলা হয় অপভ্রংশ। বারিপুর শব্দের অর্থ বারি অর্থাৎ বৃষ্টি, যা কৃষি প্রধান সহায়ক। আদিগঙ্গার তীরে এই জনপদে নানান গাছ-গাছালির প্রাধান্য থাকায় তুলনামুলক ভাবে এ অঞ্চলে বেশ বৃষ্টিপাত হয়। তাই বারি শব্দ থেকে বারুইপুর নামের উৎপত্তি হয়নি তো তা আগামী গবেষকদের ভেবে দেখতে হবে।

আটিসার, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, নাচনগাছা, ডিহিমেদনমল্ল, কল্যানপুর প্রভৃতি গ্রাম নামগুলি কে ক্রমশঃ গ্রাস করে কি করে বারুইপুর আজ একটি পরিচিত স্থান হয়েছে ?

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র বারুইপুর। ভাবতে খুব ভালো লাগে যে, এই পৌরসভা ১৩৪ বছরের প্রাচীন। বহু স্মৃতিভারে বিজড়িত এই পৌরসভা যেন নিজেই ইতিহাস। একদিন তো এটা একটা চারাগাছ ছিল এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যে সেদিন যাঁরা এই চারাগাছটিকে সজীব থাকতে সাহায্য করেছেন – বুকভরা আন্তরিকতা দিয়ে, সুগভীর মমতা দিয়ে সেই সমস্ত পূর্বসুরিদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা আজকের প্রবন্ধের প্রাথমিক কর্তব্য। বর্তমানে তো অতীতকে অস্বীকার করে নয় বরং অতীতের অস্থিপঞ্জরের উপরই তো শোনা যায় বর্তমানের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন। তাই অতীতের সেইসব দিকপাল যাঁরা এই পৌরসভার গঠন থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের জীবন দিয়ে, তাঁদের মহৎ মরণ দিয়ে এই পৌরসভাকে ক্রমোন্নতির পথে উন্নতী করেছেন, তাঁদের সবার কথা আজ আর জানার কোন অবকাশ নেই। কারণ, ১৯৭০ সালে জুলাই মাসের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি বারুইপুরের পৌরসভার সেদিনকার নাগরিকগণ। কলকাতা মহানগরী তথা পশ্চিমবাংলা তখন ঘন অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জিত। সন্ত্রাস-জিঘাংসা জর্জরিত বাংলা সেদিন মেতেছিল স্বজন নিধন যজ্ঞে। স্বদেশ ধ্বংসলীলার খেলায় মেতেছিল কোন কোন রাজনৈতিক দল।

দেশও আত্মবোধ হারিয়ে গিয়ে ধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। ঠিক সেই সময় একদল মানুষের হাতে বারুইপুরের প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন বারুইপুর পৌরসভা আক্রান্ত হয়েছিল। তারা অগ্নিসংযোগ করলো পৌরগৃহে ভস্মীভূত হলো পৌরসভার প্রাচীন মূল্যবান রেকর্ড।

এই অবস্থায় বারুইপুর পৌরসভার ইতিবৃত্ত ছিন্নভিন্ন কিছু লিখিত, কিছুবা প্রবীণ প্রাক্তন পৌরপিতাদের কাছ থেকে শ্রুত। তবু যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নথিভুক্তির সাথে সাথে কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গেজেট ও পশ্চিমবঙ্গ আরকাইভ ডির্পাটমেন্টে সংরক্ষিত নথি সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করলাম। দুঃখের বিষয় দেশ স্বাধীনতার সময় ঢাকা আরকাইভে কিছু তথ্য চলে যায়। যা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েনি। সেই সব উপাদান সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ নিশ্চয়ই বারুইপুর পৌরসভার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলিত করবেন।

গঙ্গাবিধৌত নগরসভ্যতা ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাদের বারুইপুর। যেন সেই রূপসী বাংলার এক ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। একদা প্রবল বেগে ধাবমানা সাগরমুখী স্রোতস্বিনী আদিগঙ্গা কালক্রমে এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, বন্দিনী হয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন নামে গড়েওঠা জলাশয়ে, এখন এখানে বার মাসে তের পার্বণ। ১লা বৈশাখ যার শুরু গোষ্ঠযাত্রা দিয়ে, চৈত্রসংক্রান্তি চড়কের মেলায় তার শেষ।

বারুইপুর গ্রামটি কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। বারুইপুর ছিল বারুজীবী বা বারুইজীবী (পানচাষী) অধ্যুষিত এলাকা। বারুই সম্প্রদায়ের বাস মদারাট ও দুধনই গ্রামে সবচেয়ে বেশী আছে, তবে মনে হয় বারুইপুর পৌরসভায় ৪নং ও ৫নং, ওয়ার্ডের অন্তর্গত দত্তপাড়ায় বসবাসকারী বারুইরা এখানকার আদি বাসিন্দা। এইটাই ছিল আদি বারুইপাড়া, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, পদ্মপুকুর, বলবন ইত্যাদি গ্রাম নাম ছিল। সেই নামগুলিকে প্রায় আত্মোসাৎ করে বারুইপুর আজ দক্ষিণবঙ্গের একটি উজ্জ্বল নাম। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, বারি শব্দের মানে বৃষ্টি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এইস্থানে বেশি বৃষ্টিপাত হত বলে এর নাম বারিপুর, আবার কারও কারও ধারণা বরোঠাকুর ত্রয় পূজার আয়োজন এই অঞ্চলে অধিক থাকায় এই স্থানের মান বারাইপুর ঞ্জ বারিপুর ঞ্জ বারুইপুর। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে। পরবর্তিকালে যারা গ্রাম নাম নিয়ে গবেষণা করছে তারা এ বিষয়ে নিশ্চয় সঠিক মূল্যায়ন করবে, তবে এটা ঠিক বারিপুর নামে জনপদ ছিল।

৩.৫ বর্গমাইল পৌরসভার আয়তন সেদিনও ছিল যা আজও তাই। ওয়ার্ড ছিল ৬টি। ১৯৬৪ সালে ৬টি ওয়ার্ডকে রূপান্তরিত করা হয় ১১টিতে। ১৯৯৩ সালে ১১টি ওয়ার্ডকে রূপান্তরিত করা হয় ১৭টিতে। পৌরসভার আয়তন না-বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রচুর। বর্তমানে এটি মহকুমা পৌরসভা। নীচের সারণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন।

সারণি -১
বারুইপুর পৌরসভার জনসংখ্যা

১৮৭২	–		১৯৪১	–	৭,১৩০
১৮৮১	–	৩,৭৪২	১৯৫১	–	৯,২৩৮
১৮৯১	–	৩৯২২	১৯৬১	–	১৩,৬০৮
১৯০১	–	৪২১৭	১৯৭১	–	২০,৫০১
১৯১১	–	৬৩৭৫	১৯৮১	–	২৬,২২৯
১৯২১	–	৫,১১৪	১৯৯১	–	৩৭,৬৫৯
১৯৩১	–	৬,৪৮৩	২০০১	–	৪৪,৯৬৪

প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্ন সারণি -২তে দেখান হলো। (১৯০১খ্রীঃ থেকে)

সারণি —২

বছর	–	লোকসংখ্যা	মোট বৃদ্ধি	–	শতকরাবৃদ্ধি
১৯০১	–	৪২১৭			
১৯১১	–	৬৩৭৫	ĩ২১৫৬	–	ĩ৫১.১৭
১৯২১	–	৫১১৪	–১২৬১	–	–১৯.৭৮
১৯৩১	–	৬৪৮৩	ĩ১৩৬৯	–	ĩ২৬.৭৭
১৯৪১	–	৭১৩০	ĩ৬৪৭	–	ĩ৯.৯৮
১৯৫১	–	৯,২৩৮	ĩ২১০৮	–	ĩ২৯.৫৭
১৯৬১	–	১৩৬০৮	৪৩৭০	–	৪৭.৩০
১৯৭১	–	২০.৫০১	৬৮৯৩	–	ĩ৫০.৬৫
১৯৮১	–	২৬.২২৯	ĩ৫৭২৮	–	ĩ২৭.৯৪
১৯৯১	–	৩৭,৬৫৯	ĩ১১৪৩৬	–	ĩ৪৩.৫৮
২০০১	–	৪৪৯৬৪	৭৩০৫	–	১৯.৪০

৩.৫ বর্গমাইল পৌরসভার আয়তন সেদিনও ছিল যা আজও তাই, পৌরসভা আয়তনে নাবাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিভাবে ঘটেছে তা উপরোক্ত সারণি ১ ও ২ দেখলে বোঝা যাবে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কমিশনার বারুইপুরের মহকুমাশাসক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে একটি টাউন কমিটি গঠন করেন। এই টাউন কমিটি গঠিত হয় (১) ব্রাহ্মণপাড়া, (২) বারুইপাড়া, (৩) খৈপাড়া, (৪) কুমারপাড়া, (৫) বৈষ্ণবপাড়া, (৬) মণ্ডলপাড়া, (৭) পুরাতন বাজার এবং শাসন মৌজায় ব্রহ্মণপাড়াকে নিয়ে, যেখানে মোট ৮৮৪টি পরিবার বসবাস করতো, তার মধ্যে ২৪১ জন চাষী সম্প্রদায় এবং ৬৪৩ জন

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। প্রথম টাউন কমিটি গঠিত হয় (১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (২) রাজকুমার রায়চৌধুরী, (৩) আনন্দকুমার রায়চৌধুরী, (৪) ডাঃ মহেশ ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুচরণ মিত্রকে নিয়ে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬নং বঙ্গীয় পৌর আইন অনুযায়ী বারুইপুর পৌরসভা গঠিত ও অনুমোদিত হয় ২২শে মার্চ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায়চৌধুরী সরকার মনোনীত প্রথম পৌরপ্রধান হন ও মনোনীত সদস্য ঠাকুরদাস রায়চোধুরী, আনন্দকুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী, কাশীনাথ ব্যানার্জী ও মুনসেফ হরিনারায়ণ রায়কে নিয়ে গঠিত হলো বারুইপুর পৌরসভা। বারুইপুর পৌরসভার জন্য জমিদান করেন রায়চৌধুরী পরিবার, সেই জমিতে কুঁড়েঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল বারুইপুর পৌরসভা। ১৯৩৯ সালে শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী পৌরপ্রধান থাকাকালীন কুঁড়েঘরটিকে পাকা একতলা গৃহ নির্মাণ করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পৌরপ্রধান থাকার সময় শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী বারুইপুরে প্রথম গ্রন্থাগারের জন্য পূরাতন বাজারের কাছে জমি পৌরসভা থেকে লিজের ব্যবস্থা করেন ও খেলাধুলার প্রসারের জন্য জেলা ক্রীড়া সংঘ ভবনের নির্মাণের জন্যও পৌরসভা থেকে জমি লিজের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তিনি মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল করার জন্য নিজের পারিবারিক জমি পর্যন্ত দান করেছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পরবর্তী সময়ে কোন এক পৌরপ্রধান রবীন্দ্রভবনের পাশে ঐ মূল্যবান জমিটি বিক্রয় করে দেন , যদিও স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহায়তায় উক্ত জমিতে কংক্রীটের প্রাচীর হতে পারেনি। ১৯৭০ সালের পৌরপ্রধান ললিত রায়চৌধুরী সি.এম.ডি.এ.-র সদস্য হন। সেই সময় থেকেই পৌর পরিষেবার ব্যাপক সুযোগ আসে, এই সময় বর্তমান পৌরভবন, রবীন্দ্রভবন, ওভারহেড রিজার্ভার ২টি নির্মাণ করে পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়। একই সময় প্রায় ২১ লক্ষ টাকা খরচ করে মাটির রাস্তা ও ড্রেনগুলি, পাকা পিচের রাস্তা, পাকা ড্রেনের মাধ্যমে জল নিকাশী ব্যবস্থা শুরু হয়। তারপর রাজনীতির শিকার হয় এই পৌরসভা, পৌরবোর্ড ভেঙে দিয়ে সরকার ১৯৭৭ সালে পৌর প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মৃণাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বামপন্থী পৌরবোর্ড পৌরসভা পরিচালনা করেন। এই সময়ে হেল্‌থ ইউনিট স্থাপিত হয়। এছাড়াও ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টি ওয়ার্ডে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীগণ নির্বাচিত হন। জনগণের বৃহৎ অংশ দ্বারা স্বীকৃত হল। জনগণের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সূচক মনোভাব দ্বারা গণতান্ত্রিক পৌরবোর্ড গঠন হল। পৌরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ সেন সি.এম.ডি. এ.-র ১ম পর্যায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল নিকাশী ব্যবস্থার কাজ শেষ করান। তিনি পৌরভবনটি বর্ধিত করান। ১৩৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলা পৌরপ্রধান হন ইরা চ্যাটার্জী । তিনি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে এগোচ্ছেন। প্রথমত তিনি পৌরপ্রধান হয়ে দীর্ঘ ১০/১৫ বৎসর সরকারী অডিট করান। দ্বিতীয়ত তিনি কম্পিউটার-এর মাধ্যমে প্রতিটি হোল্ডিং এর মালিক কে, সেই হোল্ডিং এর পৌরকর কত? কত দিনের পৌরকর দেওয়া

আছে। কতটি জমি উক্ত হোল্ডিং-এর এবং তার বাড়ীর নক্সা অনুমোদন-এর সময় পর্যন্ত কম্পিউটার দেখে বলা যাবে। এবার আমার দেখতে পাবো পৌরসভার বিভিন্ন বিষয় ও আমরা সারণি - ৩,৪,৫,৬ এর মাধ্যমে জানতে পারব।

সারণি – ৩

ট্রেড লাইসেন্স ছবক্ত্রস্তন্দ্ব ম্নভ্তস্তন্দ্বভ্তস্তন্দ্বগ্ন

ওয়ার্ড নং – ১ ঃ ৬২টি ওয়ার্ড নং – ২ ঃ ১০৩টি

ওয়ার্ড নং – ৩ ঃ ২৫১টি ওয়ার্ড নং – ৪ ঃ ৫৯টি

ওয়ার্ড নং – ৫ ঃ ১০৩টি ওয়ার্ড নং – ৬ ঃ ১১৫টি

ওয়ার্ড নং – ৭ ঃ ৬৫টি ওয়ার্ড নং – ৮ ঃ ২২১টি

ওয়ার্ড নং – ৯ ঃ ৪১টি ওয়ার্ড নং – ১০ ঃ ১২৯টি

ওয়ার্ড নং – ১১ঃ ১১২টি ওয়ার্ড নং – ১২ ঃ ৪৪৫টি

ওয়ার্ড নং – ১৩ঃ ৪২টি ওয়ার্ড নং – ১৪ ঃ ৭৬টি

ওয়ার্ড নং – ১৫ঃ ১৮৯টি ওয়ার্ড নং – ১৬ ঃ ৬৬টি

ওয়ার্ড নং – ১৭ ঃ ২৭৫টি

সারণি – ৪

(বারুইপুর পৌরসভার ওয়ার্ড অনুযায়ী জনসংখ্যা, ২০০১-এর লোকগণনা অনুযায়ী)

ওয়ার্ড নং	বাড়ি	হোল্ডিং	জনসংখ্যা	ভোটার সংখ্যা
১	৬৩০	৭০৩	২৬১৪	১৮০৯
২	৭৫৬	৮২২	৩১০৮	২২৯০
৩	৫৪৬	৬০৮	২৪৪২	২৪১৭
৪	৬৫৪	৭৩৪	৩০১৭	২০৩৭
৫	৫৬৪	৬৭১	২৭৩৯	২০৭৬
৬	৬২৫	৭২৮	৩১৯৯	১৯০৪
৭	৪৪২	৫৪০	১৮৪৯	১২৭৩
৮	৭১৪	৮৬০	৩২৩৬	
৯	৩৬৭	৩৮৫	২০৩৬	১৩৮২

১০	৮৯০	৯২০	৩৮৩৭	২৪১৬
১১	৪৫০	৫১০	১৯২৯	৯৫৫
১২	৩৮২	৪২৫	১৯৮৭	১৫৪১
১৩	৬৭৪	৭৫১	২৮৪৬	১৮৪০
১৪	৬৭৫	৭০৩	৩৪৫৯	৭৩০
১৫	৪০০	৪৬২	১৯৩৬	১৩০৭
১৬	৫৭৬	৬১৮	২৮৬০	১৮৮৪
১৭	২৬৩	২৮২	১৮৭০	১৩৯০

সারণি - ৫ (ব্যবহৃত জমির)

	ভূমির প্রকৃতি বর্ণনা	শতকরা হার	
		১৯৩২	১৯৬২
১)	বাসস্থান সম্বন্ধীয় সমতল ভূমি	১৬.৯৯	১৮.৫৩
২)	বাণিজ্যিক সম্বন্ধীয় সমতল ভূমি	০.৩৩	১.৪০
৩)	শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় সমতল ভূমি	০.০২	০.১৮
৪)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০.০০৫	২.৩১
৫)	পানপাতা চাষ (বরজ)	২.১২	১.২২
৬)	বাগান	২৪.২৮	২৫.১১
৭)	চাষের উপযুক্ত	১৪.৩০	১২.৭৬
৮)	উচ্চ সমতল ভূমি	১৫.০০	১০.৫৬
৯)	জলজভূমি	১০.১৬	৮.৮৯
১০)	গঙ্গা	০.৫৪	০.৪৫
১১)	রাস্তা	৪.৪৮	৫.৫৩
১২)	ড্রেন	০.৪২	০.৪৪
১৩)	মসজিদ	০.০৫	০.০২
১৪)	মন্দির	০.০২	০.০৪
১৫)	গোর দেওয়া (কবর)	০.১৫	০.১৩
১৬)	শ্মশান	০.০২	০.০৩
১৭)	কার্যালয়	০.০০	০.১৬
১৮)	পতিত জমি (কাজে লাগান)	১১.১৬	১২.১১

সারণি – ৬

১) রাস্তা ঃ ১৩০ কি.মি.

(ক) পিচের রাস্তা ঃ ৩২ কিমি
(খ) ঝামা ও খোয়ার রাস্তা ২২ কিমি
(গ) ইটের পেমেন্টর রাস্তা ৩৯ কিমি
(ঘ) কাঁচা রাস্তা ৩৭ কিমি

মোট রাস্তা ১৩০ কিমি

২) ড্রেন ঃ ৭০.০৫ কি.মি.
(ক) ইটের গাঁথুনির পাকা ড্রেন ৩৯.০৫ কিমি
(খ) মাটির কাঁচা ড্রেন ৩১.০০ কিমি

৭০.০৫ কিমি

৩) পানীয় জল ঃ (ক) পাম্প হাউস - ১২টি
এখান থেকে পাইপ লাইনের দ্বারা ১৭ কি.মি. এলাকায় জল সরবরাহ করা হয় এবং এই ১৭ কি.মি. পাইপ লাইনের উপর বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রায় ৫০০ পিস জলের স্ট্যান্ড-এর মাধ্যমে নাগরিকদের পানীয় জল দিনে দুবার সরবরাহ করা হয়। তাছাড়াও ১৭টি ওয়ার্ডে ১৩৩৪ টি বাড়িতে জলসরবরাহের লাইন দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৩১শে মার্চ ২০০৩ অবধি।
(খ) গভীঃ নলকূপ ১০০০ ফিট-এর – ৫৮টি প্রায়,
(গ) অগভীর নলকূপ – প্রায় ২৬৮টি।
আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের সরবরাহের কাজ বারুইপুরের বিধায়কের প্রচেষ্টায় কে.এম. ডি. এ.-এর অর্থানুকুল্যে শুরু হয়েছে।

৪) শিক্ষা ঃ (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭টি
(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি
(ঘ) টাউন গ্রন্থাগার ২টি
(ঙ) পৌরসভা পরিচালিত শিশুগ্রন্থাগার ও কম্পিউটার কেন্দ্র– ১টি

৫) খেলাধুলা ঃ ক) জেলা ক্রীড়া সংঘ অনুমোদিত ক্লাব – ৮টি (পূর্ণ), ৩২টি আংশিক।
খ) খেলার মাঠ – ১টি পূর্ণাঙ্গ সহ ৪টি
গ) সুইমিং পুল – ১টি

৬) স্বাস্থ্য ঃ ক) মহকুমা হাসপাতাল ১টি
খ) হেলথ সেন্টার ১টি
গ) সুলভ শৌচাগার ৩টি

৭) পরিবহন ঃ ক) সরকারি বাসরুট ১টি (টারমিনাস সহ)

খ) বেসরকারি বাসরুট — ৩টি (টারমিনাস সহ)
গ) ট্রেকার
ঘ) অটো রিক্সা
ঙ) ট্রেন রুট — ২টি
চ) পেট্রোলপাম্প — ৩টি

৮)বিদ্যুৎ ঃ ক) রাস্তার আলোকস্তম্ভ — ৫৭৩৭টি,

৯) প্রমোদ ঃ ক) সিনেমা হল — ৩টি
খ) মঞ্চ — ১টি

১০) হাট/বাজার ঃ ক) ২টি বাজার
খ) ১টি হাট (রবিবার / বুধবার) (পুরাতন বাজার)

১১) সরকারি কার্যালয় / আদালত ঃ
ক) আদালত — ১টি
খ) সরকারি কার্যালয় — মহকুমা কার্যালয়, পুলিশ কার্যালয়
মহকুমা ভূমি কার্যালয়, বিদ্যুৎ দপ্তর
পি.ডব্লু. ডি কার্যালয়, ইরিগেশন দপ্তর
ব্লক ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর
ব্লক বিদ্যুৎ দপ্তর
রেজেষ্ট্রি দপ্তর
মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

১৯৭০ সালে জুলাই মাসে কিছু দুর্বৃত্তের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল এই পৌরসভা। ভস্মীভূত হয় পৌরসভার মূল্যবান রেকর্ডপত্র, বিভিন্ন সময় যাঁরা পৌরসভা পরিচালনা করেছেন তাঁদের নাম। পশ্চিমবঙ্গে আর বাইরে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, কিছু তথ্য পৌরসভা থেকে পাওয়া গেছে আর কিছু জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গেজেটগুলো থেকে সংগৃহীত করা সম্ভব হয়েছে। তবে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভের সময় কিছু তথ্য চলে গেছে, যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যাইহোক, বিভিন্ন সময়ে যাঁরা পৌরপ্রধান হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা ঃ-

পৌরপ্রধান ঃ-		
	রাজকুমার রায়চৌধুরী	১৮৬৯
	মহেশ ঘোষ	১৮৭৮
	প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী	১৮৮০
	ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	১৮৯৪
	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯০২, ১৯০৫ - ১৯০৮
	দুর্গাদাস রায়চৌধুরী	১৯০৩–১৯০৪, ১৯০৮–১৯১৫
	শিবদাস রায় চৌধুরী	১৯১৮-১৯২৪
	সুবোধনাথ দত্ত	১৯২৫
	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	১৯৩০–৩২

শশীন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী	১৯৩৬ – ৩৯
হরেন্দ্রনাথ পাঠক	১৯৩২–৩৬, ৩৯ – ৪২, ৫৬ – ৫৮
শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৯৪২–৫৬
শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৮ – ৬৮
ললিতকুমার রায়চৌধুরী	১৯৬৮ – ৭৮
মৃণাল চক্রবর্তী	১৯৮১–১৯৯৪
রবীন্দ্রনাথ সেন	১৯৯৪ – ২০০০
ইরা চ্যাটার্জী	২০০০

মাঝে স্থানীয় বি. ডি.ও. শ্রী বিনয়কুমার সেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত পৌর প্রশাসক নিযুক্ত হন। মনোনীত বিভিন্ন সময়ে যাঁরা উপপৌরপ্রধান হয়েছেন তাঁদের তালিকা ঃ

ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	১৮৯১
ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	১৮৯৫
হরিদাস রায়চৌধুরী	১৯১৬–২০
রমেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী	১৯২০–২৫
ডাঃ পুলিনকুমার রায়চৌধুরী	১৯২৫–২৬
অজিত ব্যানার্জী	১৯২৬–১৯৩৪
অনাথবন্ধু গাঙ্গুলী	১৯৩৬–৩৯
হরিদাস মণ্ডল	১৯৩৯ – ৪২
বলাই ঘোষ	১৯৪২ – ৫২
সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	১৯৫৪ – ৫৮
ললিত রায়চৌধুরী	১৯৫৮–৬২
হারানচন্দ্র অধিকারী	১৯৬৮
তপন ভট্টাচার্য	১৯৮১
দেবেশ চক্রবর্তী	১৯৮৬
প্রশান্ত অধিকারী	১৯৯০
শৈলেন ঘোষ	১৯৯৪
হাফিজুর রহমান	২০০০

যাঁরা বিভিন্ন সময়ে পৌরসভায় কমিশনার (কাউন্সিলার) হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা

১৮৯১ ফাইল স্তু ৩৭ঙ্গ৩৫ ৬ই ফেব্রুয়ারী

১) প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী, (২) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, (৩) ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী, (৪) লাবণ্যচন্দ্র মিত্র, (৫) যদুনাথ ভট্টাচার্য, (৬) ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী।

১৮৯৪ ফাইল নং ৪ স্তু ৩৭ঙ্গ২ ১৬ই জানুয়ারী

(১) ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী, (২) সৈয়দ মহম্মদ আলি কাজী, (৩) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী

(৪) দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, (৫) পূর্ণচন্দ্র মিত্র, (৬) ব্রজেন্দ্র রায়চৌধুরী।

১৯২৫ ফাইল নং ঙ্ক ত্ত৩৭ঙ্গ২ ৪ঠা জুলাই

(১) সুবোধনাথ দত্ত, (২) শিবদাস রায়চৌধুরী, (৩) অজিতকুমার ব্যানার্জী, (৪) রমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৫) পুলিন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৬) সৈয়দ মহম্মদ ইউসুফ, (৭) গনেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, (৮) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৯) সুশীলকুমার রায়চৌধুরী।

১৯৩৪ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

১) হরেন্দ্রনাথ পাঠক, (২) অজিতকুমার ব্যানার্জী, (৩) সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী, (৪) হাজী মহম্মদ ইউসুফ, (৫) রতনেশ্বর চ্যাটার্জী, (৬) শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৭) সুশীলকুমার রায়চৌধুরী (৮) কালিদাস রায়চৌধুরী (৯) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী।

১৯৩৬ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

১) শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (২) অনাথবন্ধু গাঙ্গুলী, (৩) হরেন্দ্রনাথ পাঠক, (৪) শিবদাস মুখার্জী, (৫) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (৬) সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, (৭) বামাচরণ পাত্র, (৮) অজিতকুমার ব্যানার্জী, (৯) হাজি মহম্মদ ইউসুফ।

১৯৩৯ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

হরেন্দ্রনাথ পাঠক, হরিদাস মণ্ডল, শিবদাস মুখার্জী, শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, অনিলকুমার চৌধুরী, অজিতকুমার ব্যানার্জী, হাজি মহম্মদ ইউসুফ, মৌলবী নাজিমুল নস্কর।

১৯৪৪ (জাতীয় গ্রন্থাগারে গেজিটেয়ার থেকে সংগৃহীত)

শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী , হরিদাস মণ্ডল, বলাই ঘোষ, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, শিবদাস মুখার্জী, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, মৌলবী নাজিমুল লস্কর, বলাইদাস রায়চৌধুরী, সতীন্দ্রনাথ পাঠক।

১৯৪৮ (জাতীয় গ্রন্থাগারের গেজেটিয়ার থেকে সংগৃহীত)

(১) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (২) বলাই ঘোষ, (৩) সতীন্দ্রনাথ পাঠক, (৪) মৌলবী নাজিমুল নস্কর, (৫) শিবদাস মুখার্জী, (৬) শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৭) বলাইদাস রায়চৌধুরী, (৮) সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, (৯) অনিলকুমার রায়চৌধুরী।

১৯৫২ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (২) বলাই ঘোষ, (৩) শশাঙ্কদেব চ্যাটার্জী, (৪) সতীন্দ্রনাথ পাঠক, (৫) প্রসাদচন্দ্র পাল, (৬) শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (৭) বলাইদাস রায়চৌধুরী, (৮) শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত (৯) কিশোরীমোহন ব্যানার্জী ।

১৯৫৪ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, (২) সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, (৩) শশাঙ্কদেব চ্যাটার্জী, (৪) বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, (৫) হরেন্দ্রনাথ পাঠক, (৬) দিলীপকুমার রায়চৌধুরী (৭) মণিগোপাল সাহা (৮) বীরেশ্বর ব্যানার্জী (৯) শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত।

এই বোর্ডের পৌরপ্রধান শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই কারণে ২৩-৯-৫৪ তারিখে পৌরপ্রধান হিসাবে পদত্যাগ করেন। সেই সময় হরেন্দ্রনাথ পাঠক পৌরপ্রধান হন। কিছুদিন এর মধ্যে শৈলেন বাবু পরলোকগমন করলে ৩ নং ওয়ার্ড থেকে নিরোদলাল রায়চৌধুরী ২৪-৪-৫৬ তারিখে কমিশনার নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ ১৯-১-৫৮ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) শশাঙ্কদেব চ্যাটার্জী, (২) ললিতকুমার রায়চৌধুরী, (৩) বসন্তকুমার রক্ষিত, (৪) কমলেন্দু রায়চৌধুরী (৫) অমরনাথ ভট্টাচার্য (৬) কালীচরণ রায় (৭) শৈলেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী (৮) অনিল কুমার রায়চৌধুরী, (৯) মণিগোপাল সাহা।

১৯৬৪ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) ললিতকুমার রায়চৌধুরী, (২) কালীচরণ বাগ, (৩) হারানচন্দ্র অধিকারী, (৪) বসন্তকুমার রক্ষিত, (৫) আশুতোষ পাল, (৬) মৃণাল চক্রবর্তী, (৭) শুভেন্দু দত্ত, (৮) মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী, (৯) দামোদর মুখার্জী, (১০) নিকুঞ্জবিহারী দাস, (১১) শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাচনের পর আদালতের মোকর্দমায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুন আগের বোর্ড পৌরসভা পরিচালনা করতে থাকেন। আদালতের মোকর্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর ১৯৬৪ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৬৮ সালের ৯ই মে পৌরবোর্ড গঠন করা হয়।

১৯৭৮ সালে বোর্ড সুপারসিট হয়। ১৯৭৮ সালে স্থানীয় চ.জ্জ্খ. শ্রী বিনয়কুমার সেন পৌর প্রশাসক মনোনীত হন।

১৯৮১ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, (২) তপন ভট্টাচার্য, (৩) অসিতকুমার ঘোষ, (৪) অসীম চ্যাটার্জী, (৫) চিন্ময়নারায়ণ চৌধুরী, (৬) নির্মল পাল, (৭) দেবেশচন্দ্র সাহা, (৮) নির্মলকুমার ব্যানার্জী, (৯) পশুপতি দত্ত, (১০) শান্তিগোপাল ব্যানার্জী, (১১) প্রশান্ত অধিকারী।

১৯৮৬ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, (২) ডঃ দেবেশ চক্রবর্তী, (৩) শৈলেন ঘোষ, (৪) চিন্ময়নারায়ন চৌধুরী, (৫) নির্মল পাল, (৬) রাজেন্দ্রনাথ পাল, (৭) নির্মলকুমার ব্যানার্জী, (৮) বিকাশ

দত্ত, (৯) শান্তিগোপাল ব্যানার্জী, (১০) প্রশান্ত অধিকারী, (১১) হরিপদ দাস।

১৯৯০ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

১) মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, (২) তপন চক্রবর্তী, (৩) চিন্ময়নারায়ন চৌধুরী, (৪) নির্মল পাল, (৫) রাজেন্দ্রনাথ পাল, (৬) শক্তি রায়চৌধুরী, (৭) বিকাশ দত্ত, (৮) শান্তিগোপাল ব্যানার্জী, (৯) প্রশান্ত অধিকারী, (১০) হরিপদ দাস, (১১) শৈলেন ঘোষ।

১৯৯৪ (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) রবীন্দ্রনাথ সেন, (২) শৈলেন ঘোষ, (৩) দুলাল হালদার, (৪) হরিপদ দাস, (৫) তপতী নস্কর, (৬) ইন্দিরা বিশ্বাস, (৭) শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, (৮) নির্মল পাল, (৯) বিকাশ দত্ত, (১০) মায়া গায়েন, (১১) রীনা মাইতি, (১২) ইলা বসু, (১৩) স্বাতী রায়চৌধুরী, (১৪) স্বপন মণ্ডল, (১৫) গোবিন্দ পাল, (১৬) মৃণাল চক্রবর্তী (১৭) রাজেন্দ্রনাথ পাল।

২000 (পৌরসভা থেকে সংগৃহীত)

(১) ইরা চট্টোপাধ্যায়, (২) হাফিজুর রহমান, (৩) শৈলেন ঘোষ, (৪) তপতী নস্কর, (৫) স্বপন মণ্ডল, (৬) সুভাষ রায়চৌধুরী, (৭) নির্মল পাল, (৮) মিলু গুহঠাকুরতা, (৯) মিতা দত্ত, (১০) অমল দাস, (১১) সুপ্রভা ব্যানার্জী, (১২) মৃণাল চক্রবর্তী (১৩) মনোরমা মণ্ডল, (১৪) ইলা বসু, (১৫) বকুল মণ্ডল, (১৬) দুলাল হালদার, (১৭) মনোরঞ্জন পুরকাইত।

বারুইপুরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে। হরেক রকমের বাড়ি, পাশাপাশি ঠাসাঠাসি। নানা সমস্যায় জর্জরিত বারুইপুর পৌরসভা, পুরবাসীদের বহু চাহিদা, পুরসভার আর্থিক অবস্থা সীমিত। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মত অবস্থা। এরই মধ্যে নাগরিক পরিষেবা দিয়ে চলেছে বারুইপুর পৌরসভা তার ক্ষমতা অনুযায়ী।

ঃ তথ্য সূত্র ঃ

১) বিপ্রদাস পিপলাই,- 'মনসা বিজয়'
২) শ্রী বৃন্দাবন দাস - 'শ্রী শ্রী চৈতন্য বাগবত'
৩) কবি কঙ্কন মুকুন্দ - 'চন্ডীমঙ্গল'
৪) কবি কৃষ্ণরাম দাস - 'রায়মঙ্গল'
৫) কবি রুদ্রদেবের - 'রায়মঙ্গল'
৬) দ্বিজ রঘুনন্দনের - 'পঞ্চানন মঙ্গল'
৭) কবি অযোধ্যায়ামের - 'সত্যপীরের পাঁচালী'
৮) গাজী সাহেবের গান 'সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায়' - নগেন্দ্রনাথ বসু
৯) গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু - 'বাংলায় লৌকিক দেবতা'
১০) জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, 'আদিগঙ্গা' (পত্রিকা) দক্ষিণ ২৪ পরগণা সংখ্যা
১১) অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী - 'বারুইপুরের অতীত ও বর্তমান'
১২) ডঃ দুলাল চৌধুরী - প্রসঙ্গ বারা ঠাকুর

প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর

কৃষ্ণকালী মণ্ডল

__সূচনা ঃ__

প্রত্নতত্ত্ব এমন একটি বিষয় যাকে সাধারণ একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। একটি বিস্তৃত পটভূমিকায় প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়। পরিবেশ, স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার লাভ ঘটে এবং অনুকূল পরিস্থিতি, জীবনজীবিকার নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে তার ক্রমোত্তরণ ঘটে। মানবজীবনচর্চায় তৎকালীন ধারা অনুযায়ী লোকঅনুকৃতিগুলি ধারাবাহিকভাবে বংশপরম্পরায় অনুসৃত হতে থাকে – গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতির এক একটা বিশেষ রীতি। শিল্পসংস্কৃতিতে, নিত্যকার জীবন কর্মে, ব্যবহার্য আসবাবপত্রে, নির্মাণ শিল্পে, গঠনতন্ত্রে, রূপচর্চায়, ব্যবহৃত জিনিষপত্রে, শিল্পকলায়, কলাকৌশল প্রয়োগে, রুচিবোধ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে, গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যে, জীবনজীবিকায়, শিল্পসৌকর্যে আপন আপন বিশিষ্টতার ছাপ রেখে যায়। যুগ পাল্টায়। যুগের প্রচলিত ধারাবাহিকতা পাল্টায়। নানান কারণের উপর নির্ভর করে – কতটা পরিবর্তন হল আর কতটা প্রচলিত রইল। সবই নির্ভর করে যুগপরিবর্তনে কোন্ গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা থাকলে কিছু কিছু কাজকর্মে আগের মানুষেরা আবার বসতি বিস্তার করল তার উপর। গোষ্ঠীর আক্রমণ, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে যায়। নতুন ধরনের লোককৃতি নজরে আসে, তাও চলে একটা দীর্ঘকালীন সময় ধরে, যতদিন না একটা প্রাকৃতিক বিরূপতা বা বিশৃঙ্খলা এসে উপস্থিত হয়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, নদীতীরের হঠাৎ অবলুপ্তি, নদী ও সমুদ্রের ভাঙন, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয়, ভূ-অবনমন, খাদ্যাভাব, তুষারপাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিরূপতায় মানুষের সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। হিংস্র পশুবে নিয়ে আলোচনা। অবশ্য বারুইপুরের প্রত্নতত্ত্ব। সমাজজীবনের অবলুপ্তির কারণ হয়। অনুকূল পরিস্থিতিতে বহুকাল পরেও হয়ত আবার সেই স্থানে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে অন্যজনপদের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে– ধীরে ধীরে সেই সময়কার জনজীবনের বিকাশ ঘটতে থাকে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই বারুইপরকে নিয়ে আলোচনা। অবশ্য বারুইপুর প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে বারুইপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা- পিয়ালী নদীতীর বরাবর অবস্থিত আটঘরা-সীতাকুণ্ড, মালঞ্চ-মাহিনগর-মল্লিকপুর-দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বিড়াল-ধামনগর-ধোপাগাছি, দক্ষিণ কল্যাণপুর-পুরন্দরপুর-নিহাটা, শাসন, রামনগর- উত্তরভাগ অঞ্চলগুলির সম্মিলিত প্রত্নসম্পদই বারুইপুরের সামগ্রিক প্রত্ন-ইতিহাসের রূপরেখা তৈরী করে।

মনে রাখা দরকার যে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা তথা বিচার বিশ্লেষণ ও যুগ বিচারকে কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত রাখা যায় না। অঞ্চলগত বা প্রদেশগত বৈশিষ্ট্যের

ছাপ থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তা সারা দেশের প্রত্ন -ইতিহাসের সামিল। কাজেই আলোচনার সময় যে সব বিশ্লেষণ বা যুগবিচার করা হয়েছে তা মোটামুটি সর্বভারতীয় ও বাংলার প্রেক্ষাপটে এবং পরিচিত ও উৎখনিত প্রত্নস্থলগুলিতে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলির সাযুজ্য বিচার করে একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূ-প্রকৃতি ঃ

বারুইপুর কেন সমগ্র চব্বিশ পরগনাকেই বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ অর্বাচীন কালের ভূ-খণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। ভূ-তত্ত্ববিদরা একথা বলেছেন তার কারণ তাঁদের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছরের নিরিখে। ভূ-তাত্ত্বিকদের আলোচনার 'একক' বা Unit হচ্ছে লক্ষ বছর। সেই জন্য বিশ-পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরাবস্তুকেও তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে 'Recent' বা আধুনিক বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একশো বছরের অধিক প্রাচীন কোন মনুষ্য সৃষ্ট বস্তুকে যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাকে আমরা পুরাতাত্ত্বিক আলোচনার আওতায় আনতে পারি।

অন্যদিকে ভারতীয় প্রত্ন ও ইতিহাস চর্চা খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র ইংরেজ আমলের শেষের দিকে তা মোটামুটি সংগঠিত রূপ পায়। তাই তৎকালীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা ছিল যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় খুব বেশী দিন আগে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেনি। সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ভূ-ভাগ ও জনবসতি সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও অনেকের মধ্যেই আছে।

কলকাতার মেট্রো রেলের ভূ-গর্ভ খননকালে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এবং তৎপূর্বে ওল্ডহাম ও অন্যান্য ভূ-বিজ্ঞানীদের তথ্য থেকে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের ভূ-ভাগ একটি মূল ভূমিশিলাস্তরের উপর গঠিত। গণ্ডোয়ানা রেঞ্জের শেষাংশ থেকেই তার সৃষ্টি। ভূমির উপরিভাগ ঐ শিলাস্তরের উপর নদীবাহিত পলিদ্বারা এবং সমুদ্র খাড়ির বালুকা দ্বারা স্তরে স্তরে গঠিত। সমুদ্র সান্নিধ্য হওয়ায় এবং ভূ-স্তর আলগা পলিমাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় প্রাকৃতিক ভূ-বিপর্যয় বা ভূমিকম্প ইত্যাদির সময় নিম্নাংশে একটি শূন্যগর্ভ সৃষ্টি হওয়ার ফলে মাঝে মাঝেই ভূ-স্তরের অবনমন ঘটে থাকে। এরূপ অবনমনে অনেকগুলি উদাহরণ দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় রয়েছে। মেট্রো ভূ-গর্ভের মত ক্যানিং, বোড়াল, মাহিনগর, ধোপাগাছি, রামনগর-উত্তরভাগ, সাগরদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ২৫–৪৫ ফুট গভীরে সুন্দরী জাতীয় ম্যানগ্রোভ গাছ সমেত উপরের ভূমিতলের অবনমনগএঘটেছে যা বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে।

সাম্প্রতিককালে বর্তমান লেখকের এক ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে যে বারুইপুরের ধোপাগাছির DBW ইটখোলার প্রায় ২৫ থেকে ৪০ ফুট নীচে এরূপ ভূ-অবনমনের রয়েছে সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সেখান থেকে সুন্দরী জাতীয় গাছের কাণ্ড, কাণ্ডের নিম্নাংশ ও শিকড়, বোভিড (Bovid) বা গো-মহিষ জাতীয় প্রাণীর পাঁজর ও হাড়গোড়, লবণাক্ত জলাভূমির ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদের

বয়স ভূমি গঠনের বৈচিত্র্য – জলাভূমি ও বনভূমি ইত্যাদি ঃ

উপরোক্ত ভূ-প্রকৃতি ও নদীগুলির পলিবহতার ফলে বারুইপুর অঞ্চলের মৃত্তিকা গঠনের বিশেষত্ব রয়েছে। প্রধানত পলিগঠিত উর্বর মৃত্তিকা দ্বারা এই অঞ্চলে অধিকাংশ স্থলভাগ গঠিত। আর নদীদ্বারা এই পলিবাহিত হওয়ায় এবং মোহনা অঞ্চলে নদীর গতিবেগ কম হওয়ায় নদী গর্ভগুলি পলি ভরে নদীবক্ষ ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে নদীর নৌবহনযোগ্যতা কমে আসে– বন্যার প্রবণতা বাড়ে। বারুইপুরের মধ্যেই আদিগঙ্গা ও তার শাখাগুলি দিক পরিবর্তন করে নানা বাঁকের সৃষ্টি করেছে। অতীতে এই নদীগুলির কয়েকটি শাখার অস্তিত্ব বিষয়ে জানা যাচ্ছে। পুরন্দরপুরের কাছ থেকে এবং দক্ষিণ কল্যাণপুরের কাছ থেকে আদিগঙ্গার দুটি শাখা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হত। এগুলি সম্ভবত মলয়াপুর ধোপাগাছি প্রভৃতি গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমের খাড়ি অঞ্চলে পড়ত। পরবর্তীকালে এই স্থানটিই জগদীশপুর টংতলা অঞ্চলের জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এখনো এই অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় বিল রয়েছে যেগুলিকে ' ঝেটোর বিল', 'বড় বিল' ইত্যাদি বলা হয়।

আদিগঙ্গা ও পিয়ালীর মধ্যবর্তী শাখাটি এখন বেগমপুরের 'কাটাখাল' , অন্যদিকে পিয়ালী নদীর বাঁকের ফলে বেগমপুরের নিকট থেকে উত্তরভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একটি বিশাল জলাভূমির সৃষ্টি করেছে।

সল্টলেক-সোনারপুর-আড়াপাঁচ অঞ্চলের বদ্ধ লবণাক্ত জলাভূমির সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। ফলে ঐ জলাভূমিতে এককালে চাষ করা যেত না অধিক ক্ষার বা লবণাধিক্য থাকার জন্য। অপরদিকে পিয়ালী নদীর হঠাৎ বক্রতা বৃন্দাখালি, পারুলদহ অঞ্চলে এককালে বিশাল জলাভূমি ও হ্রদের সৃষ্টি করেছিল। বৃন্দাখালি নামেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তার নদী-সান্নিধ্য জমাজলের এই অঞ্চলগুলি 'দহ' বা হ্র দের আকার নিত বলে গ্রামনামগুলিও 'দহ' যুক্ত, যেমন এই পারুলদহ। বারুইপুরের এই সব লবণাক্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই একাকালে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হত; ইংরেজ আমল পর্যন্ত তা চলে এসেছিল। বারুইপুরে ইংরেজ সল্ট এজেন্টের অফিসও গড়ে উঠেছিল, লবণকুঠি ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে। সাউথ গড়িয়া। কালিকাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ আন্দোলনের সময়ও লবণ তৈরী করা হয়েছিল।

লবন তৈরীতে দক্ষ এক শ্রেণী: সস্তা স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক পাওয়া যেত – এরা দক্ষিণ ভারতের দরিদ্র মানুষ– দক্ষিণ বাংলায় কাজের জন্য চলে আসত। এরা 'মলঙ্গী' নামে পরিচিত। নড়িদানার কাছে সম্ভবত এদের একটি বসতি ছিল, তাই কালক্রমে এটি একটি গ্রাম নাম হয় 'মলঙ্গা' (JL - 21) । অপরদিকে নদী সান্নিধ্যের আরও কয়েকটি গ্রাম হল কুমড়াখালি (JL-91), পদ্মজলা (JL-104), তুলোর বাদা (JL-72), মনুষ্য বসতিহীন), বাগদহ (JL-72), টংতলা (JL-48), বেলেডহরি (JL-94), গঙ্গার বাদা (JL-72), গঙ্গাদুয়ারা (JL-85) প্রভৃতি অঞ্চল, যেগুলি আদিগঙ্গা বা পিয়ালী নদীখাত হয়েছে; মজে যাওয়ায় এখন 'দহ' ইত্যাদি হয়েছে । এসব অঞ্চল এখন বাদা, অল্প ফলনশীল বা অনুর্বর মাঠ। বেশীরভাগই লবণাক্ত। বেগমপুরের কিছু অংশ, উত্তরভাগের কিছু, জগদীশপুর-টংতলার বৃহদংশ জলা ও

নোনা অঞ্চল। উপরে কিছু পলি থাকলেও নীচে লোনা – ৮০০/১০০০ ফুটের কমে টিউবওয়েল হয় না। বারুইপুরের বাকী বৃহৎ অংশই সমৃদ্ধ পলিমাটি দিয়ে গড়া। কোন কোন অঞ্চলে একটু এঁটেল মাটি দেখতে পাওয়া যায়। মাটির এইসব পার্থক্যের জন্য ফসলের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ কম বেশী হয়। নীচু জমিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হয়। এখন আমনধান ছাড়াও সেচ অঞ্চলে প্রচুর বোরোধানের চাষ হয়। সব রকমের সব্জী, আনাজ, তরিতরকারীর, চাষ হয়। ফলের রাজা বারুইপুর। দোঁয়াশ মাটির উঁচু জমিতে প্রচুর ফল ফলাদির চাষ হয়। লিচু , পেয়ারা, আম,জাম, কাঁঠাল, লকেট, জামরুল, সবেদা, কলা, বেল, আখ, শশা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গম, মটর, কড়াই ও অন্যান্য কড়াই, সরষে এবং সর্ব ঋতুর ফল ও শাকসব্জী এবং শস্যাদির চাষ হয়। সুপারি নারকেলের ফলন ভালই। নীরেস জমিতে অনেকে বাঁশ লাগান, করমচা চাষের প্রাচুর্যের জন্য এখানে করমচা সংরক্ষণজাত শিল্প গড়ে উঠেছে। আম, লিচু এবং সারাবছর প্রচুর পেয়ারা বাইরে চালান যায়। আনারস, হলুদ, কচু ক্ষেত্র বিশেষে চাষ করা হয়।

জনপদ বৃদ্ধির জন্য এখন অপেক্ষাকৃত জলাজমি বা নীচু জমিতেও মানুষ বাসস্থান গড়ে তুলছে। অন্যদিকে নীচুজমি ভরাট করে জঙ্গল কেটে , বাগান তুলে দিয়ে পেয়ারার মত অর্থকরী সম্পদের নতুন জমি তৈরী হচ্ছে। অন্য অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট, বীন, সরষে ও টমেটো।

অতীতে ৭/৮ হাজার বছর আগে এ-সব অঞ্চল গভীর বনভূমি অধ্যুষিত ছিল তা DBW ইটখোলা এবং উত্তরভাগ-কুমোরহাট ইটখোলার ২৫-৪০ ফুট মাটির নীচের নমুনা থেকে জানা গেছে। সদ্য অতীতে মুসলমান রাজত্বকালে ইসলাম প্রচারের সুযোগে যে সব পীরগাজী বিবি এ-অঞ্চলে এসেছেন তাঁদের পাঁচালী ও কেচ্ছাকাহিনী থেকে বড়খাঁ, গাজী, দক্ষিণরায় বনবিবি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায় সঙ্গে 'বনযুদ্ধের' খবর।

মেদনমল্ল পরগনার জমিদার, বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মদন রায়ের (দত্ত) জমিদারী রক্ষার ব্যাপারে মোবারক গাজী সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। এই মোবারক গাজী প্রথমে 'বেলের জঙ্গলে' এসেছিলেন। এই 'বেলে' সম্ভবত বর্তমান বেলেগাছি (JL-140) সেখান থেকে তিনি কিছুদিনের জন্য কুড়ালির (JL-118) জঙ্গলে একটি শেওড়াগাছের তলে আস্তানা গাড়েন, যেটি এখন তাঁর নামে একটি সুন্দর প্রার্থনা স্থান। দেখা যাচ্ছে কুড়ালীর জঙ্গলে থেকে বাঁশড়া (বর্তমানে ক্যানিং থানা/ পরগনা মেদনমল্ল) পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চলে জঙ্গল পুড়িয়ে (দাবানল?)দেওয়া হয় (রাজনৈতিক কারণে) এবং তা পরবর্তীকালে কৃষির কাজে ব্যবহৃত হয়। উভয় অঞ্চল খুবই লোনা। পানীয় জলের জন্য কুড়ালিতে একটি পুকুর কাটা হয় আর পরবর্তীকালে জমিদারী রক্ষায় মোবারক গাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাঁশড়ায় ঘুটিয়ারীতে মাজার ও তিনকোদালের পুকুর কেটে দেন জমিদার মদন রায়। ঘুটিয়ারীতেই মূল আস্তানা হয় মোবারক গাজীর। অন্যদিকে বনের রাজা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে ইতিপূর্বেই বড়খাঁ গাজী ও বনবিবির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল। দক্ষিণরায়ের মূল মন্দির এখন ধপধপিতে। এছাড়া এরূপ কয়েকটি গ্রাম নাম থেকেও বনভূমির পরিচয় পাওয়া যায়।

'ধপধপি' গ্রামটি বনভূমি সূচক 'ধবধবি' - থেকে এসেছে 'ধব' এখানকার অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলের একটি প্রজাতির গাছ Desmodium Gangeticum / Grislea Tomentosa/ Agnogeissus Latifolia মলয়াপুর > মলম্বা = Ipomoca Turpethum. । ভাটপোয়া, বনবেড়ে ইত্যাদি গ্রামগুলিও বনকেটে বসত।

এর পূর্ববর্ত্তী কালের টোডর মলের 'আসলীতুসার' (১৫৮২ খৃঃ) এবং আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯৬খৃঃ) দেখা যায় যে বারুইপুর অঞ্চলের বর্তমান ভূখণ্ডটি সরকার সাতগাঁর অধীন ছিল এবং তার অন্তর্গত দুটি 'মহল' বা 'পরগনা' হল 'মেদনমল্ল' (মেদিনীমল্ল বা ময়দান মল) ও 'মাগুরা'। এই দুটি পরগনার অংশ নিয়েই এখনকার বারুইপুর। আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে 'মাগুরা' এবং আদিগঙ্গার পূর্বতীরে 'মেদনমল্ল' । বারুইপুরের খাসমল্লিব – শালেপুরের কাছে 'ডিহি (পরগনা) মেদনমল্ল'' (JL-34) বলে এখনো একটি গ্রামনাম রয়েছে। মেদনমল্ল পরগনা মদনরায়ের নাম অনুযায়ী নয় – কেননা 'আসলী তুমারে' 'মেদনমল্ল' নাম পাওয়া যায় ১৫৮২ খৃঃ। আর মদন দত্ত (মল্ল?) রাজপুরের জঙ্গল কেটে রাজ্যস্থাপন করেন প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর (১৬০৬/১৬১০ খৃঃ) পর। যাইহোক, ইংরাজ আমলে তো বটেই আজও বারুইপুরের মূল দুটি পরগনা– মেদনমল্ল এবং মাগুরা নামে দলিল পত্রে প্রচলিত রয়েছে। এ অঞ্চলের বাইরেও পরগনা দুটি প্রসারিত।

চক আলালপুর (JL-47), তুলোরবাদা (JL-72), সঈদপুর (JL-96), কুমড়াখালি (JL-91) নামক গ্রামগুলিতে কোন লোক বসতি নেই। এগুলি এক সময় নীচু জলাভূমি ও লবণাক্ত বনভূমির অন্তর্গত ছিল। চক আলালপুর, ধোপাগাছি, চাকার বেড় ও জগদীশপুর মৌজার সংলগ্ন বনভূমি অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য কোন 'চকদারকে' জমাবন্দী লীজ দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত মুসলিম আমলে। আজও ডোঙাঘাটা সংলগ্ন এটি একটি নীচু ভূ-খণ্ড। সম্ভবত সেই সময়কার নাম চক আলালপুর।

ভূমির এই গঠন বৈচিত্র্যের জন্য উৎপাদিত শস্যের রকমফের ঘটে থাকে এবং পরিমাণ ও কমবেশী হয়।

<u>ভৌগোলিক অবস্থান ও স্থান নাম ঃ</u>

বারুইপুর থানা অঞ্চলের উত্তর সীমান্তে সোনারপুর থানা সংলগ্ন শেষে গ্রাম পেটো বা পেটুয়া (JL-1) দক্ষিণের এমনই গ্রামগুলি হল জয়নগর থানা সংলগ্ন ধানখোলা (JL 137) পাঁচগেছিয়া (JL-88) এবং মগরাহাট থানার নিকট গঙ্গাদুয়ারা (JL-85), পূর্ব সীমান্তের গ্রাম বেলেগাছি – ক্যানিং থানার সীমান্তে, এবং পশ্চিমে বিষ্ণুপুর থানার সীমান্তে টংতলা (JL-45) ও চণ্ডীপুর গ্রাম (JL-46)

<u>বারুইপুরের ভৌগোলিক অবস্থান</u> ঃ ২২°১৫´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২°২৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ২১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮°৩৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। ৫০০০–৮০০০ বছর (বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের 'ধর্মনগরের ভূ-তাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব '– দক্ষিণ চব্বিশ

পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়, জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃঃ ১৭,২০, ৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য)। রামনগর উত্তরভাগের ইটখোলার ২৫-৪০ ফুট নীচে ঐ একই রকম সুন্দরী বৃক্ষের সারি আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের বয়স ধোপাগাছির DBW ইট খোলায় আবিষ্কৃত ভূ-নিমজ্জিত বৃক্ষসারির বয়সের অনুরূপ।

নদনদী ঃ

উন্নত সভ্যতার যতগুলি জনপদের কথা জানা গেছে তার সবই প্রায় কোন না কোন নদীবাহিত অঞ্চলে অবস্থিত। নদীবাহিত তীরভূমি এবং নদীর সমুদ্র তীরবর্তী মোহনা অঞ্চলই উন্নত জনপদ তৈরীর প্রধান প্রধান শর্তগুলি মেনে চলে। এসব বহু ভাষাভাষীর মিলন ক্ষেত্র, নগর ও উন্নত গ্রাম সৃষ্টি, লিপি, যোগাযোগ – অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যিক, বহু ধর্মীয় মিলন ক্ষেত্র এসব অঞ্চলেই নৌপোতাশ্রয়, বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, পশ্চাদভূমি, মঠ, মন্দির ইত্যাদি তৈরী হয়। বারুইপুরের প্রত্নস্থল গুলি একইভাবে আদিগঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিমতীরে এবং পিয়ালী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মূল গঙ্গানদী থেকে ভাগীরথী-আদিগঙ্গা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের কাছ থেকে কালীঘাট, বোড়াল, রাজপুর হয়ে দক্ষিণ গোবিন্দপুর (সোনারপুর থানা) পেরিয়ে বারুইপুর থানায় প্রবেশ করে এবং হালদার চাঁদনী, পুরন্দরপুর, কল্যাণপুর, শাসন, আটিসারা, সূর্যপুরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বারুইপুর থানা অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার পূর্ব দিকে চলে গেছে।

অন্যদিকে বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা থেকে নারায়ণপুরের কাছে বাঁশড়া ও চাম্পাহাটীর মধ্যে একটি স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে পিয়ালী নদী। বারুইপুর থানার সোলগোহালিয়া, বেগমপুর প্রভৃতি গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বারুইপুর ও ক্যানিং থানার সীমানা নির্দেশ করে বৃন্দাখালির পরে দক্ষিণে ঘোলা পর্যন্ত গিয়ে পিয়ালী নদী জয়নগর থানায় প্রবেশ করেছে। অতীতে পিয়ালী নদী সম্ভবত বিদ্যাধরীর মাধ্যমে সোনারপুর-আড়াপাঁচ হয়ে শিয়ালদহ সল্টলেকের ভিতর দিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা পৌছে মূল গঙ্গা স্রোতের সঙ্গে মিলিত হত। এই নদী কুলতলীর কাছে মাতলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এককালে আদিগঙ্গা ও পিয়ালী খুবই প্রবল ও নৌবহ ছিল, বারুইপুরের সীতাকুণ্ড নদী আটঘরা , উত্তরভাগ প্রভৃতি অঞ্চল পিয়ালী অববাহিকার প্রত্নস্থানগুলির অন্যতম।

বারুইপুর অতিপ্রাচীন কোন স্থান নাম নয়। প্রাচীন লিখিত কোন তথ্য থেকে বারুইপুরের নাম পাওয়া যায়নি। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে গঙ্গারিডি জাতির যে শৌর্য, বীর্যের কথা জানা যায় এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল গঙ্গানদীর মোহনা বরাবর গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থিতির যে কথা মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় এবং আটঘরা প্রভৃতি প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত মৌর্য ও মৌর্য পূর্ব যুগের যে সমস্ত প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে এঅঞ্চল তখন গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং গঙ্গারিডি সভ্যতার অংশীদার হিসাবে মৌর্য এবং মৌর্যপূর্ব যুগের শিল্প সম্ভারে পরিপুষ্ট হয়েছিল। তখন এই অঞ্চলের কি নাম ছিল তা জানা যায় না। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদদের অনেকেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর নগরী 'গঙ্গা' গঙ্গামোহনায় অবস্থিত (সাগরদ্বীপ) ছিল এবং দ্বিতীয় রাজধানী বা 'দে গঙ্গা' চন্দ্রকেতু গড় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

এই দুই রাজধানীর মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চল হল বারুইপুর-আটঘরা-সীতাকুণ্ড অঞ্চল। টলেমীর ম্যাপে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) অষ্টগৌড়া (অস্তাগুরাৎ) বলে একটি স্থানের নাম আছে। এই ম্যাপেই গঙ্গার পাঁচটি শাখার মোহনা অধ্যুষিত অঞ্চলকে গঙ্গারিডি রাজ্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই গঙ্গারিডি রাজ্যের বহু বহু উত্তরে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর সীমায় অষ্টগৌড়ার অবস্থিতি দেখান হয়েছে। অনেকে সুদূর বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী অষ্টগৌড়া নামক এই স্থানটির সঙ্গে আটঘরা নামটিকে ভ্রান্তিবসত একীভূত করতে চেয়েছেন। তাছাড়া মূল কথাটি অষ্টগৌড়াও নয়, কথাটি আস্থাগুরা (Asthagura)। স্থানটির সঙ্গে রাজগৃহের অবস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে। এ বিষয়ে নরোত্তম হালদার, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বারুইপুরের আটঘরা ও টলেমীর মানচিত্রের আস্থাগুরার অবস্থান এক নয়।

আমরা বারুইপুরের নাম প্রথম পাই মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে (১৪৯৫ খৃঃ মতান্তর আছে) প্রথম দেখি বারুইপুরের নাম ঃ

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ।।"

শ্রীচৈতন্যদেব বারুইপুরের বর্তমান মহাপ্রভূতলায় অনন্ত পণ্ডিতের আশ্রমে তাঁর নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে তৎকালীন আটিসারা নামক গ্রামে একদিন 'নাম সংকীর্তন' করেছিলেন (১৫১০ খৃঃ)। ১৬৮৬ খৃঃ রচিত কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে (৯২৮ ছত্রে) এবং কবি রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে 'বারুইপুর', 'বারিপুর' এবং বারুইপুরের বিশালাক্ষীর (কাছারী বাজারের) নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার আটিসারা গ্রামের নাম আর পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত শব্দ অপভ্রংশের ফলে (শব্দ বিবর্তনের ফলে নয়) আটিসারা এতদ্ময় আটঘরা নামে পরিবর্তিত হয়েছিল। অনেকে অবশ্য বলেন প্রথম আটটি ঘরের (পরিবারের) বসতির জন্য এঅঞ্চলের নাম আটঘরা হয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে আটঘরার জনবসতি এত অর্বাচীন নয়। প্রাচীন নদী সভ্যতার এক মাতৃভূমি আটঘরা-সীতাকুন্ড-বারুইপুরের জনবসতি বহু প্রাচীন।

অনেকে মেনে নিয়েছেন যে মধ্যযুগে বারুই সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ এ অঞ্চলে পান চাষ ও পান বরজের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই বারুই সম্প্রদায়ের থেকেই অঞ্চলটির নাম হয়েছে বারুইপুর। আগেই বলা হয়েছে যে বারুইপুর স্থান নাম মধ্যযুগীয় হলেও ভূ-খণ্ড হিসাবে অঞ্চলটি মৌর্য ও মৌর্যপূর্ব গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এই অঞ্চলটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, রায়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং রঘুবংশ, জৈনসূত্র গ্রন্থাদি ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি, সিংহলী দীপবংশ, মহাবংশ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে পাতাল, পুণ্ড্র, গঙ্গা, গঙ্গারাষ্ট্র বা বঙ্গ ইত্যাদি রাজ্য বা জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল এই অঞ্চলটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বায়ুপু রাণ, পদ্মপুরাণ এবং রঘুবংশ,

জৈনসূত্রগ্রন্থাদি ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি, সিংহলী দীপবংশ, মহাবংশ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে পাতাল , পুন্ড্র, গঙ্গা, গঙ্গারাষ্ট্র বা বঙ্গ ইত্যাদি রাজ্য বা জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়।

মহাস্থান গড়ে মৌর্যযুগের শিলালিপি প্রাপ্তি এবং আশোকের কলিঙ্গ আক্রমণ থেকে বোঝা যায় যে ধননন্দের সময়কার মতই গঙ্গারিডি রাজ্য বা বাংলার এই ভূ-খন্ড মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত, বশীভূত বা করদ রাজ্য ছিল; যে কারণে কলিঙ্গ আক্রান্ত হলেও গঙ্গারিডি আক্রান্ত হয়নি। গুপ্ত যুগেও এই সীমান্তবর্তী অঞ্চল তথা সমুদ্র বাণিজ্যপথের প্রান্ত সীমানা সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল।

রামায়ণের যুগে পাতালরাজ্যে তথা গঙ্গামোহনায় সাংখ্যাচার্য কপিলের আশ্রম ছিল এবং তৎপরবর্তীকালে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের পর গঙ্গাসাগর একটি সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। জলপথ ছাড়াও সে সময়কার যে সম্ভাব্য স্থলপথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাও খুব সম্ভবত বর্তমান বারুইপুর ভূ-খন্ডের উপর দিয়েই ছিল। গঙ্গাতীর ধরে হাঁটাপথে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে যাওয়ার সময় অন্তত এরকম একটি পথের হদিস পাওয়া যায়। 'দ্বারির জাঙ্গাল'বা প্রাচীন এই 'Pilgrims Route' টি দিয়ে সম্ভবত দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং সমুদ্রবন্দর গঙ্গে, তিলোগ্রামম্ প্রভৃতির পশ্চাদভূমি হিসাবে দেশের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে বন্দরগুলির যেমন নৌপথে যোগাযোগ ছিল তেমনি স্থলপথে যুক্ত থাকাও স্বাভাবিক। সেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় মেলবন্ধনকারী একটি সমৃদ্ধ জনপদ, বন্দর, নৌঘাট, উন্নতনগর ও কৃষিশিল্প সমৃদ্ধ গ্রাম হিসাবেই গড়ে উঠেছিল বারুইপুরের বর্তমান ভূ-খন্ড। বারুইপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ধোপাগাছি এবং জগদীশপুর গ্রামের সংযোগস্থলে পীরপুকুর, বড়বিল, ঝোটোর বিল ইত্যাদি অঞ্চলের নাম 'ডোঙাঘাটা'অর্থাৎ জাহাজ ঘাটা। এখানে দাঁড়িয়ে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকালে শুধুই চোখে পড়ত ধূ-ধূ মাঠ আর জলাভূমি— এককালে কোন চাষবাসই হত না। হাজার ফুটের কম কোন নলকূপ ছাড়া মিষ্টি জল পাওয়াই যায় না, নোনাজলের স্তরের আধিক্যে। এতদঞ্চলের জমাজল ডায়মণ্ডহারবারের স্লুইস গেট দিয়ে নদীতে পড়ে। আগে সমস্ত অঞ্চলটিই সমুদ্র খাড়ি ছিল। তাই সেই সমুদ্র তীরবর্তী জাহাজঘাটা বা ডোঙাঘাটা নাম হয়েছিল এই অঞ্চলটির। নিকটবর্তী ধোপাগাছির DBW ইটখোলার মাটির ৪০ ফুট গভীরতায় যে ঝিনুক ইত্যাদির খোল পাওয়া গেছে সেগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে ঐগুলি ছিল নোনা খাড়ি অঞ্চলের প্রাণী। অর্থাৎ প্রায় ৭০০০-৮০০০ বছর আগে অঞ্চলটি Swampy অঞ্চল ছিল। ছিল সুন্দরী জাতীয় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ছিল হিংস্র জন্তু আর বুনো মহিষ (যার হাড় পরীক্ষা করা হয়েছে) — যার বয়স প্রায় পাঁচহাজার বছর। উত্তরভাগেও যে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষরাজীর সন্ধান পাওয়া গেছে মাটির গভীরে সে কথাও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। জনবসতির প্রথম পর্যায়ে এখানে যে সব আদি গোষ্ঠী মানুষের বসবাস ছিল তাদের বংশধারায় রয়েছে পৌন্ড্র, কৈবর্ত, বাগদী, কাওরা, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বর্তমান জাতি গোষ্ঠী। এক সময় এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সম্ভবত পাল-সেন আমল থেকে প্রতাপাদিত্যের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ও

অন্যান্যদের এখানে ধর্মকৃত্যের জন্য বাসভূমি, নিষ্করজমি ও ধনসম্পত্তি দিয়ে বসানো হয়। জয়নাগ, বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন, ডোম্মণপাল প্রভৃতি রাজা ও সামন্ত রাজাদের তাম্রশাসন ও দান-পত্রাদি থেকে এ সমস্ত জানা যায়।

গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের লিখিত তথ্য ও তাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় যে দক্ষিণ বাংলার এই ভূ-খণ্ড অঞ্চলে যে সব প্রশাসনিক বিভাগ ছিল তার মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তি এবং বর্ধমানভূক্তি বলে দুটি ভুক্তির প্রচলন এই ভূ-খণ্ডেও ছিল। কালিদাস দত্ত প্রমাণ করেছেন যে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গার (এক্ষেত্রে আদিগঙ্গার) পূর্বতীরের ভুক্তিটি ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তি এবং পশ্চিমতীরের ভুক্তিটি ছিল বর্ধমানভূক্তি । সেই হিসাবে বারুইপুরের মধ্যভাগ দিয়ে আদিগঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় আদিগঙ্গার পূর্বতীরবর্তী বারুইপুর পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তির এবং পশ্চিমতীরবর্তী বারুইপুর বর্ধমানভূক্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন প্রশাসনিক বিভাগ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তি দুটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বারুইপুর। সেন বংশের মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত গ্রামদান বিষয়ক গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের প্রদত্ত গ্রামখানির নাম ছিল 'বিড্ডার শাসন'– কালিদাস দত্ত প্রদত্ত চৌহদ্দির সঙ্গে মিলিয়ে বারুইপুরের শাসন রেলস্টেশন সংলগ্ন গ্রামটি শাসন গ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রাচীন গ্রামটি জাহ্নবী তথা আদিগঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত বলে এটিকে ঐ তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির অধীনে বলা হয়েছে। আরও নির্দিষ্টভাবে এটিকে 'পশ্চিম খাটিকা' বা 'পশ্চিম খাড়ি' নামক 'বিষয়' (বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন) বা 'খাড়ি' 'মণ্ডলের' (লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা তাম্রশাসন) অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। তৎকালে 'ভুক্তি' অনেকটা প্রদেশের মত বিভাগ ছিল। 'বিষয়' বা 'মণ্ডল' ছিল 'চতুরকে' ও 'চতুরক' ছিল 'পাটকে' বিভক্ত। মোটামুটি চারটি গ্রামের একটি বর্গই হল 'চতুরক(মতান্তর আছে)। আর 'পাটক' হল একটি 'গ্রাম' বা গ্রামের অর্ধেক। এখানে যে কথাটি বলার আছে তা হল আদিগঙ্গা বারুইপুরের মত খাড়িরও মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত হত। ফলে খাড়ির পূর্বাংশে পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তি এবং পশ্চিমাংশে বর্দ্ধমানভূক্তির অধীন ছিল। আর সেজন্যই গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে 'পশ্চিম খাটিকা' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। একই কারণে বারুইপুরও সেন আমলে আদিগঙ্গার পূর্বতীরের অংশ 'পূর্ব খাটিকা' এবং পশ্চিমাংশ 'পশ্চিম খাটিকা' মণ্ডলের অধীনে ছিল। লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর (সেনানিবাস ও রাজধানী) থেকে গোবিন্দপুর তাম্রশাসনটি দান করেছিলেন। যাইহোক, সেনআমলে প্রদত্ত গ্রামখানির প্রকৃত নাম ছিল 'বিড্ডার শাসন' এবং এটি 'বেতড্ড চতুরক'-র অধীন ছিল। এই 'বিড্ডর' এবং 'বেতড্ড' কথাগুলির সঠিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। তৎকালে নিয়ম ছিল, যে গ্রামগুলি নিয়ে 'চতুরক' হবে তার কোন একটি (বিশেষ) গ্রামকে ঐ চতুরকের নামাঙ্কিত করা হবে। গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে প্রদত্ত গ্রামের চৌহদ্দিতে উত্তরের গ্রামটিকে ধর্মনগর বলা হয়েছে যেটি বর্তমানে ধোপাগাছি -ধামনগর নামে পরিচিত (লেখকের 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ঃ অঞ্চলিক ইতিহাসের উকরণ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য) এবং যেটিকে W.W.Hunter তাঁর Statistical Accounts of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তখনকার দিনে 'নগর' শব্দ যুক্ত গ্রাম প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু সেই সময়েই 'ধর্মনগর' নিশ্চিতরূপে একটি উন্নত নগর ছিল এবং তাকে

নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার ফলে একথা বলা যায় যে বারুইপুর অঞ্চল তখন উন্নত নগরায়নের আওতায় ছিল। সমগ্র ধর্মনগর ছিল এখনকার তুলনায় বহুগুন বড় এবং বিড়াল (বিড্ডার?) ধামনগর নামক সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল গুলির সম্মিলিত রূপ (লেখকের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ'ও 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধামাত্র পুরাতত্ত্বের আলোকে থানা বারুইপুর অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। তাই এ অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলিকে নির্দেশ করে সেখানে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলিকে চিহ্নিত ও বর্ণনা করে পরিশেষে একটি সার্বিক পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রত্নক্ষেত্র ঃ বারুইপুরের মূল প্রত্নক্ষেত্র হল (১) আটঘরা–দমদমার ঢিবি– সীতাকুণ্ড অঞ্চল (২) রামনগর-শাসন-বনবেড়িয়া চঙ্গের দহ অঞ্চল , (৩) ধোপাগাছি - ধামনগর– বিড়াল– পুরন্দরপুর অঞ্চল। এছাড়া ছড়ানো – ছিটানো আরও কয়েকটি স্থানে কমবেশী নানাপ্রকার প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে।

আমরা সংক্ষেপে এগুলির আলোচনা করব।

বারুইপুরের প্রত্নস্থল ও প্রত্ননিদর্শন ঃ

(১) আটঘরা - দমদমার ঢিবি- সীতাকুণ্ড ঃ আটঘরা - সীতাকুণ্ড অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান হল ২২°২২ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ১৯২৩ খৃঃ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি সার্ভেমূলক ম্যাপ থেকে বোঝা যায় যে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর রেলস্টেশনের কয়েক কিমিঃ পূর্বে আটঘরা ও সীতাকুণ্ড গ্রামের বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে আটঘরা-দমদমার ঢিবি-সীতাকুণ্ড প্রত্নাঞ্চলটি বিস্তৃত। অঞ্চলটির পশ্চিমে আদিগঙ্গার তীরভূমি। পূর্বে বিদ্যাধরী নদীর শাখা পিয়ালী নদী। আটঘরা–সীতাকুণ্ডর পাশ দিয়ে একটি সরু জলস্রোত প্রবাহিত হত, যার সঙ্গে বিদ্যাধরী-পিয়ালীর যোগাযোগ ছিল (South Asian Studies, 1994-Chakraborty, Goswami & Chattopadhaya)। সম্ভবত আদিগঙ্গার সঙ্গেও জলপথে আটঘরার যোগাযোগ ছিল। বেগমপুর সুভাষগ্রাম 'কাটাখাল'টি তার অবশেষ বলে মনে হয়।

অঞ্চলটি অত্যন্ত প্রত্নসমৃদ্ধ এবং আয়তনও বিশাল। ১৯৫৫ সালে আটঘরা নিবাসী কিছু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির চোখে আটঘরার বিভিন্ন অঞ্চলে মাটিকাটা, পুকুরখোঁড়া ইত্যাদির সময় প্রাপ্ত নানারকম প্রত্নবস্তু ধরা পড়ে। এদের মধ্যে ছিলেন হেমেন মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুশীল ভট্টাচার্য, সুনীল সর্দার প্রমুখ। হেমেনবাবুর কাছ থেকে কালিদাস দত্ত আটঘরার প্রত্নবস্তুগুলো দেখেন এবং তিনি বারুইপুরে আসেন। প্রত্নবস্তুগুলোকে তিনি গুপ্তযুগের বলে অনুমান করেন। এরপর তাঁর অনুরোধে পরেশ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ প্রত্নস্থলটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে সরকারীভাবে নথিভুক্ত কিছু মতামত পাওয়া যায়। IAR 1956-57 এবং IAR

1957-58 এ কিছু তথ্যাদি রয়েছে।

An Encyclopaedia of Indian Archaeology গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় আটঘরা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে রুলেটেড মৃৎপাত্র, লিপিযুক্ত (Inscribed) সীল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। মোটামুটি ঐসব সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে South Asian Studies -10, 1994 এ ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, এন. গোস্বামী এবং আর. কে . চট্টোপাধ্যায় আটঘরা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন (পৃঃ ১৪৮)

"Atghara -- North east of Baruipur-- the early-historic antiquity of this site in the outskirts of Baruipur was reported in IAR 1956-57, P.P. 29-30, where there were references to earlyhistoric terracottas, grey pottery, rouletted pottary, cast copper coins, etc. from the site. Terracottas, rouletted ware and an inscribed seal from Atghara were also mentioned in IAR-1957-58, P-70. The terracottas from the Maurya-Sunga Period onwards are indeed a locally well known feature of the site. One still notices a structural mound at Atghara, and there is a perceptible spread of occupational deposit which, according to a local estimate is spread over about 13 to 14 acres of land . In 1989 the directorate of Archaeology of West Bengal Government excavated the visible structural mound. The report is unpublished, but there is a reference to its results in a handout issued on the occasion on South Twenty Four Parganas History Conference at Baruipur on December, 1,1991. The sequence of the site goes back to the Mauryan Period and continues upto the 10th -- 12th Centuries A.D. A terracotta image of a Jain Thirthankara was obtained from the latter context. In the earlier context one notes the presence of NBPW, Sunga Kushan red ware, earthen vassels bearing faces of women, terracotta Yakshini images etc. It has been pointed out that the areas of Gazir Danga, Sita Kundu and Phansir Danga in the neighbour hood yields comparable antiquities whenever taeks, wells, foundations for houses etc. are dug. There is little doubt that there was a major early historic settlement at Atghara."

অর্থাৎ মোটের ওপর দেখা যাচ্ছে যে আটঘরা প্রত্নস্থলটি খৃষ্টপূর্ব যুগের মৌর্য সময়ের উন্নত জনপদের চিহ্ন বহন করছে। এ বিষয়ে আমরা আরও কয়েকটি দ্যৃষ্টান্ত দিতে চাই।

উক্ত ১৯৮৯ খৃঃ বারুইপুরের আটঘরা মৌজায় (JL 30) সীতামা পুকুরের উত্তর পশ্চিমে দমদমার ঢিবিতে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে যে **Sample** উৎখনন হয় তাতে কি কি পাওয়া গিয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। ঢিবিটির দুইপাশে দুটি এবং মাঝখানে

একটি মোট তিনটি ২ মিটার x ২ মিটার খাদ খনন করা হয়। পশ্চিম দিকের I নং খাদটি ১.১২ মিটার, পূর্বের II খাদটি ৩.৮৫ মিটার এবং মাঝে III খাদটি ১.৪৫ মিটার খনন করা হয়। এই তৃতীয় খাদটি থেকে কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের অংশাদি পাওয়া গেছে যেগুলি খৃষ্টীয় ১ম শতকের কুষাণ যুগের বলে সরকারীভাবে অনুমিত হয়েছে। II এবং I খাদ থেকে যা পাওয়া গেছে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্য	আঃ মাঃ যুগ
১। লালরঙের ভগ্ন মৃৎপাত্র – নিম্নতল গোলাকার, ভিতরদিকে কানা বাঁকানো – মৌর্যপূর্ব যুগ, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক থেকে খৃঃপূঃ ৩য় শতক।	
২। খেলাঘুটি (hop Scotch) মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশ দিয়ে তৈরী —	খৃঃ পূঃ৪র্থ-৩য় শতক
৩। ওজনের বাটখারা – সামঞ্জস্যপূর্ণ পোড়ামাটির তৈরী –	ঐ
৪। পোড়ামাটি চুড়ি, তিনটি পরস্পর ছেদী বন্ধনীর অলংকরণ –	ঐ
৫। পোড়ামাটির সছিদ্র গোলক –	ঐ
খৃঃ পূর্ব যুগের আরও কয়েকটি নিদর্শন হল ঃ	
৬। NBP র সমতালিক থালির অংশ, পোড়ামাটির পুঁথিদানা ও ছিপি –	খৃঃ পূঃ ২য় শতক শুঙ্গ।
৭। NBP র বিভিন্ন পরিধি বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের অংশ (৪০সেমি, ৬০ সেমি, ২৯ সেমি)	ঐ- আঃ মাঃ যুগ
৮। কালো রঙের বয়াম (Jar) এর বহিরাবয়ব অবতলিক – উত্তলিক	খৃঃ পূঃ ২য় শতক, শুঙ্গ
৯। ভাণ্ড (Bowl) নীচের দিকে খাঁজ কাটা রেখা	—ঐ—
১০। অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত লাল বর্ণের মৃৎপাত্র– বহির্পাত্রে আঁচড়ান (করাতের মত খাঁজকাটা) অলংকরণ (incised decoration) সমান্তরাল লম্ব লেখা	—ঐ—
১১। ব্যাপকভাবে মরিচাপড়া (Oxidized) লৌহফলা ও লৌহমল	— ঐ —
১২। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হাড়ের অংশ, লাল ও ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের অংশ	– ঐ –
১৩। ধূসর বর্ণের পাতলা কানা (rim) যুক্ত মৃৎপাত্রের অংশ বাহিরের দিকে বাঁকানো এর কানা এবং পরিধি ১১ সেমি	– ঐ–
১৪। পোড়ামাটির ছিদ্র যুক্ত টালি (অনুরূপ টালি চন্দ্রকেতুগড়ের শুঙ্গ -স্তর থেকে পাওয়া গেছে)	– ঐ –
১৫। অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পরিচয় নির্ণয় করা যায়নি এরকম একটি টেরাকোটা মূর্তি	—ঐ—
১৬। মাছধরার জালে ব্যবহৃত (Net Sinker) পোড়ামাটির সছিদ্র গোলক	–ঐ–
১৭। পরবর্তী যুগের N.B.P র অংশ	– ঐ –

১৮। ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র, গায়ে খাজখাটা রেখা — শুঙ্গ-কুষাণ, খৃঃ পূঃ ১ম শতক থেকে খৃষ্টীয় ২ য় শতক

১৯। পোড়ামাটির ওজন বা পরিমাপ বাটখারা —ঐ –

২০। ঐ নারী মূর্তি (ভগ্ন) ও পুঁতিদানী '' খৃষ্টীয় ২য় শতক, কুষাণ যুগ

২১। ঐ পুঁতিদানা, লাল-কালো মিশ্রিত রঙের মৃৎপাত্র ভিতরের দিকে কালো বাহিরে লাল, বাহিরে ঐ দুটি রঙের স্তর বা আস্তরণ দেওয়া — ঐ –

২২। হাড়ের তৈরী কিলক (ভগ্ন) –ঐ –

২৩। এগেট পাথরে তৈরী অসমাপ্ত পুঁতিদানা – ঐ –

২৪। অস্বচ্ছ পাথরের (Opaque) পুঁতিদানা গায়ে আঁচড়ান (etched) — ঐ–

২৫। পোড়মাটির মিথুন ফলক '' '' খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠী/৭ম গুপ্ত যুগ

২৬। – ঐ – নারী মূর্তির ভগ্ন অংশ ৮ম/৯ম পালযুগ

২৭। – ঐ – ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের অংশ ৬ কি.মি পুরু '' — ঐ–

২৮। মাছের হাড়ের অংশ – কাটা দাগ আছে '' '' ৯ম/১০মশতক, পালযুগ

২৯। ধূসর বর্নের পোড়ামাটির পুঁতিদানা –গাথে ২টি খাঁজ কাটা দাগ '' '' পাল যুগ

৩০। ধূসর লাল বর্ণের পোড়ামাটির ভাঙা হাতল, সূক্ষ্ম কারুকার্য কার '' – ঐ–

৩১। টেরাকোটা পুরুষ মূর্তি মাথাটি বামদিকে ফেরান আদিপালযুগ

৩২। লম্বা ধরনের পোড়ামাটির পুঁতি দানা – ঐ —

৩৩। পোড়া মাটির জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি – কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান (ভগ্ন) - ৬ সেমি পালযুগ

৩৪। ঐ একই প্রকার জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি – ৬ সেমি – ঐ –

৩৫। হরিনের শিঙের তৈরী লক (awl) ৮ম / ৯ম শতক

অঞ্চলটির নিকটবর্তী আরও কয়েকটি প্রত্নস্থল রয়েছে। এগুলি হল সীতামা পুকুর, চটার পাড়, বেচা কামারের পুকুর, নিরামিষ পুকুর, বাঁকা সর্দারের পুকুর, গোলাম আলি সর্দারের ডোবা ও ভদ্রাসন,দাঁড়ির কুনি ডোবা, ডোম পাড়ার পুকুর, কোপাইত পুরের ঢিবি, ফাসির ডাঙ্গা, শূলি পোতা, সীতামা মন্দির ও পিছনের সীতাকুণ্ডু (অমৃতকুণ্ডু ও বিষকুণ্ডু)সীতাকুণ্ড-- বারুইপুর ষ্টেশন গামী রাস্তার উত্তর দিকে এই প্রত্নস্থলগুলি বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত। ঐ রাস্তার দক্ষিন দিকে সবচেয়ে কাছে রয়েছে দেওয়ান গাজীর আধুনিক (বড়জোর চতুর্দশ শতাব্দী ?) মাজার নামক একটি বিশাল সুউচ্চ ঢিবি এবং তার পূর্বদিকে সীতাকুণ্ডু স্কুলের ঢিবি যেটি ঘোড়া ডাঙ্গা নামে পরিচিত এবং মাজারের দক্ষিণ ঢালে চাল ধোয়া পুকুর, পাত্র পুকুর ইত্যাদি প্রত্নস্থল গুলি। সীতামা পুকুর এবং চালধোয়া পুকুর দুটি থেকে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান প্রস্তর মূর্তি, বীড্‌স্‌, পটারী ও টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। ফাসির ডাঙ্গা , শূলীপোতা এবং তাদের সংলগ্ন পেয়ারা বাগান ও অন্যান্য বাগান, ডোবা ও ক্ষেতখোলা– সবগুলি খনন করলেই কিছু না কিছু প্রত্ননিদর্শন নিত্যই পাওয়া যাচ্ছে (স্কেচ দ্রষ্টব্য)।

ডোমপাড়া পুকুরের পশ্চিম দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে মাটির নীচে দীর্ঘ পাকা ভিত্তিও প্রাচীরের অংশ বিশেষ দেখা গেছে যেগুলি প্রাচীন গৃহ বা মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়। কেত্তপুরের মৃত্তিকাগর্ভে অনেকগুলি গৃহভিত্তির চিহ্ন দেখা গেছে। কোপাইত পুরের ঢিবির দক্ষিণ দিক থেকে দাঁড়ির কুনি ডোবার উত্তর দিয়ে, বেচাকামারের ঢিবির উত্তর দিকে বেঁকে আবার বারুইপুর সীতাকুণ্ডু রাস্তা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে বহুদূর বিস্তৃত একটি চওড়া গড় বেষ্টনীর মত পাকা ইটের প্রাচীর দেখতে পাওয়া যায় মাটির প্রায় ৩ মিটার নীচে থেকে ৮/১০ মিটার গভীরতায়। প্রায় অর্ধবৃত্তাকৃতি এই বিশাল বিস্তৃত পাঁচিলটির ৩ মিটার নীচে চওড়া প্রায় ৩ মিটার এবং তা বাড়তে বাড়তে নীচে আরও বেশী। কেউ কেউ মনে করেন এই প্রাচীরটি অন্ততঃ শুঙ্গ—কুষাণ যুগের বা তার আগের।

এর নিকটবর্তী পরবর্তী প্রত্নস্থল সীতাকুণ্ড গ্রামের চিত্রশালী এবং ছাটুই পাড়ার ধর্মতলা ও শিব মন্দির অঞ্চল। চিত্রশালী শিবমন্দির তথা প্রস্তর নির্মিত আয়তাকার চতুর্মুখ শিব লিঙ্গটি একটি প্রাচীন জৈনমূর্তি বলে অনেকে অনুমান করেছেন। নিকটস্থ পুকুরটি ও প্রত্ন সম্পদে ভরা। বর্তমান লেখক ছাটুইদের ধর্মতলা থেকে একটি মাঝারি আকারের বিষ্ণুমূর্তির ভগ্ন উর্ধ্বাংশ আবিষ্কার করেন। সেটি পিঁপড়ের জালির মধ্য থেকে উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে দেখা যায় যে সেটি পালসেন যুগের একটি বিষ্ণু মূর্তির মুখমণ্ডল সমেত উর্ধ্বাবয়ব। (লেখকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নিকটবর্তী কোন পুকুর কাটার সময় সম্ভবতঃ এই মূর্তিটি উঠেছিল তা ধর্ম ঠাকুরের এই প্রস্তরখণ্ডের কাছে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা আটঘরা সীতাকুণ্ড অঞ্চলের প্রত্নস্থলে পাওয়া প্রত্ননিদর্শনগুলির আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ দেব যাতে করে এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বই শুধু নয় – এখানকার জনবসতির ব্যাপকতা, বিভিন্ন ধর্মমতের একত্র সমাবেশ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নশীলতার কথা বোঝা যায়। নগরের বিস্তৃতি, বন্দর, শহর, শিল্প ও শিল্পকলার উন্নতি, ভাস্কর্যে ও মৃৎশিল্পের দক্ষতা,মুদ্রার আদান প্রদান ও সাধারণ জীবন সহজেই এতে পরিস্ফুট হবে। প্রসঙ্গত বলি যে ছাটুই পাড়ার 'ধর্মের থান ছাড়াও কিছু উত্তরে 'নড়িদানায়' একটি ধর্মমন্দির আছে। একটি ছাড়াও প্রাচীন ধর্মঠাকুরের থান – প্রায় দু'আড়াইশ বছর আগে রাজপুরের দুর্গারাম কর মন্দিরটি তৈরী করে দেন। এখানে ধর্মঠাকুর বলে পূজিত প্রায় গোলাকার প্রস্তর খণ্ডটি অত্যন্ত প্রাচীন। এই প্রস্তর মূর্তিটি ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর খণ্ড এবং অবয়বধারী কালো কষ্টি পাথরের প্রায় ৮" উচ্চতার দুটি পুরুষ মূর্তি , হয়ত কোন দেব মূর্তি। তবে স্বাভাবিকভাবে এদেশীয় চেহারা নয়। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে 'একেবারে গ্রীক মূর্তি।' সেই রকম চওড়া চওড়া হাত-পা-বুক। বলিষ্ঠ চেহারা। ভারতীয় দেবতার মত কমনীয়তা নেই।'' (নড়িদানার ধর্মের গাজন – অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তী , বিবাসন, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৯০)। আমরা আটঘরা থেকে প্রাপ্ত এরকম দেবতা বা সৈনিকের বেশধারী মৃন্ময় মূর্তির কথা জানতে পেরেছি। চন্দ্রকেতুগড় এবং হরিনারায়ণপুরে এরকম মৃন্ময় মূর্তি (গ্রীক - রোমান?) পাওয়া গেছে। যতদূর জানা গেছে এই মূর্তিগুলি সম্ভবত এখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঘোষ পুকুর সংস্কারের সময় পাওয়া গিয়েছিল। তাই বোধ হয় ধর্মঠাকুরকে বার্ষিক পূজার সময় এই পুকুরেই স্নান করাতে আনা হয়। আর একটি প্রত্নপ্রস্তর

সংরক্ষিত আছে, বাস রাস্তার নিকট ব্যাসালের মাঠের কাছে পঞ্চানন্দ-শীতলা থানের পাশে। বিশাল গোলাকার প্রস্তর - কালো মসৃন চেহারা - এত বড় কালো গোলাকার প্রস্তর খন্ডটি কোথা থেকে পাওয়া গেছে তা কেউ বলতে পারল না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাতত্ত্বের স্থপতি ও রূপকার কালিদাস দত্ত (১০-১২-১৮৯৫ – ১৪-৫-১৯৬৮) আমৃত্যু আটঘরা – বারুইপুর অঞ্চলের প্রত্ন সম্পদ নিয়ে সব সময়ই ভাবনা চিন্তা করেছেন। অবশ্য বারুইপুরের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে তাঁর কোন প্রবন্ধ নেই। কিন্তু আমরা হেমেন মজুমদার-সুশীল ভট্টাচার্য সম্পাদিত কালিদাস দত্তের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত (১ম ও ২য় খণ্ড)' নামক গ্রন্থ থেকে আটঘরার প্রত্নবিদ বালির কিছু চিত্র নিদর্শন ও তথ্যাদি পাই। সেগুলি হল ঃ

১। সালংকারা নৃত্যরতা যক্ষিনী মূর্তির উর্ধ্বাংশ ....খৃষ্টীয় ১ম শতক-শুঙ্গযুগ
২। ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা ১ টি —ঐ—
৩। পোড়ামাটির কর্ণ কুণ্ডল ২টি ....খৃষ্টীয় ১মশতক-কুষাণ যুগ
৪। মুণ্ডহীন টেরাকোটা সৈনিক মূর্তি – ঐ–
৫। টেরাকোটা মাল্যদানা – ২টি গুপ্ত যুগ
৬। উষ্ণীষ পরিহিত বুদ্ধমূর্তি .... – ঐ –
৭। প্রাচীন ত্রি-চূড় (three knot) যক্ষমূর্তি ....মৌর্য (আঃ মাঃ খৃঃ পূঃ ৩য় অব্দ)
৮। একটি উপবিষ্ট মেষের উর্ধ্বাংশ
Terracotta Ram cart শলাকা
লাগানোর ব্যবস্থা – চাকা লাগিয়ে
বালকদের খেলনাগাড়ী (আটঘরা) ....কুষাণ
(কালিদাস দত্ত,)

বিনয় ঘোষ তাঁর বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য়) গ্রন্থে আটঘরার কয়েকটি প্রত্ন সম্পদের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২৪১)

১। তাম্রমুদ্রা
২। মৃৎপাত্রের টুকরো
৩। পোড়ামাটির মেষ .... খৃঃপূঃ মৌর্যযুগ থেকে
৪। ঐ-যক্ষিণী .... হিন্দুযুগ পর্যন্ত
৫। ঐ শীলমোহর ....
৬। ঐ- তৈজসপত্র
৭। পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ....,.......

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত আটঘরার কয়েকটি প্রত্ন সামগ্রী (১৯৮৩ খৃঃ বারুইপুর ২৪ পরগনা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন স্মরণিকা, বিশ্বনাথ সামন্তর প্রতিবেদন) ঃ

১। রোমান যুগের কৌলাল পাত্রের টুকরো ....খৃঃ ১ম - ২য় যুগের
২। পোড়ামাটির মেষ এবং অন্যান্য মূর্তি ....শুঙ্গ-কুষাণ যুগ
৩। – ঐ — খেলনা গাড়ী – ঐ —
৪। পোড়ামাটির ভগ্ন মূর্তি ইত্যাদি মধ্যমৌর্য, শুঙ্গ

বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রায় সাতবছর আগে দমদমার ঢিবি ও সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কয়েকটি বড় চওড়া ইট, কিছু কালো মসৃন পটারীর টুকরো, কয়েকটি পাতলা লাল প্রলেপ দেওয়া খোলামকুচি, নানা ধরণের মোটা ও পাতলা ধূসরলাল রঙের ভগ্ন মৃৎপাত্রাংশ ইত্যাদি।

সুধীন দে বলেছেন যে সীতামাপুকুর থেকে পাওয়া একটি কালোরঙের মৃৎভাণ্ড তিনি ১৯৮৯ খৃঃ সংগ্রহ করেছিলেন যেটিকে তিনি বৌদ্ধ বা জৈন শ্রমণদের ভিক্ষাভাণ্ড (begging bowl) বলে মনে করেন। ইতিপূর্বে এই পুকুর থেকে একটি দশম/একাদশ শতকের দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং ঐ পুকুরপাড় থেকে প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন গ্রন্থে (পৃঃ ১৩)

বারুইপুর সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহ শালায় (২৭/১১/১৯৭৯ স্থাপিত) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শন গুলির মধ্যে যেগুলি 'আটঘরা সীতাকুণ্ড এবং বারুইপুর থানার অন্যান্য প্রত্নস্থল' থেকে সংগৃহীত সেগুলির কয়েকটির তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। পোড়ামাটির উভয় পার্শ্বে ৩ টি কোনা বিশিষ্ট আঃ মাঃ যুগ
ছোট্ট পুতুল (মুণ্ড) মূর্তি / আটঘরা ....প্রাগৈতিহাসিক
২। পোড়ামাটির বানর মূর্তির ঊর্ধাংশ ....ঐ ....শুঙ্গ – কুষাণ
৩। ঐ পুত্র ক্রোড়ে মাতৃকা মূর্তি-ত্রিবেণী যুক্ত (Three knot) ঐ...........মৌর্য -যুগ
৪। ঐ দ্বিমাত্রিক ফলকের গভীর ....উৎকীর্ণ, ত্রিবেণী
যুক্ত কিন্তু পিছনে ঝুটি যুক্ত ওড়না সহ মাতৃকামূর্তি – ঐ.........কুষাণ (২য়/৩য়খৃঃ)
৫। ঐ যক্ষিনী মূর্তির ঊর্ধাংশ / ঐ ....মৌর্য (খৃঃপূঃ ৩য় শতক)
৬। ঐ অনেকটা আদিবাসী ও কালোতীর্ণ ভাবনারি
আঙ্গিকে বিমূর্ত মাতৃকামূর্তির রূপকল্পনা – ঐ ....খৃঃ ২য় -৩য়
(মুখ লম্বা পাখীর ঠোঁটের মত)
৭। ঐ মাতৃমূর্তির ক্ষুদ্রায়তন প্রতীকীকরণ / ঐ ....ঐ
৮। ঐ বৃষের উচ্চ স্কন্ধ বর্ষের মুখ / ঐ .... প্রাগৈতিহাসিক
৯। ঐ জাতে গড়া ত্রিমাত্রিক ষাঁড়ের (?) অনির্দিষ্ট আকৃতি ....ঐ....... ২য় – ৩য় শতক
১০। ঐ ঐ ঐ পূর্ণাবয়ব ঐ ঐ
১১। ঐ ঐ একই প্রকার কিছু অনির্দিষ্ট জীব / ঐ ঐ
১২। ঐ মেষের মুখের আদলে জ্যামিতিক আকার / ঐ ....ঐ
১৩। ঐ ছাগ মুণ্ডর ঐ ঐ / ঐ .... ঐ
১৪। ঐ জৈন তীর্থঙ্করের মস্তকভাঙা দেহকান্ডের নিম্নাংশে পায়ের পাতা নেই – একপিঠে
ছাঁচে তৈরী / ঐ ....মৌর্য
১৫। ঐ মাথা বিশাল মুকুট – দারুণ কারুকার্য খচিত — ঐ ...শুঙ্গ
১৬। ঐ মেষ মুণ্ড / বড়, বিচিত্র কারুকার্য খচিত – খেলনার
উপরের অংশ / ঐ ....শুঙ্গ

১৭। ঐ আলতো রিলিফের একপিঠে ছাঁটতৈরী

স্নান ফেরৎ নারীর অঞ্চল নিঃসৃত বারি পানরত সারস / ঐ ....মৌর্য/শুঙ্গ

১৮। ঐ শিশু ক্রোড়ে জননী / ঐ ....কুষাণ

১৯। পোড়ামাটির হাতিটানা রথ – লেরিলিফ ফলক / আ টঘরা ....শুঙ্গযুগ

২০। ঐ যক্ষিণী মূর্তির বাঁ-দিকের পঞ্চচূড় (আয়ুধ কাটা)

বেণী সহ মুখমন্ডলের ভগ্নাংশ / ঐ ....কুষাণ যুগ

২১। ঐ ডম্বরু হাতে মহেশ মূর্তি / লো রিলিফ/ ঐ ....মৌর্য যুগ

২২। ঐ অনেকগুলি খেলনা গাড়ী (Toy car) র

অংশ বিশেষ – মেষ, অশ্ব, হস্তী ঐ ....শুঙ্গ /কুষাণ যুগ

২৩। ধূসর বর্ণের স্লেট পাথরের খুব ছোট বুদ্ধ মস্তকের

(2.8cm x 1.5) খণ্ডিত অংশ, উষ্ণীব আছে / ঐ.............................গুপ্ত যুগ

২৪। প্রায় বর্গা পাঞ্চ-মার্ক কয়েন ৪ টি / ঐ ....মৌর্য যুগ

২৫। গোলাকার কপার কাস্টিং কয়েন ১ টি ....মৌর্য যুগ

২৬। কালো শক্ত ব্যাসাল্ট পাথরের বিষ্ণুমূর্তির

ভাঙা পাদপীঠে বিষ্ণুর পদযুগল, ডান হাতের

নীচের দেবী মূর্তিটির মস্তক ভগ্ন, মূল Basement

পনের ইঞ্চি-মূল মূর্তিটি প্রায় তিনফুট উচ্চতার / ঐ ....পালযুগ

২৭। কালো ব্যাসাল্ট পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, নীচের চালচিত্র

ইত্যাদি ভাঙা বলে দূর থেকে কাশীপুরের সূর্যমূর্তির মত

একক মূর্তির মত দেখায় — নিম্নের পদদ্বয় ভগ্ন – উপরের

চালচিত্রের শীর্ষদেশ ভগ্ন – প্রায় একই উচ্চতার দেবমূর্তি / ঐ ....পালযুগ

২৮। শক্ত কালো ব্যাসাল্ট পাথরের তৈরী অক্ষত বিষ্ণুমূর্তি,

মূলপাদপীঠ এক ফুট চওড়া, উচ্চতা আড়াই ফুট,

দেবতার উভয় দিকে যথাক্রমে লক্ষ্মী ও সরস্বতী

অত্যন্ত সুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি / ঐ ....পালযুগ

২৯। কালো ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরী নিম্নাংশ ভাঙা দেবী

বাগেশ্বরী (সরস্বতী) মূর্তি, বক্ষোদেশ থেকে মুকুট সহ

শীর্যদেশ পর্যন্ত আছে – উচ্চতা এক ফুট চওড়া দশ ইঞ্চি– সুন্দর দেবী মুখমণ্ডল/ সীতাকুণ্ড — পালযুগ (৯ম - ১০ম)

৩০। ধূসর বালি পাথরের পূর্ণাঙ্গ স্বল্প উচ্চতার বিষ্ণুমূর্তি;

পাদপীঠ একফুট, উচ্চতা দুই ফুট। ডান নিম্নহস্তে পদ্ম,

ডান উর্ধ হস্তে গদা, বাস উর্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম নিম্ন হস্তে চক্র ধৃত।

ডান নিম্নহস্তের নীচে দেবী লক্ষ্মী এবং বাম বাহু হস্তের নীচে । চক্রপুরুষ। বিষ্ণুর চতুবিংশতি ব্যূহ অনুযায়ী

এই বিষ্ণুর (PGSC) নাম ঃ অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ মতে –অধোক্ষজা

এবং হিমাদ্রি মতে ইনি ত্রিবিক্রম। বারুইপুর অঞ্চলে যত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগ এই ত্রিবিক্রম মূর্তি / আটঘরা ....পালযুগ

৩১। সাদাটে ধূসর বালি পাথরে তৈরী ছোট একটি বিষ্ণুমূর্তি; Basement 8 (৮ইঞ্চি) উচ্চতা একফুট নয় ইঞ্চি, সুন্দর হাস্যময় নিমিলীত নয়নের বিষ্ণু– পূর্বোক্ত ক্রম (PGSC) অনুযায়ী একটিও ত্রিবিক্রম বিষ্ণু
সীতাকুণ্ড ....পালযুগ

৩২। কালো ব্যাসাল্ট পাথরের বড় বিষ্ণুমূর্তির একটি ভাঙা টুকরোতে ডান হাতে (নীচের) পদ্ম চিহ্নটি সহ চালচিত্রের দক্ষিণ দিকের একটু অংশ – সিংহ (!) কর্তৃক হস্তী দলনের চিহ্নের সিংহ চিহ্নটি আছে; চওড়া-একফুট চার ইঞ্চি, উচ্চতা সাড়ে আট ইঞ্চি প্রাপ্তি স্থান ঃ কাছারী বাজারের সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের কাছে (পদ্মপুকুর) ইলেকট্রিক পোষ্ট পোতার সময় পাওয়া ....পালযুগ

৩৩। সাদাটে বালি পাথরের একটি গড়েয়া বা পূজাবেদী 40 cm x 16 cm x 20 cm (উচচতা) / আটঘরা ....মৌর্য যুগ

৩৪। কাঠের বিষ্ণুমূর্তি প্রায় কয়লার মত কালো হয়ে ফেটে ফেটে ভেঙ্গে গেছে, বর্তমান টুকরোটি । x 6
প্রাপ্তি স্থান – ধোপাগাছি ....পাল সেন যুগ।

এই বারুইপুর সংগ্রহ শালায় রয়েছে 'রামনগরের তে-সতীনের পুকুরের' সংস্কারের সময় পাওয়া মসৃণ কালো কষ্টিপাথরে তৈরী একটি অপূর্ব সুন্দর দেবীমূর্তি। প্রায় একফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং সাড়ে ছয় ইঞ্চি প্রস্থের এই দেবী মূর্তিটির ওজন প্রায় দশ কিলোগ্রাম। দেবীর পদতলে হৃষ্টপুষ্ট একটি মহিষ (মতান্তরে বৃষ)। দেবী সশস্ত্রা। তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে মতান্তর আছে ঃ কেউ কেউ এটিকে জৈন দেবী বলেছেন। দেবী চতুর্ভুজা দ্বিস্তর শতদল পদ্মাসনে উপবিষ্টা, বামপদ হাটু ভেঙে পদ্মাসনের সমান্তরালে স্থাপিত ডানপদ বৃষোপরি স্থাপিত দ্বিভঙ্গে, নিম্ন ডান হাতের তালু চিত করে ডান হাঁটুর সন্ধি স্থলে রাখা। নিম্নবাম হাতে দীর্ঘ গদা বা শূল ধৃত সবস্ত্রা সালংকারা দেবীর মস্তকে জটামুকুট, ডানদিকে একটু কাত হওয়া হাস্যময় মুখ। পাদপীঠে বৃষের পিছনে (দেবীর বামে) একটি ঢালজাতীয় চক্র, বৃষ উর্ধমুখে দেবীর দিকে চেয়ে আছে। চালচিত্রে কীর্তিমুখ বা অন্য কোন চিহ্নই নেই। চালচিত্র মাথার দিকে বেশ চওড়া হয়ে ধীর গতিতে উঠে ঠিক মাথার শীর্ষের কাছে একটু উঁচু। ঊর্ধ ডান হাতটি ডান কনুই এর কাছ থেকে উপরে উঠে দেবীর ডান গ্রীবার দিকে বাঁক নিয়েছে– ঐ হাতে ধৃত একটি চক্র। বাম ঊর্ধ্ব হাতে একটা কিছু ধরা আছে যা খুব স্পষ্ট নয়। অত্যন্ত বলিষ্ঠ খোদাই, হাত পা মাংসল কিন্তু সুঠাম সৌন্দর্যের আকর। গভীর নাভি, উন্নত সুস্পষ্ট বক্ষ, চওড়া বক্ষের তুলনায় কোমর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই দেবীকে 'যমী' বললেও নির্মলেন্দু মুখার্জী এঁকে মাহেশ্বরী বলেছেন। নির্মাণ কৌশলে এটি 'শেষ গুপ্তযুগ - শিল্পের' নিদর্শন বলে অনুমান করা যায়।

বারুইপুর আটঘরা সীতাকুণ্ড থেকে পাওয়া প্রত্নসামগ্রী ছাড়াও বারুইপুরের অন্যান্য অঞ্চল

থেকে পাওয়া বেশ কিছু মূল্যবান প্রত্ন সামগ্রী এখানে সংগৃহীত হয়েছে।
নবগ্রাম (JL 135) থেকে পাওয়া গেছে বালি পাথরের সাদাটে ২টি গড়েয়া
বা পূজা দেবী 42 cm x 17 cm x 20 cm ....মৌর্য যুগ
সুবর্ণনির্মিত কর্ণাভরণ ও তার অংশ ....গুপ্ত যুগ
একটি লিপি যুক্ত স্বর্ণমুদ্রা / জয়নাগ ....গুপ্তোত্তর যুগ
একটি ইসলামি আমলের রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি (ফিরোজ শাহ)
রাজা জয়নাগের মুদ্রা বারুইপুরে প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা জয়নাগ নামে কোন রাজার কথা পূর্বে জানা ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পঠিত এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে বর্তমান কাকদ্বীপ মহকুমার পাথর প্রতিমা থানার 'মলয়া' (JL 98) নামক গ্রামে মহারাজা জয়নাগের একটি তাম্রশাসন পাওয়ার (E.P. Ind XVIII/1925-26 page - 60) পর জানা যায় যে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি এই রাজা জয়নাগ শশাঙ্কের পরে কর্মসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। এই তাম্রশাসনটি ছাড়া মহারাজা জয়নাগের কয়েকটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া গেছে। আর এই গুরুত্ব পূর্ণ বিরল মুদ্রার একটি পাওয়া গেল বারুইপুরের নবগ্রাম থেকে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহ– কৃষ্ণকালী মণ্ডল, চব্বিশ পরগনা প্রত্ন ইতিহাস সম্মেলন স্মরনিকা বারুইপুর, ২০০২, পৃঃ ৬ – ৭ দ্রষ্টব্য)।
টেকা (JL-78) গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিশাল কালো ব্যাসাল্ট পাথরের আভ্যন্তরীন জলপ্রবাহ নালী ও তৎসহ মকরমুখো জলের কৃত্রিম উৎসমুখ (একই পাথরে খোদাই করা) এই সংগ্রহ শালায় রক্ষিত। একটি প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা, দেড় ফুট প্রশস্ত এবং একফুট পুরু একটি প্রস্তর খণ্ড। এটি একটি উন্নত নগর সভ্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন এটি সম্ভবত পাল-সেন যুগের। বর্তমান সীতাকুণ্ডু পুকুরের তীরবর্তী আধুনিক কালে নির্মিত সীতামা মন্দিরেও কিছু প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। মনে হয় মন্দিরটি একটি বৃহত্তর প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিভূমির উপর পুনর্নির্মিত। সামনের সীতামা পুকুরটির সংস্কার সময়ে বা মাটিকাটার সময়ে উঠে আসা বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত প্রত্নবস্তু এখানে সংরক্ষিত আছে। এটি সকলের জন্য সবসময়ই অবারিত দ্বার।
যদিও সীতামা পুকুর এবং সীতাকুণ্ডর সীতাকে তা আজও নির্মীত হয়নি এবং নানা অনুমান ও কল্পনায় অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে, তবে মনে হয় মধ্যযুগীয় কোন মানবী কেন্দ্রিক অঞ্চল একটি এবং মানবী সীতার নামে আধুনিক সীতামা পুকুর এমন কি গ্রাম নাম সীতাকুণ্ড (JL-108) । পৌরানিক রামসীতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই মন্দিরে রামসীতার পিতলের সুন্দর দুটি মূর্তি একটি সিংহাসনে রেখে পূজা করা হচ্ছে। কিছু লৌকিক দেবদেবীর ছলন-মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি রয়েছে। কিছু প্রস্তর খণ্ড, বিষ্ণু মূর্তির ও চালচিত্রের ভাঙা অংশাদি, ছোট ছোট কিছু বৌদ্ধ তান্ত্রিক মূর্তি ইত্যাদি এখানে রয়েছে। অবশ্য প্রস্তর খণ্ড এবং ছলন ইত্যাদির আড়ালে একটি প্রস্তর নির্মিত পদ্মাসনে বসা চতুর্ভুজ গণেশ মূর্তি এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু থাকা স্বাভাবিক। এখানে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুটি রয়েছে তা হল বিষ্ণু একটি 'বরাহ-অবতার ' মূর্তি। অনেকে একটি দেখলেও

মূর্তিটির প্রত্নতাত্ত্বিক এবং Iconographic গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরল প্রকৃতির ভাস্কর্য। বরাহ অবতার মূর্তি এ পর্যন্ত যতগুলি দেখা গেছে তার সবগুলিতেই দেখা যায় বরাহরূপী বিষ্ণু অসুরকে পরাস্ত করে বসুন্ধরাকে জলতল থেকে উদ্ধার করে স্বীয় দশনের উপরে তুলে নিয়ে বীর দর্পে উঠে এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি পর্বতের ৫ নং ও ৬ নং গুহায় পাহাড় কেটে এই বরাহ অবতারের একটি বিশাল সুন্দর দৃশ্যের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে– দেবতা ও দানবেরা সারিবদ্ধভাবে তাঁকে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাজানাচ্ছে। বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বরাহ অবতারের যত ভাস্কর্য রয়েছে সর্বত্রই বরাহের দাঁতের উপর অথবা হাতে কিংবা বাহুর উপর দেবীর বসুন্ধরাকে দেখা যায়। আলোচ্য সীতামা মন্দিরের বিষ্ণু মূর্তিটি কিন্তু এই প্রচলিত ভাস্কর্য ধারার বাহিরে একটি ব্যতিক্রমী শিল্প সৃষ্টি। দেবতা এখানে সবেমাত্র অসুরকে বিশালদেহী বরাহ মূর্তিতে পরাস্ত করেছেন – কিন্তু তখনো নিমজ্জিতা দেবী বসুন্ধরাকে অন্ধকার অতল সলিল থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। পাতালের সেই মহাসমরে নাগরাজ বাসুকীকে তাঁর সাহায্যে আসতে দেখা যাচ্ছে– এই বসদীপ্ত দেবতার পদতলের আশেপাশে । ঠিক সেই সময়ই দেবতা দেখাও পেয়েছেন দেবী বসুন্ধরাকে – ঠিক পদপীঠের বামদিকের নীটে উল্টেকরে খোদিত ছোট্ট নারী মূর্তি। তাঁকে উদ্ধার করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের দৃশ্যটি রূপায়িত। বিশাল বলিষ্ঠ চেহারার পেশীগুলি স্পষ্টভাবে ফুলে উঠেছে, গলায় কোন উপনীত তাই এক হাতে গদা, অন্য হাত উর্ধে উত্তোলিত। দেবতা দ্বিভুজ। বরাহ মুখ – মাথায় বিশাল জটামুকুট, দশন ও মুখাগ্র সামান্য ভগ্ন, ডান পাদটিকদলী বৃক্ষ সমান পরিপুষ্ট ও উরু থেকে সোজা নেমে এসেছে , বাম পদ ভাঁজ করে পাদপীঠের উপর সম্ভবত নাগরাজ বাসুকীর মস্তকে স্থাপিত, এই বামপদের বেশ নীচে রয়েছেন বসুমতী। তখনো তাঁকে উদ্ধার করা হয়নি। চৌকো চালচিত্রে কোন শিল্পকার্য নেই। মূর্তিটিতে ভাস্কর্য বৈচিত্র্য থাকলেও মসৃণতা নেই।

বিষ্ণুর বৃহবাদের পরবর্তীকালেই অবতার বাদের জন্ম। খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ-৭ম এবং দশম-একাদশে অবতার বাদের এই মূর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায়। মূর্তিটির গঠন রীতিতে যথেষ্ট লালিত্য না থাকলেও চালচিত্র এবং অসংস্কৃত প্রাথমিক রূপ দেখে এটিকে গুপ্তযুগের কাছাকাছি সময়ের বলে অনুমান করা যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার বিষ্ণুর ভগ্নপাদপীঠটি এবং পদ্মাসনে উপবিষ্ট বেশ মোটা দ্বি-স্তর পদ্মপাপড়ির পাদপীঠের উপর অবস্থিত চতুর্ভুজ লম্বোদর বিস্তৃত কর্ণ, জটামুকুট ধারী গণপতি বরাহ অবতার মূর্তির মতই খুব মসৃণ সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টি নয়। অপরদিকে গণপতির চালচিত্রটি বরাহ অবতারের মত একেবারে চৌকো নয়। চালচিত্রটি দেহমাফিক হওয়ায় এটির ও চালচিত্রে অন্য খোদাই নেই। এটি ও উচ্চতায় প্রায় দেড়ফুট এবং চওড়ায় প্রায় একফুট। সম্ভবত এগুলি কোনমূল বিষ্ণু মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে সন্নিবেশিষ ছিল। অবশ্য সবগুলিই খুবভারী কালো মোটা পাথরের স্ল্যাবে তৈরী। সম্ভবত মূর্তিগুলির নির্মাণকাল পৃথক। কিন্তু সব মূর্তিগুলিই ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই মসৃণতার অভাব মনে হচ্ছে।

আটঘরা-সীতাকুণ্ড অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পুরা বস্তু সংগৃহীত হয়েছে নির্মলেন্দু

মুখোপাধ্যায়ের যাদবপুরস্থিত পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়। এগুলির মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি ঃ

১। প্রস্তর নির্মিত গোল ষ্ট্যাম্প বা সীল – বড় / আটঘরা – সীতাকুণ্ডু – আঃ সাঃ যুগ
২। ঐ – – ছোট / ঐ ঐ —
৩। কালো প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণু .... সীতাকুণ্ডু – ১১ শ শতক
৪। টেরাকোটা মুণ্ড মূর্তি .... সীতাকুণ্ডু –
৫। ঐ গনেশ আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
৬। ঐ হস্তীরূঢ় ইন্দ্র আটঘরা – খৃঃ ১ম শতক
৭। ঐ হস্তী আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
৮। ঐ মেষ আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
৯। ঐ মাতৃকামূর্তি আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
১০।ঐ বিদেশী নাবিক............................ আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
১১। ঐ অন্যান্য কতকগুলি মূর্তি .... আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
১২। ঐ লাজগৌরী আটঘরা – খৃঃ ১ম শতক
১৩। ঐ রাক্ষস আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
১৪। ঐ মিথুন মূর্তি .... আটঘরা – খৃঃ ১ম শতক
১৫। ঐ সারস ও যক্ষ .... আটঘরা – খৃঃ ১ম শতক
১৬। ঐ বানর মূর্তি .... আটঘরা – খৃঃ ২য় শতক
১৭। কালো পাথরের তৈরী ধ্যানরত –আদিবুদ্ধ ..... আটঘরা – গুপ্তযুগ
১৮। ঐ — ত্রিস্তর পদাপীঠের – পঞ্চমুখ ...আটঘরা-সীতাকুণ্ড – খৃঃ ৬ষ্ঠ শতক
১৯। ঐ ....চারফণার ছত্রযুক্ত মনসা .....আটঘরা - সীতাকুণ্ড – খৃঃ ৬ষ্ঠ শতক
২০। ঐ মুকুট যুক্ত, কর্ণাভরণ সহ তারা মূর্ত্তির
বিরাট ভরাট গোলাকার মুখাবয়ব –আটঘরা-সীতাকুণ্ড – খৃঃ ১০ম শতক
২১। পোড়া মাটির ২৮ সেমি উচ্চতা ও ১৮ সেমি ব্যাস
বিশিষ্ট কলসী – নারী দেহাকৃতি সদৃশ্য হস্তপদ, পীনদ্বয়, কণ্ঠহার
ও মেখলা সহ অ্যাপলিক পদ্ধতিতে গড়া – অভ্যন্তরে ছিল
মূল্যবান পুঁতিদানা, তামার ঢালাই মুদ্রা কয়েকটি খৃঃ পূঃ
৩য় শতকের ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ একটি অস্পষ্ট সীল, সীতাকুণ্ড
একটি ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড সম্ভবত এটি একটি শবাধার পাত্র (দাড়ির কুনি) ......মৌর্যযুগ
২২। ঐ যক্ষ-যক্ষিনী, অপ্সরা মূর্তি আটঘরা (সীতাকুণ্ড)....খৃঃ ২য়–৩য় শতক
২৩। ঐ দেব দেবী ও নরনারীর অবয়বের পুতুল ঐ ঐ
২৪। ঐ কয়েকটি পঞ্চচূড় যক্ষিণী (প্রজনন দেবী) ঐ ঐ
২৫। ঐ একটি দশচূড় যক্ষিনী ঐ ঐ
২৬। ঐ রোমক রীতিতে গড়া মনোমুগ্ধকর মুখশ্রী

ও কেশ বিন্যাস – গঙ্গারিডি সুন্দরী	ঐ	ঐ
২৭। ঐ বিভিন্ন মোটিফ ও খেলনা গাড়ী পুতুল	ঐ	ঐ
২৮। ঐ রোমক ঘাঘরা পরিহিত যোদ্ধা মূর্তির ভগ্নাংশ	ঐ	ঐ
২৯। ঐ রোমানাকৃতি মুখাবয়ব বিশিষ্ট নারী ও পুরুষ মূর্তি		ঐ
৩০। ঐ স্বচ্ছবাস পরিহিতা যৌবন প্রকাশে অকৃপণ দ্বি পরিসরাকৃতির নারীমূর্তি	ঐ	ঐ
৩১। ঐ জটামুকুট ধারিনী পদ্মখচিত কণ্ঠহারযুক্ত আবক্ষ নারীমূর্তি	ঐ	প্রাগৈতিহাসিক যুগ
৩২। ঐ দীর্ঘকণ্ঠ, মুকুট শোভিত পুরুষ মূর্তি (বারা?)	ঐ	শুঙ্গ-কুষাণ যুগ
৩৩। ঐ বিশালাকায় উন্নতশিল্প মানের দেবমূর্তির (সম্ভবত বোধিসত্ত্ব মূর্তির) ভগ্নাংশ , ত্রিশীর্ষযুক্ত মুকুট , অর্দ্ধ নিমীলিত পদ্মলাশ নেত্র (ফলক)	ঐ	গুপ্ত যুগ
৩৪। তামা ও রুপার অংক চিহ্নযুক্ত গোলাকার ও অসম চতুষ্কোণ অসংখ্য মুদ্র	ঐ	মৌর্য যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত
৩৫। তামার ব্রাহ্মী অক্ষর সহ বা অর্থারহীন গৌন পৃষ্টে জাহাজ, চৈত্য, হস্তী, বৃক্ষ, তুলাদণ্ড, উট প্রভৃতি উৎকীর্ণ	ঐ	ঐ
৩৬। স্বর্ণমুদ্রা – ধনুর্ধর মূর্তি — চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়	ঐ (ফাঁসী ডাঙ্গা)	গুপ্ত যুগ
৩৭। রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা অনেকগুলি	ঐ	১৩-১৪শ শতক
৩৮। ঐ	ঐ	সুলতানী আমল
৩৯। প্রস্তর নির্মিত ৫.৫ সেমি ব্যাসের একটি সীলমোহরের ছাঁচ একটি দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ এবং দুটি লাইন ৭ টি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা 'রাজগৃহ ছন্দোগ/পরমস্য।' (অক্ষর নীচের লাইনে কিছুটা ভগ্ন)	আটঘরা – সীতাকুণ্ডু (গোলাম আলি সর্দারের ভিটা)	আঃ মাঃ যুগ খৃঃ ১ম - ২য় শতক
৪০। পোড়ামাটির ৪ সেমি ব্যাসের একটি সীলের একদিকের এক দেবী দণ্ডায়মান ও নীচে কিছু অক্ষর অপর দিকে কয়েকটি প্রতীয় চিহ্ন	সীতাকুণ্ডু	ঐ
৪১। পোড়ামাটির বৃক্ষোপসনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ অশোকের আমলের ব্রাহ্ম লেখ	ঐ	মৌর্য

৪২। ঐ	পাত্রের হাতল	ঐ	খৃঃপূঃ ১ম-২য় শতক
৪৩। সাদা বেলে পাথরে তৈরী হংস মুখ ও খোদিত চন্দন প্রঙ্ক		ঐ	? (গোলাম আলি সর্দারের পুকুর)
৪৪। কালো শক্ত পাথরে তৈরী চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি পদ্ম , চক্র, গদা, শঙ্খ ধারী (PCGS), ডানে লক্ষ্মী দেবী ও বামে সরস্বতী সহ পূর্ণাঙ্গ মূর্তি (পদ্মপুরাণ অনুসারে ঃ হৃষিকেশ)			সীতাকুণ্ড – সেনযুগ
৪৫। কালো প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি দ্বিবাহু বিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য করা বাম হস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা		ঐ	আদি – পাল যুগ

এছাড়াও এই অঞ্চল থেকে অনেকগুলি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ও জৈন-বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। প্রচুর পটারী, টেরাকোটা, মুদ্রা এবং অর্ধ সমাপ্ত মূর্তি (প্রস্তর) পাওয়া গেছে বলে নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আদি গঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা' নামক গ্রন্থটি থেকে জানা যায়।

বারুইপুরের উত্তর সীমানার শেষ গ্রাম পেটোতে একটি তুর্কী পাঠান আমলের ভাঙা মসজিদ অশ্বত্থ গাছের শিকড়ে আবদ্ধ রয়েছে এর ইট অনেকেই সংগ্রহ করে রেখেছেন। অনুরূপভাবে মল্লিকপুরের বেনিয়া ডাঙ্গার একটি ভাঙা প্রাচীন মন্দিরের (বাংলা ১০১০ সাল) ইট ও কয়েকজনের সংগ্রহে রয়েছে। বহুকাল পূর্বে হরিহর পুরের বালির স্তর থেকে কতকগুলি প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি ফলা ও চাঁচক জাতীয় - এবং কয়েকটি বেশ তীক্ষ্ম ব্যবহৃত এই প্রস্তর হাতিয়ার গুলি নব্য প্রস্তর যুগের বলে অনুমিত (আদিগঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা, পৃঃ ৫৭)।

যোগীবটতলায় নেমে ডিহি-মেদন মল্ল গ্রামের বিশালাক্ষ্মী তলার বিশালাক্ষ্মী থানটি কত প্রাচীন তা সঠিক বোঝা না গেলেও দেখা গেল যে এখানে প্রায় ১৫ ইঞ্চি উচ্চতার শ্বেত পাথরে তৈরী সিংহারূঢ়া সবস্ত্রা, সালংকারা নানা আয়ুধধৃতা চতুর্ভুজা দেবী বিশালাক্ষ্মী বলে পূজিতা হচ্ছেন। মূর্তিটির ওজন প্রায় দশ কিলোগ্রাম। মূর্তিটি ২০০ বছরের প্রাচীন বলা হলেও ভাস্কর্য শিল্প শাস্ত্র অনুযায়ী এটি প্রাচীন নয় বলেই মনে হয়। প্রাচীন নয় তার থানটিও। যাইহোক, শ্বেতপাথরের মাহেশ্বরী মূর্তির (?) মত এই মূর্তিটি সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ গণযে আগ্রহী হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

(২) রামনগর– শাসন–বনবেড়িয়াচঙ্গের দহ অঞ্চল ঃ

আদিগঙ্গা – পিয়ালী নদী অববাহিকা অঞ্চল। উত্তরভাগ রামনগর অঞ্চলের ইটখোলাগুলি থেকে প্রাচীন পটারী, টেরাকোটা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। রামনগর, চঙ্গ, কুলপীর মাঠ অঞ্চলে মাটির নীচে গৃহ ভিত্তি, কূপ সহ জনবসতির চিহ্ন পরিস্ফুট। এ সব অঞ্চল থেকে বড় চওড়া

ইট এবং মধ্যযুগীয় ইট দ্বারা নির্মিত ভিত্তি, প্রাচীর মন্দির ভিত্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে নানা রকম মুদ্রা, অলংকার , নিজ ব্যবহার্য পটারী ও টেরাকোটা মূর্তি পুতুল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে কয়েকটি প্রাচীন পানীয় জলের পুকুর বা গঙ্গার অবরুদ্ধ খাত এবং দহ ইত্যাদি অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল। চঙ্গের দহ, কালিদহ, শিঙাদহ প্রভৃতি দহ বা হ্রদ অথবা গঙ্গার খাত গুলি থেকে অনেকগুলি প্রস্তর মূর্তি, পুতুল, টেরাকোটা, বীড়স্ ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। তে-সতীনের পুকুরটিকে বিশেষভাবেই প্রত্ন সমৃদ্ধ বলা চলে।

এই তিন সতীন বা তে-সতীনের পুকুর থেকে অনেক প্রত্নবস্তুই পাওয়া গেছে। কিন্তু বিশেষ যে মাতৃকামূর্তিটি পাওয়া গেছে এবং যেটি এখন বারুইপুর সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে – সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এটি যমী বা মাহেশ্বরী (মতান্তরে জৈনবিদ্যাদেবী)র মূর্তি। ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকেই এই প্রস্তরময়ী দেবী মূর্তি মিত্রপুকুরের সংস্কার কালে উঠে আসে। মীরপুর ও দাদপুরের দাদপুকুরে অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। এককালে দাদপুরের (JL 83) বৃহদায়তন পুকুরটিকে জলসেচেও শুকনো করা যেত না – জল ছিল কাকচক্ষু, টলটলে। পানীয় জলের জন্যই এই সব পুকুরকাটা – পাড়গুলো ভীষণ চওড়া – বন্যা দুর্গতের আশ্রয় স্থলের জন্য ও হয়ত পরিকল্পিত। কতদিনের পুকুর তা কেউ জানে না – জানে না ইতিহাস। নানা কাল্পিত কাহিনী, যখের পুকুরের কাহিনী আজও প্রচলিত। পাড় এবং খাদ অঞ্চল থেকে মাটি কাটার সময় প্রচুর প্রাচীন পটারী , টেরাকোটা মূর্তি, বেশ কিছু কালো প্রস্তর খণ্ড, নুড়ি পাথর, মাকড়া পাথর বেরিয়ে আসছে। টেকা (JL78) ও বলবলিয়ার মধ্য দিয়ে আদিগঙ্গার 'টেক' বা বাঁক পূর্বে কেশবপুর (JL 84) এবং পশ্চিমে এই দাদপুরের সীমানা দিয়ে বেরিয়ে মগরাহাট থানার বনসুন্দরিয়া (JL-193) ও তসরালার ভিতর দিয়ে প্রাচীনকালে প্রবাহিত হত এখনো বর্ষার ধারায় আদিগঙ্গার এই বিস্তৃত খাদে ডোঙা বাওয়া যায়। নিকটেই শ্মশান এবং দক্ষিণ পূর্ব তীরে বনসুন্দরিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন টেরাকোটা সমৃদ্ধ শিবমন্দিরটি।

দাদপুকুর এবং তার সান্নিহিত বিশাল বিশাল ঢিবিগুলি থেকে অজ্ঞাতে অনেক প্রত্ন সম্পদ নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ -পশ্চিম কোণের পাড়ের ভগ্নমন্দির (?) টির অর্ধাংশ পঞ্চাশ বছর আগেও জঙ্গলাবৃত অবস্থায় দেখা যেত। এখন কিছু চওড়া চওড়া ইট ইতস্তত পড়ে আছে। রাস্তার উপর পুকুরের উত্তরপাড়ে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর খণ্ডও পড়ে আছে। প্রত্ন সম্পদ বিষয়ে গ্রাম বাসীরা নীরব। মামুদপুরের (JL-62) দক্ষিণ পূর্বে এবং ইন্দ্রপালার (JL 63) পূর্বদিকে বিদ্যাধর পুর গ্রামে কয়েকটি মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী আছে। একজন বিধবা মহিলার ঠাকুরঘরে অনেক লৌকিক দেবতার ছলন মূর্তির মধ্যে প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি প্রাচীন দেব-দেবী মূর্তি আছে। পার্শ্ববর্তী ধর্মরাজের থানে রয়েছে আরও কয়েকটি লৌকিক দেবদেবী কতকগুলি ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড এবং একটি প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা একটি সরু প্রস্তর খণ্ড (মুসল বা প্যাস্টেল ?) এখানে দেখা গেল। মূল দেবতা এখানে হলেন ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজ কিন্তু ধর্মঠাকুর নন– এটি একটি প্রাচীন খুব সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারী চতুর্ভুজ প্রায় অক্ষত কালো ব্যাসাল্ট পাথরের এই বিষ্ণু মূর্তিটি প্রায় ৩১/২ ফুট উচ্চ। এটি প্রায় দু'শ/আড়াইশো বৎসর আগে বারুইপুরের শাখারী পুকুর (JL-106) থেকে মাটি কাটার

সময় এটি আবিষ্কৃত হয় এবং সামান্য ভগ্ন হওয়ার জন্য বারুইপুরের জমিদার এটিকে গ্রহণ করেননি (শুধু সেকারণেই নয় – তাঁরা ছিলেন শাক্ত – আনন্দময়ীর পূজারী) তাই এই গ্রামে এনে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্মস্থান তৈরী করে সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে আজও বৈশাখী পূর্ণিমায় বার্ষিক পূজা ও মেলা করে চলেছেন। অষ্টদল দ্বিস্তরপদ্ম– পাপড়ীর উপর দণ্ডায়মান দুই পাশে যথাক্রমে ডাইনে পদ্ম বা দেবীলক্ষ্মী এবং বামে শঙ্খদেবী বা সরস্বতী। শাস্ত্রানুসায়ী এটিও 'ত্রিবিক্রম' বিষ্ণু চালচিত্রের উপরে মাল্য হস্তে দুদিকে দুটি ফ্লাইং অপ্সরা এবং শীর্ষে কীর্তিমুখ। স্থাপত্যশিল্প রীতির এটি সেনযুগের প্রথম দিকের বলে মনে হয়।

কালিকাপুরের উত্তরে দেবীপুর নামক গ্রামে একটি বিশালপ্রত্ন জলাশয় রয়েছে এর নাম ও দেবীপুকুর। প্রচুর প্রত্ননিদর্শন এখানে রয়েছে। আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত শাসন গ্রামটি (JL--66) এখন বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের (১১৭৯–১২০৬ খৃঃ) গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের উৎপত্তি এই শাসন বা 'বিড্ডারশাসন' নামক গ্রাম দানের জন্যই। লক্ষ্মনসেন তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় রাজ্যাংকে এই গ্রামদন করে আলোচ্য তাম্রলিপিটি তাঁর 'আদেশ' বা 'শাসন' (সনদ) হিসাবে জারি করেন। তাম্রশাসনের চৌহদ্দিতে বলা হয়েছে যে প্রদত্তগ্রামের পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে স্রোতবতী জাহ্নবী, পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র, দক্ষিণে লেংঘদেব অর্থাৎ লিঙ্গদেবের মন্দির এবং উত্তরে ধর্মনগরী। এই গ্রামটি সম্পূর্ণ দান করা হয়নি–দানকৃত জমির পরিমাণ ঃ প্রচলিত (তৎকালীন) ৫৬ হাতে 'এক নল' এই মাপ হিসাবে ষাট ভূ-দ্রোণ-সতের উন্মণ মাত্র এবং এর বার্ষিক উৎপাদন মূল্য প্রতি দ্রোণে পনের পুরাণ (মুদ্রা) হিসাবে মোট নয়শত পুরাণ।

কালিদাস দত্তই প্রথম সঠিকভাবে গ্রামটিকে চিহ্নিত করেন। শাসন গ্রামের লিঙ্গদেবকে এখনো চিহ্নিত করা যায়নি। কেউ কেউ অনুমান করেন শাসনের প্রাচীন শিব মন্দিরগুলির একটি হয়ত সেই 'লেঙ্ঘদেব' মন্দির। কিন্তু দেখা যায় যে কোনটিই এত প্রাচীন মন্দির নয়। দু'একটি অনুমান হল দক্ষিণরায় মন্দিরে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গটি দেখা যায় সেটি মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর কোনভাবে পরবর্তিকালে ওখানে স্থান পেয়েছে। আর একটি প্রাপ্ত লিঙ্গকে সূর্যপুর ঘাটের কাছে সম্প্রতি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পশ্চিমের ডালিম্বক্ষেত্র টিকে ও সঠিকভাবে এখনো প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। উত্তরের ধর্ম নগরীকে 'ধামনগর' বলে চিহ্নিত করা গেছে। W.W. Hunter ও কালিদাস দত্ত একই কথা বলেছেন। শাসনে এবং তুলোর বাদার নিকটবর্তী স্থানে মাটির বৃহৎপাত্রে কয়েকটি স্থান থেকে প্রচুর 'কড়ি' পাওয়া গেছে। পাল-সেন আমলে বহু প্রচলিত মুদ্রা ছিল 'কড়ি'।

বারুইপুরের গর্বের বিষয় যে বারুইপুরে দু'টি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা রয়েছে। একটির কথা আগেই বলা হয়েছে আটঘরা প্রসঙ্গে। বর্তমান সংগ্রহশালাটি রামনগরে। কালিদাস দত্তের মৃত্যুর পরে তদনুরাগী বর্ষিয়ান লোকসংস্কৃতিবিদ ও পুরাতাত্ত্বিক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ' কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা' (বর্তমান পরিচালনার ঃ রামনগর পাঠাগার) স্থাপন করেন ১৯৬৯ সালের বিশে জুলাই। দেশ বিদেশের মুদ্রাসহ বেশ কিছু ভাল সংগ্রহ এখানে রয়েছে। আটঘরা, সীতাকণ্ড, উত্তরভাগ, দমদমা, চঙ্গের দহ, কুলপীর মাঠ ও রামনগরের প্রত্ননিদর্শন সহ

হরিনারায়ণপুর, চন্দনেশ্বর ঢোষা, কঙ্কণদীঘি ইত্যাদি স্থানের প্রত্ননিদর্শন, বহু পুঁথিপত্র, জমিদারী চিঠি ও দলিল পত্রাদি। এবং বারুইপুরের মানিকতলা কোর্টের সীলসহ রেকর্ডপত্র এখানে রক্ষিত আছে। কয়েকটি প্রত্ননিদর্শনের উল্লেখ করা হল ঃ

১। পোড়ামাটির খুবই দুষ্প্রাপ্য একটি লক্ষ্মী মূর্তি বামকক্ষে ঝাঁপি আঃ মাঃ যুগ

................আটঘরা ...... শুঙ্গ-কুষাণ যুগ

২। কালো এবং পিকে হলদে রঙে কাঁচামাটির ভাঁড় জাতীয় মৃৎপাত্র -২৫ফুট নীচ থেকে পাওয়া চিত্রশালী সীতাকুণ্ডু ?

৩। একটি লেখ দলিল ঃ আটঘরার মধ্যে একটি গ্রামনাম 'একব্বর পুর' বা আকবরপুর – 'তঃ (তরফ) আটঘরা মৌজে – 'একব্বর পুর' আটঘরা ১৭৮৩

৪। বিক্রয় কোবালায় ছাপ ঃ 'Seal of the Deputy Registrary Baruipur বারুইপুর ....১৮৮৫ খৃঃ

৫। সীলমোহর (ছাপ) 'মানিকতলার মুনসেফী বিচারালয় ১৮৬৭ খৃঃ' ষ্ট্যাম্প রয়েছে, আর একটি ১৮৬২ খৃঃ সীলমোহর পাওয়া গেছে বারুইপুর.................১৮৭৪খৃঃ

৬। উত্তরভাগে (ইটভাটার ২৫´ – ৩০´ নীচে) কাঁচামাটির ভাঁড় , পোড়ামাটির হাঁড়ি, গামলা, ঘট, প্রদীপ, পাতকুয়ার বেড়, দ্বি-মুখীবারা ইত্যাদি রামনগর .... ?

৭। শেরশাহের রৌপ্যমুদ্রা.. ঐ ....১৪৫০ খৃঃ

৮। পোড়ামাটির নানা রকম পটারী ইত্যাদি ছয়ানি ইটভাটা .... ?

৯। প্রাচীন ইট (পোড়ামাটির) ....চঙ্গ –রামনগর ও কুলপীর মাঠ

১০। পোড়ামাটির প্রাচীন টালি, পটারী, জলাধার ঐ ?

১১। ঐ জলপাত্র ও পটারী .... ঐ ১৫ শতক

১২। প্রস্তর নির্মিত তিনটি দেবদেবীর মূর্তি ঐ ?
(ধপধপির কালী চক্রবর্তীর বাড়ীতে রক্ষিত)

১৩। ছোট 'কড়ি' এক কলসী .... ঐ ১৬ শ শতক

১৪। পোড়ামাটির যক্ষিণী, একটি গোপাল মূর্তি নলগড়া .... ?

১৫। ঐ – সীলযুক্তটালী এবং রাস্তা নির্মাণের সময় জয়নাগের স্বর্ণমুদ্রা (বারুইপুর সুন্দরবন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত)................................. নবগ্রাম .... গুপ্তযুগ (?)

১৬। কার্বন হয়ে যাওয়া কাষ্ঠ খণ্ড কুমারহাট ইটখোলা....... ?

১৭। পোড়ামাটির প্রদীপ, ঘোড়া, ফলক, মৃৎপাত্রাদি বেলেগাছি .... ?

১৮। ঐ ইট পেটো পাঠান আমল

১৯। ঐ ঐ বেনেডাঙ্গা ....১০১০ বঙ্গাব্দ

২০। পাথরের বজ্রশানী – যোনিপট্ট প্রদীপ কালিদহ (আলিপুর) .... গুপ্তযুগ(?)

২১। বিষ্ণুমূর্তি ৪˝ x ৩˝ (কালী বলে পূজিত) কালিদহ .... পালযুগ
কালিদহ তীরে কালীর ঘরে রক্ষিত

২২। তাম্রমুদ্রা ৬ টি (কুষাণ) ....দমদমা–বৃন্দাখালি ....কুষাণ
(পিয়ালী তীরে)

অনেকে মনে করেন চঙ্গের দহ কুলপীর মাঠ অঞ্চল একটি বৃহৎ গড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর নীচের প্রাচীর ও গৃহাদির প্রচুর ভিত্তি রয়েছে। তে-সতীনের যমী মূর্তির কথা আগেই বলা হয়েছে।

ধপধপির দক্ষিণরায় মন্দিরে রক্ষিত চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার মূর্তি খুবই বিরল প্রকৃতির বেলেপাথরে তৈরী একটি নিটোল শিল্প ভাস্কর্য।

শিল্প রীতির দিক থেকে মূর্তিটি গুপ্তযুগের শিল্প শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ বলে মনে হয়। বর্গাকার চালচিত্রে অন্য কোন কারুকার্য নেই। নীচের দিকে মূর্তিটিকে বসানোর জন্য পাদপীঠের নীচের প্রস্তর খণ্ডটি রয়েছে।

(৩) তৃতীয় এবং সর্বশেষে আলোচনার অঞ্চল হল ধোপাগাছি – ধামনগর–বিড়াল অঞ্চল।

আগেই বলা হয়েছে লক্ষ্মণ সেনদেবের গোবিন্দপুর , তাম্রশাসনে প্রদত্ত গ্রামের উত্তর সীমানা হিসাবে ধর্মনগরের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। প্রাচীন ধর্মনগর বেশ বড় গ্রাম ছিল। সম্ভবত উত্তরকল্যাণপুর (JL-38) পুরন্দরপুর (JL-39) , বিড়াল (JL-37) ধামনগর, ধোপাগাছি-ধামনগর (JL-43) ইত্যাদি বর্তমান গ্রাগুলি পূর্বতন 'ধর্মনগর' ভেঙে তৈরী হয়েছে– বিভিন্ন সময়ে এবং যুগের প্রয়োজনে।

এই আলোচনায় যাবার আগে নিহাটা-কল্যাণপুরের (41,42,43) প্রত্নসম্পদ সম্বন্ধে একটু বলে নিতে চাই। মধ্যকল্যাণপুরের দাস পাড়ার কাছে ধর্মতলায় এক সময় প্রাচীন কিছু প্রস্তর খণ্ড এবং জড়ি ইত্যাদি ছিল। শোনা যায় এখান থেকে কিছু প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।

নিহাটার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি বিশাল প্রত্নপুকুর রয়েছে। এই নিহাটা কল্যাণপুরের বিভিন্ন পুকুর কাটার সময় অনেক প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল– কিন্তু সেগুলির হদিস এখন পাওয়া যায় না। খগেন্দ্র নাথ নস্করের বাড়ীতে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ রয়েছে। শৈলেন সাঁফুই–এর বাড়ীতে সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। কালোপ্রস্তর নির্মিত এই বিষ্ণুমূর্তিটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত । চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সুঠাম এই বিষ্ণু মূর্তিটি পাল যুগের শেষ দিকের বলে মনে হয়।

দক্ষিণ কল্যাণপুর রয়েছে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। প্রাচীন মন্দিরের সেই ধ্বংসস্তুপের উপর নির্মিত হয়েছে একটি সুন্দর আধুনিক কংক্রীট ঢালাই-এর পঞ্চরত্নশিবালয়। স্থানীয়

অধিবাসীদের কাছে এটি বুড়োশিবতলা। একাদশ দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের সময়ে এই শিবমন্দির ছিল না বলেই মনে হয়

কল্যাণ মাধব মন্দিরে রয়েছে প্রাচীন বুড়োশিবের কালো পাথরের লিঙ্গ মূর্তিটি। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়েছিল নতুন মন্দিরের ভিত খোঁড়ার সময়। বেশ কিছু প্রত্নসামগ্রী ও পাওয়া গিয়েছিল। ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরের দ্বারবাজুদ্বয়ের একটি উদ্ধার করা গেছে। পুরাতন মন্দিরের পূর্বদিকের দরজার নীচে থেকে এই প্রস্তর খণ্ডটি উদ্ধার করা হয়েছে। ক্ষয়প্রাপ্ত বালিপাথরে তৈরী এই লম্বা প্রস্তর খণ্ডটি প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এবং ৮″ – ১০″ইঞ্চি চওড়া। নীচের দিকে খোদাই করা একটি দেবীমূর্তি। ডানহাতে ধৃত সনাল পদ্ম, ফুলটি নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। বামহাতে ও কিছু একটা ধরা আছে। দেবী সালংকারা। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা মনোমোহিনীরূপে দ্বিভঙ্গে কূর্মের উপর দণ্ডায়মানা। উপরে সুন্দর চন্দ্রাতপ। দেবীর মুখমণ্ডল ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। কদলী বৃক্ষের ন্যায় সুঠামদেহ বল্লবী– বামদিকের বস্ত্রাঞ্চল প্রায় পায়ের কাছে নেমে এসেছে। কূর্মবাহিনী এই দেবী যমুনা। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে (Acc No By 2/ A 25104) এইরূপ একটি দ্বার শাখা কূর্মবাহিনী যমুনা রয়েছে যেটিকে আঃ মাঃ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর বলা হয়েছে। দ্বারা বাজু বা দ্বারশাখায় সাধারণত দ্বারলক্ষ্মী হিসাবে কূর্মবাহিনী যমুনা ও মকরবাহিনী গঙ্গা–এই দুটি মূর্তিই লাগানো হয়। সেজন্য মনে হয়, গঙ্গাশোভিত আর একটি দ্বারশাখা ধ্বংসস্তুপের মধ্যে এখনো থেকে গেছে অথবা ইতিপূর্বেই স্থানান্তরিত হয়েছে।

১৯২৯ খৃঃ দক্ষিণ গোবিন্দপুরের হোঁদা বা কালাকর্পূর পুকুর কাটার সময় লক্ষ্মনসেনের গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসনটি আবিষ্কার হয়। তাম্রশাসনটির উপরে সেনরাজবংশের সীলমোহর, এটি প্রায় বর্গাকার ১৩.৫ ইঞ্চিx ১২.৫ ইঞ্চি একটি মোটা তাম্রপট্টের উভয় দিকে খোদিত। সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব শর্মাকে বদ্ধমানভুক্তির পশ্চিমখাটিকার বেতড্ড চতুরকে বিড্ডার শাসন গ্রামটির ষাট দ্রোণ সতের উত্থান জমি দান করে এই তাম্রশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব তাঁর রাজ্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষে। দানকৃত গ্রামের উত্তরে এই ধর্মনগর।

W.W.Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal এ উল্লেখ করেছেন "Dhamnagar is a village in Baruipur Sub-Division which contains the house of a Hindu Raja named Dastidar who drowned himself in order to escape being dishonoured by the Mohanmadans. There is a tank in the village in the midest of which grows a pipal tree. and the people have a tradition that it springs from the top of a temple buried be neath the water" (Page 116, W.B. Govt. reprint, Vol-I, Part -I 1998)

উক্ত ধর্মনগর থেকে ভেঙে ধামনগর সহ গ্রামগুলি তৈরী হয়েছে। ধর্মনগরের ধর্মমন্দিরের অবস্থান ছিল বর্তমান ধোপাগাছি প্রাইমারী স্কুলের মাঠ সহ পশ্চিম দিকের ধর্মতলা নামক স্থানটি। সেখানে ধর্মঠাকুরের প্রস্তর মূর্তি এবং অন্যান্য প্রস্তর খণ্ড এখনো রয়েছে। সমস্ত

অঞ্চলটি খোসকুটি ও কড়িতে পূর্ণ ছিল – এখনো কিছু আছে। গৃহভিত্তি, বসতির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। নিকটেই রয়েছে বিশাল জলাশয় ধোপাগাছি সায়েব বা হাটখোলা পুকুর। নিকটে কিছু লৌকিক দেবদেবীর থান। হাট খোলা একটি প্রত্নপুকুরও বটে – এ টি সংস্কারের সময় শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি, প্রাচীন অলংকার, মুদ্রা, ইসলামিকমুদ্রা, পটারী, টেরাকোটা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ইসলামিক মুদ্রা ধোপাগাছি, টংতলা ইত্যাদি প্রায় সব গ্রামে পাওয়া গেছে। স্কুলমাঠের সামনের উঁচু ঢিবিগুলিতে চওড়া ভিতের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য এর বেশীর ভাগই ইসলামিক যুগে তৈরী।

হেঁদোপুকুরে মন্দির ধ্বংসাবশেষ, পদ্ম আঙুর গুচ্ছ খোদিত এবং বহুপ্রকার শিল্প সমৃদ্ধ ইট, দ্বারবাজু, প্রস্তর খণ্ডাদি, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর হাতিয়ার, মুদ্রা, অলংকার, শিলনোড়া ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

বর্তমান বিড়াল বা বিড়াল ধামনগর গ্রামে সম্প্রতি প্রচুর প্রত্নসম্পদের সন্ধান মিলেছে যা আনুমানিক গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত সময়ের নির্দেশ করে। গৃহভিত্তি, বিশাল পানীয় জলাশয়, স্তরে স্তরে বিভিন্ন প্রকার পটারী ও টেরাকোটা সমস্ত অঞ্চলের মৃত্তিকাগর্ভে পূর্ণহয়ে রয়েছে । সম্প্রতি জলের বৃহৎ পাইপ লাইন বসানোর সময়ও পাওয়া গেছে প্রচুর পটারী, উপকরণ দ্রব্যাদি, লৌহ কোদালের ভাঙা টুকরো, টেরাকোটা, প্রায় রেডওয়ার এর কাছাকাছি পটারী, ধূসর বর্ণের প্রচুর ডেকরেটেড পটারী, স্ট্যাম্পড, পটারী ইত্যাদি (বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' – ২০০২ দ্রষ্টব্য)।

পর্যালোচনা ঃ

আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে বারুইপুর অঞ্চলের কিছু প্রত্ন নিদর্শনের কথা বললাম। আরও অনেক বিষয় বাকি থেকে গেল অনেক প্রত্নপ্রাপ্তির কথা বলা গেল না। কিন্তু যে প্রত্ন নিদর্শনগুলির কথা বলা হয়েছে তার থেকে আমরা মোটামুটি ভূমির প্রাচীনত্ব এবং জনবসতির প্রাচীনত্বের কথা জানতে পারি। আদিগঙ্গা– পিয়ালী অধ্যুষিত এই অঞ্চলের কোন কোন অংশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল একথা বলা যায়। মৌর্য ও মৌর্যপূর্ব যুগথেকে যে সব প্রত্নবস্তু, ব্যবহারিক জিনিষপত্র লক্ষ্য করা গেছে তাতে মৌর্যযুগের শিল্প সংস্কৃতিতে এ-অঞ্চলের লোক যে অভ্যস্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষি পশুপালন ও মৎস্যশিকার যে এ অঞ্চলে তৎকালীন মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উপায় ছিল তাও প্রত্ননিদর্শনগুলির গভীর পর্যবেক্ষন থেকে জানা যায়। মেগাস্থিনিস এর বিবরণ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে তখন আক্রমণকারী বা শত্রুরাও কৃষিজমি ও চাষবাস শস্যাদি নষ্ট করত না। যুদ্ধের সময়ও চাষীরা নির্বিঘ্নে চাষ করতে পারত। রাজস্বের মূল আদায় ছিল উৎপন্ন ফসল থেকে। কৃষি ফসলের এক পঞ্চমাংশ থেকে এক দশমাংশ (ক্ষেত্রবিশেষ) রাজস্ব দিতে হত। যুদ্ধের সময় বা রাজকোষ কোন কারণে শূন্য হয়ে গেলে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করা হত। ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পী কারিগর কুমোর, কামার, স্বর্ণকার প্রত্যেকের পারিশ্রমিকের হার বাঁধা থাকত। চুরি ও দুর্নীতির কঠোরশাস্তি হত। পাল-সেন যুগে এমনকি আইন-ই-আকবরীর যুগেও আমরা মোটামুটি একই কৃষিনীতি দেখি। প্রশাসনিক বিভাগকে নানাভাবে সাজিয়ে গ্রাম পর্যন্ত অঞ্চল থেকে

কিভাবে কর আদায় করা যায় সে চেষ্টা সবাই করে গেছে। বনজঙ্গল হাসিল করে কৃষিক্ষেত্র বাড়ানো, বসতির প্রসার ঘটানো, নারকেল, সুপারী, বাঁশ, শিরিষ, বকুল, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে আয় বাড়াবার ব্যবস্থা করা হত। ফুলগাছ এবং বট-অশ্বত্থ গাছে গুটি পোকা বা রেশম চাষের ব্যবস্থা করা হত। পলাশ, শিমুল, পাট, শণ, তুলা এবং পান, তন্তু ও ব্যবসায়ের জন্য চাষ করা হত। জয়নাগের মলয়া তাম্রশাসন থেকে জানা যায় দক্ষিণবঙ্গের এ-সব অঞ্চলে প্রচুর সরিষা উৎপন্ন হত। গোবর্দ্ধনপুরের ইটের চিহ্ন থেকে দেখা যায় যে ধানের তুষ এবং চিটা ইট তৈরীতে প্রয়োজন হত। মৌর্যযুগের ইট আটঘরা সীতাকুণ্ডতে ও পাওয়া গেছে। গোবিন্দপুর এবং অন্যান্য তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে এ অঞ্চলে প্রচুর সুপারী, নারকেল, ডালিম ইত্যাদি চাষ করা হত। ধান প্রসঙ্গে .... তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে এ-অঞ্চলে (গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলে) সর্বোৎকৃষ্ট ধান উৎপন্ন হত। সারাবছর গাঙ্গায় এত জল থাকত যে দেবী গঙ্গা স্বর্গে প্রবাহের কথা ভুলেই গিয়েছিল। রাজস্বের আরও উৎসছিল বৃক্ষ অরণ্যাচ্ছাদিত বনভূমি। জলাভূমি (মৎস্যাদি), তৃণ-পুষ্পাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সম্পদ, দশপ্রকার দুষ্কর্মের জন্য ধার্য জরিমানা ইত্যাদি। অনেক সময় মন্দিরের ধনসম্পদ ও রাজকোষের অর্থ যোগান দিত। বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের রাজস্বের অংশ। পাল-সেন বংশের তাম্রলিপিতে মোটামুটি এসব সূত্রমেলে।
রাজ্য প্রশাসনকে দৃঢ় করার জন্য যেমন বিভিন্ন বিভাগছিল তেমনি সেহ বিভাগের এক এক জন প্রধান বা শাসনকর্তা থাকত। ভোম্মন পালের তাম্রশাসন থেকে 'সপ্ত অমাত্যের' কথা জানা যায়।

বিষয় বা ভুক্তি অধিপতি, মণ্ডলাধিপতিগণ খুবই উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসক। মন্ত্রীরা ছাড়াও ছিলেন গ্রাম পর্যায় শান্তি নানা প্রশাসক। তাম্রলিপি গুলিতে মোটামুটি যে নাম পওয়া যায় তা এই রকম ঃ

রাজামাত্য, মহাপুরোহিত, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, মহাপিস্যুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃৎ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভৌগিক, চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্য, গোমহিষা জীবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক ইত্যাদি। তাম্রশাসন ইত্যাদি জারী করতে হলে এদের ডাকতে হত। আর থাকত গ্রামবাসী, কৃষক, ব্রাহ্মণ, চট্টভট্ট জাতীয়রা ও অন্যান্যরা।

প্রত্ননিদর্শনগুলি থেকে দেখা যায় যে মাছধরা জালের কাঁঠি (পোড়ামাটির) যা থেকে মৎস্য জীবিদের তথ্য মেলে। নৌকার ভগ্নাংশ ও এ কাজের সমর্থক। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনের জন্য কড়ি, পাঞ্চমার্ক করেন; কাষ্ট-কপার কয়েন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হত। বিনিময় প্রথা ছিল। সীলগুলি থেকে বোঝা যায় এক স্থানের বিভিন্ন নামকরা জিনিষ বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে বা আনা হচ্ছে। Volieve সীল ও আছে। দেবতার নামে মানত চুকানোর সময় তা ব্যবহার করা হত ইত্যাদি। বড় পাত্র, ডেকরেটেড মৃৎপাত্র, এম্ফোরা, খেলনা, হাতি, ঘোড়া, মেষ, পুতুল ,দেবীমূর্তি, যক্ষিণী মূর্তি আমদানী রপ্তানী করা হত। বস্ত্র, মসলিন, তেজপাতা, গন্ধ দ্রব্য, স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, মূল্যবান পাথরের বীডস্ আমদানী-

রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ নিত। গৃহশয্যার দ্রব্যাদি বড় বড় মদ্য পাত্র বা Store Pots এবং তাদের সুন্দর সুন্দর ঢাকনা বাণিজ্যের অংশ ছিল।

ধর্মীয় ব্যাপারটা বারবার উচ্চমার্গের এবং লৌকিক এই দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হত। বিভিন্নতা ছিল এবং সেন আমলে সেটি বীভৎস ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে মৌর্যপূর্ব থেকে সেন যুগ পর্যন্ত জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের ধারাটি কখনো ক্ষীণভাবে কখনো প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল।

আটঘরা সীতাকুণ্ড অঞ্চলে এবং রামনগর অঞ্চলে প্রচুর জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপাচার ও উপকরণ পাওয়া গেছে। ছাটুয়ানদী থেকে জৈন তীর্থঙ্করের যে প্রস্তরমূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বারুইপুর থানার বোলবামনি গ্রামের জেলে পাড়ায় ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হত। মূর্তিটি সম্ভবত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সেটি কোনভাবে পাচার হয়ে গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কাঁটাবেনিয়া প্রভৃতি স্থানে এখনো কয়েকটি এরূপ বড় জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি রয়েছে। আটঘরা থেকে পোড়ামাটির অনেক কটি জৈন মূর্তির অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষাপাত্র, জৈন বৌদ্ধ প্রস্তরের দেবীমূর্তিগুলি, যমী, বারাহী, মূর্তি, জৈন সরস্বতী মূর্তিগুলি জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ ধারাকে বজায় রেখে চলেছে।

আগেই বলা হয়েছে এ অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে বিভিন্ন ব্যূহের বিষ্ণুমূর্তি। ভাগবতীয় বিষ্ণু, চতুর্বিংশতি ব্যূহের বিষ্ণু, দ্বিভূজ বিষ্ণু, অবতারবাদের বিষ্ণু ইত্যাদি সব কিছু আছে। সাধারণ কথায় আমরা শঙ্খগদা পদ্মধারী যে কোন বিষ্ণুকেই নারায়ন বললেও চতুবিংশতি ইত্যাদি ব্যূহবাদের ধারণা অনুযায়ী বৃষ্ণি বিষ্ণুর চারটি হাতের ঐ প্রতীক চিহ্নগুলির ক্রমপরিবর্তন সাপেক্ষে এক একটি বিষ্ণুকে এক এক নামে অভিহিত করা হয়। তবে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি। দামোদর, কেশব, নারায়ণ, অধোক্ষজা (বেশীরভাগই এই অধোক্ষজা, মতান্তরে ত্রিবিক্রিম) বিষ্ণুমূর্তি। অন্যদিকে অবতারবাদের বিষ্ণুও রয়েছে যেমন নরসিংহ বরাহ অবতার ইত্যাদি। আদি সূর্যপূজার উপকরণ ও মূর্তি (মৃন্ময়) কয়েকটি রয়েছে। শিবলিঙ্গ, শিব, উমামহেশ্বর এবং অন্যান্য তান্ত্রিক ও বৌদ্ধযানী দেবদেবী রয়েছে। তারা, কালী, মনসা ইত্যাদি পূজার প্রচলন ছিল। প্রচলন ছিল প্রজনন দেবদেবী যক্ষ, যক্ষিণীর মৃন্ময় মূর্তিপূজা, মিথুন (সৌভাগ) প্রতীকপূজা, মুণ্ডপূজার (বারালৌকিক; বুদ্ধ ও অন্যান্য - আর্য)। ধর্মঠাকুর পূজা (লৌকিক) নুড়ি ও পাথর পূজার পরিচয় রয়েছে। বৃক্ষপূজার একটি সীলও পাওয়া গেছে। তাছাড়া মুদ্রাগুলিতে চৈত্য, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকায় এই বৃক্ষ তথা বোধিবৃক্ষ পূজার চিত্র স্পষ্ট। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মুদ্রগুলির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। রোমান জাতীয় এম্ফোরা, রোমান সৈনিক ও দেবতা বৈদেশিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় যোগসূত্র সূচনা করে। আটঘরা সীতাকুণ্ড এবং নড়িদানা থেকে এরূপ মূর্তি পাওয়া গেছে।

প্রত্ননিদর্শন গুলি থেকে উন্নত রুচিবোধ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্প সুষমা ও শিল্প চর্চার উন্নতমান ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। যুগ হিসেবে সেকালের শিল্পীরা দক্ষতা ও নিপুণতায় বেশ উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছিল এবং দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসার দাবিদার ছিল। গুপ্ত ও গুপ্তপরবর্তী

যুগগুলিতে সর্বভারতীয় শিল্প দক্ষতায় আটঘরা সীতাকুণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীরা যথেষ্ট যোগ্যতার দাবিদার।

প্রত্ননিদর্শনের নিরিখে বারুইপুর জনজীবন প্রায় প্রাক্‌মৌর্যযুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে এক উন্নত সভ্যতার মধ্যমণি হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবেও এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু আমরা আজও জানি না প্রাচীন গঙ্গারাজ্যের মধ্যে কোন নামে সেদিন বারুইপুরের সৌরভ দেশ বিদেশের মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছিল।

তথ্যসূত্র ঃ- 1) IAR -- 1955 ইত্যাদি

2) The Encyclopedia of Indian Archaeology - Dr. A.Ghosh

3) South Asian Studies - 10- Chakraborty, Chatterjee & Goswami

4) নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা ও প্রত্নউৎখনন – সুধীন দে

5) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত (১ম-২য়) – কালিদাস দত্ত– সপাঃ ভট্টাচার্য ও মজুমদার।

6) Epigraphia Inidca - Vol XVIII, Vol XIX, Vol - XXVII, Vol . XXX

7) আদিগঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা – নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

8) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ – কৃষ্ণকালী মণ্ডল

9) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায় — কৃষ্ণকালী মণ্ডল

10) দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল — কৃষ্ণকালী মণ্ডল

11) সাক্ষাৎকার ঃ অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মানস মুখার্জী, রামনগর, বারুইপুর ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহশালা, যাদবপুর।

"চব্বিশ পরগণা বঙ্গদেশের একটি প্রধান জিলা। ইহার উপরিভাগও বিস্তর, ইহা রাজধানীর সন্নিকটে । এই জিলার বসুমতী শস্যরত্নে চিরভূষিতা রহিয়াছেন।

বারুইপুর এই জেলার মধ্যে একটি প্রধান এবং মেলার পীঠস্থান। কারণ এই মাঠে রাসপুর্ণিমার মেলা সাধারণ মেলা নহে, সুতরাং ইহা যে মেলার উপযুক্ত স্থান তাহা বলাই বাহুল্য।"

(মনমোহন বসুর ভাষণ হতে) ১২৭৮সন ২রা চৈত্র

বারুইপুরের মন্দির ও দেবালয় পুরাকীর্তি ঃ একটি রূপরেখা

সাগর চট্টোপাধ্যায়

বারুইপুর অঞ্চলে দেবালয়ের সূত্রপাত কোন শতক থেকে ? বলা শক্ত। সাহস করে বললেও তা অনুমান নির্ভর। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়া অনুমানকে নিশ্চিত করা যায় না। বারুইপুরে দেবালয় স্থাপত্যের আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া দরকার দক্ষিণ ২৪ পরগণা তথা পশ্চিমবাংলার দেবালয়-স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারা, যেহেতু বারুইপুর অঞ্চল এই প্রবহমান ধারার বাইরে নয়। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত মুসলমান-পূর্ব আমলে বারুইপুর অঞ্চলে কোন দেবালয় তৈরি হয়েছিল কিনা, তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এই জেলার রায়দিঘি অঞ্চলে আনুমানিক পাল-সেন আমলের ইটের একটি শিখর দেউলের (জটার দেউল) সমসাময়িক কোন দণ্ডায়মান দেবালয় কিংবা এই জেলারই পাথরপ্রতিমা থানার বনশ্যামনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, কুলতলি থানার দেউলবাড়ি বা সাগরদ্বীপের মন্দিরতলায় প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষের মত ইটের কোন সাবেকি দেবালয়ের নিদর্শন এখনো পর্যন্ত বারুইপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়নি বা চিহ্নিত হয়নি। জয়নগর থানার সরবেড়িয়া, কুলপি থানার করঞ্জলী বা পাথরপ্রতিমা থানার রাক্ষসখালি দ্বীপে ভূ-গর্ভে আবিষ্কৃত ভাস্কর্য ও অলংকরণ খচিত পাথরের স্তম্ভ/দ্বারবাজুগুলিকে অনেক গবেষক গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর সময়ের দেবালয়ের অংশ বলে মনে করলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ছাড়া এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বারুইপুর থানার দক্ষিণ কল্যাণপুর গ্রামে কল্যাণমাধবের আধুনিক পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে রক্ষিত দেবীমূর্তি খোদিত একটি পাথরের স্তম্ভ এই অঞ্চলে সুপ্রাচীন কোন দেবালয়ের অবস্থানের ইঙ্গিত করে। স্তম্ভটি ঐ মন্দির সংলগ্ন ভূ-গর্ভে আবিষ্কৃত । একই সঙ্গে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন একটি শিবলিঙ্গ যা উপরোক্ত মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি সাবেকি কোন দেবালয়ের অংশ বলে মনে করা অযৌক্তিক নয় অন্তত এই কারণে যে, বিগ্রহ হিসেবে উপরোক্ত তথাকথিত কল্যাণমাধবের কথা মধ্যযুগীয় প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে।[১] একই রকম ভাবে বারুইপুর থানার সূর্যপুরের কাছে 'বড়দুর্গা' গ্রামে 'বড়দুর্গা'র আধুনিক মন্দিরটি সুপ্রাচীন কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ওপর প্রতিষ্ঠিত এমন কথা গবেষকরা বলে থাকেন। সরাসরি 'বড়দুর্গা'র উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে (১৬৮৬ খ্রিঃ) 'দুই দুর্গা'র উল্লেখ এ অঞ্চলে কোন প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্বের ইঙ্গিতবাহী। এ সংক্রান্ত কিছু প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া গেলেও উপযুক্ত উৎখনন ছাড়া এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

পাল-সেন আমল পেরিয়ে মুসলমান আমলে বারুইপুর অঞ্চলে কি কোন মন্দির গড়ে উঠেছিল ? একটু তাকাই বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যের ইতিহাসের দিকে। খ্রিষ্টিয় তের শতকের তুর্কি অভিযানে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং দেব-দেউল বা দেবায়তন নির্মাণের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। এই ছেদ চলে টানা প্রায় দু'শ বছর। এরপর

নতুন করে বাংলায় মন্দিরচর্চা শুরু হয় পনের শতকে নবাব হোসেন শাহের আমলে[২] মন্দিরচর্চার সনাতন শিখর বা পীড়া শৈলীর আঙ্গিকের (যেমন জটার শিখর দেউল ইত্যাদি) পাশাপাশি সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের আঙ্গিকও এর সঙ্গে যুক্ত হয় যার প্রচলিত নাম বাংলা শৈলী। চালা, রত্ন, দালান ইত্যাদি আঙ্গিক নিয়ে দেবায়তন তৈরির এই নতুন শৈলীর উৎস হিসেবে ভাবা যেতে পারে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সেইসঙ্গে গ্রাম বাংলায় বাস্তু-স্থাপত্যের বহুবিধ রূপ। বহিরাগত ইসলামী স্থাপত্যের প্রয়োগও এই নতুন শৈলীতে যুক্ত হয়। এই সব কিছু নিয়েই বাংলার মন্দির-স্থাপত্য এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগোতে শুরু করে। স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় ভাস্কর্য ও অলংকরণশৈলী। নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই এগিয়ে চলার ধারা আজও অব্যাহত।

পনের শতকে বাংলা-শৈলীর মন্দিরের চিহ্ন আজ পাওয়া যায় না।[৩]

এই বিষয়টি বারুইপুরের ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়।[৪] যদিও এই শতকেই (১৪৯৫ খ্রিঃ) বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসামঙ্গলে বারুইপুরের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তবে বারুইপুরের কোন দেবালয় বা বিগ্রহের উল্লেখ সেখানে নেই। পাঁচশ বছর আগে বারুইপুর যে একটি গ্রাম বা জনপদ ছিল এই তথ্যটিও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ষোল শতকে বারুইপুর অঞ্চলে কোন মন্দির তৈরি হয়েছে এমন প্রত্ন-প্রমাণ নেই। ষোল শতকের ধর্মীয় ইতিহাসে বারুইপুরের অস্তিত্ব থাকলেও ঐ শতকে বারুইপুরে মন্দির তৈরি হয়েছে এমন কোন লিপিপ্রমাণও পাওয়া যায় না। অথচ এই ষোল শতক বাংলায় মন্দিরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন বিষ্ণু, শিব ও শাক্তদেবী বা মাতৃপূজা ছাড়াও শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের জন্ম ও সম্প্রচার সেইসঙ্গে একেশ্বরবাদ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা ও ভক্তির মাধ্যমে পূজা-পদ্ধতির প্রচলন এই শতকে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মমত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে যে অবদান রাখে নিঃসন্দেহে তা মূল্যবান। বিগ্রহ-পূজার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব পায় বিগ্রহালয় বা দেবালয় তৈরির গুরুত্ব। শুধু গৃহকোণে গৃহ-দেবতার প্রতিষ্ঠার বদলে গৃহের বাইরে বা লাগোয়া এক স্বতন্ত্র আলয়ে সর্বজনীন হিসেবে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ভাবনাও গুরুত্ব পায়। মুসলিম অনুশাসন বাংলায় হিন্দু-মন্দির তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মীয়-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না-করলেও ষোল শতকে বাংলায় হিন্দু-মন্দিরের সংখ্যার অপ্রতুলতাই লক্ষ্য করা যায়। এই ষোল শতক দক্ষিণ ২৪ পরগণা তথা বারুইপুরের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে। ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব এই জেলার আদিগঙ্গার পাশ দিয়ে বারুইপুর হয়ে পদব্রজে ছত্রভোগ পদার্পণ করেন। তাঁর দৌলতে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই জেলার বহু জায়গায় একান্তই গৃহ-দেবতা হিসেবে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা। সেইসঙ্গে আলাদা মন্দিরও বেশ কিছু জায়গায় তৈরি হয়েছে। বারুইপুর অঞ্চলে খ্রিষ্টিয় ষোল শতকে রাধা-কৃষ্ণের বা অন্য কোন মন্দির তৈরি হয়েছে এমন বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না মন্দিরের নিদর্শন, প্রতিষ্ঠালিপি বা মন্দির-সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যদেব বারুইপুরের আটিসারায় পরম বৈষ্ণব অনন্ত আচার্যের গৃহে সারারাত ছিলেন এবং অদূরে বর্তমান কীর্তনখোলা অঞ্চলে হরিনাম সংকীর্তন করেছিলেন। সেই অনন্ত আচার্যের আশ্রম আজ মহাপ্রভুতলা নামে একটি

আধুনিক দালান মন্দির। মন্দিরে গৌর-নিতাই-এর দারুমূর্তি দুটি তথাকথিত পাঁচশ বছরের প্রাচীন সেবকবৃন্দের এই দাবিও তর্কাতীত নয় প্রতিষ্ঠালিপি বা প্রামাণ্য কোন তথ্যের অভাবে। এক্ষেত্রে মন্দিরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রায় ৫০০ বছরের হলেও আক্ষরিক অর্থে তা পুরাকীর্তি নয় যেহেতু বর্তমান মন্দির-স্থাপত্যের কোন উপাদানই শতাব্দী-প্রাচীন নয়।

সতের শতকেও বারুইপুর অঞ্চলে কোন মন্দির তৈরি হয়েছে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ এই সতের শতকই বাংলায় মন্দির তৈরির উন্মেষকাল। বাংলার বার ভুঁইঞাদের আমলে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির নতুন বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বাংলায় পাশ্চাত্য বণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতা ও অর্থ বিনিয়োগ বাংলায় এক অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনেরও সূচনা করে যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই শতকেও বাংলায় মন্দিরের সংখ্যা অপ্রতুল। বারুইপুর ছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সতের শতকে কোন মন্দির তৈরি হয়েছে এমন লিপি ও মন্দিরের কথা শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মত কোনও প্রামাণ্য তথ্য মেলেনি। বারুইপুর থানার বেনিয়াডাঙায় (জে.এল.নং-১১, মৌজা হরিহরপুর, মল্লিকপুর স্টেশনের পূর্বে) রাধাকান্ত জীউ-এর আধুনিক দালান মন্দিরে রক্ষিত একটি শ্বেতপাথরের পুনঃসংস্কারলিপি (১৩২৫ সাল) থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১০১০ বঙ্গাব্দে বা ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে এই পরিবারেরই সদাশিব দে কর্তৃক নির্মিত। আপাতদৃষ্টিতে সংস্কারলিপিটি দেখে মনে হতে পারে আদি মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা প্রায় চারশ বছর আগে। বিষয়টি তর্কাতীত নয়। পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে মন্দিরটির সঠিক প্রতিষ্ঠাবর্ষ নিয়ে। সংশয় আছে গ্রামবৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রবীণদের মধ্যেও[৫]। প্রসঙ্গত এই বেনিয়াডাঙা গ্রামটি কিছুটা প্রাচীন। গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল বর্তমান বসতি পত্তনের পর বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের জমিদারিভুক্ত (আঠার শতকের শেষ) ছিল গ্রামটি। উনিশ শতকে হুগলীর সপ্তগ্রাম থেকে আসেন বেনে সম্প্রদায়ের বর্ধিষ্ণু ধনপতি দে, সুবীর দে প্রমুখ। জঙ্গল কেটে গ্রামের পত্তন করেন। কথিত 'বেনে' বা 'বেনিয়া' থেকেই গ্রামটির নাম বেনিয়াডাঙা। তাঁদের তৈরি জীর্ণ, পরিত্যক্ত একটি দুর্গাদালান আজও ঘন জঙ্গলে ঢাকা, দুর্ভেদ্য, শ্বাপদসংকুল। এই দে পরিবারের একটি পুকুর থেকে অষ্টধাতুর ছোট একটি সাবেকি দশভুজা মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মূর্তিটি গৃহদেবতা হিসেবে দে পরিবারে রক্ষিত। এটি আগে ছিল একটি দালান মন্দির। ১৩২৯ ও ১৩৭৪-এ দুবার দালান মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। শ্বেতপাথরের সংস্কারলিপির পাঠ – 'স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র দে / তস্য মধ্যমপুত্র / শ্রী গোবিন্দ চাঁদ দে / ১৩২৯।

দ্বিতীয় সংস্কার লিপির পাঠ –"অবিনাশ চন্দ্র দের / ষষ্ঠপুত্র / শ্রী হীরালাল দে কর্ত্তৃক সংস্কার হইল/ সন ১৩৭৪ সাল। শেষবার সংস্কারের পর তথাকথিত চণ্ডীর এই দালান মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণ, পলেস্তারা খসা, পরিত্যক্ত।

আঠার শতকের কথায় আসি। আঠার শতকেও বারুইপুর অঞ্চলে কোন মন্দির গড়ে উঠেছিল কি না তা জানা যায় না প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে। বারুইপুরে রায়চৌধুরীদের জমিদারির সূচনা আঠার শতকের শেষ দশকে (১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) এমন কথাই গবেষকরা বলে থাকেন[৬]।

রায়চৌধুরীদের কিছু দেবালয় স্থাপত্য বারুইপুরে দেখা যায়। এগুলির কোনটাই আঠার শতকের নয়। উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে তৈরি। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে রায়চৌধুরী ভিলার (১৮০৭ নাগাদ তৈরি বলে জানা গেছে) সামনে দিঘির পাড়ে প্রতিষ্ঠালিপিহীন পূর্বমুখী, চতুর্দিকে রোয়াকযুক্ত একদরজা বিশিষ্ট একটি প্রথাগত আটচালা শিবালয়। চারচালার ওপর দেওয়াল তুলে তার ওপর অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি চালা সংযোগে যে আটচালা মন্দিরশৈলী, তা বাংলায় প্রচুর তৈরি হয়েছে। এই জেলাতেও এই শৈলীর মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক। তুলনায় চারচালা মন্দিরের সংখ্যা অনেক কম। আর বারুইপুর অঞ্চলে চারচালা কোন মন্দির পুরাকীর্তি নেই বলেই আমার ধারণা। প্রসঙ্গত প্রথাগত দোলমঞ্চগুলি চারচালা হিসেবে পরিগণিত ও বেশী দেখা গেলেও গঠন স্থাপত্যে চারচালা মন্দির ও চারচালা দোলমঞ্চ দুটিরই আঙ্গিক আলাদা। বারুইপুর অঞ্চলে যে কটি মন্দির পুরাকীর্তি রয়েছে তা সবই আটচালা রীতির, ইটের তৈরী এবং উনিশ শতকের । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠালিপি পোড়ামাটি বা পঙ্খের অলংকরণ নেই। সবই মাঝারি মাপের শিবমন্দির যেখানে গর্ভগৃহের চার দেওয়ালের কোণে লহরার বিন্যাস (Pendentive) সহযোগে প্রথাগত পদ্ধতিতে গম্বুজাকৃতি ছাদ তৈরি করা হয়েছে এবং কোনটিতেই ভল্ট বা পাশখিলানের ব্যবহার নেই। বারুইপুরে চালা শৈলীর অন্তর্গত দোচালা (এক বাংলা), জোড়বাংলা, চারচালা অথবা বারচালা কোন মন্দির নেই। নেই রত্নশৈলীর অন্তর্গত এক, পাঁচ, নয়, তের, সতেরো বা তদূর্ধ কোন মন্দির পুরাকীর্তি। রেখ, পীড়া, বঙ্গীয় শিখরশৈলী বা মিশ্ররীতির কোন দেবালয়-পুরাকীর্তিও দেখা যায় না । এককথায় বারুইপুর অঞ্চলের হিন্দু দেবালয় স্থাপত্য দালান ও প্রথাগত আটচালা রীতির। আটচালা রীতির মন্দির-পুরাকীর্তি রয়েছে বেনিয়াডাঙ্গা (২টি, একটি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরটি দে (পোদ্দার) পরিবারের), পুরন্দরপুর (২টি, হালদার পরিবার), ধোপাগাছি (২টি, মণ্ডল পরিবার, এর মধ্যে একটি নিশ্চিহ্ন), সীতাকুণ্ডু (ছাটুই পরিবার), বেগমপুর (১টি, ভট্টাচার্য পরিবার), সাউথ্ গড়িয়া (১টি, চট্টোপাধ্যায় পরিবার), শাসন (৫টি, প্রতিষ্ঠাতা দুই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার), শাঁখারিপুকুর (১টি কালীমন্দির, ১৯৭৮-এ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্তী পরিবার, বারুইপুর রায়পাড়া (১টি, প্রতিষ্ঠাতা রায়বর্মণ পরিবার), বারুইপুর সাহাপাড়া (প্রতিষ্ঠাতা সাহা পরিবার), শিখরবালি গায়েনপাড়া (পাশাপাশি ৩ টি দেবালয়, প্রতিষ্ঠাতা কুন্দরালির মণ্ডল পরিবার), কুন্দরালি (১টি, পঞ্চাননের দালান মন্দির, বর্তমানে গাছপালা পরিবেষ্টিত হয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায়, প্রতিষ্ঠাতা মণ্ডল পরিবার) ইত্যাদি। তবে দেবালয় ছাড়া ব্যতিক্রমী কিছু স্থাপত্য পুরাকীর্তিও বারুইপুর অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকেও বারুইপুর অঞ্চলে প্রচুর দেবালয় তৈরি হয়েছে যা এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ভাস্কর্য ও অলংকরণ ঃ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বারুইপুর অঞ্চলে আটচালা মন্দিরগুলি ভাস্কর্য ও অলংকরণহীন। এর কারণ প্রতিষ্ঠাতা পরিবারগুলির বিত্ত ও রুচির অভাব নাকি উপযুক্ত মন্দির-শিল্পীর অভাব তা বলা শক্ত। বেশীরভাগ মন্দিরই খাটো ও সাদামাটা। কিছুটা ব্যতিক্রম বারুইপুর রায়পাড়ার একটি আটচালা ও পুরন্দরপুরের শ্মশান সংলগ্ন জোড়া আটচালা শিবালয়। কার্নিশের নিচে, পোড়ামাটির সারিবদ্ধ নরমুণ্ড, চক্র ও ফুলের সামান্য

কাজ ছাড়াও পুরন্দরপুরের মন্দির দুটি বারুইপুর অঞ্চলের অন্যান্য আটচালা মন্দিরগুলির তুলনায় কিছুটা বড় ও দৃষ্টিনন্দন। এই জেলার অধিকাংশ আটচালা দেবালয়ের মতই বারুইপুরের আটচালা দেবালয়গুলিতেও কৌলীন্য, রুচি, আভিজাত্য ও শিল্পসুষমার ছাপ পড়েনি। এর কারণ বিত্তের অভাব এটাইবা বলি কি করে। বারুইপুরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের তৈরি বারুইপুর রাসমাঠ সংলগ্ন খর্বাকৃতি আটচালা শিবালয়টিতেও রুচি বা আভিজাত্যের কোন ছাপ নেই। অথচ এই রায়চৌধুরী পরিবারেরই তৈরি দুটি দুর্গাদালান (বারুইপুর রবীন্দ্রভবনের উল্টোদিকে) তার বিশালত্ব ও শিল্পসুষমায় শুধু এই জেলা নয়, পশ্চিমবাংলায় একটি বিশেষ স্থান দখল করার দাবি রাখে। পঙ্খের এত সুচারু অলংকরণ বিরল। উনিশ শতকের শেষদিকে তৈরি হলেও পঙ্খের ফুলকারী ও জ্যামিতিক অলংকরণগুলি আজও অক্ষুণ্ণ। পাশাপাশি অলংকরণের দিক থেকে ততটা সমৃদ্ধ না-হলেও এই জেলার অন্যতম সুবৃহৎ ও সুউচ্চ একটি দুর্গাদালান চোখে পড়ে বারুইপুর থানার রামনগরের কৈলাস ঘোষ পরিবারে। বারুইপুর থানার অন্যান্য ঠাকুরদালানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – বারুইপুরের সাহাপাড়া (সাহা পরিবার), পুরন্দরপুরের ব্যানার্জী পরিবার, শিখরবালির পাল পরিবার, কুন্দরালির মণ্ডল পরিবার (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন), সাউথ গড়িয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়), চ্যাটার্জী, সরদার, ব্যানার্জী (অজিত ব্যানার্জী), হালদার, চাম্পাহাটির কর, নড়িদানার বাগানীপাড়ায় বাগানীদের দুর্গাদালান ইত্যাদি। শুধু অলংকরণ নয় এগুলির অধিকাংশই তৈরি হয়েছে ইউরোপ ও বঙ্গীয় স্থাপত্য ও অলংকরণ শৈলীর সম্মিলিত ধারায়। ভাস্কর্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে পুরন্দরপুরের ব্যানার্জীদের ঠাকুরদালানে Stucco-র গণেশ ও মনুষ্যমুণ্ড, বারুইপুর পুরনো বাজারের দোলতলার দোলমঞ্চটিতে পোড়ামাটির দেবমূর্তি ইত্যাদি।

<u>পাশ্চাত্য স্থাপত্যের প্রভাব</u> ঃ পশ্চিমবাংলায় বাস্তু ও ধর্মীয় স্থাপত্যে ইউরোপীয় স্থাপত্য অলংকরণ ও ভাস্কর্যশৈলীর প্রভাব পড়তে শুরু করে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা তথা বারুইপুর অঞ্চলে বিদেশী স্থাপত্য ও অলংকরণশৈলীর প্রভাব পড়েছে উনিশ শতকের আগে নয়। বারুইপুরের সম্ভ্রান্ত রায়চৌধুরী পরিবারের আদিবাড়িটি তৈরি হয় ১৭৯৩–১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এটিই বারুইপুর অঞ্চলে প্রথম সুবিশাল গৃহ যেখানে বিদেশী স্থাপত্য ও অলংকরণের প্রভাব পড়েছে। ধ্বংসপ্রায় এই বাড়িটিতে চোখে পড়ে টাস্কান রীতির স্তম্ভ। এই রীতির খর্বাকৃতি স্তম্ভের ব্যবহার হয়েছে রায়চৌধুরী ভিলার সামনে ইটের পরিত্যক্ত দেউড়ি, ফটক ও দক্ষিণমুখী পঞ্চখিলান দুর্গাদালানটিতে । স্তম্ভ ছাড়াও Stucco-র দণ্ডায়মান সিংহ ব্যবহৃত হয়েছে রায়চৌধুরী ভিলার ছাদে। এ সবই বিদেশী অনুকরণজাত। বোঝা যায় প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও পরে বৃটিশ রাজের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা এই ধরনের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি বিলাতিয়ানায় রপ্ত হয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরে বৃটিশ সরকারের আমলে এই প্রভাবের গভীরতা আরও ব্যাপ্ত হয়েছিল। তার প্রমাণ রায়চৌধুরী পরিবারের আর একটি বসতবাড়ি (বড়কুঠি) সংলগ্ন দুটি সুবিশাল দুর্গাদালান (বারুইপুর রবীন্দ্রভবনের উল্টোদিকে)। একটি ১২৮০ সাল অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি (প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত) । অন্যটিও সমসাময়িক সময়ে তৈরি বলে জানা গেছে। প্রথমটির

ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বিশুদ্ধ আয়নিক স্তম্ভ (Fluted)। আয়নিক Capital এই জেলায় বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও এমন বিশুদ্ধ আয়নিক স্তম্ভের ব্যবহার এই জেলায় বিরল। শুধু আয়নিক নয় এই দুর্গাদালানে বিদেশী Compound Pier বা গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভের অনুকরণে তৈরি প্রচলিত 'কলাগেছে' থামের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে চর্তুদিকে মোট ১২টি সরু, খর্বাকৃতি টাস্কান রীতির স্তম্ভ। পেডিমেন্টের ব্যবহার হয়েছে শীর্ষে। দুর্গাদালান লাগোয়া বসতবাড়ির একটি অংশে দ্বিতলের জানালায় ব্যবহৃত হয়েছে গথিক খিলান। এবং লম্বা বারান্দায় টাস্কান রীতির মাঝারি আকারের স্তম্ভ। অন্য অংশে করিন্থিয়ান স্তম্ভ। সুবৃহৎ টাস্কান স্তম্ভের আরো ব্যবহার এরই অনতিদূরে বড়কুঠির বাইরের দুর্গাদালানটিতে লক্ষ্য করা যায়। Compound Pier-এর ব্যবহার হয়েছে বারুইপুরের আরো কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন ঠাকুরদালানে। এগুলি হল বারুইপুর রাসমাঠ সংলগ্ন রায়চৌধুরীদের দুর্গাদালান, এরই অনতিদূরে সাহাপাড়ায় সাহাদের অলিন্দযুক্ত বহু পত্রাকৃতি পঞ্চখিলান দুর্গাদালান, পুরন্দরপুরের ব্যানার্জী পরিবারের অলিন্দযুক্ত পঞ্চখিলান দুর্গাদালান ইত্যাদি। এই তিনটি দালান মন্দিরেই গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভে ব্যবহার হয়েছে সরু টাস্কান রীতির স্তম্ভ। এ ছাড়াও একই ধরনের গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভের ব্যবহার হয়েছে বর্তমানে গাছপালা ও আগাছা পরিবৃত ও পরিত্যক্ত পাল পরিবারের ঠাকুরদালানটিতে। শিখরবালির এই পাল পরিবার বারুইপুর অঞ্চলে একটি বর্ধিষ্ণু পরিবার। রামনগরে কৈলাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ১৮৮২-র সুবিশাল দুর্গাদালানটিতেও গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চুন-সুরকির 'ফ্যানলাইট'-এর ব্যবহারও বারুইপুর অঞ্চলের কয়েকটি দেবালয়ে লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বারুইপুর সাহাপাড়া ও রামনগরের কৈলাস ঘোষ পরিবারের দুটি দুর্গাদালান। পুরন্দরপুরের ব্যানার্জীদের ঠাকুরদালানে আবার গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভ ছাড়াও আকর্ষণীয় পঙ্খের 'ফেস্টুন' এবং জ্যামিতিক নানা অলংকরণ সহ ভাস্কর্য হিসেবে Stucco-র গণেশ ও মনুষ্যমুণ্ড। পাল, রায়চৌধুরী, ঘোষ ও ব্যানার্জীদের দুর্গাদালানগুলি দক্ষিণমুখী, তবে সাহাদেরটি পশ্চিমমুখী। এগুলি সবই উনিশ শতকে তৈরি। বিদেশী স্থাপত্যের আরো ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে বারুইপুর পুরাতনবাজারে শোহাউস সিনেমার উল্টোদিকে রায়চৌধুরী পরিবারেরই আর একটি দ্বিতল বাড়িতে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন কৃষিঅধিকরণ কার্যালয়)। রাজবল্লভ রায় তাঁর মেয়ে মতিসুন্দরী দাসীর জন্য এটি তৈরি করেছিলেন বলে জানা গেছে। তৈরি করেছিল ম্যাকিনটোস-বার্ণ কোম্পানী উনিশ শতকের প্রথম দিকে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পেডিমেন্ট, টাস্কান স্তম্ভ ও অর্ধগোল খিলান। আবার গাড়ী বারান্দা বা পোর্টিকোর ব্যবহার দেখা যায় সাউথ গড়িয়ার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সুবিশাল বাড়িটিতে। পোর্টিকোর ভারবহন করছে সামনে ৬টি সুবিশাল করিন্থিয়ান স্তম্ভ। করিন্থিয়ান স্তম্ভের আরো ব্যবহার বাড়িটির অন্যান্য অংশে। উপরে ত্রিকোণ পেডিমেন্ট। বর্তমানে জীর্ণ, পলেস্তারাখসা। পুরোদস্তুর বিদেশীয়ানার ছাপ সুবিশাল এই বাড়িটিতে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, এই বাড়ির মূল পরিকল্পনা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়-এর। তৈরি করেছিলেন দুর্গাদাসের বাবা তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ির ভিতরে রয়েছে সুদৃশ্য দুর্গাদালান। এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে টাস্কান রীতির স্তম্ভ। বাড়িটি উনিশ শতকের শেষদিকে তৈরি। শুধু বারুইপুর নয়, এই জেলাতেও বিদেশী

স্থাপত্যযুক্ত এমন সুবিশাল বাড়ি বিরল। পূর্বোক্ত বেনিয়াডাঙা গ্রামটির পূর্বপ্রান্তে দত্তদের ঠাকুরদালানের ভগ্নাবশেষে পলেস্তারাখসা ইঁটের টাস্কান রীতির স্তম্ভ চোখে পড়ে। শুধু বাড়ি বা ঠাকুরদালান নয় বিদেশী স্থাপত্যশৈলীর আংশিক ছাপ লক্ষ্য করা যায় বারুইপুর পুরাতন বাজারের আগে দোলতলায় রায়চৌধুরীদের প্রথাগত উঁচু চারচালা দোলমঞ্চটিতে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে খর্বাকৃতি বিশুদ্ধ 'ডোরিক' স্তম্ভ। ডোরিক স্তম্ভের ব্যবহার এই জেলাতে বিরলদৃশ্য। এটি প্রমাণ করে দোলমঞ্চটি বৃটিশ আমলে তৈরি। স্থাপত্য রীতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সূত্রেও দোলমঞ্চটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে তৈরি বলে মনে হয়েছে। এই আকারের খর্বাকৃতি টাস্কান রীতির স্তম্ভের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মন্দিরেও। শিখরবালি, নালতের হাট, গায়েনপাড়ায় প্রতিষ্ঠালিপিহীন জীর্ণ, আগাছা পরিবৃত, পলেস্তারাখসা দক্ষিণমুখী পাশাপাশি তিনটি আটচালা দেবালয়ে এই রীতির স্তম্ভের প্রয়োগ প্রমাণ করে এগুলিও বৃটিশ আমলে তৈরি। যতদূর জানা গেছে তথাকথিত কল্যাণপুরের (কুন্দরালি) জমিদার মণ্ডল পরিবারের রতন মণ্ডল উনিশ শতকে এগুলি তৈরি করেছেন। মণ্ডলদের জমিদারির শুরু শিখরবালিতে। পরে কুন্দরালি গ্রামে (কল্যাণপুর স্টেশনের পাশে) তাঁদের বসতবাড়ি স্থানান্তরিত হয়। উপরোক্ত তিনটি পরিত্যক্ত মন্দির ছাড়া শিখরবালিতে মণ্ডলদের আর কোন স্থাপত্য পুরাকীর্তি লক্ষ্য করা যায় না।

<u>প্রতিষ্ঠালিপি</u> ঃ বারুইপুর অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দির-পুরাকীর্তি প্রতিষ্ঠালিপিহীন। প্রতিষ্ঠালিপির ব্যবহার লক্ষ্য করাযায় দোলমঞ্চ, ঠাকুরদালান, দালান মন্দির ও আটচালা মন্দিরগুলিতে। দেবালয় ছাড়াও প্রতিষ্ঠালিপির ব্যবহার হয়েছে জলাশয় স্নানঘাট নির্মাণেও। সংস্কার বা পুনঃসংস্কার লিপিও ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পোড়ামাটি ও শ্বেতপাথরের ফলক। মূল প্রতিষ্ঠালিপি বিনষ্ট বা অবলুপ্ত হতে পরবর্তিকালে সংস্কারলিপিতেও প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানতে পারা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠাতার নাম, প্রতিষ্ঠাকাল, বিগ্রহের নাম, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নাম ও পরিচয়, দেবালয়-শিল্পীর নাম ইত্যাদি। বেনিয়াডাঙার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দক্ষিণমুখী আটচালা ভুবনেশ্বর শিবালয়টি তৈরি হয়েছিল ১৭৩৮ শকাব্দ বা ১২২৩ সাল অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মিস্ত্রি। শ্বেতপাথরে হাতে উৎকীর্ণ এই লিপিফলকটিতে লিপিকর প্রমাদ কিছু লক্ষ্য করা যায়। অদূরে দে (পোদ্দার) পরিবারের দক্ষিণমুখী আর একটি আটচালা শিবালয়ের (খোকাশিব) প্রতিষ্ঠাফলকটি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে সংস্কারের সময় বিনষ্ট বলে প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রবীণেরা জানিয়েছেন। তাঁরা আরো জানিয়েছেন, পূর্বোক্ত ভুবনেশ্বর মন্দির ও আলোচ্য মন্দিরটি একই বছরে একই মন্দির-শিল্পীর (শ্রীকৃষ্ণ মিস্ত্রী) হাতে তৈরি। দুটি মন্দিরের গঠন-সাদৃশ্য দেখেও এই অভিমত সঠিক বলে মনে হয়েছে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণ মিস্ত্রী'র আর কোন পরিচয় জানা যায় না। প্রায় ২০০ বছর আগে তৈরি ভুবনেশ্বর মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে আসলে ১৩৭০ সালে তার আমূল সংস্কার করা হয়। সংস্কারের ফলে পরিবর্ধনের কারণে মন্দিরটির আয়তনেরও পরিবর্তন হয়েছে। এটি জানা যাচ্ছে এই মন্দিরটিতে প্রোথিত শ্বেতপাথরের একটি সংস্কার ফলক দেখে। এটির

পাঠ –

দেওয়ানজী চেরিটেবেল ট্রাষ্ট
কর্ত্তৃক
এই মন্দির আমূল সংস্কার
ও পরিবর্দ্ধিত করা হইল
১৫ই বৈশাখ ১৩৯০ সন

শুধু ফলক নয়, ভুবনেশ্বর মন্দিরটির শীর্ষের চারচালাটিতে চুন-বালির পলেস্তারায় হাতে কেটে উৎকীর্ণ করা হয়েছে ভুবনেশ্বর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাবর্ষ (১২২৩সাল)। অথচ এরই অদূরে 'খোকাশিবের' আটচালা মন্দিরটি তথাকথিত একই শ্রীকৃষ্ণ মিস্ত্রীর হাতে গড়া বলে শোনা গেলেও এই মন্দিরটিতে ভুবনেশ্বর মন্দিরের মতো হাতে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠাবর্ষের ব্যবহার হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি। থাকলেও সংস্কারের সময় পলেস্তারা-খসে তা নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না। গ্রামবৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রবীণদের শ্রুতি অনুযায়ী 'খোকাশিব'-এর মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন ব্রজনাথ দে ও দ্বারিকানাথ দে। এই ভুবনেশ্বর মন্দিরটির সামনে একটি বড়দিঘির স্নানঘাটে শ্বেতপাথরের একটি লিপি – 'হরদেব জলাশয় /১৩৪৬ সাল/শ্রী অমিয়'। এটি সম্ভবত দিঘিটির সংস্কার লিপি। কারণ দিঘিটি, গ্রামবৃদ্ধদের মতে শতাব্দীপ্রাচীন। আগে ছিল লাহা পরিবারের। পরে হস্তান্তর হলে 'হরদেব' অর্থাৎ হরদেব বর্ধন এটি সংস্কার করান। বললেন হরদেব বর্ধনের তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ কাশীনাথ বর্ধন (৫২)। তবে 'শ্রী অমিয়'র পরিচয় জানা যায়নি। এমনও হতে পারে হরদেব বর্ধনের স্মরণে দিঘিটি সংস্কার করেন শ্রী অমিয়। উপরোক্ত দুটি শিবালয় ফেলে কিছুটা উত্তরে এগোলে চণ্ডীর পরিত্যক্ত, ভগ্নপ্রায় দালান মন্দিরে ১৩২৯ ও ১৩৭৪-এর দুটি শ্বেতপাথরের সংস্কার লিপি চোখে পড়ে। এই সংস্কার লিপির কথা নিবন্ধের প্রথম দিকে বলা হয়েছে। পারিবারিক বংশপঞ্জিকার পুরোটা না-হলেও কিছুটা পরিচয় এই সংস্কার লিপি থেকে জানতে পারা যায়। তবে বেনিয়াডাঙা গ্রামটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লিপি এই গ্রামটির পূর্বপ্রান্তে আর এক দে পরিবারের রাধাকান্ত জিউ-এর আধুনিক দালান মন্দিরে রক্ষিত শ্বেতপাথরের একটি 'পুনঃসংস্কার লিপি'। লিপিটির পাঠ – 'সদাশিব দের দ্বারা সন ১০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত / সন ১৩২৫ সাল/ শ্রী গোবিন চাঁদ দে মহাশয়ের / প্রথমা পত্নী ঁরতনমনি দাসীর / স্মরনাথ দ্বিতীয় পত্নী শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী/ দ্বারা/পুনঃসংস্কৃত হইল।'

এই লিপিটির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা নিবন্ধের শেষে তথ্যসূত্রে বলা হয়েছে। ১৩২৫-এর পরও মন্দিরটিতে ১৩৮১ সালের আর একটি সংস্কারলিপি লক্ষ্য করা যায়।

সাউথ গড়িয়ার আটচালা দক্ষিণমুখী জীবনেশ্বর শিবমন্দিরটি ১২৮০ সাল অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন রামজীবন চট্টোপাধ্যায়। পুরন্দরপুরের শ্মশানচত্বরে উত্তর ও দক্ষিণমুখী মুখোমুখি দুটি আটচালা শিবালয়ই একই সঙ্গে তৈরি। দুটিতেই রয়েছে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠাফলক। লিপির ভাষা সংস্কৃত, হরফ বাংলা। লেখা হয়েছে প্রাচীন শব্দ-হেঁয়ালির প্রয়োগে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবর্ষ (১৮৫১খ্রিঃ) এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম এক হলেও শব্দ-হেঁয়ালির

বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মন্দিরদুটি তৈরি করেছিলেন হালদার পরিবার। এরই অনতিদূরে হালদার মোড় পেরিয়ে ধোপাগাছি গ্রামের কালীমন্দিরের কাছে মণ্ডল পরিবারের একটি আটচালা পলেস্তারা-খসা, ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত শিবমন্দির চোখে পড়ে। এটির দক্ষিণে পাশাপাশি আর একটি শিবমন্দির ছিল, বর্তমানে ধসে পড়ে নিশ্চিহ্ন। লুপ্ত মন্দিরটির শিবলিঙ্গ টি অবশিষ্ট মন্দিরটিতে এনে রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এই মন্দিরদুটি পুরন্দরপুরের পূর্বোক্ত জোড়া শিবমন্দিরের অব্যবহিত পরেই তৈরি হয়েছিল বলে প্রতিষ্ঠাতা পরিবার সূত্রে জানান হয়েছে। বারুইপুর রবীন্দ্রভবনের কাছে রায়চৌধুরীদের বাড়ির অভ্যন্তরে যে দুর্গাদালান, শ্বেতপাথরের একটি ফলক অনুযায়ী তা ১২৮০ সালে রাজকুমার রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্ভবত ঐ সময় কোন প্রতিষ্ঠাফলক বসানো হয়নি। এই কারণে দেবেন্দ্রকুমার রায় ২০ বছর বাদে ১৩০০ সালে বর্তমান প্রতিষ্ঠালিপিটি লাগান দুর্গাদালানটির প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার রায়কে স্মরণ করে। এই বাড়িরই বাইরে আর একটি সুবৃহৎ দুর্গাদালান। সেখানে অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। রায়চৌধুরীদের বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে দোলতলায় রায়চৌধুরীদের দোলমঞ্চটিতে পোড়ামাটির বিবর্ণ ও অস্পষ্ট একটি ফলক রয়েছে। এই ফলকের বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। বারুইপুর পুরাতন বাজারের সাহাপাড়ার আটচালা সংস্কার-করা শিবালয়টিতে কোনদিন প্রতিষ্ঠাফলক ছিল না। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূত্র থেকে মনে হয়েছে এটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের আগে নয়। বারুইপুর রায়পাড়ার আটচালা প্রতিষ্ঠালিপিহীন শিবমন্দিরটিও গঠনশৈলী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সূত্রে উনিশ শতকে তৈরি বলে মনে হয়েছে। ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের (দক্ষিণরায়) দালান মন্দিরটি শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী ১৯০৯-এ তৈরি বলে জানা গেছে।

<u>তক্ষণশৈলী ঃ</u> বারুইপুরে খুব প্রাচীন তক্ষণশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মহাপ্রভুতলার গৌর-নিতাই-এর দারুমূর্তি দুটি ৫০০ বছর আগের চৈতন্য সমকালীন আদি ও অকৃত্রিম মূর্তি বলে সেবায়েতগণ দাবি করলেও এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে সংশয় লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল আর্দ্র, লবণাক্ত ও বৃষ্টিপাতপ্রবণ বলে ইট ও কাঠের দ্রব্যের স্থায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই কম। এই নিরিখে ৫০০ বছর ধরে কাঠের কোন বিগ্রহ বিজ্ঞান নির্ভর কোন সুষ্ঠু সংরক্ষণ বিধি ছাড়া পুরোপুরি টিকে থাকবে এটা বিস্ময়কর। তাছাড়া বাংলায় চৈতন্য মহাপ্রভু বা গৌরাঙ্গ এবং গৌর-নিতাই-এর দারু-বিগ্রহ তৈরি হয়েছে চৈতন্য পরবর্তী সময়েই। বাংলার দারু-ভাস্কর্য প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন... চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে।' সেই হিসেবে উপরোক্ত দুটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তবে বারুইপুর অঞ্চলে কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাবেকি তক্ষণশৈলীর কিছু নিদর্শন এখনো চোখে পড়ে। এগুলি শতাব্দীপ্রাচীন না-হলেও তার কাছাকাছি বলে প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারগুলির ধারণা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারুইপুর সাহাপাড়ায় সাহাদের কয়েকটি সাবেকি কাঠের পালঙ্ক। গাছ, পাতা সেইসঙ্গে জ্যামিতিক ও ফুলকারী অলংকরণ ছাড়াও কলসী, রাধা-গোবিন্দের ভাস্কর্য, ইত্যাদি পালঙ্কে স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে রাধা-গোবিন্দের

একটি ভাস্কর্য নাকি কিছুদিন আগেও ছিল, বর্তমানে নিশ্চিহ্ন।

সীতাকুণ্ডুর ছাটুইপাড়ায় সত্য ছাটুই-এর ঘরের দরজাটি সাবেকি। কারুকায-খচিত। দরজায় স্থান পেয়েছে (১) ফুলগাছ ও ফুলের ওপর এক পায়ে দাঁড়ানো দু'কাঁধে ডানাযুক্ত পুরুষমূর্তি (ওপরের দুটি পাশাপাশি প্যানেলে), (২) মধ্যের দুটি প্যানেলে (ক) টব ও গাছ (বাঁদিকে) এবং ফুলসমৃদ্ধ গাছ(ডানদিকে), (৩) নীচের প্যানেল দুটিতে ফুলসহ গাছ (বাঁদিকে) এবং টবের ওপর ফুলসহ গাছ (ডানদিকে)। এছাড়াও গাছ-গাছালির নকাশি অলংকরণ রয়েছে দরজাটির বর্ডার ও মধ্যের অবশিষ্ট জায়গায়। সবচেয়ে উল্লেখ্য উপর ও মধ্যের প্যানেলের মধ্যবর্তী অংশে বাঁদিকে একটি মকর (উল্টো করে খোদিত) ও ডানদিকে একটি মাছের অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। দরজা ছাড়াও কাঠের কপাটের বর্ডারেও নক্সার কাজ রয়েছে।

দরজাটি শালকাঠের বলে জানা গেল। সত্য ছাটুই (৬২) জানালেন তাঁর ঠাকুরদা ঁসীতানাথ ছাটুই-এর বাড়ির সামনে একটি পরিত্যক্ত ঠাকুরদালান চোখে পড়ে। রাধাকান্তবাবু (৭৩) জানালেন ঐ খড়ের ছাউনিযুক্ত দালানটিতে ছিল অলংকৃত কাঠের খুঁটি। বর্তমানে অবলুপ্ত। তারই এক ছোট্ট নিদর্শন দেখলাম রাধাকান্তবাবুর বাড়িতে। অদূরে ছাটুই পরিবারেই একটি আটচালা, পশ্চিমমুখী, খর্বাকৃতি প্রতিষ্ঠালিপিহীন শিবমন্দির। রাধাকান্তবাবু বললেন, তাঁর পিতামহ ঁহরি ছাটুই এটি তৈরি করে গেছেন, উনিশ শতকের শেষদিকে। পারিবারিক ইতিহাস প্রসঙ্গে জানালেন, তাঁদের উপাধি ছিল কয়াল। পরে ছাটুই। বারুইপুরে প্রায় ২০০ বছরের পারিবারিক ইতিহাসে কয়াল থেকে ছাটুই হওয়ার কাহিনীটা এরকম – গরানকাঠের পিছনের অংশ (ছাটাবাড়ি) দিয়ে একটি বাঘ মেরেছিলেন এই পরিবারের দয়ারাম কিংবা গিরিধর কয়াল। 'ছাটাবাড়ি' দিয়ে মারার পর বাঘটি নিয়ে উনি দেখা করেন-আলিপুরে ছোট লাট সাহেবের বাড়িতে (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার)। সেই থেকে উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে 'কয়াল' থেকে 'ছাটুই'। একসময় ৬ থেকে সাড়ে ছ হাজার বিঘে জমির মালিক ছিল ছাটুই পরিবার, পাইকপাড়ার রাণী হর্ষমুখীর বদান্যতায়। আজ প্রায় বিত্তহীন। চাকুরিই ভরসা। রাধাকান্তবাবু চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ১৫ বছর হল।

বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের শক্তি রায়চৌধুরীর বাড়ির একটি কারুকার্য খচিত পালঙ্ক তাঁর পিতামহ নন্দলাল রায়চৌধুরীর (১৮৯৩–১৯৩২) বিবাহের সময়কার বলে জানা গেছে। সেই হিসেবে এটি বিশ শতকের গোড়ায় তৈরি এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। ভাস্কর্য ও অলংকরণ দুটিই স্থান পেয়েছে পালঙ্কটিতে। খাঁটি বিলাতিয়ানার প্রতীক হিসেবে নগ্ন নারীমূর্তির ব্যবহার আকর্ষক। এছাড়াও পালঙ্কটিতে জ্যামিতিক ও সুদৃশ্য ফুলকারী অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এই রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যান্য শরিকদের গৃহেও সাবেকি তক্ষণশৈলীর নিদর্শন এখন চোখে পড়ে। এছাড়াও রাসমাঠে রায়চৌধুরী পরিবারের কাঠের সাবেকি রথটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্য দ্বিশতাধিক বছর। তৈরি হয় ১৭৯৩–১৮০৭ এর মধ্যে। প্রথমে ছিল নবরত্ন। এরপর কয়েকবার সংস্কারের পর এখন পঞ্চরত্ন। আষাঢ়ের রথযাত্রা ও মেলা এখনও চালু। তবে শিখরবালি গায়েনপাড়ার এককালে রথ ও রাস উৎসব থাকলেও বর্তমানে তা শুধুই স্মৃতি, জানালেন দিলীপ সরদার।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

(১) কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্য (১৬৮৬) – সাধুঘাটা পাছে করি / সূর্যপুর বাহে তরী / চাপাইল বারুইপুরে আসি /বিশেষ মহিমা বুঝি/বিশালাক্ষী দেবী পূজি/ বাহে তরী সাধু গুণরাশি /মালঞ্চ রহিল দূর/ বাহিয়া কল্যাণপুর/কল্যান মাধব প্রণমিল / বাহিলেক যত গ্রাম/কি কাজ করিয়া নাম / বড়দহে ঘাটে উত্তরিল।

(২) তারাপদ সাঁতরা – পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮ পৃঃ ১০।

(৩) ঐ পৃঃ ৭৮।

(৪) বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে রায়চৌধুরীদের প্রথাগত চারচালা দোলমঞ্চটির প্রতিষ্ঠাকাল কোন কোন গবেষক ১৩৭৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করলেও (অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী – বারুইপুর, অতীত ও বর্তমান, Centenary Celebration of Baruipur Munsif Court, December, 1984) তা সঠিক নয় বলে মনে করি। পোড়ামাটির লিপিফলকযুক্ত উপরোক্ত দোলমঞ্চটির বর্তমানে বিবর্ণ ও অস্পষ্ট লিপি পাঠ যদি সঠিক হয়, কিংবা লিপিকরপ্রমাদের স্বাভাবিক সম্ভাবনার কথা মাথায় না রেখেও এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এটি তথাকথিত পাঠান আমলের বদলে বৃটিশ আমলে তৈরি। এই যুক্তির পিছনে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটির গঠনশৈলী যেখানে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রয়োগ সুস্পষ্ট। আরো দ্রষ্টব্য এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত 'পাশ্চাত্য স্থাপত্যের প্রভাব' অংশটি ।

(৫) প্রতিষ্ঠাতা 'দে' পরিবারের অশীতিপর ব্রজকিশোর দে (৮২) জানালেন যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে গণ্ডগোল আছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা সদাশিব দে তাঁরই প্রপিতামহ। এক্ষেত্রে অনুমিত হয় যে, আলোচ্য মন্দিরটি ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দের বদলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরি।

(৬) বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার নিয়ে গবেষণারত শক্তি রায়চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার – অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি গ্রামের সরেজমিন সমীক্ষাসংক্রান্ত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি (১৯৭৩)দেখতে দিয়ে ও অনেক বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই লেখাটি তাঁকেই উৎসর্গ করলাম।

কৃতজ্ঞতা – ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইত, শক্তি রায়চৌধুরী, পূজন চক্রবর্তী, ড.কালিচরণ কর্মকার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্র ঃ একটি প্রতিবেদন

ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নস্কর

বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী সাহিত্য প্রতিভা। ভারতীয় সাহিত্যে তিনিই প্রথম জাতীয়তাবাদের জনক। প্রখ্যাত মনীষী আই.সি.এস. রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় "He is the greatest man in the nineteenth century"। কিন্তু উনিশ শতকের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ঋত্বিক ও ক্রান্তদর্শী মহান ব্যক্তিত্বটির আজ পর্যন্ত কোন নির্ভর যোগ্য সম্পূর্ণ জীবনী রচিত হয়নি। কারণ এই ইতিহাস চেতনা-সম্পন্ন মনীষী বাংলার ইতিহাস নেই বলে ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের ইতিহাস একেবারে গোপন রেখেছেন। তিনি থুকিডিডিস বা হেরোডটাস হতে চাননি হয়তো, হতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের দুই মহাকবির মতো– সহস্র জীবনের মর্মব্যথা বা কথা কাব্যে শিল্পিত করেন নিজেদের নির্লিপ্ত রেখে – এ এক জীবনদর্শন, হয়তো আত্মদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেছেন 'কবিরে পাবেনা তাহার জীবন চরিতে'। আবার বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই মনে করেন যে, কবির কাব্য বুঝে লাভ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অপেক্ষা কবিকে জানতে পারলে অধিকতর লাভ। অথচ তাঁর জীবন উপকরণের উৎস সন্ধান আজ আমাদের কাছে সীমিত, হয়তো অজ্ঞাত। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথবিশীর তির্যক মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য – 'বঙ্কিম, মাইকেল কাহারও জীবনী লিখিত হইবে না; একজনের বিষয়ে কিছুই জানিনা, অপরজনের বিষয়ে অত্যন্ত বেশি জানি।' 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকা ১৮৮৭ সালে যাঁকে 'most national importance in the country just now' বলে উল্লেখ করেছে তাঁর জীবনবৃত্তান্তে আমাদের কাছে বিরল। প্লেটো সম্পর্কে এমার্সন এর মন্তব্যটি আমাদের কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে "Great geniuses have the shortert biographies they live in their writings' স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে আছেন তাঁর অনুপম শিল্পসৃষ্টির মধ্যে।

তথাপি বঙ্কিমের সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখকগণের প্রক্ষিপ্ত প্রত্যক্ষদর্ক্ষিতার চিত্র স্মৃতি উচ্চারণের টুকরো টুকরো ইঙ্গিত। সরকারি নথিপত্র প্রভৃতি তাঁর জীবনের বেশকিছু তথ্য আমাদের সমৃদ্ধ করে তাঁর জীবনের দুটি সাধনার ধারা সমান্তরালভাবে চলেছে– একটি কর্মসাধনা অপরটি সাহিত্য সাধনা। কর্মযোগী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবং সাহিত্যসাধক বঙ্কিমচন্দ্র এক বিস্ময়কর সাযুজ্যবোধে এগিয়ে চলেছেন। একটি অন্যটির দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, বরং অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কুড়ি বছর ছ' মাস বয়সে চাকুরিতে প্রবেশ করে তেত্রিশ বছরব্যাপী অতিবাহিত করা তাঁর কর্মবহুল জীবনের চিত্তাকর্ষনীতে আমরা অভিভূত হই। সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ , বিচক্ষণ, দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ আপোষহীন নির্ভীক ডেপুটি হিসাবে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর সমকালে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উর্দ্ধতন ব্যক্তি সি. ই. বাকল্যান্ড তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন "He rendered good service in a number of districts and also acted as personal Assistant to the Commission-

ers of Rajsahi and Burdwan Divisions..... while in charge of Khulna Subdivision (now a district) he helped very largely in suppressing river decoitics and establishing peace and order in the eastern cannals".

খুলনার দুধর্ষ জলদস্যু দমন ও শান্তিস্থাপনে কৃতিত্ব অর্জনের পর বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আগমন করেন। বারুইপুরে তাঁর অবস্থানকাল হল ১৮৬৪ সালের ৫ই মার্চ থেকে ১৮৬৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হন ১৮৬৪ সালে ২৪শে অক্টোবর এবং আলিপুরে বদলি হন ১৮৬৭সালে ১৪ই আগষ্ট। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে তিনি দুবার ছুটি নেন – একবার অসুস্থতা বশত ২২শে জুন ১৮৬৬ থেকে ৭ই আগষ্ট ১৮৬৬-মোট এক মাস ষোল দিন, আর একবার ব্যক্তিগত কাজে ৫ই জুন ১৮৬৯ থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ মোট ছ'মাস। অর্থাৎ এই ছুটির মোট সাত মাস ষোলদিন তিনি বারুইপুরে অনুপস্থিত ছিলেন। এই সময়টা তিনি কাঁঠালপাড়ায় অতিবাহিত করেন।

খুলনায় থাকাকালীন তিনি ১৮৬৪ সালে Indian Field পত্রিকায় ইংরেজি উপন্যাস Ragmohan's wife ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। বঙ্কিম তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন 'বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজি লেখা ও বলা আমার পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।' কিন্তু এই সময়েই তিনি অনুভব করলেন তাঁর জীবনের প্রধানতম কর্তব্য হল মাতৃভাষার সেবা। এবং ঐ সময়েই তিনি খুলনায় দুর্গেশনন্দিনী রচনা শুরু করেন। বারুইপুরে অসমাপ্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন এবং গ্রান্থাকারে ১৮৬৫ পৃ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়।

বারুইপুরবাসীর কাছে এটি গর্বের বিষয় যে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাসের ও ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গদ্যকাহিনীর জন্ম হয় এই বারুইপুরেই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলার আধুনিক কথাসাহিত্যের সিংহদরজা। এই গ্রন্থে প্লট রচনার পরিপক্বতা রোমান্সসৃষ্টির অভিনবত্ব, কল্পনার মহার্ঘ্য, ভিন্নধর্মের ত্রিকোণ প্রেমের স্পর্শকাতর নির্ভীকতা, সন্ন্যাসীর অবৈধ প্রণয়ের অসামাজিক ফলশ্রুতির বিস্তৃতি, জ্যোতিষির মোক্ষম ভবিষ্যদ্বাণী, ইতিহাসের কাঠিন্যহীন তথ্য লাবণ্য, বর্হিমুখী ও অন্তর্মুখী দ্বান্দিক যন্ত্রণা, নাটকীর উৎকণ্ঠা, প্যাথস রসের মূর্ছনা, প্রেম ও জীবন জিজ্ঞাসার বৈচিত্র্য সম্মাদন, অতীত বিধুরতা, সত্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টির একনিষ্ঠ সাধনা , পাঠকের নিকট কাহিনীর এক অনিবার্য যাদুকরী মুগ্ধতা সবই আগামী প্রজন্মের সাহিত্য প্রতিভার নিকট দিকনির্দশক যন্ত্র। এর পূর্বে দু-একটি গ্রন্থেত হয়তো এর একটি দুটি উপকরণ আছে, কিন্তু তা যেন প্রতিবেদন হিসাবে, রসের অলৌকিক আনন্দের সম্ভার হিসাবে নয়।

বারুইপুরে থাকাকালীন মনে হয় দুর্গেশনন্দিনীর ঘনীভূত চরম রসোৎকণ্ঠের নিভৃতলোকে বঙ্কিম বিহার করছিলেন। কেননা তাঁর মতো দুঁদে ডেপুটিও একজলাসে বসে কেমন যেন আত্মভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মজিলপুর নিবাসী ও বারুইপুর রেজিস্ট্রেশন অফিসের প্রধান করণিক কালীনাথ দত্ত প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিখুঁত চিত্রখানি তুলে ধরেছেন — 'এই সময়ের পূর্ব হইতেই তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতেছিলেন।

এই সময় তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমনকি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন , এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার 'Study room - এ প্রস্থান করিতেন। চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।'

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে বিস্ময়ের জল প্রপাত শুরু হল। এমন অনাস্বাদিত অভিনব গ্রন্থ তাঁরা এর পূর্বে আর দেখেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিনের অনুভূতি উজ্জ্বল করে রেখেছেন– 'দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এমন অদ্ভুত চিত্রণশক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল ' রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন – 'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। ... বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে।'(৩) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একটু সমালোচনার সুর লাগিয়ে বললেন– 'কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়োচে।'৪ মনে হয় বঙ্কিমও মনে করেছিলেন এর কিছু ত্রুটি আছে। কারণ পরবর্তী সংস্করণে তিনি পরিমার্জিত করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক বংলা উপন্যাসে এই নবজাতকের আবির্ভাবে সেদিন বারুইপুরের কোন মানুষ মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনি করেন নি। মনে হয় সেই উন্নতমানের রসরুচির কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি বারুইপুরে ছিলেন না। একটা সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ বদলে গেল, অথচ তাঁদের অনুভূতির স্নায়ুতে কোন কম্পন জাগল না – এটাই আশ্চর্য।

'দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর বারুইপুরে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা রচনা শুরু করেছিলেন বলে মনে হয়।'(৫) – এই উক্তি প্রখ্যাত গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ের। কপালকুণ্ডলা প্রকাশ পায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে জুন থেকে তিনি যে একমাস ষোলদিন ছুটি নেন, ঐ সময়টায় নিজ পিতৃভবনে কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি সমাপ্ত করেন। কপালকুন্ডলা বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি– ইংরেজ সমালোচকরা মনে করেন এমন অনবদ্য নিখুঁত সৃষ্টি শেক্সপীয়রের কোন গ্রন্থও নয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুন্ডলা'র প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান কুড়ি মাস মাত্র। এই অল্পসময়ের মধ্যে লেখা ও মুদ্রণ সমাপ্ত হওয়া সম্ভব নয় । সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনী'র সময় বা তারও পূর্বে এর রচনা শুরু হয়। ১৮৬০ সালে যখন তিনি মেদিনীপুরের নেগুয়ায় ছিলেন, তখন এক সন্ন্যাসী কাপালিক প্রায়ই গভীর রাতে তাঁর কাছে আসতেন। তখনই এর পরিকল্পনা তৈরি হয়, এবং পরে বারুইপুরে অবস্থানকালে তা কল্পনার সমুন্নতিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ লাভ করে। বারুইপুরের মানুষ সেদিনও আরো বেশি করে নীরব ছিলেন-রসের নিদ্রাভঙ্গ তার ঘটেনি, হয়তো প্রকৃত রসবোদ্ধার জন্মই হয়নি।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য এবং বিচারক হিসাবে ন্যায়পরায়ণতার বিভিন্ন যে তথ্য আমাদের গোচর হয়েছে তা বিস্ময়কর। বারুইপুর আগমনের ঠিক সাত মাস পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর প্রচন্ড সাইক্লোন ও প্লাবনে ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, মুড়াগাছা , টেঙ্গরা,করঞ্জলি, গঙ্গাধরপুর বাইশহাটা, মণিরটাট প্রভৃতি গ্রাম প্রায়

বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় বহু সহস্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিত হৃদয় কয়েকজন পারসী ও কিছু ইংরেজকর্মচারী এবং জমিদারশ্রেণীর কেউ কেউ সাহায্যদানে ধনভান্ডার স্থাপন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত করেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের কর্তব্যবিধি কালীনাথ দত্তের ভাষায় বলা যায় 'তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিঁড়া, লবণ কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েকথান পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত সঙ্গে আমাকে লোকের অন্নাভাব ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলি নদী) পার্শ্ববর্তী টেঙ্গরাবিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধর পুরে পাঠান'। এর কিছুদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র দুর্ভিক্ষের বাড়াবাড়ি আশঙ্কায় অল্পদিনের জন্য ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রতিবেদকের একটি পত্র থেকে জানা যায় – 'সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়া বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গভর্নমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। তিনি অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্ট কে কষ্টবোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয় তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তি স্থাপন ও অন্যান্যবিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।'' কমিশনার ড্যাম্পিয়ার সাহেবও এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন – One of the best deputy Magistrate and Deputy Collector, promit intelligent, reliable and efficient"

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর সন্নিহিত রামনগর নিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মহেশচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র হলেও ডাক্তার হিসাবে তেমন পসার করতে পারেননি। তাঁর একটি দামি অনুবীক্ষণ যন্ত্র কিছুদিনের জন্য বঙ্কিমকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। বঙ্কিম প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে কীটানু দূষিত জলে বীজানু, জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ পরীক্ষা করতেন–যেমন তিনি সারাজীবন মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজানু, নানা জটিল অদৃশ্য জীবানু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

বারুইপুরের অবস্থান কালে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন এবং উভয়ের সম্পর্ক ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের পর্যায়ের। এই সময় মাঝে মধ্যেই আসতেন বঙ্কিমের 'সুহৃৎ প্রধান' প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও চব্বিশ পরগণার Assistant District Superintendent জগদীশ নাথ রায়, যিনি তাঁর 'ভ্রাতৃবৎ বন্ধু' বলে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে বারুইপুর থেকে মজিলপুরের দত্তদের বাড়ি গিয়ে থাকতেন। কালীনাথ দত্ত জানিয়েছেন 'বঙ্কিমবাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিলপুরে আসিতেন তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটিতে অবস্থিতি করিতেন।'' এই সময়ে একবার দীনবন্ধু ও জগদীশনাথ মজিলপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসার সামনে এসে গান ধরলেন

'আমরা বাগবাজারের মেথরানী'। বঙ্কিম তাঁদের ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বারান্দায় এসে চিৎকার করে বললেন 'কালুয়া ! নিকাল দেও' এই 'অপূর্ব সম্ভাষণে' তিনবন্ধুর মিলন সেদিন খুব উপোভোগ্য হয়ে উঠেছিল।
তখনকার দিনে একটা মহকুমার অন্তর্গত ছোট ছোট শহরে বা বর্ধিষ্ণু গ্রামে 'ক্যাম্পকোর্ট' বসত। মহকুমা শাসক নির্দিষ্ট দিনে সেই ক্যাম্পকোর্টে উপস্থিত থেকে স্থানীয় মামলা মোকদ্দমার বিচার করতেন। মজিলপুরের একটু দূরে বিষ্ণুপুরে ক্যাম্পকোর্ট হত। সেই ক্যাম্পকোর্টের ডাক বাংলো আজও বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ক্যাম্পকোর্টে বিচারের জন্য মাঝেমধ্যে বারুইপুর থেকে আসতেন। তখন ডাকবাংলোয় না থেকে মজিলপুরের ঐ দত্তদের বৈঠকখানায় থাকতেন। তখন হয়তো কোন এক নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে থাকতে পারে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন-'বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের অট্টালিকার বর্ণনা পড়িলে মজিলপুরের দত্তবাবুদের অট্টালিকা মনে পড়ে। .... বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখন তিনি দত্তবাবুদের অট্টালিকা বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন।"[৬] কারুর মতে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের অট্টালিকার ছবিও 'বিষবৃক্ষ' রচনাকালে তাঁর কল্পনাকে একই সঙ্গে উদ্দীপিত করতে পারে।

বারুইপুরে থাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অধ্যয়ন করতেন। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে কি ব্যাপারে ঘটত শোনা যাক কালীনাথ দত্তের কাছে - - 'আমি পড়িতাম , তিনি শ্রবণ করিতেন, এবং স্থল বিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। ..আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই light reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয়ে আমার স্মরণ আছে, তাহাতে Progressive Development of species বিষয়ে লেখাছিল।' দেখা যাচ্ছে সাহিত্যক বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়নের ব্যাপ্তি কী বিচিত্র বহুমুখী।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না, তিনি একজন সমাজসেবী ও সংবেদনশীল পরদুঃখকাতর মানুষ ছিলেন। তিনি যে বেন্থামের শিষ্য ছিলেন তা কেবল পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বাস্তবতার প্রত্যক্ষতায় সত্য হয়ে উঠত। একদিন মধ্যাহ্নে বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাত শুরু হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কাছারিতে সংবাদ এল জমিদার রাজকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্রের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। শ্রবণমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র কাছারির সব কাজ বন্ধ করে মৃতের বাড়িতে উদ্বিগনতা নিয়ে উপস্থিত হলেন। দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকায় অচেতন মনে করে বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ আমাদের পূর্বোক্ত ডাক্তার মহেশবাবুকে উপস্থিত করলেন এবং 'বঙ্কিমবাবু ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।' কিন্তু কোন ফল হয়নি। বঙ্কিম এর পরেও অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মিশ্রসংস্কৃতির নায়ক। আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানচেতনা ও সাংগঠনিক জনকল্যাণ চেতনার এক সমন্বয় করতে চেয়েছেন সবসময়। স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরীদের সঙ্গে ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর পৌরসংস্থার জন্ম দেন। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুটি-একটি, ভারতবাসীকে আধুনিক রাজকার্য, প্রশাসনে

উৎসাহ দেওয়া, অপরটি হল সভাসমিতি ও রাজনৈতিক সংগঠন চালু করা। তিনি যেখানে বদলি হতেন সেখানেই এই জাতীয় স্বয়ংশাসিত সংগঠন তৈরি করতেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার বালী পৌরসংস্থা তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনের পর প্রথমদিকে জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল। বঙ্কিমের সঙ্গে পরবর্তীকালে এই পরিবারের যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিবৃত করার পূর্বে এই পরিবারের একটি ছোট ইতিহাস বলা প্রয়োজন। মদন দত্ত (রায়) -এর জমিদারি চলে যায়। এই সময় ঘুটিয়াশরীফের পীর মবারক গাজী তাঁর জমিদারী রক্ষা করেছিলেন। এখনও অম্বুবাচির পরের দিন এই জমিদারি বাড়ি থেকে সবার আগে পীরের অর্ঘ্য নিবেদন করা হলে তারপর সাধারণ মানুষ সেবা করার অধিকার পায়। এঁদের আর এক পূর্বপুরুষ রাজপুরে বসবাস করতেন —শরিকানার সঙ্গে গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ'ও ভাগ হয়ে গেল। কৃষ্ণ পেলেন বারুইপুরের পরিবার – দশ আনা অংশ, রাধা পেলেন রাজপুরের পরিবার – 'ছ আনা অংশ।

এই স্মিথ সাহেবই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট দিয়েছেন যা এক লহমায় তাঁর অসাধারণ বঙ্কিম অনুরাগ ও নিরপেক্ষ মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি গুণমুগ্ধতার পরিচায়ক বলে মনে হয় – "An excelleet officer. His judicial work which has come before me has uniformly manifested full, complete and labories inquery and sound." বারুইপুর থেকে বঙ্কিমকে সরিয়ে নিলে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছিল। এই শূন্যতা অন্যকারু দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয়নি বলে স্মিথ সাহেব মনে করেন "Has held charge during the greater part of the year of the Baruipur Sub. Dvn. which was last year found under the charge of Babu Taraprasad Chatterjee in discreditable disorder. I inspected it again recently and found it in excellent condition evineed everywhere careful supervission on the part of the Dy. Magte.

তিনি আর একটি রিপোর্টে বারুইপুরের বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মকৃতির কথা বলতে গিয়ে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বটির কথা উল্লেখ করেছেন – "There is no doubt that Baboo Bankim Chandra Chatterjee is one of the best duputies in the service. A highly educated intelligent officer ......his decission usually evince more than ordinary ability......As an executive officer. Baboo Bankim Chandra Chatterjee is one of the best in the district. "

উপরোক্ত রিপোর্টটি স্মিথসাহেব ১৮৬৯ সালে সরকারকে পাঠিয়েছিলেন এক আবিস্মরণীর ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। জমিসংক্রান্ত মারামারির একটা মকদ্দমা বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে ওঠে। রায়চৌধুরী পরিবার কলকাতা থেকে মাইকেল মধুসূদনকে ব্যারিষ্টার হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে জব্দ করবার জন্য নিয়ে যান। মামলায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষ বিচারে মাইকেল পরাজিত হন। এ বিষয়ে সরকার আনন্দ প্রকাশ করেছিল'

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটা পুত্রকন্যা সহ কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। মধুসূদন ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে হাইকোর্টে কাজ শুরু করে দেন এবং ব্যয়বহুল স্পেনসেস হোটেলে সুনির্দিষ্ট হলেন। কিন্তু পরিবার পৌঁছানোর পর হোটেল ত্যাগ করে ৬ নং লাউডন স্ট্রিটের একটি উদ্যানবেষ্টিত বাড়ি ভাড়া নেন। ব্যারিষ্টারিতে তাঁর আয় মোটামুটি হলেও অমিতব্যয়িতার জন্য প্রায় ঋ ণী হয়ে পড়ছিলেন। সেইকারণে উপার্জন বৃদ্ধির জন্য 'মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলেও যাইতেন।'(৭) সেই হিসাবে বারুইপুরে কৌসুলি হিসাবে তাঁর আগমন এই ১৮৬৯ সালেই।

সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথবিশী মহাশয় দুই যুগন্ধর প্রতিভার স্পর্শকাতর সাক্ষাৎকার অসাধারণ intuitive অনুভূতি দিয়ে অননুকরণীয় ভাষায় অমর করে রেখেছেন। আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে সেদিনের স্মৃতিকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করব – "হাকিমের এজলাসে আজ বড় ভিড়। হাকিম ছোট, মামলা ছোট; বাদী বিবাদী ধনী; তাই কৌঁসুলি আসিয়াছে – বিলাত হইতে সদ্য পাশ করা ব্যারিস্টার ....হাকিমের বয়স বেশি নয়– ত্রিশের এগিকে; গায়ে কোট-প্যান্টালুন নয়, চোগা-চাপকান। একহারা চেহারা, ক্ষীর্ণকায় বলিয়া যতটা দীর্ঘ তাহার চেয়ে বেশি মনে হয়। মাঝখান দিয়া চেরা সিঁথির দুইপাশে কুঞ্চিত সজ্জিত কেশদাম; প্রকান্ড ললাট, খড়্গের মত নাকটা চাপা অধোরষ্ঠের উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটি তীক্ষ্মোজ্জ্বল ও অনায়ত্ত।

হাকিমকে দেখিয়া অনেকের মনে পড়িল, হাকিমও বড় কম নন;তিনিও খান দুই উপন্যাস, লিখিয়াছেন, একখানা উপন্যাস তো এইখানে থাকিবার সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এত খবর রাখিত। তাহারা কবি ও ঔপন্যাসিকের মিলন দেখিবার জন্য উৎস্যুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এজলাসে ব্যারিস্টার প্রবেশ করিলেন। আত্মপ্রত্যয়বান বিখ্যাত অভিনেতা যেভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেইভাবে হাকিম জবরদস্ত হইলেও তাঁহার প্রভাব আজ কিঞ্চিৎ ম্লান ; তাঁহার মনে হইল হাকিম এজলাস মামলা সবই উপলক্ষ একমাত্র লক্ষ্য তিনি।

নেকটাই হইতে বুট পর্যন্ত আগাগোড়া বিলাতের ছাপ মারা ......ব্যারিস্টার স্থূলকায়। মাথায় চেরা সিঁথি, চুল অনেকটা বিরল হইয়া পড়িয়াছে; গড়ানে ললাট, কোন সঙ্কল্প যেন দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে পারে না ....নাকটা মোটা, অধোরষ্ঠ স্থূল ও ফাঁক, ...চোখ উদার ও উজ্জ্বল ....

হাকিম বুঝিতে পারিলেন হাকিম হইলেও আজ তিনি উপলক্ষ, লক্ষ্য ওই কৌসুলি। ....কবি ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে কে বড় সে বিষয়ে তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু এজলাসে কৌসুলির চেয়ে হাকিম বড় – তাহা প্রমাণ করিয়া দিবেন। তীক্ষ্মোজ্জ্বল চোখ কাগজে নিবদ্ধ করিয়া অনুকম্পামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি যেন কৌসুলির তর্ক শুনিতে লাগিলেন।

হঠাৎ কাগজ হইতে একবার চোখ উঠাইতে দুইজনে চোখাচোখি হইয়া গেল। এতক্ষণের

সঙ্কল্প ভুলিয়া, জনতা ভুলিয়া, স্থানকালপাত্র ভুলিয়া দুইজনে দুইজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে উদার চোখের সম্মেলন, তীক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টির , গদ্যের সঙ্গে পদ্যের, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের ।' [৮]

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র কয়েকবছর বারুইপুর অবস্থান করেও বারুইপুর বাসীর নিকট প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের এক নজিরবিহীন নজির স্থাপন করেছেন। আধুনিক নগর সভ্যতার গভীর এক চেতনা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই তাঁর হাতে গড়া বারুইপুর পৌরসংস্থা আজ নাগরিক জীবনের দীপবর্তিকা হিসাবে আগমীদিনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিতে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যসূচী

১। প্রমথনাথ বিশী — মাইকেল মধুসূদন

২। কালীনাথ দত্ত – বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত)

৩। রমেশচন্দ্র দত্ত– সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ (১৩০২)

৪। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ — সোমপ্রকাশ, ১৮৬৫, ২৪ এপ্রিল

৫। গোপালচন্দ্র রায় — বঙ্কিমচন্দ্র

৬। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিমচন্দ্র

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – মধুসূদন দত্ত (সাহিত্য সাধক চরিত মালা)

৮। প্রমথনাথবিশী – মাইকেল মধুসূদন

পাঠগ্রন্থ —

১। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

২। বঙ্কিমচন্দ্র — মণি বাগচী

৩। বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র — গোপালচন্দ্র রায়

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক – সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

৫। বঙ্কিমচন্দ্র – শান্তনু কায়সার

নিম্নবঙ্গের অতীত ও আটঘরা

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

নিম্নবঙ্গের অতীত অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রচেষ্টায় ২৪ পরগণা জেলার পূর্বে অবস্থিত বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 'চন্দ্রকেতুর গড়' নামক গ্রামে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে। এই অঞ্চলের মাটি খননের ফলে উদঘাটিত হয়েছে বাঙলার এক সুপ্রাচীন নগরী ও বন্দর ।

বন্দরের পরিচয়

'চন্দ্রকেতুর গড়' গ্রামটির পূর্বে ক্ষীণকায়া বিদ্যাধরী আজও প্রবাহিতা। আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতে এই আবিষ্কৃত বন্দরটি সুদূর অতীতের লুপ্ত বিদ্যাধরী তীরবর্তী 'গঙ্গে'। বন্দর 'গঙ্গে' ছিল 'গঙ্গবিড়ই' নামক প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। রোম, গ্রীস, ঈজিপ্ট থেকে বণিকগণ এই নদীপথে নিম্নবঙ্গের বন্দরটিতে আসতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য। ইহার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই স্থান থেকে কয়েকটি হেলেনীয় রীতিতে গঠিত মাটির কাপ আবিষ্কৃত হওয়ায়। "A remarkable maritime contact with nations of the Graeco-Roman world has been amply proved by the roubetted shards and a number of pottery cups" (Statesman-10.4.57)

'গঙ্গরিডই' রাজ্য যে কোথায় অবলুপ্ত তা এতদিন জানা যায় নি। ১৯০৫ সালে এই স্থান থেকে কয়েকটি মৌর্য্য-মুদ্রা পাওয়া গেলে ঐতিহাসিকগণ ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দেন। সেই আভাস ১৯৫৭ সালে সত্যের পর্যায়ে দাঁড়াল।

এই রাজ্যটির উল্লেখ মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া, পেরিপ্লাস-গ্রন্থ (১) ও টলেমীর 'লগবুকে'ও ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকগণ এই রাজ্যের পশ্চিমে প্রাচী বা প্রাসিই (Prasii) নামক অপর একটি রাজ্যেরও নামোল্লেখ করেন। এই দ্বিতীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল পালি বোথরা (পাটলিপুত্র)। 'গঙ্গারিডই' রাজ্যটি ছিল নিম্মবঙ্গে। 'প্রাচী' 'গঙ্গারিডই' রাজ্যের শাসক ছিলেন একই ব্যক্তি। এই সকল দিক বিবেচনা করে ঐতিহাসিকগণ স্থির করেন যে ইহা নন্দ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এবং এই নন্দরাজা ছিলেন বাঙালী। আলেকজাণ্ডার বিপাশা-তীরে শিবিরে বসে বাঙলার এই রাজ্যটির কথাই শুনেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে 'গঙ্গরিডই' রাজ্য ভাগিরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী খাড়িময় ভূভাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং মৌর্য্যযুগেরও পূর্বে বাঙলায় তথা নিম্মবঙ্গে এক সমুন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

যাই হোক সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত অদ্যকার খাড়িময় ভূভাগই এককালে 'গঙ্গরিডই' রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং 'গঙ্গে' বন্দরের সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে পাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। ২৪ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে ইতিহাসের দ্রুত উত্থান-পতন ঘটেছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু সভ্যতার উদয় ও অবসান এই অঞ্চলে ঘটেছে।

কারণ- 'জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্য্যমূর্তি (আনুঃ–ষষ্ঠশতক), ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষণ সেনের পট্টোলি (দ্বাদশ-শতক) এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পট্টোলি (দ্বাদশ-শতক) , ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপি-উৎকীর্ণ এক ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ-শতক), ...চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাঙলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত বহন করে'' (বাঙলার নদনদী ঃ-ডাঃ নীহার রায়; পৃঃ- ৩৫)। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে হরিনারায়ণপুরেও খৃষ্টপূর্ব যুগের মুদ্রা, শীল ও অন্যান্য পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। এই সকল দ্রব্য কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

আটঘরা

ইদানীং অনুসন্ধানের ফলে আর একটি ঐতিহাসিক স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই স্থানটি হল কলকাতা থেকে দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে বারুইপুর শহরের নিকটে দুই মাইল পূর্বে আটঘরা গ্রাম। আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ এই গ্রামটিতেও অনুসন্ধান কার্য্য চালান ও ভূপৃষ্ঠতল থেকে কিছু প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন উদ্ধার করেন। এছাড়া পুষ্করিণী খনন ও সংস্কারকালে এই অঞ্চলে পোড়ামাটির ও প্রস্তরের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। 'আটঘরা'র পূর্বসীমায় 'সীতাকুণ্ডু' গ্রাম, এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের মাটি ও পুষ্করিণীতল থেকে মৌর্য্যযুগের তাম্রমুদ্রা, শুঙ্গ-কুষানযুগের পোড়ামাটির মেষমূর্তি, যক্ষিনীমূর্তি (Moulded) শীলমোহর (Clay-seal) , আদিযুগের মৃৎপাত্র, আঙুলের ছাপমারা জালার ভগ্নকানা (আনুঃ– খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী), রোমান মৃৎপাত্রের টুক্‌রা (Rouletted Shard) পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাল যুগের বহু মাটির তৈজসপত্র ও মধ্যযুগের মনুষ্যমূর্তি (২) মনসার প্রতিমূর্তি (আশুতোষ মিউজিয়ামে প্রদত্ত), এবং সেনযুগের প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

মুদ্রা ও শীলমোহর

আটঘরায় দু'টি ক্ষুদ্র গোলাকার ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। উহার মধ্যে একটিতে চৈত্য-ঢঙে হস্তীর চিত্র উৎকর্ণ আছে। মিউজিয়ামের আটঘরায় প্রাপ্ত শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির মস্তকহীন পুরুষমূর্ত্তি। বস্ত্রের ভাঁজে হেলেনীয় রীতি বৈদেশিক প্রভাবের পরিচয় দেয়।

মতে উহা 'পুরানে'র (৩) যুগের পয়সা। তমলুকে (তাম্রলিপি) প্রাপ্ত অনুরূপ মুদ্রা মিউজিয়ামে আছে। ঐতিহাসিক ৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন–'ভারতবর্ষে যে সময়ে 'পুরান' ব্যবহৃত হইত সেই সময়ে দুই জাতীয় তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। প্রথম, বৃহৎ তাম্রখণ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা; এবং দ্বিতীয় ছাঁচে-ঢালা (Cast) চতুষ্কোন বা গোলাকার মুদ্রা। .... নৃপেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বেড়াচাঁপা গ্রামের নিকট (চন্দ্রকেতুর গড়ে) শেষোক্ত প্রকারের ছয়টি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন'' (বাঙালীর ইতিহাস ঃ– পৃঃ ৩২)। সুতরাং আটঘরায় প্রাপ্ত মুদ্রা তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুর গড়ের সভ্যতার সমসাময়িক কালের একটি নিদর্শন। তাছাড়া, উল্লিখিত শীলছাপগুলির অনুরূপ

শীল (চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত) আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে এবং উহাতে একই ব্রাহ্মীলিপির মত অক্ষর ও বৃক্ষের চিত্র দেখা যায়। মিউজিয়ামের মতে উহা খৃষ্টপূর্ব অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর।

ছাঁচের মৃন্ময়মূর্তি

প্রাচীন বাঙলার মৃৎশিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। কারণ পাথরের মধ্যে এদেশের মানুষ তার শিল্পের স্ফূর্তি পায়নি। মিউজিয়ামের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রী পরেশ দাসগুপ্ত মহাশয় স্বয়ং একটি আবক্ষ যক্ষিণী মূর্তি আটঘরা থেকে সংগ্রহ করেন ও উহার সম্পর্কে তাঁহার যে মতামত তাহাতে জানা যায় উহা কুষান-যুগীয়। ছাঁচের মৃন্ময় মূর্তি শুঙ্গ-কুষাণ যুগেই প্রচলিত ছিল। আলোচ্য যক্ষিণী মূর্তিটির অংগের নিখুঁত অলংকরণ, নাভির নীচে সূক্ষ্মবস্ত্রের কটিবন্ধনী ও বক্ষের উপর ফেলা ওড়নার ভাঁজ দেখলেই বোঝা যায়, সেই অতীত যুগেও মানুষের সৃষ্ট শিল্প কত উন্নত ছিল। পেলব, পুষ্টদেহে, উন্নত পীণযুগল ও উপাস্থি গঠনে বাড়াবাড়ি দেখা যায়। "In the portrayal of the yaskhis' there is an emphasis on the attributes of fertility in the swelling breasts and ample pelvis ("Art and Architecture of India and Asia"-- Rowland; chap. -VI. P. 49)। চিত্রে প্রদর্শিত মূর্তিটিও ছাঁচের (Moulded) ও শুঙ্গ-কুষান যুগীয়, মূর্তিটির মধ্যে দেশীয়-বিদেশীর মিশ্র শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট। এবং মনে হয় কোন বিদেশী ব্যক্তির প্রতিমূর্তি। কারণ অহগ-বিন্যাস ও দেহভঙ্গিমা এবং প্রতীয়মান লৌকিক চেতনার মধ্যে একটি অভারতীয় শিল্পরীতির পরিচয় মেলে। ভারতীয় মূর্তিরচনায় স্বপ্নাচ্ছন্নতাই বড় কথা; কিন্তু হেলেনীয় শিল্পে বাস্তবমুখীনতাই বড়। তাই সেখানে একটি স্নিগ্ধ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুমূর্তি

আটঘরায় একটি পুষ্করিণী সংস্কারকালে বহুপূর্বে কয়েকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাষাণ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। উহার মধ্যে মাত্র দুটি এখনও সংরক্ষিত আছে। মূর্তিগুলি বিষ্ণুর। পালযুগে বাঙলা দেশে প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্তি ছড়িয়ে পড়ে। মিউজিয়ামে সমজাতীয় মূর্তি বহুসংখ্যায় সংগৃহীত আছে। মোটামুটি সেন যুগের মূর্তি এইরূপ হলেও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পালযুগের বিষ্ণুমূর্তিগুলির প্রভামণ্ডলটি সাধারণতঃ গোলাকার হতো। কিন্তু সেন আমলে ইহার অগ্রভাগ কোনায়িত হয়ে যায়। মূর্তিগুলি আড়ষ্ট, প্রতিমাশাস্ত্রানুগ হওয়ায় বোঝা যায় গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্মিত হয়েছিল। –'হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্যাদির বিন্যাস একান্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট; ইহাদের দেহের অলংকরণ , অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষীণতা অথবা মাংসলতা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর। এবং রেখার গতি ও মস্তনের দৃঢ়তা বা কমনীয়তা যৌথশিল্প দৃষ্টি ও রীতিনির্ভর। .... দোলায়মান উত্তরীয় ও দৃঢ় নিয়মিত ছন্দে বাঁধা, উভয় ক্ষেত্রেই স্বাচ্ছন্দ লীলার আভাস অনুপস্থিত" (বাঙালীর ইতি ঃ- ডাঃ নীহার রায়; পৃঃ- ৭৯৩)। চিত্রের মূর্তিটি মসৃণ পাথরের নির্মিত। পশ্চাতে প্রভামণ্ডলটি কোনায়িত ও অলংকারবহুল। বিগ্রহের চারিহস্তের মধ্যে নিম্নদক্ষিণ ও নিম্নবাম হস্তদ্বয় ভগ্ন। পদযুগল জানুদেশের নিকট হতে ভগ্ন। উর্ধ্ববামে ও উর্ধ্বদক্ষিণে চক্র ও গদা ধৃত। সূক্ষ্ম, সিক্ত বসন দেহের সহিত যেন এক হয়ে আছে। ইহার ভঙ্গিমা ও

শিল্পরীতি দেখিয়া অনুমান করা যায় (মিউজিয়ামের মতে) উহা একাদশ শতাব্দীর প্রস্তর শিল্পের একটি নিদর্শন।

অন্যান্য বিভিন্ন পুরাবস্তুর মধ্যে পালযুগের মৃৎপাত্রাদিই বেশি। পাল-পূর্ব যুগের নিদর্শন খুবই কম। যাই হোক মোটামুটি মৌর্য্যযুগের মুদ্রা,শুঙ্গ-কুষান যুগের শীল ও পোড়ামাটির মূর্তি থেকে ইহার প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় মেলে। মাঝে গুপ্ত যুগের বিশিষ্ট কোন নিদর্শন মেলেনি। পাল রাজাদের আমলে আবার হয়তো নূতন ক'রে সভ্যতার বিস্তার হয় ও সেন যুগ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকে। তারপর আবার একটা ধ্বংসকার্য্য বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। কারণ – 'ত্রয়োদশ শতকের পর কোন সময় চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নভূমি কোন এক অজ্ঞাত অনির্দ্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়' (বাঙালীর নদনদী – ডাঃ নীহার রায়। পৃঃ – ৩৬)।

আটঘরায় স্থানে স্থানে মাটি খননের ফলে প্রাচীন যুগের ইষ্টক প্রাচীর ও পাতকুয়া দেখা গেছে। ইহাতে আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন অতীতে হয়তো কোন উন্নত শহর এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল (স্টেট্‌সম্যান্ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ দ্রষ্টব্য)।

ইতিমধ্যে আটঘরাকে মধ্যযুগের একটি শহর (৪) বলে অনুমান করা হয়েছে। তবে একটি লুপ্ত প্রাচীন শহরের নামের সঙ্গেও ইহার নামের মিল পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক টলেমীর নাম পূর্বেই করেছি। তিনি ছিলেন মিশরের গ্রীক নরপতি। তিনি এদেশে ভ্রমনকালে অন্তর্গাঙ্গেয় ভারতের (India-Intra gnugem) একখানি নক্শা ও একখানি ভ্রমনবৃত্তান্ত (Logbook) রচনা করেন (দ্বিতীয় শতক)। সেই বিবরণীতে ও নক্শায় গঙ্গে বন্দরের কাছাকাছি আর একটি শহরের উল্লেখ করেন। উহার নাম 'আষ্ঠগৌড়া' (Asthagoura)। ঐতিহাসিকদের নিকট ইহা এখনও অজ্ঞাত। তবে সমসাময়িক কালের সভ্যতার পরিচয় পাওয়ায় ও 'আটঘরা'কে উহার বিবর্তিত নাম অনুমান করে মিউজিয়াম কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করেন যে হয়তো এই 'আটঘরা'র মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে আছে 'আষ্ঠগৌড়া' শহর। এবং এই স্থানেও পরেশবাবু রোমে নির্মিত মৃৎপাত্রে (Roulette) ভগ্ন টুকরা আবিষ্কার করেন ও মনে করেন ইহার সহিত বিদেশের সামুদ্রিক যোগাযোগ ছিল। বলা বাহুল্য 'চন্দ্রকেতুর গড়' ও 'আষ্ঠগৌড়া' একই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। যদি তাই হয় তবে বর্তমান 'আটঘরা' অতি প্রাচীনকালে তথাকথিত বিদ্যাধরীর তীরবর্তী স্থান ছিল একথা অনুমান করা যায়। এই অনুমান সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখেছিলাম আমার লিখিত 'আটঘরা ইতিহাসের নতুন ইসারা' নামক প্রবন্ধে (প্রকাশ 'স্বাধীনতা' ১৯/৫/৫৭)। আমার এই মতের স্বপক্ষে আশুতোষ মিউজিয়ামের রায় আছে।

আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত একথা আলোচনা করে জানতে পারি। তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করে সম্প্রতি একটি মানচিত্র অঙ্কন করেছেন। মানচিত্রটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই মানচিত্রে তিনি বিদ্যাধরীর প্রাচীনকালে যেমন গতি ছিল তাহার সেই বিচ্ছিন্ন ধারাগুলিকে জুড়ে দেখিয়েছেন যে ইহার তীরেই অতীতকালে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা। বর্তমান কালের কলকাতাকে কেন্দ্র করেই উহার পশ্চিমে

মেদিনীপুর জেলার তিলদা, পান্না, তাম্রলিপ্ত (তমলুক) থেকে সুরু করে দক্ষিণে ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুর, ছত্রভোগ ও আটঘরা এবং ক্রমশঃ পূর্বে হাড়োয়া, চন্দ্রকেতুরগড় পর্য্যন্ত অর্ধমালাকারে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান (A chain of cities and ports -- states-man" - 8/12/56) চিহ্নিত করা হয়েছে। উহার মধ্যে কেবল তমলুক ও পূর্বে চন্দ্রকেতুরগড়ে মৌর্য্যযুগ থেকে সেনযুগ পর্য্যন্ত সভ্যতা-পরম্পরা পাওয়া যায়। আটঘরায় মৌর্য্য, শুঙ্গ ও পাল যুগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝে সভ্যতার যোগসূত্রটি ছিন্ন। আদি-গঙ্গার তীরেও কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার স্থল নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে বিদ্যাধরীকে এমনভাবে রেখাবদ্ধ করা হয়েছে যাহার স্রোতসলিলে আটঘরার মাটি বিধৌত হতো; অথচ আটঘরার পশ্চিমে প্রবাহিতা বারুইপুরের নিকট আদিগঙ্গার খাত এখান থেকে বেশ কিছু দূরে। অর্থাৎ আটঘরা বিদ্যাধরী কুলেই অবস্থিত ছিল। এখন এই সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হওয়ায় ও রোমান শিল্পের টুকরা নিদর্শন পাওয়ায় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এই স্থানটিকে খনন করবার কথা ভাবছেন। এবং মনে হয় 'চন্দ্রকেতুর গড়ে'র পরেই নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি সমসাময়িক সভ্যতার আবিষ্কার ঘটতে পারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে উপেক্ষিতা নিম্নবঙ্গের প্রাচীন পরিচয়ও আরও পূর্ণ হযে আসবে।

(১) 'পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিট্রিয়ান সি' নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহার রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। ভারত-মহাসাগরে জনৈক গ্রীক বণিকের ভ্রমন-বৃত্তান্ত উহার কাহিনী।

(২) পোড়ামাটির একটি সূক্ষ্ম শিল্প-সম্পন্ন ছিন্নমস্তা মূর্তি। উহা আমাদের নিকট হতে মজিলপুর নিবাসী শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় চেয়ে নেন। বর্তমানে তাঁরই কাছে আছে।

(৩) মৌর্য্যরাজ আমলে ভারতে এক প্রকার রজত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। উহা আকারে চতুষ্কোণ। উহাকেই 'পুরাণ' বলা হতো।

(৪) 'স্বাধীনতায়' লিকিত ও ১৯শে মে, ১৯৫৭ তারিখে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধে আটঘরাকে 'আটিসারা' বলে উল্লেখ করি। 'আটিসারা' ছিল শ্রী চৈতন্যের নীলাচল যাত্রাপথের একটি স্থান।

'আটঘরার জনৈক কৃষক শ্রী শৈল ঘোষ কর্তৃক প্রাপ্ত একটি মুদ্রা আমি সংগ্রহ করি ও পরেশ দাসগুপ্ত মহাশয়কে দিই। উহা বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে।

বারুইপুরে মূর্তির খোঁজ

মানস চক্রবর্তী

সভ্যতার ইতিহাস অন্বেষণে মানুষ চির উৎসাহী। আসলে আমরা প্রত্যেকেই শিকড় সন্ধানী। অতীতের অনুচ্চারিত কথামালা খুঁজতে খুঁজতেই তো রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – দয়ারাম সাহানীরা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো খুঁজে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার মাত্রা বদল ঘটেছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ আজ বিশ্বজনের মুখে মুখে। আমাদের এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কথাও জেলাবাসী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জানিয়েছেন আমাদের বিভিন্ন সময়ে। ইতিহাস রচনার মূল উপাদানগুলি আজকের দিনে নানাভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট 'মানুষ' এই সত্য চিরন্তন এবং আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের ওপর মানুষ কতটা কর্তৃত্ব করেছে তা বোধ হয় ইতিহাস বোধের নতুন সংযোজন। মাটির তলার মূর্তি, মুদ্রা, তৈজস, বাসন-পত্র, ধাতব দ্রব্য অথবা বিভিন্ন লিপি যেমন একটা সময় সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাকে পথ দেখায় তেমন বর্তমানের কথা আগামী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করাও তাদের বহু প্রশ্নের সমাধান করতে পারে এই বিশ্বাস থেকেই সমকালের ইতিহাস রচনা হয়। সমকালের ইতিহাসে যেমন দেব-দেউল-মন্দির, মসজিদ-গীর্জা জায়গা পায় তেমন সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও নিজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ বারুইপুর। দক্ষিণের ভাষায় 'বারিপুর'। রাজপুর, বোড়াল, মালঞ্চ-মাহিনগর, জয়নগর-মজিলপুর, কাশীনগর-কৌতলা, ডায়মণ্ডহারবার, দেড়িয়া, কাকদ্বীপ, মহেশতলা বাওয়ালি ইত্যাদি আমাদের এই জেলার প্রাচীন জনপদ। কলকাতার উপকণ্ঠ স্থান হিসাবে ভৌগোলিক কারণে বারুইপুর আজ দঃ ২৪ পরগণার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। বারুইপুর পৌর এলাকাকে ঘিরে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা বারুইপুর থানা এলাকার অন্তর্গত সেখানকার সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণ যথার্থই সময় সাপেক্ষ ও আয়াস সাধ্য ।

মাটির তলার মূর্তিগুলি থেকে আমরা জানতে পেরেছি জনধর্ম ও রাজধর্ম। জিওলজির গবেষণায় বুঝেছি কতটা প্রাচীনত্ব আছে ঐ মূর্তিতে। কিন্তু মাটির নীচে প্রাপ্ত কোনও মূর্তিই সমসাময়িক কোনও মানবমূর্তি বলে শোনা যায় নি। বড়জোর তা কোনও শাসকের দেবত্ব অর্জনের চেষ্টা হতে পারে। অথচ মাটির ওপরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি চলমান সমাজের বৈশিষ্ট্যকে কত সহজে ভবিষ্যতের কাছে পরিচিত করে তোলে।

কোনও পুণ্যকর্মের তাগিদ থেকে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোনও মহান মানবের স্মৃতিরক্ষা এবং প্রতিনিয়ত তাঁর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন মূলত মূর্তিপ্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য। গোপন গভীর এক আবেগ সমাজের কিছু মানুষকে তাড়িত করে স্থায়ীভাবে মহামানবের স্মৃতিরক্ষায়।

বারুইপুর থানাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ভাগ করলে প্রথমে উত্তরাংশে মূর্তির খোঁজ করা যাক।

১) দঃ গোবিন্দপুরে খাসমল্লিক স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে আবক্ষ নেতাজী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইঁট সাজিয়ে রাস্তার পাশে ক্লাবভবনের সামনে মূর্তিটি সাম্প্রতিক সময়ে বসানো হয়েছে।

২) হরিহরপুর খেলার মাঠের দিকে (জাগৃতি সংঘ) যেতে রাস্তার পাশে অনিল পালের বাড়ি। শ্রী পাল ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ির সামনে ২০০২ সালে ২৪শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তিবসানো হয়েছে। শ্রী পালের স্ত্রী জানালেন নজরুলের মূর্তি বসানোরও ইচ্ছা আছে।

এবার দক্ষিণ বারুইপুর ভ্রমণ।

১) ১৯৯২ সালের ১৫ই মার্চ দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশনে বিবেকানন্দ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। বিবেকানন্দ মূর্তিটি উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দ।

২) ধপধপিতে ২০০০ সালের ২৯শে জানুয়ারী দেবপ্রসাদ সিংহের আতিথ্যে ধপধপি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী শুভেন্দু বিশ্বাস উন্মোচন করেন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রিয়নাথ ঘোষের আবক্ষ ফলক। প্রিয়নাথ ঘোষের পুত্রবধূ শ্রীমতী ঘোষের এই স্মরণ প্রয়াসে বিদগ্ধ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

৩) রামনগর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের সামনে তিমিরি আদিত্য মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ২০০০ সালের ২৭শে মার্চ তিমির আদিত্যর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তিমির আদিত্য স্মৃতিরক্ষা কমিটি এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় মানুষের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন সমাজসেবী তিমির আদিত্য। আবক্ষ মূর্তিটি উন্মোচন করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী শিবদাস ভট্টাচার্য্য।

বারুইপুর পৌরসভা এলাকার পূর্বপার্শ্বের মূর্তিসন্ধান ঃ

১) চম্পাহাটি স্টেশনের উত্তর দিকে পীচ রাস্তার ওপর আবক্ষ ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একদা এই অঞ্চলে উদয় সংঘ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল। মূলত নাটক, থিয়েটারের প্রতিষ্ঠান। উদয় সংঘের উদ্যোগে ১৫ই আগস্ট ১৯৮০ সালে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকবছর আগেও একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ক্ষুদিরামের জন্মদিন পালন করতেন এবং মূর্তিটিতে মাল্যদান হত। এখন তাও হয় না। অবহেলায় ক্ষুদিরামের মূর্তিটি রাস্তার পাশে কোনক্রমে টিকে আছে আজও।

২) সাউথ গড়িয়ার মোড়ে ‘প্রভাতী’ সংঘের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৯ সালে নেতাজী মূর্তির পুনর্বাসন হয়। অনেক আগে স্থানীয় কিশোরদের কমমস ক্লাব নেতাজীর আবক্ষ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করে। রাস্তা সংস্কারের সময় মূর্তিটির পুনর্বাসন হয়। ‘প্রভাতী’র সদস্যরা নেতাজী মূর্তিটিকে অবহেলায় রাখেন নি তা দেখলেই বোঝা যায়। ১৯৯৯ সালে মূর্তিটি নতুন করে প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট ও ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান হয়।

৩) ফুলতলার তিনমাথার মোড়ে নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি প্রতিষ্ঠিত আবক্ষ নেতাজী মূর্তিটি বেশ সুন্দর। ১৯৮২ সালের ২৩শে জানুয়ারী এই মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মূর্তিটি উদ্বোধন করেন বিপ্লবী নলিনী গুহ।

৪) ২০০৩ সালের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরূপ ভদ্র সহ বহু বিশিষ্ট জন। উদ্বোধক ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

<u>পশ্চিম অংশের মূর্তি সন্ধান</u>

১) পুরন্দরপুর কল্যাণপুর রোডের ওপর শ্বেতপাথরের ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মণ্ডলের শ্বেতশুভ্র আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ২০০২ সালের ২৬শে জানুয়ারী মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নিহাটা পর্যন্ত এই রাস্তাটি অনুকূলচন্দ্র সরণি হিসাবে পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রস্তাবিতও হয়েছে। যদিও এখনও জেলা পরিষদ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। ডাঃ অনুকূলচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী। এলাকায় গরীব মানুষের চিকিৎসা শুধু নয় চাষ-বাস সংক্রান্ত এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ছিল। সৎ-মানবপ্রেমী হিসাবে পুরন্দরপুর অঞ্চলে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

২) বারুইপুর কলেজের ঠিক আগে পুরন্দরপুর মঠে কালিকা চৈতন্য ব্রহ্মচারী-র পূর্ণাবয়ব উপবিষ্ট মূর্তি আছে। তাঁর আসল নাম ছিল বিনয়ভূষণ চ্যাটার্জী। কল্যাণপুর হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাই ছিলেন ।

<u>বারুইপুর পৌর এলাকা</u>

১) পৌরসভার প্রাঙ্গণে পাশাপাশি বঙ্কিম মূর্তি ও নেতাজী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দুটি আবক্ষ মূর্তি। পৌরসভার ১২৫ বছর পূর্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৯৯৪ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর বঙ্কিম মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৌরসভা প্রাঙ্গণের বঙ্কিমমূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পৌরপিতা শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী। পৌরসভার ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য গঠিত কমিটির সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত সজল রায়চৌধুরী।

নেতাজী সুভাষ জন্মশতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে ও পৌরসভার সৌজন্যে ১৯৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্রী দুলাল হালদার, ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইত ও শ্রী বিকাশ দত্ত। ঐ নেতাজী মূর্তিটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন বিধায়ক শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পৌরপ্রধান রবীন সেন।

২) পৌরসভার গেট থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে টাউন লাইব্রেরীর গায়ে কুলপীরোডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নজরুল মূর্তি । মূর্তিটি আজও ফলকহীন। নজরুল জন্মশতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে কবির জন্মশতবর্ষে এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শতবর্ষ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন দিলীপ সরকার ও দেবব্রত চ্যাটার্জী। নজরুলের এই আবক্ষমূর্তিটি উদ্বোধন করেন বারুইপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য্য।

৩) কুলপীরোড ধরে পুরাতন বাজারের দিকে ঋষি বঙ্কিম নগর। পাড়ায় ঢোকার মুখে আবক্ষ রাজীব গান্ধীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উদ্যোক্তা এলাকার সমাজসেবী শ্রী রাজেন পাল।

৪) রাজীবগান্ধীর মূর্তিটিকে পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে রবীন্দ্রভবন। বারুইপুর পৌরসভার কমিউনিটি হল। পাশেই সংগ্রহশালা। রবীন্দ্রভবনের প্রবেশপথে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি । ১৪০৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগস্ট, ২০০১) রবীন্দ্র তিরোধান দিবসে মূর্তিটি উদ্বোধন করেন বিধায়ক শ্রী অরূপ ভদ্র। সভাপতিত্ব করেন পৌরপ্রধান ইরা চট্টোপাধ্যায়। কাউন্সিলার ও বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইত এই রবীন্দ্রমূর্তিটি পৌরসভাকে উপহার দিয়েছেন।

৫) রবীন্দ্রভবন ফেলে দোলতলা। একটু এগিয়ে ডান হাতে বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার। পাঠাগার প্রাঙ্গণে আবক্ষমূর্তি ডাঃ খ্রীশ্চিয়ান ফেড্রিক সেমুয়েল হ্যানিম্যানের। সম্ভবত দঃ ২৪ পরগনা জেলার একমাত্র হ্যানিম্যান মূর্তি এটি। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের সার্বিক সহযোগিতায় ডাঃ সূর্যকুমার সর্দার, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ প্রণয়কুমার পান, ডাঃ চন্দ্রভূষণ চ্যাটার্জী , ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইত, ডাঃ নিরঞ্জন সরদার, ডাঃ খইরুল আলম প্রমুখ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের উদ্যোগে হোমাই, বারুইপুর ইউনিট থেকে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৯০ সালের ১০ই এপ্রিল। মূর্তি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিধায়ক শ্রী হেমেন মজুমদার। উদ্বোধক ছিলেন ডাঃ বি.বি.ঘোষ।

৬) হ্যানিম্যান মূর্তি দেখে মুখ তুলে সামনে তাকালে নেতাজীর আবক্ষমূর্তি । পুরাতন বাজারে রাস্তার ওপর এই সুভাষ মূর্তিটি নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী। মূর্তিটি উদ্বোধন করেছিলেন শ্রী অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী।

৭) পুরাতন বাজার থেকে জয়নগরের রাস্তায় বারুইপুর হাইস্কুল। স্কুলের প্রাঙ্গণে সুনন্দ বিবেকানন্দ মূর্তি (আবক্ষ) প্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৮ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিমল পালের সৌজন্যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৌরসভা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে। এতল্লাটে আর কোনও মূর্তি নেই। আবার ফিরে চলা। পৌরসভাকে ডান হাতে রেখে রেলগেট সামনে। রেলগেট অতিক্রম করলে বারুইপুর স্টেশনে ১ নং প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার রাস্তা। একটু এগোলেই বাঁ হাতে বসু বাড়ীতে বৌদ্ধমূর্তি। রাস্তা থেকে দেখা যায়। আরও একটু স্টেশন অভিমুখ গেলে ঋষি বঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতির বিপণন কেন্দ্র। তার সামনেই রাস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি। সমিতির ২৫ তম বর্ষ উদযাপনে বঙ্কিম মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত

হয় পৌরসভার সৌজন্যে। সমিতির তৎকালীন চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন পুরকাইত সহ দ্বিজেন মজুমদার, পার্থ দাশগুপ্ত, সুকান্ত মুখার্জী, সুশান্ত মুখার্জী, নির্মল দাম, মোশারফ হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই দৃষ্টিনন্দন বঙ্কিম মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঋষিবঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রী সুশীলকৃষ্ণ দত্ত বঙ্কিমমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই মহতী অনুষ্ঠান করেন তৎকালীন সংস্থা সম্পাদক শ্রী দ্বিজেন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক, রবীন সেন। সন্তোষকুমার দত্ত, রাধাকান্ত দত্ত, প্রদোৎ রায়চৌধুরী, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, প্রভাস মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বারুইপুর কাছারী বাজার। কল্যাণপুর রোড দিয়ে ঢুকলে বাঁহাতে মাইকেল মধুসূদন স্কুল। মাইকেলের মূর্তি স্কুলের নামকরণ অনুসারী। মূর্তি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জাতীয় শিক্ষক প্রয়াত ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক।

কাছারী বাজার থেকে স্টেশনে আসার রাস্তা বারুইপুর থানার পাশ দিয়ে। ঐ রাস্তায় স্টেশনে পৌঁছে উত্তর দিকে ওভার ব্রিজ ধরে কলপুকুর পাড়। পোষাকী নাম সুবুদ্ধিপুর।

সুবুদ্ধিপুর থেকে উত্তরমুখো রাস্তা সোজা চলে গেছে সূর্যসেন নগরে। এখানে মাষ্টারদা সূর্যসেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পৌরসভার শিশুউদ্যানের পাশে। দেখলে অবহেলায় পড়ে আছে মনে হয়। ফলক ছিল, এখন নেই।

সূর্যসেন নগরে যেতে সুবুদ্ধিপুর থেকে একটু উত্তরে এগোলে ডান হাতে বেলতলার রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে সোজা থইপাড়া। মাষ্টারপাড়ার শেষ সীমায় থইপাড়ার পথে শরৎস্মৃতি সঙ্ঘের মাঠ। মাঠের সামনে রাস্তার পাশে শরৎচন্দ্রের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীতে ২০০০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শরৎমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শরৎস্মৃতি সংঘের এই উদ্যোগে মূর্তি উন্মোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী, এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অমর কথাশিল্পীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মুকুল চট্টোপাধ্যায়। সুন্দরভাবে মূর্তিটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তা দেখলেই বোঝা যায়। সৌমেন মণ্ডলের স্মৃতিতে শিবানী মণ্ডল বাঁধানো চাঁদোয়াটি নির্মাণে সাহায্য করেছেন। মূর্তি দর্শন শেষ। খুব উল্লেখযোগ্য মূর্তি দর্শন হয়নি মনে হয়।

কীর্তনখোলা মহাশ্মশানে বারুইপুর পৌরসভা কর্তৃক ২০০৪ সালের মার্চ মাসে গৌর-নিতাই-এর মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ কৃষ্ণা বসু, বিধায়ক অরূপ ভদ্র, ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, সন্তোষকুমার দত্ত, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, বিমল পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ইরা চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন পুরকাইত, মিতা দত্ত, স্বপন মণ্ডল, শক্তি রায়চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগ স্মরণযোগ্য।

পৌরএলাকায় বিভিন্ন নতুন জনপদগুলি সবই প্রায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নামাঙ্কিত। সুকান্তসরণী, রবীন্দ্রনগর, বিদ্যাসাগর পল্লী, অরবিন্দনগর, অবনীন্দ্র নগর, বঙ্কিমনগর, এমন কত নাম। প্রত্যেকটা পাড়ার মুখে সেইসব মহামানবদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কি খুব কঠিন কাজ!

অথবা জেলা ক্রীড়া সংঘ, NIC, বিশালাক্ষ্মী স্পোর্টিং, এই সব সংস্থার পক্ষে কোথাও কি

থাকতে পারত না কোনও প্রতিভাবান স্মরণীয় ক্রীড়াবিদদের মূর্তি ? সাউথ গড়িয়ায় কেন নেই দুর্গাদাসের মূর্তি অথবা কৃষ্ণমোহনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি কৃষ্ণমোহন হল্টে।

আরো মনীষী আছেন। দেশী-বিদেশী। জ্ঞানী জন দেশকালে আবদ্ধ থাকেন না। হ্যানিম্যান আছেন বারুইপুরে। বিদেশ থেকে আসুন নিউটন– শেক্‌সপীয়ার – আইনস্টাইন – চার্লিচ্যাপলিন –। রবীন্দ্রমূর্তির কাছে প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্বমানবতার রবীন্দ্রসময়ের আর এক উজ্জ্বল নাম রোমাঁ রোলাঁর মূর্তি। বারুইপুরের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 'মানুষ' নামের মানে খুঁজে পাবে এই সব বিখ্যাত মনীষী সান্নিধ্যে। 'পৃথিবীতে এখন গভীর অসুখ' তাই মূর্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে চরিতামৃত অন্বেষণ আজ খুব জরুরী এবং তা ইতিহাস অনুসারী হবে বলে মনে হয়।

সূচনায় লিখেছিলাম মাটির ওপরে যা কিছু তা চলমান সময়ের ইতিহাসের উপাদান। হ্যাঁ, একটু আশ্চর্য হয়েছি নিজেই এতবড় বারুইপুর থানা এলাকায় একটি মাত্র রাজীব মূর্তি ছাড়া আর সেইভাবে কোনও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মূর্তি অনুপস্থিত দেখে। বারুইপুরের সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে সকলেরই। নেতাজী আর স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের কাছে একই উচ্চারণ। নেতাজী মূর্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে সমাজের আবেগের স্ফুরণ হয়। আবার বঙ্কিম– নজরুল – রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা আমাদের শ্রদ্ধা– কৃতজ্ঞতা এবং সম্মাননা প্রদর্শন করি।

বারুইপুর থানার হিন্দু মন্দির ও দেবস্থান

মানিকচন্দ্র দাস

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার কিছু এলাকা অতীতে একদা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। ইতিহাসের দিক থেকে সরাসরি কিছু সাক্ষ্য পাই চৈতন্য সমসাময়িক কাল (১৪৮৬ – ১৫৩৩) থেকে। তার আগে যা পাওয়া গেছে তা মূলত প্রত্নবস্তু। গণেশ, মহিষমর্দিনী দুর্গা, বিষ্ণুমূর্তি, সরস্বতীমূর্তি ও বিষ্ণুর পাদদেশ প্রস্তরমূর্তি, মন্দিরচূড়ার লৌহচক্র, কিছু ধাতব পাত্র ও মৃন্ময় পাত্র, ইটের চত্বর, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সহ আরো অনেক কিছু । এই সব জিনিস বেশি পাওয়া গেছে আটঘরায়, ধপধপি স্টেশন থেকে কিছুদূর আলিপুর গ্রামে ও রামনগর মৌজার চঙ্গ গ্রামে। সেইসব প্রত্নবস্তু দেখে পণ্ডিতগণ স্থিরসিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ বস্তুগুলো গুপ্তযুগ থেকে পালযুগের মধ্যেকার। আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে – ঐ সময়ে ঐ সমস্ত সমৃদ্ধ এলাকায় কয়েকটি মন্দির ছিল।

ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন বারুইপুরে আদি গঙ্গার তীর ধরে পদব্রজে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ ঘন বনে আবৃত থাকলেও কিছু অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ। শ্রী চৈতন্যের আগমন প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে বর্তমান বারুইপুরের পুরাতন বাজার সংলগ্ন আটিসারাকে বলেছেন শহর ও গ্রাম অর্থাৎ অতি সমৃদ্ধ জনপদ। তখন ওখানে পরম বৈষ্ণব অনন্ত আচার্যের একটি কুটির ছিল। ঐ কুটিরে শ্রীচৈতন্যদেব একরাত্রি অতিবাহিত করেন। বর্তমান গৌর-নিতাই -এর মূর্তি তখন নিশ্চয়ই ছিল না। পরে ঐ মূর্তিগুলি স্থাপিত হয়; কিন্তু কখন স্থাপিত তা জানা যায় না। গৌরনিতাই-এর পাশে আছে শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, নিমকাঠের তৈরী বর্তমান গৌরনিতাই মূর্তিদুটির বয়স অতি প্রাচীন। মহাপ্রভুতলা নামে চিহ্নিত এই স্থানটির মন্দিরটি তাই পাঁচশ বছরের প্রাচীন। মন্দিরে নিয়মিত পূজার্চনাদি হয়। মহাপ্রভুর স্পর্শধন্য এই স্থানটি খুঁজে খুঁজে প্রথম চিহ্নিত করেন বৈষ্ণবসাধু রামদাস বাবাজি।

বারুইপুরের স্টেশনের পশ্চিমদিকে কাছারীবাজার বা পৌরবাজারের উত্তরদিকে বিশালাক্ষীর মন্দির বেশ প্রাচীন। পারিপার্শ্বিকতায় এটাই মনে হয় যে, বারুইপুরের এই বিশালাক্ষী দেবী চৈতন্য পূর্ববর্তী। লোকশ্রুতি আছে, শ্রীচৈতন্যদেব এই বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করে অনন্ত আচার্যের আশ্রমে গেছিলেন। বর্তমান ট্রাস্টীদের অন্যতম শ্রী প্রতীপ মৈত্র বলেছেন, বছর তিনেক আগে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এই মন্দির পরিদর্শনকালে ইঙ্গিত দেন যে, তৎকালীন এই প্রাচীন বিশালাক্ষী থানে চৈতন্যদেব এসেছিলেন। সেইসূত্রে তিনি এই থানে রক্ষিত কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ও ছোট ছোট আবরণ থেকে দেবতার অনুসন্ধান করেন এবং দেখে তৃপ্তি লাভ করেন। আবার কৃষ্ণরাম দাসের রচিত 'রায়মঙ্গলকাব্যে (১৬৮৬ খ্রীঃ) এই বিশালাক্ষী দেবী ও বারুইপুরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠী পুষ্প দত্তের স্বগ্রাম বড়দহে (বর্তমান হরিনাভির কাছে) ফেরার পথে দেখি –

সাধু ঘাটা পাছে করি সূর্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুর আসি
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই রচনা প্রমাণ করে চৈতন্যদেবের পরেও দেবী বিশালাক্ষীর বিশেষ মহিমা অক্ষুণ্ণ ও চারদিকে বিস্তৃত ছিল এবং দূরাঞ্চলের অধিবাসী এমন কি সমুদ্রগামী বণিকগণও এই দেবীর মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে মনস্কামনা পূরণার্থে পূজা দিতেন। দ্বিভুজা রক্তাম্বরা বিশালাক্ষী দেবীর বামহাতে আছে খড়গ, ডানহাতে ঢাল, তিনি ভূপৃষ্ঠে শায়িত শিবের বক্ষদেশে দণ্ডায়মানা। আদি-গঙ্গার উভয় তীরে এই দেবীর বহু মন্দির ছিল, এখনো তার বহু স্মৃতিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। বারুইপুরের এই মন্দিরটির ইতিহাস পাওয়া যায় অতঃপর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে। বিশিষ্ট ভক্ত ও ভূম্যধিকারী নুটুবিহারী ময়রার অধিকার ছিল এই মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন কয়েকবিঘে জমি। সেই সময় রাজস্ব অনাদায়ে তাঁর সম্পত্তি নিলামে ওঠে এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন; ফলে মালিকানার পরিবর্তন ঘটে। সেই সময় পদ্মপুকুরনিবাসী স্বর্গত নিবারণচন্দ্র মৈত্র মন্দিরটির মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং স্থানীয় অনুরাগীদের নিয়ে একটি ট্রাস্টগঠন করেন। সেই ট্রাস্ট ১৯২৫ -এর কাছাকাছি সময় থেকে এখনো পর্যন্ত মন্দিরের দেখাশোনা করছেন। মূল মন্দিরটি ছিল বর্তমান মন্দিরের সামনে দক্ষিণ-পূর্বকোণে। সেখান থেকে পরে বর্তমান স্থানে এই মন্দির স্থাপিত হয় এবং সিমেন্টের দেবীর মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়। বিশালাক্ষী দেবীর সম্মুখে সিঁদুর মাখানো আরো দুটি প্রাচীন মূর্তিও দেবীর সঙ্গে পূজিত হয় – একটি মঙ্গলচণ্ডী ও অন্যটি শীতলা। মূলমন্দিরের ডানদিকে একটি ঘরে শিবলিঙ্গ আছে। বর্তমানে বিশালক্ষ্মী মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা দুবেলা নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন উৎসবে ভক্ত ও ব্রতীদের ভীড় হয়। তবে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় সবচেয়ে বড় উৎসব হয় এবং সমবেত সকলকে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হয়।

বারুইপুরে আছে আরো দুটি বিশালাক্ষী মন্দির যেগুলোর বয়স দুশ বছরের কম নয়। প্রথমটি বারুইপুর পৌরবাজার থেকে উত্তরে যোগীবটতলা থেকে পূর্বে হাঁটাপথে বা রিক্সাপথে ডিহিমেদন মল্ল গ্রামে। রিক্সা থেকে নেমে একটু ভিতরে দিলীপ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ির পাশেই সুন্দর নবনির্মিত মন্দির। দেবী বিশালাক্ষী দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দিলীপবাবুর পূর্বপুরুষ চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিজের পুকুর খননকালে পেয়েছিলেন শ্বেতপাথরের তৈরী সওয়া একফুট উচ্চ জগদ্ধাত্রী দেবীর একটি সুন্দর মাতৃকামূর্তি। বিশালাক্ষী বলে পূজিত মাতৃমূর্তিটি এ অঞ্চলের একটি মূল্যবান শিল্প নিদর্শন। স্বপ্নাদেশের সঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তিটির মিল না - থাকায় মা বিশালাক্ষীর একটি মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরী করে পূজা করা হয়। তিনি শবাসনা, দ্বিভুজা, রক্তাম্বরা। পৌরবাজার সংলগ্ন বিশালাক্ষী মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শনি-মঙ্গলবার ও বিশেষ তিথিতে বহু ভক্ত মানুষ আসেন প্রার্থনা নিয়ে। এই সব বিশেষ দিনে নির্দিষ্ট পুরোহিত পূজা করেন, যদিও নিত্যপূজা এখন দিলীপবাবুই করে থাকেন। বার্ষিক পূজা ও মেলা হয় দুর্গাষষ্ঠীর

দিন। সকাল ছ'টা থেকে প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত পূজা চলে। পূজা করেন ঐ নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

তৃতীয় বিশালাক্ষী মন্দিরটি বারুইপুর পুরানো বাজার থেকে আধকিলোমিটার দূরে ফুলতলার পথে রাস্তার বামদিকে রায়চৌধুরীদের বিশালাক্ষীতলায়। প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে নানা মত থাকলেও মোটামুটিভাবে প্রায় সকলে মেনে নিয়েছেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে রাজপুর থেকে বারুইপুরে আসেন জমিদার রাজবল্লভ রায়। তাঁর সঙ্গে আগত আনন্দময়ী সাধক আনন্দগিরি দুটি মূর্তি নিয়ে আসেন – প্রথমটি আনন্দময়ী ও দ্বিতীয়টি বিশালাক্ষী। এই বিশালাক্ষী দ্বিভুজা, বটুক ভৈরবাসনা, দিব্য হলুদবর্ণা, রক্তাম্বরা, সালংকারা। হাঁটু ছাড়িয়ে প্রায় নিম্ন পদযুগল পর্যন্ত প্রলম্বিত মুণ্ডমালা, দক্ষিণহস্তে উদ্যত খড়্গ, বামহস্তে একটি বিশেষ মুদ্রায় চিত করে পদ্ম বা সিঁদুরকৌটোজাতীয় কিছু একটা ধরা। দেবীর মাথার বিশাল রজত জটা মুকুট। একফুট বেদীর উপর দণ্ডায়মানা প্রায় চারফুট দেবী মূর্তি। বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয়। বিশাল আকৃতির বিশালাক্ষী অন্যান্য বিশালাক্ষীর মতই। দেবীর দুদিকে দুটি পার্শ্বদেবতা হিসেবে দু'রকমের বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত। বিশালাক্ষীর মূর্তির বিবর্তনে এই বটুক ভৈরব বিশালাক্ষী এক স্বতন্ত্র সংযোজন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা নিত্যপূজা হয় নিরামিষ নৈবেদ্যে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং অন্যান্য সব ছোটবড় পূজা ও ব্রতে দেবীর মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় আজও।

বারুইপুরের ভূতপূর্ব জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়িতে মোহান্ত আনন্দগিরি প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দময়ী' নামে কালীর মন্দির আছে। নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা নিত্যপূজার আয়োজন। দু'শ বছরেরও বেশী সময়ের এই আনন্দময়ী স্থানীয় মানুষদের একটি শ্রদ্ধার ক্ষেত্র, যদিও মন্দিরটি মূলত পারিবারিক।

এই রায়চৌধুরী বাড়ির দক্ষিণে কোষাঘাট পুকুরের উত্তরপাড়ে ঐ সমসাময়িক কালের একটি শিবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরে মহাদেবকে প্রণাম করে তবে জমিদার বাড়িতে যেতে হয়। এখন সে রেওয়াজ না-থাকলেও এবং মানুষের চোখে দেবতা কিছু মহিমাহীন হলেও মন্দিরটি যথাস্থানে ইতিহাসের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে।

বারুইপুর বাজারের কাছে রায়চৌধুরীদের একটি দ্বিতল দোলমঞ্চ আছে। তার চূড়ায় একটি প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া গেছে – 'ওঁ ১৩৭৩ ওঁ।' ১৩৭৩ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দ। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এই দোলমঞ্চটি নির্মিত কিনা এবং উক্ত লিপি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, মঞ্চটির প্রাচীন রূপের সাথে নতুন কিছুর সংযোজন ঘটেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকায়ত সংস্কৃতিতে দেবতা পঞ্চানন্দের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বারুইপুরেও পঞ্চানন্দ যথাযথ মহিমায় সমাসীন। বারুইপুরে অন্তত আটটি থান আছে যেখানে পঞ্চানন্দের পূজার্চনা চলে। বিশেষভাবে চিহ্নিত বিগ্রহহীন উন্মুক্ত স্থানকে থান বলা হয়। কিছু গাছপালা, পাথর বা বেদী থাকলেও বাঁধানো বা সুরক্ষিত মন্দির থাকে না। তবে ছটি মন্দির বা মন্দিরকল্প স্থানে পঞ্চানন্দের নিয়মিত পূজার্চনা হয়। (১) বারুইপুর পুরাতন বাজারের দক্ষিণপ্রান্তে বটগাছের তলায় বিশাল-মূর্তি পঞ্চানন্দের নিয়মিত পূজা হয়। স্থানীয় দত্তপরিবার দেখাশোনা করলেও স্থানীয় জনসাধারণ ও বাজারের ব্যবসায়িগণ সশ্রদ্ধভাবে

এই পূজার্চনায় যোগ দেন। (২) বারুইপুর স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার পূর্বে মদারাট গ্রামে আছে পঞ্চানন্দের মন্দির, যেটি গ্রামের একাধিক মন্দির ও থানের মধ্যে গ্রামবাসীদের অন্যতম শ্রদ্ধাকেন্দ্র। (৩) বারুইপুর বাজার থেকে কয়েকশ মিটার দূরে সাহাপাড়ায় আছে অন্তত একশ বছরের পুরানো পঞ্চানন্দের মন্দির। টালির মূল মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির আছে। শনিবার ও মঙ্গলবার পূজা হয়। বছরে একবার বার্ষিক পূজা (দেশমালাপূজা) হয়। স্থানীয় মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বর্তমান পুরোহিত। (৪) বারুইপুর স্টেশন থেকে পূর্বদিকে উকিলপাড়ার শেষপ্রান্তে পঞ্চাননতলায় আছে পঞ্চানন্দ মন্দির, যেখানে বর্ষশেষে গাজনের মেলায় অনেক লোকের সমাগম ঘটে। (৫) গোবিন্দপুরে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে পঞ্চানন্দের একটি মন্দির আছে, যেখানে নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা আছে। (৬) রামনগরের কাছে শাঁখারিপুকুরে আছে পঞ্চানন্দের একটি মন্দির। থানার মধ্যে পঞ্চানন্দের এই প্রাচীনতম মন্দিরটি ২০০ বছরের কম নয়। পঞ্চানন্দের থান আছে বারুইপুর পুরাতন থানার সামনে বৈদ্যপাড়ার মুখে, লাঙ্গলবেড়িয়া, সীতাকুণ্ডু, শিখরবালি, রামনগর, সূর্যপুর ইত্যাদি জায়গায়।

রায়চৌধুরীদের বিশালাক্ষীতলা থেকে পূর্বদিকে কিছুটা দূরে পালপাড়ায় আছে অন্নপূর্ণা মন্দির। বেতী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের বয়স অর্ধশতকেরও বেশি। নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা। দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও পূজার্চনা চলে।

ফুলতলার আধকিলোমিটার উত্তরে ছাটুইপাড়ায় আছে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। জোড়াবাংলা মন্দির। পূর্বতন জমিদার ছাটুইবাবুরা বলেন, মন্দিরটি অন্তত দুশ বছরের প্রাচীন। মন্দিরের শিবলিঙ্গটি দেখে বিশেষজ্ঞগণ এই শিবলিঙ্গটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ফুলতলা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ডু গ্রামে আছে 'সীতামায়ের মন্দির'। এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণের কালনির্ণয়ে কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন জনশ্রুতিও প্রচলিত নেই। তবে মন্দিরটি শতাধিক বছরের প্রাচীন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্দিরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতার নাম পাওয়া যায় না। মন্দির সংলগ্ন বিশাল পুকুরটির দক্ষিণ তীরে ইট বাঁধানো সোপানাদি সহ নানা ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে, যেগুলি মন্দিরটির প্রাচীনত্ব প্রমাণে একান্ত সহায়ক।

সীতাকুণ্ডুর এক কিলোমিটার উত্তরপূর্বে চিত্রশালী গ্রামে আছে চিত্রশালী মঠের নন্দীকেশ্বর শিব ও দালানমন্দির। বন কেটে বসত নির্মাণের সময় কোন জমিদার এই লিঙ্গমূর্তিটি উদ্ধার করেন এবং পূর্ববর্তী মন্দিরের ধ্বংসের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। তাঁর নাম বর্তমান প্রবীণদের কেউ বলতে পারেন না। বর্তমান একতলা দালানমন্দির নির্মাণ করেছেন ইন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে নাটমন্দির। গর্ভমন্দিরের কয়েক ধাপ নিচে নেমে লিঙ্গদর্শন করতে হয়। নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিয়মিত পূজার্চনা হয়। শিবরাত্রি ও গাজনে মহাসমারোহে উৎসব হয়।

সীতাকুণ্ডু ও চম্পাহাটীর প্রায় মাঝামাঝি বেগমপুর গ্রামে আছে আজ থেকে দেড়শ বছর পূর্বে শিবনারায়ণ সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ। ১৯৯৯-এ প্রয়াত চণ্ডিকাচরণ ভট্টাচার্যের পর এখন মন্দিরের দেখাশোনা ও পূজার্চনার দায়িত্বে আছেন গণেশ

ভট্টাচার্য। তবে এখন মন্দিরের অবস্থা ভাল নয়। কোনরকমে পূজা চলে এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসবও কমে যাচ্ছে। সীতাকুণ্ড ও চম্পাহাটির প্রায় মাঝামাঝি বেগমপুর গ্রামে আছে আজ থেকে দেড়শ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ। সেখানে আজও নিয়মিতভাবে পূজা ও উৎসব চলে। পণ্ডিত শ্রী চণ্ডিকাচরণ ভট্টাচার্য পূজারী ও সেবায়েত ছিলেন। বারুইপুরের বাজার থেকে একটু দক্ষিণে আছে সদাব্রত ঘাটের মন্দির, যেখানে আছে শিবলিঙ্গসহ শীতলা বনবিবি ও কালীমূর্তি। বহু প্রাচীন এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা হয় নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও উৎসবে স্থানীয় মানুষের সমাবেশে বেশ মুখর হয় মন্দির-প্রাঙ্গণ।

ফুলতলায় বি. ডি. ও. অফিসের কাছে আছে একটি শীতলা মন্দির, যাতে নিয়মিত পূজা হয় নির্দিষ্ট পুরোহিতের দ্বারা। স্বাধীনতার পর এই অঞ্চল যখন উদ্বাস্তু, অধ্যুষিত হয়। সেই সময় থেকে এই মন্দিরের সূচনা। তাই পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরাতন এই মন্দির।

বারুইপুর দত্তপাড়ার মাঝে আছে আদি কালীমাতা মন্দির। একশ বছরেরও বেশি প্রাচীন এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা হয় নির্দিষ্ট পুরোহিতের দ্বারা। গ্রামের যেকোন পূজা বা ব্যক্তিবিশেষের মানত উপলক্ষ্যে এখানে পূজা হয়। তাই গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্র এই মন্দির।

আদি কালীমাতামন্দির থেকে কিছুটা উত্তর গেলে দত্তপাড়ায় পাওয়া যায় গোপালবাবাজীর আশ্রম-মন্দির । প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রাচীন এই আশ্রমে আছে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ। জন্মাষ্টমী ও দোলপূর্ণিমায় বহু ভক্ত ও অনুরাগীর সমাবেশে বড় উৎসব হয়। স্থানীয় ও বহিরাগতদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অন্য বৈষ্ণব তিথিগুলোতে বেশ ভীড় হয়। আশ্রমিকদের দ্বারা নিয়মিত পূজা ও নিয়মিত সংকীর্তন হয়।

চাম্পাহাটির কাছাকাছি নড়িদানা গ্রামে ধর্মতলা নামে একটি স্থান আছে। ধর্মঠাকুরের নামে স্থানটির নাম ধর্মতলা। প্রায় দুশ বছর আগে ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজপুরের দানশীল জমিদার দুর্গারাম কর। এখন মন্দিরে আছে ৫˝/৬˝ পরিমিত কূর্মমূর্তি। এই কূর্মমূর্তিটি ধর্মঠাকুরের। এছাড়া আছে কষ্টিপাথরের কিছু শিলাপুত্র। সেগুলো বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী, শীতলা, মনসা ও গঙ্গা নামে পূজিত হয়। মন্দিরের সেবায়েত ও পুরোহিত ভট্টাচার্য পরিবারের বাড়ি মন্দিরের সামনে। এই ভট্টাচার্য পরিবারের বিপুল ভট্টাচার্য এখন মন্দির দেখাশোনা ও পূজার দায়িত্বে আছেন। মূল মন্দিরের সামনে সম্প্রতি একটি নাটমন্দির নির্মিত হয়েছে। দৈনন্দিন পূজা ছাড়া বৈশাখী বা বুদ্ধপূর্ণিমার সময় এখানে বিরাট মেলা হয়। তখন কাছের ও দূরের বহু লোকের সমাগম হয়।

ফুলতলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রামনগর গ্রামে আছে 'রামনগর কালীবাড়ি' – আড়াইশ বছরেরও বেশি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, স্বামী ভৈরবানন্দ নামে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, মন্দির থেকে প্রায় আড়াইশ হাত দূরে পূর্বদিকে 'কালীমা ঢিবি' সংলগ্ন এক দহ থেকে ৬˝ পরিমিত একটি মূর্তি উদ্ধার করে এখানেই প্রতিষ্ঠা করে যান। মূর্তিটি 'কালী' বলেই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কয়েকবছর আগে মূর্তিটির আলোকচিত্র নিয়ে শ্রদ্ধেয় অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী দেখেছেন, ওটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। এ তথ্য জনসাধারণের অবিদিত। বর্তমান মন্দিরটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে পুনর্নির্মিত হয়। প্রকাশ্যমূর্তিটি নিমকাঠের তৈরী । নাম উগ্রতারা। স্থানীয়

হিন্দু জনসাধারণের প্রাণকেন্দ্র এই মন্দিরটিতে নিয়মিত পূজার্চনা হয়; কিন্তু মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

রামনগরের পাশের মৌজার নাম শাঁখারিপুকুর। এই মৌজার শাঁখারিপুকুর গ্রামে আছে শিবমন্দির ও কালীমন্দির। এই গ্রামের পঞ্চানন্দের মন্দিরের তুলনায় নতুন হলেও এগুলো একশ বছরের কম নয়। নিয়মিত পূজা ছাড়া মন্দিরদুটিকে কেন্দ্র করে বিশেষ পূজা ও নানা মেলায় যথেষ্ট জনসমাবেশ হয়।

ধপধপি রেলস্টেশন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ধপধপি গ্রামে আছে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মন্দির, যা দক্ষিণেশ্বর নামে এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। মূর্তিটি বিশাল– অশ্বারোহী পুরুষমূর্তি, পায়ে বুট, ডানহাতে বন্দুক, চোখদুটি বিরাট – এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। মূলমন্দিরের সামনে নাটমন্দির আছে। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে হিন্দু – মুসলমান নির্বিশেষে দূরের ও কাছের বহু মানুষ পূজা দেয়। দক্ষিণরায়ের আবির্ভাব ১৫শে বা ১৬শ শতাব্দীতে। ধপধপিতে এই দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভবত আড়াইশ বছরের বেশি নয়। বর্তমান নাটমন্দিরটি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মণিমোহন চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় নির্মিত হয় ও ব্রিটিশ ভাস্কর্যে নাটমন্দিরটি অলংকৃত করেন তিনিই। প্রতি বছর ১লা মাঘে উৎসব এবং ১লা ও ২রা মাঘে দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল উৎসব উপলক্ষ্যে বহু মানুষের সমাগম হয়।

সূর্যপুর রেলস্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে কেয়াতলার কাছে বড়দুর্গায় আছে একটি মন্দির। দুর্গার মন্দির । জনশ্রুতি আছে, কেশবপুর গ্রামনিবাসী গাঙ্গুলীবংশের পূর্বপুরুষ দেবী দুর্গার স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী থেকে প্রস্তরময়ী দুর্গামূর্তি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। সে মূর্তি আজ আর নেই। আছে কেবল তিনটি শিলার মধ্যে একটি বড় ডিম্বাকৃতি শিবলিঙ্গ, আর কিছু ভগ্নাবশেষ। দেবী দুর্গা-ভাবনায় পূজার্চনা চলে। প্রবীণ গ্রামবাসীদের ধারণা, ১৬শ শতাব্দীতে শ্রীমন্ত সদাগর এখানে এসে দেবী দুর্গার পূজা করেন। তবে একটা বিষয়ে সকলে একমত এখানে বেশ কয়েকশ বছর আগে একটা প্রস্তরময় মন্দির ছিল। এ-গুলো তারই ভগ্নাবশেষ। এই দুর্গার নামানুসারে গ্রামের নাম দুর্গা।

সূর্যপুর স্টেশন থেকে কাছেই সূর্যপুর হাটের উপর আছে সুদৃশ্য সুরক্ষিত এক প্রাচীন কালীমন্দির। স্থানীয় জমিদার প্রফুল্ল ঘোষ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে এই মন্দির স্থাপন করেন। প্রস্তর বিগ্রহটি যথেষ্ট প্রাচীন বলে মনে হয়। বিগ্রহের একপাশে আছে শ্রী রামকৃষ্ণের মূর্তি, অন্যপাশে মা সারদার মূর্তি। এই মন্দিরে দ্বিতীয় একটি ঘরে আছে শনিঠাকুরের বিগ্রহ। দুটি মন্দিরেই নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ দ্বারা নিয়মিত পূজা হয়।

সূর্যপুরহাটের পশ্চিমে আদি-গঙ্গার তীরে আছে দুটি মন্দির ডানদিকের মন্দিরটি রাধাকৃষ্ণের এবং বামদিকের মন্দিরটি শিবমন্দির। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে স্থাপিত এই মন্দিরদুটির মাঝখানে আছে নাটমন্দির। মূল্যবান কষ্টিপাথরে নির্মিত মূর্তিদুটি। রাজস্থান থেকে আনা শ্বেতবর্ণের রাধাকৃষ্ণ মূর্তিটি অতি সুন্দর, যেন জীবন্ত। নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বারা নিত্যসেবার আয়োজন আছে। জন্মাষ্টমী, রাসমেলা, শিবরাত্রি, দোলপূর্ণিমা ও অন্নপূর্ণা পূজার দিনে বিশেষ উৎসব হয়। সে সময়ে বহু লোকের সমাগম হয়। বর্তমানে এই মন্দির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আছে একটি অছি পরিষদের উপর।

বারুইপুর–ডায়মণ্ডহারবার রেলপথের প্রথম স্টেশন কল্যাণপুরে আছে কল্যাণমাধবের মন্দির। ১৫শে শতকের শেষভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গলে আছে – চাঁদ সদাগর এই দেবতাকে পূজা করে সিংহলে বাণিজ্যতরী নিয়ে গেছিলেন। আবার সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে কল্যাণপুরের নাম ও কল্যাণমাধবের উল্লেখ আছে। পূর্বমন্দিরের কোন চিহ্ন নেই। পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট এই মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। কয়েকটি পিলারের উপর ছাদ আর মধ্যভাগে উচ্চ মঠশৈলীর চূড়া এবং চারধারে ছোট ছোট চারটি চূড়া। গর্ভগৃহে কল্যাণমাধব বা বুড়োশিব। এই বুড়োশিবের নামে জায়গাটির নাম বুড়োশিবতলা। অন্য সাধারণ শিবলিঙ্গ থেকে এই শিবলিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

বারুইপুরের পদ্মপুকুর মোড় দিয়ে বারুইপুর আমতলা রাস্তায় পুরন্দরপুরে কলেজ স্টপেজে নামলে সামনেই দেখা যায় জোড়ামন্দির। মাহীনগর গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মহীপতি বসুর বংশধর গোপীনাথ বসুর নবাব প্রদত্ত নাম পুরন্দর খাঁর সঙ্গে এই স্থানটির নাম জড়িত। পোড়ামাটির টেরাকোটার সঙ্গে আটচালা মন্দির। দুটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ। ডাইনে প্রথমটি নারায়ণীশ্বরের দক্ষিণমুখী দরজা, বামদিকে রামনাথেশ্বর মন্দিরটি উত্তরমুখী। মধ্যে ব্যবধান একটি চাতালের। মন্দিরদুটির দ্বারফলকে সাদা ফলকের উপর সংস্কৃত ভাষায় লেখা থেকে জানা যায় ১৭৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে শ্রী কালীচরণ শর্মাকর্তৃক মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠিত। এই কালীচরণ (শর্মা) হালদার ছিলেন ধর্মনগর বা ধোপাগাছির জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর নামেই মন্দির সংলগ্ন শ্মশান ও মন্দির চত্বরের নাম হালদার চাঁদনী। হালদার চাঁদনী নামটি এ অঞ্চলের সকল মানুষের অতি পরিচিত। বহু জনশ্রুতি ও ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরের এই হালদার চাঁদনী। একই সরলরেখায় অবস্থিত মুখোমুখী সুন্দর দুটি বাংলাচালের শিবমন্দির। মাঝের চাতালটি অনেক যাত্রী বসার মত প্রশস্ত। এর পশ্চিমদিকে ফাঁকা জমির উপর তুলসীমঞ্চ। মন্দির দুটি পরস্পরের মুখোমুখী হলেও আদি গঙ্গার ঘাটের দিকে উভয়েরই একটি করে দরজা আছে, পূর্বমুখী। সারা বছর ধরেই চলে শিবপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান। তবে শিবরাত্রি, বারুণী ও বিশেষ বিশেষ গঙ্গাস্নানের সময় মেলা বসে ও যাত্রীদের বেশ ভীড় হয়।

হালদার চাঁদনীর হালদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অদ্বৈত মণ্ডলের নেতৃত্বে স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের লোকজন সমসাময়িককালে ধোপাগাছিতে জোড়া শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার একটি মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মন্দিরটিও জরাজীর্ণ। সেখানে কোনরকমে নিত্যপূজা চলে। ধোপাগাছির সরদারপাড়ায় মুখার্জি পরিবারের স্থাপিত একটি শিবমন্দির আছে, যার বয়স একশ' বছরের কম নয়। সে মন্দিরে নিত্যপূজার আয়োজন আছে।

জোড়ামন্দির থেকে সামান্য উত্তরে বর্তমান শ্মশানক্ষেত্রে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আসেন বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি ছিলেন উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার জনৈক শিক্ষক। আশ্রমিক জীবনে কালিকানন্দ চৈতন্য নামে এই সর্বত্যাগী সাধক ও সমাজসেবীকে লোকে পণ্ডিত মশাই বলে ডাকত। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও প্রেরণায় এখানে প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ সহ অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এ অঞ্চলটির অনেক উন্নতি হয়েছে। শ্মশান

সংলগ্ন বটগাছের তলায় তাঁর আশ্রম, কালীমন্দির, দুটি ছোট শিবলিঙ্গ, কয়েকটি মূর্তি ও পাথর ইত্যাদি নিয়ে একটি দেবস্থান। শোনা যায়, এই স্থানে একসময় পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। ২৪.১০.২০০০ তারিখে তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিপূত এই দেবস্থানকে স্থানীয় জনসাধারণ সমান মর্যাদায় তত্ত্বাবধান করে চলেছে।

বারুইপুর ও মল্লিকপুরের মাঝামাঝি রেললাইনের পশ্চিমদিকে হরিহরপুরে আছে 'হরিহরপুর শ্রী শ্রী ভজন ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম'। ১৯৭২-এ স্থাপিত হলেও আশ্রমের বর্তমান রূপান্তর হয় ১৯৭৬-এ । সাড়ে তিনবিঘা জমির উপরে স্থাপিত এই মন্দিরচত্বর বারুইপুর থানার মধ্যে বৃহত্তম। মূল মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে বিশাল সুন্দর নাটমন্দির, আশ্রমিকদের থাকার ঘর, অতিথিনিবাস ও একটু দূরে ভজনবাবার সমাধি বেদী ও মনোরম পুষ্পোদ্যান নিয়ে আশ্রমের সামগ্রিক পরিবেশ যথার্থ সুন্দর । দুটি ঘরে বিগ্রহ আছে । প্রথমটিতে শ্রী রাধাগোবিন্দ ও শ্রী শ্রী গোপাল; দ্বিতীয়টিতে মা ভবতারিণী। আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দগিরির তত্ত্বাবধানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ, যাঁদের সংখ্যা বর্তমানে দশ। নিঃশুল্ক দাতব্য চিকিৎসার সঙ্গে কিছু সামাজিক সেবামূলক কাজ আছে। ভক্ত ও অনুরাগীদের প্রণামী ও চাঁদায় চলে আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যধারা। প্রতিষ্ঠা দিবস, সাধুভাণ্ডার, গুরুপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, কালীপূজা ও শিবরাত্রিতে বিরাট উৎসব হয়; বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাবেশে আশ্রমপ্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আনন্দমুখর।

বারুইপুরের উত্তরে প্রথম রেলস্টেশন মল্লিকপুর। সেই মল্লিকপুর থেকে দু'কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত অতীতের অতি সমৃদ্ধ গ্রাম বেনিয়াডাঙ্গা বা বেনেডাঙ্গা। 'এই গ্রামে দে উপাধিধারী সুবর্ণবণিক বংশ বহুগুণে অলংকৃত সমৃদ্ধিশালী ও কিছু পুণ্যকীর্তি স্থাপয়িতা।' গ্রামে আছে রাধাগোবিন্দের মন্দির যা 'সদাশিবের দ্বারা ১০১০ সালে (ইং ১৬০৩ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত'। স্পষ্টভাবে সালের উল্লেখ থাকলেও সালটি নিয়ে অনেকে বিতর্ক করেন; কিন্তু গ্রামে এখনও কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন যাঁরা ঘটনা পরম্পরা দিয়ে বলেন এবং বিশ্বাস করেন, মন্দিরটির বয়স সত্যি সত্যি চারশ বছর। মন্দিরে নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। যে বিশেষ উৎসবের জন্য এই মন্দির ও এই অঞ্চলের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত, তাহল পঞ্চম দোল-এর উৎসব। চৈত্রপূর্ণিমার পর পঞ্চমদিনে এই পঞ্চম দোল হয় মন্দিরের সামনের মাঠে জাঁকজমকসহকারে বহু মানুষের সমাগমে। সন ১২২৩ সালে রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই গ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজার আয়োজন আছে নির্দিষ্ট পুরোহিতের দ্বারা গ্রামের সকল মানুষের সহযোগিতায়। গ্রামে হরিসভার সম্মুখে নাটমন্দিরে গৌরপূর্ণিমায় হরিনামের আসর বসে। তার পাশেই কাঞ্চনতলায় আছে একটি শিবমন্দির। ১২২৩ সালে ব্রজনাথ দে ও দ্বারিকানাথ দে এই মন্দিরটি স্থাপন করেন; এখানকার শিব 'খোকাশিব' নামে খ্যাত ও পূজিত। এ মন্দিরে সকলের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট পুরোহিতের দ্বারা নিত্যপূজা চলে। তবে মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীদেবী স্বয়ং আসেন তাঁর বাড়িতে। একান্ত পারিবারিক এই পূজাস্থানে সাধারণের অংশগ্রহণ নেই।

বারুইপুর স্টেশনের পূর্বদিক থেকে মদারাট গ্রামের সূচনা। এখানে আছে দুটি কালীমন্দির। প্রথমটি সিদ্ধেশ্বরী কালীতলা যেখানে নিত্যপূজা হয় নির্দিষ্ট পুরোহিতের দ্বারা। এখানে

বছরে বেশ কয়েকটি উৎসব হয় বিশেষ বিশেষ তিথিতে। স্থানীয় জনসাধারণের আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণে উৎসবগুলো বিশেষ প্রাণবন্ত হয়। কালীতলায় রক্ষাকালীর মন্দিরের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। তবে বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয় চৈত্রমাসে খুব ধুমধাম করে। এখানে আছে একটি শিবমন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছে এবং নিয়মিত পূজার্চনা চলে। চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে তিনদিন ধরে বেশ বড় মেলা হয়। এছাড়া আছে মনসার থান, যেখানে বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজা হয়।

বারুইপুর বাজার থেকে চার কিলোমিটার দূরে শিখরবালিতে আছে শতবৎসরেরও অধিক সময়ের শীতলা মন্দির। ১৩০০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি শিখরবালির বর্ধিষ্ণু পাল পরিবারের ডাঃ নরেন্দ্রনাথ পাল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হোমিওপ্যাথির পাশকরা ডাক্তার হলেও তিনি আয়ুর্বেদে উৎসাহী ছিলেন এবং নিয়মিত চর্চা করতেন। বসন্তরোগের প্রতিষেধক এক ধরনের তেল তিনি তৈরি করেছিলেন এবং এই মন্দির থেকে তিনি রোগীদের তা দিতেন। এই প্রসঙ্গে শীতলা মন্দিরের নাম বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। মন্দিরে শীতলা মূর্তি আছে এবং পাশে আছে নাটমন্দির। সামনের পুকুর আদিগঙ্গারই অংশ; তাই সেখানে স্নান। স্থাপনের সময় থেকে পুরোহিত দ্বারা নিত্যপূজার ব্যবস্থা। চৈত্রমাসের শীতলা ষষ্ঠী এবং জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম শনি–রবি–সোম–মঙ্গল– চারদিন বেশ বড় মেলা হয় বহুলোকের সমাগমে। পারিবারিক দানে স্থাপিত পারিবারিক মন্দির হলেও স্থানীয় জনসাধারণ এ মন্দির সকলের করে নিয়েছে বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায়।

বারুইপুর পুরসভার কেন্দ্রস্থলে শিবানীপীঠের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ইং ১৯৬৬ অব্দে শ্যামাপূজার দিন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য পঞ্চাননতলায় দত্তদের পুকুর থেকে একটি ঘট এনে প্রতিষ্ঠা করেন এবং যথারীতি পূজা করেন। কিন্তু দেবীহীন ঘটপূজায় তাঁর মনে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। এরূপ চিন্তার মাঝে তিনি একরাতে দেখলেন বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক কালীমূর্তি। দ্বিতীয়বারে তিনি একই মূর্তি দেখলেন। তাঁর দেখা দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন পাষাণী মূর্তিতে; কিন্তু সঙ্গতির অভাবে নাজিরপুরের শিল্পী শ্রীমন্ত সরদারকে দিয়ে নিমকাঠের দেবীমূর্তি তৈরী করালেন এবং যথারীতি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই মৃন্ময় ঘট এবং দারুময়ী মূর্তি এখনও পূজিত হয়। শিবানী ছিলেন দুর্গাদাসবাবুর অতি আদরের কন্যা। দেবী শিবানীর মত আদর চান ভক্তপূজারী দুর্গাদাসবাবুর কাছে। তাই দেবীর ইচ্ছায় দেবীর নাম শিবানী এবং দেবস্থানের নাম শিবানীপীঠ। মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী ও জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় বিশেষ উৎসব হয়। ঐ সব উৎসবে এবং দুর্গাপূজার সময় সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বর্তমান মন্দির ও নাটমন্দির ভক্তগণের দানে নির্মিত। মন্দিরে নিত্য দুবেলা পূজার ব্যবস্থা আছে। পূজার্চনা ও মন্দির তত্ত্বাবধানের এখন দায়িত্বে আছেন স্বর্গত দুর্গাদাসবাবুর দুইপুত্র – মর্ধেন্দুশেখর ও পূর্ণেন্দুশেখর।

বারুইপুর রেল স্টেশনের দক্ষিণে কালীতলায় আছে রক্ষাকালীর মন্দির। প্রায় শতবৎসরের প্রাচীন এই মন্দিরে নির্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। চৈত্রমাসে বিশেষ তিথিতে রাত্রে সবিগ্রহ বার্ষিক পূজা হয় খুব ধুমধাম করে।

বারুইপুর বাজার থেকে পূর্বদিকে নিরালা রোডের সামনেই আছে ২০০১ অব্দে স্থাপিত ঠাকুর ওঙ্কারনাথের মন্দির ও আশ্রম। সুসজ্জিত মন্দিরে নির্দিষ্ট পূজারী দ্বারা নিত্যসেবার আয়োজন আছে। প্রতিদিন কিছু ভক্ত আসেন মন্দিরে কাছের বা দূরের। বছরে তিনচারটি উৎসব হলেও ফাল্গুনমাসের ওঙ্কারনাথের জন্মদিনে বিশেষ উৎসব হয় বহু ভক্ত ও অনুরাগীজনের সমাবেশে। সকলকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয় ওদিন।

সাউথ গড়িয়া বারুইপুর থানার একটি বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। সেখানে আছে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। পূজার্চনায় অতীতের জৌলুস না-থাকলেও বিশেষ বিশেষ উৎসবে সেখানে বহু ভক্তজনের সমাবেশ হয়।

সাউথ গড়িয়ায় আছে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম কেন্দ্রীয় মন্দির । ইং ২০০০ অব্দে ক্রীত তিনবিঘার অধিক জমিতে আছে একটি পুরাতন ও বড় দোতলা বাড়ি এবং পুকুর। সেখানে নিত্যপূজা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ উপলক্ষ্যে বহু ভক্ত ও অনুরাগীর সমাগম হয়। ভাদ্রমাসের তালনবমী, শারদীয়া বিজয়াদশমী ও অন্য কয়েকটি বিশেষ তিথিতে সেখানে বহু মানুষের মিলন ঘটে। এই সাউথ গড়িয়া গ্রামে আছে ভুবনেশ্বর মন্দির।

বারুইপুরে হিন্দু মন্দির ও দেবস্থান অসংখ্য। প্রধান মন্দিরগুলোর দিকে নজর দেবার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে সীমিত সময়ে। তবে বহু জায়গায় আছে মনসার থান, পঞ্চানন্দের থান এবং শনিঠাকুরের মন্দির বা থান। ইদানীং কালে বারুইপুরের শহর ও গ্রামে বহু জায়গায় শনিঠাকুরের পূজার চল হয়েছে। দু'একটি সুগঠিত মন্দিরও আছে এবং শনিবার সেখানে বেশ জাঁকজমক করে পূজা হয়। দু'একটি পুরাতন মন্দির, যেখানে মানুষের আবেগ জড়িত, হয়তো এই প্রবন্ধে বাদ পড়েছে অবধান বা সময়ের অভাবে। বারান্তরে সে সব মন্দিরসহ নতুন মন্দিরগুলোর সামগ্রিক পরিচয় দেবার আন্তরিক চেষ্টা থাকবে।

<u>তথ্যসংগ্রহে সাহায্য</u> –

ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা — কৃষ্ণকালী মণ্ডল ।

খ) দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ — কৃষ্ণকালী মণ্ডল ।

গ) অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ।

ঘ) শক্তি রায়চৌধুরী ।

ঙ) কিছু মন্দিরের সেবায়েত।

বারুইপুরের মস্‌জিদ-মাজার ও মাদ্রাসা

এম. এ. মান্‌নান

মুখবন্ধ ঃ

বারুইপুরের ইতিহাসে মস্‌জিদ-মাদ্রাসা-মাজারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এদের মধ্যে কতগুলি প্রতিষ্ঠান যেমন প্রাচীন তেমনি রয়েছে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু মানুষের আত্মত্যাগের ও সাধনার ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে এগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ধর্মীয় মূল্যবোধের আদর্শ ও শিক্ষাধারা। নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মূর্ত প্রতীক ও ইহা ভারতভূমির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

কল্যাণপুর গ্রামপঞ্চায়েত

করিম কর্তা পীর সাহেবের মস্‌জিদ ঃ

কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পুরন্দরপুর গ্রামে সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য মস্‌জিদ হল 'করিমকর্তা পীর সাহেবের মস্‌জিদ।' নিকটেই আদি গঙ্গা। চারদিকে ছিল জঙ্গলে পূর্ণ। ঐ জঙ্গলের ধারে বাস করত মাত্র ৪/৫ ঘর লোক। শোনা যায় করিমকর্তা নামে এক পীর এখানে এসে থাকতেন। পুরন্দরপুর মস্‌জিদটি তাঁরই তৈরী। পাতলা পাতলা চারকোনা ইটে মস্‌জিদের দেওয়াল তৈরী। এখানে একটি বড় পাথর আছে ঐ পাথরে বসে পীরসাহেব সাধনা করতেন। বহু দিন ব্যবহারের ফলে ঐ পাথরে থাকা দাগ আজও বিদ্যমান।। মস্‌জিদের বর্তমান মাতয়াল্লী ৮৬ বছরের ইস্‌মাইল মোল্লা জানান ঃ 'এই মস্‌জিদ কতদিন আগে তৈরী হয়েছে সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেননি। তিনি নানীমার (দিদিমা) বাড়ীতে আছেন। তাঁর নানীমা বেঁচে ছিলেন ১৭৫ বছর। নানীমা ফুলজান বিবির স্বামী ভুলি সরদার স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর বাড়ীর কাছে মাটির মধ্যে মস্‌জিদ রয়েছে। তখন খননের ব্যবস্থা হয়। মাটি খুলে পাওয়া যায় চারকোনা হাতে চাপড়ানো ইটে কাদার গাঁথনি দেওয়াল। খুলতে খুলতে ইটের দেওয়াল প্রায় সব ভেঙে যায়। এখনও একটি পিলার আছে। তার পিতা মতিয়ার রহমান মোল্লা ঐ পুরানো ইট দিয়ে প্রায় ৭০ বছর আগে মস্‌জিদটি পুনরায় তৈরী করেন। প্রায় ৬ বছর খোলা অবস্থায় মস্‌জিদের ইটগুলি পড়েছিল।

প্রতি শুক্রবার করে একজন ইমাম নামাজ পড়াতে আসেন। পুরাতন মস্‌জিদ হিসেবে ঐ দিন বাইরে থেকে বহু লোক আসেন।

খোদার বাজার নিশ্চিন্তপুর জামে মস্‌জিদ ঃ

নানারকম ফলের গাছের ছায়ায় ঘেরা দো-তালা মস্‌জিদটি বেশ জাগ্রত। স্থানীয় যুব ছাত্রদের 'আখলাক' বা চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে এই মস্‌জিদের কর্ণধারদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

রয়েছে। বিশেষ করে মস্‌জিদের ইমাম জনাব দাইয়ান সাহেবের মেহনত বা পরিশ্রমের তুলনা নেই। মস্‌জিদের সামান্য কিছু স্থায়ী আয় আছে। স্থানীয় দানে মস্‌জিদের ব্যয় নির্বাহ হয়। পুরাতন মস্‌জিদ। ১৮৯৮ সাল নাগাদ এই মস্‌জিদ তৈরী হওয়ার কথা জানালেন মস্‌জিদ কমিটির সভাপতি মনসুর আলি সরদার। প্রথমে টালির ছাদ ছিল, পরে ছাদ আঁটা পাকা ঘর তৈরী হয়েছে। বিগত কিছু বছর আগে মস্‌জিদের ঘর বেড়েছে ও দো -তালা হয়েছে।
এই মস্‌জিদ তৈরীর উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা ছিল হাজী সুফী সাহেবের। তিনি ছিলেন একজন সাধক।

খোদার বাজার বড় মস্‌জিদ (আহলে হাদিস)ঃ

আদি গঙ্গার তীরে কিস্মৎ মোমিনাবাদ বর্তমানে খোদার বাজার গ্রামের এই মস্‌জিদটি সবদিক থেকে উন্নত। আর্থিক কাঠামো মোটামুটি ভাল। মস্‌জিদ কমিটি পরিচালিত ডেকরেটিং ব্যবসায় মস্‌জিদের আর্থিক কাঠামো মজবুত হয়েছে। অল্প কিছু জমি আছে মসজিদের নামে। মসজিদের অধীন কিছু লোকের আর্থিক কাঠামো মোটামুটি স্বচ্ছল থাকায় তাদের সহযোগিতায় মস্‌জিদের উন্নয়নমূলক কাজ সহজ হয়েছে।
মস্‌জিদটি ছিল আগে খড়ের চালের। বাংলা ১৩০২ সালে হাজি আবদুল্লাহ মস্‌জিদটি পাকা করে দেন। হাজি আবদুল্লাহ ছিলেন খোদার বাজার গ্রামের জামাই। বাড়ী কলকাতার তাঁতিবাগান। তিনি ছিলেন খুবই সৎ ব্যক্তি। তাঁতিবাগান মস্‌জিদে থাকতেন। আবদুল্লাহ সৎভাবে সাহেবের কেরোসিন বিক্রি করায় সাহেবের খুবই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। আমেরিকা থেকে জরুরী ডাক পড়লে সাহেবরা স্বামী স্ত্রী চলে যান। যাওয়ার সময় চুক্তি হয় সাহেবের অনুপস্থিতে মালিক থাকবেন আবদুল্লাহ। সাহেব ফিরে এলে আবার মালিকানা তিনি ফিরে পাবেন। কিন্তু সাহেব আর ফিরে আসেননি। আবদুল্লাহ ক্রমে অর্থশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট প্রভৃতি জায়গায় কে. তেলের ডিপো তৈরী করেন। মিলন সিনেমার পাশে তেলের ডিপো ছিল। এখানে কয়েক বিঘে সম্পত্তি ছিল, এই আবদুল্লার পুত্র বর্তমান কাছারী বাজার প্রতিষ্ঠাতা হাজি ইউসুফ। হাজি ইউসুফের পুত্র সামিম ইউসুফ বর্তমান কাছারী বাজারের মালিক।
মস্‌জিদ গৃহ নির্মাণের পর ভাল ইমাম রাখার প্রয়োজন হয়। সদ্য মাওলানা পাশ করার পর এই সময় আসেন জয়নগর থানার বাইশ হাটা নিবাসী মাওলানা বাবর আলি সাহেব।
বর্তমানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় মস্‌জিদ গৃহের নবরূপায়ন হয়েছে। খোদার বাজার বড় মস্‌জিদটি এখন পশ্চিম বঙ্গের আহ্‌লে হাদিস জামাতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এম . আবদুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রচার সমিতি (১৯৯১) প্রতি বছর গরীব ছাত্র -ছাত্রীদের বই ও শিক্ষার উপকরণ

বিতরণ করে। সকালে নিয়মিতভাবে শিশুদের আরবি ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মূলক

উত্তর খোদার বাজার হানাফিয়া মস্‌জিদ ঃ

বাংলা ১৩৩৫ সালে বছরদ্দিন শেখ (ওরফে মোল্লা) এই মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মস্‌জিদের জন্য জমি দান করেন। মধ্যপাড়ায় মৌখিক দানের ভিত্তিতে তিনি কিছু জমি দিয়েছিলেন। এর পরে আরও কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ মস্‌জিদের নামে কিছু সম্পত্তি দান করেন। মস্‌জিদের ব্যয় নির্বাহ হয় কিছুটা সম্পত্তির আয় থেকে, বাকীটা চাঁদায়। মস্‌জিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী ফজলুর রহমান সরদার এবং ইমামের দায়িত্বে আছেন জনাব খায়রুল আনম সাহেব। গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় কয়েক বছর আগে মস্‌জিদ গৃহের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

উত্তর কল্যাণপুর সিপাই পাড়া মস্‌জিদ ঃ

ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছু আগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। নুরমহম্মদ সিপাই মসজিদের জন্য ১৪ শতক জমি দান করেন। ১৯৬৮ সালে মস্‌জিদ গৃহ সংস্কার করা হয়। গ্রামের লোকের চাঁদার উপর মস্‌জিদ চলে । মস্‌জিদের পাশে মাদ্রাসায় শিশুদের আরবি পড়ানো হয়। বর্তমান মস্‌জিদের ইমাম আলি হোসেন মণ্ডল।

চাকারবেড়িয়া পুরাতন মস্‌জিদ ঃ

যতদূর জানা যায় প্রায় ১৫০ বছর আগে মস্‌জিদটি স্থাপিত হয়। মস্‌জিদের জমিদাতাদের মধে ছিলেন ইউসুফ জমাদার, আছুর খাঁ, হাজি সহরদ্দি, হারেজ নস্কর। প্রায় ৭ শতক জমির উপর মস্‌জিদ অবস্থিত। আগে ছিল মাটির মস্‌জিদ। পাকা হয়েছে প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বছর আগে। ইমাম হাজি লুৎফর রহমান মস্‌জিদ দেখাশুনা করেন। স্থানীয় দানে মস্‌জিদ চলে।

দঃ চাকারবেড়িয়া জামে মস্‌জিদ ঃ

পীরস্থ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জমিতে প্রায় ২০/২২ বছর আগে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই মস্‌জিদ নির্মাণ হয়। মস্‌জিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী জুব্বার আলি নস্কর।

হক্কানিয়া মাহ্‌মুদিয়া ফয়জুল উলুম ট্রাস্ট (.....শাখা চাকারবেড়িয়া)

এই প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্র মগরাহাট। মূল কেন্দ্র তৈরী হয়েছে ১৯৮২ সালে। গত চার-পাঁচ বছর আগে চাকারবেড়িয়া শাখাটি চালু হয়। মাদ্রাসার সাথে মস্‌জিদ রয়েছে। এখানে প্রায় একশত গরীব ও এতিম ছাত্র পড়াশুনা করে। তাদের কোন খরচ দিতে হয় না। জাকাত, ফেতরা , কুরবানির চামড়া বিক্রির অর্থ ও বিভিন্ন জায়গার সহৃদয় দানে এই শাখাটি চলে। মাদ্রাসা ও মস্‌জিদের জন্য জমি দান করেন জিয়াউর রহমান, গিয়াসুদ্দিন লস্কর, ইদ্রিশ সরদার ও অনেক সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ। এখান থেকে ছাত্ররা কোরাণে হাফেজ হবে (কমবেশী ৫ বছরে) ও এখানে মাওলানা কোর্স পড়ানো হয়। তবে এখানে পড়া শেষ করে কিছু বছর বাইরে যেতে হবে।

ধোপাগাছি জামে মসজিদ ঃ

ধোপাগাছি মস্‌জিদ স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালে। মস্‌জিদের জন্য ধোপাগাছি লস্কর পরিবার প্রায় ৮ শতক জমি দান করেন। মস্‌জিদ দেখাশুনা করতেন জনাব কাশেম আলি লস্কর। মস্‌জিদে ইমামতি করেন মাওলানা আবুল হাসান। ছোট গ্রাম প্রায় ৭০০ লোকের বাস। স্থানীয় দানে মস্‌জিদ নির্মিত হয়েছে।

হরিহরপুর গ্রামপঞ্চায়েত

খাসমল্লিক জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর কুলপী রোডের পাশে অবস্থিত খাস মল্লিক জামে মস্‌জিদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ইহা তবলিগ জামাতের একটি প্রধান কেন্দ্র। মগরাহাটের পরই এই জেলায় খাস মল্লিকের গুরুত্ব। এটি ৮২ টি মস্‌জিদের মার্কাস (কেন্দ্র), প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে তবলিগ জামাত আসে ও আবার এখান থেকে ভাগ হয়ে বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। প্রতিদিন বিকেলে ৪০/৫০ জন বালক -বালিকা আরবি ও উর্দু শিক্ষা করে। রাতে আরবি ও ধর্মীয় শিক্ষার তালিমচলে বয়স্ক লোকদের।

জামাত আলি শেখ ছিলেন জমিদাতা ও মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে মস্‌জিদটি ছিল তালপাতার ছাউনি দেওয়া। আনুমামিক ১৯৩৫ সালে মসজিদটি তৈরী হয়। ১৯৬২ সালে মস্‌জিদের জমির রেকর্ড করা হয়। বর্তমানে মসজিদ গৃহের সংস্কার করা হযেছে। কেবল গ্রাউন্ট ফ্লোরে প্রায় ৬০০ লোক এক সঙ্গে নামাজ পড়তে পারে।

মস্‌জিদ সংলগ্ন দোকান ঘরের ভাড়া, জমি থেকে আয় এবং স্থানীয় দান ও মাসিক চাঁদায় মস্‌জিদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়।

হরিহরপুর মাইনগর জামে মস্‌জিদ ঃ

বারুইপুর থানার শেষ প্রান্তে হরিহরপুর গ্রামের এই মসজিদটি প্রায ৭০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন মাইনগর নিবাসী মহঃ সৈয়দ খাঁ। তিনিও মাইনগরে মস্‌জিদের নামে ৫ কাটা জমি দান করেন। মস্‌জিদটি গোবিন্দপুর পোটোর মোড়ের আগে একবারে কুলপী রোডের গায়। তৎকালীন গ্রামবাসী অচিমদ্দিন শেখ, নারান শেখ, লক্ষ্মী বিবিরা মস্‌জিতের নামে ২১ শতক জমি ওয়াকাফ করে দেন। সাপ্তাহিক মুষ্ঠির চাল, মাসিক চাঁদা, আর মস্‌জিদ সংলগ্ন দোকান ভাড়া ও জমির কিছু বাঁশ বিক্রির মাধ্যমে মস্‌জিদের ব্যয় নির্বাহ হয়। বর্তমান ইমাম জাহাঙ্গির পুরকাইত।

পদ্মপুকুর কাজি পাড়া মস্‌জিদ

পদ্মপুকুর কাজিপাড়া মস্‌জিদটি বারুইপুর আমতলা রোডের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রায় ৩০ বছর আগে প্রয়াত আব্দুল ছোবহান মিস্ত্রীর উদ্যোগে তৈরী হয়। মস্‌জিদের দ্বিতল নির্মাণ

চলছে। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জমির উপর মস্‌জিদটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা গেল। স্থানীয় দান ও চাঁদার উপর মস্‌জিদটি চলে। ইমাম নুর মহম্মদ গাজি।

মাদ্রাসা বাহারুল উলুম

মাদ্রাসা বাহারুল কাজিপাড়ায় বারুইপুর আমতলা রোডের পাশে অবস্থিত। ১৯৮০ সালে আব্দুল ছোব্‌হান মিস্ত্রি ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মাদ্রাসা তৈরী হয়। পঞ্চান্ন জন ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনা করে। এর মধ্যে অবৈতনিক আবাসিক ছাত্র আছে দশ জন। মুসলিম জনসাধারণের সাহায্যে মাদ্রাসা চলে। মাদ্রাসার অবস্থান এমন যে হাইমাদ্রাসা হওয়ার (সরকার অনুমোদিত) একেবারে উপযুক্ত। এখানে দুজন মাওলানা আছেন – ইছা মজাহারী ও কোব্বাত আলি সাহেব।

বেনিয়াডাঙ্গা জুমা মস্‌জিদ

১৯৭৮ সালে বেনিয়াডাঙ্গা গ্রামে পত্তন হয় বেনিয়াডাঙ্গা জুমা মস্‌জিদ। পোঃ মল্লিকপুর। মস্‌জিদের নামে ৫ কাঠা জমি রয়েছে। মস্‌জিদের আয় বলতে গ্রামবাসীর দান ও মস্‌জিদের ডেকরেটিং থেকে আসা সামান্য অর্থ। মস্‌জিদে একজন বেতনভোগী ইমাম আছেন। জনাব আমির আলি ঘরামী বর্তমান মাতওয়াল্লী।

বেনিয়াডাঙ্গা বড়পীর জুমা মস্‌জিদ

বেনিয়াডাঙ্গা বড়পীর জুমা ম্সজিদ স্থাপতি হয় ১৯৮৫ সাল নাগাদ। মস্‌জিদের নামে আছে ৪ কাঠা জমি। চাঁদা ও মুষ্টির চালে মস্‌জিদের ইমামের বেতন ও অন্যান্য খরচ চলে। মাতওয়াল্লীর নাম জনাব আমজেদ মণ্ডল।

বেনিয়াডাঙ্গা খাঁ পাড়া মস্‌জিদ

বছর চারেক আগে তৈরী হয় বেনিয়াডাঙ্গা খাঁ পাড়া মস্‌জিদ। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মস্‌জিদ তৈরী হয়। মস্‌জিদ পরিচালনা করেন একটি কমিটি। স্থায়ী ইমাম আছেন।

মদারাট গ্রামপঞ্চায়েত

মদারাট জামে মস্‌জিদ

মাদারাট মস্‌জিদ পাড়ার সুদৃশ্য এই মস্‌জিদটি খুবই পুরাতন। মস্‌জিদ কমিটির সম্পাদক ইউসুফ আলি সরদার জানালেন, ১৩৩৫ সালে এই মস্‌জিদটি ওয়াকাফ বোর্ডের অধীনে আসে। মস্‌জিদের বয়স একশত বছরের বেশী। আগে ছিল মাটির মস্‌জিদ। মস্‌জিদের জন্য জমি দান করেছিলেন বছরদ্দিন সরদার।

১৯৯৫ -৯৬ সালে মস্‌জিদ গৃহের নব রূপায়ন হয়। এলাকার লোকের দানে মসজিদ গৃহের সংস্কার হয়। এই মসজিদটি মোটামুটি স্বয়ংম্ভর। মস্‌জিদের অন্যান্য ব্যয় নিজস্ব আয় থেকে সমাধা হয়। মস্‌জিদের নামে ৮/১০ বিঘে জমি, বাগান ও পুকুর আছে। বর্তমানে পালান

মোল্লা মাতোয়াল্লীর দায়িত্বে আছেন। মস্‌জিদের প্রবীণ ইমাম কারী নূর মহম্মদ সাহেব।

মাদারাট বটতলা মস্‌জিদ

মাদারাট প্রাইমারী স্কুলের পরে মাদারাট বটতলা। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দের সাথে পাশাপাশি বাস করে। এখান থেকে মাদারাট জামে মস্‌জিদটি অনেকটা দূরে। কয়েকজন স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে গত ২ বছর আগে এখানকার মস্‌জিদটি তৈরী হয়। এ বছর ঢালাই হয়েছে।

বলবন জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর পুরাতন বাজার বিশালাক্ষীতলা পিছনে ফেলে ৫ মিনিট এর হাঁটা পথে গাছ-গাছালিতে ঘেরা শান্ত পরিবেশে অবস্থিত বলবন জামে মস্‌জিদ। কারা কোন সময় মস্‌জিদটি তৈরী করেছেন সঠিকভাবে বলা কঠিন। বয়স্কদের অনুমান ইং ১৮৮২ সাল নাগাদ মস্‌জিদটি তৈরী হয়েছে। বয়স্ক হাজি বেলাত আলি শেখের কাছে শোনা খোদার বাজার নিবাসী হবি ও সফি এখানে মস্‌জিদ তৈরী করে হজে চলে যান। তারপর তারা আর ফেরেন নি।

এখানে প্রায় ১০০ শত ঘর মানুষের বাস। পালপাড়া, পিয়ালী টাউন থেকে এখানে নামাজ পড়তে আসেন। মস্‌জিদের সম্পত্তি বলতে সামান্য কিছু বাগান ও ধানজমি। এই সামান্য আয়ে মসজিদ চলে না। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা নিতে হয়। শুক্রবার লোক জমে বেশী। মাতোয়াল্লী হাজি এনায়েত আলি শেখ বলেন, 'ছুটির সময় শিশুদের আরবি পড়ানো হয়। ইমাম আছেন, নাম আবুল কাশেম।

পিয়াদাপাড়া জামে মস্‌জিদ

মাদারাট পোস্ট অফিসের অধীন পিয়াদা পাড়া মস্‌জিদটি স্থাপিত হয় ১৯৯২ সালে। মস্‌জিদ ঘরের জন্য ৯ শতক জমি দান করেছিলেন কাশেম আলি সরদার। মস্‌জিদ ঘরটি ছাদ দেওয়া। গ্রামবাসীদের মাসিক চাঁদায় মস্‌জিদ চলে। মস্‌জিদে ইমাম আছেন।

মাঝের হাট জামে মস্‌জিদ

ছোট একটি গ্রাম মাঝের হাট। পোঃ মাদারাট। কমবেশী ১৩৫ ঘর লোকের বাস। বেশির ভাগ গরীব, দীন মজুর, ভ্যান চালক ১৯৭৩ সালে তালপাতার ছাউনি মাটির মস্‌জিদটি স্থাপিত হয়। মস্‌জিদের জন্য ৩ শতক এবং এছাড়া ডোবা ও ধানজমি মোট ৮ শতক জমি। ৭/৮বছর আগে মস্‌জিদের ছাদ আটা ঘর তৈরী হয়েছে। মস্‌জিদের মাতয়াল্লী সোলেমান লস্কর এবং বর্তমান ইমাম হলেন সামসুল সরদার।

পাইকপাড়া জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর পৌর এলাকা সংলগ্ন মাদারাট অঞ্চলের পাইকপাড়া মস্‌জিদটি তৈরী হয় ১৯৮৫ সাল নাগাদ। মাত্র ৫০০ শত লোক এখানে বাস করে। বেশীরভাগ গরীব। ১৯৯০ সাল নাগাদ

পাকা হয়। চাঁদার মাধ্যমে মস্‌জিদের খরচ চলে। মস্‌জিদের মাতোয়াল্লী জুব্বার শেখ। মস্‌জিদে ইমামতি করেন আশরাফ আলি শেখ।

কোপিন্দরপুর জামে মস্‌জিদ

কোপিন্দপুর গ্রামে প্রায় ৯০ বছর আগে একটি মাটির তৈরী মস্‌জিদ ছিল। সম্প্রতি বছর আষ্টেক আগে সেখানে ছাদ আঁটা একতলা মস্‌জিদ তৈরী হয়েছে। মস্‌জিদের জন্য ৩ শতক জমি দান করেছিলেন ইয়ার আলি কাজি । পাকা মস্‌জিদ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মাতয়াল্লী জামাত আলি লস্কর। লতিফ লস্কর মস্‌জিদের বর্তমান ইমাম।

কাঁটা পুকুর জামে মস্‌জিদ

কাঁটাপুকুর গ্রামের মস্‌জিদটি তৈরী হয় প্রায় ২৫ বছর আগে। মস্‌জিদের জন্য মোমিন সরদার ১ কাঠা জমি দেন আর সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ১ কাঠা জমি, মোট ২ কাঠা জমির উপর মস্‌জিদ। মস্‌জিদের মাতয়াল্লী হলেন আবু বক্কার সরদার। এখানে স্থায়ী ইমাম আছেন।

বারুইপুর পৌরসভা

বারুইপুর কাছারী বাজার জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর স্টেশন ও কোর্ট সংলগ্ন সুদৃশ্য ত্রিতল মস্‌জিদটি কাছারী বাজার জামে মস্‌জিদ। জয়নগর থানার হরিনারায়ন পুরের (বর্তমান ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের কাছে)বাসিন্দা তছরদ্দিন মোল্লা ও আছরদ্দিন মোল্লা। এই দুই ভাই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বারুইপুর মুনসেফ কোর্টে মামলা করতে আসতেন। তাদের নামাজ পড়তে হতো কোর্টের বারান্দায়। তারা ১৯২৩ সালে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করে চাঁদা পয়সা তুলে মসজিদ পত্তন করেন। তখন জমির দাগ খতিয়ান সৃষ্টি হয়নি। কেবল জমির চৌহদ্দির বর্ণনা আছে দলিলে। তারা এই জমি ওয়াকাফ করেদেন এবং মস্‌জিদ দেখাশুনার জন্য মাতোয়ালির দায়িত্ব দেন পোয়ালেডাঙ্গা নিবাসী নিরমনি মিস্ত্রী ও খিজির মিস্ত্রীকে। পরবর্তীকালে জমির দাগ নং হয়েছে ৫৭ মৌজা বারুইপুর, পরিমান ১০ শতক। মসজিদের কোন স্থায়ী আয় নেই। সম্পূর্ণ দানের উপর নির্ভর।

মস্‌জিদ কমিটির বর্তমান সম্পাদক জানান- মস্‌জিদের আগে কোন কমিটি ছিল না। এক গণদরখাস্তের ভিত্তিতে তৎকালীন ওয়াকাফ কমিশনার আলাউদ্দিন সাহেব মিস কেস ৩৭/৭০ নামে একটি ফাইল তৈরী করে সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন মাতয়ালি মোনাজাত মিস্ত্রী ও স্থানীয় লোকজনকে ডেকে পাঠান। তারা হলেন এম. আবদুল্লাহ, শেখ আজিজার রহমান, সামির আলি মিস্ত্রী, জয়নাল আবেদীন ও গোলাপ রহমান সরদার প্রমুখ। কমিশনার সবার বক্তব্য শুনে ১৯৭০ সালে এম. আবদুল্লাকে সভাপতি করে ১১ জনের একটি কমিটি করে দেন। কমিটির বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কাজ করে মস্‌জিদের আয়তন আগের থেকে প্রায় ৪ গুন বাড়িয়ে ফেলেন।

শাহ্‌জাহান রোড্ জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা পোয়ালেডাঙ্গা। বর্তমানে শাহজাহান রোড। মস্‌জিদটির পিছনে ছোট ইতিহাস আছে। এখানে ছিল বিবি মাতা ও গাজিবাবার মাজার। মাজারের জমি [illegible]ছিলেন বারুইপুরের চৌধুরী বাবুরা। প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ এখানে মেলা বসত। লোকসমাগম হতো। মাজারের সেবায়েত বা দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন কিনু সিপাই। মস্‌জিদটি আগে ছিল উক্তিয়া নামাজ ঘর। ছিল মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল। প্রখ্যাত ধর্মীয় বক্তা জনাব আবু তালেব চৌধুরী সাহেবের উদ্যোগে ৬৯-৭০ সাল নাগাদ নামাজ ঘরের সংস্কার করা হয় । তখনও মস্‌জিদের মধ্যে মাজারের নিদর্শন ছিল। আবু তালেব চৌধুরী সাহেব মুর্শিদাবাদ থেকে এম.পি. হয়েছিলেন। আনুমানিক ৬/৭ বছর আগে এটি জামে মস্‌জিদে পরিণত হয়। তব্‌লিগ জামাতের প্রভাবে গ্রামবাসীরা মস্‌জিদের ভিতর থেকে মাজারের চিহ্নটি তুলে দেন।

মস্‌জিদ সংলগ্ন প্রায় ৫/৬ বিঘা গোরস্থান আছে । এই গোরস্থানটি খুবই প্রাচীন। ১২০/১২৫ বছরের বেশী। গোরস্তানে প্রচুর বাঁশ আছে। বাঁশ বিক্রির অর্থে গোরস্থান সংস্কার করা হয়। পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। 'তৎকালীন সীতাকুণ্ডুর মেনাজ সরদার এক হাজার ইট দান করেছিলেন। সাংসদ কোটার টাকায় গোরস্থান রক্ষণা বেক্ষণ গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০ টাকা ব্যয়ে।

বারুইপুর নলগড়া জামে মস্‌জিদ

বারুইপুর পৌর এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডে নলগড়া গ্রামের মস্‌জিদ খুবই পুরাতন। বাংলা ১২৭০ সাল নাগাদ মস্‌জিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মাত্র ৯০ ঘর মুসলিমের বাস। ৪ শতক খাস জমির উপর মস্‌জিদে গড়ে উঠেছে। পরে আকবর আলি শেখ কিছু পরিমান জমি কিনে দেন।

বারুইপুর কাছারী (সখের) বাজার মস্‌জিদ

প্রকৃতপক্ষে এটি উক্তিয়া নামাজ ঘর। বাজারের সূচনা থেকে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চলার ফাঁকে এখানে ওখানে জামাত করে নামাজ পড়ে নিতেন। কাছারী বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ১৩৩৫ সালের ৩রা আষাঢ়। বর্তমান মস্‌জিদটি যেখানে আছে তার কাছাকাছি ছাদের উপর প্রায় ৩০ বছর ধরে নামাজ পড়া হতো। ১৯৯৮ সাল নাগাদ কাছারী বাজারের ব্যবসায়ী, চাষী ও জনসাধারণের উদ্যোগে কল্যানপুর রোডের পাশে ছাদের উপর মস্‌জিদটি (নামাজঘর) তৈরী হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন, নাম মাওলানা আব্দুল লতিফ লস্কর। ব্যবসায়ীদের দানের উপর মস্‌জিদ চলে।

বারুইপুরে গাজীবাবার মাজার

মাজার-কে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘকাল থেকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন সেতু গড়ে উঠেছে। মানুষের অন্তরে বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে ছুটে যান মাজারে মাজারে—কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের যুগেও এই বিশ্বাস ও ভক্তি মানুষের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। কোন কোন মাজার রয়েছে জাগ্রত, কোনটি বা কোনক্রমে অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি নিয়ে টিকে রয়েছে। বারুইপুর এলাকার কিছু মাজারের কথা এখানে উল্লেখ করব, যেখানে আজও নির্দিষ্ট দিনে গাজীবাবার নাম কীর্তন হয়।

কিংবদন্তী আছে—বারুইপুরের জমিদার চৌধুরীপরিবার নবারের ঋণের দায়ে জমিদারী হারাতে বসেন কিন্তু মোবারক গাজীর অনুকম্পায় তারা রক্ষা পান। এরপর থেকে তাদের স্টেটের ওপর মাজার স্থাপন করা হয়।

বারুইপুর কোর্টের সন্নিকটে খগেন্দ্র স্টেটে প্রতি কছর ১৬ই শ্রাবণ বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের দিন গাজীবাবার নাম কীর্তন হয় ও গরীবদের মধ্যে 'তাবারক' (খিচুড়ী ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়। বর্তমান সেবায়েত বা দেখা শুনার দায়িত্বে থাকা সালাউদ্দিন মন্ডল জানান স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের দানের উপর এই অনুষ্ঠান চলে। বংশানুক্রমিক তিনি এই মাজারের দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন প্রায় ১৮০০ সাল নাগাদ বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার দ্বারা এই মোবারক গাজির মাজার বা স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খাসমল্লিক (ডিপ্‌জিপে হাট) গাজীবাবার মাজার। স্থানীয় দাস পাড়ার লোকেরা মাজার দেখাশুনা করে।

বারুইপুর সুবুদ্ধিপুর দাসপাড়া গাজি বাবার মাজার। দাস পাড়ার লোকেরা মাজার দেখাশুনা করে।

বারুইপুর শাসন রোডে গাজীবাবার মাজার রয়েছে। এই মাজার কে দেখাশুনা করে সঠিকভাবে জানা গেলনা।

সূর্যপুরহাট গাজীবাবার মাজার। হাটের মালিক বারুইপুর রায়চৌধুরীরা এই মাজার দেখাশুনা করেন।

দঃ কল্যানপুর নাথ পাড়ায় গাজীবাবার মাজার। নাথেরা এই মাজার দেখাশুনা করেন।

রামনগর স্কুল মোড়ে গাজীবাবার মাজার। এটি বহু পুরাতন। কতদিনের কেহ সঠিক বলতে পারেন না। স্থানীরা নিভারাণী বসু মাজারের জন্য জমি দান করেছিলেন। স্থানীয় বিপীন বিহারীদেব থানের ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন।

মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েত

পেটুয়া জামে মস্‌জিদ

গ্রাম পেটুয়া, পোঃ সুভাষ গ্রাম। পেটুয়া মসজিদ্‌টি ভাঙাচোরা অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে

ছিল। মসজিদ ঢেকে ফেলেছিল দেওয়ালে গজিয়ে ওঠা অশত্থ গাছে। বহু পুরাতন, বরফির ধাঁচে পাতলা পাতলা ইট এর গাঁথুনিতে। দেওয়াল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরী করতে হয়। মাতয়ালী ও মসজিদ কমিটির সম্পাদক মহঃ আব্দুল রহিম মোল্লা বলেন, তাঁরই পূর্বপুরুষ মোল্লা পরিবার এই মসজিদটি নির্মান করে দিলেন প্রায় ৫০০ শত বছর আগে। বর্তমান ইমাম মাওলানা আব্দুর রশীদ সাহেব। মাসিক চাঁদার উপর মসজিদ নির্ভরশীল।

পাঁচঘরা বায়তুল মাহমুদ জামে মসজিদ

মল্লিকপুরের পাঁচঘরার এই মসজিদটি আদি মসজিদ। স্থাপিত হয়েছিল বাংলা ১৩১০ সালে। আগে ছিল মাটির মসজিদ। মোড়ল পরিবারের খতিয়ান ভুক্ত ১১ শতক জমি মসজিদের জন্য দান করা হয়। মসজিদ গৃহ দ্বিতীয়বার সংস্কার করে তৈরী হয় কাঠে পোড়ানো ইটে টালির শেডের ঘর। ৫/৬ বছর আগে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ছাদ আটা পাকা মসজিদ তৈরী হয়। একটি পুকুর ও ১০ কাঠা জমি ছাড়া মসজিদের আর কোন স্থায়ী সম্পদ নেই। স্থানীয় দান ও মাসিক চাঁদায় সবকিছু করতে হয়। মসজিদ কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

বড় মসজিদ পাঁচঘরা লস্করপুর

পাঁচঘরা মস্‌জিদ স্থাপিত হয় বাংলা ১৩৯১ সালে। গ্রামের প্রবীণ ও ধার্মিক ব্যক্তি মহঃ আব্দুল ছাত্তার মণ্ডল বলেন, এই মস্‌জিদ নির্মানের জন্য জমি দান করেছিলেন মহঃ সালামত মণ্ডল। এনসান মণ্ডল, আঃ গফ্ফার মণ্ডল ও আঃ ছাত্তার মণ্ডল নিজে। আজ পর্যন্ত মসজিদের জমি বেড়ে হয়েছে ৯ কাঠা। গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে ছাদ আটা পাকা মসজিদ তৈরী হয়েছে। বর্তমানে মস্‌জিদের ইমাম মহঃ ফয়জদ্দিন লস্কর। দোকান ঘরের সামান্য ভাড়া ও স্থানীয় চাঁদার উপর মস্‌জিদ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

পাঁচঘরা লস্করপুর পুরাতন জামে মসজিদ

১৯৬০ সাল নাগাদ পাঁচঘরা ঘরামী পাড়ার এই মসজিদটি নির্মিত হয়। সাত শতক জমি দান করেছিলেন আলি আজগার ঘরামী। মস্‌জিদ নির্মানে উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন লতিফ ঘরামী, ইয়ারালী ঘরামী, হাজি আনোয়ার ঘরামী, ইউনুস ওস্তাগর ও আরও অনেকে। মস্‌জিদ গৃহটি পাকা ছাদ আঁটা। এই মস্‌জিদের প্রধান আয় হল মাসিক চাঁদা।

ফরিদপুর জামে মস্‌জিদ

মল্লিকপুরের ফরিদপুর জামে মস্‌জিদ সাহেব জান মোল্লা ও তৎকালীন গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রায় ১০০ শত বছর আগে স্থাপিত হয়। জমিদাতা সাহেবজান মোল্লা। খুব গরীব এলাকা। স্থানীয় চাঁদার উপর মসজিদের আয় নির্ভর। মসজিদ পরিচালনা করেন জুলফিকর মোল্লা, আকবর আলি মোল্লা, বাবিউল দপ্তরী প্রমুখ।

আখ্‌না গাজিপাড়া মস্‌জিদ

আখনার গাজি পরিবারের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে মসজিদ্‌টি তৈরী হয়। মসজিদের দেওয়াল ইটের ও টালির ছাউনী। এখানে কোন স্থানীয় ইমাম নেই। গাজি পরিবার মসজিদ দেখাশুনা করেন।

ফরিদপুর মোল্লা পাড়া জামে মসজিদ

মল্লিকপুর গনিমার কাছে রোডের পাশে বহু প্রাচীন মসজিদ এটি। মসজিদটি নির্মিত হয় প্রায় ১২০ বছর আগে। গনিমার পীর সাহেব এই মসজিদে নামাজ পড়তেন। মসজিদের সামনে থাকা একটি তালগাছ বিখ্যাত। এই তালগাছের নতুন নতুন মাথা গজায়। বর্তমানে এর মাথার সংখ্যা ৩২ টি। ফরিদপুর মোল্লা পরিবারের উদ্যোগে মসজিদ তৈরি হয়েছিল। মসজিদ কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান মোল্লা। মসজিদের ইমাম হাফেজ আব্দুল কালাম।

জান মসজিদ

মল্লিকপুর জান মসজিদ ১৯৯২-৯৩ সাল নাগাদ তৈরী হয়। বর্তমান মাতয়ালী হাজি মহম্মদ আলি ৫ কাঠা জমি দান করে তাঁর পিতা হাফিজ জান আলির নামে এই জান মসজিদটি নির্মানের উদ্যোগ নেন। গ্রামবাসীরা বলেন কলকাতার কোন এক হাজি সাহেব মসজিদ গৃহনির্মানে এগিয়ে আসেন। মাসিক চাঁদা ও মসজিদের দোকান ঘরের ভাড়া থেকে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ হয়।

মল্লিকপুর কাজিপাড়া জুম্মা মসজিদ

মল্লিকপুরের কাজিপাড়া মসজিদটি স্বাধীনতার আগে স্থাপিত হয়। সে সময় মসজিদ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডাঃ মুন্সী রওসন আলি, আজাদ বক্‌স ও কাজি আবদুর বারি। মুসলিম সর্বসাধারনের ব্যবহার্য ১৫ কাঠা জমির উপর মসজিদ অবস্থিত। মাসিক চাঁদা ও দানের উপর মসজিদ চলে।

সালেহ্ মস্‌জিদ

হাবিব চক, মল্লিকপুর। ১৯৯২-৯৩ সাল নাগাদ মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জমি দান করেন এক বিধবা ভদ্রমহিলা। কোলকাতার এক হাজিসাহেব মসজিদের ঘরটি তৈরী করে দেন। তার নামেই মসজিদের নামকরণ করা হয়। এখানে স্থায়ী ইমাম আছেন। মসজিদটি কমিটি পরিচালিত। মসজিদ চলে স্থানীয় দানে।

পীরতলা মসজিদ

পীরতলা, মল্লিকপুর। স্থানীয় ও কলকাতার লোকের উদ্যোগে মসজিদটি তৈরী হয় ১০/১২ বছর আগে। 'গনিমাতুল খায়ের' (গনিমার) পীর সাহেব এখানে আসতেন, সেজন্য এটি পীরতলা নামে বিখ্যাত। এখানে তিনি গনিমার মস্‌জিদটি করতে চেয়েছিলেন। শোনা যায়, পরে স্বপ্ন দেখে তিনি স্থান পরিবর্তন করেন। গনিমার পীর সাহেবের নাম হাজি হাবিব আবদুল্লাহ্ আল্‌ আত্তাস।

লতিফুন্নেসা জামে মসজিদ

মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন সুদৃশ্য লতিফুন্নেসা জামে মসজিদটি তৈরী হয় ১৯৮৫ সালে। লতিফুন্নেসা জমি দান করেন। হাজি মহম্মদ আলিও কিছুটা জমি কিনে দেন। মসজিদটি নির্মিত হয় হাজি নাদের হোসেনের উদ্যোগে। মসজিদের যাবতীয় ব্যয় চাঁদার ওপর নির্ভর। বর্তমান মাতয়ালী আব্দুল মজিদ সাহেব। মসজিদের ইমাম হলেন হাসেম মণ্ডল।

মিরজাপুর সাদির মসজিদ

আখনা মিরজাপুর সাদির মসজিদটি নির্মিত হয় প্রায় ১০৩ শত বছর আগে। মসজিদটি পাকা একতলা। সাদির আলি গাজি মসজিদের জন্য জমি দান করেছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে এই মসজিদ তৈরী হয়। মসজিদের নামে ওয়াকফ করা অনেক জমি আছে। কিন্তু সব জমি দখল নেই।

লক্ষ্মীনাথপুর মিলন মসজিদ

লক্ষ্মীনাথপুর মিলন মসজিদ প্রায় ২৫ বছর আগে গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে তৈরী হয়। মসজিদের ঘর পাকা, টিনের চাল। ভোলা কাজি হলেন মসজিদের মাতয়ালী ও কমিটির সম্পাদক মহঃ মফিজ সরদার। মসজিদের ইমাম আছেন। কোন স্থায়ী আয় নেই মসজিদের। চাঁদার ওপর সব কিছু নির্ভর।

গনেশপুর জামে মসজিদ

গনেশপুর মসজিদটি প্রায় ১০০ এক শত বছর আগে তৈরী হয়। প্রথমে ছিল তালপাতার ছাউনি ঘর, পরে টালি এবং পরে পাকা হয়। প্রায় ২০ কাঠা মুসলিম সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জমিতে মসজিদের অবস্থান। নিকটে আছে ১০/১২ বিঘে বিশাল গোরস্থান।

মাদ্রাসা রহমানিয়া দারুল উলুম

পেটুয়া গ্রামের এই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৭৭ সালে। ১০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এর মধ্যে আবাসিক ছাত্র ৪০ জন। এরা খুবই গরীব। এদের কোন খরচ দিতে হয় না। শিক্ষক ৭ জন। সাধারণ মানুষের দানে ও চাঁদায় মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ হয়। এখানে পড়ার বিষয় আরাবি, উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজী প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা হয়।

এখানে আর একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে নাম ANGLO ARABIC ISLAMIC INSTITUTE। ২০০২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এ্যাডভোকেট ইদ্রিশ আলি, চেয়ারম্যান, সারা ভারত মাইনরিটি ফোরাম, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

গনেশপুর মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম

গনেশপুর মাদ্রাসাটি প্রায় ১৩০ বছর আগে তৈরী হয়। ২৫০ জন এখানে পড়াশুনা করে। এর মধ্যে ৩০ জন ছাত্র আবাসিক। ৫ টাকা ভর্তি ফি। পারক ছাত্রের কাছ থেকে ৫০/১০০ টাকা নেওয়া হয়। শিক্ষক ৪ (চার) জন। সহৃদয় লোকের অর্থসাহায্যে মাদ্রাসা চলে। চতুর্থমান পর্যন্ত পড়াশুনা হয়। মাদ্রাসাটি দোতালা। সামনে ১ বিঘে মাঠ আছে।

মল্লিকপুরের গণিমা (গনিমাতুল খায়ের)

বারুইপুর থেকে শিয়ালদহ যাওয়ার পরের স্টেশন মল্লিকপুর। সেখানে রেলের স্থায়ী সাইন বোর্ড "ফতেহা দোয়াজ দা হাম্" উপলক্ষে যাত্রীদের নামার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবছর ১২ই রবিউল আউলের দিনটি গনিমাতে পালন করা হয়। প্রতি বছর ঐ তারিখে

খুব ভিড় হয় । আগে রাতের বেলায় আতস বাজি পোড়ানো হত। ১৫/২০ বছর আগে মেলায় তেমন ভিড় হতো না। আবার পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এই এলাকায় পাক সার্কাসের মতো ঘন বসতি গড়ে উঠেছে । অবাঙালী মুসলিম বস্‌তিতে সারা এলাকা ভরে গেছে । মাঠের মাঝে ফাঁকা পড়ে থাকা মল্লিকপুর আর নেই। মল্লিকপুর স্টেশনের ভির বারুইপুরকে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে । নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা মল্লিকপুর স্টেশন এখন ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে গম্‌গম্‌ করছে।

প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবার বা রবিবার প্রচুর মানুষ নানা মনস্কামনা নিয়ে ওখানে যান। ইবাদৎ খানায় গিয়ে ইবাদৎ বা উপাসনা করেন। গনিমাতে একটি কূয়া আছে। ঐতিহাসিক এই কূয়াটির পবিত্র পানির মহিমা শোনা যায়। পেটের জটিল রোগ নিরাময়ের জন্য কূয়ার পানিতে স্নান করে ঐ কুয়োর পানি পান করে ও নিয়ে যায় দলে দলে লোক। গনিবার বর্তমান খলিফা জনাব । আহমাদ্‌ আলি সাহেব জানালেন কূপটির নাম, জমজমা কা বেটি 'নাইমা'। অর্থাৎ মক্কার জমজমার পবিত্র পানির মত এই পানির মহিমা আছে।

গনিমার প্রতিষ্ঠাতা সাধক হাজি হাবিব আবদুল্লাআল আত্তাস এসেছিলেন ১৮৮৫ সালে। ইমাম আল আত্তাস জন্মগ্রহণ করেন ১২৭৭ হিজরী মহরম মাসে ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভার সারবুনে। নিজস্ব বাড়ী ইয়েমেন এর হায়দারামাউথ এ। তাঁর পিতা ১২৭৩ হিজরীতে কোরান প্রচারের জন্য জাভায় এসেছিলেন। পুত্রের যখন ৬ বছর বয়স সে সময় তিনি আবার দেশে ফিরে যান ।

ইমাম আল আত্তাসের প্রথম 'জাবিয়া' বা খনকা শরীফ বা মারকাস কেন্দ্র বর্মার রেঙ্গুন শহরে। সেটির নাম বশীরুল খায়ের। করাচি, মায়ানমার, প্রভৃতি স্থানে ইমাম আত্তাসের আরও কেন্দ্র রয়েছে।

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তুমি ইন্ডিয়া যাও''। সেই সময় হাজি সেলিম কুঞ্জিও মাহ্‌মুদ কুঞ্জিদের বর্মাতে চালের ব্যবসা ছিল। তাদের জাহাজও ছিল। তারা রেঙ্গুনে শুনলেন, এক সাধক ভারতে আসতে চান। তারা খোঁজ খবর করে ইমাম আত্তাসকে কলকাতায় আনলেন। সে সময় রাজপুরের জমিদার আশুতোষ চক্রবর্তীর সাথে কুঞ্জিদের পরিচয় ছিল। তখন এই সব এলাকা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই স্থান দেখানো হয়। ইমামের জায়গা পছন্দ হয়। কুঞ্জীরা তাঁর কাছে "মুরিদ" (শিষ্যত্ব গ্রহণ) হন। তারা জায়গা কিনে জারিয়া/মারকাস তৈরী করে দেন। অন্য মুরিদানরাও সাহায্য করেন। তখন জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০/২৫০ বিঘে । মারকাসের গেট থেকে গেট ঝিল কেটে ও তার বাইরে প্রাচীর দেওয়া হয়। মারকাসের নামকরণ করা হয় গণিমাতুল খায়ের''। প্রায় ৫০ বিঘে (জমির উপর এই মাকায়াজাবিয়া) এটি পঃ বঙ্গের ওয়াকাফ বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত।

মস্‌জিদের মত স্থানটি 'ইবাদত্‌ খানা' (সাধনা ঘর)। এখানে ধমচর্চা ও আল্লাহের সাধনা করা হয়। কুয়োটি তৈরী হয় ১৩২৬ হিজরীতে সকল ধমের মানুষ এখানে আসেন ইবাদত খানায়। ফল লাভের জন্য নানা মানুষ নানা উদ্দেশ্যে ইবাদত খানায় প্রার্থনা করেন। দো-তালার ঘরে হাবিব থাকতেন। তাঁর ব্যবহারের খাটটি আজও রয়েছে । প্রতিবছর 'ফতেহা-

দোয়াজ- দাহাম' ও ফতেয়া- ইয়াজ - দাহাম উপলক্ষে মেলা বসে, মিলাদ বা ধর্ম আলোচনা হয় তাবারক (খিচুড়ী) বন্টন করা হয়, আতস্ বাজি পোড়ানো হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার করে মিলাদ হয় ।

ইমাম আল্ - আত্তাস এন্তেকাল (পরলোক গমন) করার আগে তাঁর হাতে গড়া প্রিয় ছাত্র শায়েখ ছালেহ আবেদ মোহাম্মদ ইবনে সালেহ জওহরকে নিজের স্থলাভিসিক্ত করে যান। তিনি ছিলেন হেজাজের অধিবাসী । বর্তমানে সু প্রীম খলিফা হচ্ছেন মস্তোফা - বিন আবদুর রহমান। তিনি দুবাইতে থাকেন, কখনও থাকেন আবুধাবিতে। তিনি ইমাম াল্ আত্তাসের পাত্র । গনিমার দায়িত্ব প্রাপ্ত খলিফা সুপ্রীম খলিফা দ্বারা অনুমোদিত । গনিমার খরিদারা (শিষ্যদের) একটি কমিটি খলিফা নিযুক্ত করে সুপ্রীম খলিফার দ্বারা অনুমোদন করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া দায়িত্বে আছেন ২ জন সহকারী খলিফা ও একজন ম্যানেজার ।

গনিমার আয় বলতে গাছের ফল বিক্রি, জমির ধান, ঘর ভাড়া ও স্বেচ্ছাদান। এখানে ইমাম আল আত্তাসের মানুষদের সেবা করে চলেছেন। গনিমার পূর্ব গরিমা এখন ম্লান। অনেক জমি বে-দখল হয়ে গেছে । এক-দেড়শ বিঘে ধান জমি বর্তমান রয়েছে। স্থানীয় সমাজ সেবী কিছু মানুষ প্রতিষ্ঠানের মহিমা বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ।

সীতাকুন্ডু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামান্য আগে পাকা রাস্তার গায়ে একটি পুকুর — পুকুরটির নাম "নিরামিষ পুকুর"। পুকুরের দক্ষিণে রাস্তার পাশে বেশ কিছু উঁচু জমি দেখা যায় । ঐ উঁচু জমিতে রয়েছে দেওয়ান গাজী সাহেবের মাজার। বর্তমানে মাজারের জমির পরিমাণ ১০/১১ বিঘে হবে । নিরামিষ পুকুরটিও মাজারের সম্পত্তি। আগে মাজারের

সাউথগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত

খাড়ুপাতালিয়া গাজিপাড়া মস্জিদ -

সাউথ গড়িয়া বর্ধিষ্ণু এলাকা। আর এর মধ্যে খাড়ুপাতালিয়াতে মুষ্টিমেয় গরীব গাজি পারিবারের বাস। এখানকার গাজি পরিবার বলতে একজনই ছিলেন। নতুই গাজি, ফতুই গাজি তাদের বংশধর। প্রায় ১৪/১৫ বছর আগে কাদা দিয়ে গাঁথা ইটের দেওয়ালের একটি ছোট মস্জিদ ছিল। বর্তমানে পাড়ার লোকেদের এবং বাইরের দু একজন লোকের সাহায্য নতুন করে কিছুটা নির্মাণ কাজ হয়েছে। মস্জিদের নামে জায়গা আছে প্রায় ৮ শতক। মস্জিদের সন্নিকটে প্রায় ২ বিঘে গোরস্থান রয়েছে। গোরস্থানটি প্রাচীর দেওয়া খুবই দরকার। উন্মুক্ত থাকার জন্য নোংরা করা হয়।

মসজিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী আশ্রাফ আলি গাজি। আগে দেখাশুনা করতেন আমির হোসেন। মস্জিদের ইমামের দায়িত্বে আছেন জালালউদ্দিন মণ্ডল।

চম্পাহাটি গ্রামপঞ্চায়েত

শোলগোয়ালিয়া জামে মসজিদ গ্রাম শোলগোয়ালিয়া, পোঃ চাম্পাহাটি। ওয়াকাফ বোর্ডের তালিকাভুক্ত এই মস্জিদটি প্রায় ১০০ শত বছরের বেশী সময়ের। প্রায় ৮০ বছর

আগে একতালা মসজিদ নির্মান হয়েছিল। বছর তিনেক আগে দোতালা হয়েছে। মসজিদের বিঘে দুই ধান জমি আছে। সামান্য আয় হয়। প্রায় সব কিছু মাসিক চাঁদা নির্ভর। মসজিদের মাতয়ালী আছেন জিয়া সরদার। মসজিদের ইমাম হলেন মুফতি আলাউদ্দিন সাহেব।

কমলপুর জামে মসজিদ ঃ

গ্রাম কমলপুর, পোঃ চাম্পাহাটি, ওয়াকফ বোর্ডের তালিকাভুক্ত প্রায় ১২০ বছর আগে মসজিদটি তৈরী হয়। মসজিদ তৈরী হয় মোল্লা পরিবারের জমিতে। আগে মাটির মসজিদ ছিল। বছর কুড়ি আগে ছিল একতালা। আর বছর তিনেক আগে দোতালা ঘর হয়। মসজিদের মাতয়ালী জলিল গাজি। মসজিদের একটি কমিটি আছে। এখানে স্থায়ী ইমামও আছেন।

বেগমপুর গ্রামপঞ্চায়েত

পুঁড়ি জামে মস্‌জিদ ঃ

পুঁড়ি জামে মস্‌জিদের মাতোয়াল্লী মহঃ সালাউদ্দিন লস্কর জানান ১৯৭৩ সালে এই মস্‌জিদ স্থাপিত হয় । তাঁর পিতা দাউদ আলি লস্কর মস্‌জিদের জন্য জমি দান করেন ১০ কাঠা। মস্‌জিদের নামে বিঘে চারেক ধান জমি ও আছে – এই জমি প্রতি বছর বিলি করা হয়। মাওলানা লিয়াকত আলি সাহেব এখানে ১৮ বছর ইমামতি করেন।

পশ্চিম পুঁড়ি জামে মস্‌জিদ

প্রায় ২০ বছর আগে এই মস্‌জিদ চালু হয়। রইচ আলি লস্কর মস্‌জিদের জন্য ৫১/২ শতক জমি দান করেন। পশ্চিম পুঁড়ি ও ফুলডুবিতে মিলিতভাবে ১১৫ ঘর লোকের বাস। গরীব এলাকা। মুষ্টি চাল ও মাসিক চাঁদায় মস্‌জিদের খরচ চলে। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এ বছর মস্‌জিদের ছাদ ঢালাই হয়েছে। এখানে মাতোয়াল্লী হলেন ছমেদ আলি মণ্ডল এবং বর্তমান ইমাম আব্দুল মজিদ মোল্লা।

রামনগর গ্রামপঞ্চায়েত (১নং)

চিত্রশালী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ

চিত্রশালী পশ্চিম পাড়ার মসজিদটি সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় ২০০ বছর আগে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটি আছে ৫ কাঠা জমির ওপর। এই মসজিদের নামে উত্তরভাগে ১৮ বিঘে ধান জমি রয়েছে। এই জমি ভাগচাষী হওয়ায় ঠিকমত ধান পাওয়া যায় না, এছাড়া প্রায় ৭ কাঠা পুকুর ও ৪ কাঠা বাড়ী জমি আছে। তা সত্বেও মসজিদ চালানোর জন্য মাসিক চাঁদা তুলতে হয়। মাতোয়ালী হলেন আতোয়ার রহমান লস্কর।

চিত্রশালী শেখপাড়া মসজিদ

প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর প্রায় ৮ বছর আগে মসজিদটি তৈরী হয়। চিত্রশালী,

কাজিরাবাদ ও শেখ পাড়া মিলিতভাবে মসজিদ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। মসজিদটি কমিটি পরিচালিত। মাতওয়ালী হলেন ইলিয়াচ শেখ ও ইমাম জয়নাল মণ্ডল।

চিত্রশালী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ

পশ্চিম সীতাকুণ্ডুর চিত্রশালী গ্রামের এই মসজিদটি খুবই পুরাতন। মসজিদটি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রায় ১৭০ বছর আগে তৈরী হয়। আনুমানিক ৩ কাঠা জমির উপর মসজিদটি। মসজিদের মাতয়ালী হলেন নূর ইসলাম মোল্লা, সুজাউদ্দিন মোল্লা এবং কুতুবুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, ফুরফুরা শরীফ—হুগলি। মসজিদের ইমাম হলেন আব্দুলগানি মোল্লা।

চিত্রশালী (তাড়াপুকুর) জামা মস্জিদ

ছাদ আঁটা মস্জিদ। দু-বছর আগে (২০০১) মস্জিদ স্থাপিত। প্রয়াত মহম্মদ মোল্লার বাস্তুর জায়গায় মসজিদ। তার একটি বিকৃত মস্তিষ্ক কন্যা ছিল। মসজিদ করার জন্য তাকে বাস্তু থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদের জন্য তিনি আরও ১৩ শতক বাঁশবাগান দান করেন। মসজিদের মাতোয়াল্লী হলেন রেজাউল মোল্লা। ইমাম আবুল বাসার মোল্লা এবং কমিটির সভাপতি আব্দুল মোল্লা। জমির কিছু আয় এবং চাঁদায় মসজিদ চলে।

সীতাকুণ্ড (তাহের লস্কর পাড়া) মস্জিদ

মসজিদটির বয়স প্রায় ১০০ বছর। আগে টিনের চালের মসজিদ্ ছিল। প্রায় ১০ বছর আগে সীতাকুণ্ডু গোলাম আলি সরদার পুরাতন ঘর ভেঙে পাকা ছাদ আটা মসজিদ করে দেন। মসজিদটি ৪ কাঠা জমির উপর। চাঁদার উপর নির্ভর করে চলে। মাতয়ালী হলেন তাহের আলি লস্কর। ইমাম রফিক খাঁ।

সীতাকুণ্ড মণ্ডল পাড়া জামে মস্জিদ

ব্রিটিশ আমলের তৈরী এই মসজিদটির বয়স প্রায় ১০০ শত বছর। সাহেব আলি মণ্ডল প্রায় ১৮ বিঘে জমি দান করেন। তখনকার দিনে চৌহদ্দি করা দলিল। জমি প্রায় সবটা বে-দখল হয়ে রয়েছে। আব্দুর রাজ্জাকও কিছু ধান জমি দান করেন। ইদানীং মসজিদ ভালভাবে সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের কমিটি আছে। মাতায়ালী হলেন সাহাদাত পিয়াদা। সামান্য জমির আয় ও চাঁদায় মসজিদ চলে।

সীতাকুণ্ড সরদার পাড়া মস্জিদ

মসজিদটি বহু পুরাতন। ব্রিটীশ আমলে তৈরী। মসজিদটির বয়স আনুমানিক ১০০ শত বছর। প্রায় ৫/৬ বিঘে পুকুর, জমি, বাগান আছে মসজিদের। মূল্যবান সম্পত্তি। ৩ বছর অন্তর ১৫/২০ হাজার টাকায় সম্পত্তি লিজ দেওয়া হয়। গ্রামের চাঁদা ও মসজিদের আয়ে মসজিদ চলে। মসজিদের মাতয়াল্লী হলেন জাহাঙ্গীর ঢালী। মসজিদের স্থায়ী ইমাম আছেন।

দঃ সীতাকুণ্ডু কাজিপাড়া মস্জিদ

এটি প্রায় ১০০ বছর আগে তৈরী হয়। মসজিদের দখলে ২/৪ বিঘে জমি আছে।

মসজিদের মাতয়ালী আশরাফ আলি সরদার। মসজিদ কমিটি আছে। স্থায়ী ইমাম আছেন।

দঃ সীতাকুণ্ড জমাদার পাড়া মস্‌জিদ

জমাদার পাড়ার মসজিদ বয়স প্রায় ১০০ বছর। জামাদার পরিবারের উদ্যোগে মসজিদ গৃহের কাজ শুরু হয়। গ্রামবাসীগণ মসজিদ সংস্কার করেন।

দক্ষিণ সীতাকুন্ডু হরিরাজ সরদার পাড়া মাদ্রাসা

প্রায় ৪১বছর আগে মাদ্রাসাটি তৈরী হয়। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক ভাবে আরবী ও বাংলা ভাষা শেখে। মাদ্রাসার নিজস্ব জমি থেকে যে আয় হয় তাতে কোন রকম অতিকষ্টে চলে। হাজি গোলাম সামদানী নিজে জমি দান করেন ও মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে মাদ্রাসাটি তৈরী হয় । মাদ্রাসা দেখাশুনা করেন আজাহার সরদার ।

রামনগর তরফদার ও মিস্ত্রী পাড়া মস্‌জিদ

প্রায় ১২০ বছর আগে মসজিদটি তৈরী হয় তরফদার পাড়া ও মিস্ত্রী পাড়ার লোকদের উদ্যোগে । জমি দান করেন আরমান মিস্ত্রী । মস্‌জিদের নিজস্ব আয় থেকে মসজিদের খরচ নির্বাহ হয়। মাতোয়ালী হলেন ফিরোজ মিস্ত্রী এবং ইমাম হলেন আনোয়ার শেখ।

মসজিদ আকবর/মধ্য সীতাকুণ্ড লস্করপাড়া মস্‌জিদ

১৯৩০ সাল নাগাদ মসজিদের গৃহ নির্মাণ হয়। আগে ছিল টিনের চালের মসজিদ। আর অর্ধেক ছিল পেটাছাদ। ১০/১২ কাঠা জমি ও পুকুর আছে। ডাকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। মসজিদের মাওয়ালী হলেন আহ্‌দালী লস্কর। আর ইমাম আছেন আঃ ওহাব মণ্ডল।

মাদ্রাসা বাইতুল উলুম মোহাম্মদীয়া

গ্রাম বাজে উড়ঞ্চ, পোঃ সীতাকুণ্ডু। মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৯৩ সালে। মাদ্রাসার জন্য গ্রামবাসী জমিদান করেন। এখানে ৩০ জন দুস্থ ছাত্র আবাসিক। কোন বেতন বা কোন খরচ লাগে না। গ্রামের লোক অর্থ সংগ্রহ করেন। মাদ্রাসায় শিক্ষক থাকেন তিন জন। এখানে আরবি ভাষার শিক্ষাদানের সাথে বাংলা ইংরাজী ও অংক শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

মাদ্রাসা মিন্‌হাজুল উলুম

সীতাকুণ্ডুর মোড়ে বাসরাস্তার পাশে মাদ্রাসাটি অবস্থিত। মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে। এখানে ৩২ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এর মধ্যে ১৫ জন ছাত্র আবাসিক। দুঃস্থ আবাসিক ছাত্রদের সবকিছু ফ্রি। শিক্ষক আছেন ৩ জন। এখানে 'হাফেজ' (শুদ্ধ কোরান শরিফ মুখস্থ পড়ার ক্ষমতা) তৈরী করা হয়। মাওলানা হওয়ার পথে 'কাফিয়া' পর্যন্ত ক্লাশ হয়। পরে ছাত্ররা বড় মাদ্রাসায় চলে যায়। মাদ্রাসার নামে ৬ বিঘে ধান জমি আছে। এই ধান জমিতে ভাগচাষী রয়েছে। মাদ্রাসা ঘরটি দো-তালা করা হয়েছে। এলাকাও এলাকার বাইরের দানে মাদ্রাসা চলে।

দেওয়ান গাজী সাহেবের মাজার

জমি ছিল প্রায় ৫০ বিঘের বেশি। সীতাকুন্ডু হাই স্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকা

এক সময় মাজার ভুক্ত ছিল। মাজারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে। মাজারে চারখানা বহু পুরাতন বেল গাছ আছে। বর্তমান খাদেম বা সেবায়েত মীর আতিয়ার রহমান জানালেন, তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন — তাঁর পিতাও সারা জীবন বেলগাছগুলি একই ভাবে দেখে আসছেন । তিনি জানালেন, খাসমল্লিক, ডিহিমেদন মল্ল এলাকা থেকে জগদীশ ব্যানার্জী, কুন্তল আচার্য ও আরও অনেক পরিবারের লোকেরা প্রতি বছর সর্বপ্রথম পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের শনি বা মঙ্গলবার সারাদিন উপোষ করে নেওয়াজি বা হাজত (বিভিন্ন প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি) মাজারে দিতে যান বৈকালে মাজারের পুকুরে স্নান করার পর। অন্যেরা হাজত দিতে যান ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের শনি বা মঙ্গলবার সারাদিন উপোসের পর। বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয় ২২শে শ্রাবণ। প্রতি বছর হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম পুরুষ-মহিলা সমবেত হয় বাজারে মহিলাদের উপস্থিতি হয় বেশী। বারুইপুর থানার বেগমপুর, আটঘরা, সাহেবপুর, রঘুনন্দনপুর, টগরবেড়িয়া, ভুরকুল, শশাড়ি, কল্যাণপুর, নাজিরপুর, ভুরকুল প্রভৃতি এলাকা থেকে মানুষ এসে মাজারে হাজত দেন। মাজারে প্রচুর উপকন্ঠ আসে । খাদেমের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এগুলি ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়।

মানুষ আসে নানা মনস্কামনা নিয়ে। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় অনেক সক্ষম ব্যক্তি বাবার মাজারের উন্নতিতে অর্থ ব্যয় করেছেন।

বর্তমান খাদেম মীর আতিয়ার রহমানের পিতা মীর গোলাম মাওলানা ও তার বন দাদা মীর গোলাম আলি, আমার গোলাম আলির পিতা মীর আব্দুল এবং তার আগে রমজান মীর এরফান মীর বংশের আরও অনেকে বংশানুক্রমিক মাজার দেখাশুনা করে আসছেন। কথিত আছে মীরেরা ছিলেন আরবদেশের লোক, সোলেমান বাদশার সন্তানাদি।

গাজীসাহেবের মাহাত্ম্যের কিছু কিছু ঘটনা শোনা যায়।

কোন অনুষ্ঠানের সময় গাজী সাহেবের নাম করে নিরামিষ পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে প্লেট চাইলে পুকুরে প্লেট উঠত। আবার কাজের শেষে প্লেট পরিষ্কার করে পুকুরে ফেলে দিতে হতো। একবার কোন ব্যক্তি কটি প্লেট কম করে পুকুরে ফেলায় প্লেট ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। এই পুকুরটি কাটানো যায় না। জল তুলে মাটি কাটার পর অল্প সময়ে আবার সেখানে জলে ভরে যায়। একটি কূয়ো আছে । সেটি মাটি ফেলে প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

একবার ১৩-১৪ বছর বয়েসি তপন হালদার শ্রাবণ মাসের বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর বেলগাছের মাথায় মাজারের নতুন পতাকা নামিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে মাজারের সামনে গাছ থেকে পড়ে মুখে রক্ত উঠে মরণাপন্ন হয়ে বারুইপুর হস্‌পিটালে যায়। সব ঘটনা শুনে সেখান থেকে বলা হয় বাঁচার আশা কম - মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি করতে বলা হয় । মাজারে কান্নাকাটির পর ছেলেটি আস্তে আস্তে সুস্থ হয় । বর্তমানে তপন হালদারের বয়স ৩৬/৩৭ বছর।

গত ২ বছর আগে বেলগাছ থেকে বেল পাড়ার জন্য বেলগাছে থাকা একটি পুরাতন পতাকার বাঁশ পাড়তে যায় সীতাকুন্ডুর মনো সরদার, পিতা মৃত বাঁকা সরদার পীরের নাম

করে গাছে ওঠার মুহূর্তে তার একেবারে গা ঘেঁসে ধ্বজিটি এসে পড়ে। মাথার মাঝখানে পড়লে অঘটন ঘটে যেত। ঘটনাক্রমে মনো সরদারের সাথে দেখা হয়ে যায়। সে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ।

কয়েক বছর আগে চিত্রশালী মস্‌জিদের ইমাম একবার গাজী সাহেবের অস্তিত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য চিত্রশালী মস্‌জিদের ইমাম অনেক রাতে মাজারে যায়। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিষন ঝড় শুরু হয়ে যায়। এতে ইমাম খুব ভয় পেয়ে যান। তাঁর কথা মত তিনি মাজারের জানলার মধ্য দিয়ে একটি রঙীন শিশির ফেলে দিয়ে আসেন। মীর বংশের লোকেরা কোন বিপদে পড়লে মাজারে গিয়ে পীরের প্রার্থনা করেন।

রামনগর—২ গ্রামপঞ্চায়েত

রামনগর উত্তরভাগ পুরানো মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি বহু পুরানো। স্থানীয় মানুষের ধারণা প্রায় ৩০০ বছর আগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। ভুতুই মন্ডল, নুতুই মন্ডল, মানিক মন্ডল ও নন্দ সরদারদের উদ্যোগে মস্‌জিদ নির্মিত হয়। জমি দান করেছেন এলাই মন্ডল। এলাকার মানুষের দানে মস্‌জিদ চলে। বর্তমান মাতয়ালী আকবর মোল্লা এবং ইমাম জনাব নুরুল শেখ।

উত্তরভাগ মিস্ত্রীপাড়া মস্‌জিদ

প্রায় ৬৫ বছর আগে এই মস্‌জিদটি তৈরী হয় হাজি আবদুল মোতালেব মিস্ত্রীর উদ্যোগে। জমিদাতাও তিনি। মোটামুটি মস্‌জিদের জায়গা-জমির আয়ে মস্‌জিদ চলে। মাতোয়ালী আকবর মোল্লা এবং ইমাম হলেন নরুল শেখ।

ইসলাম নগর (চঙ্গ) জামে মস্‌জিদ

বাংলা ১৩৩০ সালে মাটির দেওয়াল ও তালপাতার ছাউনি দেওয়া এই মস্‌জিদটি তৈরী হয়েছিল। ইয়ারালী নস্কর, দবিরদ্দি সরদারের উদ্যোগে—একথা জানান প্রায় ৬৭ বছর বয়স্ক স্থানীয় ইসমাইল সরদার। আমিন নস্কর, বুদাই সরদার, মস্তাফা নস্কর, কচি সরদার, মনি সরদাররা পিচ রাস্তার ধারের মস্‌জিদ তৈরীর জন্য এই ১১ শতক জমি দান করেছিলেন। মস্‌জিদের ব্যয়ের জন্য আরও ৫ বিঘা জমি তারা দান করন। পরে ছোট পাকা মস্‌জিদ তৈরী হয়। এবার ১৯৮৯ সালে মসজিদ সংস্কার করে ছাদ আঁটা হয়। মাতোয়ালী আলি মামুদ সরদার ও ১৫ বছর যাবৎ ইমাম আছেন সাজেদুল রহমান সাহেব।

ইসলাম নগর (চঙ্গ) মাদ্রাসা

দঃ ২৪ পরগনার ইসলাম নগর (চঙ্গ) মাদ্রাসা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এর নাম মাদ্রাসা দারুল উলুম। বারুইপুর থেকে অটো বা মিনিবাসে রামনগর স্কুল মোড়ে নেমে হেঁটে মাত্র ৮/১০ মিঃ পথ। ঐ গ্রামের সমাজকর্মী আবদুল জুব্বার সরদারের উদ্যোগে বাংলা ১৩৮০ সালে ছোট একটা ঘরে সামান্য সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে মাদ্রাসা শুরু হয়েছিল। আজ জুব্বার সরদার বেঁচে নেই। গত '৯৭ সালের ১৭ই মার্চ তিনি এন্তেকাল করেন কিন্তু তাঁর তৈরী প্রতিষ্ঠান স্বমহিমায় ভাস্বর। আজ মাদ্রাসার বিশাল দো-তালা বাড়ী ৪/৫ বিঘে জমির

ওপর। প্রায় ৩৮৫ নন ছাত্র। এর মধ্যে আসিক প্রায় ২৫৮ জন। বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১২/১৩ লক্ষ টাকা। ৬ বিঘে ধান জমি কেনা হয়েছে। প্রতি বছর এলাকার চাষীদের কাছ থেকে ধান্য সংগ্রহ করা হয় আর আছে জাকাত, ফেতরা, সংগৃহীত কোরবানির চামড়া থেকে আয়। এ ছাড়া আছে এলাকা ও এলাকার বাইরের মানুষের স্বেচ্ছাদান। বর্তমানে শিক্ষক আছেন ১৯ জন। বর্তমানে মক্তব বিভাগ বা পাঠশালা থেকে মাওলানা (টাইটেল) পর্যন্ত ক্লাশ চলছে। জেলা, জেলার বাইরে এমনকি বাংলার বাইরে থেকে এখানে ছাত্র আসে। ছাত্রদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়ার ও পুস্তকাদির ব্যবস্থা করতে হয়। মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা আহম্মদ সাহেব জানালেন, তারা কোনদিন সরকারী সাহায্য পাননি। স্বেচ্ছাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

ধপধপি ২নং গ্রামপঞ্চায়েত

পশ্চিম মল্লিকপুর জামে মসজিদ

প্রাচীন মসজিদটি এটি। ১৯০৩ সালের ২০ শে নভেম্বর (বাংলা ১৩১০, ৪ঠা অগ্রহায়ন) বক্তার খাঁ এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। দেড় বিঘা জমির উপর তিনি একতালা পাকা মসজিদ করে দেন এবং মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ধান জমি ও বাড়ি জমি সমেত ১৫৬ বিঘে জমি দান করেছিলেন যে সব জমি বর্তমানে বে-দখল হয়ে রয়েছে। এটি ওয়াকাফ বোর্ডের অধীনস্থ মসজিদ। মসজিদের গৃহের অবস্থা ভাল নয়। অর্থের অভাবে সংস্কার হচ্ছেনা। চাঁদা তুলে প্রাচীর টানা হয়েছে। মসজিদে বিকেলে আরবি পড়ানো হয় বালক-বালিকাদের। স্থায়ী ইমাম আছেন। মল্লিকপুর ছাড়া শেরপুর, পুরুষোত্তমপুর প্রভৃতি গ্রামবাসী মসজিদের সাথে যুক্ত আছেন।

খানে খোদা মসজিদ

মসজিদটি অতি প্রাচীন। এটি এখন একতলা। এটি নবাবী আমলের মসজিদ বলে শোনা যায়। ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল। বছর দশেক আগে গ্রামবাসীরা এই মসজিদ সংস্কার করেন মসজিদের নামে কিছু জমি আছে। মসজিদের স্থায়ী ইমাম এবং মাতয়াল্লী আছেন।

ভাটপোয়া জামে মস্‌জিদ

অতি প্রাচীন মস্‌জিদ। মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায়, একশত বছর আগে। গ্রামবাসীদের চেষ্টায় মস্‌জিদ দো-তালা হয়েছে। এই মস্‌জিদের মাতোয়াল্লী জনাব সিরাজ মীর, উপপ্রধান। স্থায়ী ইমাম আছেন। মস্‌জিদের আয়ের উৎস গ্রামের চাঁদা।

আলিপুর জামে মস্‌জিদ

মস্‌জিদটির বছর ছয়েক আগে সংস্কার হয়। পাকা ঘর। স্থানীয় সমাজসেবী ইব্রাহিম মোল্লার উদ্যোগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়েছিল। বর্তমান কর্ণধার তিনি।

শেরপুর সর্দার পাড়া জামে মস্‌জিদ

মস্‌জিদটি সরদার পরিবারের উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল। বছর দশেক আগে মসজিদটির সংস্কার করা হয়। গৃহটির ইটের দেওয়াল ও টালির ছাউনি। সরদার পরিবারের লোকজন

মস্‌জিদ দেখাশুনা করেন। ইমাম আছেন।

দঃ পদ্মজলা মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ৭০/৮০ বছর আগে। জমি দিয়ে ছিলেন ইউনুস চাপরাশি। আগে ছিল মাটির দো-তালা। বর্তমানে পাকা মসজিদ নিচের ঘর মোজাইক করা হয়েছে। স্থায়ী ইমাম আছেন।

মজলিস পুকুর মস্‌জিদ

প্রায় ৩০ বছর আগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। এটি একতলা পাকা মস্‌জিদ। প্রয়াত হানিফ ঘরামী মস্‌জিদ তৈরীর পুরোভাগে ছিলেন বলে জানা গেল। গ্রামবাসীগণ তার সাথে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। স্থায়ী ইমাম আছেন।

মাঝের পাড়া মস্‌জিদ

ধপধপির মাঝের পাড়া মস্‌জিদটি আগে ছিল। গৃহ নির্মান করা হয় বছর পাঁচেক আগে। এখন এটি ছাদ আঁটা মসজিদ। স্থায়ী ইমাম আছেন। আয়ের উৎস চাঁদা।

ধপধপি ঘরামী পাড়া জামে মস্‌জিদ

ঘরামী পাড়ার মস্‌জিদটি প্রায় ১০০ শত বছর আগে স্থাপিত হয়। ঘরামী, দেওয়ান সিপাই পরিবারের উদ্যোগে মস্‌জিদ তৈরী হয়। মস্‌জিদটি ছিল একতলা ছাদ আঁটা। পরে আবার সংস্কার করা হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন।

ধপ্‌ধপি ১নং গ্রামপঞ্চায়েত

সূর্যপুর মাদ্রাসা জামিয়া ইস্‌লামিয়া মাহমুদিয়া

এই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৭৪/৭৫ সালে আমার মনে আছে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য বিশাল সারারাত ব্যাপী ধর্মসভা হয়েছিল। বক্তা ছিলেন গোলাম আহম্মদ মোর্তজা সাহেব (বর্ধমান) সভায় অর্থসংগ্রহ ও জমি সংগ্রহ করা হয়েছিল। রাস্তার পার্শ্বস্থ মূল্যবান জমি বাজেয়ার আলি বৈদ্য দান করেছিলেন। সেদিন বহুলোক অর্থ ও জমি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত মাদ্রাসা তৈরীর কারিগর হিসেবে যুক্ত থাকা হাজি নাসিরুদ্দিন সাহেব সেদিনের টগবগে যুবক যিনি তাঁর সারা জীবনটা উৎসর্গ করে দিলেন এই মাদ্রাসার উন্নতিতে। তাঁরই চেষ্টায় মাদ্রাসার দো-তালা বাড়ী হয়েছে। পাশে তৈরী হয়েছে সুন্দর মস্‌জিদ। সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সেবামূলক কাজের জন্য মাদ্রাসা সংলগ্ন জমিতে মহম্মদ আলি সোসাইটির সুদৃশ্য ভবন তৈরী হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে আবাসিক বালিকা মাদ্রাসা। গরীব ও এতিমদের এখানে সম্পূর্ণ ফ্রি। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রী ও শিক্ষিকা এখানে আছেন।

শিক্ষার্থীদের এখানে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন হাতের কাজ শেখানো হয়। গরীবদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা। সরকারী চাকুরীর পরীক্ষায় যাতে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পায় তার জন্য আছে কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা।

মাদ্রাসা বিভাগে নিয়মিত তৈরী হচ্ছে হাফেজ ও মাওলানা। এখানে পড়ার পর আর দুবছর বাইরে পড়লে মাওলানা পাশ হবে। আরবির সাথে ইংরেজী ও বাংলা পড়ানো হয়। মাদ্রাসা বিভাগে এখন ছাত্র সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক এবং শিক্ষক আছেন ১২ জন। এখানে সবার বিনা-বেতনে থাকা -খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আয়ের উৎস- মানুষের স্বেচ্ছা দান, জাকাত, ফেতরা আর কোরবানির চামড়া বিক্রির অর্থ।

চাঁদখালি বৈদ্যপাড়া মস্‌জিদ

মস্‌জিদটি খুবই প্রাচীন, ধপধপি স্টেশন রোডের পাশে অবস্থিত। মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহঃ সাকের বৈদ্য ১৮৯৩ সালে। পুরাতন ছাঁদ আটা ঘর বর্তমানে দো-তালা হয়েছে। বর্তমান মাতোয়াল্লী ইউসুফ আখন। স্থায়ী ইমাম আছেন।

চাঁদখালি গাজিপাড়া মস্‌জিদ

চাঁদখালি গাজি পাড়ায় ১৯৯৩ সালের আগে মস্‌জিদ নির্মান হয়েছিল। গৃহ সংস্কার করা হয় ১৯৯৩ সালে। মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন সেলিম গাজি। বর্তমান মাতোয়াল্লী মহঃ আকসেদ গাজি।

সূর্যপুর মারকাজী মস্‌জিদ

সূর্যপুর মারকাজী মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। মস্‌জিদের জন্য জামি দান করেছিলেন মাহাতাব মন্ডল। সোহরার সাহেব এই মসজিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী। স্থায়ী ইমাম আছেন।

সূর্যপুর মন্ডল ও লস্কর পাড়া মস্‌জিদ

১৯৮৫ পদ্মজলা নিবাসী কওম দরদী সমাজসেবী হাজি নাসির উদ্দিন সহেব এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা ১১০ জন। মূল উদ্দেশ্য 'আখলাক' বা চরিত্র গঠন, জ্ঞান অর্জন।

পদ্মজলা মণ্ডল পাড়া মসজিদ

এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে জমি দান করেন আহম্মদ মণ্ডল। মসজিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী হাজি মুহাম্মদ আলি। স্থায়ী ইমাম আছেন। মসজিদ চলে গ্রামবাসীদের চাঁদায়।

পদ্মজলা সরদার পাড়া মসজিদ

স্থানীয় গ্রামবাসী জনাব হোসেন আলি, ছোপান আলি, কাদের আলি ও আকবর আলি ও গ্রামবাসীর উদ্যোগে ১৯৮৫ সাল নাগাদ মসজিদ তৈরী হয়। জমি দান করেন উপরোক্ত ব্যক্তিগণ। বর্তমান মাতোয়াল্লী হাজি কাদের সাহেব। স্থায়ী ইমাম আছেন।

পদ্মজলা মসজিদ

এই মসজিদ স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে। জমিদান করেন জনাব হামিদ সরদার, সোহারাব মিয়া, আপসার মিয়া প্রমুখ। বর্তমান মাতোয়ালী হাজি নুর মহম্মদ সাহেব। স্থায়ী ইমাম

আছেন।

পদ্মজলা লস্কর পাড়া মসজিদ

এই মসজিদটি তৈরী হয় ১৯৯৮ সালের আগে। জমিদান করেছিলেন লস্কর ও গাজি পরিবার। বর্তমান মাতোয়াল্লী জনাব হাসেম লস্কর। স্থায়ী ইমাম আছেন।

পদ্মজলা ঘরামী পাড়া মসজিদ

১৯৯৪ সাল নাগাদ এই মসজিদের তৈরী হয়। পাকাবাড়ী। এই মসজিদ তৈরীর উদ্যোগে ছিলেন ঘরামী পাড়ার মানুষ। মসজিদ দেখাশুনা করেন জনাব ইয়াকুব আলি, পিয়ার আলি ও দেবু মিয়া প্রমুখ। স্থায়ী ইমাম আছেন।

রাণা মণ্ডলপাড়া মসজিদ

এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৫ সালে রাণার মণ্ডল পরিবার। জমিদান করেন তারাই। বর্তমান মাতোয়াল্লী জনাব ইচ্ছাগাজি। স্থায়ী ইমাম আছেন।

রাণা সরদার পাড়া মসজিদ

এই মসজিদটি স্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে। মসজিদের জন্য জমি দান করেছিলেন জনাব ফকির সরদার মহাশয়। মসজিদের বর্তমান মাতোয়াল্লী জনাব ফকির সরদার। স্থায়ী ইমাম আছেন।

নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

কেয়াতলা লস্কর পাড়া মসজিদ

সূর্যপুর স্টেশন ছেড়ে গোচারণ স্টেশনের দিকে ট্রেনে যেতে সূর্যপুর রেল ব্রীজ ফেলেই পশ্চিম দিকে দেখা যাবে বহু প্রাচীন এই গ্রাম কেয়াতলা। গ্রামের বেশির ভাগ অংশ জলাশয় দিয়ে ঘেরা। এই গ্রামে সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের মসজিদটি খবুই প্রাচীন। ২০০ (দু'শত) বছরের বেশি হবে। লস্কর বংশের লোকেদের উদ্যোগে মসজিদ তৈরী হয়। জমিদাতা তারাই। বর্তমানে বড়-সড় পাকা মস্জিদ। মসজিদে ভালই ভিড় হয়। সকালে নিয়মিত আরবি শেখানো হয়। সমজিদের নামে ৮/১০ বিঘে ধান জমি আছে। গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিশাল সরকারী গোরস্থান। গোরস্থানের মধ্যে থাকা পুকুর এবং গ্রামের সীমানায় থাকা জলা জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের বেশির ভাগই মসজিদের জন্য ব্যয় হয়। আগে মসজিদের ইমামকে ইমামতির জন্য কিছু জমি দিয়ে রাখা হতো। বর্তমানে ইমামকে বেতন দেওয়া হয়।

হিমচি নুরানি জামে মসজিদ

হিমচি গ্রাম। পোঃ নবগ্রাম। হিমচির নুরানি জামে মসজিদ স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। হিমচির গাজি পরিবার জমি দান করেন। প্রায় ১০/১২ কাঠা জমির ওপর মসজিদ। মসজিদের নামে ধান জমি ১ বিঘে। এই মসজিদ সম্পূর্ণ চাঁদা নির্ভর। বর্তমানে মসজিটি পাকা, মসজিদের মাতয়াল্লী কুব্বাত আলি গাজি। ইমাম হাফেজ আব্দুস ছোবহান।

হিমচি নস্করপাড়া জামে মসজিদ

১৯৬০ সাল নাগাদ মসজিদ স্থাপিত হয়। মসজিদ নির্মানের উদ্যোক্তা নস্কর পরিবার। জমিদাতারা হলেন এস্তাজ নস্কর, জুব্বার নস্কর, মোসলেম নস্কর, ইয়ুকুব নস্কর। ২ বিঘে জমির উপর মসজিদ ও মাদ্রাসা। মসজিদের নামে প্রায় ৩ বিঘে ধান জমি আছে। মাতয়ালী মনসুর আলি লস্কর, ইমাম মাওলানা আবদুল রাজ্জাক লস্কর।

মসজিদের সাথে মাদ্রাসা রয়েছে। ৬০/৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ে। কিছু ছাত্র আবার আবাসিক । আরবির সাথে বাংলা পড়ানো হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মান পর্যন্ত। ওস্তাদ আছেন তিনজন। সম্পাদক কারী সালাউদ্দিন গাজি। স্থানীয় ও বাইরের গ্রামের সাহায্যে মাদ্রাসা চলে।

হিমচি অছিমদ্দিন পীরের মসজিদ

পীর সাহেবের শিষ্যরা ১৯৯০ সাল নাগাদ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদাতা হলেন হাজি জোবেদ আলি গাজি। মসজিদ সংলগ্ন পুকুর ও জমি ১ বিঘে। মসজিদের ইমাম হাফেজ মোক্তার মণ্ডল। মসজিদ পরিচালনা করেন হামিদ আলি গাজি, ছাকাত গাজি, আশ্রাফ গাজি ও অনেকে।

হিমচি মণ্ডলপাড়া জামে মসজিদ

এক বিঘে জমির উপর মসজিদ। ১৯৫০ সালের আগে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পীরদের হেজবুল্লা। মসজিদের মাতয়ালী লুৎফর রহমান মণ্ডল। ইমাম নিজাম উদ্দিন মণ্ডল।

কেয়াতলা গাজিপাড়া জামে মসজিদ

সূর্যপুর বলবলিয়া মোড়ে কুলপী রোডের পাশে গাজি পরিবারের উদ্যোগে মসজিদ তৈরী হয়। ৮/১০ বছর আগে মসজিদটির ছাদ আটা হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন।

হিমচি হারামোল্লা পাড়া জামে মসজিদ

১৯৯০/৯২ সালে নাগাদ মসজিদটি তৈরী হয়। প্রায় ১০ কাঠা জমির উপর মসজিদটি অবস্থিত। পাকা ঘর, টালির ছাউনি। মসজিদটি সম্পূর্ণভাবে চাঁদার উপর নির্ভরশীল। মসজিদের বর্তমান মাতয়াল্লী আরফাত মোল্যা।

নবগ্রাম হালদার পাড়া মসজিদ

মসজিদটি ১৯৮০ সাল নাগাদ তৈরী হয়। খুব গরীব এলাকা। খুবই অল্প মুসলমানের বাস। মসজিদ ঘরটির দেওয়াল মাটির এবং টালির ছাউনি। মসজিদের ইমাম মুন্সী হান্নান মণ্ডল। মসজিদের মাতয়ালি ও সম্পাদক হাজি জহরউদ্দিন।

গোড়দা জামে মসজিদ

প্রায় ৬০/৭০ বছর আগে মসজিদটি তৈরী হয়। যতদূর জানা যায় হাজি আবুরালি, খাজা বকস, প্রমুখ ব্যক্তিদের উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন। মসজিদটি কমিটি পরিচালিত। সম্পূর্ণ ভাবে চাঁদায় চলে।

পূর্ব পাঁচগাছিয়া খাঁ পাড়া মসজিদ

১৯৩৫ সালে মহব্বত খাঁর উদ্যোগে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে টিনের চাল ও ইটের দেওয়াল। বর্তমানে গ্রামবাসীর উদ্যোগে নির্মিত হয়ছে ছাদ আঁটা মসজিদ। সকালে আরবি পড়া হয়। মসজিদদের আয়ের উৎস গ্রামবাসীদের চাঁদা, সামান্য জমি আছে মসজিদের নামে। বর্তমানে মাতয়ালি আছেন মেহের আলি খাঁ। ইমাম নূর মহম্মদ সাহেব।

পূর্ব পাঁচগাছিয়া মোল্লাপাড়া মসজিদ

১৯৫৩ সাল নাগাদ জনাব কমরুদ্দিন মোল্লার উদ্যোগে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ছিল মাটির দেওয়াল ও টালির ছাদ। বর্তমানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় মসজিদের পাকা ছাদ হয়েছে। সকালে আরবি পড়ানো হয়। মসজিদের বর্তমান মাতয়ালি রবিউল মোল্লা ও ইমাম আবুল হোসেন মোল্লা সাহেব। মসজিদ চলে চাঁদায়, কিছু ধান জমি আছে মসজিদের নামে।

বৃন্দাখালি গ্রামপঞ্চায়েত

বৃন্দাখালি জামে মসজিদ

খুবই প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি তৈরী হয় ১৮৯৮ সালে। জমি দাতা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা হলেন হারা মোল্লা। জমির পরিমাণ ২৫ শতক। গ্রামবাসীদের দানে মসজিদ চলে। বর্তমান মাতয়ালী আয়নাল মোল্যা ও সম্পাদক হলেন খোসদেল সরদার। মসজিদের ইমামের দায়িত্বে আছেন আব্দুর রউপ সাহেব।

মাছপুকুর জামে মসজিদ

মসজিদটি ১৯৪৩ সাল নাগাদ তৈরী হয়। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায় আবদুল আজিজ মোল্লা। জমিও দান করেছিলেন আবদুল আজিজ মোল্লা। প্রায় সাত শতক জমির উপর মসজিদ। মসজিদ চলে গ্রামবাসীদের দানে। বর্তমান মসজিদের মাতয়ালী বাকীউল্লা গাজি। ইমামের দায়িত্বে আছেন সামসুদ্দিন মোল্লা।

বেলেগাছি গ্রামপঞ্চায়েত

জেলের হাট জামে মস্‌জিদ

মস্‌জিদটি এই গ্রামের বাহার আলি মন্ডল জমি দান করে তৈরী করে দেন প্রায় ৪০ বছর আগে। মস্‌জিদ ঘরটি আগে ছিল মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনি। বর্তমানে ইটের দেওয়ালের উপর এ্যাস্‌বেস্টস্‌ এর ছাউনি দেওয়া হয়েছে। মস্‌জিদ এলাকাটি প্রায় ১০ কাঠা। মস্‌জিদের নামে আছে ১৪ বিঘে ধান জমি। বর্তমান মাতোয়াল্লী আলি হোসেন সরদার এবং ইমাম আঃ জলিল সরদার।

ঘোলা বাজার জামে মস্‌জিদ

ঘোলা বাজার মস্‌জিদটি স্থাপিত হয় ১৯৮৪ সালে। জমি দান করেছিলেন জনাব

গোলাম নবি মোল্লা। গ্রামবাসীরা গৃহ নির্মাণ করেন। মস্‌জিদের দেওয়াল পাকা ও এ্যাস্‌বেস্টসের ছাউনি। বর্তমানে মাতেয়াল্লী নুর আমিন মোল্লা এবং ইমাম আছেন মৌলভী আজিজুর হক্‌ মন্ডল।

দঃ বেলেগাছি মিদ্ধে পাড়া জামে মস্‌জিদ

প্রায় ৩০ বছর আগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। মস্‌জিদের দেওয়াল ইটের ও ছাউনি এ্যাস্‌বেস্টসের। ১০ কাঠা জমির উপর মস্‌জিদটি অবস্থিত। মাতোয়াল্লী মহঃ মোস্‌লেম হালদার। চাঁদায় ব্যয় নির্বাহ হয়।

উঃ বেলেগাছি জামে মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি প্রায় ১০০ শত বছরের পুরনো। মসজিদের জন্য জমি দান করেছিলেন আঃ গনি মোল্লা। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মস্‌জিদের গৃহ নির্মান হয়। বর্তমানে ছাদ আঁটা একতলা মস্‌জিদ। মস্‌জিদের মাতোয়াল্লী ও ইমাম হলেন মাওলানা আঃ দাইয়ান সাহেব। মস্‌জিদের নামে ৪ বিঘে ধান জমি আছে।

রামধারী নূরহোসেন লস্কর কলোনী মস্‌জিদ

৫ কাঠা জমির উপর ১৯৮৪ সালে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়। জমি দান করেছিলেন প্রদীপ সরদার মহাশয়। মস্‌জিদ সংলগ্ন একটি পুকুর আছে। মস্‌জিদটি এখনও জামে মস্‌জিদে পরিণত হয় নি।

বেলেগাছি সায়ফুদ্দিন সিদ্দিকিয়া কোরানিয়া মাদ্রাসা

এই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। মাদ্রাসার জন্য জমি দান করেছিলেন সাহারালী ঢালী, গোলাম গায়েন ও জিয়াদ গায়েন। পাকা ঘর, ছাউনি এ্যাস্‌বেস্টসের। ৫০/৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করেন।

আমিনিয়া হক্কানিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা

হরিমূলের এই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালে । এটি এই এলাকার খ্যাতি সম্পন্ন ও ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে খারিজীসহ হাফেজী বিভাগ এবং বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয় অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাড়ানো হচ্ছে। এখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। নবম, দশম শ্রেণীতে যারা পড়তে চায় তাদের ফুরফুরা শরীফে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক । এদের থাকা খাওয়া, শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতির জন্য বৎসরে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা দরকার। উপযুক্ত হোস্টেল না থাকায় শিক্ষার্থীদের খুবই কষ্ট করে থাকতে হয়। এলাকা ও এলাকার বাইরের মানুষের জাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া এবং স্বেচ্ছাদানের উপর নির্ভরশীল। এই মাদ্রাসা কোনক্রমে চলছে। মাদ্রাসাটি ভালভাবে চালাতে গেলে আরও অর্থ দরকার।

হারদহ গ্রামপঞ্চায়েত

কুড়ালি মারকাস মস্‌জিদ

কুড়ালির লস্কর পরিবারের ও সাহাপুর গ্রামের উদ্যোগে মস্‌জিদটি স্থাপিত হয় প্রায় আশি বছর আগে। বর্তমানে একতালা ছাদ আঁটা পাকা ঘর। মস্‌জিদের নামে কিছু সম্পত্তি আছে। সকালে মস্‌জিদের মক্তবে আরবি ও বাংলা পড়ানো হয়। মস্‌জিদের মাত্রেয়াল্লী মহঃ কবুল হেসেন লস্কর।

সাহাপুর জামে মসজিদ

মস্‌জিদটি স্থাপিত হয় প্রায় ৬০ বছর আগে। একতালা ছাদ আঁটা ঘর। কিছু সম্পত্তি আছে। সকালে আরবী পড়ানো হয়। সাহাপুরের মন্ডল পরিবারের উদ্যোগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়।

মল্লিকপুর জামে মস্‌জিদ

মস্‌জিদটি বর্তমানে দো-তালা । ঘরের অবস্থা আগে ভাল ছিল না। মল্লিকপুরের মোল্লা পরিবারের উদ্যোগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর আগে। মস্‌জিদের নামে কিছু ধান জমি আছে।

পশ্চিম হাড়দহ জামে মসজিদ

পশ্চিম হাড়দহ লস্কর পরিবারের উদ্যোগে ৭০/৮০ বছর আগে মস্‌জিদ তৈরী হয়। পাকা ঘর এ্যাস্‌বেস্টসের ছাউনি। সকালে আরবি পড়ানো হয়। ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু আছে। স্থায়ী ইমাম আছেন।

হাড়দহ পূর্ব জামে মস্‌জিদ

প্রায় ৪০/৪৫ আগে মস্‌জিদটি স্থাপিত হয়। এই মসজিদেরও জমি দাতা লস্কর পরিবার। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মস্‌জিদ তৈরী হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন। সকালে আরবি পড়ানো হয়। গ্রামবাসীদের দানে মস্‌জিদের ব্যয় নির্বাহ হয়।

চক্রবর্তী আবাদ মোল্লা পাড়া মস্‌জিদ

উত্তরভাগ পার হয়ে গিয়ে ক্যানিংগামী রাস্তার পাশে মস্‌জিদটি প্রায় ৫০/৬০ বছর আগে স্থাপিত হয়। মস্‌জিদ গৃহটি পাকা। মস্‌জিদের মাতোয়াল্লী হলেন মোঃ সুলতান মোল্লা এবং ইমাম হাফিজুদ্দিন মোল্লা ।

চক্রবর্তী আবাদ শেখ পাড়া মস্‌জিদ

পাশাপাশি আর একটি মস্‌জিদ তৈরী হয় বছর ছয়েক আগে। পাকা ঘর। মস্‌জিদের নামে কিছু ধান জমি আছে।

অর্জুনা জামে মস্‌জিদ

সাঁফুই পরিবারের উদ্যোগে মস্‌জিদটি তৈরী হয় বছর পাঁচেক আগে। মস্‌জিদের ইটের দেওয়াল, এ্যাস্‌বেস্টসের ছাউনি। কিছু সম্পত্তি আছে মস্‌জিদের নামে।

ছয়ানি জামে মস্‌জিদ

প্রায় ৪০ বছর আগে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। পাকা ঘর এ্যাস্‌বেস্টসের ছাউনি। মস্‌জিদের নামে কিছু ধান জমি আছে। মস্‌জিদের স্থায়ী ইমাম আছেন।

হাড়দহ ইসলামিয়া জ্যাকারিয়া মাদ্রাসা
মাদ্রাসাটি প্রায় ৩০ বছর আগে তৈরী হয়। আবাসিক মাদ্রাসা। বহু সমস্যার মধ্যেও মাদ্রাসাটি সুনামের সঙ্গে চলছে, প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র এখানে পড়াশুনা করে।

শংকরপুর গ্রামপঞ্চায়েত (১নং)

রতনপুর জামে মসজিদ

মসজিদটি খুবই প্রাচীন। কবে এই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঠিক জানা গেল না। গ্রামের ডাঃ কত্তসার আলি মোল্লা জানান, আরব দেশ থেকে কোন ব্যক্তি এসে এখানে প্রথমে বাস করেন বলে শুনেছেন। ফার্সি ভাষায় লেখা কিছু কিতাবও পাওয়া গিয়াছে। মসজিদ সংলগ্ন প্রায় ৫ বিঘে গোরস্থান আছে। কবর খোলার সময় মাটির মধ্যে থেকে বিশালাকায় কংকাল পাওয়া গিয়েছে।
প্রাচীন মসজিদ বলে বহু দূর থেকে লোকেরা জুম্মার নামাজ পড়তে আসত। আগে ছিল মাটির মসজিদ। প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে মসজিদ সংস্কার হয়েছে। বর্তমানে মসজিদের নিচের ঘরে ৫৬০ জন একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারে। শুক্রবার প্রায় ৩৫০/৪০০ জন নামাজ পড়ে। বর্তমান মাতয়ালি কাহার আলি মোল্যা। ইমাম আবদুল অজিজ সাহেব। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা আছে।

টৈকা নূর মসজিদ

আনুমানিক ১৫ বছর আগে মসজিদটি গ্রামবাসীদের উদ্যোগ তৈরী হয়। জমি দান করেছিলেন চৌধুরী পরিবার। ইমাম আছেন কারী ইসমাইল মণ্ডল। গ্রামবাসীদের মুষ্ঠির চাল ও চাঁদায় মসজিদ চলে।

টৈকা জুম্মা মসজিদ

ঐ মসজিদটি আনুমানিক ২৫ বছর আগে তৈরী হয়। মসজিদের জন্য জমিদান করেছিলেন তাহার আলি সরদার ও সাহারালি সরদার। গ্রামের সাহায্যে মসজিদটি চলে। মসজিদের মাতয়ালীর দায়িত্বে আছেন জনাব সাজিদুর রহমান মণ্ডল। মসজিদের ইমাম হলেন 'আবেদালী সাহেব।
মীরপুর জামে মস্‌জিদমীরপুর জামে মস্‌জিদ স্থাপিত হয় আনুমানিক ৮০/৯০ বছর আগে। মস্‌জিদের মতিয়ালী ও কমিটির সভাপতি আবদুল বারি সরদার জানালেন মসজিদ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবাদালি সরদার, সাদেক আলি সরদার, আলিমদ্দিন সরদার ও অনেকে। মস্‌জিদটি ছিল আগে মাটির, সম্প্রতি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে পাকা দোতালা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে।
দাদপুর জামে মস্‌জিদ
১৯৯৫ সালে মস্‌জিদটি তৈরী হয়। ১০ শতক জমির উপর মস্‌জিদটি স্থাপিত। গ্রামবাসীদের দানে মসজিদ চলে। মস্‌জিদের বর্তমানে মাতয়ালী মাজেদালী লস্কর। মস্‌জিদে একজন ইমাম আছেন।

দাদপুর মন্ডল পাড়া জামে মস্‌জিদ

এটি একটি পুরানো মসজিদ। আনুমানিক ১৯০৮ সাল নাগাদ মসজিদটি তৈরী হয়। মস্‌জিদের নামে কিছু ধানজমি আছে। তাছাড়া গ্রামবাসীদের চাঁদার উপর মস্‌জিদ চলে। মস্‌জিদে একজন ইমাম আছেন এবং মস্‌জিদের বর্তমান মাতয়ালী সওকাত আলি মন্ডল।

গাজির হাট জামে মস্‌জিদ

১৯৬২ সাল নাগাদ মসজিদটি স্থাপিত হয়। মস্‌জিদের নামে কিছু জমি আছে। চাঁদার উপর মস্‌জিদ নির্ভরশীল। মস্‌জিদের মাতয়ালী গোলাম রব্বানী মোল্যা। মস্‌জিদে স্থায়ী ইমাম আছেন। মস্‌জিদ কমিটির সম্পাদক আব্দুর রসিদ সাহেব।

শংকরপুর গ্রামপঞ্চায়েত (২নং)

বলবলিয়া হাফেজ সাহেব (লস্কর পাড়া) জামে মসজিদ

এই মসজিদটি প্রায় ৪৫/৪৬ বছর আগে নির্মিত হয়। মসজিদের জন্য জমি দান করেছিলেন তাবিজ লস্কর ও ইমাম বক্স মণ্ডল। আগে ছিল খড়ের চাল। সম্প্রতি ছাদ আঁটা হয়েছে। স্থানীয় ইমাম আছেন। চাঁদা তুলে বেতন দেওয়া হয়।

নোড় রাজগড়া আহ্‌লে হাদিস জামে মসজিদ

মসজিদটি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রায় ১৫০ বছর আগে তৈরী হয়। বর্তমানে দো-তালা মসজিদ। পুকুর সহ মসজিদ এলাকা প্রায় ৭/৮ কাঠা হবে। এখানে শিশুদের আরবির সাথে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়ের উৎস স্থানীয় মানুষের দান। স্থায়ী ইমাম আছেন।

গোচারণ জামে মসজিদ

মসজিদটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর আগে। আগে ছিল মাটির দেওয়াল। পরে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে একতলা ছাদ আঁটা মসজিদ তৈরী হয়। স্থায়ী ইমাম আছেন। মসজিদ কমিটি চাঁদা তুলে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ করেন।

নোড় হালদার পাড়া জামে মসজিদ

প্রায় ১২০ বছর আগে মসজিদ স্থাপিত হয়। জমি দান করেছিলেন হালদার পরিবার। আগে ছিল ইটের দেওয়াল, টালির ছাউনি। স্থায়ী ইমাম আছেন। স্থানীয় চাঁদায় ইমামের বেতন দেওয়া হয়।

নোড় নুরুল উলুম মাদ্রাসা ও মসজিদ

প্রায় ২৪/২৫ বছর আগে এই প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়। ছাত্রসংখ্যা প্রায় শতাধিক। শিক্ষক আছেন প্রায় ৮ জন। আবাসিক ছাত্র আছে ৩০/৪০ জন। থাকা খাওয়ার জন্য কোন, টাকা-পয়সা দিতে হয় না। কেবল আরবি ও উর্দু পড়ানো হয়। এখানকার মসজিদটির ১০/১১ বছর আগে ছিল ইটের দেওয়াল ও এ্যাসবেস্টস এর ছাউনি। সম্প্রতি ছাদ আঁটা হল। স্থানীয় দানে প্রতিষ্ঠান চলে।

বলবলিয়া হালদার ও লস্কর পাড়া মসজিদ

মসজিদটি তৈরী হয় প্রায় ১০০ শত বছরের আগে। উদ্যোক্তা ছিলেন মূলতঃ লস্কর পরিবার। মসজিদের সবকিছু ব্যয় নির্বাহ করেন লস্কর ও হালদার পরিবার ও কিছু ধার্মিক ব্যক্তি। স্থায়ী ইমাম আছেন।

শিখরবালী ১নং গ্রামপঞ্চায়েত

দঃ শাসন পুরাতন মস্‌জিদ

দঃ শাসনের এই মস্‌জিদটি খুবই প্রাচীন। ছোট ছোট হাতে পেটা ইটে তৈরী। এটি রাণী হর্ষমুখী স্টেটের সম্পত্তি। সব সম্পত্তির উপর ছিল প্রজাস্বত্ব। পরবর্তীকালে ঝোড়ো নস্কর ও আব্দুল হামিদ বৈদ্যের নামে দলিল পাওয়া যায়। এটি ওয়াকাফ স্টেটের মস্‌জিদ। মস্‌জিদের নামে ছিল প্রচুর সম্পত্তি। এখনও দঃ শাসন মৌজায় ১০/১২ বিঘে সম্পত্তি আছে বলে জানা গেল। সব সম্পত্তি বে দখল হয়ে আছে। জানা যায়, বারুইপুর সীতাকুণ্ডুতে (সম্ভবতঃ ফুলডুবি) এই মস্‌জিদের নামে ৪০ (চল্লিশ) বিঘে জমি বেদখল হয়ে রয়েছে। শোনা গেল কাগজে কলমে দাউদ পরিবারের জামাতা খোদার বাজার (নিশ্চিন্তপুর) এর আব্দুল জব্বার সরদার মাতোয়াল্লি।

কাছেই মজে যাওয়া আদিগঙ্গা। কিশোর বয়েসে আবু তালেব ওখান দিয়ে জাহাজ যেতে দেখেছেন । স্থানীয় একটি নাম 'হুলদি ডিবে'। ওখানে হুলদির জাহাজ বসে গিয়েছিল। এখানে ৬ বিঘে (ছয়) গোরস্থানের উপর বাঁশ বাগান রয়েছে। এই গোরস্থানে আছে ঠাসা কবর। অথচ এই এলাকায় তেমন লোক বসতি নেই। শুধু বাগান। মহামারীতে গ্রাম শূন্য হয়ে যেতে পারে। অনেকে অনুমান করেন পর্তুগীজ ও ইংরেজ জলদস্যুরা বিদেশে বিক্রির জন্য গ্রম শূণ্য করে ধরে নিয়ে গেছে। অনেকে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। সম্ভববতঃ লক্ষণ সেনের আমলের শেষ দিকে তুর্কী আক্রমণের সময় নীচু শ্রেণী ধর্মান্তরিত হওয়ায় এই এলাকায় মুসলিম জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে।

উঃ শাসন জামে মস্‌জিদ

শাসন স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় পনের মিনিটের পথ উত্তর শাসন গ্রাম। হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোট্ট একটি মুসলিম গ্রাম। নানা রকম ফলের গাছের ঘন ছায়ায় ঘিরে আছে গ্রামটি। আনুমানিক ৪/৫ শ লোকের বাস। এখানে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ছোট্ট একটি মসজিদ গড়ে ওঠে। পাশে পুকুর থাকায় দেওয়াল ও মেঝেতে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এ্যাস্‌বেস্টাস এর ছাউনি দিয়ে মস্‌জিদ বাড়ানো হয়েছে। ইমামের নাম বরিউল হালদার। বিধায়ক অরূপ ভদ্রের চেষ্টায় মস্‌জিদের পিছনে গার্ডওয়াল তৈরী হয়েছে। তা না হলে মস্‌জিদ ঘর রক্ষা পেত না।

পশ্চিম রামনগর ফলাহি মস্‌জিদ

দঃ শাসনের লাগোয়া মুস্‌লিম অধ্যুসিত গ্রাম পশ্চিমরামনগর। দঃ শাসনের মতো গ্রামটি ফলের বাগানে ঢাকা। ১৯৮০ সাল নাগাদ গ্রামবাসীদের উদ্যোগে একটি মস্‌জিদ তৈরী হয়। মস্‌জিদের মাতোওয়াল্লীর দায়িত্বে আছেন ওয়াজের সরদার। গ্রামবাসীদের চাঁদায় খরচ চলে।

পশ্চিম রামনগর ঈদ্‌গাহ্‌ মাদ্রাসা

প্রতিবছর এখানে ঈদের জামাত হয়। প্রায় ৫০ বছর আগে মাদ্রাসাটি তৈরী হয় জানা গেল। এটাকে কোচিং মাদ্রাসা বলা হয়। আরবি শিক্ষার সাথে সাথে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পঃ বঃ সরকারের সিলেবাস অনুযায়ী কোচিং দেওয়া হয়।

দঃ শাসন গাজি পাড়া মস্‌জিদ

গাজি পাড়া মস্‌জিদটি স্বাধীনতার দশকে তৈরী হয়। রাণী হর্ষমুখী স্টেটের প্রজাস্বত্ত্বের অধিকারী দবিরদ্দি গাজি জমি দান করেন। অধিকাংশ জমি জবর দখল হয়ে আছে। স্থায়ী ৬ (ছয়) বিঘা গোরস্থানের বাঁশ বাগানের আয়ে দঃ শাসনের মস্‌জিদ দুটির ব্যয়ের অনেকাংশ নির্বাহ হয়। এছাড়া আছে স্থানীয় চাঁদা, মস্‌জিদের বর্তমান মাতোয়াল্লি আহাদালী গাজি।

শিখরবালী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ইন্দ্রপালা মস্‌জিদ

ইন্দ্রপালা মস্‌জিদের কথা লেখার আগে ঐ এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে দুচার কথা লিখতে হয়। এলাকার বয়স্ক ও অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে যে তথ্য উঠে আসে তাতে জানা যায় ঃ

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের কথা। সমাজে তখন চলছে নিম্নশ্রেণীর উপর বর্ণ হিন্দুদের অবর্ণনীয় অত্যাচার। নিম্নশ্রেণীর অত্যাচারিত মানুষ দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়ে চলে আসে ইসলাম ধর্মে। নস্কর, জমাদার, সরদার, গায়েন প্রভৃতি পদবী তারই সাক্ষ্য বহন করে। এক সময় এই এলাকায় মুসলিম বসতি ছিল প্রচুর। সম্ভবতঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লেগ ও বসন্ত রোগে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। বেঁচে থাকা মাত্র চারটি পরিবারের তিনটি পরিবার কেহ মগরাহাট, কেহ রসখালি, কেহ দঃ শাসন চলে যায়। দঃ শাসনের বৈদ্য পরিবারও ওখান থেকে চলে আসেন। কেবল থেকে যান নস্কর পরিবার। বর্তমান মামুদপুর ও গাজিপুর মৌজা দুটির নাম মুসলিম নামের সাথে সঙ্গতি আছে। কিন্তু এখন ঐ দুটি মৌজায় একটি মুসলিম বাস করেনা। বর্তমান গাজিপুর মৌজার উপর দুর্গাপুর স্টেশনটি অবস্থিত। এলাকার পীরপুকুর নামে একটি পুকুর বর্তমান (আনু ১০/১২ বিঘে)। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ ঐ এলাকায় হিন্দু মুসলমান পীর পুকুরে মহাসমারোহে মাছ ধরে। এছাড়া পীরপুকুরের পাশে রয়েছে বিশাল কুবরস্থান

(প্রায় ৩২ বিঘে) যার পরিমান ২/৩ বিঘেতে এসেছে। বেদখল হয়ে রয়েছে বাকীটা। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বর্তমান গোরস্থানটি। অন্যদিকে তৈরী হয়েছে পাঁচ পীরের মন্দির ও একটি খেলার মাঠ। স্থানীয় একটি উন্নয়ন কমিটি এখন মাছ চাষের জন্য পীরপুকুর বিলি করে, তবে শর্ত ১লা বৈশাখের আগে লিজ হোল্ডারকে মাছ ধরে নিয়ে আবার ঐ পুকুরে এক কুইন্টাল মাছ ছেড়ে দিতে হয়।

ইন্দ্রাপালা মুসলিম পাড়ার লোক সংখ্যা খুবই কম – ছ - সাতশ হবে। আদি নস্কর পরিবারের পর আরও কিছু পরিবার পরে এসেছে যেমন খাঁ, মোল্লা, জমাদার, শেখ, ঘরামী প্রভৃতি। এই পরিবারগুলির মধ্যে মস্‌জিদের স্থান নিয়ে তীব্র মতভেদ থাকায় দীর্ঘদিন কোন মস্‌জিদ গড়ে উঠতে পারেনি। পরিবারগুলি নিজেদের পছন্দমত জায়গায় নামাজ পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৬৭ সালে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ এর এক ফকির বাবা ইন্দ্রপালা গ্রামে এসে হাজির হন। তারই চেষ্টায় গোষ্ঠীগুলি এক জায়গায় মস্‌জিদ তৈরীর সম্মতি দেন। সবার নিয়ে গঠিত হয় মস্‌জিদ কমিটি। মোসলেম গায়েন মস্‌জিদের জন্য দু'বিঘে পনের কাঠা জমি দান করেন। প্রতিবাড়ী থেকে একজন করে লোক মস্‌জিদ তৈরীর সাহায্যের জন্য বিভিন্ন দিকে বার হয়ে পড়েন। কারণ এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

সবার চেষ্টায় ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দ্রপালায় মাটির মস্‌জিদ গড়ে তোলা হয়। এখনও সেই মাটির মস্‌জিদ বিদ্যমান । দীর্ঘদিন মাতয়াল্লী বা মস্‌জিদ দেখাশুনার দায়িত্বে আছেন জনাব ইউনুস আলি গায়েন। মস্‌জিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা আছে। সেখানে শিশুদের আরবি শিক্ষা দেওয়া হয়।

বারুইপুর থানার শ্মশানের ইতিকথা

বিনয় সরদার

উনিশটি অঞ্চল আর পৌরসভা নিয়ে বারুইপুর থানা গঠিত। বারুইপুর থানার কয়েকটি অঞ্চলে ও পৌরসভায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ২৪ টি শ্মশান।

<u>কল্যাণপুর অঞ্চল</u>

১। হালদার চাঁদনি

২। ব্যানার্জীদের শ্মশান

৩। নস্করদের শ্মশান

৪। নস্করদেব মড়ার ক্ষেত (শ্মশান)

৫। অশ্বত্থতলা শ্মশান

৬। নস্করঘাট

<u>শিখরবালি ১ নম্বর অঞ্চল</u>

১। বংশি বটতলা

২। জংলে শ্মশান

৩। স্বাবিনী বাগান - বালি শ্মশান

৪। ভাদ্দুরিঘাট শ্মশান

<u>ধপধপি ১ নম্বর অঞ্চল</u>

১। কুমারহাট শ্মশান

২। সূর্যপুর নীলকুটি বাঁধ শ্মশান

<u>ধপধপি ২ নম্বর অঞ্চল</u>

১। সূর্যপুর নাচনগাছা শ্মশান (পশ্চিমবাহিনী ঘাট)

<u>শংকরপুর ১ নম্বর অঞ্চল</u>

১। আলমপুর শ্মশান

২। মীরপুর হাটখোলা শ্মশান

৩। শংকরপুর শ্মশান

<u>শংকরপুর ২ নম্বর অঞ্চল</u>

১। কেশবপুর শ্মশান

<u>হরিহরপুর অঞ্চল</u>

১। বৈকুণ্ঠপুর বদ্যিদের শ্মশান

২। পাতালির শ্মশান

৩। চিন্তামনী শ্মশান

৪। ভট্টাচার্য গঙ্গা

বারুইপুর পৌরসভা

১। সদাব্রত ঘাট

২। কীর্ত্তনখোলা

৩। শাসন শবদাহ মন্দির

পুরন্দরপুর গ্রামে অবস্থিত 'হালদার চাঁদনি শ্মশান' পুরন্দরপুর আদিগঙ্গা-তীরস্থ শ্মশানটির বয়স কত তা নির্ধারণ করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কারণ এই অঞ্চলে যেদিন থেকে মনুষ্য বসতি সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই এখানে শ্মশানের জন্ম। তবে এ গ্রামের শ্মশান সংলগ্ন জোড়ামন্দির চূড়ায় উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কালীচরণ শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ মন্দির দুটি নির্মাণ করেন। দক্ষিণের মন্দিরটি নারায়ণীশ্বর শিব মন্দির এবং উত্তরের শিবমন্দিরটি রামনাথেশ্বর শিবমন্দির। উক্ত কালিচরণ শর্মা ধোপাগাছির জমিদার হালদার বংশের বলে অনেকে মনে করেন। কারণ , ঐ সময় ওই অঞ্চলে শর্মা বা ব্রাহ্মণ বলতে সঙ্গতি সম্পন্ন ঐ হালদার বংশেরই অস্তিত্ব ছিল।

তাছাড়া ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলে যখন পাইক পাড়ার জমিদার রাণী হর্ষমুখীর তালুক ছিল তখন অধুনা পুরন্দরপুর গ্রামের উত্তরদিকে কিছু অংশ মধ্য সত্বভোগী জমিদাররূপে ধোপাগাছির হালদারদের অধিকার ভুক্ত ছিল। উক্ত হালদার বংশ এখানে যে শ্মশানযাত্রী ও তীর্থ যাত্রীদের জন্য চালা বা মণ্ডপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী স্থানটি হালদার চাঁদনি নামে অভিহিত হয়ে আসছে। অবশ্য সেই প্রাচীন চালা বা মণ্ডপটির অস্তিত্ব আজ আর নেই। এঁদের তৈরী মন্দিরের নিকট গঙ্গায় নামার সানের ঘাট ও তার পাশে দেবেন্দ্র নাথ হালদারের ভগ্ন স্মৃতিসৌধটির অস্তিত্ব আজও বজায় আছে। কল্যাণপুর অঞ্চলের মধ্যে এই শ্মশানটি। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এই শ্মশানে দাহকার্য হয়।

১৯৬৯ সাল থেকে শবদাহ রেজিস্টার মেনে কাজ হচ্ছে। সরকারী ভাবে রেজিষ্ট্রি হয় ১৯৭৬ সালে। এখান থেকে বার্নিং সার্ট্রিফিকেট দেওয়া হয়। এখানে শশ্মান কমিটি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে দশরকম দ্রব্যাদি-ব্রাহ্মণ ও শ্মশান পুত্র (ডোম) সহ ১২৫ টাকায় শবদাহ করা হয়। বারোমাস এখানে কাঠের ব্যবস্থা থাকে। কাঠের মূল্য আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয়। পাকা চিতার ব্যবস্থা আছে। একসাথে ৬ টি শবদাহ কার্য করা যাবে। উপরে ছাওয়া বর্ষায় কোন অসুবিধা নেই যাত্রী বসার দুটি প্রসস্থ জায়গা, কল-পায়খানা সান-বাঁধানো জলাশয়, ভিতরে একটি বিশাল কদম গাছ আছে। শ্মশানের পাশেই চারটি চায়ের দোকান যাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা এখান থেকে করা হয়। শ্মশানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে ইলেকট্রিক চুল্লী করার। শ্মশান সমিতি দ্বারা নির্মিত মহিলাদের স্নানঘর আছে।

ব্যানার্জীদের শ্মশান – পুরন্দরপুর গ্রামে অবস্থিত (কল্যাণপুর অঞ্চলের মধ্যে)

পুরন্দরপুর গ্রামের (হালদার চাঁদনি থেকে দক্ষিণে) সামান্য দক্ষিণে কল্যাণপুর রোডের পাশে কিছুটা জায়গা এক সময় উত্তর কল্যাণপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। এই পরিবারের সহস্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এখানে আদিগঙ্গার তীরে একটি পুকুর খনন করে একটি সানের ঘাট ও অন্তর্জলী যাত্রার ঘর নির্মান

করেছিলেন। স্থানটি আজও ব্যানার্জীদের গঙ্গা নামে অভিহিত হয়। তবে প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ধ্বংশাবশেষে পরিণত হয়েছে। এই শ্মশানে শুধুমাত্র ব্যানার্জীরা সৎকার করেন। এবং গঙ্গায় ব্যানার্জী বাড়ীর দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন হয়। শ্মশানের কোন কমিটি নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। পুজো বা মেলা হয় না।

নস্করদের শ্মশান - পুরন্দরপুর গ্রামে অবস্থিত (কল্যাণপুর অঞ্চলের মধ্যে)

ব্যানার্জীদের শ্মশানের সরাসরি পূর্বদিকে বর্তমানে বাইপাশ রাস্তার খালের ধারে শুধুমাত্র নস্কর বংশের সৎকার করা হত। পাশাপাশি শিমূলতলা নামক জায়গাটিতে ছোট বাচ্চাদের পুতে দেওয়া হত। আবার এই শ্মশানের দক্ষিনে বেশ কিছুটা দূরে 'মড়ার ক্ষেত' বলে একটা জায়গাতে বর্ষার সময় পোড়ানো হত। অর্থাৎ শিমূলতলার পাশের শ্মশানটিতে শুকনো কালে আর বর্ষাকালে মড়ার ক্ষেত নামক জায়গাটিতে সৎকার করা হত। বর্তমানে জায়গাটি ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় ও জনবহুল এলাকা হয়ে যাওয়ায় এবং শ্মশান দ্রব্যাদি কাঠপাতা ব্রাহ্মণ-শ্মশান পুত্র(ডোম) সমস্যা থাকায় হালদার চাঁদনি শ্মশানে সৎকার করেন। উক্ত শ্মশানের বয়স সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মত অনুযায়ী দু'শ-আড়াইশ বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

অশ্বত্থতলা শ্মশান –(বারিক পাড়া) দক্ষিণ কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত (কল্যাণপুর অঞ্চলের মধ্যে)

নস্করদের শ্মশানের দক্ষিনে, অর্থাৎ পুরন্দরপুর গ্রামের শেষে দক্ষিণ কল্যানপুর গ্রাম শুরু। আর এখানেই অশ্বত্থতলা শ্মশান। আদিগঙ্গার তীরস্থ এই জায়গাটিকে 'বুড়োনদী' নামে গ্রামের মানুষ অভিহিত করতেন। এই বুড়ো নদীর কিনারে ছিল অশ্বত্থ গাছ এখানে পূর্বে মৃত ছোট বাচ্চা ফেলে যেত। পরবর্তী সময়ে সৎকার করা শুরু হয় ঐ স্থানে। পাশে যে সানটি আছে, নির্মান করেছেন ওই গ্রামের গয়ারাম নস্কর ১৩১৩ সালে। সানে লেখা আছে, 'শ্রী শ্রী হরিনাম সত্য, শিব সত্য শ্রী গয়ারাম নস্কর, পিতা ঁঈশ্বর চন্দ্র নস্কর, শ্রী গয়ারাম নস্কর স্ত্রী শ্রীমতী গুনমনি দাসী। সাং দক্ষিণ কল্যাণপুর সন ১৩১৩ , ৪ঠা শ্রাবন। একটা পাকা চিতা নির্মাণ করে দেন শ্রীমতী পচিমনী দাসী। 'স্বগীয় বৈকুণ্ঠ নস্করের কন্যা শ্রীমতী পচিমনী দাসী স্বামী ঁ সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সাং দক্ষিণ কল্যাণপুর ১৩৭১ সাল। আছে একটি কালী মন্দির ও প্রাচীন পঞ্চানন্দ মন্দির। যাত্রী বসার একটা ঘর আছে।

এখানে সৎকার করেন চারটি গ্রামের লোক। দক্ষিণ কল্যাণপুর, নিহাটা, মধ্যকল্যাণপুর, উত্তর কল্যাণপুর, এই শ্মশানের কোন কমিটি নেই। শ্মশান দ্রব্যাদি কাঠ পাতা নিজেদের আনতে হয়। এখানে কোন মেলা বা পুজো হয় না। পাশে একটি পঞ্চানন্দ মন্দির আছে।

নস্কর ঘাট - দক্ষিণকল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত (কল্যাণপুর অঞ্চলের মধ্যে)

অশ্বত্থতলা শ্মশান থেকে দক্ষিণে সোজা মাত্র দু'শ গজ দূরে যা এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশান সহজে দেখা যায়, এই 'নস্কর ঘাট' এটিও আদিগঙ্গার তীরে নির্মিত। শ্মশানটি দক্ষিণ

কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত হলেও এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন কল্যাণপুর অঞ্চলের অধীনস্থ নিহাটা গ্রামের অরুণ নস্কর।

অরুণ নস্করের পুত্র গৌরচন্দ্র নস্কর পুরাতন শ্মশান মন্দির ও স্নান ঘাট সংস্কার করেন। তাতে লেখা আছে ওঁ তৎ সতমা পতিতদ্ধারিনী গঙ্গা দেব্যৈ নমঃ। নিহাটা ১৩৬৬। এখানে মলয়াপুর, চন্ডীপুর, নিহাটা কল্যাণপুর এমনকি ক্যানিং নদীর ওপার থেকে ও এখানে মাঝে মধ্যে দাহ করতে আসেন। দাহ করার জন্য যাত্রীদের কাঠ পাতা শ্মশান দ্রব্যাদি নিয়ে আসতে হয়। শ্মশানের বয়স ১৫০ বছর। নস্কর ঘাটের একটু পশ্চিমে 'মা স্বর্ণময়ী ঘাট'। মায়ের নামাঙ্কিত ঘাটটি সানবাঁধানো জলাশয়, পাকা-চিতা আছে। পুত্র খগেন্দ্রনাথ নস্কর ১৩৭২ সালে করেছিলেন। একটি ছাদ ঘর, স্থানীয় মানুষের আপত্তি থাকায় আজও সৎকার করা সম্ভব হয়নি।

<u>বংশী বটতলা – দক্ষিণ কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত (মৌজা -শাশন) শিখরবালী ১ নম্বর পঞ্চায়েত</u>

নস্কর ঘাটের দক্ষিণে আদীগঙ্গার তীরে দক্ষিণ কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থিত বংশীবটতলা শ্মশান। এই শ্মশানটি শিখরবালি ১নং পঞ্চায়েতের মধ্যে। বংশীবটতলা নামকরনের পিছনে যা শোনা যায়, এক সময় এক সাধু এসে এখানে থাকা শুরু করেন বটগাছের তলায়। তাঁর নাম ছিল বংশী। তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয় বংশীবটতলা। শ্মশানের বয়স অনুমান আড়াইশ বছর। এখানে আছে পাকা চিতা, যাত্রী বসার ঘর, বিশাল বটগাছ, কালীমন্দির। এই কালীমন্দির করে দিয়েছেন– স্বর্গীয় বারেন্দ্রনাথ পাত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে, পত্নী শ্রীমতী রেনুবালা পাত্র, পুত্রদ্বয় শ্রী শম্ভুনাথ পাত্র শ্রী হরিদাস পাত্র। বারুইপুর বৈশাখ ১৩৮৪ সাল। এখানে সৎকার করেন দুর্গাপুর, চন্দনপুকুর, বাগদহ, ধনবেড়িয়া, দেবীপুর, কালিকাপুর, সোনাগাছি, রামগোপালপুর, শিখরবালি ১ নং ও ২নং অঞ্চলের লোক ছাড়া ভুঁড়ু দরমহলা 'রামকৃষ্ণপুর (বিষ্ণুপুর থানা) ক্যানিং থেকে ও এখানে আসে। শ্মশানের কোন কমিটি নেই স্থানীয় ভাবে কোন পরিকল্পনা নেই। সম্প্রতি শ্মশানের পাশেই এক নতুন বাসিন্দা শুধু মাত্র কাঠ রাখেন, তাই কাঠ পাওয়া যায়। বাকি শ্মশান দ্রব্যদি ব্রাহ্মণ বাইরে থেকে আনতে হয়। প্রতি অমাবস্যায় কালীমন্দিরে পুজো হয়।

<u>জংলে শ্মশান – শিখরবালি গ্রামে অবস্থিত</u>
<u>(শিখরবালি ১ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে)</u>

সত্যিই জংলে, শ্মশানের নিস্তব্ধতা এখানে না এলে বোঝা যাবে না। জঙ্গলে ঘেরা, একটি মাত্র বটগাছ কোন কিছুই নেই একেবারে ঘর বর্জিত। বর্ষাকালে দাহকার্যের খুবই অসুবিধা। বংশীবটতলা শ্মশান থেকে অনেক দূরত্ব, দক্ষিণে শিখরবালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের পূর্বদিকে। এই শ্মশানে না আছে কমিটি না আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। শ্মশান যাত্রীদের সবকিছু এনে এখানে সৎকার করতে হয়। তিনশ বছর বয়সী শ্মশান। এখানে সৎকার করে থাকেন মূলত তিনটি গ্রামের মানুষজন। শিখরবালি, শিবসুতি, ত্রিপুরানগর। জংলে নামের কারণ জানা যায়নি। হয়ত অতীতের জঙ্গল থেকেই জংলে। যা আজও বিরাজমান।

স্মাবিনী বাগান-বালি শ্মশান – শ্রিখরবালি গ্রামে অবস্থিত (শিখরবালী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)

শিখর বালি জংলে শ্মশানের পশ্চিম দিকে এই শ্মশানটি তৎকালীন সময়ের জমিদারদের আমল থেকে সৃষ্টি হয়। মূলত চক্রবর্তীরা (জমিদার) ও নোগদেব পণ্ডিত (ব্যানার্জীরা) রা এখানে দাহ করেন। শ্মশানের কোন নিদর্শন নেই। কাঠ শ্মশান দ্রব্যাদি সব নিজেদের আনতে হয়। কোন পুজো হয় না। কমিটি নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

শিখরবালি ভাদ্দুরি ঘাট শ্মশান – শিখরবালি গ্রামে অবস্থিত (শিখরবালি ১ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

শিখরবালি গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত । আদিগঙ্গার তীরে আবার জংলে শ্মশানের দক্ষিণ প্রান্তে। দূরত্ব দুটো শ্মশানের অনেক খানি। দেড়শ বছর আগে এই শ্মশান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এক মহিলা (ডোম) তৎকালীন সময়ে এখানে থাকতেন তাঁর নাম ছিল ভাদ্দুরি । তিনি জীবিত থাকাকালীন তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয় এই ভাদ্দুরি ঘাট শ্মশান। এখানে দাহ কার্য করেন তাপুকুর, হোটর মাকালতলা (মগরাহাট থানা) ইন্দ্রপালা, বিদ্যাধরপুর, শিখরবালি প্রভৃতি-জায়গার মানুষ। এখানে পনের জনের কমিটি আছে। কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা - পুকুরে সান দেওয়া, চিতার থেকে দূরে গার্ডওয়াল দেওয়া ও টিউবওয়েল বসানো।

এই মুহুর্তে এখানে আছে বিশাল বটগাছ , যাত্রী বসার ছাদ ঘর, অশ্বত্থ গাছ, পুরাতন একটা ঘর , পাকা চিতা, (উপরে ছাওয়া নেই) কালী মন্দির , তুলসী মঞ্চ। বারুইপুর তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রথিত যশা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বিপিন ঘোষ যাত্রী বসার ছাদ ঘর করে দিয়েছেন। এখানে প্রতিবছর জৈষ্ঠ্যমাসে কালী পুজো হয়। এখানে শ্মশান যাত্রীদিগের সৎকার করার জন্য কাঠ পাতা শ্মশান দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ সব কিছু আনতে হয়। কোন রকম এখানে ব্যবস্থা নেই।

কুমারহাট শ্মশান – কুমার হাট গ্রামে অবস্থিত (ধপধপি ১ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

ভাদ্দুরীঘাট শ্মশানের পূর্ব- দক্ষিণ কোনে কুমারহাট মোড় থেকে পশ্চিম দক্ষিণ কোনে কুমারহাট শ্মশান। এই এলাকায় কুমোরদের হাট ছিল অতীতে, এবং সেখান থেকেই কুমারহাট শ্মশান নামকরণ হয়। এখানে মাত্র দুটি গ্রামের মানুষ সৎকার করেন। চাঁদখালি ও কুমার হাট গ্রামের মানুষ। শ্মশানে একটা পাকা চিতা আছে। কোন শেড নেই। দাহকার্যের সমস্ত জিনিস ও ব্রাহ্মণ যাত্রীদের আনতে হয়। কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে কোন কমিটি নেই স্থানীয় ভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নেই। কোন পুজো বা মেলা হয় না। শ্মশানের আনুমানিক বয়স দু'আড়াইশ বছর হবে।

সূর্যপুর নীলকুঠি বাঁধ শ্মশান – সূর্যপুর গ্রামে অবস্থিত (ধপধপি ১ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

কুমারহাট শ্মশানের দক্ষিণে আদিগঙ্গার তীরে এই নীলকুঠি বাঁধ শ্মশান । তৎকালীন সময়ে সাহেবদের আমলে সাহেবরা এখানে নীলচাষ করতেন, এই অঞ্চল জুড়ে হত নীলচাষ। ফলে

সেই অনুযায়ী নাম হয় নীলকুঠি বাঁধ শ্মশান। এখানে মূলত তিনটি গ্রামের মানুষ দাহকার্য করে থাকেন । ওলবেড়ে , গোপালপুর, আলিপুর আর সূর্যপুরের সামান্য অংশ। এখানে কোন কমিটি নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই স্থানীয় ভাবে। শ্মশান যাত্রীদের সৎকার করার জন্য কাঠ পাতা শ্মশান দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ সবকিছু নিয়ে আসতে হয়। এখানে আছে একটা কালী মন্দির অশ্বত্থ গাছ বটগাছ। অশ্বত্থগাছের পাশে দুটি সমাধি আছে একটি মশানি বাবা আর একটি প্রেমানন্দ গিরির। দু'জনেই সাধু ছিলেন এখানে থাকতেন। মারা যাওয়ার পর তাঁদের ভক্তরা ঐ সমাধি দুটি করে দেন। একটিতে লেখা আছে, জন্ম ১৩ই শ্রাবণ ১৩৪০ । মৃত্যু ১৭ই চৈত্র ১৩৯৬। এই সমাধিটি মশানি বাবার । এঁর মৃত্যুর পর থেকে ১৭ই চৈত্র মৃত্যুদিনে প্রতিবছর বিশাল মেলা হয় কলকাতা কামরূপ সহ ভিন রাজ্যের সাধুরা এসে এই উৎসব বা মেলা করেন। উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন।

সূর্যপুর নাচনগাছা শ্মশান (পশ্চিম বাহিনী ঘাট) নাচনগাছা গ্রামে অবস্থিত (ধপধপি ২ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

সূর্যপুর নীলকুঠি বাঁধ শ্মশানের দক্ষিণে খুব কাছে সূর্যপুর নাচনগাছা শ্মশান। নাচনগাছা গ্রাম নামের সঙ্গে বেশ রহস্য লুকিয়ে আছে। 'নাচনগাছা' গ্রামটি যথেষ্ট প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রচর্তী প্রণীত অভয়ামঙ্গল (চণ্ডিমঙ্গল) কাব্যে ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহলে বানিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে গঙ্গার দু-তীরে যে সকল গ্রাম নাম ও স্নান নামের উল্লেখ আছে সেগুলির মধ্যে 'নাচনগাছা'-র উল্লেখ রয়েছে।

("বালুঘাটা এড়াইল বেনিয়ার বালা / কালীঘাটে এল ডিঙ্গা অবসান বেলা।।

মহাকালীর চরণ পুজেন সদাগর।

তাহার মেলান বয়ে যায় মাইনগর।।

নাচনগাছা, বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া

দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া।।

ডাইনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।

ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেলা")

নাচনগাছার পশ্চিমদিকে একদা প্রবাহিত আদিগঙ্গার যে ঘাট ছিল তাকে পশ্চিমবাহিনীঘাট বলা হত। গ্রামবাসীদের মুখে আজও নামটি শোনা যায় । অধুনা এখানে একটি কালীমন্দির, শ্মশান ও কিছু সমাধিস্থল রয়েছে। আছে ছায়া ঘেরা বটগাছ, যাত্রী বসার ঘর, পরিস্কার পুকুর। ছোট ছোট করে বসার জায়গা।

নাচনগাছা ইতিহাস লব্ধ গ্রামে শ্মশানটি অবস্থিত। এই শ্মশানে জয়নগর, ক্যানিং ও বারুইপুরের একটা অংশের মানুষ এখানে সৎকার করেন। শ্মশানের মধ্যেই স্থানীয় ঘরামী পরিবারের সমাধি আছে। ছায়া ঘেরা বটগাছ যাত্রী বসার ছাদধর একদিকে বাউন্ডারী ঘেরা। বেশ

পরিপাটি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পাকা চিতা উপরে শেডকরা। এগারো জনের কমিটি আছে। সভাপতি মন্টু রায়, যুগ্ম সম্পাদক তপন ঘরামী , সুভাষ নস্কর। শ্মশানে অমলা নামে এক মহিলা ডোম আছে। ব্রাহ্মণ কাঠ শ্মশান দ্রব্যাদি সব যাত্রীদের বাড়ী থেকে এনে সৎকার করতে হয়। এখানে বারুনী - দোল উৎসব ও কালীপুজো হয়। শ্মশানটি সূর্যপুর হাটের বাস রাস্তার পাশেই।

আলমপুর শ্মশান – আলমপুর গ্রামে অবস্থিত (শংকরপুর ১ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

কুমোরহাট মোড় থেকে পশ্চিমে ঢুকে মীরপুর পোলের গা ধরে পূর্বদিকে আদিগঙ্গার একেবারে গায়ে এই আলমপুর শ্মশান। এখনই চৈত্রমাসে কানায় কানায় জল চিতার পাশ বরাবর। হ্যাঁ, শ্মশানের নিস্তব্ধতা এই আলমপুর শ্মশানে এলে বেশ বোঝা যায়। শ্মশানের অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়ী নেই। বাগানে ঘেরা নিস্তব্ধতা। একেবারেই শুনশান। একটা মাত্র পাকা চিতা উপরে শেড নেই, যাত্রী বসার ঘর নেই। স্থানীয় ভাবে একটা যাত্রীবসার ঘর ভিত থেকে ফুট দুই গাঁথা অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে আছে। গরীব এলাকা হওয়ায় আর কোন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ষার সময় ছাতামাথায় ধরে শব পোড়াতে হয়। অনেক দূর পর্যন্ত কোন দোকান নেই। গরীব এলাকা হওয়ায় উন্নয়নের কোন ছোঁয়া নেই। কমিটি নেই। শবদাহ করার জন্য যাত্রীদের সবকিছু আনতে হয়। কোন ঠাকুরের থান নেই তাই কোন পুজো হয় না। মাথার উপরে কোন গাছ নেই। শ্মশানের বয়স স্থানীয় মানুষের কথায় প্রায় দুশো বছর হবে। এখানে মীরপুর ও আলমপুর দুটি গ্রামের মানুষ সৎকার করেন।

মীরপুর হাটখোলা শ্মশান – মীরপুর গ্রামে অবস্থিত শংকর পুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে

মীরপুর পোল থেকে সামান্য দক্ষিনে মীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন থেকে ইটের রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে বেশ ভিতরে এই শ্মশানটি। শ্মশানের সঙ্গেই বড় মাঠের ন্যায় জায়গা বেশ খোলা মেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অতীতে এই মাঠে হাট বসতো, জায়গাটা দেখে তা অনুভুত হয়। হাট বসার প্রেক্ষিতে জায়গাটার নাম হয় হাটখোলা। শুধুমাত্র ঐ জায়গাটাটুকু। গ্রামের নাম 'মীরপুর'। পাড়ার পাশেই শ্মশান। এখানে -মীরপুর, শিবরামপুর, খানপুর ও দৌলতপুর এই চারটি গ্রামের মানুষ এখানে সৎকার করেন। এখানে এগারো জনের কমিটি আছে। এখানে আছে পঞ্চানন্দ মন্দির; কালী মন্দির যাত্রীবসার ঘর, পাকা চিতা সান আছে ও একটা বড় বটগাছ আছে যা দীর্ঘ জায়গা জুড়ে ছায়া ঘেরা থাকে।

কার্ত্তিক মাসে কালীপুজো ও পঞ্চানন্দ পুজো হয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা -টিউব ওয়েল বসানো মন্দির সংস্কার করা ও শবদাহের জায়গায় গার্ডওয়াল দেওয়া। এখানে কমিটি থাকলেও কাঠ পাতা শ্মশান দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ এর ব্যবস্থা নেই। সব কিছু যাত্রীদের আনতে হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী শ্মশানের বয়স হবে দু'শ বছর।

শংকরপুর শ্মশান – শংকরপুর গ্রামে অবস্থিত (শংকরপুর ১নং পঞ্চায়েতের মধ্যে)

মীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সরাসরি দক্ষিণে শংকরপুর হাটের মধ্য দিয়ে গিয়ে এই

শ্মশানটি। বারুইপুর থানার চব্বিশটি শ্মশানের মধ্যে এই শ্মশানটি অন্যতম। অন্যতম এই জন্যে বৈষম্যের ছোঁয়া তীব্রভাবে এখানে লক্ষনীয়। আমরা লেখাপড়ার মধ্য শিখেছি বা জেনেছি, 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি', বা শ্মশান হল সাম্যের স্থান। কিন্তু এই শ্মশান হল অসাম্যের পীঠস্থান। দু'দিকে জলাজমিতে মরসুমি সব্জিচাষ তার মাঝখান থেকে গ্রামের মেঠো রাস্তা চলেগেছে, রাস্তা চওড়া হবে প্রায় দশ পনের ফুট। রাস্তার পূর্বদিকে চিতাটি ব্রাহ্মণদের দাহ করবার জন্য। ঐ চিতার সরাসরি পশ্চিমদিকের চিতাটি সাধারণ মানুষ বা ছোট জাতের মানুষের দাহ করবার জন্য। ভাবলে অবাক হতে হয় দুহাজার তিন সালে দাঁড়িয়ে বারুইপুর থানার মাটিতে এরকম একটি চিত্র দেখে। এই স্মশানের হাল কেমন ? মাত্র তিন-চারটি আমগাছ আছে, আর এর তলায় দুটো কাঁচা চিতা। আর কিচ্ছু নেই। একটা ছোট্ট ইটের টুকরো পর্যন্ত নেই। অথচ গূঢ় ভাবে আছে জাতি বৈষম্য। দু'শ বছর ধরে এমনই বৈষম্যের ধারা বহন করে চলেছে। এখানে না আছে কোন কমিটি, না আছে কোন ব্যবস্থা। শুধুই ধুধু শ্মশান। এখানে - দৌলত পুর, খানপুর, শংকরপুর, গাজিরহাট এই চারটি গ্রামের মানুষ সৎকার করে থাকেন।

<u>কেশবপুর শ্মশান – কেশবপুর গ্রামে অবস্থিত (শংকরপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্যে)</u>

জাতি বৈষ্যমের (শংকরপুর শ্মশান) দক্ষিণে কেশবপুর গ্রাম। আর এই গ্রামে অবস্থিত শ্মশান। খালের ধারে এই শ্মশানটির বয়স হবে প্রায় তিনশ বছর। শুধু মাত্র কেশবপুর গ্রামের মানুষের দাহকার্য হয়। এই শ্মশানের ও কোন কিছুই নেই। খোলা আকাশের নীচে সৎকার হয়। এখানে বেশ অভিনব জিনিস লক্ষনীয়। এলাকায় ঠিকঠাক ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বসে বট বা অশ্বত্থ পাতায় মন্ত্র লিখেদেন সেই পাতা শবদেহের উপর রেখে দিয়ে দাহ কার্য সমাপন্ন করেন। শ্মশানের ভবিষ্যৎ নেই। পরিকল্পনা নেই। কমিটি নেই। কোন কিছুই এখানে হয়না।

<u>বৈকুণ্ঠপুর বদ্যিদের শ্মশান – বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে অবস্থিত (হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)</u>

শ্মশান সম্পর্কিত লেখার শুরুতে 'হালদার চাঁদনি' ছিল। এই শ্মশানের পর শুধু দক্ষিণদিকের শ্মশান'র কথা বলা হয়েছে। এবার একটু উত্তর দিকের কথা বলব। উত্তর দিক অর্থে হালদার চাঁদনি শ্মশানের উত্তর দিকের শ্মশানের কথা। হালদার চাঁদনি শ্মশানের পাশেই 'বারুইপুর কলেজ'। কলেজের পিছন থেকে শুরু হয়ে গেল হরিহরপুর অঞ্চল। বারুইপুর কলেজ বা হালদার চাঁদনি শ্মশান থেকে সামান্য উত্তরে 'বৈকুণ্ঠপুর বদ্যিদের শ্মশান'। এই শ্মশানে বিড়াল মাঝের পাড়া ও বৈকুণ্ঠপুর দুটি গ্রামের মানুষ সৎকার করে থাকেন। বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বদ্যিদের প্রতিষ্ঠিত শ্মশান। শ্মশানের শুরুর সময়কাল ঠিক না জানা গেলেও লোক কথায় প্রকাশ পায় দেড়-দুশ বছরের কথা। একটা শ্মশান দেবীর ঘর আছে যা যাত্রী বসার পক্ষে সহায়ক। শ্মশানের উত্তর দক্ষিণ দিকে দুটি সান বাঁধানো পুকুর আছে বৃহৎ গ্রামের মানুষ দুটি পুকুরে স্নান করেন। একটা তুলসি মঞ্চ আছে। দক্ষিণ দিকের সানে ও তুলসি মঞ্চে লেখা আছে, 'হরিনাম সত্য- তুলসি স্থাপিতং যত্রহরি তত্রৈব তিষ্ঠতি।' সন ১৩২১ – ১৬ই ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত গৌর মোহন দাস – বিড়াল। শ্মশানের কোন কমিটি নেই। ভবিষ্যৎ

কিছু নেই। দাহকার্যে ব্রাহ্মণ সহ যাবতীয় জিনিসপত্র যাত্রী দিগের আনতে হয়।

<u>পাতালির শ্মশান – বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে অবস্থিত (হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)</u>

বৈকুণ্ঠপুর বদ্যিদের শ্মশানের সরাসরি উত্তরদিকে পাতালির শ্মশান। শ্মশানটি চৌমাথায় অবস্থিত। জন বহুল এই রাস্তা (শ্মশানের ধার দিয়ে) দিয়ে যেতে হয় গোবিন্দপুরের দুটো উচ্চ বিদ্যালয়ে। শ্মশানের পাশেই পয়লা বৈশাখে দীর্ঘ বছর ধরে পাতালিদের উদ্যোগে গোষ্ঠ পালিত হয়।

শ্মশানের কোন লোক কথা নেই। এখানে সৎকার করেন মূলত তিনটি গ্রামের মানুষ। বৈকুণ্ঠপুর, রায় পাড়া, ঘোষ পাড়া ও কিছু অন্যান্য দিক থেকে আসেন। শ্মশানের প্রতিষ্ঠাতা কেষ্ট পাতালি। শ্মশানের আনুমানিক বয়স হবে ৯০ বছর। এখানে ১১ জনের কমিটি আছে। সম্পাদক অশোক দাস , সভাপতি - গোষ্ট বিহারী পাল। কমিটি নাম করণ করেছেন 'বৈকুণ্ঠপুর সৎকার সমিতি ও মহাশ্মশান।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা , বাউন্ডারী দেওয়া বড় বটগাছের পিছনে পোড়ানোর ব্যবস্থা, যাত্রী বসার জায়গা, নীচু জায়গা উঁচু করা। কমিটি দেখাশুনা করলেও সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। শবদাহের জন্য ব্রাহ্মন, কাঠ ও শ্মশান দ্রব্যাদি যাত্রীদের আনতে হয়। শ্মশানে আছে একটা কালী মন্দির ও বড় বটগাছ। এখানে কালী পুজো হয়।

<u>চিন্তামনী শ্মশান — বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে অবস্থিত (হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)</u>

পাতালির শ্মশানের উত্তরে একই রাস্তা ধরে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চিন্তা মনি শ্মশান। শ্মশানটি বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থিত হলেও সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুরের (পাতকোতলা) বিশ্বাস পরিবারের মানুষ শ্মশানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিদর্শন স্বরুপ শ্মশানের পাশেই একটি (বর্তমানে ভঙ্গুর অবস্থা) যাত্রী নিবাস থেকে বোঝা যায়। যাত্রী নিবাসে পাথরে খোদাই করে লেখা আছে 'চিন্তামনি শ্মশান ঘাট' (১৩০০) "চিন্তা মনি বিশ্বাস, গোবিন্দ পুর' (সংস্কার ১৩৩১)। বিশ্বাস পরিবারের ৭০ বছর বয়সী সমীর বিশ্বাস শ্মশানের বয়স বলতে পারেন নি। তবে জনশ্রুতি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব আদিগঙ্গার তীরে তীরে দ্বারীর জাঙ্গাল ধরে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে সপার্ষদ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বারুইপুর পুরাতন বাজার সংলগ্ন অনন্ত আচার্যের কুটিরে আগমনের পূর্বে দক্ষিণগোবিন্দপুরের এই 'ছিটে ঘাটার' পাশে (চিন্তামনি) স্নানাহার করে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই স্মরণে আজও এখানে চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে বারুনী মেলা উদ্যাপন হয়। এই শ্মশানে লাঙ্গলবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, রায়পাড়া, গোবিন্দ পুর (সোনারপুর থানা) এবং বৈকুণ্ঠপুর (বারুইপুর থানা) গ্রামের মানুষ এখানে সৎকার করেন। শ্মশানে একটি সমাধি আছে। 'মা' সীতারাম শ্রী শ্রী দুর্গামণি দেবী সমাধিস্তম্ভ ২০শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৪০ সাল, তারামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।" বিশ্বনাথ মণ্ডল এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জয়বতী মণ্ডল পত্নী। দক্ষিণ গোবিন্দপুর ১লা বৈশাখ ১৪০৪ শ্রী শ্রী সর্বেস্বরী" তারা নামে আর একটি মন্দির। বর্তমানে শ্মশানে ২৫ বছর ধরে আছেন ভৈরবানন্দনাথ নামে এক প্রতিবন্ধী সাধু। পুজার্অর্চনা নিয়ে থাকেন। শ্মশানে প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন মহাধুমধামে পুজা হয় ও ভোগ বিতরণ করা হয়।

এখানে আর একটি সমাধিস্থ্ ঘর আছে যাঁর নাম গোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫১ বছর বয়সে মারা যান না পুড়িয়ে সমাধিস্থ্ করা হয়। বাড়ি ছিল গোবিন্দপুরে।

এই শ্মশানের কোন কমিটি নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। কোন কোন মানুষ কারুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু করে থাকেন। শ্মশান যাত্রীদের এখানে ব্রাহ্মণসহ সব কিছু এনে সৎকার করতে হয়।

ভট্টাচার্য গঙ্গা – খাসমল্লিক গ্রামে অবস্থিত (হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)

পাতালির শ্মশানের পূর্ব দিকে একেবারে কাছে উইনার বিস্কুট কারখানার পিছনে এই শ্মশান। গোবিন্দপুরের ভট্টাচার্যিরা প্রতিষ্ঠা করেন শ্মশান। শ্মশানের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা যায়নি। এখানে সৎকার করা হয় – হরিহরপুর, ডিহিমেদনমল্ল, মাটিপাড়া, ঘোষপাড়া, খাসমল্লিক ও বেনেডাঙ্গা গ্রামের মানুষের। ১১ জনের কমিটি আছে যুগ্ম সম্পাদক – গঙ্গারায়– রবীন সরদার, সভাপতি জীবন চক্রবর্তী। এখানে ১৪০৪ সাল থেকে প্রতিবছর চৈত্রমাসে ২৩-২৬ তারিখ চারদিন মেলা হয়। শ্মশানের নিজস্ব ব্রাহ্মণ নেই। শ্মশান দ্রব্যাদি সহ সব কিছু যাত্রীদের আনতে হয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – শ্মশান স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রি করা। এখানে কালীমন্দির, যাত্রী বসার জায়গা ও গঙ্গায় ভাল সান আছে।

সদাব্রত ঘাট – ৮নং ওয়ার্ড (বারুইপুর পৌরসভার মধ্যে)

বারুইপুর থানার ১৯টি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেমন ২৪ টি শ্মশান আছে, তেমনি ভাবে বারুইপুর পৌরসভার মধ্যেও শ্মশান আছে। সদাব্রত ঘাট ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। সদাব্রত ঘাট সম্পর্কে যা জানা যায় – রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হরপার্বতীমঙ্গল' ও দুর্গামঙ্গল কাব্যের আখ্যান অনুযায়ী রাজপুর থেকে রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী সর্বপ্রথম বারুইপুরে আসেন এবং শ্রী চৈতন্যদেবের পদস্পর্শে ধন্য অনন্ত আচার্যের আশ্রমের সামান্য দক্ষিণে আদিগঙ্গার ঘাটে একলক্ষ বিঘা জমিদান করে সদাব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই কারনে ঘাটটির নাম হয় সদাব্রত ঘাট। ঠাকুর বিসর্জনের ঘাট রূপে সদাব্রত ঘাট খুবই পরিচিত। প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভৈমী একাদশীব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এখানে উৎসব হয় ও হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের সমাগমে এখানে একটা বড় মেলা বসে। এখানে এই সদাব্রত ঘাটে কেবলমাত্র বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের শবদাহ হয়। দাহ করবার যাবতীয় দ্রব্যাদি নিজেদের আনতে হয়। এখানে কোন ব্যবস্থা নেই। সদাব্রত ঘাটের যে সান আছে তার পূর্ব দিকে একটা বড় বট গাছ আছে ও 'আদ্যাশক্তি আনন্দময়ী আশ্রম ও নবগ্রহ মন্দির ' এবং পশ্চিম দিকে টালির চালের কালিমন্দির ও বটঅশ্বত্থ্ একসাথে বড় গাছ একটি আছে। 'আদ্যাশক্তি আনন্দময়ী আশ্রম ও নবগ্রহ মন্দিরের পূজারী ও প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ দাস নিয়মিত পূজা করেন।

কীর্ত্তনখোলা – বারুইপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড

অধুনা বারুইপুর পৌরসভার দক্ষিণ প্রান্তে ও সদাব্রত ঘাটের দক্ষিণ প্রান্তের শ্মশানটি হল কীর্ত্তনখোলা। এটি আদিগঙ্গার প্রবাহে পূর্বতীরে অবস্থিত শুধু একটি শ্মশান নয়। মহাপ্রভু শ্রী

চৈতন্যদেবের পদস্পর্শে ধন্য একটি ঐতিহাসিক স্থান ও বটে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচল অর্থাৎ পুরী যাত্রাকালে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব সপার্ষদ দারীর জাঙ্গাল নামে আদিগঙ্গার তীর ধরে বিস্তৃত একটি প্রাচীন পথ ধরে কীর্ত্তন করতে করতে বর্তমান বারুইপুর পুরাতন বাজার সংলগ্ন প্রাচীন আটিসারা গ্রামে বৈষ্ণব সাধু-অনন্ত আচার্যের আশ্রমে উপনীত হন। এবং এখানে একরাত্রি অতিবাহিত করার সময় এখান থেকে কিছুটা দক্ষিণে উক্ত কীর্ত্তনখোলা নামে একটি খোলামেলা স্থানে তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তন করেছিলেন। এই ঘটনার অনুসঙ্গে স্থানটি কীর্ত্তনখোলা নামে খ্যাত। অন্যমতে কীর্ত্তন করার সময় কীর্ত্তন দলের খোলটি ভেঙে গিয়েছিল। তাই স্থানটি কীর্ত্তন খোলা। মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত আদিগঙ্গার তীরস্থ এই স্থানটি পরবর্তীকালে শ্মশান গড়ে ওঠে।

এই শ্মশানে বারুইপুরের প্রথিতযশা ব্যক্তি সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চিতা ভস্ম নিয়ে একটি স্মৃতিসৌধ করেছেন। "ॐ সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় , প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার গীতিকার বিপ্লবী", জন্ম ২১শে কার্ত্তিক ১৩০৭, মৃত্যু - ১৪ই আশ্বিন ১৪০৫ 'শায়িত আছে তাঁর চিতাভস্ম'। ভস্মসৌধ উদ্বোধক মাননীয় পৌরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ সেন। সভাপতি – বিকাশকুমার দত্ত, পৌর প্রতিনিধি ৮ নং ওয়ার্ড, বারুইপুর পৌরসভা। ৯ই জানুয়ারী ২০০০ সাল। বর্তমান পৌরবোর্ড বিধায়ক অরূপ ভদ্রের উন্নয়ণ তহবিলের অর্থে এই শ্মশানের আমূল সংস্কার করা হয়। এখানে গৌর-নিতাই-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শ্মশানটি বারুইপুর পৌরসভা দেখাশোনা করে। পৌরসভা দেখাশোনা করলেও সব কিছুর ব্যবস্থা এখন ও করে উঠতে পারেনি। টেন্ডার পদ্ধতিতে শ্মশান চলে। এই মুহূর্তে যিনি টেন্ডার নিয়েছেন, সেই অনিল মিত্র জানালেন শুধুমাত্র এখানে কাঠ পাতার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ বা শ্মশান দ্রব্যাদি সব যাত্রীদের ব্যবস্থা করে নিতে হয়। বার্ণিং সার্টিফিকেট পৌরসভা থেকে দেওয়া হয়। এখানে সাতটা থানার লোক দাহ করে থাকেন। মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর , ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা ও সন্দেশখালি থানা।

পাকা চিতা উপরে শেড আছে দুজন দাহ করা যায়। কল, পায়খানা, বাথরুম, আলো, পুকুরে সানের ঘাট, কদমগাছ, যাত্রী বসার ঘর, কাঠপাতা রাখার ঘর ও দুটো অন্য ধরনের গাছ আছে। এখানে খুব ছোট মৃত বাচ্চাদের পোতা হয় গঙ্গার আশেপাশে, এক্ষেত্রে ১৫ টাকা ট্যাক্স নেওয়া হয়। চা ও খাবারের দোকান কয়েকটা আছে। বাস রুটের গায়েই 'স্বর্গীয় মাতা নিবারণী দাসী, স্বর্গীয় পিতা যদুনাথ নন্দীর আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক ॐ গঙ্গা দেবীর ঘাট ও কালী মন্দির নির্মিত হইল। বারুইপুর ১৩৩৮ সাল।'

<u>শাসন শবদাহ মন্দির — শাসন গ্রামে অবস্থিত (বারুইপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে)</u>শাসন শবদাহ মন্দির ১৩৪৪ সালে প্রতিষ্টা করেন শাসনের জমিদার কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষজন এখানে দাহ করেন। শ্মশানটি শাসন রেলস্টেশনের কাছেই দক্ষিণ দিকে। এখানে যাত্রীদের কাঠ, ব্রাহ্মণ শ্মশান দ্রব্যাদি সব নিয়ে আসতে হয়। এখানে শ্মশান কমিটির ইচ্ছা আছে গার্ডওয়াল, পাকা চিতা, বসার জায়গা করার। এখানে দোল উৎসব হয় নাম সংকীর্ত্তন ও হয়।

তথ্যসূত্র

১। মৌন মুখর   ডঃ কালিচরণ কর্মকার

২। চব্বিশ পরগনা প্রত্ন ইতিহাস সম্মেলন — বারুইপুর , ২০০২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রত্ন – ইতিহাস চর্চা সমিতি বারুইপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা – সম্পাদক– কৃষ্ণকালী মণ্ডল

'গ্রামনামের উৎস সন্ধানে নাচনগাছা' ডঃ কালিচরণ কর্মকার (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

৩। বারুইপুর শিশু বইমেলা (২০০২) প্রাঙ্গণ সংলগ্ন স্থানিক ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত রূপরেখা) ডঃ কালিচরণ কর্মকার

এছাড়া স্থানীয় ভাবে বয়সী মানুষ মৌখিক তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন –

১। কৃষ্ণপদ মণ্ডল — পুরন্দরপুর   ২। ভোলানাথ মণ্ডল – উত্তর কল্যাণপুর

৩। চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী –   ৪। আনন্দ নস্কর – পুরন্দরপুর

৫। সহদেব নস্কর – দক্ষিণ কল্যাণপুর   ৬। গৌরচন্দ্র নস্কর – নিহাটা

৭। স্বপন ব্যানার্জী, গঙ্গা রায়-খাসমল্লিক   ৮। রতন পাতালী – বৈকুণ্ঠপুর

৯। নীলমনি মণ্ডল – বৈকুণ্ঠপুর   ১০। ভৈরবানন্দ নাথ – বৈকুণ্ঠপুর

১১। শৈলেন্দ্রনাথ দাস - দক্ষিণ কল্যাণপুর   ১২। অনাথ মণ্ডল – কুমারহাট

১৩। সুনীলচন্দ্র সরদার – আলমপুর   ১৪। কালীদাসী মণ্ডল – মীরপুর

১৫। গদাধর মহাত্মা – কেশবপুর   ১৬। সমতুল মণ্ডল – সূর্যপুর

১৭। ভীমচন্দ্র হালদার – সূর্যপুর   ১৮। অতুল চন্দ্রমণ্ডল – শিখরবালি

১৯। কালিপদ প্রামানিক – শিখরবালি   ২০। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় – শাশন

২১। অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - শিখরবালি   ২২। ভূধর দাস – বৈকুণ্ঠপুর

এছাড়া আমার সঙ্গী ছিল— বিশ্বজিৎ দাস – বিড়াল, নাসির শেখ – সালেপুর, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স কৃষ্ণপদ মণ্ডলের ৯৩ বছর।

বারুইপুরের ভূত্বক — একটি সমীক্ষা

অদিতি দাস

বারুইপুর অঞ্চলের ভূত্বক অর্থাৎ মাটি সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তথা দক্ষিণবঙ্গের মাটি কিভাবে সৃষ্টি হলো তা জানা প্রয়োজন। ভূতাত্ত্বিকভাবে বিবেচনা করলে, দক্ষিণবঙ্গের মাটি অর্থাৎ ভূত্বকের উপরিভাগ সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ গঙ্গাবিধৌত পলিমাটি দিয়ে। গঙ্গা তার দীর্ঘ প্রবাহের শেষ অংশে অর্থাৎ সমুদ্রে মিলিত হওয়ার আগে স্রোতে বয়ে আনা ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমিভাগের বালি, পলি, কাদা ও অন্যান্য অংশ বহনে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত পদার্থের অধঃক্ষেপ ঘটিয়ে যে বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সেটিই দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি নামে পরিচিত। ভূতাত্ত্বিকদের মতে – কোনো নদী প্রতি মাইলে ৫ ইঞ্চি নিম্নগামী হলে পলি বহন করে নিয়ে যেতে পারে। গাঙ্গেয় উপদ্বীপে অর্থাৎ গঙ্গার প্রবাহের শেষ অংশে নদীর নিম্নগামিতা এরও কম হওয়ার ফলে এই বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্তের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর অঞ্চলের মাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। বারুইপুর মহকুমা অঞ্চলের অধীনে ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত অজস্র গ্রামের প্রত্যেকটির মাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের আলোচনা মূলতঃ বিভিন্ন অঞ্চলের আকৃতি এবং প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন মাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

বারুইপুর অঞ্চলের মাটির গভীরতা ৩০০০ মিটারের বেশী। বারুইপুরের দক্ষিণে জয়নগর থানার বকুলতলায় ১৯৭৫ – ৭৭ সালে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানীর (O.N.G.C) ড্রিলিং-এর সময় ৩৭০ মিটার পর্যন্ত মাটির স্তর লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বারুইপুর অঞ্চলে যে মাটি দেখতে পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ গাঙ্গেয় নবীন পলি যেটি দোআঁশযুক্ত অর্থাৎ বালি ও কাদার আনুপাতিক মিশ্রণে তৈরী । কিছু জায়গায় সমুদ্রের সান্নিধ্য এবং বৃষ্টিজাত জলের খনিজ এই মাটির উপরে লবণের সাদা প্রলেপ দিয়েছে এবং অবধারিত ভাবেই মাটির কেবল রূপ নয়, প্রকৃতিও পালটে গিয়েছে। যার ফলে এখানকার সাধারণ আম, জাম, কাঁঠালের পরিবর্তে এসব জায়গায় ঝাউ, সুন্দরী, গরাণ এসব গাছপালা চোখে পড়ে। এখানে গাঙ্গেয় পলি পাওয়ার প্রধান কারণ গঙ্গা তথা ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ (যেটি এই অঞ্চলে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত এবং বর্তমানে প্রায় লুপ্ত অথবা মজে-যাওয়া জলধারা) এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বহমান ছিল। এখানে জমির ঢাল খুবই কম - একে সমতলভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ব-দ্বীপ অঞ্চলের এই সমভূমি বাগড়ী অঞ্চল নামে পরিচিত। মূলতঃ গঙ্গা এবং তার শাখানদী বিধৌত এই অঞ্চলকে ভূমির গঠন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ১) মৃতকল্প ব-দ্বীপ অঞ্চল , ২) পরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং ৩) সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল। বারুইপুর অঞ্চলটি পরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ এখানে ভূ-ভাগ গঠনের কাজ সম্পূর্ণ।

ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, বারুইপুরের অধিকাংশ অঞ্চলের (যেমন বিড়াল,

বৈকুণ্ঠপুর, পুরন্দরপুর, কল্যাণপুর, ধোপাগাছি, সীতাকুণ্ডু, আটঘরা, শাসন, মদারাট, ডিহিমেদনমল্ল, রামনগর, ধপধপি, খোদারবাজার, কুন্দরালি, দুর্গাপুর, দুধনই, বলবন, চণ্ডীপুর, নিহাটা প্রভৃতি গ্রামের) ভূত্বকের উপরাংশ দোআঁশ মাটিতে তৈরী। এই দোআঁশ মাটির স্তরের গভীরতা ১ থেকে ২ ফুট, এর নীচে ১৪-১৫ ফুট গভীরতা থেকে ২২ – ২৩ ফুট পর্যন্ত লালচে আঁটল কাদা অথবা বালি মেশানো লালচে কাদা দেখা যায়। অর্থাৎ এই অঞ্চলে মূলতঃ বেলে, এঁটেল এবং দোআঁশ মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এই মাটিতে পাথর ও কাঁকর নেই। মাটির এই লালচে রঙ সম্ভবতঃ মাটিতে ফেরিক স্তরে লোহার উপস্থিতির জন্য। মাটির উপরের ১—২ ফুট গভীর অংশের বৈশিষ্ট্য নীচে বলা হলো।

মাটির নমুনা সংগ্রহের অঞ্চল ঃ বৈকুণ্ঠপুর, হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। বালি ১৬.২০ % , কাদা ২৭.৩০ %, পলি ৫৬.৫০ %, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫৬, ঘনত্ব ১.২৫ গ্রাম /ঘনসেমি, জলধারণ ক্ষমতা ৫৩.৮০ %, জৈবিক কার্বন ০.৭২৯ %, নাইট্রোজেন ০.০৭৮ %, ফসফরাস ৩০ কেজি / হেক্টর, পটাশিয়াম ২৬০ কেজি / হেক্টর, অম্লমাত্রা / ক্ষারমাত্রা (pH) ঃ ৬.০ অর্থাৎ এই ধরনের মাটি অল্প পরিমাণে আম্লিক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মাটির pH ৭-এর কম হলে তাকে আম্লিক এবং ৭-এর বেশী হলে তাকে ক্ষারীয় বলা হয়। উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে উর্বরা দোআঁশ মাটির গড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা উচিত কারণ মাটির প্রকৃতি, বিশেষ করে রাসায়নিক প্রকৃতি মরশুমের সাথে বদলায়।

বারুইপুরের মাটির অংশবিশেষে উপর থেকে প্রায় ২০ ফুট নীচে কালচে বাদামী স্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই কালচে বাদামী স্তরের উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায় যে, উদ্ভিদজাত পদার্থের স্তর জলাভূমিতে জমাট বেঁধে উপরের পলির চাপে ও ভূগর্ভস্থ তাপের ক্রিয়ায় এই পীটস্তরের সৃষ্টি হয়েছে। পীট হল গাছপালার অবশেষ থেকে কয়লার রূপান্তরকালের প্রাথমিক অবস্থা। এর দাহিকাশক্তি খুবই নগণ্য হলেও কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা একে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করেন। এই ধরনের মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপস্থিতির জন্য এদের রঙ কালো। মাটিতে অম্লভাব বেশী হওয়ার কারণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থের বিজারণ। এই ধরনের মাটির বৈশিষ্ট্য নীচে বর্ণনা করা হলো।

মাটির নমুনা সংগ্রহের অঞ্চল ঃ উত্তরভাগ (বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত)। এই মাটি ওজনে অন্য মাটির তুলনায় ভারী, ভঙ্গুর, ঔজ্জ্বল্যহীন, উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপস্থিতির চিহ্ন বর্তমান, জলীয় পদার্থ বেশী , আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.১, বালি ও কাদার তুলনায় পলির ভাগ অনেক বেশী, জৈব কার্বন ৫০%-এর বেশী, হাইড্রোজেন ৬ %, অক্সিজেন ৩৫.৩ %, নাইট্রোজেন ১.৭ %- ২%, দাহিকাশক্তি ১৩০০০ – ২০০০০ কিলো জুল / কেজি, অম্লমাত্রা /ক্ষারমাত্রা ৩.৫, এই মাটি দহনের ফলে ২০ % বা তার বেশী ছাই উৎপন্ন করে।

মূলতঃ গঙ্গার নবীন পলি দিয়ে গঠিত হলেও বারুইপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে এই নবীন পলির মাঝে লোনামাটিও (যেমন মলঙ্গা, ভুরকুল, টগরবেড়িয়া, মধুবনপুর, আকনা, বেগমপুর, পুঁড়ি, বেতবেড়িয়া, চম্পাহাটি, কামরা প্রভৃতি গ্রামে) দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার স্রোতোধারা

এবং সাগরের অবস্থান প্রাচীনকালে ভিন্ন হওয়ার কারণে জোয়ারের সময় আসা লোনাজল আটকা পড়ে অথবা এক জায়গায় বহু সময় ধরে জল সঞ্চিত হয়ে থাকার কারণে এই লোনামাটির সৃষ্টি। এই জাতীয় মাটিতে যেখানে লবণাক্ত ভাব খুব বেশী, সেখানে সাধারণতঃ গাছপালা জন্মায় না। অনেক ক্ষেত্রেই জমির উপর নুনের সাদা স্তর দেখতে পাওয়া যায়। মাটির লোনাভাব ঋতুর সঙ্গে বদলায়। লোনাভাব সবচেয়ে বেশী হয় মে মাসের মাঝামাঝি, তারপর বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে । কখনো কখনো এর ফলে মাটির উপরের স্তরের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা খুব বেড়ে যায় (৩০ মো/সেমি কিংবা তারও বেশী, ২৫^{0}C তাপমাত্রায়)। কিন্তু নীচের স্তরে এই পরিবাহিতা বেশ কম (৬ – ১০ মো /সেমি)। এই মাটির জলদ্রাব্য লবণগুলি সাধারণতঃ সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট যৌগ। কম পরিমাণে এই মৌলগুলির বাই কার্বনেটের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কার্বনেট লবণ একেবারেই পাওয়া যায় না। মাটিতে জলদ্রাব্য এই সোডিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম লবণগুলি থাকার ফলে এবং এই মৌলগুলির পরস্পরের প্রতিস্থাপনযোগ্য হওয়ার কারণে কাদার উপস্থিতিতে এই মাটি খুব চটচটে হয় আর জলবিহীন অবস্থায় শুকনো, শক্ত হয় এবং ফাটল দেখা যায়। এই মাটির স্তর গভীর হলেও জলস্তরের গভীরতা বেশী না হওয়ার কারণে মাটির নীচের স্তর বিজারিত বা আংশিক বিজারিত অবস্থায় থাকে এবং কালো রঙের অন্য একটি স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। জলস্তরের গভীরতা বেশী না হওয়ায়, জলীয় পরিবাহিতা কম হওয়ায় এবং ভূমির উপরিভাগ সমতল হওয়ায় এই মাটিযুক্ত অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো নয়। মাটিতে উপস্থিত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের আনুপাতিক হার বিচার করলে একে উর্বরা বলা যায়। কিন্তু তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন এবং মলিবডেনামের আনুপাতিক হারে সামঞ্জস্য না থাকলে এই ধরনের মাটিতে অনেক সময় বিষক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই মাটির বৈশিষ্ট্য নীচে বলা হলো। মাটির নমুনা সংগ্রহের স্থান ঃ মলঙ্গা (বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), এই মাটির গ্রথন (টেক্সচার), চটচটে পলিযুক্ত কাদা, বালি ১০ %, কাদা ৫১.২ %, পলি ৩৮.৪ %, জৈব কার্বন ০.৯৮%, দস্তা ১.০/ দশলক্ষ, বোরন ০.৫ / দশলক্ষ । পটাশ ৪৫০ কেজি /হেক্টর, গন্ধক ঃ২২.৫ কেজি/হেক্টর, গড় অম্লমাত্রা / ক্ষারমাত্রা (pH) ৫.৪ – ৭.৮, কিন্তু এটা মরশুম অনুযায়ী বদলায় । যেমন জানুয়ারীতে ৬.৯, ফেব্রুয়ারীতে ৭.০, মার্চে ৮.৮, এপ্রিলে ১০.৮, মে'তে১১.৮, জুনে ৮.৪, জুলাইয়ে ৩.০, আগষ্টে ২.৫ , সেপ্টেম্বরে২.১, অক্টোবরে ২.৮, নভেম্বরে ৪.০ এবং ডিসেম্বরে ৫.৭।

বারুইপুর উর্বর নবীন পলিগঠিত গাঙ্গেয় সমভূমির অংশ হলেও প্রকৃতির নিয়মেই নদীবাহিত পলি ও জলের পরিমাণগত তারতম্যের কারণে এখানে উঁচু নীচু অঞ্চল দেখা যায়। গঙ্গার (ভাগীরথী) মূলস্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমান ভাগীরথী হুগলীর পূর্বে মূলতঃ পলিগঠিত দোআঁশ এবং লোনামাটি ছাড়াও কোনো জায়গায় প্রাচীন বালিয়াড়ি অর্থাৎ এখন বেলেমাটি অধ্যুষিত অঞ্চল (যেমন বেলেগাছি, বেলেঘাটা, শিখরবালি, সূর্য্যপুর, চাঁদখালি, রাণা, নাচনগাছা, কেয়াতলা, গঙ্গাদুয়ারা, নোড়, শঙ্করপুর, দুর্গা, আলিপুর প্রভৃতি গ্রাম) আবার কোনো জায়গায় অগভীর নীচু অঞ্চল (যেমন টঙ্‌তলা) লক্ষ্য করা যায়। জমির এই নীচু অংশে দীর্ঘদিন ধরে জল এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ জমতে থাকলে বদ্ধ হয়ে

থাকার কারণে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এখানকার মাটির মধ্যে উপস্থিত লোহা ফোরাস থেকে ফেরিক স্তরে জারিত হতে পারে না তাই এই ধরনের মাটিতে নীলচে ভাব লক্ষ্য করা যায়। ফেরাস আয়রণ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপস্থিতির জন্য এই মাটির রঙ নীলচে কালো। এই মাটিতে জলের পরিমাণ বেশী। দীর্ঘদিন ধরে সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের লবণ জমতে থাকার কারণে এই মাটি আম্লিক (এর অম্লমাত্রা/ ক্ষারমাত্রা ৩.৫ বা তার কম) এবং এতে লোনাভাব বেশী।

গঙ্গার প্রাচীন বালিয়াড়ি অঞ্চলের মাটি অর্থাৎ এখন আমরা যাকে বেলেমাটি বলছি, সেই মাটিতে বালির ভাগ কাদা ও পলির তুলনায় অনেক বেশী। মাটির স্তরের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় তলায় বালির স্তর, মাঝে কাদা এবং উপরে পলির স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে আবার উপরের দিকে দানার আকৃতি সূক্ষ্মতর হতে থাকে। অভ্রযুক্ত তুলনামূলকভাবে নরম পাথর যেমন মাইকা শিস্ট বা ফিলাইট জাতীয় মণিকগুলি (মিনারল) যেমন বালি (কোয়ার্জ),অভ্র (বায়োটাইট , মসকোভাইট) এবং কাদাজাতীয় মণিক অর্থাৎ কেওলিনাইট, ট্যালক, পাইরোফিলাইটের পরিমাণ বেশী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় মাটির জলশোষণ ক্ষমতা বেশী কিন্তু জলধারণ ক্ষমতা কম। বালির পরিমাণ ৮০%-এর বেশী, কাদা ও পলি মিলে ২০% । মোট পটাশ, চুনজাতীয় পদার্থ এবং ফসফেটের পরিমাণ মোটামুটি ভালো। জৈব পদার্থের (মূলতঃ গাছের শেকড়) উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। নাইট্রোজেন সাধারণতঃ কম থাকে কিন্তু যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তখন এই মাটিকে উর্বরা বলা চলে। মাটি প্রশম, অনেকক্ষেত্রেই ক্ষারীয় কিন্তু লোনাভাব বেশী হওয়ায় সব ধরনের ফসল চাষের পক্ষে এই মাটি উপযুক্ত নয়।

কৃতজ্ঞতা ঃ

লেখা প্রসঙ্গে মূল্যবান মতামত, তথ্যসংগ্রহ এবং মাটির নমুনা সংগ্রহে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন ডঃ কালিচরণ কর্মকার, ডঃ রঞ্জিত কুমার সরকার, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং বিধান সাহা, এছাড়া নিম্নলিখিত বিবরণ, গ্রন্থ এবং পরীক্ষাগারের সাহায্য বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ।

১) অখণ্ড চব্বিশ পরগণার ভূ-তাত্ত্বিক পরিচয়, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী , গঙ্গারিডি, ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন, ১৯৬৯ থেকে ক্রমশ।
২) পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬ ।
৩) ভূ-তাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা, সঙ্কর্ষণ রায়।
৪) Land and soil, S.P. Roychaudhury.
৫) Text book of soil science, T.D.Biswas, S.K.Mukherjee.
৬) Text book of coal (Indian context) D. Chandra, R.M.Singh, M.P. Singh.
৭) Management of Coastal Saline Soils of Sundarbans, Central Soil Salinity Research Institute, 1981, Bulletin no. 7
৮) মাটি পরীক্ষাগার, কৃষিবিদ্যা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯) মাটি পরীক্ষাগার, সেন্ট্রাল সয়েল স্যালিনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুণে ।

বারুইপুরের ভৌগোলিক পরিক্রমা ঃ চাষবাস, ফল -পাকড়, জলজঙ্গল ও অন্য কিছুকথা

জীবন মণ্ডল

কানন কুন্তলা বারুইপুর। আদিগঙ্গার তীরে ছায়াঘেরা সবুজ প্রান্তরে গড়ে-ওঠা এক প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। একদিন ছিল ছোট গ্রাম। এল বণিক সম্প্রদায়, বারুইপুর রূপ নিল পুর বা নগরে। আজ সেই বারুইপুর শহর, হয়তবা হবে আগামীদিনে মহানগরীর অংশ বা তার সংগে বাঁধবে গাঁটছড়া, মিলনবন্ধন।

থাক সে ভবিষ্যতের কথা। একদা স্বাভাবিক উদ্ভিদে ঘেরা আদিগঙ্গার তীরে গড়েওঠা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক প্রশাসনিক অঞ্চল বারুইপুর থানা। ফলে বিস্তার ঘটে বারুইপুরের। এই বিস্তার লাভের ফলে গাঙ্গেয় অববাহিকার উর্বর ভূমির সাথে যুক্ত হয় বিদ্যাধরী, পিয়ালী নদী অববাহিকার রুক্ষ্ম, লবণাক্ত ভূমি যা বাদাভূমি নামে পরিচিত। এরই ফলে বারুইপুরে একস্থানের সাথে আর একস্থানের মাটি, ফসল, ফসলের স্বাদ, তাপ-তাপমাত্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণগুলির তারতম্য দেখা দেয়, এমনকি মানুষেরও গঙ্গাকূলের মানুষরা বাদাভূমির মানুষদেরকে ব্যঙ্গে সম্বোধন করে 'আবাদে', আবাদের ভূতো। জবাবে বাদাভূমির মানুষরা গঙ্গাকূলের মানুষদের সম্বোধন করে ডাকে কুঁকো, কুলুটের কুঁকো। ধীরে ধীরে কুলুটের কুঁকো, আবাদের ভূতো স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়। কুলোট শব্দটি এসেছে কুল থেকে (গঙ্গার কূল), কুঁকো একজাতীয় পাখী। পাখীটি ছোট নয়, মাঝারী আকারের, ফল খেতে ভালবাসে। ফলের বাগানে তার নিত্য আনাগোনা। অবশ্যই অলস প্রকৃতির।

এই স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচন থেকে একটা ধারণা পরিষ্কার হয় যে, বারুইপুরের গাঙ্গেয় ভূমি, আদিগঙ্গার দুই তীর সুজলাং, সুফলাং, শস্য শ্যামলাং বাগিচা ফসলের বিস্তৃত ক্ষেত্র। এই বাগিচা ফসল বারুইপুরকে দিয়েছে এক বিরাট খ্যাতি ও পরিচিতি। অবশ্য লিচু, পেয়ারা, লকেটের কথা উঠলেই এসে যায় বারুইপুরের নাম । পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বহুস্থানের মানুষ বারুইপুরকে চেনে বারুইপুরের ফলের দৌলতে।

বারুইপুর মূলতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। বারুইপুরের নামের মধ্যে তার গন্ধ লুকিয়ে আছে। বারুই এক কৃষিজীবী সম্প্রদায় (পানচাষী)। আবার সর্বত্র বারুইপুর লেখা হলেও এ অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে 'বারিপুর', 'বারাইপুর' উচ্চারিত হয়। হতে পারে এগুলি বারুইপুর শব্দের উচ্চারণের তারতম্য। যাকে বলা হয় অপভ্রংশ। বারিপুর শব্দের বারি অর্থাৎ বৃষ্টি যা কৃষির প্রধান সহায়ক। আদিগঙ্গার তীরে এই জনপদে নানান গাছ-গাছালীর প্রাধান্য থাকায় তুলনামুলক ভাবে এ অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। বারাই বারা থেকে আগত, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ।

একদিকে আদিগঙ্গা অববাহিকা অন্যদিকে পিয়ালী অববাহিকা, দুইয়ের মিলনে বারুইপুরের মাটি, পরিবেশ, কৃষি, শস্যও ফলের মধ্যে এক বৈচিত্র্য হয়েছে। কিন্তু একটু অতীতে এই তারতম্য ছিল না। কেন এমন হল ? একদা গঙ্গার শাখানদী, পিয়ালী, বিদ্যাধরী এবং তাদের শাখা-প্রশাখা ময়না, পারুলী প্রভৃতি খাড়ী বা শীর্ণকায়া নদীগুলিতে গঙ্গার উৎস থেকে আসা স্বাদু জলের ধারা প্রবাহিত ছিল। পরে কোন এক সময় মূল হতে শাখানদীগুলি বিছিন্ন হয়ে গেলে এই শাখানদীগুলি স্বাদু জল থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সারাক্ষণ প্রবাহিত হতে থাকে মোহনা থেকে আসা লবণাক্ত জল। আর সেই কারণে পিয়ালী বিদ্যাধরী অববাহিকা অঞ্চল হয়ে ওঠে লবনাক্ত। অন্যদিকে আদিগঙ্গা উৎস থেকে পাওয়া স্বাদু জলের প্রভাবে হয়ে ওঠে লবনহীন। এমনকি মোহনার লবণাক্ত জল ও তাকে স্পর্শ করে অথচ বারুইপুরের একটু দক্ষিণে গেলে দেখা যাবে মোহানার লবণাক্ত জলের প্রভাব। সেদিক থেকে বারুইপুর অবশ্য সৌভাগ্যবান। আর এই কারণে বারুইপুর, আদিগঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল হয়ে উঠেছে উর্বরা, শস্যশ্যামলা।

কৃষি–প্রধানত তিনটি উপাদানের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। ১। মাটি, ২। উষ্ণতা বা তাপ, ৩। জল। বিস্তীর্ণ নদী অববাহিকা এবং একদা ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় বারুইপুরের মাটি প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। পলি দুই প্রকারের– ১। প্রাচীন পলি। ২। নবীন পলি। প্রাচীন পলিগঠিত স্থানকে ভাঙ্গর বলে। বারুইপুরের উত্তরে একটি বিস্তৃত অঞ্চল ভাঙ্গর নামে পরিচিত। এর থেকে প্রমাণ হয় এ অঞ্চলের মাটি প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। তবে এও ঠিক, বারুইপুরে নবীন পলির প্রভাবও আছে। তবে তা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। কারণ ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটির গঠনকার্য দীর্ঘদিন ধরে চলে। অনেক মাটি বিশেষজ্ঞ পলিমাটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দেন না। তাঁরা মাটির কাদা বালির অংশ অনুসারে মাটিকে ভাগ করেন। সেই অনুসারে বারুইপুরের মাটি তিন প্রকারের– ১। এঁটেল, ২। দোঁয়াশ, ৩। বেলে ।

এঁটেলমাটি–যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী থাকে তাকে এঁটেল মাটি বলে। বারুইপুরে কিন্তু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এঁটেল মাটি দেখা যায়। যেমন– ধরা যাক, কইমুড়ো মাটি, এতে বালির ভাগ খুবই কম। এই মাটিতে জল পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। আবার শুকনো অবস্থায় দারুণ শক্ত । মাটির বর্ণ হালকা কালচে। গঙ্গা ও পিয়ালী অববাহিকার মিলনস্থলে এই মাটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এই উর্বরা মাটির শালী জমিতে আমনধান এবং পরে অর্থাৎ শীতে রবিশস্যের চাষ ভাল হয়। ডাঙা জমিতে বাগিচা ফসলের চাষ হলেও পেঁপে, কলাচাষ ভালো হয়। বিশেষ করে কাঁটালি কলা। মধ্য, দক্ষিণ সীতাকুণ্ডুর কিছু অংশে কাঁটালিকলার জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে এ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে পেয়ারার চাষ হচ্ছে। কিন্তু সে পেয়ারার রঙে উজ্জ্বলতার বেশ অভাব ।

লবনাক্ত এঁটেল – উত্তরভাগ অঞ্চলে পিয়ালী অববাহিকায় যে বাদাভূমি দেখা যায় তার মাটি লবণাক্ত এঁটেল মাটি। এই মাটিতে (শালী জমিতে) বর্ষায় ভালো আমনধান ফলে। উঁচু জমিতে বর্তমানে নদী না-থাকায় লবণের প্রভাব কমে যাওয়ায় নানান শাকসব্জীর চাষও হচ্ছে। এখানকার পটল খুবই সুস্বাদু। দেখতে একটু হালকা সবুজ রঙের। নদীর চর ও

নিকাশী নালার পাড়ে বিস্তৃত জমিতে এখন অসময়ে বিশেষ করে বর্ষায় ধনেচাষ হচ্ছে। শালী জমিতে রবিশস্যের চাষও হচ্ছে। ফলের বাগানও তৈরী হচ্ছে। আগে এই সব অঞ্চলে বাবলা, তাল, খেঁজুর ছাড়া অন্য কোন গাছ দেখা যেত না। এখন আম, নারকেল, তেঁতুল, শিরীষ প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। করমচারও চাষ হচ্ছে। বেশ কিছু অঞ্চলে সম্প্রতি বোরোচাষের ব্যবস্থা হয়েছে।

পাণ্ডব পোড়া মাটি – বাদাভূমি অঞ্চলের শালী জমি কেটে ডাঙ্গা জমি তৈরী করতে গেলে মাটির নীচে থেকে উঠে আসছে এই মাটি। এগুলি জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এই মাটিতে প্রথমে কয়েক বছর ভালো ফসল না ফললেও পরে রোদ, বৃষ্টিতে ক্ষয়কার্যের ফলে রূপান্তরিত মাটিতে ভালো ফসল ফলছে। পাণ্ডব পোড়া মাটি মাটির নীচে স্তরীভূত নিম্নমানের কয়লার এক রূপ। বারুইপুরের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে অর্ধবৃত্তাকারে বাদাভূমির নীচে এর সঞ্চিত ভাণ্ডার। আকনা, বেগমপুর, উত্তরভাগ, রামনগর প্রভৃতি মৌজা এর অন্তর্গত। অনুমান, কোন এক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ অঞ্চলের বনভূমি মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। হয়ত সে সময় পিয়ালী-বিদ্যাধরী গঙ্গার মূলধারা থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানে বলে রাখা ভালো, দুই চব্বিশ পরগনায় একাধিক বিদ্যাধরী নদী আছে। আমাদের আলোচ্য বিদ্যাধরী সোনারপুরের তাড়দা, প্রতাপনগর, সুন্দিয়া হয়ে পিয়ালী স্টেশনের উত্তর দিক দিয়ে তালদির উপর দিয়ে প্রবাহিত পূর্ববাহিনী নদীটি। পিয়ালী তার শাখা নদী। পিয়ালী স্টেশনের কিছুটা উত্তরে তার সৃষ্টি। প্রসঙ্গত জানাই এই এঁটেলমাটিকে স্থানীয় ভাষায় পোড়া এঁটেল বলে।

দোঁয়াশ মাটি– আদিগঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের মাটি দোঁয়াশ মাটি। এই মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ সমান সমান। এই দোঁয়াশ মাটি অঞ্চল বাগিচা ফসলের স্বর্ণভূমি। এখানেই একদা সৃষ্টি হয়েছিল স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের বনভূমি। প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়ে-ওঠা বনভূমি বাগিচায় দেখা যায় বিচিত্র ফলের সমাবেশ। স্বাদুফল, কষায় ফল কি নেই! পৃথিবীর কোন অঞ্চলে এত ফলের সমাবেশ দেখা যায় না। ফলের ঝুড়ি নামে খ্যাত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে ফল পাওয়া যায়, হাতে গুনলে তারও চেয়ে বেশী টক বা কষায় ফলের সন্ধান মেলে বারুইপুরে। স্বাদু ফল তো অতিরিক্ত। এমনকি শীত অঞ্চলের ফসলও এখানে জন্মায় যা বিস্ময়কর। তাই বারুইপুরকে 'ফলের ভাণ্ডার' নামে অভিহিত করলে অত্যুক্তি নয়, যথার্থই হয়।

বেলেমাটি – বেলেমাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকে। বারুইপুরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বেলেমাটি দেখা যায়। অন্যত্র নয়, কারণ, যখন আদিগঙ্গা প্রবলভাবে প্রবাহমান ছিল, সে সময় সে সৃষ্টি করেছিল বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ি সৃষ্টি করা নদীর এক কাজ। বেলেঘাটা, শাঁখারীপুকুর, দুধনই প্রভৃতি গ্রাম এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বাগিচা ফসল ভালো জন্মায় বিশেষ করে ঠিকরি পেয়ারা, জলপাই, চালতা প্রভৃতি। এখানেই একদা গড়ে উঠেছিল সেগুনের বনভূমি। কোথাও কোথাও সরলবর্গীয় দেবদারুর জঙ্গল।

নদীর বাঁকে বালুচরের সৃষ্টি হয়। যখন দুটি বাঁক কাছাকাছি এসে যায় তখন সৃষ্টি হয় হ্রদের। অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। অশ্বক্ষুরের মত দেখতে বলে সেটির নাম অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। এরূপ হ্রদ

অঞ্চল ছিল পদ্মজলা। আর একটি হ্রদের সন্ধান মেলে দুধনইও সীতাকুণ্ডু মৌজার মিলন স্থলে যেখানে বর্তমান সাগর সংঘের মাঠ। এই স্থানটিকে স্থানীয় লোক একসময় পুরন্দর বলত। একাধিক নদীর মিলনস্থানকে পুরন্দর বলে। এই স্থানে দীর্ঘদিন জলাশয় ছিল। এখানে একসময় প্রচুর শোলা জন্মাত।

মাটি নিয়ে আলোচনায় আমরা মাটিকে ভাগ করেছি মূলত মাটির ভৌত উপাদান নিয়ে। কিন্তু মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মাটির গঠন, মাটির রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, মাটির রং, মাটির বুনন, মাটির গভীরতা, তার জল ধারণ ক্ষমতা প্রভৃতির উপর শুধু তাই নয় মাটির গঠন নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ু, শিলাস্তরের উপর, এমনকি উদ্ভিদেরও উপর। যেমন, মাটি দেখে বলা যায় এখানে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে আবার উদ্ভিদ দেখে বলা যায় এখানকার মাটি কেমন।

বারুইপুরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে এখানকার মাটি থেকে লবণ সহজে বেরিয়ে যায়। তার ফলে বেড়ে যায় মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ। আর সেই কারণে দেখা যায় এখানকার মাটিতে লৌহের পরিমাণ খুব বেশী। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মাটিকে 'পেডালফার মৃত্তিকা' বলে। যখন 'অপসৃত মৃত্তিকা' অর্থাৎ পলিমাটি পেডালফার মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয় তখন সেই অঞ্চলে অরণ্যের সৃষ্টি হয়। বারুইপুরের মাটি 'পেডালফার মৃত্তিকা' তার প্রমাণ এই অঞ্চলের মাটিতে ব্যাপক পরিমাণ লৌহের উপস্থিতি।

বারুইপুরের মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে ভীষণভাবে সহায়ক। কারণ, মাটির নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকায় (গ্রানাইট, ব্যাসল্ট প্রভৃতি) সেখানে গড়ে উঠেছে ভৌম জলস্তর। গ্রীষ্মকালে এই সঞ্চিত জল শ্যালো পাম্পের সাহায্যে উঠে আসে উপরে। রুক্ষ্ম মাটি পায় প্রাণের পরশ, বয়ে যায় আকাশের নীচে সবুজের বন্যা।

এই ভৌম জলস্তর, অপ্রবেশ্য শিলাস্তর, পাণ্ডব পোড়া মাটি, জীবাশ্ম (বারুইপুর সুন্দরবন সংগ্রহশালায় একটি সংরক্ষিত আছে) প্রভৃতি ইঙ্গিত দেয়, এখানকার মাটির সুগভীরে লুকিয়ে আছে বিরাট প্রাকৃতিক তেলের ভাণ্ডার।

এখানকার জলবায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশী থাকায় আবহবিকারের ফলে দ্রুত লবণাক্ত জমি থেকে লবণের অপসারণ ঘটছে। আর তার ফলে একফসলী জমি দ্রুত দ্বিফসলীতে পরিণত হচ্ছে। আর সেই কারণে এই এলাকায় ঘটছে চাষবাসের বিস্তৃতি।

এই অঞ্চলে একটি স্থানীয় প্রবাদ আছে। 'পা বাড়ালেই মাটি' বা পা অন্তর মাটি। অর্থাৎ এক পা দূরত্বে মাটির চরিত্র পাল্টে যায়। সেটা বোঝা যায় ভৌম জলস্তরের ক্ষেত্রে। কোথাও ২০ ফুট নীচে জলস্তর কোথাও ১০০ ফুটেও জলস্তরের দেখা মেলে না। আর সেই কারণে এখানকার এক এক অঞ্চলে ফল বা ফসলের স্বাদ, রূপ, রং আকারের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। যেমন, আটঘরায় ওল সুস্বাদু কিন্তু একপা পশ্চিমে মদারাট অথবা এক পা পূর্বে সীতাকুণ্ডুতে সেই স্বাদের ওল পাওয়া যায় না। ঠিক সেই রকম শাসন, কুমারহাটের মানকচু, চঙ্গের মহম্মদগুলি, মুক্তকেশী বেগুন, শাসনের শাসনগুলি বেগুন, শিখরবালির

লিচু, আঁশফল। রানা ও বেলেঘাটার ঠিকরি পেয়ারা, জলপাই, মদারাটের পান, উত্তরভাগের পটল, কল্যাণপুর অঞ্চলের পেয়ারা প্রভৃতি বিখ্যাত। তাছাড়া এক এক অঞ্চলে ফলনের পার্থক্যও ঘটে। খোদার বাজারের লকেটফল তো বিস্ময়কর। এটি শীতপ্রধান দেশের ফল। ভারতের কাশ্মীরে এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে এটি ফলে। চীনের হিমালয় অঞ্চলে ব্যাপক জন্মায়। অথচ অদ্ভুতভাবে বারুইপুরের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চল খোদার বাজারে এই অতুলনীয় ফলটি ফলে। কি জানি খোদার মর্জি বোধ হয়!

মাটি নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে একটু ভূ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে নিই। এই অঞ্চল গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত হলেও এর ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। এককথায় বলা যায়, এখানে উপকূলের সমভূমি, ব-দ্বীপ সমভূমি ও প্লাবন সমভূমির একত্র সমাহার ঘটেছে।

তাপ বা উষ্ণতা – বারুইপুরের তাপ বা উষ্ণতা আলোচনা করার আগে আমরা একটু জেনে নিই, কিসের উপর নির্ভর করে উষ্ণতার তারতম্যতা। যেগুলির উপর তারতম্যতা নির্ভরশীল সেগুলি হল অক্ষাংশ, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, মেঘের অবস্থান, মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, অরণ্যের প্রভাব, জলাভূমির প্রভাব, মানুষের ভূমিকা প্রভৃতি।

অদ্ভুত লাগলেও বারুইপুরের সমদূরত্বে উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। ফলে দুইয়ের প্রভাব তাপ ও তাপমাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বারুইপুরের উত্তর অক্ষাংশ ২২°/২১´, দ্রাঘিমাংশ পূর্ব ৮৮° /২৭´। সেই অনুসারে দেশান্তর বা স্থানীয় সময় ২৩মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড। অর্থাৎ আমাদের ঘড়ির সময়ের (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম) সাথে ২৩ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড যোগ করলে বারুইপুরের স্থানীয় সময় পাওয়া যাবে। যাঁরা ব্রত, পূজা-পার্বণ, পালন-উপবাস করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই তাঁরা যে-পঞ্জিকা অনুসরণ করেন সেগুলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। সেখানে কলকাতার স্থানীয় সময় দেওয়া থাকে। কলকাতার সাথে বারুইপুরের সময়ের পার্থক্য ০ মিনিট ১৮ সেকেন্ড অর্থাৎ পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের সময়ের সাথে উক্ত সময় যোগ করলে বারুইপুরের স্থানীয় সময় নির্দিষ্ট হবে। অক্ষাংশ অনুসারে বারুইপুর উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখার (২৩½°) কাছাকাছি থাকায় এ অঞ্চল ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। সে কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় উষ্ণতা কম হওয়ার কথা। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতার জন্য এখানে উষ্ণতা বেশী হওয়ার কথা। (সূর্য থেকে আগত তাপ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। ভূপৃষ্ঠে তাপ বিকিরণের ফলে বায়ুস্তর বিকীর্ণ তাপ লাভ করে এবং উত্তপ্ত হয়।) এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব। সেই রকম দেখা যায় আর্দ্রতার ক্ষেত্রেও। সমুদ্র থেকে আসা বায়ুপ্রবাহে প্রচুর জলীয় বাস্প থাকায় এ অঞ্চলে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার অন্যদিকে কর্কটক্রান্তিরেখা থেকে আগত নিরক্ষরেখাগামী আয়নবায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাস্প বৃদ্ধি পায়। এবং আয়নবায়ুতে জলীয় বাস্প বৃদ্ধি হলে সে অঞ্চলে আর্দ্রতার বৃদ্ধি ঘটে। এই আয়নবায়ুর আর্দ্রতা কিন্তু বৃষ্টিপাত কম করায়। এখানেও পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব।

জলভাগ ও স্থলভাগের মধ্যে তাপ পরিচলনে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তার প্রভাবে ঘূর্ণবার্তের সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণবাত মহীরুহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এবং এই ঘূর্ণবাত একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে চলে যায়। বারুইপুর সেই পথের মধ্যে পড়ে না । এটি বারুইপুরের পরম সৌভাগ্য।

বারুইপুরের গঙ্গা অববাহিকার মাটি দোঁয়াশ কিন্তু কিছু কিছু স্থানে বেলেমাটি থাকায় তাপ বিকিরণে দিনের বেলায় মাটি সহজে উত্তপ্ত হয় আবার রাতে সহজে শীতল হয়। ফলে এখানকার জলবায়ু রুক্ষ্ম চরমভাবাপন্ন হওয়ার কথা কিন্তু এই অঞ্চল গাঙ্গেয় সমভূমি হওয়ায় এখানকার মাটি নরম ও সরস। সে কারণে এখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু হওয়ার কথা। আবার সেই পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব। তার উপর আছে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব। বাস্তবে তাই এই অঞ্চলে একটি মিশ্র আবহাওয়া দেখতে পাই। যা চরম ও সমভাবাপন্নের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। যা ফসল উৎপাদনের সহায়ক। এখানকার বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বেশী থাকায় নিয়তবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর মিলনে প্রচুর শিশির সৃষ্টি করে যা গাছ ও ফলের বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। অবশ্য আর্দ্রবায়ুর প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বারুইপুরের সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রী হলেও মাঝে মাঝে তার ও বেশী দেখা যায়। সর্ব নিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী হলেও কোথাও কোথাও ৬ ডিগ্রীতে নামতে দেখা যায়। আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ %। সব তাপমাত্রার মাপ সেন্টিগ্রেড স্কেলে। এই উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বিশেষভাবে জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে এই অঞ্চলের বহু বিপরীত মুখী তত্ত্ব এক বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাবে এ অঞ্চলের বাগিচা ফসলে ঘটেছে উৎকৃষ্টতা এবং উদ্ভিদের নবনব রূপে বিকাশ।

বীজের ভালো অঙ্কুরোদ্‌গম ২৫° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দরকার। বারুইপুরে সারাবছরে এই তাপমাত্রা মেলে। আর সেই কারণে একদা স্বাভাবিক ভাবে এখানে বনভূমির সৃষ্টি হয়েছিল।

বারুইপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেসব নাবাল ভূমিতে ধানচাষ হয়, বর্ষাকালে সে স্থানগুলি জলাভূমির রূপ নেয়। এই জলাভূমি এবং বারুইপুরের গাঙ্গেয় সমভূমির বৃহৎ তরুরাজির আহ্বানে এখানে মেঘের অবস্থান ঘটে। ফলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা এখানকার তাপ বা উষ্ণতাকে প্রভাবিত করে, জলবায়ুও প্রভাবিত হয়। তাপ ও জলবায়ু একে যে অপরের পরিপূরক।

জলবায়ু ঃ জলবায়ু নির্ধারণে উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমরা তাপ বা উষ্ণতা আলোচনা কালে জলবায়ুর আলোচনা প্রায় এক রকম করেছি। কারণ, উষ্ণতা নিরূপণে যে যে উপাদান লাগে জলবায়ু নিরূপণে প্রায় সেই সেই উপাদান লাগে। তাই আলাদা করে জলবায়ুর সমস্ত উপাদান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বারুইপুর বিশ্বের মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু হলেও প্রকৃতির এক অপূর্ব লীলাভূমি, যে জলবায়ুর কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বকে মানে নি। যেমন, ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল জলবায়ুর প্রচলিত কোন তত্ত্বকে না-মেনে নিজেই একটি জলবায়ু সৃষ্টি করেছে। বারুইপুর অনেকটা তাই। বড় কম সীমা রেখা, নইলে নিজেই একটি জলবায়ু অঞ্চলে পরিণত হতে পারত। অথবা

বারুইপুরের অবস্থান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে হলে, এখানকার জলবায়ুকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলা যেত।

একদিকে ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলে অবস্থান, অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব, সেই সাথে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশী হওয়া, প্রতি মুহূর্তে লবণাক্ত ভূমিতে যান্ত্রিক আবহবিকার ঘটা (রাসায়নিক আবহবিকারও ঘটে), সমুদ্র থেকে দূরত্ব কম, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কম, আয়নবায়ুর প্রভাব, শীতকালে শুষ্ক বায়ুপ্রভাব, মাটির গঠন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী, অরণ্যভূমির বিশাল জলাভূমির প্রভাব, মাটির গঠন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী, অরণ্যভূমির বিস্তার, বিশাল জলাভূমির প্রভাব, ভূ-প্রকৃতিগত সমভূমির মিশ্রণ প্রভৃতির ফলে এখানকার জলবায়ু চরমাভাবাপন্নও নয়, সমভাবাপন্নও নয়। শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালে বেশ গরম এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে উষ্ণতা বাড়ে, কখন কখনও আবার তাপমাত্রা নেমেও আসে। বাতাসের আর্দ্রতা বৃষ্টিপাত যেমন ঘটায়, তেমন একটানা বৃষ্টির পর শুষ্ক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। শীতকালে তাই এ অঞ্চল শুষ্ক থাকার কথা কিন্তু নিয়ম ভেঙে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হওয়ায়, কৃষিতে বিশেষ সুবিধা হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ফলের দেশ হিসাবে বিখ্যাত। বারুইপুরও তাই। তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে পাব, ভূমধ্যসাগরের তুলনায় বারুইপুর অনেক অনেক এগিয়ে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্বাদু ফলের (মিষ্ট) সংখ্যা বেশী, কষায় ফল (টক) দু-একটা, নেই বললেই হয়। সেখানে বারুইপুরের কষায় ফলের সংখ্যা অনেক। স্বাদু ফলের সংখ্যা তো বহু। যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। অথচ ভূগোলের পাতায় ভূমধ্যসাগরের তীরকে ফলের ঝুড়ি বলা হয়। বারুইপুর সেখানে উপেক্ষিত। বারুইপুরের মানুষদের অবহেলার জন্য এখানকার অনেক ফসল আজোও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

মানুষের ভূমিকা ঃ

বারুইপুরের পরিচিতি বারুইপুরের ফলের জন্যে কিন্তু সে ফল হাতে গোনা কটা মাত্র । অথচ বারুইপুরে বহুজাতের ফল জন্মায়। একদা বাণিজ্যায়নের সুযোগ না-থাকায় এবং এখানকার মানুষজনের অলসতা (অবশ্য সমভূমির মানুষরা অলস হয়) ও প্রকৃতি নির্ভরতার জন্য এখানে ফলচাষের ব্যপক প্রসার ঘটেনি। বারুইপুরের বাগিচা ফসলের জমির মালিকানা ছিল একদল মানুষের হাতে কুক্ষিগত। যারা সমাজের বড়লোক শ্রেণী নামে খ্যাত। তারা ছিল পরিশ্রমবিমুখ এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফলে বাগিচা ফসলের ভূমি অনাবাদী ছিল। থাকারই কথা। তখন কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেনি, ঘটেনি যোগাযোগ ব্যবস্থার, ফলগুলি দ্রুত পচনশীল, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সে সময় না-থাকায় এই ফলগুলির বাণিজ্যায়ন সম্ভব হয়নি। এখনও ফল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। একই অবস্থা ছিল ক্ষুদ্র প্রান্তিক বাগান মালিকদের। প্রকৃতির খেয়ালে সেখানে কখনও ফল ফলত কখনও ফলত না।

ফলের জমিগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল – একটি আবাদী, অন্যটি অনাবাদী। যেসব ফলের গাছের জীবন স্বল্পমেয়াদী যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি এগুলি ছিল আবাদী ফল। এগুলি

চাষে কম বেশী যত্ন নেওয়া হত। যত্ন মানে একটু কোপকাপ দেওয়া। না ছিল জলসেচের ব্যবস্থা, না ছিল সার বা কীটনাশক প্রয়োগ। অবশ্য তারও আগে এই চাষ অনাবাদী ছিল। এখন এই চাষের যত্ন নেওয়া হয় এবং বিভিন্নভাবে পরিচর্যা করা হয়। পেঁপের কথা ধরা যাক, বাগানের বা সব্জি ক্ষেতের ধারে ধারে দু-চারটে গাছ লাগান হত বাড়ীতে খাবার জন্য। এখন বিঘে কে বিঘে পেঁপে চাষ হচ্ছে। ঠিক একই অবস্থা ছিল করমচা ও গন্ধরাজ লেবুর ক্ষেত্রে। বাগানের ধারে ধারে এই কাঁটা যুক্ত গাছগুলি ছিল আসলে বেড়ার কাজে। আজ কিন্তু তাদের বিস্তার ঘটেছে। আর যেসব ফলের গাছের জীবন দীর্ঘমেয়াদী, যেমন – আম, জামরুল, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি, সেগুলির পরিচর্যা করা হত না। এসব গাছের ফসল ফলত সম্পূর্ণ প্রকৃতির খেয়ালে।

শুরু হল একদিন দিন বদলের পালা। প্রান্তিক চাষীরা বা জমির মালিকরা অর্থনীতির তাড়নায় যখন মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থায়, ঠিক সেই সময় তারা পেল নতুন পথের নিশানা। ষাটের দশক তখন শেষ; সত্তরের দশক শুরু। এই সময় ঘটল এক মধ্যকারীর উদ্ভব। তারা জমির মালিক ও বাজারের মধ্যে স্থান করে নিল। তারা পরিচিত হল বাগান ব্যবসায়ী বা বাগানী নামে। তারা জমির মালিকদের কাছ থেকে মরশুমের জন্য বাগান লিজ নিয়ে ফলগুলি পৌঁছে দিল বাজারে। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। ব্লক কৃষি আধিকারিকের মাধ্যমে এসে গেছে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি। সেই সাথে বাজারে বেড়েছে ফলের চাহিদা। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে বাগিচা ফসলের শুরু হল নতুন পথ চলা।

কেন হঠাৎ করে চাহিদা বাড়ল ?

দীর্ঘদিন বিদেশী ইংরেজের শাসনাধীনে থাকায় আমরা সাহেবিয়ানায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠি। আর তার ফলে সাহেবরা যে ফল পছন্দ করত আমরা সেই ফল পছন্দ করতে থাকি। সাহেবদের ফল তো সেই হাতে গোনা ভূমধ্যসাগরীয় ফল। আমাদের দেশে সেই ফল বলতে আপেল, আঙুর, ন্যাসপাতি। সাহেবরা একদিন চলে গেল কিন্তু রয়ে গেল আমাদের মধ্যে সেই সাহেবিয়ানা। তার পরিবর্তন হল না। বরং তারা দেশীয় ফল দেখে নাক সিঁটকাতে লাগল। তাতে দেশীয় ফলের চাহিদা কমে গেল। পরিসংখ্যান বলে, স্বাধীনতার পরে দেশীয় ফলের চাহিদা রেখা আরো নিম্নগামী হয়। ষাট দশকের শেষ দিকে কিছু সমাজসেবী সংস্থা ও পুষ্টি বিজ্ঞানীগণ একযোগে প্রচারে নামে। তারা প্রচার করে দেশীয় ফল ওই আপেল আঙুরের চেয়ে অনেক বেশী খাদ্যগুণে ভরা। মিডিয়ার ছড়াছড়ি তখন এত ছিল না। সংবাদপত্রগুলোও তখন তেমন ভাবে এগিয়ে না আসলেও সত্তর দশকের মধ্য হতে নানা প্রচারমাধ্যমের আনুকূল্যে দেশীয় ফল প্রচার পায় এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেইসাথে বিদেশে ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার লাভ হওয়ায় বিদেশে ফলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এইভাবে বেড়ে উঠেছে দেশবিদেশে দেশীয় ফলের চাহিদা। পেয়ারা তো আপেলকে টেক্কা দিতে খুব জোর ছোটা ছুটছে। মুশকিল হল, পেয়ারা দ্রুত পচনশীল। বিশেষত গরমকালে। সংরক্ষণ যোগ্য হলে এর গুরুত্ব আরো বাড়বে।

নতুন করে পথ চলার শুরু আম দিয়ে। আমের মুকুলে কীটনাশক স্প্রে করে বাগানীরা পেল হাতে হাতে ফল। এখন তো আমগাছে ৩/৪ বার স্প্রে করা হয়। মুকুল আসার আগে, মুকুল এলে, মুকুলে গুটি ধরলে, ছোট আমে পোকা লাগলে। হর্মোন জাতীয় ঔষধ, যদি মুকুল আসার সম্ভাবনা না থাকে তখন অথবা আম খুব ঝরে যেতে থাকলেও স্প্রে করা হয়। প্রথম কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হয়েছিল 'সেভিন' পাউডার দিয়ে। এখন বাগানী বা চাষীরা বিভিন্ন কীটনাশক নিয়ে নিজের নিজের মত করে সংমিশ্রন করে তারা স্প্রে করছে। এ বলা যায় তাদের এক ধরনের গবেষনা।

এই আমচাষে চাষীরা বিশেষ সুফল পাওয়ায় তারা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়ে। সেই উৎসাহ এসে পড়ে পেয়ারা বাগানে। পেয়ারা বাগানে ঘটে যায় এক বিস্ময়কর বিপ্লব। বর্ষার পেয়ারা আজ বারোমাস লভ্য। এ ব্যাপারে কল্যাণপুরের হারুলাল মণ্ডল (বটোদা) পথিকৃৎ। অবশ্য আমি ১৯৭৪ সালে একটি গাছ নিয়ে বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে শীতে ফল ফলিয়েছিলাম। কিন্তু বটকৃষ্ণবাবুর প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক। তিনিই প্রথম বাণিজ্যিক ভাবে এর চাষ শুরু করেন। এবং পরবর্তিকালে তিনি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। আজও বিভিন্ন চাষী নানানভাবে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এমনকি তারা মানুষের ঔষধও ব্যবহার করছে, যেমন ভিটামিন বি, টেরামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি। আমি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রিয়োজোট কীটনাশক হিসাবে এবং প্লাসেন্টা অধিক ফলনের জন্য ব্যবহার করে ফল পেয়েছিলাম।

এই পেয়ারাচাষে কৃষিবিজ্ঞানীদের কোন ভূমিকা নেই। প্রসঙ্গত জানাই ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে অধিক ফলনশীল L 49 পেয়ারাগাছ চাষীদের দেওয়া হয়। কিন্তু সে পেয়ারার স্বাদ, আকার, বর্ণ কোনটি উল্লেখযোগ্য না-হওয়ায় বাগানে তার ঠাঁই হয়নি। একই দশা হয় এলাহাবাদ সফেদের। বরং এখানকার চাষীরা স্থানীয় পেয়ারা বিশেষ করে খাজা পেয়ারাকে নানান পরীক্ষানিরীক্ষায় এমন উপযোগী করে তুলেছে, তার চাহিদা আজ তুঙ্গে। এই ফল এখন বারোমাস পাওয়া যায়। তার বর্ণেরও হয়েছে পরিবর্তন, হয়েছে আকারেরও । যেন পালিশ করা, তৈলাক্ত, ঝকঝকে চকচকে। স্থানীয় ফল দোমড়া ভাল স্থান না পেলেও আর একটি স্থানীয় ফল এলাহাবাদ বাগানে ভাল স্থান করে নিয়েছে। এই পেয়ারার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, খাজা পেয়ারার মত খুব বেশী পরিচর্যা করতে হয় না।

এই পেয়ারাচাষকে কেন্দ্র করে বারুইপুরের চাষীরা উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি প্রচলিত তত্ত্বকে পরিবর্তিত করেছে। আমরা জানি, উদ্ভিদের পাতার কাজ প্রস্বেদন অর্থাৎ দেহকাণ্ড থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া। সালোকসংশ্লেষ রান্নাঘরের কাজ, সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে খাদ্য তৈরী করা। আর একটি কাজ শ্বসন, পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ-বর্জন করা। পাতার কাজের এই প্রচলিত তত্ত্বের সাথে যোগ হয়েছে আর একটি নতুন তত্ত্ব। সেটি হল, উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ করতে পারে (যা এখনও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জানে না)। ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন কৃষি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত নাইট্রোজেন যখন বৃষ্টির মাধ্যমে পাতার উপরে পতিত হয়, পাতা তার জলরন্ধ্রের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে এবং অনেক রবিশস্য সরাসরি বাতাস থেকে

পাতার পত্ররন্ধ্রের নীচে থাকা বায়ু গহ্বরের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে। একটি গাছকে টিউবওয়েলের জলে পুরোপুরি ভিজিয়ে আর একটি গাছকে বর্ষার জলে ভিজিয়ে একদিন পর দেখলে দেখা যাবে বর্ষার জলেভেজা গাছটি তুলনায় অনেক সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই সূত্রে প্রথমে আমি সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া জলে গুলে শশাগাছে স্প্রে করেছিলাম। তাতে দেখেছিলাম, গাছ তা গ্রহণ করেছে এবং গাছেরও পরিবর্তন হয়েছে। (কিন্তু পটাশিয়াম-এর বেলায় তা হয়নি। বরং গাছের পাতার ক্ষতি হয়েছে।) তাতে আমি উৎসাহিত হয়ে ব্যাপকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করি।

শুধু পাতা খাদ্যগ্রহণ করে না। পাতা ছাড়া কাণ্ডের অগ্রমুকুল বা কাণ্ড পাতার সংযোগস্থল পত্রমূলে যে ছিদ্র আছে, যেখান থেকে কচি কাণ্ড বের হয় (উপপত্র ও কাক্ষিক স্থান) সেখান থেকেও উদ্ভিদ খাদ্যগ্রহণ করে।

পাতা খাদ্যগ্রহণ করতে পারে, বিষয়টি যখন স্থানীয়ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক তখনই বারুইপুরে চলছে চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে কেমন করে অসময়ে বড় ঝকঝকে চকচকে মসৃণ ফল গাছ থেকে নামাতে পারে। তারা বিষয়টি লুফে নিল, শুধু তাই নয়। তারা আরও একধাপ এগিয়ে মানুষের ব্যবহৃত ভিটামিন বিকোসুল ক্যাপসুল জলে গুলে পাতায় স্প্রে করল। ফলও পেল। আমি হোমিওপ্যাথি এভেনা, আলফালফার মিশ্রণ প্রয়োগ করলাম। ফল মন্দ হল না। খবরটা বহুজাতিক কোম্পানীর কানে পৌঁছতেই বাজারে চলে এল গাছের ভিটামিন। প্রথমে গোদরেজ কোম্পানী নিয়ে এল 'বিপুল' । এখন অনেক ব্যান্ড বাজারে চলছে। আমি এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীকে পাতা খাদ্যগ্রহণ করতে পারে বলায় সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। সে হাসি ছিল কিন্তু অট্টহাসি। তাকে যখন বললাম হর্মোন স্প্রে করলে পাতার মাধ্যমে গাছ তা কিভাবে গ্রহণ করছে ? তিনি তখন ছিলেন নীরব, নিরুত্তর। সবচেয়ে আশ্চর্য এই বিষয়ে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও ঘুমে অচেতন। কোন দিন দেখব কোন বিদেশী গবেষক পাতার খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

বারুইপুরের চাষীরা আরো একধাপ এগিয়ে গেল, অসময়ে জামরুল ফল ফলাল তারা। জামরুল ফলে গ্রীষ্মকালে। সেই ফলকে শীতকালে ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিল মানুষকে। খোদার বাজারের গোবর্ধন মোল্লা এর পথিকৃৎ। তার হাতের স্পর্শে মানুষ পেল অসময়ে এই জলভরা ফল। এ যেন এক যাদুদণ্ডের ছোঁয়া!

একসময় বারুইপুরের লিচু দিয়েছিল বারুইপুরের পরিচিতি। সুস্বাদু রংবাহারী ফল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ ফল প্রতিবৎসর ফলে না। ফলে বারুইপুরের বহু বড় বড় বাগান কেটে সাফ্ হয়ে গেছে। সেই লিচু আবার ফিরে আসছে নব কলেবরে। আশা করা যায়, আবার লিচুর গাছে ভরে যাবে। আসলে লিচু যখন গাছ থেকে ভাঙা হয় তখন গাছের কাণ্ডের অগ্রমুকুল ভাঙা পড়ে। ফলে গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতিপূরণ হতে লেগে যায় একটা বছর। এখন লিচু পাড়ার পর গাছের গোড়ায় সার দিয়ে পরিচর্যা করা হয়। আর তাতে হয় তার দ্রুত ক্ষয়পূরণ। তার ফলে এখন প্রায় প্রতিবৎসর লিচু ফলছে। লিচুর আর একটা সমস্যা

পাক ধরলেই শেষ। এই স্বল্প সময়ের সমস্যা দূর করতেও সক্ষম হয়েছে চাষীরা। তারা আরো গবেষণায় মগ্ন।

বারুইপুরের চাষীদের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, হয়ত একদিন মানুষ ভুলে যাবে। সেজন্য উচিত তাদের কর্ম পদ্ধতি, চিন্তাভাবনা, গবেষণাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা।

পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম একই প্রজাতির। এদের ফুলগুলির মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল আছে। এগুলি লক্ষ্য করে আমি পেয়ারা ও গোলাপজামের মধ্যে জোড়কলম করতে সক্ষম হই। তার থেকে যে পেয়ারা উৎপাদিত হয়েছিল, তাতে সামান্য গোলাপজামের সুবাস ছিল। জামরুল ও পেয়ারার পরাগমিলন ঘটিয়ে পেয়ারা উৎপাদন করেছিলাম। দুর্ভাগ্য সে ফলটি পরে নষ্ট হয়ে যায়।

এই গোলাপজামের বাজারে চাহিদা থাকলেও একসময় বারুইপুরের গোলাপজামের নাম কেউ মুখে আনত না। এ ফলগুলি ছিল খুব ছোট । সেই গোলাপজামের এখন দারুণ চাহিদা। সেই বুনো মত ফলের আকারেরও বৃদ্ধি হয়েছে , হয়েছে রূপেরও। আজ বাজারের অন্যতম দামী ফল।

বাজারে চাহিদা পেয়ে জাতে উঠেছে করমচা। নকল চেরীর প্রধান উপকরণ হওয়ার দৌলতে তার চাষের পরিধি বাড়ছে। একদিন ছিল বেড়ার গাছ, আজ তার ফল অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল।

জল – কৃষির অন্যতম উপাদান জল। বারুইপুরের মাটির নীচে রয়েছে ভৌম জলস্তর। সেখানে আছে জলের বিশাল ভাণ্ডার। সেই জল উঠে আসছে পাম্পের সাহায্যে। মজেযাওয়া বহু খাড়ি বা প্রশাখানদীর স্রোতোধারা বহু স্থানে বাধা পেয়ে সৃষ্টি হয়েছে পুকুরে। আবার নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট জলাশয়ের। এছাড়া তো এ অঞ্চলে রয়েছে বৃষ্টিপাতের আধিক্য।

একসময় এই অঞ্চলের বিরাট অংশের জল নিষ্কাশনের কাজ করত পিয়ালী নদী। এই অঞ্চলের বর্ষার জমা জলরাশিকে ভাটার সময় পৌঁছে দিত সাগরে। এইভাবে চলতে চলতে একদিন পিয়ালী নিজে মজে গেল। সৃষ্টি হল এক সমস্যার, জল নিষ্কাশনের সমস্যা। বারুইপুরের বাদাভূমি অঞ্চল ভাসাভূমি নামে পরিচিত হল। বন্ধ হয়ে গেল ধানচাষ। কৃষকের জীবনে নেমে এল অন্ধকার। বাদাভূমি তখন শুধুই হোগলাভূমি। এই সমস্যা দূর করতে পিয়ালী নদীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল আরাপাঁচ পরিকল্পনার। উত্তরভাগে বসল পাম্পিং ষ্টেশন। বাদাভূমির উপর কাটা হল বহু খাল। মনে রাখা দরকার, এর জন্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গন আন্দোলন। আর এর বেশীর ভাগ নেতৃত্বে ছিল তৎকালীন অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি। উত্তরভাগ পাম্পিং ষ্টেশন বারুইপুরের গর্ব, কারণ এটি এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাম্পিং স্টেশন। তার জন্য ধন্যবাদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে, তঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি গড়ে উঠেছিল। এই পাম্পিং স্টেশনের নিকাশী খালগুলি বর্তমানে সেচখালের ভূমিকা পালন করছে। বোরো মরশুমে হুগলী নদীর জল আসছে এই সেচখালের মাধ্যমে। আর তার ফলে

এই সেচখালের দুই পারে হচ্ছে ব্যাপক বোরোধান চাষ। কোথাও কোথাওবা হচ্ছে রবিখন্দ।

মাছ – জলকে কেন্দ্র করে যেমন ফসল ফলছে, তেমনি চাষ হচ্ছে মাছের। মাছ চাষের জন্য পুকুরগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। ১) বিলসে পুকুর ২) পোনা পুকুর, এই বিলসে পুকুরগুলি প্রকৃতি নির্ভর। এই পুকুরের জন্য মালিকরা কোন অর্থব্যয় করে না। এইগুলি সাধারণত ছোট ছোট হয়। বর্ষাকালে পাড়ের একটা অংশ কাটা থাকে, স্থানীয় ভাষায় বলে 'মোনকাটা'। এই অংশ দিয়ে বর্ষার জলের সাথে মাছ প্রবেশ করে। এই মাছগুলি সাধারণত জিওল মাছ। মাছগুলি হল কই, শিং, মাগুর, শাল, শোল, ল্যাঠা, ন্যাদস, খলসে, গুতে, চাঁদা, পুটি, খেনে, ময়াটি, চ্যাং, বান, তোড়া, বোগো, বেলে, ফলুই, ট্যাংরা, বোল, বান-তোড়া, কুঁচে, চিংড়ি প্রভৃতি। এই মাছগুলি খানাতেও জন্মায়। খানা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়। এখন এগুলি বিলুপ্তির পথে। এই মাছগুলির মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় মাছগুলি হল, ন্যাদস , চাঁদা, গুতে, বোগো, ফলুই প্রভৃতি।

বারুইপুর অঞ্চলের পুকুরগুলি জল অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত। ১) স্বাদু জলের পুকুর, ২) নোনা জলের পুকুর। উভয় পুকুরে একই জিওলমাছ বা বিলসে মাছের চাষ হয়। তবে নোনা পুকুরে অতিরিক্ত হিসাবে নোনামাছ যেমন ভেটকি, ভাঙন, গলদা চিংড়ি, বাগদাচিংড়ি প্রভৃতির চাষ হয়। সব পুকুরে দেশী কাঁকড়া যা তেলোকাঁকড়া নামে এ অঞ্চলের লোকমুখে প্রচলিত, প্রচুর জন্মায়।

যে পুকুরে পোনামাছ জন্মায় তাকে পোনাপুকুর বলে। পোনামাছ বলতে কার্পমাছ। কার্পমাছ দুই প্রকারের। ১) দেশী কার্প– রুই , মৃগেল, কাতলা, কালবোস, বাটা। ২) বিদেশী কার্প– সিলভার (১৯৫৯, হংকং থেকে), গ্রাস (১৯৫৯ জাপান থেকে), কমন বা আমেরিকান রুই (১৯৫৭ ব্যাংকক থেকে) স্থানীয় ভাষায় সাইপন বলে, তেলাপিয়া (১৮৬৫, ১৯৫২ মরিশাস, জাভা পুঁটি বা জাপানী পুঁটি (১৯৭২, ইন্দোনেশিয়া থেকে)। অবশ্য যে পুকুরে ডিম থেকে চারা ফোটানো হয় তাকেও পোনাপুকুর বলে।

বারুইপুর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, সে কারণে এ অঞ্চলে জলের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী। তাপমাত্রার পরিবর্তন ও জলের গুণাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এ অঞ্চল মাছচাষের পক্ষে উপযুক্ত। বারুইপুরের আদিগঙ্গা অববাহিকায় কিছু পুকুর আছে। যা বেলেপুকুর নামে খ্যাত। এইসব পুকুরে বালির ভাগ বেশী থাকায় জলের PH অনেক কম। একটি পুকুরের মাছচাষের জন্য সুষম PH মাত্রা হল 6.5 - 8.5 (নিরপেক্ষ মাত্রা 7)।

স্বাদু জলের পুকুরে এখন বেশ গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। স্থানীয় ভাষায় একে মোচা চিংড়ি বলে। বেলেপুকুরের তলদেশ পরিষ্কার। এইসব পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে এই চিংড়ি চাষের ব্যাপক সুযোগ আছে। বারুইপুরে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্থানে মাছচাষ হচ্ছে। এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ পুকুর বা মাছ নিয়ে কোন ভাবনাচিন্তা করত না। পোনা পুকুরে ভারীদের কাছ থেকে কিছু মাছ ফেলে দিয়ে কর্তব্য পালন করত। আজকে ফলের মত মাছও বারুইপুরের জনজীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। যা ছিল স্বপ্নাতীত সেই আঁতুড় পুকুর এখন বারুইপুরের যত্র তত্র, যেখানে ডিম ফুটিয়ে মাছের চারা উৎপাদন করা হয়।

চারা বলতে ডিম থেকে ডিমপোনা পরে ধানীপোনায় রূপান্তরিত হওয়া পোনাকে চারা পোনা বলে। অনেকে বিশেষ একটি জিওলমাছ যেমন সিং বা মাঁগুরকে নিয়ে পুকুরে বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করছে। অনেকে দক্ষিণ ভারতের অনুসরণে কৃত্রিমভাবে ট্যাংকের মাধ্যমে জিয়লমাছ চাষের চেষ্টা চালাচ্ছে।

বারুইপুরের পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য বিভাগ আধুনিক মৎস্য চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং জলের PH পরীক্ষা এবং পুকুরের মাটি পরীক্ষারও ব্যবস্থা করছে। উদ্দেশ্য সৎ কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ঘটছে না এই বিভাগের।

বেশ কিছু দিন হল মাছের একটি রোগ দেখা দিচ্ছে। রোগটি গায়ে ঘা (ক্ষত) হওয়া। এটি হচ্ছে জলের উপর স্তরে থাকা মাছগুলিতে। এই ক্ষেত্রে টেরামাইসিন ক্যাপসুল অল্প জলে গুলে তা জলের উপর স্তরে ছড়িয়ে দিলে ভালো কাজ হয়। ভালো কাজ হয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে। পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট গোলা জলে যেমন ভাবে মাছকে স্নান করানো হয় সেইমত ক্যালেন্ডুলা মাদার টিংচার ও হিপার সালফার ২০০-এর মিশ্রনে মাছকে স্নান করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বারুইপুরের নগরায়নে এখন রঙীন মাছের চাহিদা খুব। এখানে দু-একজন চাষ শুরু করেছে।এ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা আছে তার খাদ্য কেঁচো চাষেরও। মাছের অন্যতম শত্রু গোসাপ (স্থানীয় ভাষায় গু-এঁড়কেল), এর বর্ণ স্বর্ণবর্ণ। সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলে অন্য এক গোসাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। স্থানীয় লোকেরা একে ত্যালকা বলে। এর বর্ণ কালচে। অবশ্য উভয়ই এক প্রজাতির। বড় বড় ত্যালকাকে অনেক সময় ছোটখাট কুমির বলে ভুল হতে পারে। বিদেশে এর চামড়ার প্রচুর চাহিদা আছে। বাণিজ্যিক ভাবে এর চামড়া বিদেশে রপ্তানী করতে পারলে এখানকার অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হতে পারে। মাছের উপজাত দ্রব্য যেমন আইজিন গ্লাস, ফিসপ্লু (এক ধরনের আটা) যার বাজারে আছে বিশাল চাহিদা। সে নিয়েও ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।

ফলের দেশ বারুইপুর। তার জলজ ফল পানিফল। স্থানীয় ভাষায় তাকে সিঙাড়া বলে। অবশ্য সিঙাড়া নামে ময়দার তৈরী একরকম খাবার দোকানে পাওয়া যায়। মনে হয় এই ফলের মত দেখতে বলে খাবারটির নাম সিঙাড়া। মজে-যাওয়া আদিগঙ্গার বুকে নতুন করে যে খালকাটা হয়েছে তার জলে এই পানিফলের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। যে জলতলে দোঁয়াশ মাটি আছে সেখানে এই ফল খুব ভাল জন্মায়। দুধনই গ্রামে প্রথম পানিফলের চাষ হয়েছিল, এখনও হচ্ছে।

বারুইপুরের সর্বত্র জলাস্থানে পাওয়া যায় বাংলার নিজস্ব ফুল শাপলা। স্থানীয় ভাষায় শাঁপলা। অনেকে শামলাও বলে। শাপলার মূলকে অনেকে শালুকও বলে। সাদা, লাল, নীল তিনপ্রকারের শাপলা হলেও সাদারই বেশী বাড়বাড়ন্ত। লাল তুলনায় কম হলেও নীল প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতির দলে। সাদা শাপলা আনাজ বা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে লাল শাপলার ব্যবহার অনেক কম। লৌকিক গল্পের প্রভাবে অনেকের মনে একটা সংস্কার গেঁথে আছে যে, এ শাপলা সেই গল্প কাহিনীর রক্ত দিয়ে তৈরী। পাকা শাপলাফুলের মধ্যে পোস্ত দানার মত

বীজ পাওয়া যায়, তা শুকিয়ে খই ভাজা হয়। সেই খইতে পাওয়া যায় অন্য এক আস্বাদ

বারুইপুরের বিভিন্ন জলাশয়ে একসময় শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম দু'ধরনের প্রচুর পদ্মফুল ফুটত। পদ্মপুকুর, পদ্মজলা গ্রামগুলি তো তার সাক্ষী। ফুলতলার হিমসরোবর তো সেদিন পর্য পদ্মের জন্য বিখ্যাত ছিল। রানাগ্রামের পদ্মপুকুরটিও নেই। বারুইপুরে এখন পদ্মের অস্তি

জলের কথা হচ্ছে যখন তখন হাঁসের কথা আর বাদ যায় কেন ? বারুইপুরের প্রায় সব গ্রা হাঁস দেখতে পাওয়া যায়। তবে জলা অঞ্চলে বেশী। হাঁস অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য না-দিলে গ্রাম্য গৃহবধূদের হাতখরচের যোগান দেয়। এ হাঁসগুলি পাতিহাঁস। তবে অনেকে শখ কা রাজহাঁস পোষে। আজকাল অবশ্য আর এরকম শখ খুব বেশী দেখা যায় না।

চাষবাস ঃ কৃষি– বারুইপুরের শতকরা ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপ নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, এখানকার অর্থনীতির মূল উৎসও কৃষি। এবং এই একই কারা এখানকার গ্রামাঞ্চল এখন সমৃদ্ধ। স্বাধীনতার পূর্বে বা পরের কয়েক বছর এমন ছিল ন ষাট দশকে সূত্রপাত হলেও সত্তর দশকে শুরু হয় নড়াচড়া, আশির দশকে সুফল মিলত থাকে। পরিবেশ, পরিস্থিতি, অভাববোধ, চাহিদা, বাজার, শিক্ষাবিস্তার, আধুনিকতা, বিজ্ঞা ভাবনা, প্রতিযোগিতা সব মিলিয়ে এ অঞ্চলের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে উন্নয়নের স্তরে

ফসল রোপণের সময় অনুসারে কৃষিজ ফসল দু'ভাগে বিভক্ত, ১) খারিফ ফসল ২) রা ফসল। আবার অন্য ভাগেও ভাগ করা হয়। চা , কফি, ডাব পানীয় ফসল; পাট , শন, তুল তন্তুফসল; ধান গম প্রভৃতি তণ্ডুল ফসল বা ভক্ষ্য ফসল। আবার যে ফসলে অর্থ আসে তা বাণিজ্যিক ফসল, বাগানে যে ফসল ফলে তাকে বাগিচা ফসল বলে। অনেকে যে গাছ দীর্ঘদি ফল দেয় তার ফলকে বাগিচা ফসল বলে। যে গাছ আপনা আপনি জন্মায়, বিনা পরিচর্যা ফল দেয়, যেমন– খেঁজুর, তাল প্রভৃতিকে স্বাভাবিক ফসল বলে।

ধান – এ-অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে ধানচাষ হয়। শাস্ত্রমতে ধান চার প্রকা ১) দাউদখানি, ২) বৃহি, ৩) উড়ি, ৪) দেধান। রোপণ সময়কাল অনুসারে তিন প্রকার ১ আউশ, ২) আমন, ৩) বোরো। বারুইপুরে আউশের চাষ হয় না। অনেক আগে দু-একজ চাষ করেছিল এখন আর কেউ করে না। আমনধান সর্বত্র ফলে। ইদানিং বোরোচাষ অনেকটা বেড়েছে। বারুইপুরের পশ্চিমে ধোপাগাছি, টংতলা এলাকায় জমি খুব নীচু। তাড়াতাড়ি জলে ডুবে যায় (সেজন্য এই অঞ্চলকে জলা বলে)। তাই এখানে খুপি দেওয়া পদ্ধতিতে আমনধান রোপণ করা হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মে খোপ কেটে শুকনো ধান দেওয়া হয়। সেই ধা থেকে চারা বের হয়। যখন জল জমে বাড়তে থাকে, ধানের চারা সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। এখানকার মানুষের বর্তমানে বোরোচাষে উৎসাহ বেশী। অন্যত্র বোরো ব আমন সবক্ষেত্রে বীজতলা পদ্ধতিতে চাষ হয়। অর্থাৎ মাটি কর্ষণ দ্বারা উপযুক্ত করে সেখানে বীজ অর্থাৎ ধান ছড়িয়ে চারা করা হয়। একে বীজতলা বলে। পরে এই বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলে (স্থানীয় ভাষায় বীজ ভাঙা বলে) আটি বেঁধে জমিতে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হয়। ভাল ধানচাষের জন্য দরকার ২০° – ৩০° উষ্ণতা এবং ১৫০–২০০ সেমি বৃষ্টিপাত। বারুইপুরে যা সহজলভ্য।

বিভিন্ন দেশী প্রজাতির ধানের নাম – পাটনাই, রূপশাল, ঝিঙেশাল, মরিশাল, কেউটেশাল, উড়াশাল, লালমোটা, কালোমোটা, আঁশফলি, কনকচূড়, হরকুল, বাসমতি, গোপালভোগ, রাসপাগড়ি, ঝিঙেগোড়, অগ্নিবান, পাটনাই, বাসমতি, জ্ঞাত, হরিমতী, কাঁটারাঙি, দলপদরাঙি, পলবিড়ে, মালাবতী, লক্ষ্মী পাটনাই, দেরাদুন পাটনাই, জ্ঞাত পাটনাই, বোকড়া, ধলো বোকড়া, বানেশ্বর, ফুলেশ্বরী প্রভৃতি। স্থানীয় প্রবাদ, মানুষের যত নাম ধানেরও ততনাম।

উচ্চফলনশীল ধান – তাইচুং, জয়া, আই আর ৮ , ক্ষিতীশ , অমূল্য, আম্রপালী, ললাট, মিনিকীট, রত্না, মাসুরী, লাল মাসুরী, স্বর্ণ, পঙ্কজ, স্বর্ণমাসুরী, আই আর ৪২, ১০৪৬, ১০৫২প্রভৃতি।

সংকর জাতের ধান – (হাইব্রীড) গোবিন্দ, আদিত্য প্রভৃতি। মুড়ির ধান হিসাবে মরিশাল, ঝিঙেশাল, হরকুল প্রভৃতি এবং খইয়ের ধান হিসাবে মরিশাল, কনকচূড় বিখ্যাত। মোয়ার খইয়ের জন্য দরকার হয় কনকচূড় ধানের। এই ধানের খই সুগন্ধিযুক্ত হয় । মুড়ি ও খই ভেজে এ অঞ্চলের অনেক পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। সব ধানে চিঁড়ে হয়। তবে বড় চিঁড়ের জন্য পাটনাই ভালো।

পাট – বাণিজ্যিক ফসল। একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর পাটচাষ হত। এখন অন্যান্য চাষের সুযোগ থাকায় এ চাষ কম হচ্ছে। এছাড়া বাজারে দামের অনিশ্চয়তা এর অন্যতম কারণ। আর একটা অসুবিধা হল পাট পচানো। পতিত জলাশয়, খাল, ডোবা কমে যাওয়া তার কারণ। পাটের শুকনো পাতাকে নালতে পাতা বলে, আয়ুর্বেদের ঔষধ।

গম – এখানে খুব কম হয়। ঝাড়াই, মাড়াই সমস্যা মূলত চাষীদের অনাগ্রহের কারণ। ডাল কলাই চাষের মধ্যে বুট বা মটর চাষ প্রধান। এর শুটি সব্জী হিসেবে বাজারে বিক্রী হয়। বাজারে এর খুব চাহিদা। মসুর, খেসারী (স্থানীয় নাম তেউর বা তেবড়ে) চাষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবে বাজারে তেবড়ে শাকের ভাল চাহিদা আছে। বর্তমানে উত্তরভাগ মৌজায় আজাওয়া মুসুর কলাই চাষ হচ্ছে। আজাওয়া অর্থাৎ জমি কর্ষণ না-করে বীজ ছড়ানো। ছোলা ভালো হলে কি হবে চাষীরা আগ্রহহীন। এ অঞ্চলের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের মুগের চাষ হয়। যেমন, কৃষ্ণমুগ, সোনামুগ, চৈতেমুগ, বিউলি, ঠিকরে কড়াই (কলাইকে স্থানীয় ভাষায় কড়াই বলে)। অড়হর বেড়া হিসাবে চাষ হয়,ঋ ফলটা অতিরিক্ত লাভ।

আলু – আলু বলতে আমরা গোল আলুকে বুঝি। আলুর বিভিন্ন প্রজাতি আছে যেমন, কাটোয়া, আলতামুখী, চন্দ্রমুখী, নৈনিতাল প্রভৃতি । তাছাড়া অন্য আলু যেমন, রাঙাআলু বা লাল আলু এখন চাষ অনেক কমে গেছে। ঝোড়া বা চুবড়ি আলু বাগানে হয়। তাকে স্বাভাবিক উদ্ভিদের দলে ফেলা যায়। সুন্দর আলু – জমির বেড়াতে চাষ হয়। শাঁকালু – ফল হিসাবে খ্যাত। পতিত জমিতে খুব হয়। শেষোক্ত আলু দুটিও স্বাভাবিকের দলে। কল্যাণপুর , ধোপাগাছি এলাকায় গোলআলু চাষ বেশী হয়। বর্তমানে পিয়ালী অববাহিকার বাদাভূমিতে ব্যাপক চাষ হচ্ছে।

বেগুন– সময় অনুযায়ী তিন প্রকার। খোরো (গ্রীষ্ম), বর্ষা, শীতে বেগুন। আবার প্রকৃতি

অনুযায়ী যেমন, কাঁটা, গুলি প্রভৃতি। বিভিন্ন বেগুনের নাম– মুক্তকেশী, এলোকেশী, বোড়াল পায়রাটুনি, শাসন গুলি, মহম্মদগুলি, মাকড়া, নুড়কি প্রভৃতি । একসময় শাসন, ত্রিপুরানগর অঞ্চলগুলি বেগুনচাষে বিখ্যাত ছিল। চঙ্গ-রামনগরও ছিল বিখ্যাত। চঙ্গের মুক্তকেশী বেগুন স্বাদে বিখ্যাত ছিল। হাইব্রিড বেগুনবীজ এখানকার চাষীরা পরিত্যাগ করেছে। বর্তমানে চিত্রশালী বেগুনচাষে খ্যাত।

মূলা – আউশে, পৌষে, লাল, সাদা, রাক্ষুসে প্রভৃতি। একসময় দুধনইয়ের পৌষেমুলো বিখ্যাত ছিল। শরতের মুলোকে আউশে, শীতের অর্থাৎ পৌষের মুলোকে পৌষেমুলো বলে। উন্নতপ্রজাতির সাদামুলার বাজার এখন রমরমা।

ট্যাড়শ – সাতশিরা, পাঁচশিরা। বর্তমানে সঙ্কর জাতীয় অর্থাৎ হাইব্রীড ঢেঁড়শের চাষ সর্বত্র। দেশী ট্যাড়শ সত্বর লুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর একটি ট্যাড়শ আছে। টক্ ট্যাড়শ। আটঘরা, সীতাকুণ্ডু, চিত্রশালী একসময়ে এই চাষে খ্যাত ছিল।

পালাচাষ – বাঁশের পালাতে যে চাষ হয় তাকে পালাচাষ বলে। এতে সিম, ঝিঙে, তুরুল, বরবটী, শশা প্রভৃতি চাষ হয়।

শিম – আলতামুখি, পাথুরে, নলডোগ, হাতির কান , কটকি, বোগো, সাদা শিম প্রভৃতি।

ঝিঙে – পালায় চাষ হয়, আবার মাটিতে হয় রবিচাষের সময়। আবার বর্ষায় শন গাছের মধ্যে চাষ করা হয়। এই শন তন্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, ঝিঙে লতার সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পালাচাষে ধপধপি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খ্যাত ।

মাচাচাষ বা ভারাচাষ – কুমড়া, লাউ, চালকুমড়া, শশা, করলা, পুঁই, চিচিঙ্গে , কাঁকরোল প্রভৃতি। কুমড়ো শীতে ও গ্রীষ্মে অবশ্য মাটিতে হয়। একমাত্র বর্ষাকালে মাচায় হয়। লাউ আগে শীতকালে হত , এখন বারোমাস হয়। মাচা ছাড়া শশা শীতে, গ্রীষ্মে মাটিতে হয়। লাউ ও শশার কলম থেকে চারা করা যায়। তার ফলনও খুব ভাল হয়। রবিশস্য হিসাবে আলু কলাইয়ের পাশাপাশি মেথি, ধনে, মৌরি, তিল, সরষে, নটেশাক, ধনেশাক, ফুলকপি, বাঁধা কপি, ওলকপি, বীট, গাজর, বীন, পালংশাক, কাঁকুড়, ফুটি, উচ্ছে প্রভৃতির ব্যাপক চাষ বারুইপুরের সর্বত্র হয়।

টম্যাটো– স্থানীয় ভাষায় গুড়কেবেগুন বা বিলাতি বেগুন বলে। এখন হাইব্রিড টম্যাটোর চাষ চারদিকে। দিশি টম্যাটো বিলুপ্তপ্রায়, উত্তরভাগ ভেড়ী অঞ্চলের দু-এক জায়গায় এর চাষ দেখা যায়। গ্রাম অঞ্চলে তরমুজ, লঙ্কার চাষ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। পটলচাষে উত্তরভাগ এখন বিখ্যাত। কচুচাষে শাসন মতান্তরে কুমারহাট বিখ্যাত। কচু আবার অনেক প্রকারের। যেমন, মানকচু, গুঁড়িকচু (মুইকচু -স্থানীয় ভাষায়), ভোটকচু, পদ্মমানকচু, ছোলা কচু, কালকচু প্রভৃতি। পদ্মমান, ছোলা ও কালকচু শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শংকরপুর, মীরপুর এলাকায় একসময় ট্যাপারি চাষ হত। বর্তমানে এটি বিলুপ্ত প্রজাতির দলে। বারুইপুরের প্রায় সর্বত্র আখ (ইক্ষু) জন্মায়। শুধুমাত্র মেলাপার্বণে বিক্রী, বাণিজ্যিক অন্য সুযোগ নেই। বারুইপুরের নামের মধ্যে বারুই অর্থাৎ পানচাষী। মদারাট অঞ্চল একসময় পানচাষে বিখ্যাত ছিল।

সঙ্গী ছিল দুধনই। পানের বরজ ঢাকা থাকত পটলগাছে বা পলতায়। পটল তেমন না-ফললেও লাভ হত দুর্লভ পলতায়।

পানগাছের মত দেখতে মরিচগাছ। আসলে লতা। বারুইপুরের আবহাওয়ায় মরিচচাষের ব্যাপকতর সুযোগ আছে। বাগানের গাছের পাশে চারা লাগালে গাছ বেয়ে উপরে উঠবে মরিচগাছ। অতিরিক্ত পরিচর্যার দরকার নেই। মরিচকে বলা যায় অতিরিক্ত বাগিচা ফসল। মরিচের বাণিজ্যিক মূল্য অনেক।

সূর্যপুর, শংকরপুরে, রানা, পদ্মজলায় সবজীর চারা তৈরীর অনেক নার্সারী আছে। বারুইপুর বাজার এই চারা বিক্রির বিশেষ বাজার। অন্যান্য বাজারেও চারা বিক্রি হয়।

ভেষজ – আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা শাস্ত্র। অতিপ্রাচীন কালে এই শাস্ত্রের সৃষ্টি। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের ভেষজের বিস্তৃত আলোচনা আছে। বর্তমানে নতুন করে আবার আয়ুর্বেদের প্রসার হচ্ছে। আয়ুর্বেদে বলে, সব গাছই ভেষজ। কারণ সব গাছে দ্রব্যগুণ আছে। বারুইপুরে যে সব লতাগুল্ম কন্টকাদি পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম, পাশে দিলাম স্থানীয় নাম। তরুরাজির নাম রাখছি না। সেগুলি আমরা পরে পাবো ফল বা বনভূমির মধ্যে।

হিঞ্চে (হিমচে), শানচে, পূর্ণিমা (পুনপো), গাধা পূর্ণিমা, ব্রাহ্মী (বামনী), থানকুনী (অনেকে একে ব্রাহ্মী বলে। থালকুড়), গ্রীষ্ম সুন্দরী (গিমে), ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ), কলমী, চাকুন্দে, খুঁদে কেশরী, মুক্তোঝুরি, তেলাকুচা, ইঁদুরজালি, বাস্তুক (বেতো), জামাই নাড়ু, সুন্বি (সুষনী) ছিলিহিন্ট (জলজমানি), বুড়িপান, তাম্রপুষ্পী, লক্ষ্মীনটে, অগ্নিমন্থ (গন্ধপাতা - ডাল রান্নায় ব্যবহৃত হয়), সহদেবী, গন্ধভাদুলী (গাঁদাল), অনন্তমূল, ঝালনটে, কাঁটানটে, গুলঞ্চ (গুড়চী) হাতিশুঁড়, ধুতুরা, গন্ধনাকুলী, অশ্বগন্ধা (বড় চাঁদড়), সর্পগন্ধা (ছোট চাঁদড়), বন চালতা, কুলে খাঁড়া, ঘৃতকুমারী, জয়ন্তী, বড়া, অপরাজিতা, কালকাসুন্দে, শতাবরী (শতমূলা), আমরুল, পিপুল , আত্মগুল্ম (আলকুশী) বৃশ্চিকা (বিচুটি), লজ্জাবতী, কন্টিকারী (শিয়ালকাঁটা), কাকমাছি, দ্রোণপুষ্পী (ঘলঘসে),ব্যকুড়, কুড়চি, পাঠা (বানভারা) ফার্ন (ঢেঁকিশাক), অপমার্গ (আপাং), শতপুষ্পা (শুল্পো), কুঁচ, গজ পিপুল, কুড় (কুড়চি), বংশ রোচন, মদন (ময়না), মুলহাটী, লতাকাটাকি , পাথরকুচি, আম্রগন্ধা (আমআদা), ক্যাঁচড়া, বন হলুদ, হলুদ, বুঁচকি (বুঁচ), বনপালং, নাগাদানা, ইসলাঙ্গলা, পার্পট (ক্ষেত পাপড়া), ঘন্টাকর্ণ, টকপালং , ভুঁই কুমড়ো, হাড়ভাঙ্গা, ভুঁইছাতা (কুড়ুক, মাসরুম), বিশল্যকরণী, বনজোয়ান, জোয়ান, রাধুনী, ভূতরাজ (ভূতভৈরব), যুক্তিফুল, বাসক, তুলসী, কুলুত্থ কলাই, মাষকলাই প্রভৃতি।

ঘাস– দূর্বা, নল, শর, উলু (কেঁশে), বাঁশপাতা, ধানি, মুথা, শ্যামা, পাতি প্রভৃতি।

ছোটতরু – দাড়িম্ব, মেহেন্দী (মুদি), বাসক, রামবাসক, নিশিন্দা (নিশ্চিন্দে), ওলোট কম্বল, কাঞ্চন, শিউলি, কুরচি, ক্ষীরিনী, কু-হলুদ (এইগাছের ফলে হলুদ রং হয়) প্রভৃতি । নিষিদ্ধ গাছ– গাঁজা, ভাঙ্গা (ভাঙ)।

ফুল– জাতি (নয়নতারা), চামেলী, জুঁই, বেল, মল্লিকা, দোপাটি (ডুমুটি), মাধবী, কেয়া, জবা, স্থলপদ্ম, করবী, তরুলতা, ডালিয়া, জিনিয়া, মালঞ্চ, গন্ধরাজ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, কাঁঠালচাঁপা, দোলনচাঁপা, রজনীগন্ধা, ভুঁইচাঁপা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ভাবে গোলাপ, বেলফুল গাঁদা ও রজনীগন্ধার ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে। ব্যাপকভাবে ভেষজ লতা গুল্মের চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে দু-একজন শুরু করেছে। সবজী জাতীয় চাষে খরচ বেশী হওয়ায় এবং বাজারে ঠিকমত দাম না-পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে প্রায় হতাশ হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ভেষজ চাষ ও ফুল চাষ নবাদিগন্তের সন্ধান দিতে পারে। বর্তমানে বিদেশে ফুল রপ্তানী হচ্ছে।

নার্সারী করে ফুলের চারা শুধু নয়, টবে ফুল ফুটিয়ে বিক্রী করার নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে। উত্তর পদ্মজলার মৃণাল সরদার এবং আরো অনেকে এই ব্যবসা করছে ভালোভাবে।

ফল – ফলের ভাণ্ডারে বিবিধ আস্বাদনের ছড়াছড়ি। কোনটি রসাল, কোনটি রসহীন, কোনটি আবার মিষ্টি-স্বাদুফল, কোনটি আবার টক বা কষায় ফল। এই ফল কোনটি বাগিচা ফসলের অন্তর্গত আবার কোনটি রবিফসলের অন্তর্গত। আবার কোনটি জলজাত, আবার কোনটি লতাজাতীয় অথচ রবিখন্দের অন্তর্ভুক্ত। কোনটি আবার বাগিচাতে হয় অথচ ওষধি জাতীয়, যেহেতু বর্ষশেষে মারা যায়।

বারুইপুরের ফলের সংখ্যা প্রায় ষাট।

স্বাদুফল ঃ- আম – গোলাপখাস, বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া , কালাপাহাড়, চৌষা, দশেরী, হাঁড়িবাড়ি, বাসদেব, শশাফুলি, তোতাফুলি, বেগমফুলি, পেয়ারাফুলি, লতাবোম্বাই, আঁটিবোম্বাই , ভুতোবোম্বাই, মউচিনি, গোপালধোপা, রানীপসন্দ, কটোসুন্দরী, বর্ণচোরা, বকমুখী, কাঁচামিঠে, ফজলী, চালতা, বগোশুঁড়ো, বারোমেসে প্রভৃতি। পেয়ারাফুলি এবং ফুলিজাতীয় আমগুলিকে অনেকে বারুইপুরের নিজস্ব বলে দাবী করে । উচ্চ ফলনশীল হিসাবে মল্লিকা, তাম্রপালী। সংকর জাতের আম – সুবর্ণরেখা। বারোমেসে আমের মধ্যে ভাসতারা (৩ বার ফলে), চীনে দুফলা, বাবলু দুফলা (২বার) বিখ্যাত। এগুলি সাধারণত টক আম।

হায়দরাবাদের বিখ্যাত আলফান্সো আম এবং মহারাষ্ট্রের হাপুস আম এখন বারুইপুরে চাষ হচ্ছে। এই আমদুটির বিশেষত্ব পচনশীল নয়। গোলাপখাস পচনশীল হলেও দ্রুত নয়। যার জন্য এই আমটিও বাণিজ্যিক দিক থেকে অর্থকরী। হাপুস আলফান্সোর সাথে হিমসাগর-বোম্বাই-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে যদি নতুন কোন প্রজাতির সৃষ্টি হয়, তবে আমচাষে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে। কারণ, আম আর তখন পচনশীল হবে না। বাজারে নতুন একটি আলফান্সোর ক্রশবিড এসেছে তার নাম কালাপাহাড়। বারুইপুরের নিজস্ব আম কি, তা নিয়ে নানান মত আছে। তবে বোম্বাই আমের ব্যাপকতা ছিল বেশী। পুরানো আমলের সেই সব গাছ প্রায় কাটা পড়ে গেছে। বারুইপুরের নগরায়ন হওয়ার ফলে পুরাতন বাগানগুলির অস্তিত্ব আর নেই। বর্তমান শিবানীপীঠ, ঋষিবঙ্কিম নগর প্রভৃতি স্থানে বিশাল বিশাল আমের বাগান

ছিল। বাগান না বলে জঙ্গল বলা ভালো, সূর্যের আলো প্রবেশ করত না সেখানে।

এখানকার প্রাচীন লোকেরা আমকে আঁপ বলত। কেউ কেউ বলত আঁব। এখনও অনেকে তাই বলে।

লিচু – (স্থানীয় ভাষায় নিচু) দেশী গোলা ও বোম্বাই। দেশী গোলা প্রথমে পাকে, বোম্বাই পরে পাকে। তবে রঙে এবং স্বাদে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ। সাধারণত দেশী লিচু প্রায় প্রতিবছর ফলে। শাসন, শিখরবালী, খোদারবাজার, কল্যাণপুর লিচুর জন্য বিখ্যাত। বারুইপুরের আদিগঙ্গা অববাহিকায় এটি ফলে। বিদ্যাধরী–পিয়ালী অববাহিকায় এ গাছ জন্মায় কিন্তু ফল হয় না। স্থানীয় ধারণা ফলের ভারে গাছের ডাল নিচু হলে লিচু পরিপুষ্ট হয়।

আঁশফল – লিচুর পরেই আসে এই ফল। এ ফলে শাঁস আছে তবে লিচুর মত রসাল নয়।

শিখরবালীর আঁশফল আকারে বড় হয়। ফল পাকার সময় আষাঢ় মাস।

পেয়ারা – খাজা, ফুলকাশী, ভাদ্দুরেকাশী, দুধেকাশী, দোমড়া, ন্যাসপাতি, বিলাসপুরী, নাগপুরী, দিশি, ঠিকরি, লালখোল প্রভৃতি। আদিগঙ্গার পশ্চিম পারে এই চাষের ব্যাপকতা বেশী। বিশেষ করে বারোমেসে পেয়ারায়। বিরাল, বৈকুণ্ঠপুর, ধোপাগাছি, কল্যাণপুর, খোদার বাজার, শাসন প্রভৃতি অঞ্চলের এখন প্রধান ফসল এই পেয়ারা। দুধনই, বেলেঘাটা, রানা, শাঁখারীপুকুর অঞ্চল দিশি পেয়ারায় বিখ্যাত ছিল। এখন সেখানেও শুরু হয়েছে বারোমেসে পেয়ারা। স্থানীয় ভাষায় হাইব্রীড। স্থানীয় লোক হাইব্রীড বললেও এটি সংকর জাতীয় নয়। বারুইপুরের অন্যত্রও ব্যাপক হারে পেয়ারা চাষ হচ্ছে, এমনকি বাদাভূমি অঞ্চলেও। পেয়ারার একনাম আমরুত। অমৃত থেকে আমরুত শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ পেয়ারা অমৃততুল্য। বাজারে এখন কয়েকটি নতুন জাতের পেয়ারা এসেছে। যেমন, কেজী পেয়ারা-এর ওজন প্রায় এক কেজি। ন্যাসপাতির মত স্বাদ।

কালোজাম – বড় জাতীয়, ছোট জাতীয় (বুনো বা কুকুরে)। বড় জাতীয় ফলটি গ্রীষ্মে ফলে, ছোট জাতীয় ফলটি তার পরে বর্ষায় ফলে। ফলটি দামী ফল। বাজারে প্রচুর চাহিদা আছে। বহুমূত্ররোগীর উপকারে লাগে।

গোলাপজাম – সুবাসিত মিষ্টি ফল। একসময় এর কদর ছিল না। কারণ ফলগুলি ছিল ছোট এবং রং ছিল অনুজ্জ্বল। বর্তমানে আধুনিক পরিচর্যায় বারুইপুরের গোলাপজাম জাতে উঠেছে। এ ফলটিও দামী ফল। পদ্মজলা ও তার আশপাশ এই ফলের জন্য বিখ্যাত। উঃ পদ্মজলার নবকুমার নস্কর, বাসুদেব নস্কর গোলাপজামের বড় চাষী।

সবেদা (সফেদা) – এই ফল দুপ্রকারের; ১) ছোট জাতের, যাকে নারকুলে সবেদা বলে ২) বড় জাতের। ছোটটির স্বাদ বেশী। গাঙ্গেয় অববাহিকায় সর্বত্র এই ফলটি ফলে। যতদূর জানা যায়, নাগপুর থেকে এই ফলটি বারুইপুরে এসেছিল।

জামরুল – সাদা, সবজেটে, আলতামুখি। আলতামুখীর বাজার নেই। সাদার দাম ও চাহিদা

বেশি। এখন অসময়ে ফলছে। সে কারণ বাণিজ্যিক ভাবে এর কদর বাড়ছে দিন দিন।

আনারস – বড় বড় বাগানে, বড় বড় গাছের তলায় গাছগুলি অবহেলায় অযত্নে পড়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে আনারসের চাহিদা বেশী থাকায় এই রসাল ফলটির প্রতি এই অঞ্চলের চাষীদের অবজ্ঞা খুব বেশী। এর ছোট আকার তার অন্যতম কারণ। কিন্তু এর স্বাদে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বড় গাছের তলায় যেহেতু এটি হয় সেজন্য একে অতিরিক্ত বাগিচা ফসল বলে।

কাঁঠাল – খাজা, রসখাজা, গোলা, ভাদ্দুরে প্রভৃতি। বারুইপুরের সর্বত্র কাঁঠাল দেখতে পাওয়া যায়। ফলটি বর্ষার ফল। যদিও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকতে শুরু করে।

কলা – কাঁঠালী, চাঁপা, মর্তমান, কাঁচকলা, ডেমরে (দানাওয়ালা), সিঙ্গাপুর বা ভুসওয়াল (অনেকে একে কাবলী কলা বলে)।

বারুইপুরের সর্বত্র কলাচাষ হয়। কাঁঠালীকলা দু-প্রকারের। ১) সাধারণ ২) লতা কাঠালী চাঁপাও দুই প্রকারের। ১) সাধারণ ২) চিনি চাঁপা। মর্তমানও কয়েক প্রকারের। ১) ঢাকাই, ২) দেশী, ৩) চাটিম প্রভৃতি। কাঁচকলাও দুই প্রকারের। ১) সাধারণ, ২) বাইশে, (এ কলার কাঁদিতে ২২টি ছড়া হয়)। এছাড়া উন্নত প্রজাতির বিভিন্ন কলা যেমন, সেভেন স্টার প্রভৃতির চাষ হচ্ছে।

পেঁপে – সাধারণত দু জাতীয় পেঁপের চাষ হয়। একটি লম্বা জাতীয় (কাবলি), অন্যটি গোল জাতীয় । কাঁচা পেঁপে সবজী হিসাবে ব্যবহার হয়। পেঁপে সহজপাচ্য। তাই রোগীর পথ্য তালিকায় তার ঠাঁই উপরে। পাকা পেঁপের বাজারদর ভাল। পাকা পেঁপে খাদ্যগুণে ভরা। এছাড়া আছে, নোনা, আতা, বেল, গাব, ডালিম, কেঁও, শশা, পানিফল, শাঁকালু, নারকেল, বাদাম (বাক্স, কটকি, চীনা), বিলাতী আমড়া, তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, ডেয়ো (মান্দার) প্রভৃতি ফল।

পানীয় ফল – ডাব । গাঙ্গেয় অববাহিকায় ফসল হলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে নোনা এলাকায় এই গাছের চাষ হচ্ছে এবং তুলনামূলকভাবে নোনা এলাকায় এর ফলনও বেশী।

কষায় বা টক ফল– জলপাই । ভূমধ্যসাগরীয় এই বিখ্যাত ফলটি বারুইপুরের গাঙ্গেয় দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায়। বেলেঘাটা, শাঁখারীপুকুর , বারুইপুর পুরাতন থানা এলাকায় এর ফলন বেশী।

লেবু ঃ- বারুইপুরে বিভিন্ন প্রকার লেবু জন্মায়। যেমন– পাতিলেবু, কাগজীলেবু, গন্ধরাজ, বাতাবী, মোসাম্বি, গোঁড়া, জামির প্রভৃতি।

বাতাবীলেবু দুপ্রকারের, ১) সাদাখোল, ২) লালখোল। লালখোল লেবুটি খুবই সুস্বাদু।

মোসাম্বী লেবু – সম্প্রতি এই লেবুচাষের প্রবণতা এ অঞ্চলে বেড়েছে। বালি অঞ্চলে এর ফলন খুব ভালো। রসের প্রাচুর্য থাকলেও আস্বাদে একটু জলো ভাব দেখা যাচ্ছে। একটু

টোটকা বাতলে দিই। মূলকাণ্ডে বা গুঁড়িতে কলি চুন লাগালে স্বাদের উন্নতি হবে। বাতাবী ও মোসাম্বি দুটিকে স্বাদুফলের ঝুড়িতে রাখা যায়। শখ করে অনেকে কমলালেবুর চারা বাড়িতে বসিয়েছে। ফলছে খুব, কিন্তু সমস্যা সেই স্বাদের।

গন্ধরাজ – গন্ধরাজলেবুর চাষ শুধু মাত্র বৃদ্ধি পায়নি। পেয়ারার মত বানিজ্যিক ভাবে চাষ হচ্ছে। এবং তার ফলন বাড়ানোর জন্য নানান ভাবনাচিন্তা চাষীরা করছে। কাগজী নিয়ে নতুন করে বড় আকারের ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। গোঁড়া, জামীর আয়ুর্বেদে প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ফলদুটি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির দলে চলে গিয়েছে।

করমচা – কৃষি অর্থনীতিতে করমচার ভূমিকা ব্যাপক। কৃত্রিম চেরীর দৌলতে করমচার এখন জয়জয়কার। যার জন্যে এখানে কয়েকটি কারখানা গড়ে উঠেছে। অনেকে আবার করমচা সংরক্ষণে উৎসাহী। বড় বড় ড্রামে রসায়ন মিশ্রিত করে তাতে করমচা রেখে দিলে বহুদিন তাজা থাকে । এই সংরক্ষণ ব্যবসায়ে ধপধপী, সূর্যপুর, আটঘরা অঞ্চলের চাষীরা জড়িত। বিরাল, বৈকুণ্ঠপুর, ধোপাগাছি, কল্যাণপুর, আটঘরা, রামনগর, সীতাকুণ্ডু, ধপধপি সর্বত্র এর চাষ হয়। মাঝখানে কিছুদিন এর বাজার মন্দা হওয়ায় চাষীদের কপালে ভাঁজ পড়েছিল।

এছাড়া আছে কয়েতবেল, চালতা, তেঁতুল, নোড়, কুল, কামরাঙা (টক ও মিষ্টি দুপ্রকার) ফলসা, বুনো আমড়া (দিশি) প্রভৃতি ফল। আয়ুর্বেদের বিখ্যাত ত্রিকষায় বা ত্রিফলা হরীতকী আমলকী , বহেড়া এখানে জন্মায় কিন্তু বাণিজ্যিক সুবিধা না থাকায় এর চাষ কম। আগামীদিনে এই ত্রিফলার ব্যাপক চাষের সম্ভাবনা আছে।

কেয়াফলটি – বারুইপুরে লুপ্ত প্রজাতির দলে। গাব ফলটিরও প্রায় একই দশা।

শোভাঞ্জানি – সজনে ফলটিকে লোকে ডাঁটা বলে। আর একটি প্রজাতি আছে নজনে বা নদনা, এটি বৎসরে ২/৩ বার ফলে। আর একটি লুপ্তপ্রায় প্রজাতি আছে, নাম মদনা। এটি আকারে ছোট এবং লালচে, বারোমাস কমবেশী ফলে। এই ফলটি সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ডুমুর বা ডুম্বুর – এটিও সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছটিও লুপ্তপ্রায় প্রজাতির দলে নাম লেখাতে বসেছে। বাণিজ্যিক সুবিধা নাথাকাটাই এর অন্যতম কারণ। যজ্ঞডুম্বুর নামে আর একটি ডুমুর আছে। আয়ুর্বেদে তার ব্যাপক ব্যবহার আছে।

নারকেল – ডাব ও নারকেল একই ফল। প্রথমাবস্থাকে ডাব বলে, তখন শুধু জল। পরিণতাবস্থায় নারকেল। বারুইপুরের নারকেল বড়জাতের এবং স্বাদীয়। এখানে ছোটজাতের হাজারী যার কাঁদিতে ফলন বেশী, সেই নারকেল গাছ খুব কম দেখা যায়। বাজারে চাহিদা তার কম। তার কারণ, বারুইপুরের নারকেল খাদ্যফল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তেল হিসাবে ব্যবহার কম। কেরালায় তেল হিসাবে ব্যবহার হয়, তাই সেখানে ছোটজাতের হাজারীর চাষ বেশী।

একবার 'এফিকর' নামে এক সমাজসেবী সংস্থার কর্ণধার কর্নেল ম্যাথুজ নামে এক ভদ্রলোক কেরালাবাসী আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁকে ডাবের জল খেতে দিলে, জল খেয়ে বিস্ময়ে বলেছিলেন, আমরা ভারতে নারকেল চাষে প্রথম কিন্তু এমন স্বাদীয় পানীয় কখন ও পান করিনি। কেরালার গর্ব আপনি ভেঙে দিলেন। এই নারকেলটির স্থানীয় নাম সুপারীপোঁদা। বড়গ্লাসের দুগ্লাস জল এতে ধরে। মিছরির জলের মত মিষ্টি। নমুনা হিসাবে কয়েকটি তিনি নিয়ে গেছিলেন সেখানে চাষ করার জন্য । তাঁর অকালমৃত্যুতে জানতে পারিনি বারুইপুরকে কেরালার মাটিতে প্রোথিত করেছিলেন কিনা। বিশালক্ষ্মীতলার সুখরঞ্জন গুহর বাগানে একটি গাছ আছে, বড়খোল অথচ বিরাট কাঁদি হয়। প্রতি কাঁদিতে ৫০ থেকে ৮০টি ডাব থাকে। নারকেলগাছের আলোচনা করার সাথে সাথে এসে পড়ে তাল, খেঁজুরের নাম। কচি তাল থেকে বের-করা তালশাঁসতো খুবই লোভনীয় আবার পাকাতাল থেকে তৈরী তালবড়ার তো কথাই নেই। জিভে জল এনে দেয়। তাল থেকে আরো অনেক কিছু তৈরি হয়। যেমন, তাল সক্করা, তালভাত, তালের রুটি, তালের পিঠে প্রভৃতি। তাল নিয়ে বাংলাদেশে এক দৈব অনুষ্ঠান আছে, তার নাম তালনবমী। জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া অন্যতম একটি উপচার। তালের রস সুমিষ্ট পানীয়। তালের রস থেকে তৈরী হয় তালপাটালী তৈরী হয় তারগুড়। সার তালগুড় থেকে তৈরী হয় মিছরি, তালমিছরি। নেশাখোরদের কাছে তালরস খুব প্রিয়। তালরস থেকে তাড়ি হয়। যদিও এটি নিষিদ্ধ পানীয়। তালের মত খেঁজুরও একই পথের পথিক। তবে এই খেঁজুরকে দিশি খেঁজুর বলে।

ডাব, নারকেলকে পানীয় ফল বললে তাল, খেঁজুরকে কি ফল বলা হবে? ফলগুলি তো পানীয় নয়। অথচ সুমিষ্ট পানীয় উপহার দেয় দুটি গাছ। আবগারী দপ্তরের অনুমতি পেলে পাওয়া যায় ভেষজ সুরা। সেও একদল মানুষের কাছে প্রিয় পানীয়। সুতরাং তাল-খেঁজুর-কে পানীয় উদ্ভিদ বলা সমীচীন। দুজনে একই পথের পথিক হলেও খেঁজুরগুড় স্বাদেগন্ধে অতুলনীয়। খেঁজুরগুড় ছাড়া তো মোয়ার কথা ভাবা যায় না। খেঁজুরগাছে নল দিয়ে রস বের করা হয় বলে খেঁজুরগুড়কে নলেনগুড় বলে। নলেনগুড়ের সন্দেশ কার না ভাল লাগে! নলেনগুড় না-থাকলে কি শীতের পিঠেপুলি এমন করে জমত? নলেনগুড় ছাড়া কি আর পৌষপার্বণের কথা ভাবা যায়। তাল যেমন জন্মাষ্টমী, তালনবমী পার্বণের সাথে যুক্ত তেমনি খেঁজুর যুক্ত পৌষপার্বণের সাথে। তবে একটা কথা জানা দরকার, বাজারে সাধারণত যে খেঁজুর পাওয়া যায় তা আরবি খেঁজুর, দেশী খেঁজুর নয়। দেশী খেঁজুর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে, তখন বাজারে তার দেখা মেলে। আমরা যাকে ভেষজ সুরা বলছি, স্থানীয় ভাষায় তাকে তাড়ি বলে। বাজারে এর ভাল চাহিদা আছে। তাল, খেঁজুরগাছ থেকে তাড়ি কাটতে হলে সরকারী আবগারী বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন হয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চোরাগোপ্তা ভাবে তাড়ি কাটা হচ্ছে। যারা তাড়ি খায়, তারা জানে, আহা, বাঁধাভাঁড়ের তাড়ির কি স্বাদ !

সুপারী – নারকেলের সঙ্গী সুপারী। বাগানের চারধারে লাগান থাকে সুপারী গাছ। আবার পানেরও সঙ্গী বটে। পানের মশলা হিসাবে এর ব্যবহার সর্বত্র। বারুইপুরে প্রচুর সুপারী

উৎপাদন হয়। স্থানীয় বাজারে এর চাহিদা প্রচুর। তাছাড়া এ অঞ্চলে সুপারীর আড়ৎ থাকায় বিক্রীর কোন অসুবিধা নেই। গত কয়েক বছর বাজার সস্তা হওয়ায় চাষীদের মধ্যে এই চাষে হতাশা দেখা দিয়েছে।

বারুইপুরে কিছু গাছ জন্মায় কিন্তু ফল হয় না। যেমন, এলাচ, আপেল, ন্যাসপাতি, লবঙ্গ, লকেট (খোদার বাজার ব্যতিক্রম) , কাজুবাদাম, ক্ষীরিনা প্রভৃতি। এখানে আঙ্গুর জন্মায়। স্বাদ ভাল নয়। আঙুরচাষ মানে শখের চাষ । কমলালেবুও সেই দলে। দেশী কুলগাছ শেষ হয়ে যাচ্ছে। একদিন লুপ্ত প্রজাতির দলে চলে যাবে। শাঁকালুও তাই। বারুইপুরে কৃষির উন্নতি ও নগরায়নে জমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল প্রায় নিঃশেষ। ঝোপঝাড়ের ফল বুঁচ বা বৈঁচি এবং ছেঁকুল কিশোরবেলার সাথী, হারিয়ে-যাওয়া দিনের মত হারিয়ে গেছে প্রায়। আর একটি শিশুসাথী ফল বকুল, সেও হারিয়ে যাওয়ার দলে। হারিয়ে গেছে বুনো জামের মত দেখতে আরো ছোটফল অম্বুবাচী ফল। এও ঝোপঝাড়-জঙ্গলের ফল। আর একটি ফল কালিফল। এর পাতা অনেকটা জামের মত, ফলও অনেকটা বুনো জামের মত। কেয়া বা কেঁওফলের দেখা আর মেলে না। গাবের দেখা মাঝেসাঝে মিললেও তাকে যে ভবিষ্যতে দেখা যাবে না সেটা নিশ্চিত। মাছের জালে কষ দেওয়ার জন্য এই গাছটির একসময় খুব চাহিদা ছিল। এখন তো আর সুতোয় জালবোনা হয় না। বোনা হয় নাইলনে, তাই এই গাছটির নির্বাসন পাকা। আর একটি ফলের কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ঝোপঝাড় জঙ্গলের লতানো ফল জামাইনাড়ু। এটিও কিশোরসাথী কিশোরী মনোলোভা।

আর দেখা পাওয়া যায় না প্রবাদের সেই মাকালফল। অপূর্ব দৃষ্টি মনোহর কিন্তু ভিতরে যেন পরিত্যক্ত বিড়ালের মল।

ফল নিয়ে বারুইপুরের কয়েকটি গ্রাম আছে। নোড় নিয়ে দুটি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। একটি নোড়, অন্যটি নড়িদানা। এ ছাড়া কেয়াফল নিয়ে কেয়াতলা। গাব নিয়ে গাবতলা। মাদার নিয়ে মদারাট। কুল নিয়ে ভুরকুল। উত্তরভাগ পাম্পিং স্টেশনের কাছে গুড়মিচক্। গুড়মি ফুটিজাতীয় ফসল। কাঁঠাল নিয়ে কাঁঠালবেড়িয়া প্রভৃতি।

বনভূমি – স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জে ভরা বারুইপুরে শুধু যে ফলের গাছ দেখা যায় তা নয়, আর এক ধরনের গাছ দেখা যায়, স্থানীয় ভাষায় তাকে জংলীগাছ বলে। জঙ্গলের গাছ, তাই ওই নাম। ওই গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায়। জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর সাধারণত উদ্ভিজ্জ নির্ভরশীল। বারুইপুরের জলবায়ুর বৈচিত্র্য এখানকার উদ্ভিজ্জের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সেই সাথে বিস্ময়ও। এখানকার উদ্ভিজ্জকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১) চিরহরিৎ ২) পর্ণমোচী। যেখানে ২০০সেমির বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মায়। সারাবছর এই গাছগুলি সবুজ থাকে। যেমন, আম, জাম প্রভৃতি। যেখানে ১০০ থেকে ২০০ সেমি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মায়। যে গাছের পাতা ঝরে যায় আবার নতুন করে পাতা জন্মায়। যেমন, আমড়া, চালতা, শিমুল পলাশ, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি।

বারুইপুরে এই দু'ধরনের গাছ জন্মায়। তাই বিশেষজ্ঞগণ এখানকার আর্দ্র আবহাওয়াকে

দায়ী করে এই অরণ্যকে আর্দ্র পর্ণমোচী মৌসুমী অরণ্য নামে অভিহিত করেছেন। আসলে আর্দ্রতা যেমন, মৌসুমী বায়ুও তেমন প্রভাবশীল এই অরণ্য সৃষ্টিতে, তাই অনেকে এই অরণ্যকে মিশ্র মৌসুমী অরণ্য বলে। অনেকে শুধু মিশ্র অরণ্য বলে। তার কারণ, এখানে সরলবর্গীয় গাছ, যে গাছ ২০০০ মিটারের উচ্চতায় জন্মায়, সেই গাছও দেখা যায়। যেমন, দেবদারু। আবার দেখা যায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য যা উপকূলের গাছ। এই সেদিন পর্যন্ত পিয়ালী অববাহিকায় কেঁউ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। যদিও এখন খুব একটা দেখা যায় না।

এই মিশ্র বনভূমিতে যে গাছ দেখা যায় সেগুলি হল পঞ্চপল্লবের পঞ্চ মহীরুহ – বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, আম, পাকুড়, বকুল (তন্ত্রমতে পঞ্চ পল্লবের অংশীদার)। এছাড়া শিরীষ স্থানীয় ভাষায় খিরীশ। এই গাছ দুই প্রকারের। কাঠ খিরীশ (যার বৃদ্ধি কম কিন্তু কাঠ খুব শক্ত), অন্যটি ফুল খিরীশ (যার বৃদ্ধি দ্রুত, কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম)। নিম, ঘোড়ানিম, মহানিম, জারুল, বাবলা, গুয়ে বাবলা, জিউলি, সেগুন, শিমুল, গাব, শ্যাওড়া, ডহর করঞ্চ (স্থানীয় ভাষায় ডাক করমচা), অর্জুন, ছাতিম, তেজপাতা, পারিজাত (তেপলতে) সাঁই (লুপ্ত প্রজাতির দলে) প্রভৃতি।

এই বনভূমিতে কিছু গাছ জন্মায়। মূলত তার থেকে কাঠ পাওয়া গেলেও তার ফুল বনভূমিকে আলো করে রাখে। এই সব পুষ্পবৃক্ষের নামগুলি হল - কৃষ্ণচূড়া, শ্বেতচাঁপা, কনকচাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, অশোক, বকুল, শোঁদাল, কদম, বকফুল, নাগকেশর, পলাশ, শিমুল, বাউমিয়া (বিদেশী ফুল) প্রভৃতি।

এই বনভূমিতে জন্মায় নানা ধরনের বাঁশ। যেমন, বেঁশিনী (এই বাঁশ দিয়ে মাছ ধরার ঘুনি, আটল, খাঁচা, পোলো প্রভৃতি হয়)। জাওয়া বাঁশ (এই বাঁশ পালাচাষে পালা হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়)। গিরুটে বাঁশ (ঘরের চাল, গরুর গাড়ি প্রভৃতি কাজে ব্যবহার হয়)।

এছাড়া আর একটি বাঁশ যাকে বিলাতি বাঁশ বলে, খুব মোটা এবং লম্বায়ও বড় এই বাঁশটি আর দেখা যায় না। বারুইপুর বাজারে জলের ট্যাংকের কাছে এর ঝাড় ছিল। আগে অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে প্রচুর বেতগাছ জন্মাত। এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।

গত শতকের শেষপাদে সারা বিশ্বে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সবুজ বাঁচাও আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই সময় আমাদের দেশে বনবিভাগের একটি অংশকে সামাজিক বনসৃজন বিভাগ নামে গড়ে তোলা হয়। তারা বনমহোৎসব পালন করত, বিনামূল্যে গাছের চারা দান করত। তার জন্য তাদের নিজস্ব নার্শারীও ছিল। বারুইপুরে ছিল তার একটি বিভাগ। বর্তমানে এই বিভাগটি গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সব ভার সেই পুরানো বনদপ্তরের হাতে। সামাজিক বনসৃজন বিভাগ রাস্তার ধারে, খালের ধারে, পতিত জমিতে নানান গাছ বসিয়েছিল। তাদের নার্শারীতে বাইরের বীজ এনে চারা করেছিল এবং তাদের রোপণ করে বড় করেছিল। বারুইপুরের মাটি সেই সব বীজ বা চারা কাউকে ব্রাত্য ঘোষণা করেনি। এই সব গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিশু, সুবাবুল, ইউক্যালিপ্টাস, মেহগনি, শ্বেতচন্দন, লালচন্দন, রুদ্রাক্ষ, ঝাউ, আকাশমণি , গামার, অর্জুন, কাজুবাদাম, লম্বু, হুকমি, গ্লিসিরিয়া, পুত্রঞ্জীবা

(এই গাছের পাতা ঝরে না), বাউমিয়া, শাল, আইল্যান্ড, থার্স মালাবেরিয়া, পিয়াশাল, বিভিন্ন প্রজাতির পাম ও রডোডেন্ড্রন প্রভৃতি। বারুইপুর বিডিও অফিসের পাশে মূল নার্সারিটি এখনও বর্তমান। ধপধপিতে সামাজিক বনসৃজন বিভাগের একটি নার্সারী ছিল। সামাজিক বনসৃজন বিভাগ পঞ্চায়েতে নার্সারী করার জন্য সে সময় আর্থিক অনুদানও দিয়েছিল। বনবিভাগের পরিকল্পনা ভাল, কিন্তু কিছু গাছ যেমন, ইউক্যালিপ্টাস, সুবাবুল প্রভৃতি এদের মূলশিকড় না-থাকায় ব্যাপকভাবে রাস্তার ধারে বসানোয় বর্তমানে এর একটি কুফল দেখা যাচ্ছে। ঝড় সহ্য করতে পারে না গাছগুলি, ফলে প্রায় উপড়ে যাচ্ছে, রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়া ইলেকট্রিকের তারগুলির।

একসময় বারুইপুর দত্তপাড়া, নলগড়া ও তার পুবদিকটায় বিরাট সেগুন-দেবদারুর জঙ্গল ছিল। আরো বিশাল ঘন জঙ্গল ছিল আদিগঙ্গার পুবে বেলেঘাটা, রানা, শাঁখারীপুকুর, পদ্মজলা, ধপধপির পশ্চিম অঞ্চলে আর এই ঘন জঙ্গল মহলে অধিষ্ঠান হয় জলজঙ্গলের দেবতা দক্ষিণেশ্বরের। পুঁথির পাতায় তিনি দক্ষিণরায়। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণে, জনমানসে তিনি দক্ষিণেশ্বর। জলজঙ্গলের সাথে সম্পর্ক যাদের সেই কৈবর্ত সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারত থেকে এই দেবতাকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই কৈবর্তদের বাসভূমি কৈবর্তপাড়া। পূজারী ব্রাহ্মণও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের। এই দেবতার খাদ্যও জলজঙ্গলের খাবার, কাঁকড়া আর মাছ। পোড়ামাছ।

দক্ষিণ ভারতে 'মাদুরাই ডল' নামে এক শ্রেণীর মূর্তি আছে। দক্ষিণেশ্বরের মূর্তি সেই শ্রেণীর। তাছাড়া এই মূর্তির গঠনও দক্ষিণ ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নৃত্য কথাকলির মুখোশের চোখমুখের সাথে দক্ষিণেশ্বরের চোখমুখের অদ্ভুত মিল প্রমাণ করে এ দেবতা দক্ষিণ ভারতীয় দেবতা। শুধু তাই নয়, এ দেবতা অপদেবতা। অপদেবতার প্রিয় খাদ্য পোড়ামাছ।

সে যাই হোক, এই দেবতা এবং দেবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র। সম্ভবত এটি বারুইপুরের দৈবকেন্দ্রিক প্রথম আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র। এখনও বহু মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসে। স্থানীয় লতা-গুল্ম গাছগাছড়া প্রভৃতি চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অরণ্যের সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক সেইসব পশুপক্ষীদের কথায় আসি। পশুর সংখ্যা অবশ্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

পশু – খেঁকশিয়াল, পাতিশিয়াল, খটাশ, বনবিড়াল, ব্ল্যাকপান্থার, উদবিড়াল, বাঘরোল, গন্ধগোকুল, ভোঁদড়, খরগোশ, বেঁজি, নেউল, ধামসাইন্দুর, কচ্ছপ প্রভৃতি। খরগোশ দু'রকমের। একরকম সাদা, অন্যরকম হল মেটে বা ধূসর রঙের। এখানে একসময় প্রচুর সজারু ছিল। সজারুর মাংস ছিল খুব সুস্বাদু আর তার কাঁটা দিয়ে সেসময় এ অঞ্চলের নারীরা কেশবিন্যাস করত। বর্তমানে এ অঞ্চলে সজারু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে বুনো শুয়োর। ভবিষ্যতে খরগোশের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ একমাত্র তার মাংস। ব্ল্যাকপ্যান্থারও খুব একটা চোখে পড়ে না। বারুইপুরে একসময়ে প্রচুর কুমিরের দেখা মিলত। আটঘরার ফরদি নদী ছিল তাদের বাসভূমি। বর্ষায় তারা ছড়িয়ে পড়ত। কুমীর এখন বারুইপুরে বিলুপ্ত।

সাপ – বোড়া, চন্দ্রবোড়া, কেউটে, গোখরো (পদ্মগোখরো) কালাচ্‌, দাঁড়া বা দাঁড়াস (ধোড়া) জলদাঁড়া, লাউডগা, কালনাগিনী, খড়িচোঁচ, মেটুলে, হেলে প্রভৃতি। দু-এক স্থানে ময়ালের দেখা পাওয়া গেছে। মেটলে সম্পূর্ণ জলের সাপ। জলদাঁড়াকে জলে দেখা যায় ঠিকই তবুও জলের সাপ সম্পূর্ণ বলা যায় না। কারণ, এরা ডাঙ্গায়ও থাকে।

পক্ষী – বুলবুলি, টুনটুনি, ফিঙে, ময়না, টিয়া, নীলকণ্ঠ, বদরী, কোকিল, দোয়েল, কুকোঁ, পাপিয়া, চন্দনা, চাতক, টিয়া, টাকাচোরা, চড়াই (চটা), বাবুই, কাক, শালিক, গোশালিক, রামশালিক, মাছরাঙা, বক, সারস, কাঠঠোকরা, পানকৌড়ি, ঘুঘু, ছাতারে, চিল, শকুন, বাজ, মুনিয়া, লেজঝোলা, হলদি, পায়রা, কাদাখোঁচা, পেঁচা (কোটরে, হুতোম, লক্ষ্মী) বাদুড়, চামচিকে প্রভৃতি। অনেকের মতে বাদুড়, চামচিকে পাখীর দলে পড়ে না, এমনকি পেঁচাও। তবে যেহেতু তাদের পাখা আছে তাই আলাদা না-করে একগোত্রে রাখলাম। চিল, বাবুই, বাজ প্রভৃতি বিলুপ্তির পথে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে বনমোরগ-মুরগী। গরম পড়লে গ্রামের মানুষ তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে, চিল পুকুর কাটছে কিনা। পুকুর কাটলে বৃষ্টি হবে। সে দৃশ্য এখন বিরল। অথবা পেয়ারাবাগান, ঢ্যাঁড়শক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক সবুজ টিয়ার দল কিচমিচ শব্দ করতে করতে, সে দৃশ্যও।

হাঁসের মত মুরগীও গৃহবধূদের হাতখরচের পয়সার যোগান দেয়। তবে মুসলমানপ্রধান গ্রামে দেশী মুরগীর দেখা পাওয়া যায় বেশী। এখন গ্রামে গ্রামে আধুনিকভাবে মুরগীপালন হচ্ছে। গড়ে উঠেছে পোল্ট্রী ফার্ম। এই পোল্ট্রী ব্যবসা এ অঞ্চলের বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর করতে খুবই সাহায্য করেছে এবং করছে। বারুইপুরের বর্তমানে সবচেয়ে বড় খামারী ধপধপির নির্মল পাল। টংতলাতে মুরগীর ডিম ফোটানোর হ্যাচারী আছে। নাম সুন্দরবন হ্যাচারী। বারুইপুর পুরাতন বাজারে ‘কেগ’ নামে আর একটি হ্যাচারী আছে। এর মালিক চিত্রাভিনেতা শশীকাপুর।

বাজারদরের অনিশ্চয়তা এই ব্যবসার চিন্তার কারণ। আর চিন্তার কারণ ককসি, গামবোরো জাতীয় মড়ক রোগ। হোমিওপ্যাথিতে ককসি রোগে রাসটাস ৩০। মার্কসল ৩০, অব্যর্থ ঔষধি। পকস, গামবোরো, কলেরা, উদরাময়েও হোমিওপ্যাথিতে ভাল ঔষধ আছে। মুরগী-চাষে এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। একসময় গ্রামে মুরগী বিনোদনে অংশ নিত। মুরগীর লড়াই ছিল খুব জনপ্রিয়। এখন সেসব আর দেখা যায় না।

আসবাবপত্র, দরজাজানালা ও গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটাতে দরকার হয় কাঠের। সেই কাঠ আসে বনভূমি থেকে। আসবাবপত্রের কাঠ হিসাবে সেগুন, শিশু, মেহগনি, জাম, কাঁঠাল, বাদাম, শিরীষ বা খিরীশ, চালতা, কুল প্রভৃতি। ঘরের চালে বাঁশ, তাল, নারকেল, খেঁজুর প্রভৃতি। ঘর ঢালাইতে নারকেল, তেঁতুল, প্রভৃতি কাঠের তক্তার ব্যবহার হয়। জ্বালানী হিসাবে পেয়ারা, লিচু, তেঁতুল উল্লেখযোগ্য। এইগুলির চাহিদা আছে স্থানীয় বেকারীতে। বারুইপুরে রাবারগাছ, পাতাবাহারগাছ হিসাবে বাগান সাজাতে ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং এই বাণিজ্যিক গাছটার চাষ এখানে করা যেতে পারে। রাবারগাছে যদি তরুক্ষীর নাও পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি নেই। রাবার গাছের কাঠ আসবাব পত্রের অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ। রাবারগাছের মত

দক্ষিণ ভারতের কোকোর চাষ এখানে হতে পারে। বারুইপুরের অদূরে গোবিন্দপুরের বারুলীগ্রামে একসময় ব্যাপক কোকোচাষ হয়েছিল।

এই বনভূমির গাছকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে লতা। এই লতা থেকে আমরা কিছু সবজী জাতীয় ফল পাই। যেমন, মাখমসিম, হনুমানসিম, কাঁকরোল, ঝোড়াআলু, কুড়েয়া, শাক আলু (শাঁখা আলু) কামরাঙাসিম প্রভৃতি। এই রকম লতানোগাছের ফুল যুক্তিফুল, স্বাদে তিত, গ্রীষ্মে পাওয়া যায়। বাজারে এর চাহিদাও খুব।

বারুইপুরের বনভূমির কথা ভেবে আসবাবপত্রের চাহিদা মেটাতে এখানে যাতে দারুশিল্পের বিকাশ ঘটে, সেই ভেবে ফুলতলা পিয়ালীনগরে কারপেন্টারী ওয়ার্কশপ নামে একটি শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বর্তমানে এটি বন্ধ আছে। অনেকের মতে এটি স্থানান্তরে চলে গেছে। বারুইপুরের ঋষিবঙ্কিম নগরে ফল সংরক্ষণের একটি শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এখানে এত ফল অথচ এখানে একটি জ্যামজেলীর কারখানা গড়ে ওঠে নি। অনেকদিন আগে অশোক নস্কর একটি উদ্যোগ নিয়েছিল, তা চলেনি। অবশ্য এখানকার অতিরিক্ত আর্দ্রতা এই শিল্পের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। বারুইপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃষিখামার আছে, সেখানে আমের উদ্যান আছে। সেখান থেকে আমের কলম পাওয়া যায়। অন্য বিষয়েও স্থানীয় চাষীরা নানানভাবে উপকৃত হয়। বারুইপুর সাহাপাড়ায় প্রচুর নার্শারী আছে। খগেন সাহা, নগেন সাহা এর পথিকৃৎ। বর্তমানে তাদের বংশধরেরা এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা যেমন, দাশরথি সাহা, বিজয় সাহা, বিশ্বনাথ সাহা, ধোনা সাহা, পাঁচকড়ি সাহা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত। কৃষিঘরের সনৎ সাহা, ফল, ফুল ও নানা জাতের চারা, বীজ, কলম যোগান দিয়ে কৃষকদের উৎসাহ দিচ্ছে বহু দিন ধরে।

আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, তিনি হলেন শালুকধানির হাকিম আলি সরদার। এবং তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর ভাই মজিদ সরদার। নয় নয় করে এঁরা বাইশ বছর এই ব্যবসার সাথে জড়িত। রানাগ্রামে এঁদের নিজস্ব দুবিঘা জমিতে নার্শারী আছে। এঁদের বাবা আবদুল হামিদের সব্জি চারা ও দানাবীজ ব্যবসায় খুব সুনাম ছিল। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠেছে তাঁদের নার্শারি। নার্শারির নাম গাজীবাবা নার্শারী। এঁরা স্থানীয় আম, লিচু, জলপাই, জামরুল প্রভৃতি গাছের কলম কাটেন। আমগাছের জন্য জোড়কলম লাগে। বড়গাছের ডালের সাথে টবে বসানো চারাগাছের জোড় লাগিয়ে জোড়কলম করা হয়। এঁরা বসিরহাট থেকে গ্রাফটিং কলমের (স্থানীয় ভাষায় বাটিং বলে) আমের গাছ কিনে এনে এখানে বড় করে পাইকারী দরে বিক্রী করে দেন। গ্রাফটিং কলম হল, বড়গাছের ডাল কেটে এনে মাটিতে বসানো চারাগাছের সাথে জুড়ে দেওয়া। এছাড়া এঁরা বীজ সংগ্রহ করে চারা তৈরী করেন। সেই চারার মধ্যে, মেহগনি (ছোটপাতা, বড়পাতা) লম্বু, গামার, আকাশ মণি প্রভৃতি অন্যতম। বড়পাতার মেহগনি গাছকে হুকমি বলে। বনবিভাগের নার্শারীতে বীজ থেকে যে চারা তৈরী করা হয়, তা আগে বনমহোৎসবে বিনা পয়সায় বিলি করা হত। এখন নামমাত্র মূল্যগ্রহণ করে। উদ্দেশ্য, গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পরিবেশ দূষণমুক্ত করা। এই নার্শারী নানাভাবে বাইরের বীজ এনে চারা তৈরীর পরীক্ষানিরীক্ষাও করছে। জনগণের সাহায্য

করার জন্য এরা সবসময় হাত বাড়িয়ে আছে। বাঙালীর বারোমাসে তেরোপার্বণ, সেই সাথে আছে অগুনতি বারব্রত। আর এই সব বারব্রত কিন্তু গাছগাছালি ফলমুল শাক-সবজিকে নিয়ে। ব্রত বা পূজাপার্বণের উদ্দেশ্য যাইহোক, মূল উদ্দেশ্য কিন্তু গাছপালাকে ভালবাসা এবং কৃষির বিকাশ ঘটানো। (দেবতা কতটুকু সন্তুষ্ট হয় তা দেবতাই জানে) আজ যদি পূজায় পঞ্চপল্লবের ব্যবহার না থাকত তাহলে ওই মহীরুহ বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, আম, যজ্ঞডুমুর (তান্ত্রিকমতে কাঁঠাল বা বকুল) দেশে কি থাকত ? হোমের জন্য তো লাগে, সাঁই, খদির, পলাশ, আপাং, দূর্বা, কুশ, আকন্দ, বেল, যজ্ঞডুম্বুরপাতা বা অগ্রমুকুল (সমিধ), সে সব তো গাছ। আবার সরস্বতীপূজার হোমে দ্রোন পুষ্প, দোলে শ্বেতকরবী – এগুলি ফুল। এছাড়া যে কোন পূজাতে লাগে তিল, যব, হরীতকী, বহেড়া, আমলকি, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, আতপচাল, জায়ফল, জৈত্রী, মেথী, ছোলা, বুট, আটকলাই প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য। দুর্গাপূজার কলাবউ তো কলাগাছ। আর নবপত্রিকা অর্থাৎ বেল, জয়ন্তী, ডালিম, হরিদ্রা, কালকচু, ধান, অশোক, মানকচু, কদলী সেও গাছ। আবার বৈশাখে চন্দনষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে বটসাবিত্রী ব্রত, চম্পক চতুর্দশী, অরণ্যষষ্ঠী, রম্ভা তৃতীয়া, ফলহারিণী কালিকাপূজা, আষাঢ়ে দশহরা, বিপত্তারিণী ব্রত, শয়নৈকাদশী, শ্রাবণে জন্মাষ্টমী, ভাদ্রে তালনবমী, জয়ন্তী দ্বাদশী, আশ্বিনে অপরাজিতাপূজা (বিজয়া দশমী), কার্তিকে ভূত চতুর্দশী, বকপঞ্চক, অগ্রহায়ণে ঘটপূজা, মূলাষ্টমী, পৌষে বকুল অমাবস্যা, মাঘে ভীম একাদশী, সরস্বতীপূজা, শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে বারুনী এইসব পূজাপার্বণ ব্রত সেই ফল, ফুল অথবা গাছকে নিয়ে। অনেকগুলি ব্রতের নাম তো তার পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়। দশহরায় লাগে দশটা ফল, বিপত্তারিণীতে লাগে তেরোটি ফল। ভূত চতুর্দশীতে খেতে হয় চোদ্দশাক, ভীম একাদশীতে সাতশাক। সরস্বতীপূজায় আমের মুকুল, ভীম একাদশীতে ফল বিতরণ। বারুণীতে গঙ্গায় আম বিসর্জন, জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া প্রভৃতি। জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশীর ভাগ ফল পাকে। ওই সময় ব্রতের সংখ্যা বেশী। তাছাড়া উপকরণ হিসাবে পূজাতে ফলের এবং পূজার কাজে ফুল, বেলপাতা, তুলসীপাতা, দুর্বা তো লাগেই। দোলযাত্রাতে আগেই বলেছি, হোমে লাগে শ্বেতকরবী ফুল। জ্যৈষ্ঠমাসের মঙ্গলবার বিভিন্ন স্থানের মানুষ বিভিন্ন নামে ব্রতপালন করে। বারুইপুরের ব্রতীরা পালন করে জয়মঙ্গলবার নামে (মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে)। ব্রতীরা আঠারো রকমের পাতা আঠারোটি করে এবং আঠারো রকমের ফল দিয়ে ডালা সাজায়। এ ব্রত বারুইপুর এলাকার নিজস্ব ব্রত। বাজারে আঠারো রকমের ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আঠারো রকমের পাতা মিলবে না। এখানে বহু ফলের গাছ আছে বলে এত পাতা ও ফলের আয়োজন। বারুইপুরের উত্তর অংশে বেগমপুর অঞ্চল চম্পাহাটী বলয়ে অগ্রহায়ণ মাসে কুলী মঙ্গলবার নামে একটি ব্রত পালিত হয়। কুলোয় করে কচি কুলভরা কুলের ডাল নিয়ে ডালা সাজানো হয়। এ ব্রতও বারুইপুরের নিজস্ব ব্রত।

বারুইপুরের ভাদ্রমাসের অরন্ধনে স্থানীয় মানুষেরা শাপলা ও কাশফুল ব্যবহার করে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির ইতুপুজো এখানে ঘটপুজো নামে প্রচলিত। ঘটের সাথে মুলোর ফুল, সরষেফুল, হিঞ্চেশাক, কচুগাছ, কলার তেড়, ওকড়া ধান, ক্যাঁচড়া প্রভৃতি দিয়ে ডালা সাজান হয়। একটু খেয়াল রাখা দরকার ওকড়া ধান কিন্তু সর্বত্র পাওয়া যায় না। একই ভাবে পৌষ

সংক্রান্তির বাউনি তৈরী হয় ধানের শিষে ফাঁস দিয়ে, দেখতে একটা নারী মুর্ত্তির মত। তাতে দেওয়া হয় মুলোর ফুল, সরষের ফুল, তুলসীপাতা, দূর্বা, চালের গুঁড়ো, গোবর প্রভৃতি। সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজিয়ে ধানের গাদার উপর ছুড়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় দেবস্থানেও। সরস্বতীপূজার পরদিন শীতল ষষ্ঠী, এ এক অরন্ধন। এখানকার স্থানীয় মানুষেরা একে বলে গোটাষষ্ঠী। আগের দিন রাতে ছয়শাক, ছয়সব্জী, ছয়মূল, ছয়কপি প্রভৃতি প্রতিটি আবার ছটা করে নিয়ে গোটা অর্থাৎ আস্ত না-কেটে বা টুকরো না-করে রান্না করে রেখে পরের দিন পান্তাভাতের সাথে খায়। এখানেও সেই স্থানীয় কৃষি বা শাকসব্জির প্রভাব।

৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী, সাড়ে তিনদিনের ব্রত বা পার্বণ। তবে উৎসব বলা ভালো। এ সময়ে গরমের ফল প্রায় শেষ। তাই ফলকে কেন্দ্র করে এই ব্রত। ফল খাওয়ার ব্রত। অন্যদিকে এদিন সারা বছরের সবচেয়ে বড় দিন। কৃষি জীবনে এ দিন যে বিনোদনের মাত্রা পাবে সেটাই স্বাভাবিক। এই দিনেই শুরু দক্ষিণায়ন। সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তো কৃষকের একটি অবশ্য কর্তব্য। অম্বু অর্থে জল। তাই অম্বুবাচী মৌসুমী বায়ুকে স্বাগতম জানানোর উৎসব। প্রাচীন জ্যোতিষ বলে, এ সময় সূর্য আদ্রা নক্ষত্রকে ভোগ করে। একটু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সেই তাপ আর আর্দ্রতা, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত। হিন্দুশাস্ত্র বলে, এদিন ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। সেজন্য মাটিতে কোন কাজ নিষেধ। এমনকি মাটিতে আঁচড় কাটাও বন্ধ। অর্থাৎ চাষআবাদ বন্ধ। আবার ঘুরে ফিরে আসে কৃষি জীবনে বিনোদনের কথা। রজস্বলার পর প্রজনন, তারপর সৃষ্টি। এই প্রজননকর্ম হল চাষ। ফসল হল তার সৃষ্টি। এক্ষেত্রে ধান চাষের কথা ভাবা হয়েছে। কারণ, তখন ধানচাষই ছিল মুখ্যচাষ। আবার অন্য একটি বিষয় ভাবা যেতে পারে। আষাঢ়মাস রজস্বলা মাস, এই মাসে মাতৃজঠরে প্রতিস্থাপিত হয় ভ্রূণ। সেই ভ্রূণ পরিণত হয়ে নয়মাস দশদিন পরে যখন প্রসব হয় তখন আসে ১লা বৈশাখ, নববর্ষ। অর্থাৎ অম্বুবাচীর মাস নববর্ষের ভ্রূণ স্থাপনের মাস। স্থানীয় মানুষজন অম্বুবাচীকে আম্ববাসী বলে। ধপধপির দক্ষিণেশ্বরে ওই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলা বসে বারুইপুর থানার অদূরে ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী সাহেবের মাজারে। যে মাজারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার। এই দিনটিকে বারুইপুরের কৃষক পরিবারের লোকজনেরা ভীষণভাবে মেনে চলে।

নববর্ষ, ১লা বৈশাখ, সেও কৃষির সাথে জড়িত। সেদিন নানান রকমের রান্না অর্থাৎ কৃষিজ ফসলের ব্যবহার। এদিন কৃষকেরা হল পুণ্যাহ করে (স্থানীয় ভাষায় – হালপুন্নি বা হাল পুণ্যি বলে) অর্থাৎ জমিতে হাল চালনার শুভ সূচনা। এদিন কৃষি বলদদের সুন্দর করে শিংয়ে তেল, কপালে সিঁদুরের রেখা এঁকে দেওয়া হয়। তারপর শাঁখ, কাঁসা বাজিয়ে পুকুরে স্নান করানো হয়। একে বলে গরুনাওয়ানো (স্থানীয় ভাষায় বলে গরুনাওন)। এই স্নানের পর গরুকে কলাপাতায় মুড়ে ময়াটি মাছ খাওয়ানো হয়। জনবিশ্বাস, এতে বলদের অসুখবিসুখ হবে না, সারাবছর বলিষ্ঠ থাকবে। এ অনুষ্ঠান অবশ্য আর বেশী দিন হবে না, বলদের স্থান নিয়েছে যন্ত্রদানব।

রথযাত্রা মানে কৃষিযাত্রা। কৃষিযাত্রার আগে আর একটু বিনোদন, একটু মেলামেশা, দেখা

সাক্ষাৎ, একটু কেনাকাটা। তাই রথের মেলা হয় জমজমাট। বারুইপুরের রথ এ অঞ্চলের বিখ্যাত রথ। কেন বিনোদন? আগের দিনের চাষে এখনকার মতো যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এবং যাতায়াতও সুগম ছিল না। বিশেষ করে সেসময়ে মানুষজনদের বিষাক্ত সাপের ভয় তো ছিলই, তার উপর ছিল বাঘের ভয়। চাষ শেষ করে কে ফিরবে আর কে ফিরবে না সেই ভাবনা ছিল বড় ভাবনা।

বার, ব্রত, পূজা, পার্বণ সব মূলেই কৃষিভাবনা। আবার কথায় বলে, যেমন দেশ তেমন ভাবনা। কালীপূজার আগের দিন ভূত চতুর্দশী, এদিন চোদ্দশাক খাওয়ার নিয়ম। শাস্ত্রমতে শাকগুলি হল, ওল, কেঁউ, কালকাসুন্দে, বেতো, নিম, জয়ন্তী, হেলেঞ্চে, সরিয়া, শাকে, পলতা, গুলঞ্চ, ঘেঁটু, শুলপো, শুষনি। কিন্তু বারুইপুরের মানুষজন শাস্ত্রমতে শাকগুলি বর্জন করে সুস্বাদু শাক সংগ্রহ করে ভক্ষণ করে। বারুইপুরে তো আর শাকের অভাব নেই।

এতক্ষণ তো খাওয়ার কথা হল। এবার নিষেধের কথায় আসি। বর্ষাকালে কলমীশাকের ডগা কাটলে দেখা যায় এক রকম সাদা আটা বেরুচ্ছে, অন্য সময় বের হয় না। এই আটাযুক্ত কলমীশাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সেইজন্য সেই শাক খাওয়া নিষেধ করতে শয়নৈকাদশী ব্রত। এইদিন হরি কলমীশাকের বিছানায় শয়ন করে, তাই এদিন থেকে কলমীশাক খাওয়া নিষেধ যতদিন না তিনি শয্যাত্যাগ করেন। হরি যখন শয্যাত্যাগ করবেন তখন থেকে আবার কলমিশাক খাওয়া চলবে। কারণ, তখন কলমিশাকে আর আটা জন্মাবেনা।

চম্পাহাটী ঘোষপুরগ্রামে একটি ধর্মমন্দির আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। স্থানীয় লোক জাতপূর্ণিমা বা ধর্মের জাত বলে। বহুলোক আব (অর্বুদ) সারাবার জন্য ওল মানত করে। কেন ওল ? হয়ত আব বা অর্বুদগুলি ওলের মত দেখতে। ওলের কথা যখন এল, যে কথা বলতে ভুলে গেছিলাম বলে ফেলি। বারুইপুরে এখন প্রচুর কাটোয়া ওলের চাষ হচ্ছে। অর্থাৎ আলুর মতন ওল কেটে রোয়া বা রোপণ করা । স্থানীয় লোক এই ওলকে মাদ্রাজী ওল বলে। আসলে তা নয়, এটি কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকৃত ওল।

'আমে ধান তেঁতুলে বান।' খনার এই বচনটি স্থানীয় মানুষজন যারা বিশেষ করে কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে তারা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে বা মানে। আমে ধান অর্থাৎ আমের ফলন বেশী হলে ধানের ফলন ভাল হবে। এর থেকে বোঝা যায় বৃষ্টিপাত পরিমিত হবে, খরা বন্যার সম্ভাবনা নেই। তেঁতুলে বান অর্থাৎ তেঁতুলের ফলন বেশী হলে সেস্থানে প্রচুর বৃষ্টি হবে, বন্যার সম্ভাবনা থাকবে। এইসব মানুষজন কৃষি বিষয়ে খনার বচন খুব মেনে চলে। এসব যেন তাদের ঠোঁটস্থ। আর একটি বিষয়কে তারা খুব গুরুত্ব দেয়। সেটি হল, দেবী দুর্গার গমনাগমনের ফলাফল। 'গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। নৌকায়ং শস্য বৃদ্ধি তথা জলম।'

নববর্ষের পঞ্জিকা হাতে পেয়ে প্রথমেই তারা দেখে এই নতুন বছরের রাজা, মন্ত্রী কে। এই রাজামন্ত্রীর উপর চাষবাস নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, তারা দেখে বর্ষগণনা, এবছর কত আঢ়ক (আড়া) বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ জানতে পারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। এখন প্রশ্ন আসতে পারে এ সবের সত্য মিথ্যে কতখানি ? উত্তরে বলতে হবে বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস।

বচন থেকে প্রবচন। 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি', 'কহাত ঢেঁকি বাবলা কাঠ' এসব পুরানো, অতি পুরানো। বারুইপুরের ফল, গাছপাতা নিয়ে নিজস্ব কিছু প্রবচন আছে, তার দু-একটি দিলাম। নালতে রোগা। পাটের শুকনোপাতাকে নালতে বলে। হাড় জিরজিরে লোক প্রবচনের লক্ষ্য। শেওড়া গাছে পেতনী নাচে। এটা ভয় দেখানোর জন্য বলে। শোনা যায় শ্যাওড়া গাছের গোড়ায় বিষাক্ত সাপের গর্ত থাকে। সুরথে যাব না দিদি উল্টোরথে যাবো, দুই সতীনে যুক্তি করে কাঁঠাল কিনে খাবো। পিরীত কথা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বচন থেকে প্রবচন হল, এবার দিই কিছু সুলুকের সন্ধান। এখানকার স্থানীয় মানুষজন যাকে সুলুক বলে তাকেই অনেকে হেঁয়ালী বলে, কেউ কেউ বলে ধাঁধা। সুলুক নিয়ে এ অঞ্চলের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে একটা খেলা আছে, তাকে বলে সুলুক কাটাকাটি। একজন সুলুক বলে, অন্যজন তার উত্তর দেয়। উত্তর দিতে না-পারলে হেরে যায়। আবার সে সুলুক বলে, এ উত্তর দেয়। এইভাবে হারজিত নির্ধারিত হয়। অনেক সময় বিয়ের আসরে বুড়ো দাদাশ্বশুর, দিদিশাশুড়ীরা নতুন বরকে সুলুক কাটতে বলে। সুলুক অর্থ সূত্র বা খেই, সূত্র দিয়ে উত্তর চাওয়া। আমার তো মনে হয় ধাঁধা বা হেঁয়ালীর চেয়ে এই শব্দটি ভালো। আর এ শব্দ তো বাংলাভাষায় নতুন নয়। বাংলায় আছে 'সুলুকসন্ধান'।

১। বন থেকে বেরুল হুমো, তার গায়ে ডুমো ডুমো – উত্তর – কাঁঠাল।

২। রাজার ছেলে ভোম্বল দাস, খায় ছোবলা ফেলে শাঁস – উত্তর – চালতা।

৩। একটা গাছে তিন তরকারী, বলে ফেলো তাড়াতাড়ি – উত্তর – কলা।

৪। ও পাড়ায় বুড়ি মলো, এ পাড়ায় গন্ধ এলো – উত্তর – কাঁঠাল।

৫। হাজার চোখো ফল , তাড়াতাড়ি বল – উত্তর – আনারস।

৬। বন থেকে বেরুল হুতি, হুতি বলে পাতে মুতি, – উত্তর – পাতিলেবু।

৭। বন থেকে বেরুল ছুরি, ছুরি বলে তোর উঠোন ঘুরি – উত্তর – বাঁশপাতা।

৮। একটুখানি গাছে, রাধাকৃষ্ণ নাচে – উত্তর – কাঁচা পাকা লঙ্কা

৯। বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে – উত্তর – আনারস।

সুলুকের মধ্যে মাত্রা আছে, ছন্দ আছে শ্লোকের মতন। তাই হয়ত শ্লোক থেকে সুলুক এসেছে। স্থানীয় গ্রাম্যজীবনে সুলুক কাটাকাটি অন্যতম অন্তঃপুরী ক্রীড়া। স্থানীয় বহু সুলুক আছে যার সন্ধান করে সংগ্রহ করা উচিত।

বারুইপুরের ফল আজ খ্যাতির শীর্ষে। যারা এ নিয়ে চাষবাস, ভাবনাচিন্তা করছে তাদের নাম জানা বা জানানোর প্রয়োজন আছে। স্থানাভাব তাই বিশেষ বিশেষ কয়েক জনের নাম দিলাম। সেইসাথে যারা অন্য শাকসবজি, মাছ ও মুরগী চাষ করছে তাদেরও নাম কিছু দিলাম। যতীন গায়েন, গোপাল মাল, উদয় ঘোষাল, স্বরূপ পুরকাইত, পাঁচুগোপাল মণ্ডল (ধোপাগাছি); হীরুলাল দাশ, খগেন দাশ, পুষ্কর দাশ, শান্তি দাশ, বিশ্বনাথ দাশ, বদন দাশ,

কানাই দাশ, প্রদীপ দাশ (মধ্যকল্যাণপুর) ভীমচন্দ্র বৈদ্য, হারুলাল নস্কর, নিমাই নস্কর (উত্তর কল্যানণপুর); রতন বারিক, অটলচন্দ্র দাশ (দঃ কল্যাণপুর); ঘোতন নস্কর (পুরন্দরপুর) গৌতম মণ্ডল, পালান মণ্ডল, রমেশ মণ্ডল, ধনেশ মণ্ডল, নিরঞ্জন নস্কর, অজয় মণ্ডল (নিহাটা) জীতেন্দ্রনাথ সরদার (ধর্মনগর), রণজিত মণ্ডল , শংকর মণ্ডল, রামকৃষ্ণ নস্কর (বেলেঘাটা) সাইফুল মোল্লা (পুঁড়ি); মুকুল ঘোষ (আটঘরা); জয়দেব মণ্ডল, খোকন তরফদার, কালিদাস সরদার (রামনগর); ঝড়ো মণ্ডল(দুধনই); জাকির সরদার, মেহেরুল সাঁফুই, রহিম সরদার লিয়াকত ঢালী, রতন মণ্ডল, আকতার শেখ (সীতাকুণ্ড); রহিম শেখ, মমিনদ্দি খান (চঙ্গ); অশোক মণ্ডল, বাদল নস্কর (উত্তরভাগ) রবিন নস্কর (পদ্মজলা); বিশ্বনাথ দাস (ধপধপি); লক্ষ্মন মণ্ডল (শাঁখারীপুকুর); কাদের সরদার (উঃ পদ্মজলা); অবনী নস্কর (আলিপুর); অনিল মণ্ডল (গাবতলা); অটল মণ্ডল (শংকরপুর)।

মাছ – মৃদুল ঘোষ, বিষ্টু দত্ত (বারুইপুর); মফিজ ঢালী, মাজেদ আলি মোল্লা, রুল আমিন মোল্লা (সীতাকুণ্ডু); সামির সরদার, দুলাল কয়াল (রামনগর); তারাপদ মণ্ডল (আটঘরা) প্রভৃতি। শেষ সমীক্ষায় জানা যায় মফিজ ঢালী এখন বড় মৎস চাষী। শূণ্য থেকে তার শুরু। তার ইচ্ছে আধুনিক হ্যাচারী গড়ার।

পোল্ট্রী – তপন ভট্টাচার্য্য (মল্লিকপুর); প্রহ্লাদ দাস, প্রবোধ দাস, নির্মল পাল (ধপধপি); শংকর মণ্ডল, কচি প্রামাণিক (সীতাকুণ্ডু); প্রদীপ মণ্ডল, উদয় মণ্ডল, জগাই মণ্ডল (বেগমপুর) শংকর মণ্ডল (বারুইপুর); সত্যমণ্ডল (কল্যাণপুর); ভাস্কর ছাটুই, মনোজ ছাটুই (সীতাকুণ্ডু) রাজু চ্যাটার্জী (শংকরপুর) প্রভৃতি।

বারুইপুরে একটি সরকারী কৃষি খামার আছে। বর্তমান নাম মহকুমার উপযোগী গবেষণা খামার। এই খামারের নামের প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে। এখানে ধানের বীজ তৈরী হয়। রবি মরশুমে একসময় কার্পাস চাষ হয়েছিল, খুব ভালো ফলন হওয়া সত্ত্বেও এ চাষ বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ, তুলা তোলার সময় এদেশের আবহাওয়া ভালো থাকে না, প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয়। পরপর কয়েক বছর সূর্যমুখীর চাষ হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল অপূর্ব এক পরিবেশের। সে দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য যারা দেখেছে তারা তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। ফলন ভালো হয়েছিল। এখন যে চাষ বন্ধ। এখানে পরীক্ষামূলকভাবে বীটের চাষ হয়েছিল। সে চাষ ভালো হওয়ায় পঃবঃ সরকারের কৃষি বিভাগ দঃ২৪ পরগনায় ব্যাপক ভাবে বীট চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সহযোগী হয় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম। আই.এফ.বি এগ্রো নামে একটি সংস্থা বীট থেকে এ্যালকোহল তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত। মাঝে দু-একবার মুগের চাষ হয়েছিল। রবিখন্দের বিষয়ে খামারটি বড় খামখেয়ালী। যাইহোক, খামারটি স্থানীয় মানুষদের বেশ উপকারে আসে। এখান থেকে চাষীরা অপেক্ষাকৃত কম দামে বীজধান পায়। এমনকি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বীজতলা নষ্ট হয়ে গেলে চাষীরা এখান থেকে বীজ (ধানের চারা) পায়। এখানে কিন্তু উদ্যান বিভাগ হতে পারে, পারে ফল গবেষণা কেন্দ্র।

সম্প্রতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বৃক্ষসংরক্ষণ নিয়ে আইন তৈরী হয়েছে। এই আইনের

প্রয়োজনীয়তা অতীব। তার আগে আইন মানার ইচ্ছেটা থাকা প্রয়োজন। নইলে আইন যেমন বইয়ের পাতায় বন্দী থাকে তেমনই থাকবে। চারিদিকেঁ সবুজ বাঁচাও অভিযান হচ্ছে, হচ্ছে বনসৃজন প্রকল্পের নানা অনুষ্ঠান। ভাল কথা, খুবই ভাল কথা। উদ্দেশ্য মহৎ। শুধু একটা কথা, এতে যেন ফাঁক না থাকে। মিডিয়ার সামনে মুখ দেখানোটা যেন উদ্দেশ্য না হয়। তাহলে সব বৃথাই হবে।

কাননকুণ্ডলা, শ্যামলা, চিরযৌবনা বারুইপুর আজ যেন ভীতসন্ত্রস্তা হরিণী। যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসীবাহু প্রসারিত হচ্ছে তার দিকে। একদিন ছিল ছোট নগর, তারপর শহর, পরে মহকুমা শহর। হয়ত আগামীদিনে হবে জেলা শহর বা সদর শহর।

এমনিতে তো তার মহানগরীর সাথে বাঁধা আছে গাঁটছড়া। ফলে এখানকার জমিতে শুধু বাড়ী তৈরী হচ্ছে। কাটা হচ্ছে ফলের গাছ। নষ্ট হচ্ছে একের পর এক বাগান। এভাবে চলতে থাকলে একদিন হারিয়ে যাবে বারুইপুরের ঐতিহ্য। তাই যারা বাড়ী করেছে বা করবে করবে ভাবছে তারা যেন অন্তত একটা ফলের গাছ বাড়ীতে লাগায়। বেশী হলে তো খুব ভালো হয়। ফল তো পাওয়া যাবেই, সৃষ্টি হবে এক অনুপম পরিবেশের। পাওয়া যাবে নির্মল বাতাস্। মনপ্রাণ ভরে যাবে অমৃতময় স্নিগ্ধতায়।

বারুইপুরের দীঘি খালবিল জলাভূমি পরিক্রমা

ড. কালিচরণ কর্মকার

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই

তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী

স্তম্ভিত হয়ে রও।

ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,

কথা কও, কথা কও।"

বাংলাদেশ খাল, বিল, দীঘি, পুষ্করিণী, জলাভূমি অধ্যুষিত জলমাতৃক এক শীতলাসিক্ত সরস ভূখণ্ড। মমতাময়ী মায়ের কল্যাণ হস্তস্পর্শের মতো এইসব জলাশয় একদিকে যেমন এর পবিত্র ভূমিকে করেছে উর্বর কৃষিমাতৃক, বন্যা প্রতিরোধক, দূষণ প্রতিরোধক অন্যদিকে তেমনি বাঙালির জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, স্নান, পান ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়, বাংলার ইতিহাস এবং ভূগোলের উপর এগুলির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা হলো বারুইপুর। এটি একদা প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গস্থ সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বারুইপুর থানার ঐতিহ্যের সঙ্গে এর অন্তর্ভুক্ত পুষ্করিণী, দীঘি, খালবিল, জলাভূমির ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলার অন্যান্য থানা বা অঞ্চলের মতোই এই থানার অধীনস্থ জলাশয় ও খালবিলভিত্তিক ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ইত্যাদির একটা বিশেষ তাৎপর্যয় ভূমিকা আছে। বিশেষ করে একদা এখানে বারুই সম্প্রদায়ের পানচাষে ও পরবর্তিকালে পেয়ারা, লিচু, লকেট, সফেদা, গোলাপজাম, করমচা, পেঁপে প্রভৃতি বাগানচাষে এবং বিভিন্ন জাতের ধানসহ খারিফ ও রবিশস্য চাষে এখানকার জলাশয় ও খালবিলগুলির অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন প্রত্নবৈভবের উত্তোলনে এবং বেশকিছু জনশ্রুতি ও লোককথার উৎসরূপে বারুইপুর অঞ্চলের পুকুর দীঘি, খাল, বিল ইত্যাদি জলাশয়গুলির বিশেষ খ্যাতি আছে। তারই অনুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া যাক।

কটকিপুকুর – জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর মহকুমার প্রাণকেন্দ্র হলো বারুইপুর শহর। এই শহরের দক্ষিণপ্রান্তে বারুইপুর পুরাতন বাজার সংলগ্ন অঞ্চলটির প্রাচীন নাম আটিসারা। এখানে আদিগঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলিধন্য অনন্ত আচার্যের শ্রীপাটে নির্মিত চৈতন্যমন্দির এবং এর দক্ষিণপশ্চিম লাগোয়া ঐতিহাসিক কটকিপুকুর। অধুনা প্রায় দশ-বারো বিঘা আয়তন নিয়ে পুকুরটি বিস্তৃত। এর পূর্বদিকে একটি চওড়া ভগ্ন প্রাচীন সানের ঘাট এবং ঘাটের ডানদিকে একটি পুরাতন তুলসীমঞ্চ ও বটবৃক্ষ আজো বিদ্যমান।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর নদীয়ার শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীরে তীরে দ্বারীর জাঙ্গাল নামক একটি পথ ধরে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে সপার্ষদ অনন্ত আচার্যের কুটিরে (মিত্র) পদার্পণ করেন এবং একরাত্রি হরিনাম সংকীর্তন করে কাটিয়ে পরের দিন ঐ পথ ধরেই ছত্রভোগ হয়ে উড়িষ্যার কটক তথা পুরীর উদ্দেশে রওয়া হয়ে যান, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য 'ভাগবত' নামক জীবনীমূলক কাব্যে।

'হেনমতে প্রভুতত্ত্ব কহিত কহিতে।

উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে।।

সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।

আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে।।

শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।

প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।।'

আটিসারা পরিত্যাগের প্রাক্কালে মহাপ্রভু আদিগঙ্গার যে ঘাটে স্নান সমাপন করে কটকাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন সেই ঘাটটি কটকিঘাট নামে সর্বজনবিদিত । বলাবাহুল্য পরবর্তিকালে আদিগঙ্গা হেজেমজে গেলে কটকিঘাট সংলগ্ন স্রোতের কিছুটা অংশ সংস্কার করা হয় যা কিনা অধুনা কটকিপুকুর নামে খ্যাত। পূর্বে পুকুরটি শ্রীপাটের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তিকালে এটি স্থানীয় দত্ত পরিবারের এক্তিয়ারভুক্ত হয়।

জনশ্রুতি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আটিসারা পরিত্যাগকালে অনন্ত আচার্যের কাছে বিদায় নিতে এলে অনন্ত আচার্য চৈতন্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সাশ্রুনয়নে যখন কিছুতেই মহাপ্রভুকে বিদায় দিতে চাইছিলেন না তখন মহাপ্রভুর কৃপায় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দুটি দারুমূর্তি আদিগঙ্গার জলস্রোতে অধুনা কটকিপুকুরের ঘাটে ভেসে আসে। তখন মহাপ্রভু অনন্ত আচার্যকে তার কুটিরে মূর্তিদুটিকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যসেবা করতে বলেন এবং আরো বলেন যে, ঐ দুটি মূর্তির মধ্যেই তিনি ও নিত্যানন্দ বিরাজ করবেন। এটি ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে এই শ্রীপাটের পরিচালক নিত্যানন্দ বাবাজীর কাছ থেকে শ্রুত। বলা বাহুল্য যে, অনন্ত আচার্যের শ্রীপাটের পুণ্যার্থিদিগণ এই কটকিপুকুরে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে থাকেন। আজো সূর্যস্নাত প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য কটকিপুকুরের সানের ঘাটে বসে থাকলে সহসা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং একটা নস্টালজিয়ায় মন আপ্লুত হয়ে পড়ে।

কোষাঘাটা – বারুইপুর পুরোনো বাজার সংলগ্ন এই অঞ্চলের জমিদার রায়চৌধুরীদের রাজবল্লভ ভবনের সম্মুখে বামদিকে রাসমাঠ এবং ডানদিকে কোষাঘাটা নামক জনপ্রিয় পুকুরটির অবস্থান। জানা যায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী রাজপুর থেকে

প্রথম বারুইপুর আগমন করেন এবং জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব মেটাতে এখানকার কাছারীবাড়ির সম্মুখে আলোচ্য জলাশয়টি খনন করান। পরবর্তিকালে দুর্গাচরণের পৌত্র রাজবল্লভ রায়চৌধুরী অনুমানিক ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোষাঘাটার উত্তরপাড়ে তাঁরই নামে 'রাজবল্লভ ভবনটি' নির্মাণ করেন।

প্রায় চারবিঘা আয়তন বিশিষ্ট এই জলাশয়টি খননকালে মাটির নিচে থেকে একটি পাথরের ধারকের উপর তামার কোষাকুষি পাওয়া যায়। পরে জলাশয়টির উত্তরপাড়ে শিবমন্দির নির্মাণের সময় ঐ পাথরের ধারকটি রাসমঞ্চের পূর্বপাশে মাটির নিচে পুঁতে দেওয়া হয় আর বৃহৎ আকৃতির কোষা ও কুষিটি রাজবল্লভ ভবনের মধ্যে অবস্থিত রায়চৌধুরীদের কুলদেবী আনন্দময়ীর পূজায় ব্যবহৃত হয়। অধুনা ছিদ্রাবস্থায় অব্যবহার্য।

শোনা যায় এই জলাশয়ের পাশে অবস্থিত শিবমন্দির এবং শানের ঘাটের তলদেশে একটি গোপন খাত আছে যেখানে অনেক বড় বড় মাছ এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে জাল ফেলে কিম্বা ছিপ ফেলে এদের সহজে ধরা যায় না।

একদা কোষাঘাটের পূর্বপার্শ্বস্থ রাসমাঠে রাস উৎসবের সময় জলাশয়টির উত্তরপূর্ব কোণে সুন্দরভাবে সজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা নির্মাণ করে তার উপর বারবণিতাগণ রাধাকৃষ্ণ ও সখী সেজে অশ্লীল পোষাক সহকারে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে নৃত্যের মাধ্যমে রাসলীলা পরিবেশন করতো। এই নৃত্য পরিসমাপ্ত হতো কোষাঘাটায় ঝাঁপিয়ে ডুব দিয়ে ওঠার মাধ্যমে। তাই এই নৃত্য ডুবাই বা ডোবাই নাচ নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। তৎকালে এই অশ্লীল ডুবাই বা ডোবাই নাচ দেখতে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ কোষাঘাটের চারপাশে বিপুল ভিড় করতো। পরবতীকালে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এই নাচ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় তিনশো বছরেরও অধিককালের নানা ঘটনার উত্থানপতনের সাক্ষ্য বহন করে আজো নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বারুইপুরের ঐতিহ্যবাহী এই জলাশয়টি।

শাঁখারীপুকুর – বারুইপুর পুরাতন বাজারের পূর্বপার্শ্ব থেকে উত্তরদক্ষিণে যে সড়কটি (প্রাচীন দ্বারীর জাঙ্গাল) ধপধপির সুবিখ্যাত দক্ষিণরায়ের মন্দির অভিমুখে চলে গিয়েছে তার বামদিকে শাঁখারীপুকুরটি বিদ্যমান। অধুনা পুকুরটি শরীকানী ভাগবাঁটোয়ারার ফলশ্রুতিতে প্রায় দশবারোটি খণ্ডে খণ্ডিত। পুকুরটির নামেই অঞ্চলটি শাঁখারীপুকুর নামে পরিচিত। পুকুরটির সন্নিকটে কয়ালপাড়ার কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নীলকর সাহেবদের প্ররোচনায় চাষীরা নীলচাষ করতো বলে জানা যায়। আজো শাঁখারীপুকুরের পাশে জঙ্গলের মধ্যে সাহেবদের গোটাকয়েক পাকা কবরের ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। শাঁখারীপুকুরকে কেন্দ্র করে একটি বহুল প্রচলিত গল্পের আদলে একটি জনশ্রুতি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শোনা যায়, গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে এক শাঁখারী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অল্পবয়স্কা বিবাহিতা একটি মেয়ে ঐ পুকুরের কাছে বসে শাঁখা পরে। শাঁখা পরা শেষ হলে মেয়েটি অদূরে একটি বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলে যে, ঐ বাড়িটি তার বাপের বাড়ি। তিনি ঐ বাড়িতে গিয়ে তার

বাবার কাছ থেকে যেন শাঁখার দাম নিয়ে নেন। শাঁখারী বামুন যথারীতি ঐ বাড়ির গৃহকর্তার কাছে ঘটনাটি বলে শাঁখার দাম চাইলে গৃহকর্তা অবাক হয়ে যান কারণ তাঁর কোনো মেয়েই ছিলো না । অতঃপর রহস্য উদ্‌ঘাটনে দুজনে পুকুরধারে এসে মেয়েটিকে ডাকাডাকি শুরু করে খোঁজাখুজি করতে থাকেন। সহসা পুকুরের মাঝখান থেকে দুটি শাঁখাপরা হাত ভেসে ওঠে। শাঁখারী ও গৃহকর্তা ঐ দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। সেই থেকে পুকুরটির নাম হয় শাঁখারিপুকুর, তবে সেই শাঁখারী পরিবারটির অবস্থানটি এই গ্রামে ঠিক কোথায় ছিল তা আজ আর জানা যায় না।

মদাপুকুর – বারুইপুর শহরের অব্যবহিত পূর্বদিকে ২২°৭ʹ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৭ʹ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত মদারাট গ্রামের পূর্বে মদাপুকুরটির অবস্থান। বলা বাহুল্য মদারাট গ্রামনামের উৎসই হলো এই মদাপুকুরটি। পুকুরটি যে যথেষ্ট পুরাতন সে বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীগণ একমত। প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা আয়তন বিশিষ্ট এই বিখ্যাত পুকুরটি বর্তমানে অনেকাংশে হেজেমজে গিয়েছে। পদ্ম, শাপলা ও নানান জলজ উদ্ভিদ আচ্ছাদিত এবং ঝোপঝাড় পরিবেষ্টিত হয়ে পুকুরটি দীর্ঘদিন অসংস্কৃত ছিলো। কয়েকবছর পূর্বে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের চেষ্টায় পুকুরটির কিছুটা সংস্কৃত হয়েছিলো বলে জানা যায়।

পুকুরটির পশ্চিমপাড়ে একটি প্রাচীন ঝুরিওয়ালা প্রাচীন বটবৃক্ষ ধ্যানমগ্ন মৌন ঋষির মতো অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান। বটবৃক্ষটির তলদেশে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ছলন পড়ে থাকতে দেখা যায়। এককালে এইসব লৌকিক দেবদেবী ও পীরপীরানীদের পূজা হাজোত হত বলে জানা যায়। গ্রামের বৃদ্ধ মানুষজন বলে থাকেন যে, পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বেও মদাপুকুরের চারপাশে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে বারুজীবীদের বহু পানের বরজ সৃষ্টি হয়েছিলো। তবে বর্তমানে আর তার কোনো চিহ্ন নেই।

মদাপুকুরের নামকরণটি কীভাবে হয়েছিলো তার পিছনে তিনটি অভিমত আছে। কেউ বলেন এরূপ নামকরণের পিছনে সুফিবাদী মাদারপীরের প্রভাব থাকতে পারে। বাংলাদেশে তাঁর নামে বহু স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন মদারীপুর, মদার বাড়ী, মদারডাঙা ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী আলোচ্য পুকুরটির নাম মাদারপুকুর বা মদারপুকুর থেকে মদাপুকুর হতে পারে।

দ্বিতীয় ধারণাটি হলো এইরূপ যে, এককালে পুকুরটির পাশে হয়তো কোনো মাদার বা ডেওফলের গাছ ছিলো, যার ফলে পুকুরটি মাদারপুকুর বা মদাপুকুর নামে পরিচিত হয়েছিলো।

আর সবশেষে যে অভিমতটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা আছে বলে আমরা মনে করি তা হলো, মেদনমল্ল পরগনা অধ্যুষিত এই অঞ্চলের জমিদার রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ এবং এঁদের জমিদারি প্রতিষ্ঠাতা মদন দত্ত যিনি পরে রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি অধুনা মদাপুকুর অঞ্চলের মানুষজনের জলকষ্ট নিবারণার্থে এই বিশাল পুকুরটি খনন করান। তাই মদন দত্তের নামানুসারে লোকের মুখে পুকুরটির নাম হয় মদাপুকুর।

এই তিনটি ধারণার মধ্যে প্রথম দুটি ধারণার জোরালো কোনো ভিত্তি নেই। প্রথমত দক্ষিণ

চব্বিশ পরগনা জেলায় বারুইপুর অঞ্চলে মাদারপীরের তেমন কোনো প্রভাব ছিলো বলে প্রমাণ নেই। এই অঞ্চলে পীর মোবারক গাজীর প্রভাব অবিসংবাদিত। মোবারক গাজীর প্রসঙ্গ আঞ্চলিক লোকসাহিত্যে যত্রতত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত গ্রামের বয়স্ক মানুষজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মদাপুকুরের আশেপাশে মাদারগাছ বা ভেওফলের গাছ ছিলো বলে জানা যায় না। কিন্তু জমিদার মদন দত্তের প্রসঙ্গ এই পুকুর সম্পর্কে সর্বজনবিদিত। মদন দত্ত খনিত পুকুর যে মদাপুকুর এবং ঐ মদা নাম থেকেই যে গ্রামনাম মদারাট[১] নিষ্পন্ন হয়েছে তা সহজেই অনুমিত হয়।

তবে ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে এখানকার ভূমিরূপ দেখে ধারণা হয় যে, একদা পশ্চিমে আদিগঙ্গা এবং পূর্বে বিদ্যাধরী নদীর সংযোজক যে স্রোতটি এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিলো যা ফর্দি [২] নামে এখনো এর আশেপাশে সামান্য চিহ্ন রেখে গেছে, পুকুরটি এই স্রোতেরই একটি আটকে-পড়া অংশ। এই অংশটি পরে জমিদার মদন দত্ত কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে পানীয় জলের পুকুররূপে ব্যবহৃত হতো। একসময় মদাপুকুরে প্রচুর পরিমাণে পদ্মফুল ফুটতো বলে জানা যায়। অধুনা পুকুরটিকে একপাশ থেকে যেভাবে ভরাট করা হচ্ছে তাতে এর অস্তিত্ব যে কতদিন তাতে সন্দেহ আছে।

হাঁদোলপুকুর – প্রায় তিনবিঘা আয়তন বিশিষ্ট এই জলাশয়টি বারুইপুর শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার পূর্বে বেগমপুর নামক একটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত জলাশয়টির পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে বেগমপুর গ্রামটি ঘিরে আছে। আর দক্ষিণদিকে অবস্থিত মাধবপুর নামক একটি গ্রাম। জলাশয়টির কিছুটা উত্তরদিক দিয়ে বারুইপুর-চম্পাহাটী পাকা সড়কটি প্রসারিত। একদা জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম মেদনমল্ল পরগনার জমিদার রায়চৌধুরীদের এক্তিয়ারভুক্ত এই জলাশয়টির অবস্থান এবং এখানকার ভূমিরূপ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এটি পৃথকভাবে খনন করা কোনো পুষ্করিণী নয়, নদী থেকে নির্গত একটি বিশেষ স্রোতের আটকে-পড়া অংশ। একসময় এই অঞ্চলের পশ্চিম ও পূর্বে যথাক্রমে আদিগঙ্গা নদী ও বিদ্যাধরী নদী প্রবাহিত ছিলো। এই উভয় নদীর সংযোজক ফর্দি নামে যে একটি প্রবল স্রোতের অস্তিত্ব যা আজো এই অঞ্চলে কোথাও কোথাও সাক্ষ্য বহন করে। তা থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী আর একটি সংকীর্ণ স্রোত পিয়ালী নদীর দিকে বহমান ছিলো। পরবর্তিকালে মজে-যাওয়া এই স্রোতের একটি গভীর অংশই বর্তমানে হাঁদোলপুকুর নামে বিদ্যমান। তাই জলাশয়টির নির্দিষ্ট কোনো মালিকানাও নেই।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে, এই জলাশয়ের স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মতো টলটলে শীতল জল তৎকালে বেগমপুর গ্রামসহ আশেপাশের লোকালয়ের পানীয় জলের অন্যতম উৎস ছিলো। পরবর্তিকালে এই হাঁদোলপুকুর সংলগ্ন মণ্ডল ও ভট্চার্য পদবীধারী কয়েকটি পরিবার একটি দখলী শরিকানা সম্পত্তিরূপে ভোগ করতে শুরু করেন। ক্রমশ জলাশয়টির আশেপাশে কালীমন্দির, চণ্ডীর থান, বিবিমার থান, শিবমন্দির, দোলমঞ্চ এবং এর উত্তরপাড়ে ১৯৮০-৮২ সাল নাগাদ একটি প্রশস্ত সান নির্মিত হয়েছে।

হাঁদোলপুকুরের দক্ষিণপাড়ের বেশকিছুটা স্থান অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং দু-চারটি পুরোনো

আমগাছ দেখা যায়। এখানে এককালে এক দারোগার বসতি ছিলো বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষের কাছে শোনা যায়, তিনি ছিলেন নুনের দারোগা। আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী ও পিয়ালীর মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে (খালারি)[৩] একসময় স্থানীয় মানুষজন যথেষ্ট পরিমাণে নুন তৈরী করতো। আজো বেগমপুরের পূর্বদিকে মলঙ্গা নামে গ্রামটি সেই স্মৃতি বহন করছে। বলাবাহুল্য যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার লবণ উৎপাদনকারীদের মলঙ্গী বলা হতো। হাঁদোলপুকুরের উত্তরপূর্বে বাণীর বাগান নামক স্থানেও গ্রামবাসীরা নুন প্রস্তুত করতো। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসকগণ সাধারণ মানুষ যাতে লবণ তৈরী না-করে এবং গোপনে মহাজনদের নুনের গদীতে নুন পাচার করতে না-পারে সেজন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে নুনের দারোগা নিয়োগ করেছিলেন। এই ধরনের এক দারোগার বসতি ছিলো এখানে। তাই হাঁদোলপুকুরের দক্ষিণপাড়ের এই উঁচু স্থানটি দারোগাবাড়ি নামে কথিত ছিলো এখানে। তাই হাঁদোলপুকুরের দক্ষিণপাড়ের এই উঁচু স্থানটি দারোগাবাড়ি নামে কথিত হয়।

জলাশয়টির হাঁদোল নামকরণের উৎস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, 'হাঁদোল' কথার অর্থই হলো আন্দোলন।[৪] অর্থাৎ তরঙ্গ আন্দোলিত জলাশয়। এই অনুষঙ্গে 'হিন্দোল' শব্দটি থেকেও ধ্বনিতত্ত্বের পরিবর্তনের সূত্রে খুব সহজেই হাঁদোল কথাটি নিষ্পন্ন হতে পারে। আর তা থেকেই অকাট্যপ্রমাণ যে, জলাশয়টি নদী থেকে আগত জোয়ারভাটা-খেলা স্রোতের অঙ্গ বা কালক্রমে রুদ্ধ হয়ে ঐ স্থানে জলাশয় বা পুকুরে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

খাঁদীঘি – বারুইপুর শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে একটি ঐতিহাসিক দীঘিরূপে খাঁদীঘির অবস্থান। দীঘিটি পুরন্দরপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফকিরপাড়ার পিছনে বাগানের মধ্যে আজো তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে।

গৌড়বাংলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রি. – ১৫১৯ খ্রি.) তাঁর রাজস্বমন্ত্রী ও নৌসেনাধ্যক্ষ অধুনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্ভুক্ত মাহীনগরনিবাসী কায়স্থ কুলতিলক গোপীনাথ বসুর বীরত্ব ও বুদ্ধিতে তুষ্ট হয়ে 'পুরন্দর খাঁ'[৫] উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে যে জায়গীর প্রদান করেন সেই জায়গীর পুরন্দরপুর গ্রাম নামে কথিত হয়। শোনা যায়, গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খাঁ এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন এবং পার্শ্ববর্তী আদিগঙ্গার জলপথ ধরে নৌকাযোগে রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত করতেন। এই গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খাঁর পরপুরুষ ভারতগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, একদা পুরন্দরপুর গ্রামে রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের 'একজাই' হওয়া উপলক্ষে যে বিপুল জনসমাগম হয় তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পুরন্দর খাঁ এই বিশাল দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন – 'তাঁর নিজগ্রাম মাহীনগর থেকে অনতিদূরে পুরন্দরপুর নামে এখন যে গ্রাম আছে সেটি তিনি জায়গীর হিসাবে লাভ করেন। পুরন্দর খাঁ একমাইল লম্বা একটি দিয়েছিলেন যার ধ্বংসাবশেষ খানপুকুর নামে এখনও পুরন্দরপুরে দেখতে পাওয়া যাবে ।'[৬]

পুরন্দর খাঁর তত্ত্বাবধানে এই খাঁদীঘিটি খনন করতে যে বহুসংখ্যক কোদাল লেগেছিলো সেগুলি তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁরই জন্মভূমি গ্রাম মাহীনগর সংলগ্ন একটি স্থানে হয়েছিলো।

সেই স্থানটি 'কোদালিয়া' বা কোদালে নামে খ্যাত হয়। আর যে স্থানে মাটি বয়ে নষ্ট হয়ে-যাওয়া ঝোড়া বা চাঙাড়ীগুলোকে পোঁতা হয়েছিলো সেই স্থানের নাম চাঙড়ীপোতা[৭] হয় বলে জানা যায়।

খাঁদীঘিটি যে দীর্ঘদিন যাবৎ পুরন্দরপুরের গ্রামসহ আশেপাশের দু-একটি গ্রামের পানীয়জলের অবলম্বন ছিলো তা আজো বয়স্ক ব্যক্তিগণের কাছ থেকে শোনা যায়। খাঁদীঘির ঠিক পূর্বপার্শ্বে প্রাচীনকালে একটি ধর্মস্থান গড়ে উঠেছিলো। খাঁদীঘির ধারে ধারে এই ধর্মস্থানের পাশে দুটি প্রায় তিনফুট ব্যাসযুক্ত ছ'ইঞ্চি মোটা প্রচণ্ড ভারী পাথরের গোলাকার চাকতি ইটের স্তূপের মধ্যে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, সম্ভবত এই স্থানটিতে অর্থ ও মূল্যবান ধাতু বা অলঙ্কার সংরক্ষণের দুটি ভাণ্ডার ভূগর্ভে স্থাপন করা হয়েছিলো যার ঢাকনারূপে ঐ পাথরের গোলাকার চাকতি দুটি ব্যবহৃত হতো।

আজো ছশো বছরের প্রাচীন ইতিহাসের উত্থানপতনের সাক্ষী হয়ে বৃদ্ধ খাঁদিঘিটি নীরবে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে যেন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার দিন গুনছে। আর তার চারপাশে সৃষ্টি হয়েছে গাছগাছালি আচ্ছাদিত গা-ছমছমে পরিবেশ।

রামসাঁতালির পুকুর – বারুইপুর থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম শাসন। পূর্বরেলের শিয়ালদহ – লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার বারুইপুরের পরবর্তী স্টেশনও শাসন। শাসন গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি সর্বজনবিদিত পুকুর হলো রামসাঁতালির পুকুর। আনুমানিক সাতবিঘা পরিমাণ বিশিষ্ট পুকুরটির উত্তরপূর্ব কোণে একটি প্রাচীন বনবিবি মার চালামন্দির আছে। শোনা যায়, পুকুরটির পাশে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিলো যা কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুকুরটির বর্তমান মালিক কে তা ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে আশেপাশের মানুষজনদের কাছ থেকে সঠিকভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ শুধু এটুকুই জানিয়েছে যে, মালিক কলকাতানিবাসী। বাস্তবে আশেপাশে বসবাসকারী পরিবারগুলি পুকুরটি ভোগদখল করে থাকে। তাদের মৎস্যরসনা পরিতৃপ্তির উৎস এই জলাশয়টি।

পুকুরটির রামসাঁতালি নামের উৎস অনুসন্ধানে ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায় যে, প্রায় দুশো বছর পূর্বে এখানে রাম সাঁতাল নামে এক গুণিন বাস করত। রাম সাঁতাল প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল ছিল বলেই আমরা মনে করি। একসময় সুন্দরবন অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করতে স্থানীয় জমিদার, তালুকদার বা চকদারগণ পশ্চিম সীমান্তবাংলা থেকে এসব সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রমুখ আদিবাসীদের নিয়োজিত করেছিলেন। যাদের স্থানীয় ভাষায় ধাঙড় বলা হতো। রাম সাঁওতাল ছিল এমনই একজন আদিবাসী।

এই অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে যে, রাম সাঁতাল নারীপ্রধান কামরূপ কামাক্ষ্যা গিয়ে জাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিল কিন্তু সেখান থেকে তাকে সহজে ফিরতে দেওয়া হয়নি। রাম সাঁতাল নাকি কোনোক্রমে নদীতে ভাসমান একটি বটগাছ আশ্রয় করে ভেসে পালিয়ে এসেছিলো। উক্ত বটগাছটি নাকি আলোচ্য পুকুরটির পাড়ে একসময় বিরাজ করতো। রাম সাঁতালের যাদুবিদ্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু কথা প্রচলিত আছে। যেমন –

রাম সাঁতালির আজ্ঞে

পোঁদে পিঁড়ে জোড়া লাগ্নে।

ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে উক্ত পুকুরের পাশের বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র গুহ নামক এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা যায় যে, রাম সাঁতালি কাররূপ কামাক্ষ্যা থেকে ফেরার পর সেখান থেকে এক মহিলা তাঁর খোঁজে একবার এখানে এসেছিলেন। তখন রাম সাঁতালি তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে যাদুবলে প্রথমবার একটি কুমড়োর মধ্যে এবং দ্বিতীয়বার একটি বিশেষ স্থানে মাটির নিচে আত্মগোপন করেছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ ভদ্রমহিলার কৌশলে প্ররোচিত হয়ে রাম সাঁতালির স্ত্রী তাঁর স্বামীর আত্মগোপন স্থানের কথা বলে দিলে সেখানেই রাম সাঁতালির নামেই পুকুরটির নাম হয় রামসাঁতালির পুকুর। একদা পুকুরটির উপরে মোটা ঘাসের দাম বসে গিয়েছিলো। পরবর্তিকালে সংস্কার করা হয়। আশেপাশের চাষের জমিতে এই পুকুরের জল সেচ দেওয়া হয়ে থাকে।

স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, বিবাহ, দেবপূজা, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের একটি তালিকা তৈরী করে সিধাসহ ঐ পুকুরপাড়ে রেখে এলে উক্ত পুকুরে বসবাসকারী যখে তা সরবরাহ করতেন। কোনো এক গ্রামবাসী এইভাবে প্রাপ্ত তৈজসপত্রাদি পুনরায় ফেরৎ না দেওয়ায় পরবর্তিকালে আর তৈজসপত্রাদি পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য যে, বাংলার পুকুর, দীঘি, জলাশয়কে নিয়ে এই ধরনের গল্প যত্রতত্র শোনা যায়। রামসাঁতালির পুকুরও তার ব্যতিক্রম নয়।

সীতাকুণ্ডু ও জীবৎকুণ্ড (সীতামা'র পুকুর) – শুধু বারুইপুর থানা নয়, সমগ্র চব্বিশ পরগণার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবৈভব অঞ্চল হলো সীতাকুণ্ড এবং তৎপার্শ্বস্থ অঞ্চল আটঘরা। সীতাকুণ্ড নামেই যে গ্রামটি সীতাকুণ্ড তা বলাই বাহুল্য। মানুষের উচ্চারণে সীতাকুণ্ডু নামে কথিত হয়। আর সীতামার সম্মুখস্থ প্রায় ছয়সাত বিঘা আয়তন বিশিষ্ট বিশাল জলাশয়টি জীবৎকুণ্ড বা সীতামা'র পুকুর নামে পরিচিত। সম্প্রতি সীকাকুণ্ডটি জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা পরিপূর্ণ হয়ে ছোটো ডোবারূপে কোনোক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মাত্র। সীতাকুণ্ডটি নলকুণ্ড নামেও অভিহিত হয়। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, সীতামা'র মন্দির থেকে ভূগর্ভস্থ একটি নলের দ্বারা এই কুণ্ডটির সংযোগ ছিলো। সেই অর্থে এটি নলকুণ্ড। পূর্বে এই মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীর দল এই সীতাকুণ্ডেই পুণ্যস্নান সমাপন করতেন। কিন্তু অধুনা এটি হেজেমজে আগাছা পরিপূর্ণ হয়ে নিতান্ত একটি ক্ষুদ্র ডোবায় পরিণত হওয়ায় পুণ্যার্থীগণ এখন মন্দিরের সামনের জীবৎকুণ্ডে বা সীতামা'র পুকুরে পুণ্যস্নান সম্পন্ন করে থাকেন। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস যে, এই জীবৎকুণ্ড বা সীতামা'র পুকুরের জল মুমূর্ষু মানুষকে বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করালে জীবন রক্ষা পায় ও ব্যাধির উপশম হয়। এমনকী বন্ধ্যা গাছের উপর অর্থাৎ ফলহীন গাছের উপর উক্ত জলাশয়ের জল ছড়িয়ে দিলে গাছ ফলবতী হয়। তাই এটি জীবৎকুণ্ড।

সীতামা'র মন্দির, সীতাকুণ্ড, নলকুণ্ড, সীতামা'র পুকুর বা জীবৎকুণ্ড কদিন আগে কার বা কাদের দ্বারা নির্মিত বা খনিত হয়েছিলো তার কোনো প্রমাণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়, 'পার্শ্ববর্তী গ্রাম রামনগরে ছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নাম ছিলো তাঁর শিশুমোহন বন্দোপাধ্যায় ..... এই শিশুমোহনই নাকি শ্রীরামচন্দ্রের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা আরম্ভ করেন। ..... তাহলে দেখা যাচ্ছে রামসীতার প্রতিষ্ঠা আজ থেকে একশো বা দেড়শো বছরের বেশি নয়। .... কিন্তু তারও আগে যে নামটার লিখিত প্রমাণ পাচ্ছি ? তাহলে এই সীতা কে ? হিন্দু-মুসলমান — উভয় সম্প্রদায়ের কিছু প্রবীণ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করি, এ-সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন কিনা। তাঁরা বলেছিলেন, জনশ্রুতি এই যে, সীতা নামে কোনো রাজকন্যা এখানে ছিলেন। আর তাঁর সামনে থাকতেন দেওয়ানা গাজী। নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় এঁদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে সীতা ঠাকুরণ পরাস্ত হোয়ে ঐ কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর থেকে ঐ কুণ্ডের নাম হয় সীতাকুণ্ড।'[৮]

জনশ্রুতি অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে, সীতামা'র মন্দিরের ও সীতাকুণ্ড সীতা রঘুপতি রামচন্দ্রের পত্নী জনকনন্দিনী সীতা নয়। এই সীতা এক মানবী রাজকন্যা। তিনি যে কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করেছিলেন সেই কুণ্ড সীতাকুণ্ড, তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে সীতামা'র মন্দির এবং সীতামা'র মন্দিরের সম্মুখস্থ জলাশয়টি সীতামা'র পুকুর বা জীবৎকুণ্ড। তবে কোন্ রাজার কন্যা এই সীতা তা আজো জানা সম্ভব হয়নি কিন্তু সীতামা'র পুকুরের দক্ষিণপাড়ে অধুনা দেওয়ানগাজীর মাজার সংলগ্ন উঁচু ঢিবিতে যে সুপ্রাচীনকালে একটি রাজবাড়ি ছিলো তার বহু প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কারণ, এই ঢিবির উত্তরপ্রান্তে নিরামিষ পুকুর, নিরামিষ পুকুরের উত্তরপূর্বপাড়ে ফাঁসিডাঙার ঢিবি, ফাঁসিডাঙার উত্তরসীমায় শূলীপোতা ঢিবি আবার রাজবাড়ি ঢিবির দক্ষিণ সীমায় চালধোয়া পুকুর, এর সামান্য পশ্চিমে পাত্রপুকুর এবং দক্ষিণে পদ্মপুকুর। আর পূর্বে ঘোড়াঢিবি ইত্যাদির অস্তিত্ব আজো কিছু অংশে রয়ে গেছে।

পরিশেষে বলি যে, আটঘরা সীতাকুণ্ড অঞ্চলে যে সুপ্রাচীনকালে একটি সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিলো তার বহু প্রত্ন নিদর্শন এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের মতো সীতামা'র পুকুর বা জীবৎকুণ্ড থেকেও উত্থিত হয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি পাথরের বিষ্ণুমুর্তি একটি নৃসিংহ অবতারের অভিনব পাথুরে মূর্তি এবং একটি কালো পাথরে উৎকীর্ণ সিন্ধুঘোটকের মূর্তির আদলে একটি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এগুলির বয়সসীমা পালসেন যুগ থেকে প্রাক্‌মৌর্যযুগ পর্যন্ত বিধৃত বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং নিকটেই যে অষ্টগৌড়া বন্দরের অবস্থান ছিলো সে অনুমান অযৌক্তিক নয় বলে মনে করি। আলোচ্য জলাশয়দুটির মৌনতাকে ভাবীকালের কোনো পণ্ডিত বা গবেষক যদি তাঁদের অনলস সাধনায় ভঙ্গ করে মুখরতা দান করতে পারেন তবে সেদিনই এর সত্যকার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হবে।

হেদোপুকুর বা কালাকর্পূরপুকুর – থানা বারুইপুরের উত্তর সীমান্তে ও আদিগঙ্গার পশ্চিমপারে অধুনা দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুর নামক ঐতিহাসিক পুকুরটি বিস্তৃত। পুকুরটির আয়তন বর্তমানে প্রায় পাঁচবিঘার কম নয়।

স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের কাছ থেকে জানা যায় যে, পূর্বে পুকুরটি আরো বিশাল ছিলো। বর্তমানে প্রায় হেজেমজে যাওয়ার উপক্রম। হাদুয়া বা হেদো কথার অর্থই হলো হাজামজা পুকুর। আর কালাকর্পূর নামে এক ধরনের কর্পূর গন্ধযুক্ত জলজ লতা পুকুরটিতে প্রচুর জন্মায় বলে পুকুরটির নাম হয়েছে কালাকর্পূর। হুপিং কাশিতে কালকর্পূরের রস নাকি অব্যর্থ ঔষধ, অন্তত স্থানীয় ব্যক্তিদের তাই ধারণা। এই হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুরের মাঝখানে যে একটি নিমজ্জিত মন্দির ছিলো এবং তার চূড়া থেকে যে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মেছিলো সেকথা স্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশই বলে থাকেন।

প্রাচীনকালে পুকুরটি ধামনগর (ধর্মনগর) নামে একটি বিশাল গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং একজন হিন্দু রাজা মুসলমানদের দ্বারা অসম্মানিত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে এই পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

"Dhamnagar is a village in Baruipur Subdivision which contains the house of a Hindu Raja. Who drowned himself in order to escape being dis-honoured by the Mohamadans. There is a tank in the village in the midst of which grows a Pipal tree and people have a tradition that it springs from the top of a temple buried beneath the water"

বলাবাহুল্য যে, উপরে উদ্ধৃতিটির মধ্যে যে পুকুরটির কথা বলা হয়েছে সেটি আলোচ্য হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুর। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) এই পুকুরটি সংস্কার করার সময় লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯ খ্রি. – ১২০৫ খ্রি.) একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাম্রশাসনের একস্থানে লেখা রয়েছে – 'যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃ পাতিপশ্চিম খাটিকায়াং বেতড্ড চতুরকে পূর্ব্বে জাহ্নবী (স্র) বস্তি অর্দ্ধসীমা। দক্ষিণে লেংঘদেবমণ্ডপী-সীমা। পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্রসীমা। উত্তরে ধর্মনগরসীমা।' এখানে উল্লেখিত ধর্মনগর গ্রামটির অন্তর্ভুক্ত হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুরটি। বলা বাহুল্য যে, এই সুপ্রাচীন গ্রামটি ভেঙে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামের সঙ্গে অধুনা দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামটির উদ্ভব। যাই হোক হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুরটির উপর সুদীর্ঘকাল ধরে এমন মোটা ও ঘন জলজ আগাছার দাম সৃষ্টি হয়েছে যে, এই দামের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাচল করা যায়। এমনকী এর মাঝামাঝি স্থানে দুটি দিশি কালোজাম গাছ জন্মেছে। পুকুরটির দক্ষিণপূর্বের বেশকিছুটা অঞ্চল জুড়ে হাতে তৈরি পাতলা নক্সাকাটা অসংখ্য ইট বা ইটের খণ্ড পাওয়া গিয়েছে। শোনা যায়, পূর্বদিকে একটা বড়ো ঢিবি ছিলো। ঐ ঢিবি থেকে প্রচুর নক্সাকাটা ইটের সঙ্গে একটা ত্রিকোণাকৃতি পাথর পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষজনের ধারণা, ঐ স্থানেই ছিলো একটা প্রাচীন রাজবাড়ি। তাদের সঙ্গে কথা বলে আরো জানা যায় যে, পুকুরটির দক্ষিণদিকে একটি ইষ্টকনির্মিত শিবমন্দির যার সম্ভবত চূড়াতেই জন্মেছিল একটি অশ্বত্থ গাছ যেটি বহুদিন পর্যন্ত পুকুরটির মধ্যে বসে গিয়ে নিমজ্জিত হয়। ঐ মন্দিরের পুকুরটির উপরে দেখা যেত। হান্টার সাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে এর সাযুজ্য রয়েছে।

হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুর সম্পর্কে একটি গল্প এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। যার সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রঙিন কল্পনা মিশেছে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ –

একদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উক্ত রাজা জয়লাভ করেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত পরাজয়ের প্রতীক কালো পায়রা উড়ে এসে রাজবাড়িতে পৌঁছায়। তখন রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ শোকসন্তপ্ত হয়ে মুসলমানদের কবল থেকে নিজেদের সম্মানরক্ষার্থে রাজবাড়ি সংলগ্ন ঐ হেদোপুকুর বা কালার্কপূর পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এদিকে রাজা দ্রুত রাজবাড়িতে পৌঁছে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা শুনে মহাশোকে উন্মাদ হয়ে তিনিও ঐ পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তবে রাজার পরিচয় আজো অনুদঘাটিত।

শোনা যায় পূর্বে পৌষসংক্রান্তিতে অর্থাৎ গঙ্গাসাগরে মকরস্নানের দিন ঐ পুকুরের জল বৃদ্ধি পেয়ে পাড় উপচে পাশের রাস্তাঘাটে উঠে আসত। মনে হয় যে, আদিগঙ্গার একেবারে তীরস্থ ঐ পুকুরের সঙ্গে কোনো সংকীর্ণ নালা বা সুড়ঙ্গপথ কিম্বা মাটির তলা দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের মাধ্যমে জোয়ারের সময় ঐরূপ জল বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' – এই প্রবাদবাক্যটির মূর্ত দৃষ্টান্তরূপে দাঁড়িয়ে আছে এই হেদোপুকুর বা কালাকর্পূর পুকুরটি।

কলপুকুর – বারুইপুর স্টেশান সংলগ্ন পূর্বপার্শ্বস্থ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আয়তকার পুকুরটি কলপুকুর নামে জনপ্রিয় । বারুইপুর স্টেশান ও এখানকার রেলপথ নির্মাণের জন্য মাটি কাটার ফলে এই পুকুরটির সৃষ্টি হয় প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে। কারণ, সোনারপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত বাষ্পচালিত রেলগাড়ী চলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই। গাড়ীটি বারুইপুর স্টেশানে এসে পৌছেছিল সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে। কলপুকুরের পূর্বদিকের গ্রাম সুবুদ্ধিপুর। বর্তমানে এটি বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত। বারুইপুর স্টেশান থেকে সুবুদ্ধিপুর যেতে একসময় কলপুকুরের উপর দিয়ে আড়াআড়ি একটি মাটির রাস্তা গড়ে ওঠে ফলে কলপুকুর দুটি খণ্ডে পরিণত হয়।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে প্রবল বাষ্প তৈরীর জন্য দরকার হয় প্রচুর পরিমাণে জল। বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কে ঐ জল ভরার জন্য বারুইপুর দু'নম্বর প্লাটফর্মের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে মোটা পাইপ সংযুক্ত ইংরাজী 'L' আকৃতির দুটি জল তোলা কল ঐ সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকেই স্থাপিত হয়েছিল। ঐ দুটি জল তোলা কলের নামানুসারেই পুকুরটির নাম হয় কলপুকুর। বলাবাহুল্য ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাস থেকে শিয়ালদহ-বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হলে কিছুদিন পর বিগত শতাব্দীর ষাট-এর দশকে এই দুটি জল তোলা কল উঠে যায়। কিন্তু কলপুকুর নামটি আজও লোকমুখে যথারীতি প্রচলিত আছে।

দুপাশের স্থান ও ড্রেনের জল, নোংরা-আবর্জনা, মল, মূত্র, থুথু, কফ ইত্যাদি এইপুকুরে ক্রমাগত পরিত্যক্ত হওয়ায় একাধারে পুকুরটির গভীরতা যেমন কমে আসছে তেমনি পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পুকুরের জল উপচে আশেপাশের রাস্তা নিমজ্জিত করে।

স্থানীয় ব্যক্তিগণ পূর্বরেলের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত এই পুকুরটি জমা নিয়ে মাছচাষ করে থাকেন। পূর্বরেল কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায় খুব সহজেই এই কলপুকুরটি সৌন্দর্যময় লেক রূপান্তরিত হয়ে বেড়াবার উপযুক্ত স্থান রূপে বারুইপুর মহাকুমা শহরটির শোভা বৃদ্ধি করতে পারে। তাতে পরিবেশদূষণও প্রতিরুদ্ধ হবে।
কালীদহ ও শিঙ্গাদহ — বারুইপুর পুরাতন বাজার থেকে দক্ষিণাভিমুখী কুলপী রোডের পূর্বদিকে ধপধপি এবং সূর্যপুর স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে কালীদহ ও শিঙ্গাদহ নামে দুটি প্রায় মজে-যাওয়া খালের অবস্থান। একদা পশ্চিমপাশে আদিগঙ্গা থেকে নির্গত হয়ে চাঁদোখালি নামক একটি স্থানের মধ্যে দিয়ে এই স্রোতদুটি পরস্পর প্রায় সমান্তরালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে বিস্তৃত ছিলো। অধুনা এ দুটি প্রায় হেজেমজে যাওয়া খালের মাঝখানের স্থলভাগে আলিপুর নামক একটি গ্রাম গড়ে উঠেছে।

আমাদের মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে বর্ণিত যে কালীদহে চম্পকনগরের বণিক চাঁদসদাগরের চোদ্দোখানি বাণিজ্যতরণী (মধুকরসহ) মনসার কোপে সলিলসমাধি প্রাপ্ত হয়েছিলো, এটাই সেই কালীদহ বলে বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের অভিমত প্রমাণসাপেক্ষে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ ও লোকসংস্কৃতি গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের 'সুদক্ষিণা' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তথ্যপ্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'চাঁদের ডিঙ্গা নিমজ্জনের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, স্বাভাবিক কারণেই ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিতে ডিঙ্গাগুলি ডুবেছিলঃ 'দেখি কালীদহ নীর চমকিত চন্দ্রধর/মনে বড় পাইল তরাস/আকাশ পাহাড় ডাক/বিষম্ বিপাকে পাক/দেখি লোক জীবনে নৈরাশ/বিষম বৃষ্টির ফোঁটা/দেখি বিদ্যুতের ছটা/শিলাবৃষ্টি ঘন ঘন বরিষণ/ ঝড় বহে খরশান/ নক্ষত্র নাড়িটান তরঙ্গ আছাড়ে ঘ.. ঘন /ছিঁড়িল নায়ের পাট/ভাঙ্গিল মাসুন কাঠ/আছড়য়ে লৌহপিণ্ড প্রায়/কাণ্ডারী লাখিতে নারে/ ঘন পাকে ডিঙ্গা ফেরে / বাতাসেতে ছৈ-ঘর উড়ায়/ ভয়ংকর অন্ধকারে কেহ কাহে নাহি হেরে / না পারে রাখিতে কর্ণধার।' (দ্বিজবংশদীপ)। ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস লিখছেন, – 'গজ শুণ্ডাকার / বরিষে জলধার / ঘন ঘন ঘোরতর গর্জে।'

আমাদের মনে হয়, সেদিন এখানে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা টর্নেডো বয়ে গিয়েছিল। টর্নেডো হলে মেঘ, বাতাস ও জল মিলেমিশে হাতির শুঁড়ের আকারে নেমে আসে। আর তারি মধ্যে পড়ে চাঁদের ভরাডুবি হয়েছিল। চাঁদ ছিলেন মধুকর ডিঙ্গায়। তাই আদিগঙ্গার যে স্থান থেকে কালীদহের সৃষ্টি হয়েছিলো সেই অঞ্চলটি আজো চাঁদসদাগরের নামানুসারে চাঁদের খাল বা চাঁদোখালি নামে কথিত হয়। কালীদহ থেকে শঙ্খ, ঘণ্টা, একটি লৌহচক্র, সর্পগণবেষ্টিতা মনসার প্রস্তর-মূর্তি এবং কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড বিন্যাসে কমলেকামিনীর হাঁটু থেকে উদরের উপরিভাগ পর্যন্ত অংশ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি আলিপুর গ্রামের মাঝখানে একটি মন্দিরের ঘরে পূজিত হচ্ছে। কালীপুজোর রাতে এখানে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে পাঁঠাবলি হতো কিন্তু বর্তমানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়।

কালীদহ ও শিঙ্গাদহের মাঝখানে একটি প্রাচীন ঝাউবৃক্ষ অধুনা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা জানিয়েছে যে, গাছটি সুদীর্ঘকাল একইরকম অবস্থায় আছে। এই দহদুটিতে

কেউটেসাপের মারাত্মক উৎপাত। কেবলমাত্র দশহরাপূজার দিন গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে ঐ ঝাউগাছের আশেপাশের ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে মনসাপুজো সমাপন করে। একদা এই দুটি দহে অজস্র সাদা ও লাল পদ্ম ফুটত বলে জানা যায়।

ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, পাশের শিঙ্গাদহে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত সদাগর নাকি শিঙ্গাধ্বনি করেছিলেন। তাই এটি শিঙ্গাদহ। অন্যমতে সিংহদহ থেকে সিঙ্গুদহ। অন্যমতে সিংহদহ থেকে সিঙ্গাদহ।

আলোচ্য দহদুটির দুপাশে মজে-যাওয়া অংশে স্থানীয় মানুষজন আখচাষ ও কলাচাষ করে থাকেন। আর সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের কিছু কিছু অংশে ভালো পানিফল চাষও হয়। বর্ষাকালে এলাকার অতিরিক্ত জল নিকাশের ক্ষেত্রে কালীদহ ও শিঙ্গাদহের বিশেষ ভূমিকা থাকে। নানা অধিদৈবিক ও অধিভৌতিক কাহিনীর উৎসভূমি রূপে এই দহদুটি আজো এই অঞ্চলের জনগণের সমীহ আদায় করে নেয়। জলনিকাশী, জলসেচ, জলপথে যোগাযোগ রক্ষা মৎস্যসংগ্রহ তথা পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা এবং লোকসংস্কৃতির বিশেষ উৎসরূপে বাংলার খালবিলের যে অবদান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলরূপে বারুইপুর অঞ্চলের খালবিলগুলির ভূমিকা সেক্ষেত্রে কোনো অংশ কম নয়। এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কয়েকটি প্রধান খাল ও সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি সুঁতি খাল উল্লেখযোগ্য।

আড়াপাঁচ খাল– এটি একটি কাটাখাল। সোনারপুর থানার পূর্বপ্রান্তে আড়াপাঁচ নামক একটি বাদ্য অধ্যুষিত জনপদ থেকে এই খালটির সূত্রপাত। খালটি দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বারুইপুর থানার উত্তরভাগ হয়ে ক্যানিং থানার অধুনা ডাবু নামক পর্যটন কেন্দ্রটির অনতিদূরে মাতলা নদীতে মিশেছে। এই প্রবাহপথে শিয়ালদহ ক্যানিং রেলপথের তলা দিয়ে খালটি বারুইপুর থানায় প্রবেশ করেছে এবং পশ্চিমদিকে যথাক্রমে বিদ্যাধরপুর, আকনা, টগরবেড়ে, ভুরকুল, বেগমপুর, পুঁড়ি, কৈলাসবাবুর আবাদ, উত্তরভাগ এবং পূর্বদিকে কালিকাপুর, মলঙ্গা, রঘুনন্দনপুর, কামরা, তেঁতুলিয়া, উত্তর পুঁড়ি, ষাটকলোনী প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করেছে। বারুইপুর থানার দক্ষিণপূর্বের শেষপ্রান্ত উত্তরভাগে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১ – ১৯৫৬ খ্রি.) এই খালটি করে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এশিয়ার বৃহত্তম 'আড়াপাঁচ জলনিকাশী' প্রকল্পটি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিলো সোনারপুর থানা এবং বারুইপুর থানার অন্তর্ভুক্ত পূর্বদিক ও দক্ষিণপূর্ব দিকের যে বিস্তীর্ণ বাদাভূমি জলমগ্ন হয়ে থাকতো সেই বিপুল জল এখান থেকে পাম্প করে খালপথে মাতলানদীতে ফেলা। বলাবাহুল্য যে, এর ফলে খালের দুপাশের বিস্তীর্ণ বাদাভূমির জল বিশেষ করে বর্ষার জল উত্তমরূপে নিকাশ হয় এবং বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন প্রজাতির ধানচাষ সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর না-করে যথাসম্ভব এই খাল থেকে সিঞ্চিত জলের সাহায্যে কিছু খারিফ ও রবিশস্য এবং উন্নত প্রজাতির ধানচাষ হচ্ছে। আড়াপাঁচ খালটি থেকে কয়েকটি সুঁতি খালও বারুইপুরের বিভিন্ন কৃষিপ্রধান এলাকায় চলে গিয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চম্পাহাটির নিকটবর্তী খড়িগোদা গ্রাম থেকে উত্তরভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি

সরু খাল। এই খালের পশ্চিমদিকে কমলপুর, শোলগোয়ালিয়া, হাড়াল, রঘুনন্দনপুর, তেঁতুলিয়া, উত্তরপুঁড়ি, ষাটকলোনী প্রভৃতি গ্রাম সংলগ্ন নিচ জমি ও পূর্বদিকে পিয়ালী নদীর মজাখাত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বাদাভূমির জমে-থাকা জল এই সরু খালের মাধ্যমে আড়পাঁচ খালে এসে পড়ে। আবার গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে এই খালের জলে দুপাশের জমিতে সেচ দিয়ে ধানসহ বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়। আড়াপাঁচের পশ্চিমদিকে উত্তরভাগের নিকটবর্তী একটি স্থান থেকে একটি সরু খাল কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দুভাগে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণদিকের শাখাটি খুঁড়িগাছি প্রমুখ গ্রামের পাশ দিয়ে সূর্যপুর খালের একটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং আর একটি সুঁতি শাখা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সীতাকুণ্ডু গ্রামের এগ্রিকালচার ফার্ম পর্যন্ত বিস্তৃত। আড়াপাঁচ মূল খালটি উত্তরভাগ অতিক্রম করার পর কিছুদূর দিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা যে পূর্বাভিমুখে ক্যানিং থানার অধুনা পর্যটনকেন্দ্র ডাবুর অনতিদূরে মাতলানদীতে পতিত হয়েছে সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অপর শাখাটি দক্ষিণাভিমুখে পিয়ালী নদীর খাত ধরে বারুইপুর থানার মাঝপুকুর, দমদমা, বৃন্দাখালি ইত্যাদি গ্রামের পাশ দিয়ে ঢোসা হয়ে কুলতলির দিকে বিস্তৃত হয়ে অদূরে ডোঙাজোড়া নামক স্থানের কাছে মাতলানদীতে মিলিত হয়েছে।

বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণ হলে উত্তরভাগের পাম্পিং স্টেশনটি আড়াপাঁচ খালের বিপুল জল পাম্প করে নিকাশ করতে শুরু করে। ফলে এর উপরে প্রবল চাপ পড়ে। এই চাপ কমানোর জন্য ১৯৮৯ সালে মূল পাম্পিং স্টেশনের পাশে আর একটি অতিরিক্ত পাম্পিং স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। উক্ত অতিরিক্ত পাম্পিং স্টেশনটি ঐ বছরের ২৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধন করেন।

সূর্যপুর খাল — এই খালটিও একটি কাটাখাল। বারুইপুর থানার প্রায় মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা স্রোত থেকে নির্গত হয়ে পূর্বাভিমুখে প্রথমে কুলপি রোড ও পরে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার রেললাইনের তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খালটি ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে নেমে এসে হিমচির কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে উত্তরভাগের আড়াপাঁচ খালের পশ্চিমাভিমুখী স্রোতের সঙ্গে মিশেছে। অপর শাখাটি দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর খাতে মিশে কেল্লার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সূর্যপুর-কাটাখালের দক্ষিণে বলবলিয়া, কেয়াতলা, ঘোষের চক, তেওর হাট, গোলবেড়ে, হিমচি, খুঁটিবেড়ে, মাঝপুকুর, দমদমা, বৃন্দাখালি, পারুলদা এবং উত্তরদিকে নাচনগাছা, ওলবেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামগুলি অবস্থিত। এইসব গ্রামসংলগ্ন নিচু জমির বর্ষাকালীন জমা অতিরিক্ত জল যেমন এই সূর্যপুর খাল ও তার শাখা দিয়ে নিকাশ হয় তেমনি চাষের প্রয়োজনে এই খালগুলি দিয়ে প্রবাহিত জলের সাহয্যে সেচ দেওয়া হয় দুপাশে বিস্তীর্ণ চাষের জমিগুলিতে। একসময় এই খালকে কেন্দ্র করে ধানের বন্দর হিসেবে সূর্যপুরের প্রসিদ্ধি হয়েছিল। ধান ছাড়াও ব্যবসায়ী-চাষীরা খড়া, বাঁশ, কাঠ, উলু, মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি নৌকাভর্তি করে এই খাল বেয়ে যাতায়াত করতো। এই খালের ইজারাদার ছিলেন মল্লিকপুরের খাঁ পরিবার। ধান ব্যবসায়ীদের প্রদেয় ধুলাট কর ছাড়াও অন্যান্য চাষী-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এঁরা জোরজবরদস্তি করে ৫টাকা

থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বারোয়ারী চাঁদা আদায় করতো। এঁরা এমনই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল যে কেউ তাদের সামনে প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারীর প্রতি কথায় ৫ টাকা করে জরিমানা বেড়ে যেত। পণ্ডিত রাইচরণ সরদার তাঁর 'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য, পরীক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন 'উক্ত খাঁ-বংশ এক প্রকার জলদস্যু ছিল, তাহারা এরূপ প্রবল প্রতাপাদিত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে বারুইপুরের জমিদারবংশ, হুগলী জেলার অন্তর্গত তেলিনীপাড়ার জমিদার সত্যকৃপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলিকাতা জানবাজার নিবাসী বিশ্বাস জমিদারগণও তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই।' (পূর্ণেন্দু ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

এই খাঁ-অত্যাচারের দমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন গ্রন্থকার রাইচরণ সরদার। অর্থবল ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেন মুলটীর নরেন্দ্রনাথ পালধী এবং কাঁঠালবেড়িয়ার রাধাকান্ত সরদার। গভর্ণমেন্টের দরবারে লেখালেখি করে রাইচরণবাবু তদানীন্তন জোল ম্যাজিস্ট্রেট মি. লিগুসে-কে দিয়ে সূর্যপুরের ঘাট তদন্ত করান। অতঃপর ফৌজদারী আইনের ১১০ ধারায় অভিযুক্ত হন খাঁ পরিবারের মেনাজাত খাঁ ও বেলায়েৎ খাঁ। খাঁদের কর আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সূর্যপুর ঘাটের ইজারার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাধাকান্ত সরদার।

আদিগঙ্গা নালা — কালীঘাট থেকে ক্রম দক্ষিণমুখী ভাগীরথীর প্রাচীন ও মূল প্রবাহটি যা আদিগঙ্গা নামে এককালে রসা, বৈষ্ণবঘাটা (গড়িয়া), বোড়াল, রাজপুর, মালঞ্চ , মাহীনগর, বারুইপুর, সূর্যপুর, নাচনগাছা, মূলটি, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি প্রভৃতি জনপদকে কখনো দক্ষিণে কখনোবা বামে রেখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছিলো। তা প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হেজেমজে গিয়েছিলো। পরবর্তিকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বরেণ্য সন্তান ও স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ কালিদাস দত্ত মহাশয় আদিগঙ্গার সেই লুপ্তপ্রায় মূল ধারাটিকে সপ্রমাণ চিহ্নিত করে এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ণেল উইলিয়াম টলি আদিগঙ্গার মজাখাত ধরে একটি খাল কেটে খিদিরপুর থেকে গড়িয়া হয়ে আরো পনেরো কিলোমিটার পূর্বে শামুকপোতার নিকটে বিদ্যাধরী নদীর সাথে সংযুক্ত করেন। যা টালির নালা নামে খ্যাত। ফলে শেষ দশায় আদিগঙ্গার খাতে যে সামান্য জল প্রবাহিত হতো তাও বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়ে এবং গড়িয়ার পর থেকে আদিগঙ্গা শুকিয়ে সম্পূর্ণরূপে হেজেমজে যায়।

পরবর্তিকালে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে প্রাক্তন সাংসদ জ্যোতির্ময় বসুর উদ্যোগে সোনারপুর থানার রাজপুর থেকে বারুইপুর থানার মধ্যে মোটামুটিভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সূর্যপুরের পর থেকে আদিগঙ্গার মজে-যাওয়া খাতটিও আর ভালো করে চেনা যায় না। কোথাও ধানক্ষেত , কোথাও বাগান, কোথাও লোকালয় বা কোথাও পুষ্করিণীরূপে আদিগঙ্গা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

বারুইপুর থানার মধ্যে আদিগঙ্গা নালার যেটুকু অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে দিয়ে দুপাশের কিছু নর্দমার জল এবং বর্ষাকালে দুধারে জমে-যাওয়া জলের কিছুটা এই নালার মধ্যে এসে জমে এবং জমা জল ঠিকমতো বহির্গমনের পথ পায় না বলে দূষণের সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও

কচুরিপানা এবং আগাছার দাম জমাট বেঁধে থাকতে দেখা যায়। এরই মধ্যে থেকে কিছু কিছু অংশ ফাঁকা করে স্থানীয় চাষীরা পানিফল চাষ করেন এবং চাষের জমিতে ও ফলের বাগানে জলসেচ করে থাকেন। বর্ষাকালে এই নালা বা খালটি জলে টইটম্বুর হয়ে উঠলে বহু গ্রামবাসীকে খেপ্‌লা জাল ফেলে মাছ ধরতে দেখা যায়। তবে এই নালাটি আজো আদিগঙ্গার খাতরূপে মানুষজনের কাছে অতি পবিত্র। নিকট ও দূরের মানুষজন পবিত্র গঙ্গাজল রূপে এই নালার জল সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বিভিন্ন পুণ্যদিবসে এর জলে স্নান করে দেহমনকে পবিত্র করেন। এর মৃত্তিকা পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। এর তীরে তীরে শ্মশানগুলিতে শবদাহ হয়। সেগুলির মধ্যে ছিটেঘাট, হালদার চাঁদনী ঘাট, বারিকপাড়া ঘাট, সদাব্রত ঘাট, কীর্তন খোলাঘাট, নাচনগাছার পশ্চিমবাহিনী ঘাট, সূর্যপুর ঘাট, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে অধুনা এই নালার পূর্বপার্শ্বে প্রাচীন আটিসারা গ্রামে (বর্তমান বারুইপুর পুরাতন বাজার সন্নিকটস্থ স্থান) সাধু অনন্ত আচার্যের আশ্রমে সপার্ষদ শ্রী শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আগমন করেছিলেন এবং একরাত্রি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে কাটিয়েছিলেন ও অদূরে কীর্তনখোলায় কীর্তন করেছিলেন। সেই থেকে স্থানটি কীর্তনখোলা নামে পরিচিত। পরের দিন তিনি আশ্রম সংলগ্ন যে ঘাটে স্নান করে কটক (উড়িষ্যার)-এর অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন সেই ঘাটটি কটকিঘাট নামে আজো আদিগঙ্গা নালা বা খালের পাশে অবস্থিত, যা বর্তমানে পুকুর রূপে গণ্য হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এতদঞ্চলের জমিদার দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী তাঁর রাজপুরস্থ প্রাসাদ থেকে বারুইপুরে আগমন করেন এবং আলোচ্য আচার্যের শ্রীপাটের অদূরে অধুনা আদিগঙ্গা নালা বা খালের পূর্বপার্শ্বস্থ যে ঘাটে সদাব্রত উদ্‌যাপন করে তিনি ব্রহ্মণদের জমি দান করেছিলেন সেই ঘাটটি সাদব্রত ঘাট নামে এখনোও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।[১০]

আদিগঙ্গা নালা বা খালের উভয়পার্শ্বে প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে অদ্যাবধি বিরাজ করছে হালদার চাঁদনীর জোড়া শিবমন্দির, কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব শিবমন্দির এবং বারুইপুরের বিশালক্ষ্মী মন্দির। শেষোক্ত মন্দিরদুটির দেবদেবীর কথা কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ আছে।[১১] সর্বোপরি এতদ্‌ঞ্চলের পূজানুষ্ঠানের দেবদেবী বিসর্জনের ক্ষেত্র হলো এই আদিগঙ্গা নালা বা খালের ঘাটগুলি। আজো এর তীরে এসে বসলে শনশন বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেন শোনা যায়, একদিন এই আদিগঙ্গার খাত ধরে চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরদের বাণিজ্যতরণীগুলির ভেসে যাওয়ার ছপছপ শব্দ।

বড়কুঠির নীলকর সাহেবদের কাটাখাল – ইংরেজ আমলে নীলকর সাহেবরা যথারীতি বারুইপুর থানার কিছু কিছু অঞ্চলে উৎকৃষ্ট নীলচাষ করিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির গেজেটে তাই উল্লেখ করা হয়েছে, "We understand that the best indigo delivered on conctract for the last year has been manufactured by Messrs, win and that. Seott of Gayipore and by Mr. Gwilt of Barrypore." বারুইপুরে নীলকর সাহেবদের বড়কুঠিটি আজো অক্ষত রয়েছে বারুইপুর শহরের রবীন্দ্রভবনের পশ্চিমদিকে। এটি বর্তমানে বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের

সম্পত্তি। ইংরেজ আমলে এই কুঠির পিছন দিক দিয়ে নীলকর সাহেবরা একটি খাল কেটে সেটিকে শাসন নামক একটি গ্রামের কাছাকাছি আদিগঙ্গার সংগে যুক্ত করেন। আজো এর কিছুটা অংশ দেখা যায়। পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে বারুইপুর শহরে এই খালটির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বারুইপুর থানার অধীনস্থ যে খালগুলির আলোচনা করা হলো সেগুলির মধ্যে আড়াপাঁচ খাল ও সূর্যপুর খালের কিছু কিছু অংশে দুচারটি ছোটো ছোটো নৌকা, ছোটোখাটো শালতি ও তেলোডোঙ্গা চলতে দেখা যায়। এগুলির বিশেষ করে খড়, বিচালী, বীজধান বহন করার কাজে ও মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, আড়াপাঁচ খালের উপরে ষাট কলোনীর কাছেই দুএকটি পরিবারকে বিশাল ফেটি জাল পেতে মাছ ধরতে দেখা যায়।

বারুইপুর থানার দীঘি, খালবিল, জলাভূমি পরিক্রমান্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা না বললেই নয়। প্রথমত এই অঞ্চলের আলোচিত প্রধান প্রধান জলাশয় বা পুষ্করিণী বা দীঘিগুলির একক কোনো মালিকানা নেই অর্থাৎ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর এগুলির অধিকাংশই সরকারের খাস তালুকে পরিণত হয়েছিলো। পরবর্তিকালে স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ বা পরিবারগুলি এগুলি ভোগদখল করতে শুরু করেন। কেউ কেউ দখলী রেকর্ডও করেন। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ও জেলা পরিষদের অনুসন্ধান সাপেক্ষে যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে প্রয়োজনে অধিগ্রহণ ও সংস্কার জরুরি।

এই অঞ্চলের খালবিল, নালাগুলি যেভাবে ক্রমশ মজে যাচ্ছে এবং আগাছা পরিপূর্ণ হচ্ছে এমনকী দুধার বিভিন্নভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোকে কাটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে দখলমুক্ত করতে ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে না-পারলে এই অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা, সেচব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিদারুনভাবে ব্যাহত হবে এবং ভয়ংকরভাবে পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠবে ও সর্বোপরি লোকলোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটিও ক্রমশ হারিয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

প্রয়োজনীয় টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১। মদাপুকুরের চারপাশে ছিলো বারুই সম্প্রদায়ের বহু পানের বরজ। বাঁশ, চেড়া, কঞ্চি, পাটকাঠি, নারকেল পাতা, খড় ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত বরজের চারপাশের বেড়াকে স্থানীয় ভাষায় টাট বলা হতো। সুতরাং 'মদারটাট' কথাটি থেকে উচ্চারণে মাঝখানের 'ট' বর্ণটি লুপ্ত হয়ে 'মদারাট' গ্রামনামের সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

২। ফরদা,-র্দ্দা–খোলা, ফাঁকা। – বঙ্গীয় শব্দকোষ(দ্বিতীয় খণ্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা– ১৪২০। ফরদা বা ফর্দ্দা এই আরবি শব্দ থেকে ফর্দিতে পরিণত হয়েছিলো। আজো বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টির জল ধানখেতরূপ এই ফাঁকা নিচু স্থানের উপর দিয়ে প্রবল বেগে দক্ষিণে আদিগঙ্গার মজাখাত অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

৩। The salt are those protions which are exposed to the overflowing of the tides, where mounds of earth strongly impregnated with salt are formed, and classed into khalaris or working places. A statistical Account of Bengal (Sundarbans), Vol. 1, Part - II , W.W.Hunter, Page - 112.

৪। হাঁদোল – আন্দোলন, – বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ২৩৪০।

৫। সংস্কৃত 'পুরং' শব্দের অর্থ হলো অসুরপুরকে এবং 'দৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন দ্বার শব্দটির অর্থ হলো বিদারণ করা । অর্থাৎ অসুরপুরকে বিদারণ করেন যিনি তিনিই হলেন পুরন্দর।

৬। সমগ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সুভাষচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা – ৩, ৪।

৭। মতান্তরে দেবী হাড়ি ঝি চণ্ডীর রোচা অধ্যুষিত এই অঞ্চল চাণ্ডড়ীপোতা।

৮। গ্রামের নাম সীতাকুণ্ডু – অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (আদিগঙ্গা – প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮), সম্পাদক শক্তি রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৮, ৯।

৯। A Statistical Account of Bengal Vol, W.W. Hunter, Page 120,121

১০। 'সদাব্রত ঘাট' এখনও গঙ্গার খালের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দেখা যায়, মাত্র কয়েকবছর আগেও খালপথে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ত। এখন পুকুরের মাছ রক্ষার জন্য খালের সংযোগপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। – পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয়খণ্ড -বিনয় ঘোষ – পৃষ্ঠা ২৪২)।

১১। 'সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালক্ষ্মী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি ।। ৯২৮
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল ।' – কবি কৃষ্ণরাম
দাসের গ্রন্থাবলী – শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত — পৃষ্ঠা ২৪৪।

ক্ষেত্রসমীক্ষা সহায়তায় – শ্রীনবকুমার মণ্ডল (শিক্ষক, উকিলপাড়া, বারুইপুর), শ্রী অলোক বিশ্বাস (শিক্ষক, উকিলপাড়া, বারুইপুর) এবং শ্রী অলোক বিশ্বাস (উত্তর পুঁড়ি)।

ফটো – শ্রীনবকুমার মণ্ডল (শিক্ষক, উকিলপাড়া,বারুইপুর)

সৌজন্যে – 'লোক' পত্রিকা - বাংলার দীঘি জলাশয় সংখ্যা।

নদী-বিধৌত অববাহিকা – বারুইপুর

ড. গৌতম কুমার দাস

ভূ-তত্ত্বের নিরিখে বারুইপুর আদিগঙ্গার পলিসঞ্চিত অববাহিকা। উর্বর পলিসমৃদ্ধ দোঁয়াশ মাটি বারুইপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ। আর এই মাটি পানচাষের জন্য আবশ্যক। বারুজীবিরা পানচাষের জন্য এলাকার মাটি সনাক্ত করেছিল। এককালের বারুজীবিদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র একালে বারুইপুর নামে পরিচিত আদিগঙ্গার অত্যন্ত উর্বর পলি থাকার দরুন বারুইপুরে প্রায় সব ধরণের ফল শস্যদানা, শাক-সবজীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এখানকার পেয়ারা, লিচু, আম এর খ্যাতি বহুশ্রুত। আদিগঙ্গা ও বারুইপুর অর্থাৎ উৎস ও সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বারুইপুরের ভূ-প্রকৃতি, কৃষি, জীবন-জীবিকা সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই আদিগঙ্গার ছোঁয়া। শুধু তাই নয়, বারুইপুর একটি ঐতিহাসিক স্থান – আদিগঙ্গার কারণে। কিন্তু যার প্রাকৃতিক অবদানের জন্য বারুইপুরের প্রসিদ্ধি, সেই আদিগঙ্গা আজ প্রায় লুপ্ত, নিঃশেষিত। আদিগঙ্গার সাম্প্রতিক অবস্থান পর্যবেক্ষণও পর্যালোচনার কারণে এই আদিগঙ্গা চর্চা। বারুইপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী আদিগঙ্গা আর বারুইপুরের দক্ষিণ দিকের সীমানা পিয়ালী নদী এই রচনায় সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভূক্ত।

আদিগঙ্গা

সামাজিক ক্রিয়ার, পুণ্য লাভার্থে কিংবা শান্তির আকাঙ্খায় আদিগঙ্গার পুন্যতোয়া জল ব্যবহারের চিরায়ত রীতি ছিল অধুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হিন্দু অধ্যুষিত জনমানসে। আদিগঙ্গার বিস্তৃতি ছিল রাজপুর, হরিনাভি, গড়িয়া, মালঞ্চ, গোবিন্দপুর, বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর, রায়দিঘী, কাকদ্বীপ হয়ে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। আদিগঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় সবজী, ফল প্রভৃতির প্রাচুর্যের কারণ হল আদিগঙ্গার উর্বর পলিসমৃদ্ধ দোঁয়াশ মাটি। শুধু তাই নয়, আদিগঙ্গার উপস্থিতি এই বৃহৎ এলাকাকে ঐতিহাসিক পটভূমিতেও করেছে সমৃদ্ধ যেমন এখনো সারি সারি ঐতিহাসিক নিদর্শন আদিগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ও অনেক ঘটনা সম্বলিত তথ্যাবলী যা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সুচারুভাবে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষিত। পালযুগ থেকে লক্ষ্মণসেন ; বল্লালসেনের দিঘী খনন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর নৌকা করে মজিলপুরে যাওয়া ; রেনেল সাহেবের ম্যাপ তৈরী থেকে ডাম্পিয়ার – হেজেস বর্ণিত রেখা সবটাই এখন ইতিহাস। টালিসাহেবের আদিগঙ্গা সংস্কারের পর টালিনালা থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধনী' কাব্যে আদিগঙ্গার উল্লেখ ; মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের বারুইপুর হয়ে ছত্রভোগ অবধি আদিগঙ্গার পাড় বরাবর হেঁটে গিয়ে নৌ-পথে নীলাচলে যাত্রা – ইতিহাসের নথিপত্রে কি নেই আদিগঙ্গার! প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে চলে যাওয়ার নিরিখে আদিগঙ্গা চর্চা সম্প্রতি খুবই জরুরী ও প্রাসঙ্গিক। ইতালীর টলেমি সাহেব সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ম্যাপ তৈরী করেছিলেন। ম্যাপ তৈরীতে পথিকৃৎ হলেও তাঁর ম্যাপ নির্ভুল ছিল না। তাই তাঁর বর্ণিত গঙ্গারিডি প্রদেশ দিয়ে বহমান আদিগঙ্গার গতিপথ সঠিক নয়। রেনেল সাহেবে বিখ্যাত 'রেনেলের ম্যাপ' তৈরীর সময় আদিগঙ্গা প্রায় মজে গিয়েছিল। রেনেল সাহেব জরিপের কাজ শুরু করেছিলেন ১৭৬৪ সালে। ব্রিটিশ সরকার নৌ– সেনাধ্যক্ষ উইলিয়াম টালিকে

ক্ষীনস্রোতযুক্ত আদিগঙ্গা লীজ দিয়েছিল ১৭৭৫ সালে। এর থেকে বোঝা যায় যে টালিসাহেব প্রায় মজে যাওয়া আদিগঙ্গার সংস্কার করেছিলেন এবং তা গড়িয়া পর্যন্ত। গড়িয়ার থেকে আদিগঙ্গার মূলস্রোত সংস্কার না করে টালি সাহেব গড়িয়া থেকে পূর্বদিকে শামুকপোতা পর্যন্ত নতুন খাল খনন করেছিলেন এবং ঐ খাল শামুকপোতায় বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। ফলে হুগলী নদী দিয়ে পন্যবাহী নৌকা গড়িয়া হয়ে শামুকপোতায় বিদ্যাধরী নদীতে চলে আসতে পারত এবং অধুনা বাংলাদেশের খুলনা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করা সম্ভবপর হতো। টালিসাহেব গড়িয়া থেকে দক্ষিণদিকে বোড়াল হরিনাভি গোবিন্দপুর বারুইপুর এর আদিগঙ্গার কোনরূপ সংস্কার করেননি। অন্যদিকে আদিগঙ্গাকে গড়িয়া থেকে শামুকপোতায় বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যুক্ত করায় এই নালায় সর্বদা জল থাকত এবং নৌপরিবহনযোগ্য ছিল। টালিসাহেব গড়িয়া পর্যন্ত আদিগঙ্গাকে সংস্কার করার দরুন আদিগঙ্গার পরবর্তীকালে নাম হয়েছে টালিনালা। টালিসাহেব এর এই ঐতিহাসিক সংস্কারের সুবাদে তাঁর মৃত্যুর পরেও ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্ত্রী আন্না মারিয়া টালিকে আদিগঙ্গা লীজ দিয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত দুই জরিপবিদ্ ডাম্পিয়ার ও হেজেস্ বর্ণিত রেখা অনুযায়ী আদিগঙ্গার অববাহিকা বারুইপুর সুন্দরবনের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও আদিগঙ্গা নৌকা চলাচলের উপযুক্ত ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নৌকা করে কলকাতা থেকে হরিনাভি হয়ে তাঁর আদিবাড়ি মজিলপুরে যেতেন। এই তথ্য তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লিখিত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব আদিগঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হয়ে বারুইপুরে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। বারুইপুরের ঐ স্থান এখন কীর্তনখোলা নামে পরিচিত। পরে মহাপ্রভু বারুইপুর থেকে আদিগঙ্গার তীর বরাবর হাঁটাপথে আটিসারা হয়ে ছত্রভোগ পৌঁছে আদিগঙ্গা দিয়েই নৌকাপথে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আদিগঙ্গা উল্লিখিত চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও রায়মঙ্গল কাব্যে। তখনকার বিখ্যাত বনিক সম্প্রদায় যেমন চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর এরা প্রত্যেকেই আদিগঙ্গার পথেই বানিজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। বর্তমানে গড়িয়া মহাশ্মশানে শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এখনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে। পূর্বে গঙ্গাসাগর এর কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন পুন্যতীর্থের মহামিলনমেলায় যাত্রার জন্য নির্ধারিত পথ ছিল আদিগঙ্গার জলপথ। পুরাণমতে সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথ হল আদিগঙ্গার আদি সংস্কারক অর্থাৎ ভগীরথই আদিগঙ্গা সংস্কার-এর প্রথম নির্বাহী বাস্তুকার।

কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রাম-এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে ইংরাজ আমলে আদিগঙ্গার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। ইংরেজদের মধ্যে ডি.ব্যারোস এবং ভ্যানডেন ব্রুক এর মানচিত্রে আদিগঙ্গাকে ভাগীরথী নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে দেখানো হয়েছে। বারুইপুরে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের আমলের তাম্রলিপিতে আদিগঙ্গা বা জাহ্নবীর গুরুত্ব রয়েছে। আদিগঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধনী' কাব্যে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আদিগঙ্গা স্রোতহীন ও নৌকা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বারুইপুরের নিকটস্থ আদিগঙ্গা তখন হয়ে যায় মজাগঙ্গা, তখন থেকেই আদিগঙ্গা কোথাও গঙ্গার বাদা কোথাও বা মজাগঙ্গা নামে পরিচিত হতে শুরু করে। স্থানীয় জনসাধারণ

জায়গা বিশেষে এই মজা গঙ্গা থেকে বড় বড় দিঘী, পুষ্করিণী খনন করেছেন। আদিগঙ্গা থেকে রূপান্তরিত এই সব পুষ্করিণীতে সঞ্চিত বৃষ্টির জল এখনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গঙ্গার পবিত্র জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইসব পুষ্করিণীর তীরে এখনো শবদাহ করা হয়। পুষ্করিণীগুলি সংস্কারকের নামে কিংবা দেবদেবীর নামে পরিচিত যেমন শিবগঙ্গা, বাসন্তীগঙ্গা, বোসের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, মিত্র গঙ্গা ইত্যাদি। এখন বিভিন্ন তিথিতে এইসব পুষ্করিণীর তীরে পূজা পার্বন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় পবিত্রতার কারণে। জনপ্রবাদ যে এই আদিগঙ্গার তীরেই বহু সতীদাহ প্রথার ঘটনা ঘটেছে।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে টালিসাহেব সংস্কার করার পরে পরবর্তীকালে আদিগঙ্গার কোনরূপ সংস্কার করা হয় নি। তবে ১৯৪০ সাল অবধি আদিগঙ্গার কিয়দংশ (টালিনালা) নৌবহনযোগ্য ছিল। তখন বারুইপুরের আদিগঙ্গা সম্পূর্ণ মজে গেছে। পূর্ব পাকিস্থান তৈরী হওয়ায় ১৯৪৭ সালে হিন্দুরা কলকাতায় চলে আসে এবং টালিনালার দু'পাশে চালাঘর বানিয়ে নেয়। দখলদারি ও উদ্বাস্তুদের ফেলা বর্জ্য পদার্থে টালিনালাও ক্রমশ মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় চিড়িয়াখানার জীবজন্তুর এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নর্দমা থেকে বেরোনো বর্জ্য পদার্থ। বর্তমানে আদিগঙ্গা তথা টালিনালায় হুগলী নদী থেকে জল কুঁদঘাট অবধি যায়। সম্প্রতি মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজের সুবিধার জন্য টালিনালার স্রোত কুঁদঘাটে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কুঁদঘাটে আদিগঙ্গা থেকে বেরিয়েছে কেওড়াপুকুর খাল। এই খাল দিয়েও জলের প্রবাহ বন্ধ একই কারণে। তবে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর আশার বানী শুনিয়েছেন যে মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আদিগঙ্গা যথাযথ সংস্কার হবে এবং এই নালা পথে ২০০৪ সালের মধ্যে গঙ্গার জল প্রবাহিত করানো হবে। এমনকি এই নালার মধ্য দিয়ে জলযান ও চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে টালিনালা অর্থাৎ আদিগঙ্গার কিয়দংশ আবার নতুনরূপে ফিরে আসবে। ওপরে মেট্রোরেল আর নীচে গঙ্গাজলের কল্লোল। তবে বোড়াল, হরিনাভি, বারুইপুরের আদিগঙ্গার পুনর্জীবন প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা আর নেই। কারণ এই আদিগঙ্গার বুকে বিভিন্ন স্থানে মানুষ তার বাসস্থান কিংবা কৃষিজমি তৈরী করে ফেলেছে। কোথাও কল্লোল, কোথাও বিস্মৃতি - এটাই আদিগঙ্গার সাম্প্রতিকী।

আদিগঙ্গার সৃষ্টি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ নির্মানকালে। মূল গঙ্গার মতো আদিগঙ্গার প্রস্থ ও পরিসর কোনদিন প্রশস্ত ছিল না। নৌবহন যোগ্য হলেও এটি প্রকৃতিতে ছিল একটি নালা। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যত পরিণত হয়েছে, আদিগঙ্গা ক্রমশ ক্ষীনকায়া হয়েছে। কোন কোন জায়গায় এতটাই যে সাধারণ মানুষ আদিগঙ্গার স্রোত বেঁধে রাস্তা তৈরী করেছে এপার-ওপার পারাপারের সুবিধার্থে, এমনকি আদিগঙ্গার বুকে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। তাই নালা পরবর্তীকালে ক্ষীন জলধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ কেউ ঐ সমস্ত জলধারা সংস্কার করেছেন এবং তাদের নামেই গড়ে উঠেছে আজকের ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, শিবগঙ্গা, বাসন্তী গঙ্গা কিংবা রামগঙ্গা । ঘোষ বোস এরা মূলতঃ ঐ সমস্ত এলাকায় ছিল। প্রজার দেওয়া খাজনায় প্রজা হিতার্থে বড় বড় পুষ্করিণী তৈরী করেছেন আদিগঙ্গার নালায়। কোথাও এলাকার মানুষ, যূথচারী হয়েছেন এই ধরণের সংস্কারে, তখন কখনও দিঘী তৈরী হয়েছে আদিগঙ্গার খাতে। আদিগঙ্গা আজ মজে যাওয়া খাত মানেই এটি পরিত্যক্ত নয় অর্থাৎ এটি অন্যদিকে সরে যায় নি। নদীর গতিপথের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নিম্নগাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ক্রমশঃ পরিণত ও স্থায়ী

হওয়াই আদি গঙ্গার মজে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আর একটি কারণ- আদিগঙ্গার নিম্নগতিপথে গভীরতা কম হওয়ার জন্য সাগরদ্বীপ সংলগ্ন হুগলীর মোহানা থেকে জোয়ারের জল উচ্চ গতিপথে প্রায় প্রবেশ করা। এছাড়াও আলীবর্দী খাঁ হুগলী নদীর জল সাঁকরাইল থেকে একটি খাল খনন করে খিদিরপুরের নিকট জুড়ে দিলে আদিগঙ্গা দিয়ে জল ঢোকা কমে যায় এবং সেই থেকেই আদিগঙ্গা মজতে শুরু করে। আদিগঙ্গা মূলতঃ হুগলী নদীর শাখা নদী। আদিগঙ্গার পরিত্যক্ত খাত এর মৃত্তিকাস্তরের গঠনশৈলী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আদিগঙ্গার জোয়ার ভাটার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। নদীর গভীরতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হওয়ার নদীর বহন ক্ষমতা থেকে পলির বোঝা বেড়ে যায়, তখন আদিগঙ্গা তার পলির বোঝার কিছু অংশ নদীখাতে সঞ্চয় করার জন্যে আদিগঙ্গার গভীরতা ও প্রস্থ কমতে শুরু করে। নিম্নগাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যত সুগঠিত হয়েছে, ততই নদী তার বয়ে আনা পলি সঞ্চয় করে প্রথমে সংকীর্ণ,ক্রমে মুমূর্ষু, শেষে লুপ্ত। সুন্দরবন অঞ্চলের ডাম্পিয়ার ও হেজেস রেখার উপরের দিকে প্রবাহিত নদীগুলি এই কারণে মৃত বা মৃতপ্রায়, আদিগঙ্গাও তার ব্যতিক্রম নয়।

পিয়ালী

বারুইপুরের সামগ্রিক ভূ-তত্ত্ব ও ভূমি-বিন্যাসের বৈচিত্রে পিয়ালী নদীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। পিয়ালী নদী বারুইপুরের দক্ষিণ দিকের সীমানা নির্দেশক। পিয়ালী বামনঘাটার ১৫ কিমি দক্ষিণে প্রতাপনগরের নিকট বিদ্যাধরী নদী থেকে বেরিয়ে ক্যানিং থেকে প্রায় ৩২ কিমি দক্ষিণে কুলতলা গাঙ এর মধ্য দিয়ে মাতলা নদীতে মিশেছে। আসলে লুপ আকৃতি বিশিষ্ট কুলতলা গাঙ মাতলা ও পিয়ালী নদীর যোগসূত্র। কুলতলা গাঙ-এর নিকট মাতলা প্রায় ৬ কিমি প্রশস্ত। কুলতলা গাঙ-এর সঙ্গে ঠাকুরাণ নদীর যোগাযোগ রয়েছে বাগার গাঙ-এর মধ্য দিয়ে ।

পিয়ালী নদীর উচ্চগতি পথে বারুইপুর ব্লকের অন্তর্গত উত্তরভাগ ঘাটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তর পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করেছে। ফলে সাউথ গড়িয়া, চাম্পাহাটিসহ বারুইপুর এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষার সময় অতিরিক্ত জল পাম্প করে পিয়ালী নদীর মাধ্যমে বের করে দেওয়া সম্ভবপর হয়। বারুইপুরে পিয়ালী নদীর গুরুত্ব এখানেই । তাছাড়া বর্ষার জল পিয়ালী নদীতে সঞ্চিত থাকে বলে এই জল সেচযোগ্য। সেইজন্য সেচ ও প্লাবন নিয়ন্ত্রণে পিয়ালী নদীর ভূমিকা বারুইপুরে অত্যন্ত অর্থবহ।

সম্প্রতি দক্ষিণদিকে মাতলা ও পিয়ালীর মিলনস্থলে অম্বিকানগরে পিয়ালী নদীর মুখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে সেচের জন্য জলাধারে রূপান্তরিত করা হয়েছে পিয়ালী নদীকে। ফলে বেগমপুর, উত্তরভাগ, দমদমা, মাছপুকুর , বৃন্দাখালি, জয়াতলা প্রভৃতি অঞ্চলে সেচের জন্য পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। বারুইপুরের এইসব অঞ্চলের কৃষকরা এতে অনেক উপকৃত হয়েছেন। এই জল ফসল উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য করছে। সঞ্চিত জল থেকে মাছ ধরে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছেন। তবে স্রোত না থাকায় অজস্র শৈবাল দাম নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। নদীর তীরে কোন ম্যানগ্রোভ নেই। নদীর কূল ভাঙা গড়ার খেলাও অদৃশ্য। চর জাগে না। পিয়ালী এখন নামেই নদী, প্রকৃতিতে নয়।

মৌমাছিপালনে — বারুইপুর

কানাইলাল ত্রিপাঠী

স্মরণাতীত কাল হতে মৌমাছি, মধু ও মধুর ব্যবহার মানুষের নিকট পরিচিত। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ও কোরাণ প্রভৃতিতে এর যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জন্মের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মধুর ব্যবহার হয়।

প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে নতুন পথ আবিষ্কারে সাহায্য করে। মধু ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। মানুষ নিজের স্বার্থে মৌমাছির বাসা হতে আগুনের সাহায্যে মৌমাছি তাড়িয়ে ও পুড়িয়ে মধুসংগ্রহ করত। এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি আজও বহু জায়গায় বিদ্যমান।

পঃবঙ্গে বারুইপুর পুরসভা অন্যতম পুরাতন পুরসভা। বারুইপুরের সংগে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের নাম যেমন জড়িত, তেমনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নামও যুক্ত। এ অঞ্চলের পেয়ারা, লিচু, আম (গোলাপজাম) ও লকেটফল বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৌমাছিপালনের বিশেষ ভূমিকা থাকায় বারুইপুর সারা পঃবঙ্গে মৌমাছি পালনের পুরোধা ও পথিকৃৎ । আজ দেশ ও বিদেশে এমনকি UNO-তে বারুইপুর ও ২৪ পরগণা মৌমাছিপালক সমবায় সমিতির নাম বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পঃবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালেই খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন মৌমাছিপালনের প্রশিক্ষণ, বিকাশ, প্রচার ও প্রসারের জন্য শাসনে মৌমাছিপালন কেন্দ্র Beekeeping Area office, Baruipur স্থাপন করে। মৌমাছিপালনে বিশেষজ্ঞ N.S.Nair, Aparist হিসাবে ১৯৫৬ সালে বারুইপুর বী কিপিং এরিয়া অফিসের দায়িত্ব নিয়ে ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে মৌমাছিপালনে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। লেখকও ঐ সালে মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর থেকে Aperiast Course (Higher course in Beekeeping) এ প্রশিক্ষণ নিয়ে বারুইপুর এরিয়া অফিসেই যোগদান করেন। কয়েকমাস পরে Sri Nair বদলী হয়ে গেলে এরিয়া অফিসের দায়িত্ব নিতে হয় লেখককে।

বছরে প্রায় ১০ জন করে দুটো ব্যাচের ট্রেনিং হত। শিক্ষার্থীরা প্রায় সারাদিন শিক্ষা নিত। বারুইপুর অঞ্চলে শাসন থেকে দঃ শাসন, ত্রিপুরানগর, রামগোপালপুর কল্যাণপুর, কোটালপুর, মলয়া চণ্ডীপুর, নিহাটা, মধ্য কল্যাণপুর, ধোপাগাছি, লাঙ্গলবেড়িয়া, পুরন্দরপুর, খোদার বাজার, সুবুদ্ধিপুর, ডিহি মেদনমল্ল, খাসমল্লিক, মদারাট, আটঘরা, রামনগর, ধপধপি, পিয়ালী টাউন, রানা বেলেঘাটা, কুমারহাট, বারুইপুর পুরাতন বাজার পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ২/৩ টা দলে ভাগ হয়ে যেত প্রকৃতিতে মৌমাছির সন্ধানে। তখন প্রকৃতিতে ভারতীয় মৌমাছি (Apis cerara Indica) যথেষ্ট সংখ্যায় গাছের কোটরে দেওয়ালের ফাটলে, পুরানো মন্দিরে ও বাড়ীতে পাওয়া যেত। এ জাতের মৌমাছি অন্ধকারে থাকে এবং একাধিক চাক তৈরী করে অন্ধকারে একপ্রকার নাচের মাধ্যমে (Bee dance বা Bee language) ভাবের আদান প্রদান করে। কাজ করার ক্ষমতা রাখে বলেই এদের বাক্সের মধ্যে রেখে

আধুনিক পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে আরও তিন রকমের মৌমাছি পাওয়া যায়। যেমন, Apis Florea (মাছি মৌমাছি), Apis sata (ডাঁশ মৌমাছি) এবং ক্ষুদে মৌমাছি (Trigrna) Apis florea, Apis Dorsata একটি করে চাক তৈরী করে ও সূর্যের আলো ছাড়া কাজ করতে পারে না। এরা যাযাবর প্রকৃতির। তাই এদের বাক্সের মধ্যে রেখে পালন করা যায় না, ক্ষুদে মৌমাছি মোম, মাটি মিশিয়ে আঙুরগুচ্ছের মত চাক তৈরী করে এবং এদের থেকে মধুও সংগ্রহ করা যায় না বলা চলে।

বারুইপুর এরিয়া অফিস থেকে যারা ট্রেনিং নিত তারা গ্রামে গ্রামে যেত মৌচাকের সন্ধানে। সন্ধানের সময় দেখা যেত, অনেক বাড়ীতে মাটির দেওয়ালে হাঁড়ি বা কলসী (মাটির) বসিয়ে রাখত। হাঁড়ি বা কলসীকে দুভাগ করে জোড়ার মত লাগিয়ে দেওয়ালের মধ্যে বসিয়ে দিত। দেওয়ালের বাহিরে হাঁড়ির পেছনে এক ছিদ্র করে রাখা হত যাতে মৌমাছি মধুঋতুতে ঐ ছিদ্র দিয়ে এসে বাসা বাঁধতে পারে। লিচু প্রভৃতি ফুলের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অর্ধেকটা অংশ খুলে নিয়ে দুধারের মধুভর্তিচাকগুলো কেটে নিয়ে তা নিংড়ে মধু নেওয়া হত। সাধারণত ধারের চাকে মধু ও মাঝের চাকগুলোতে ডিম, শুককীট ও মককীট থাকে। এভাবে লোকেরা বছরে ১/২ বার মধুসংগ্রহ করে ১/২ কিলো মধু পেত। মধুঋতুতে বংশবিস্তারের প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণায় একটা মৌমাছির কলোনী থেকে ৪/৫ টা নতুন কলোনী তৈরী হয়। ঝাঁকছাড়া নতুন কলোনীগুলো গাছের কোটরে, দেওয়ালের ফাটলে বা হাঁড়ির মধ্যে বাসা বাঁধত। শিক্ষার্থীরা সন্ধান পেয়ে বাড়ীর মালিককে বাক্সে রেখে আধুনিক পদ্ধতিতে ৩/৪ বার মধু নিষ্কাশন করে ৫/৭ কিলো মধু পাওয়ার কথা বোঝাত। সবাই বুঝতেন না। বেশীরভাগ লোকের ধারণা ছিল – মৌমাছি ঘরের লক্ষ্মী। এদের তাড়ানো উচিত নয়। যারা রাজি হতেন, শিক্ষার্থীরা বাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিজেরাই মাথায় করে নিয়ে গিয়ে মৌমাছি ধরে বাক্সে (বী হাইভ) ভরে ওখানেই রাখত। একটি কলোনীতে (Pis cerana India) একটি রাণী ও দশ-পনেরো হাজার শ্রমিক ও কয়েকশ পুরুষ মৌমাছি থাকে। এক কিলো মধুসংগ্রহ করতে প্রায় ৪ লক্ষ ফুলে মৌমাছিদের যেতে হয় এবং মৌমাছিরা যতবার যাতায়াত করে তা যোগ করলে দেখা যায় যে, ৫০ হাজার মাইল যেতে হয়। এক কিলো মধু যা আমরা পাই তা সংগ্রহ করতে মৌমাছিদের প্রায় ৩ কিলো পুষ্পরস আনতে হয়। পুরুষ মৌমাছি সংগমের পর জননাঙ্গ ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে মারা যায়। বেশির ভাগ শ্রমিক মৌমাছির পরমায়ু মাত্র ছয় সপ্তাহ। রাণী মৌমাছি চারবছর পর্যন্ত বাঁচলেও দুবছর পর ডিম দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে রানি পরিবর্তন করে কলোনীতে নতুন রানী দেওয়া হয়।

১৯৫৬–৫৭ সাল থেকে প্রথম আট-দশ বছর প্রকৃতি থেকে মৌচাক ও মৌমাছির ঝাঁক সংগ্রহ করে মৌমাছিপালনে বিস্তার ঘটে। পরে এদের বিস্তার হয় বিভাজন পদ্ধতিতে।

অনেকদিন আগের কথা সব নাম মনে পড়ছে না। তবে মনে পড়ে-শিখরবালিতে কিশোরীমোহন সরদারের বাড়ীতে প্রায় ২০–২২টি হাঁড়িতে মৌমাছি ছিল। যার থেকে আট-দশটা মৌচাককে আধুনিক বাক্সে রেখে পালন করা হয়েছিল। ঐ সময় যারা গাছের কোটর থেকে, দেওয়ালের ফাটল থেকে, হাঁড়ি থেকে বা ঝাঁক ছাড়া থেকে আরম্ভ করে ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনের

নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে। কল্যাণপুরের মাখনলাল নাগ ও সুশীল নস্কর রানাবেলেঘাটার মেহচন্দ্র দাস, আটঘরার রঘুনন্দী, সুবুদ্ধিপুরের শ্যামাপদ চ্যাটার্জী ও কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরানগরের বিমলেন্দু মণ্ডল।

ঐ সময় মৌমাছিপালনের জন্য ছোটো বী-হাইভ (New-ton-type) বীকিপিং এরিয়া অফিসের মাধ্যমে বিতরণ হত। সেগুনকাঠের বাক্স বারুইপুরের ষ্টেশন রোডের অরবিন্দ ঘোষের কাঠের কারখানা থেকে তৈরী হত। বাক্সের দাম ছিল মাত্র দশ টাকা। খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন থেকে প্রাপ্ত পাঁচ টাকা অনুদান বাদ দিয়ে মৌমাছিপালককে দেওয়া হত মাত্র পাঁচ টাকায়। অন্যান্য যন্ত্রপাতিও বারুইপুরে তৈরী হত। তাও অনুদান সহ সরবরাহ করা হত।

শাসনে বারুইপুরে এরিয়া অফিস থেকে যারা বী-ফিল্ডম্যান কোর্সে ট্রেনিং নিত তারাই মৌমাছির বিভিন্ন পালন কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকত, এদের বলা হত বী-ফিল্ডম্যান। এদের কাজ ছিল গ্রামে, বাগানে ঘুরে ঘুরে মৌচাকের সন্ধান করে মৌমাছি বাক্সে রেখে পালন করার পদ্ধতি বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়া। এরা মাসে মাত্র ৬০ টাকা বেতন পেতেন কিন্তু কাজে এরূপ নিষ্ঠাবান ছিল যে, এখন তা ভাবলে অবাক লাগে। বারুইপুর ও লাগোয়া সোনারপুর এলাকাতেও অনেক মৌমাছিপালন কেন্দ্র ছিল। যেমন কোদালিয়া, চৌহাটি, খাসমল্লিক। দক্ষিণে গোচরণ, দঃ বারাসত, বহড়ু ও জয়নগর মজিলপুর ইত্যাদি, সেসময় ২৪ পরগনা জেলায় বিভিন্ন স্থানে ৫৭টির মত মৌমাছি পালন কেন্দ্র ছিল।

এছাড়া বারুইপুর এরিয়া অফিসের উপর দায়িত্ব সারা ২৪ পরগনা ছাড়া পঃ বঙ্গে এই শিল্পের প্রচার ও প্রসার।

১৯৬৩–৬৪ সালে বর্তমান লেখক বারুইপুর তথা পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছিপালন শিল্পের দায়িত্বে ছিল। ঐ সময় কর্মচ্যুত বীফিল্ডম্যানদের অসহায় অবস্থায় তাদের কি করে কাজে লাগান যায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের শ্রী সিতেন চক্রবর্তী (Dy- Director, c& SSi Directorate) ও ডিরেক্টরের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও অর্থ সচিবদের দপ্তরকে সঠিকভাবে বোঝাতে পারায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার D.I.C-র মাধ্যমে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় দশটি করে মোট কুড়িটি মৌমাছিপালন কেন্দ্র খোলেন এবং নিয়ম শিথিল করে কর্মচ্যুত বী-ফিল্ডম্যানদের Super vison-Beekeeping পদে নিয়োগ করেন। ঐসব কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাক্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যা লেগেছিল তা বারুইপুর থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

মৌমাছির বক্স ছাড়া ধোঁয়াদানি ও মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে পুরাতন বাজারে নারায়ণচন্দ্র প্রামাণিক তৈরী করতেন। এখনও তিনি ঐ কাজ করেন। আরও অনেকে এ কাজ পরে করেন।

পরবর্তিকালে I.S.I Standard অনুসারে বাক্স পিয়ালী টাউনে কেন্দ্রীয় সরকারের Model Carpentery Workshop বিশেষভাবে সাহায্য করে। ঐ কারখানার কাঠের কাজে বিশেষজ্ঞ শ্রী শ্যামাচরণ অধিকারীর কথা মনে পড়ে। পরবর্তিকালে উক্ত মানের বাক্স তৈরীর দায়িত্ব

নেয় পিয়ালী টাউনে M/s K.C. Dey & Sons. অবশ্য ঐ কারখানা বেশিদিন চলেনি।

বারুইপুরের এরিয়া অফিস থেকে লেখকের সম্পাদনায় হাতে স্টেনসিল কেটে ও সাইক্লোস্টাইল করে 'মৌমাছি জগৎ' মাসিক পত্রিকা বের করা হত। পরে রেলগেটের কাছে সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপা হত। এর শুরু হয় ১৯৬০ সালে এবং সাময়িকভাবে প্রকাশ বন্ধ হয় ১৯৬৪ সালে। হাতে লেখা ও পরবর্তিকালে পত্রিকা প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রী পরিণয়কুমার ভূঁএ্যা, কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল নাগ ও বিমলেন্দু মণ্ডল। কপির মূল্য ছিল মাত্র পঁচিশ পয়সা।

২৪পরগনা মৌমাছিপালক সমবায় সমিতি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশ হয় ১৯৬৬ সালে। সম্পাদনার দায়িত্ব প্রথমে নেয় শ্রী অমলেন্দু ত্রিপাঠী এবং পরে শ্রী কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায় ও মাখনলাল নাগ। এরা সবাই এবং সমিতির লেখককে উপদেষ্টার মর্যাদায় রেখেছিলেন। আরও চারটি সমবায় সমিতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। লোকের অভাবে পত্রিকাটি আবার বন্ধ হয় ১৯৬৯ সালে। বিগত ২০০০ সালে পত্রিকাটি নবপর্যায়ে প্রকাশ পায় এবং আজ পর্যন্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৬৪ সালে খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের ডেভলপ্মেন্ট অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা অফিসে যোগ দিলেও বারুইপুরে লেখকের আস্তানা থেকে যায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে এক হাজার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলেও প্রায় পাঁচশ কেন্দ্র যেগুলো সবে শুরু হয়েছিল তা আরও পাঁচ-সাত বছরের জন্য থেকে যায় । পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০টি কেন্দ্র থেকে যায়। তাই পুরাতন ও নতুন কেন্দ্রের মৌমাছিপালকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য লেখকের প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন জেলার কয়েকজন নিঃস্বার্থ মৌমাছিপালকের সহায়তায় পাঁচটি জেলাভিত্তিক মৌমাছিপালক সমবায় সমিতি গঠিত হয়। যেমন, ২৪ পরগনা জেলার শাসন, বারুইপুরে; মেদিনীপুরের প্রতাপপুরে; হুগলির চন্দননগরে; জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মংপুতে (পরে কার্সিয়াঙে)। ২৪ পরগনার মৌমাছি পালক সমবায় সমিতি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন তাঁরা হলেন শ্রী মাখনলাল নাগ, শ্রী কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিমলেন্দু মণ্ডল, শ্রী অজয়কুমার পাল, শ্রী অধীর চন্দ্র মণ্ডল, শ্রী পরিণয়কুমার ভূঁএ্যা , শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষাল, শ্রী সুবোধচন্দ্র ঘোড়ই এবং প্রয়াত ননীগোপাল দাস ও সরস্বতী মল্লিক।

উক্ত সমিতির এলাকা হল সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা। সদস্য চাঁদা ছিল মাত্র ৫ টাকা। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রী মাখনলাল নাগ ও শ্রী কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৫ সালের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সমিতি খাদি কমিশন থেকে মৌমাছিপালনের এজেন্সিশিপ নেবে ও শেয়ার মূলধনের ভিত্তিতে ৫০০০ টাকা লোনেরও আবেদন করা হয়। খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন থেকে স্বীকৃতিও আসে। এর পর খাদি কমিশন বাৎসরিক বাজেটের ভিত্তিতে সমিতিকে কেন্দ্র পরিচালনা ট্রেনিং, স্কুল এ্যাপিয়ারী, মডেল এ্যাপিয়ারী এবং বাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির উপর অনুদান ও ঋণ দিত।

শুরুতে কোনও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা না থাকায় খাদি কমিশনের কর্মীদের ও সমিতি ডাইরেক্টারের নিঃস্বার্থ পরিষেবায় সমিতি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। প্রতি বছরই আগ্রহী লোকেদের শাসনে মৌমাছিপালনে এক মাসের প্রশিক্ষণ দিত। বিভিন্ন এলাকাতেও ৭ দিনের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করত। এক জায়গায় বেশী দিন ফুল না-থাকার কারণে বারুইপুর এলাকায় লিচুফুল ছাড়া অতিরিক্ত মধুসংগ্রহ ও কলোনী বাড়াবার জন্য ভ্রাম্যমাণ মৌমাছি পালনে খাদি কমিশন সামান্য অনুদানও দিয়ে মৌমাছিপালকদের উৎসাহিত করত। এভাবে মধুর উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালে শূন্য থেকে প্রথম ১০ বছরে পঃবঙ্গে ১০০১টি গ্রামে ৩৪৮৭টি মৌমাছিপালকের কাছে ৭০০০ কলোনী থেকে মধুর উৎপাদন হয় ২৫৪০০কেজি। যার অর্ধেক উৎপাদন ছিল ২৪ পরগনা মৌমাছিপালক সমবায় সমিতির মাধ্যমে। ঐ সময় বারুইপুরে একটি মডেল এ্যাপিয়ারী ও বারুইপুর হাইস্কুলে একটি স্কুল এ্যাপিয়ারী চলতে থাকে। মূল এ্যাপিয়ারীর উদ্দেশ্য ছিল মৌমাছিপালনকে ছাত্ররা যেমন কর্মশিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে মৌমাছির জীবনযাত্রা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে তেমন অবসর সময়ে মৌমাছিপালন করে নিজ খরচের জন্য কিছু আয়ও করতে পারবে (Earn while you learn)। এখানে বারুইপুর হাইস্কুলের তখনকার উৎসাহী শিক্ষক শ্রী সৌরভচন্দ্র দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি সমিতির সভাপতিও হয়েছিলেন ১৯৮৪ সালে।

উৎপাদন সামান্য হলেও তা বিক্রি করা যেত না। ১৯৬৫ সালে মধুর কেনা দাম ছিল ঃ মিষ্টি মধু – ৪.০০ টাকা, তেতো মধু – ২.৫০ টাকা। বিভিন্ন প্যাকের বিক্রি দাম ছিল ঃ ১ কিলো – ৬.০০ টাকা, ৫০০ গ্রাম – ৩.২৫ টাকা, ২৫০ গ্রাম – ১.৭০ টাকা এবং ১২৫ গ্রাম – ০.৯০ টাকা। তেতো স্বাদের মধুর দাম ছিল যথাক্রমে ৩.৭৫, ২.০০, ১.২৫ ও ০.৬৫ টাকা।

১৯৫৮– ৫৯ সালে মিষ্টি মধুর দাম ছিল ২ টাকা প্রতিসের। মেদিনীপুরের কালোজাম ইত্যাদির মধুর দাম ছিল প্রতিসের ১.২৫ টাকা-স্থানীয়ভাবে মধু বিক্রি না হওয়ায় ঐ মধু কলাপাতায় আর্য়ুবেদিক প্রতিষ্ঠানে ও মাড়োয়ারী হাসপাতলে ৪০ টাকা মন প্রতি বিক্রি করার জন্য গেলে হাসপাতালের কর্ণধার বলেন – আপনারা যে মধু দেবেন তা খাঁটি, আর আমরা যে মধু পাই তাও খাঁটি, তফাৎ কেবল দামের। আমরা ২০ টাকা মন দরে নিতে পারি।

বারুইপুর এরিয়া অফিস থেকে সমিতির কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকে চেষ্টা চলে নিজস্ব জায়গা ও বাড়ির জন্য। শাসনে যে বাড়িতে এরিয়া অফিস ছিল তা সমিতি মাত্র এগার হাজার টাকায় পুরাতন বাড়ি সহ কেনে। এব্যাপারে ভোলাবাবু (ডাকনাম – হালদার) বিশেষ সাহায্য করেন। ১৯৯৩–৯৪ সাল থেকে ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় জায়গায় দরকার হয় উন্নত ল্যাবরেটারি, বড় বাড়ি ও উন্নত মধু শোধনাগার। এজন্য শাসন রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি দশ কাঠা জায়গা কিনে সমিতির লাভের টাকা থেকে নতুন দ্বিতল ভবন তৈরী করতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অবশ্য খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের কাছে এখনও প্রায় দশ লক্ষ টাকার উপর ঋণ রয়েছে।

১৯৯২–৯৩ সাল পর্যন্ত বারো-চোদ্দ জন কর্মীর বেতন মেটাতে যে সমস্যা ছিল, ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে তা খানিকটা সহজ হয়েছে নিট লাভ বাড়ার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকার খাদি কমিশনের মাধ্যমে মৌমাছিপালন, চামড়া ও হাতে তৈরী কাগজ ইত্যাদি কয়েকটি শিল্পে বিকাশের জন্য UNO-র অধীন UNDP (United Nations Development Project) গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য হল Common Facilities Centere এর মাধ্যমে উদ্যোগী বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য উন্নতমানের শোধন, প্যাকিং ইত্যাদি করে বাজারজাত করা। খাদি কমিশন ২৪ পরগনা মৌমাছিপালক সমবায় সমিতিকে মৌমাছিপালনে UNDP–K.V.I.C Bee keeping Programme কার্যকরী করার জন্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকার অনুদান (সমিতিও ২ লক্ষ টাকা নিজের থেকে খরচ করেছে) দিয়েছে। কুড়িজন মৌমাছিপালককে প্রশিক্ষণ, বাক্স, কলোনী, আধুনিক মধু শোধন প্ল্যান্ট (Modern Honey Processing Plant) ল্যাবরেটারিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংযোজনের জন্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৌমাছিপালকরা যাতে মধু উৎপাদন ছাড়া পরাগ, মৌমাছির বিষ, রয়েল জেলি, মোম প্রপোলিস, উন্নতমানের রাণী তৈরী ও তার বাজারজাত করতে পারে তার উপর জোর দেবে- এরূপ আশা করা যায়।

সমিতির আর্থিক অসুবিধার কারণে ১ লক্ষ বা ১.২৫ লক্ষ কেজি মধু রিটেল ও বাক্স প্যাকিং করে বিক্রি করে যার বেশির ভাগ যায় অন্যান্য রাজ্যে। যেমন – উড়িষ্যা , অন্ধ্র , কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রভৃতি। মৌমাছিপালকদের কাছে ১/২ বছর আগে যে-ইউক্যালিপটাস মধু এখানে বিক্রি হত না, তার দাম এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় প্রতি কেজি ৬০ টাকা। অন্যান্য মধুর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে এখন ৮০-৯০ টাকা কেজি। সমিতির পক্ষে ঐ দামে কিনে অন্যান্য রাজ্যে বাজারজাত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় হঠাৎ করে মধুর রপ্তানি বেড়ে যাওয়ায় এরূপ হয়েছে। কতদিন থাকে তা দেখার । অনেক বড় মৌমাছিপালক, ফড়েও মধুর ব্যবসাতে নেমে পড়েছে।

সব শেষে জানাই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তথা বর্তমান সমিতির একজন ডিরেক্টর শ্রী কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়, যিনি ১৯৫৬–৫৭ সালে মৌমাছিপালন শুরু করেন এবং এ্যাপিথরারিষ্ট কোর্সে ট্রেনিং নেন। তিনি এখনও হাতেনাতে মৌমাছিপালনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এপিস সিরানা। (Apis Cerana) মৌমাছিকে সংরক্ষণ ও তার কলোনী বাড়াবার সাথে সাথে ভেষজ ও ভিটামিন যুক্ত মধু উৎপাদনের উপর গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন বারুইপুরে। অবশ্য উৎপন্ন মধু ও অন্যান্য উৎপাদনে গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার স্বীকৃতি পেলে দেশে ও বিদেশে এর বাজার পাওয়া যেতে পারে।

এ সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ যেমন জেলা পরিষদ, জেলা শিল্পকেন্দ্র, বন বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সমন্বয় ঘটলে মৌমাছিপালন শিল্পে প্রচার ও প্রসার বাড়ার সাথে সাথে অনেকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হবে এবং কৃষিজ ফল ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ শিল্প বিশেষ সহায়ক হবে।

বারুইপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"............. বাংলাতে বাংলার ইতিহাস নাই। বাংলাতে বাংলার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন – সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কে লিখিবে – তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলে লিখিবে। মা যদি মরিয়া যান তবে সেই মায়ের গল্প করিতে কত না আনন্দ। আর আমাদের এই সর্বসাধারণের মা, জন্মভূমি – বাংলা দেশ – ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?" – কথাটা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে বহু ঐতিহাসিক তাঁদের প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের এই বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনা করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু আঞ্চলিক ইতিহাসও রচিত হয়েছে। মননশীল পাঠকদের দ্বারা সেগুলি যথেষ্ট সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় বারুইপুরের কিছু কিছু বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক রচিত হলেও সেগুলিকে একই সূত্রে গ্রন্থিত করে অঞ্চলের একটি সামগ্রিক ইতিহাস সৃষ্টির তাগিদ বড় একটা দেখা যায় নি।

বারুইপুরের একটি সামগ্রিক ইতিহাসকে রূপ দেওয়ার বর্তমান এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে আমার প্রচেষ্টা বারুইপুরের অতীত ও বর্তমান কালের যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বরূপ অনুসন্ধান।

অসংখ্য নদী-নালা ও আদিগঙ্গা বেষ্টিত এই অঞ্চলের প্রাচীনকালের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ নদীপথে নৌকা বা আদিগঙ্গার তীর ধরে সরুঘন জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল মগদস্যু অধ্যুষিত আলপথে পায়ে হেঁটে যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রী চৈতন্যদেব মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নীলাচলধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর যাত্রাপথে তিনি আদিগঙ্গার তীর ধরে বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া অতিক্রম করে এসে বারুইপুরের নিকট আটিসারা গ্রামে একরাত্রি অতিবাহিত করেন। তৎকালীন সময়ে আদিগঙ্গা খরস্রোতা, ব্যাপ্তিতে বিশাল এবং এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবহমান। অনুমান, তিনি আদিগঙ্গা দিয়ে নৌকা করে এবং আলপথ ব্যবহার করে নীলাচলে পৌঁছোন।

তৎকালীন সময়ে ব্যবসায়ী বা সওদাগরেরা এই নদীপথেই তাঁদের বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে সুদূর সিংহল, সুমাত্রা ইত্যাদি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চাঁদ সওদাগর কালীঘাটে পুজো দিয়ে তাঁর বাণিজ্যতরী ভাসিয়েছিলেন সিংহলের উদ্দেশ্যে। তাঁর যাত্রাপথের বর্ণনা হিসেবে পাই –

"কালিঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পূজিয়া।

চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।

ধনস্থান এড়াইল মহা কুতূহলে।

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ।।

(মনসার ভাসান – বিপ্রদাস চক্রবর্তী

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় এই নদীপথই তখন ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগের একমাত্র উপায়। বণিক বাণিজ্য করে ফিরছেন। ডিঙ্গা পথের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা দেখেই মনে হয় এটা ফিরতি পথ।

সাধুঘাটা পাছে করি সূর্যপুর বাহে তরী

চাপাইল বারুইপুর আসি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক কালিদাস দত্ত রচিত বিভিন্ন মূল্যবান প্রবন্ধগুলি পরবর্তিকালে বারুইপুরের ইতিহাস অনুরাগী ডাঃ সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য এবং হেমেন মজুমদারের সম্পাদনায় 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়খণ্ডেঅতীতে পায়ে হাঁটা পথের বর্ণনায় পাই (পৃঃ ৩১) বর্তমান সময়ে দ্বারির জাঙ্গাল নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন পথের ভগ্নাবশেষ বারুইপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ বহু গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথেই পূর্বে লোক গঙ্গাসাগর আসিত । খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা ইহাকে Pilgrims track বলিত। আটিসারা গ্রাম হইতে নীলাচল যাইবার সময় শ্রী চৈতন্যদেব এই পথই ব্যবহার করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুলপী রোড নির্মিত হইবার পর উল্লিখিত দ্বারির জাঙ্গাল পথটি ক্রমশঃ অব্যবহার্য হইয়া পড়ে এবং সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হইয়া যায়।

ইংরেজ আমলে ১৮৮২ সালের ১০ই জুলাই বারুইপুরে প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রথম ট্রেনটি কলিকাতা হইতে ছাড়ে সকাল ৬-৩০মিনিটে এবং বারুইপুর পৌঁছায় সকাল ৭-৪৫ মিনিটে। (সূত্রঃ – অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী)

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর লেখা থেকে আরও জানা যায় মানুষ তখন ট্রেনকে বলত রেলগাড়ী বা কলের গাড়ী। ট্রেন কথাটা এল আরও পরে। কিন্তু দাউ দাউ করা একঘর আগুন পুরে হুস হুস করে যে গাড়ী চলে তাকে অগ্নিযান ছাড়া আর কিইবা বলা যায়। আর অগ্নি হল দেবতা। সেই দেবতা যে গাড়ী টেনে নিয়ে যায় তাতে পা দিয়ে ওঠা মানে মহাপাপ। সুতরাং তদানীন্তন সময়ে পণ্ডিতদের বিধান, অগ্নিযানে উঠেছো, তাহলে মাথা ন্যাড়া করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মানুষ পণ্ডিতদের এই বিধান বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনেও নিত। আজকের দিনে এটা ভাবতে মজা লাগলেও, অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই ছিল সেকালের বাস্তব চিত্র।

ইংরেজ আমলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলেও রাস্তা নির্মাণ বা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার খুব একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ডুলি, পাল্কী, ঘোড়ায় টানা গাড়ী, গরুর গাড়ী ইত্যাদি।

স্বাধীনোত্তর বারুইপুরে ২/ ৪ টি সাইকেল রিক্সা চলতে আরম্ভ করলেও ১ নং প্ল্যাটফর্মের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ঘোড়ারগাড়ীর আধিক্যই ছিল চোখে পড়ার মত।

বারুইপুরে বাস চলাচল শুরু হয় যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সাল বা কাছাকাছি সময়ে। বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে বারুইপুর রাসমাঠ। যাদবপুর হয়ে ৮০এ। আর একটি বাস নং ৮০ । এটা চলতো টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে নাকতলা গড়িয়া হয়ে বারুইপুর রাসমাঠ। এই

দুটোই ছিল বারুইপুর বা দক্ষিণ শহরতলীর প্রথম বাসরুট। তারও অনেক পরে বারুইপুর থেকে আমতলা ৯৭ নং রুটে বাস চলাচল শুরু হয়।

কুনকুইনাল রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৮৪৭/৪৮ সাল পর্যন্ত বারুইপুর , ক্যানিং রোড তৈরী হয়নি। পরে 'বারুইপুর থেকে সীতাকুণ্ডুর মধ্যে দিয়ে ক্যানিং রোড তৈরী করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মাটি ফেলার কাজও (earth work) শেষ হয়। কিন্তু তদানীন্তন মাতব্বরদের মধ্যে মতভেদের কারণে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।'

আজকের বারুইপুর পুরোপুরি শহর। বারুইপুরকে গ্রাম থেকে শহরে পরিণত করার কাজ শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের শুরু বা তারও কিছু আগে থেকে। বারুইপুর থেকে দেশের যে কোনও প্রান্তে বা কলকাতা যাওয়ার জন্য খণ্ড ছিন্ন বারুইপুরের নানা গ্রামকে শহরের সঙ্গে গেঁথে ফেলার একটা তাগিদ লক্ষ্য করা যায় ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। তখন রামনগর পর্যন্ত (আনুমানিক ১৯৫০ সাল) এবং উত্তরভাগ ও ক্যানিং পর্যন্ত (আনুমানিক ১৯৫৩ সাল) পথ চলাচল শুরু হয়ে গেছে।

বর্তমান বারুইপুর শহরকে আশেপাশের নানা গ্রাম ঠিক মানব দেহকে যেমন ঘিরে নানা ধমনী, শিরা তেমনি নানা জনপদ, সড়ক রক্তজালিকার মত ঘিরে রেখেছে। শহর জুড়ে কর্মচঞ্চলতায় যেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে। চলার ছন্দে এসেছে গতি। আজ বারুইপুরের যে কোনও প্রান্তে যেতে হলে হাঁটার কোনও প্রয়োজন হয় না। সাইকেল রিক্সা, অটো তো আছেই। আর বারুইপুরের বাইরে কলকাতামুখী যেতে হলে ট্রেন ছাড়াও ২১৮ নং বাস, সি টি সি এবং ভূতল পরিবহন নিগমের বাস চলাচল করে। এছাড়া আছে নানা রুটের মিডি, মিনি বাস, ট্রেকার ইত্যাদি। যেগুলি ক্যানিং, আমতলা, দঃ বারাসাত প্রভৃতি জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াত করা আজ বারুইপুর থেকে খুবই সহজ হয়ে গেছে।

এত কিছুর মধ্যেও আক্ষেপের বিষয় বারুইপুরে প্রথম চলাচলকারী বাসরুট ৮০, ৮০এ এবং ৯৭ নং বাস আজ দীর্ঘকাল অজানা কারণে বন্ধ। এই রুটগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। বারুইপুর থেকে গড়িয়া যেতে হলে একমাত্র বাস রুট ২১৮ নং বাস। এছাড়া আছে অটো সার্ভিস। অটোগুলি সর্বদাই বহন ক্ষমতার বাইরে যাত্রী নিয়ে চলাচল করে এবং প্রায়শঃই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই বেআইনীভাবে যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী অটোগুলোকে সংযত করে আইনী অনুশাসনের মধ্যে আনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কোনও নজর নেই। এছাড়াও অটোতে যাতায়াত ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং উক্ত তিনটি রুটের বাস যাতে আবার চালু করা যায় তার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বারুইপুরের আর একটা সমস্যা যানজট। পদ্মপুকুর থেকে রেলগেটে পৌছানো কখনও কখনও ঘন্টাধিক সময়ও লেগে যায়। বিশেষ করে পিয়ারা, লিচুর মরশুমে।

এই সমস্যার সমাধানে অনেক ভাবনা চিন্তার পর আদিগঙ্গার তীর ধরে পদ্মপুকুর থেকে খোদার বাজারের ভেতর দিয়ে মূল শহরকে এড়িয়ে শাসনে উঠে পড়ার জন্য একটা বাইপাস

নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ হলে বারুইপুরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে গতি এবং স্বাচ্ছন্দ।

আর একটা রাস্তা বারুইপুর রেল স্টেশন থেকে রেলগেট। যানবাহনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রশস্ত। বিশেষ করে অফিস যাত্রী, স্কুল ছাত্র, ছাত্রীদের গন্তব্যে পৌছুতে কোন কোন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইনের ওপর দিয়ে যেতে হয়। এই রাস্তাটার উন্নতির জন্য রেল, পুরসভা পি. ডব্লু.ডির যৌথ উদ্যোগ আশু প্রয়োজন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার আর একটা দিক হল ডাক ও তার অফিস। বারুইপুরে বড় ডাকঘরের সংখ্যা একটি আর সাব পোষ্ট অফিসের সংখ্যা ৬৩টি। টেলিগ্রাফ অফিস বা তার ঘরের সংখ্যা ১ টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বারুইপুরের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধে হয়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা এবং ইন্টারনেট পরিষেবা।

বারুইপুর শহরের মূলকেন্দ্র থেকে আধাশহর ও গ্রামের নানা প্রান্তের পথ নানাদিকে ছুটে চলেছে। সেই প্রাচীনকালে ইতিহাসে পড়া বারুইপুর এবং ছেলেবেলায় দেখা 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ' সেই বারুইপুরের সঙ্গে হালফিলের মহকুমা শহর বারুইপুরের কত তফাৎ হয়ে গেছে। অযত্নে অবহেলায় পড়ে-থাকা নানা খণ্ডে বিভক্ত ফুলগুলোকে সযত্নে তুলে নিয়ে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে একটা মালা।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তনকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হয়। কিন্তু ভুলতে পারি না ছেলেবেলায় দেখা বারুইপুর ১নং প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়ান সারিবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ির কথা, টিমটিমে কেরোসিনের আলোয় নির্জন, এবড়ো-খেবড়ো ঝিঁঝি-ডাকা রাস্তা দিয়ে চলা, মাঝে মাঝে দূর থেকে আসা একটা আধটা গাড়ীর আওয়াজে চমক ভাঙ্গা, যেগুলির অভাব আজ এই পরিণত বয়সেও বেশী করে মনে পড়ে। ভীষণ নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ি। আশঙ্কা হয় আমি কি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মেনে নিতে পারছি না! আমি কি এই যুগের কাছে অচল, প্রাচীন হয়ে পড়ছি!

একনজরে বারুইপুরের পথের পাঁচালী

মোট দৈর্ঘ্য কি.মি।এর মধ্যে পাকা সড়ক কি.মি পি. ডব্লু ডি এবং পি.ডব্লু.ডি (সড়ক) এর অধীন। কি.মি পৌরসভা করেছে। রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বও তাদের। কে.এম.ডি.এও পঞ্চায়েতের অধীন কি.মি রাস্তা, মাটির রাস্তা কি.মি পঞ্চায়েতের অধীন। আংশিক পাকা বা ইঁট বাঁধানো রাস্তা কি.মি। পঞ্চায়েত সমিতি /জেলা পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাধানে তৈরী কিমি।

একনজরে নির্মীয়মাণ বারুইপুরের পথের পাঁচালী

বারুইপুর-ক্যানিং এলাকায় কুড়ালি মিলন বাজার রাস্তা নির্মাণ চলছে।

বারুইপুর এলাকায় শাসন-শঙ্করপুর রাস্তা সমাপ্তির পথে।

বারুইপুরে আদিগঙ্গার পাড় দিয়ে বাইপাস হচ্ছে।

বারুইপুর-বিষ্ণুপুরে ঘাটুর মোড় - কল্যাণপুর রেলস্টেশন রাস্তা নির্মাণ সমাপ্তির পথে ।

বারুইপুরের শিক্ষার সেকাল ও একাল

বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র

শিক্ষা কি ? শিক্ষা কেন ? এ সম্পর্কে বহু মানুষ বহুকথা বলে গেছেন। সেসব পুনরাবৃত্তি নাকরে এটুকু বলা যায় যে, শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্নততর করে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সেজন্য বলা যেতে পাবে, সমাজের প্রয়োজনে বিশেষ সময়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায় সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের মানসিক বিন্যাসও গড়ে ওঠে। সামাজিক চাহিদার যোগান হিসাবে ব্যক্তিমানস সৃষ্টি হয়। এবং এই সৃষ্টির সহায়ক হচ্ছে শিক্ষা।

বারুইপুরের শিক্ষার ইতিহাস সামগ্রিক শিক্ষার ইতিহাস থেকে পৃথক কোনো অবস্থানে ছিলো না।

ইংরাজ এদেশে আসার আগে দেশে ব্যাপক কোন সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো না। মূলত মুসলমান শাসকদের সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে আরবি, ফারসী শিক্ষা করতেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়। জমিদারী সেরেস্তার কাজের জন্যও প্রয়োজন হত কিছু শিক্ষার– যা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সাধিত হত। ধর্মশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার (রাজকর্মচারী হতে হলে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন) বাহিরে বিশেষ কোন সাধারণ শিক্ষার প্রচলন ছিলো না। সাধারণ মানুষ বর্তমানে যে অর্থে শিক্ষা প্রচলিত তা থেকে দূরেই থাকতেন। অন্তত রাজকীয় উদ্যোগে সাধারণ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। দেশে টোল, চতুষ্পাঠী মক্তব, মাদ্রাসা ছিলোই। তা কিন্তু সাধারণের জন্য নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সে সব প্রতিষ্ঠান ছিলো – যার অস্তিত্ব আজকে আর পাওয়া যায় না। এবং গ্রাম্য গুরু পাঠশালা তো ছিলোই। কিছু স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর বাড়ীর দাওয়ায় বা দোকানের পাশে অথবা কোন ধনীব্যক্তির আটচালায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিলো। সুদূর গ্রামাঞ্চলে সম্ভবত আজও বেঁচে আছে এই সব পাঠশালা যেখানে এখনো শুভঙ্করী, বাল্যশিক্ষার পাঠধারা চলে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার সেই শিক্ষাতেই কিন্তু রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য ইত্যাদি মধ্যযুগের বিশাল সাহিত্যসম্ভার। সেই যুগের ধারাবাহিকতা রেখেই আজও পীরের গান ও সমজাতীয়গান বাঁধা হয় ও পল্লী আসরে শোনা যায়। যাঁরা এর রচয়িতা তাঁরা স্বল্পশিক্ষিত হলেও এক অর্থে শিক্ষিত। এককথায় বলা যায় কোন ধারাবাহিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নাথাকলেও শিক্ষার একটা অঙ্গন ছিলো এবং সামাজিক প্রয়োজনে তা লালিত হয়ে থাকতো।

আধুনিক শিক্ষার শুরু হয় ইংরাজ আসার পরে। মূলত অন্য এলাকার মতোই এই এলাকাতেও খ্রীষ্টান মিশনারীরাই আধুনিক শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিধর্মী ধর্মশিক্ষা

থাকায় উচ্চবিত্ত সমাজ তাতে আগ্রহ দেখায়নি এবং শাসক ইংরাজ সরকারও মিশনারীদের কাজে উৎসাহ দেয়নি বরং বিরোধীতাই করেছিলেন। তবে ১৮৫৪ সালের "Report on Public Instruction"-এ দেখা যাচ্ছে বারুইপুর এলাকায় ২.০০ টাকা ও ৩.০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে যে বিদ্যালয়গুলিকে সেগুলি হচ্ছে, গোচারণ, কল্যাণপুর ও বারুইপুরের তিনটি বিদ্যালয়। বহু অনুসন্ধান করেও গোচারণ ও কল্যাণপুরের বিদ্যালয় দুটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন সেই গ্রামের মানুষেরা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। বিষয়টি একটি উদাহরণে বোঝা যাবে। বারুইপুর হাইস্কুলটি অনুদান পেয়েছে ১৮৫৪ সালে কিন্তু তাঁরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন ১৮৫৮ সাল ধরে। ঐ বিদ্যালয় থেকে ১৮৬০ সালে প্রথম পাশ-করা ছাত্রটির নাম পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার থেকে। তখন বিদ্যালয়গুলি ছিল এইরকম ঃ ১ম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী (বাংলা বা এম. ই স্কুল) অথবা প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী (হাইস্কুল)কোন এক সময়ে (সম্ভবত ১৯৫২-এর পর থেকে) প্রাথমিক বিভাগটি মূল বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা সেই প্রথম থেকেই যখন হাইস্কুল বা এম. ই স্কুল হয় সম্ভবত আরও আগে থেকে। দুর্ভাগ্যবশত এর কোন রেকর্ড নেই। সঙ্গের যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আছে যার নাম 'আনন্দময়ী পাঠশালা' তার প্রতিষ্ঠা লেখা হয় ১৯৭০! আধুনিক শিক্ষা শুরুতো প্রাথমিক থেকেই অথচ এই পরিস্থিতির জন্য ঠিক কোন সময় থেকে বারুইপুরে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠলো তার কোন প্রামাণ্য হদিশই পাওয়ার উপায় নেই।

বাংলায় আধুনিক শিক্ষার গুরু রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে রসময় দত্ত পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে শিক্ষাকে বিস্তার করার দায় যে সরকারের, সে সম্পর্কে সম্ভবত প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সচেতন করিয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের সহকারী পরিদর্শক হয়েই তিনি প্রথমে যে কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে চারটি জেলায় চারজন অবর পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়ে তাদের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হওয়া। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি বহু বিদ্যালয় বিশেষত বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, দঃ ২৪ পরগনা বিশেষত বারুইপুর এলাকা তাঁর বিবেচনার মধ্যে ছিল না। সে জন্য তাঁর উৎসাহে বা উদ্যোগে কোন বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিলো কিনা তা জানা যাচ্ছে না। তবে তাঁর প্রেরণায় যে কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম যুগে পূর্বে উল্লেখিত তিনটি বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বারুইপুর হাইস্কুল তার প্রমাণ রয়ে গেছে কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, অপর বিদ্যালয় দুটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সেই যুগে স্থাপিত ধপধপি হাইস্কুলটিও ১৮৬৫ সালে হলেও ১৯৬৬ সালের আগে মাধ্যমিক রূপে রূপান্তরিত হয়নি। তবে রামনগরের প্রাথমিক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল জানা যাচ্ছে না—তার যে অস্তিত্ব ছিলো তার প্রমাণ ডাঃ মহেশচন্দ্র ঘোষের মতো উজ্জ্বল ছাত্র। এই ভাবে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে আবার নতুন করে গড়ে উঠছে নতুন প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্যোগে নতুন নাম নিয়ে। কোটালপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর

শেষার্ধে প্রতিষ্ঠা হলেও পরবর্তিকালে স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের আগ্রহে কোটালপুর মধুসূদন বিদ্যালয় হিসাবে আজকে প্রকাশিত। ১৯৩৯- এর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জেলা পরিষদ থেকে অনুদান লাভ করতেন এলাকার অবর পরিদর্শকের সুপারিশক্রমে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সামনে রেখে বারুইপুরে হিন্দুমেলা গড়ে উঠেছিলো। সেই সময়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যেন আন্দোলনের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো। সব বিদ্যালয়কে আজ আর পাওয়া না-গেলেও কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মারফৎ তাদের অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে। এই পর্বে যে বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছে সে-গুলির মধ্যে মদারাট পপুলার একাডেমী, ঘোলা উচ্চবিদ্যালয়, সাউথগড়িয়া যদুনাথ বিদ্যামন্দির ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ১৯২০ সালের আগে আর দেখা যাচ্ছে না। কোন বিদ্যালয়ই ১৯২০-২৪ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত এমন কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবেই ১৯৩০ সালের পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গ্রামে গ্রামে সংগঠিত হচ্ছিল। সে সময় গ্রামে গ্রামে ক্লাব, লাইব্রেরী এবং অবশ্যই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এরই জের ধরে ১৯৪১ এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়কাল পর্যন্ত বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। 'গড়া' শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এজন্যই, বহু মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও সমবেত প্রচেষ্টায় বেশ কিছুকাল ধরে ধীরে ধীরে একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছিল। বহু বিদ্যালয়ই একদিনেই স্থাপন করা হয়নি। এই পর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে স্বতন্ত্র কোন বিদ্যালয় ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাষায় 'প্রাইমারী' 'হাইস্কুল' ও 'বাংলাস্কুল' যেগুলি প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। হাইস্কুল ছিলো প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলি যুক্ত ছিল এবং এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও কোন বিভাজন ছিলো না।

লক্ষ্যণীয় যে, বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত সমাজের তৎকালীন প্রধানদের, যাঁরা জমিদার ও রাজভক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে ও উদ্যোগে। সে যুগে শিক্ষা রাজানুগ্রহে পালিত হলেও ইংরাজ শাসকদের কঠোর নির্দেশেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রূপ নেয় তখন কিন্তু শাসকের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়গুলি। এই প্রসঙ্গে মদারাট পপুলার এ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। বারুইপুর হাইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলী (মূলত জমিদারগোষ্ঠী) পছন্দ করতেন না যে, সেই স্কুলের ছাত্ররা কোন রকম রাজনীতির ছোঁয়া পায়। দুর্ভাগ্যবশত যে স্রোত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার থেকে কি করে সরে থাকবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ? বাঁধলো সংঘাত। কিছু ছাত্র (যাঁদের নাম এখন আর পাওয়া যায় না) বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিলেন স্বতন্ত্র একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব দিলেন সে সময়ের বারুইপুর কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীগণ যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন প্রয়াত হরেন্দ্রনাথ পাঠক মহাশয়।

মদারাটের সম্পন্ন পরিবারের প্রয়াত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর বাগানবাড়ীটিই দান করলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। গড়ে উঠলো নতুন একটি হাইস্কুল – যেখানে রাজনীতি করার অপরাধে পরিচালকদের ভ্রূকুটি থাকবে না। তার ফলও ভোগ করতে হয়েছে। ১৯০৯ সালের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, সরকারী অনুমোদন মিলেছে ১৯২২ সালে; তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। গ্রামে গ্রামে এমন পরিচয় খুব একটা পাওয়া গেল না। ইতিহাস পাওয়া গেল না, কিভাবে কাদের জেদে সেই ১৯১১ সালে সুদূর পল্লীঅঞ্চলে (তখন রাস্তাঘাটও তেমন ছিলো না) ঘোলাগ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। যেটাকে স্থানীয়ভাবে বাংলাস্কুল বলা হত। অবশ্য বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) স্তরে উন্নীত হতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় (১৯৬৮)। কোটালপুর সম্পর্কে বলা যায় যে, ১৮৯৮ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে জনৈক রামেন্দ্রসুন্দর গোস্বামী ১৭ বৎসর ৫ মাস বয়সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ধরে নেওয়া যায় বিদ্যালয়টি ১৮৯৫-৯৬ সালে অনুমোদন লাভ করেছিল অবশ্যই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর অংশটি কবে বিচ্ছিন্ন হল বা সেটি কোথায় গেল তারও কোন ইতিহাস নেই। তবে সকলেই স্বীকার করবেন প্রাথমিক না-থাকলে মাধ্যমিক গড়ে উঠতে পারে না।

বিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিকতা রেখে বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ের আলোচনার সুযোগ তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য সম্ভব নয়। পরিশিষ্টে কিছু বিদ্যালয় এবং তাদের ঘিরে কিছু প্রধান শিক্ষক ও সংগঠকের বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

১৮৫৪ সাল বা তারও আগে থেকে আধুনিক শিক্ষা শুরু হলেও উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ স্নাতকস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হতে একশত বৎসরের অধিককাল লেগে গেছে। ১৯৬৮ সালে বারুইপুর থানার গ্রামীণ এলাকা ঘোষপুরে স্থাপিত হয় সুশীল কর মহাবিদ্যালয়। কি সেই শক্তি? যার জন্য স্বর্গত বিজলীভূষণ কর মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনে? আসলে তাঁকে ঘিরে এমন একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যাঁরা ব্যক্তিজীবনে শিক্ষক তো ছিলেনই-এবং বহন করেছিলেন শিক্ষাদীপকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার তীব্র আকাঙ্খা। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয়ভাবে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন 'বড়মাষ্টার' বলে, প্রয়াত সুশীলকুমার পূততুণ্ড, ডাঃ দুর্গাপদ ব্যানার্জী কেবল জনপ্রিয় ডাক্তারই ছিলেন না শিক্ষাকে এগিয়ে দেওয়ার প্রেরনায় উদ্বুদ্ধপ্রাণ, এছাড়া প্রয়াত অর্ধেন্দু অধিকারী, প্রয়াত ডাঃ তারাপদ ঘোষ, প্রয়াত অধ্যাপক শরৎ ঘোষ শ্রী বিদ্যুৎ সরকার, শ্রী বামনদেব মজুমদার, ডাঃ ভবেন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ মানুষজন প্রয়াত বিজলীবাবুকে উদ্বুদ্ধ করেন নানাভাবে সাহায্য করে যা বারুইপুরে সম্ভব হয় নি তা তাঁরা সম্ভব করে তুলেছিলেন। স্থাপিত হয়েছিল সুশীল কর কলেজ। এর দেড় দশক পরে স্থাপিত হয় বারুইপুর কলেজ ১৯৮২ সালে। অথচ ১৯৫৪ সাল থেকেই বারুইপুরে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগের কথা শোনা যায়। প্রয়াত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, শ্রী হেমেন মজুমদার, প্রয়াত শিবদাস মারিক প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ তো ছিলেনই, এছাড়া ডঃ পূর্ণেন্দু বোসও উৎসাহিত হয়ে একটি ট্রাষ্টবডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বারুইপুরে বিশিষ্ট মারিক পরিবার তাঁদের

নিজস্ব ৮১ শতক জমিও দান করেছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় তা আর সম্ভব হয়নি। এই সময় মহারাজ কালিকাচৈতন্য যিনি পণ্ডিতমশাই নামে পরিচিত এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিতে নিবেদিতপ্রাণ এগিয়ে এসে কিছু জমি সংগ্রহ করে দেন ও মহাপ্রাণ প্রয়াত খগেন্দ্রনাথ নস্কর মহাশয় জীবনের শেষপর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার জমি দান করেন ও গৃহনির্মাণের জন্য কিছু অর্থও সংগ্রহ করে দেন, যার জন্য আজকে বারুইপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। জানি না কেন বারুইপুর কলেজের ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য যে বিবরণপত্র প্রকাশ করা হয়েছে তাতে কর্তৃপক্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ততে মহাপ্রাণ প্রয়াত খগেন্দ্রনাথ নস্কর বা পণ্ডিতমশাই-এর নাম জানালেন না। যদিও ঠিক যে, কেবলমাত্র তাঁরা নন, বারুইপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থ ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছেন। তবে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় কলেজটি আজ বর্তমান অবস্থায় এসেছে তিনি বারুইপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী হেমেন মজুমদার মহাশয়। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, মারিক পরিবার যাঁরা প্রয়াত অমৃতলাল মারিক মহাশয়ের স্মৃতিতে ৮১ শতক জমি দান করেছিলেন তাঁরা জানালেন যে, যদি সরকার থেকে অমৃতলাল টেক্‌নিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় কিছু সর্তসাপেক্ষে ঐ জমি বিশেষ ধরনের শিক্ষার স্বার্থে দান করতে পারেন। যদি তা সম্ভব হয় তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দীর্ঘদিনের একটি কাঙ্খিত ফল পেতে পারে। বারুইপুর তথা দঃ ২৪ পরগণায় এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুরকে বাদ দিলে আর কোথাও নেই।

বারুইপুরের প্রথাগত শিক্ষার বিষয়ে আজ পর্যন্ত যা গড়ে উঠেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি নেতাজি মুক্ত বিদ্যালয়, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়-এর সাহায্যে বিদ্যালয়-ছুট ছাত্ররা মাধ্যমিক পাশের সুযোগ পেতে পারেন সীতাকুণ্ডু বিদ্যায়তনে এবং মেলিয়া রাইচরণ বিদ্যাপীঠে। ঠিক তেমনভাবে যাঁরা কলেজে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছেন না তাঁরা বারুইপুর কলেজ ও সীতাকুণ্ডু বিদ্যায়তনে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNU) থেকে ডিগ্রীস্তরে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নিতে পারেন। মোটামুটিভাবে বারুইপুরের শিক্ষাব্যবস্থাটির যদি পর্বভাগ করতে হয় তবে মনে হয় নিম্নলিখিতভাবে করাই বাঞ্ছনীয়।

১। আধুনিক শিক্ষার সূচনা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ।

২। আন্দোলনের ক্রমপর্যায় – ক) ১৯৩৩ এবং খ) ১৯৪২ পর্যন্ত

৩। স্বাধীনতা উত্তর – ক) ১৯৫১ পর্যন্ত (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা),

খ) ১৯৭৬ পর্যন্ত,

গ) ১৯৭৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

পরিশিষ্টের একটি সারণীতে উপরোক্ত পর্বভাগে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা

জানা যাবে। এবং এ তথ্য অস্বীকার করা যাবে না যে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাপ্রসার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে ১৯৭৬-এর সময়কাল পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার একটা ধারাবাহিকতা ছিলো।

আবহমান কাল থেকেই মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা পূরণের পরেও শিক্ষার আকাঙ্খা থেকে যায় এবং সরকার বিশেষত স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার সে আকাঙ্খা পূরণের প্রতি দায়বদ্ধ। দুঃখের বিষয়, দায়বদ্ধতা থাকলেও আজও পর্যন্ত, কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সরকার শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়ভার বহনে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নতুন শিক্ষানীতি (A challenge to Education) ঘোষণা করা হয় তখনই সারাভারতে শিক্ষার একটা জোয়ার আশা করা গিয়েছিলো। সে বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দও হয়েছিলো। ঠিক হয়েছিল যে, প্রতি জেলায় একটি করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন হবে যেখানে জেলার মেধাবী ছাত্ররা পড়াশুনার সুযোগ পাবে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে । এবং 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কমপক্ষে সর্বঋতুর উপযোগী একটি করে ঘর ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া হবে। যেহেতু শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব এবং রাজ্য সরকার প্রথম দিকে প্রকল্প দুটি গ্রহণ না-করায় বহু বিদ্যালয়ই সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অবশ্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত না-হলেও বর্তমানে বারুইপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সামগ্রিকভাবে গৃহসমস্যা থেকে মুক্ত। যদিও বহু বিদ্যালয়ে আজও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় শৌচাগার নেই – আশা করা যায় আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেই এলাকার শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে অদ্ভুত কিছু সমস্যায় বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার সার্বিক প্রসার মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। ১৯৮২ সালের পর থেকে রাজ্য সরকার প্রাথমিব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেন যে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী পাঠদান বাতিল এবং কোনো শ্রেণীতে কোন ছাত্রকে আটকে রাখা যাবে না। অর্থাৎ প্রথমশ্রেণী থেকে চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের মধ্যে পাঠগ্রহণ সম্পূর্ণ করবে। এমনকি চতুর্থ শ্রেণীর শেষে, সেই শিক্ষার প্রথম যুগ থেকে চালু প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা বাতিল করা হল। এই ব্যবস্থা সার্বিকভাবে মেনে নেয়নি সর্বশ্রেণীর মানুষ। দিশাহারা অভিভাবকগণ কোন বিতণ্ডার মধ্যে না-গিয়ে আপন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তথাকথিত কে.জি, নার্সারী নামের বিদ্যালয়েতে ভর্তি করে দিলেন। এর বিষময় ফল হল যে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যার জন্য কেবলমাত্র বারুইপুর থানাতেই কোটি টাকার মতো সরকারী ব্যয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা রয়ে গেল। কারণ, বারুইপুর শহরের উপর অবস্থিত প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেরা ছেলেরা কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, সেরা ছেলেমেয়েদের পাঠ শুরু হয়েছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। আজকে বারুইপুর শহরের অধিকাংশ শিশুই, কোন না কোন তথাকথিত নার্সারী কে.জি. স্কুলে পাঠ

শুরু করে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মূলত সেইসব শিশুরা পড়াশুনা করছে যাদের অনেকেরই অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি নেই, এর ফলে নতুন বিদ্যালয় গড়ে উঠলো না। গ্রামেও চাহিদার তুলনায় সেভাবে প্রতিষ্ঠা হল না, সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অবশ্য আর একটি বিষয় উল্লেখ না-করে পারা যায় না, তা হচ্ছে শিক্ষক বেতনের গুরুভার। গত ২০/২৫ বৎসরে সরকারের থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার এবং স্বাভাবিক কারণে শিক্ষকদের বেতন গত ২০/২২ বৎসরে বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাখাতে সরকারী খরচের সিংহভাগই বেতন ভাতা দিতে ব্যয় হওয়ায় নতুন কোন বিদ্যালয় তো গড়ে তোলা যাচ্ছে না। এমনকি ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষকপদও সৃষ্টি করার পক্ষে অন্তরায় হয়ে পড়ছে।

আগেই বলা হয়েছিল যে, প্রাথমিকে ইংরাজী পঠনপাঠন বন্ধ হওয়ার জন্য প্রাথমিকস্তরে বহু বেসরকারী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ অভিভাবকই ঐ সব বিদ্যালয়ে তাঁদের শিশুদের পাঠান। ঠিক কতগুলি এই ধরনের বিদ্যালয় বারুইপুরে আছে তা জানা সম্ভব নয়। কারণ, এদের প্রায় সবকটিই ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া এবং মূলত শিক্ষাবিস্তার নয়, শিক্ষা ব্যবসাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবুও বলা যায় উদ্দেশ্য যাই থাক, এঁদের সাহায্যে অন্তত কিছু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চমানের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক অনুপাত খুবই কম, দেখা গেছে সর্বাধিক ২৫ জন; সেখানে ব্যক্তিগত যত্ন সম্ভব, উপরন্তু যেহেতু বেশভালো অর্থমূল্য দিতে হয় সেজন্য শিশুর পঠনপাঠন সম্পর্কে অভিভাবকদেরও সদা সচেতনতা থাকে। এর ফলে সাধারণ অর্থে পঠনপাঠনের মান ভালো হওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান সিলেবাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অর্ধেকটাই উৎপাদনাত্মক, সৃজনাত্মক এবং খেলাধুলার অংশ। অর্থাৎ বেসরকারী বিদ্যালয়ে যেখানে নাচগান, ছবি আঁকা শেখানো বাধ্যতামূলক; সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থা চালু রাখা প্রায় অসম্ভব। কারণ, ১৭৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫ টি শিশু কে পাঠদানের সুযোগ আছে এমন বিদ্যালয় মাত্র ১৫ টি । কমপক্ষে ৫০ টি ছাত্রকে পাঠদানের সুযোগ আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬। অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ভয়াবহ। বহুক্ষেত্রে পঠনপাঠন তো দূরের কথা, নিয়মিত শৃঙ্খলা রক্ষা করাই দূরূহ। তবুও দেখা গেছে, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শিশুদের পঠন পাঠনের মতো দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে কেন সচেতন অভিভাবকগণ তথাকথিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির প্রতি ধাবমান।

মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টি খুবই গুরুতর। সেখানে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং কোন একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। সক্ষম হলেও অভিভাবকদের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে পাশফেল প্রথা রদ হওয়ায় এখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বৎসরান্তে সরাসরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায় এবং কাছেদূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু অতিরিক্ত ছাত্রভাবের পীড়িত বিদ্যালয়গুলিতে যথার্থ পঠনপাঠনের সুযোগ কতটা ? এই মুহূর্তে বারুইপুরের মোট ৩২

টি উচ্চতর, উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩২ হাজারের মতো। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, প্রতিটি বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বাদ দিলে মোট ১১২ টি শিক্ষকের পদ শূন্য। নতুন পদসৃষ্টিতো দূরের কথা। বর্তমান শূন্যপদগুলিও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন পদসৃষ্টির জন্য শ্রেণী পিছু ৮০ জন ছাত্রের প্রয়োজন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়তেই একটি শ্রেণীকক্ষে ৮০ + ছাত্রের বসার মতো শ্রেণী কক্ষ আছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয় অনুযায়ী শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন, বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ে। দুর্ভাগ্যবশত বহু বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর পদগুলি শূন্য থেকে যাচ্ছে। বর্তমানে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিরঃপীড়ার কারণ প্রধানত দুটি; প্রথমত অতিরিক্ত ছাত্রভার দ্বিতীয়ত প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অপ্রতুলতা। শ্রেণীকক্ষের সমস্যাতো আছেই। কয়েকটি বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ না-করে পারা যায় না; যেমন কাঁঠালবেড়িয়া হরিহর বিদ্যালয়, প্রাচীন এই বিদ্যালয়টিতে ১২ টি শিক্ষকপদের মধ্যে ৬ জন কর্মরত। বারুইপুর জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠ, এখানে ১২ জন শিক্ষকের পদে ৭ জন কর্মরত। রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৯০০, সেখানে কর্মরত স্থায়ী শিক্ষক মাত্র ১৫ জন। ধপধপি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত মাত্র ২১ জন শিক্ষক। দুটি বিদ্যালয়তেই কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখা রয়েছে। একটি সারণীতে ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা দেওয়া হল। তবে ঐ দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা কত কম তা বোঝাবার জন্য বলা যায় মদারাট পপুলার এ্যাকাডেমীর ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২০০০, শিক্ষকের পদ ৪২ যদিও ৩০ জন কর্মরত। বারুইপুর হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৮০০, শিক্ষকের পদ ৩৯, কর্মরত ৩৪, বারুইপুর রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৩ শতর মতো ছাত্রী, শিক্ষক পদ ৫৪, কর্মরতা ৪৫। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকগণ তার ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে উপযুক্ত করতে পারবেন না যদি বাড়ীতে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারেন ? আগেই বলা হয়েছিলো একটি বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সেই এলাকার শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নয়ের দশক থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার সম্প্রসারণ হচ্ছে না, তার পরিকাঠামো যথার্থ অর্থে গড়ে তোলা যাচ্ছে না বলে।

বারুইপুরের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের পাশাপাশি কিছু অন্য ভাষাভাষী মানুষের কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। যেমন সরস্বতী হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উর্দুভাষায় মল্লিকপুর উর্দু প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত। তবে হিন্দী বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে অনুমোদিত।

বারুইপুরে একমাত্র ইংরাজীমাধ্যম বিদ্যালয়টি হচ্ছে হোলিক্রশ স্কুল। বিদ্যালয়টি বেসরকারী হলেও সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত। বিদ্যালয়টি প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। বর্তমানে আই.সি.এস.ই (Indian School Certificate Exam., New Delhi) পরীক্ষা দিতে পারবে এখানকার ছাত্ররা । বিদ্যালয়টি একটি বিশাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত। বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রী ৪৪৬ জন। অবশ্য ছাত্রবেতন সাধারণের নাগালের বাহিরে – মাসিক ৩০০,

আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ তো আছেই।

প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধান মান্য করে, সকল শিশুকে শিক্ষার আঙ্গিনায় আনার জন্য অতি সম্প্রতি সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে বিদ্যালয়হীন এলাকায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। সরকারী আইন অনুযায়ী এক একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ৫০ টি ছাত্র থাকবে। কেন্দ্রগুলির নিজস্ব কোন গৃহ না-হলেও চলবে। এর যাঁরা শিক্ষিকা থাকবেন তাঁরা একটি স্বল্পকালীন শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদানের উপযুক্ত হবেন। পরিচালনব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমেই সাধিত হবে। বারুইপুরে মোট ৪১টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ৮২ জন সহায়িকার মাধ্যমে প্রায় ১৫০০-র মতো শিশুরা পাঠনপাঠনেরত। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো নির্দিষ্ট সময়ে পঠন পাঠন হয় না— কারণ এর ছাত্র- ছাত্রী তারাই যারা নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায় না। কিন্তু এর পাঠ্যসূচী মায় পুস্তক পর্যন্ত সবই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো। এখান থেকে চতুর্থশ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠগ্রহনের সুযোগ পাবে। এই সব বিদ্যালয়ের যাঁরা সহায়িকা তাঁরা গ্রামেরই চল্লিশ উর্দ্ধা মহিলা সাধারনভাবে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণা থেকে মাধ্যমিক পাশ। যতদুর জানা গেছে এঁরা বেশ আগ্রহ নিয়ে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পঠন-পাঠনের কাজ করেন। কিন্তু বাধা হচ্ছে মাত্র একবছরের চুক্তিবদ্ধ তাঁদের কর্মকাল এবং প্রায়শই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরার অভাবে নিয়মিত পাঠের যে ধারাবাহিকতার প্রয়োজন হয় তা প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যদিও দাবী যে পড়াশুনার সুযোগ যারা পাচ্ছে না বা স্কুল ছুট (Dropont student) শিশুদেরকে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত। অন্যভাবে বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ হিসাবে এই গুলির আবির্ভাব। প্রকল্পটি সম্প্রতিককালের - আগামীতে জানা যাবে এর সুফল। মাধ্যমিক স্তরেরও অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে—তবে আপততঃ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানকে আকর্ষনীয় করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এককালীন গৃহনির্মাণ বাবদ অনুদান ও সকল কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাউপকরনের জন্য বিদ্যালয় পিছু ২০০০ টাকা ও শিক্ষক পিছু ৫০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিকে যেমন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে মাধ্যমিকেও এই ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে তবে বারুইপুরে এই ধরনের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো হয় নি। আশাকরা যায় যে সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হবে।

বেশ কিছু সংখ্যক শিশুকে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে। বারুইপুরে মোট ১৪৬ টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে মোট ১০,৬২০ (৫৫০০ বালক ৫১২০ বালিকা) শিশুকে দৈনন্দিন শিশুখাদ্য পরিবেশনের সঙ্গে কিছু শিক্ষাদান করেন ২৪৬ জন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পরিচালিকা। যদিও এই শিশুদের বয়স ৩ থেকে ৫ বৎসর তবুও বলা যায় একটা ভালো সংখ্যক শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে আনতে সাহায্য করছেন। কেন্দ্র পরিচালিকারা

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের মতো একবৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হওয়ায় অন্ততঃ কিছুদিন শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব। না, এই সব কেন্দ্রে প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বারুইপুরে মোট ১৮ টি সাক্ষরতা কেন্দ্রে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করা হয় এবং ১৮০ সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রে মোট ১৮ জন মূখ্য প্রেরক ও ১৭৫ জন প্রেরকের মাধ্যমে সাক্ষরতা কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। এই সব কেন্দ্র থেকে সামগ্রিকভাবে বৎসরে প্রায় ২০০০ নিরক্ষরকে সাক্ষর সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নিরক্ষরকে সাক্ষর করার থেকে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই সব কেন্দ্রে শিক্ষার উপকরন প্রায় বিনামূল্যেই সরবরাহ করা হয়। এর পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই বয়স্ক নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষর।

প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সমগ্র দঃ ২৪ পরগনার মতোই বারুইপুরেও কোন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল– দূর্ভাগ্যবশতঃ তা ফলপ্রসু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকৃত জমিতে একটি আদর্শখামার দেখা যায়।

কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারুইপুরে আছে সেগুলি নিম্মরূপ –

(১) টাইপ শর্টহ্যান্ড কলেজ — বারুইপুর কমার্শিয়াল কলেজটি স্বাধীনতার পরেপরে স্থাপিত হয়েছিল। এটি ব্যক্তি মালিকানাধীন এখানে টাইপ ও স্টেনোগ্রাফী শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় আরও দু একটি আছে।

(২) বারুইপুর মহিলা সমিতি – ১৯৫১-৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপিত হয়। তৎকালীন সময়ে বারুইপুরের বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির সমন্বয়ে মোট ১১ জনের একটি কমিটির এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হলেও এর প্রাণ বারুইপুরের এক মহিয়সী মহিলা শ্রীমতী বীনা সেনচৌধুরীর একান্ত নিষ্ঠায় এটি আজও দুঃস্থ সল্পশিক্ষিত মহিলাদের আশ্রয়স্থল। অশিতিপর এই মহিলা আজও এই প্রতিষ্ঠানটিকে ধরে রেখেছেন আপন সন্তানের স্নেহে। এখানে মহিলাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয় — (১) টেলারিং ও কাটিং (২) লেডি ব্যাবোর্ন ডিপ্লোমার কোর্স , (৩) উল নিটিং বাটিক ও হ্যান্ড প্রিন্টিং (৫) তাঁত চালনা (৬) মেসিন এমব্রয়ডারী (৭) শিবন শিক্ষা (৮) আচার জ্যাম জেলী তৈয়ারী। প্রশিক্ষিত কর্মীদের (সকলেই মহিলা) সহায়তা উপরোক্ত বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বর্তমানে সরকারী অনুদানের অপ্রতুলতায় এবং সর্বক্ষেত্রে কর্মীর অভাবে সংগঠনটির নিয়মিত পরিচালনায় ব্যাহত হচ্ছে।

(৩) সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার — ব্যারাকপুর ডায়াশেষন পরিচালিত এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বারুইপুরের স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের কার্পেন্টারী ও টু-হুইলার এর কারিগরী শিক্ষাদান করা হয়। এখানে কার্পেন্টারী ট্রেনিং এর জন্য অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে এবং দু-বৎসরের সময়কাল। কোন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না তবে সফল ছাত্রদের

সেন্টার থেকে কিছু যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়। ৪০ জন এর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। টু-হুইলার মোটর মেকানিক্স এর জন্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে। ২৫ জন ছাত্র। ছয় মাস শিক্ষাকাল এখানেও কোন স্টাইপেণ্ড নেই। উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। চারজন প্রশিক্ষক আছেন।

(৪) ফুড প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টার – সম্পূর্ণভাবে সরকার পরিচালিত মূলত মহিলাদের জন্য এই কেন্দ্রটি। আড়াই মাস শিক্ষাকাল। ২০ জন্য শিক্ষার্থী যাঁদের বয়স ১৮ বৎসরের নীচে নয় এবং মাধ্যমিক পাশ এখানে ১০০টাকা মাসিক স্টাইপেণ্ডে মোট আড়াই মাস শিক্ষাগ্রহণ করেন। এখানে মূলত জ্যাম, জেলি তৈরী শেখানো হয় তাছাড়াও ফল সুস্ক রাখার পদ্ধতি ও শেখানো হয়। মূলত মহিলাদের হলেও কিছু পুরুষ এই শিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষান্তে মানপত্র দেওয়া হয়। মোট চারজন শিক্ষক ও ল্যাবরেটারী সহায়ক আছেন। এখানে সামান্য অর্থমূল্যে জ্যাম জেলি তৈরী করে দেওয়া হয় ।

(৫) কম্প্যুটার ট্রেনিং – এ সম্পর্কে বলা যায় যে শহরাঞ্চলের যত্রতত্র যেমন টাইপস্কুল দেখা যায় তেমনি বহু কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংস্থা আছে। তবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় 'সৃষ্টির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে' কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উল্লেখযোগ্য। এখানে ডিপ্লোমা ৫টি কোর্সে ও সার্টিফিকেট ৬টি কোর্সে। ৬ মাস থেকে ১ বছর সময়কাল লাগে এবং ১৬০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা ফি এক একটি কোর্সের জন্য। বছরে ২ টি সেশনে জানুয়ারী ও জুলাইয়ে একএকটি ব্যাচে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা নেয় মোট ৭ জন উপযুক্ত শিক্ষিত প্রশিক্ষক আছেন। ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক /উচ্চতর মাধ্যমিক। এছাড়া যাঁদের সাহায্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ্যাপটেক ও ওয়েবেল কোম্পানীরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এখানে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স আছে। বেতন কোর্স হিসাবে ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। যাঁদের সাহায্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সম্ভব হয়েছে।

সারণী – ১

প্রতিষ্ঠাকালের ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলির বিভাজন

	১৯০৫ পর্যন্ত	১৯০৬ ১৯৩৩	১৯৩৪ ১৯৪২	১৯৪৩ ১৯৫১	১৯৫১ ১৯৭৭	১৯৭৮ ২০০৩	মোট
প্রাথমিক	২	৮	১৯	২৭	৯৬	২৫	১৭৭
মাধ্যমিক	২	৪	২	৩	১৬	৫	৩২

বারুইপুরের সরকার অনুমোদিত নিম্নবুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
চাম্পাহাটি নিঃ বুঃ - চাম্পাহাটি	২-১-১৯২৪		২৪৭	৬	স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না থাকলে ধরে নিতে হবে যে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।
সোলগোহালিয়া নিঃ বুঃ-চাম্পাহাটি	১-৯-১৯৩২		৪৪১	৫	
মদারাট পঃ নিঃ বুঃ - মদারাট	১৯-৩-৩৯		১৪১	৫	
ছয়ানী কালাবড়ু – ছয়ানী	২-১-৩৪		১৭৮	৩	
বীণাপাণি পাঠশালা-বারুইপুর	১-৯-৩৯		২৪৫	৫	
জয়কৃষ্ণনগর – বাঁশড়া	১-৯-৩৬		২৩৩	২	
মল্লিকপুর নিঃ বুঃ – মল্লিকপুর	২০–১২-৪১		৬৭৪	৭	
আটঘরা নিঃ বুঃ - মদারাট	১-৪-৪৭		১৫৭	৫	
নাজিরপুর নিঃ বুঃ- কালীনগর	১-৩-৪২		২৪৬	৬	
মধ্যকল্যাণপুর নিঃবুঃ– বারুইপুর	২-১-৪২		৬৩	২	
খোদারবাজার নিশ্চিন্তপুর নিঃ বুঃ বারুইপুর	১-৩-৪২		২৫৫	৪	অন্য নাম না-থাকলে দরে নিতে হবে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
চাকারবেড়িয়া খোপাগাছী নিঃবুঃ কুন্দরালী	২-১-৪২		২৪০	৩	
চণ্ডীপুর নিহাটা নিঃ বুঃ -কুন্দরালী	১-৪-৪৪		১৬৬	৩	
নড়িদানা নিঃ বুঃ - নড়িদানা	৩-১-৪২		২৬৫	৫	
কামরা বেগমপুর নিঃ বুঃ-বেগমপুর	৫-২-৪২		২৬৮	৪	
কুলাড়ী হাড়দাহ – ছয়ানী	২-১-৪২		৪০৮	২	
ঘোলা প্রাঃ বিঃ- দোলতলা ঘোলা	২-১-১৯১০		৩৪৭	৪	
হরিমূল – দোলতলা ঘোলা	৭-৪-৪২		১৮৭	৩	
চম্পাহাটি বালিকা, চম্পাহাটি	৫-২-৬২		২৯১	৩	
ডিহিমেদনমল্ল বিশালক্ষ্মী নিঃবুঃ	১৮-১২-৫৪		১৮১	৫	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
ডিহি মেদনমল্ল বৈকুণ্ঠপুর নিঃ বুঃ	১০-১-৫৩		৫০	২	
খাসমল্লিক ফ্রেন্ডশিপ ইউনিট প্রাঃবিঃ	৩ - ৩ - ৬৪		১১০	৩	ক্লাবের ঘরে শ্রেণীপাঠ
বিড়াল ধামনগর নিঃ বুঃ	১-৮-৫৫		৫১	২	
খাসমল্লিক কাজিপাড়া প্রাঃ বিঃ	১-৯-৫৫		২৪৮	৪	
হরিহরপুর বেনিয়াডাঙ্গা নিঃবুঃ	১-৩-৪৮		৪৯৪	৪	
হরিহরপুর নিম্ন বুনিয়াদী	১-৩-৫৬		১৩৯	৩	
ফরিদপুর নিঃ বুঃ	২-১-৪৭		৪৬২	৪	
পুরন্দরপুর (নতুন) প্রাঃ বিঃ	১-৪-৭৪		১৩৮	২	
খোলাপোতা প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৩		১৭৪	৩	
আখনা মির্জাপুর ফ্রেন্ডশিপ ইউনিট প্রাঃবিঃ	১-১-৭০		১৪৪	২	ক্লাবের ঘরে শ্রেণীপাঠ
পেটুয়া প্রাঃ বিঃ	১-১১-৫২		৫৬৪	৫	
পাঁচঘরা প্রাঃ বিঃ	১-৬-৫৭		২৭৯	২	
বলরামপুর প্রাঃ বিঃ	২-৩-৫৪		৯৬	৩	
মদারাট পূঃ নিঃ বুনিয়াদী	১-৪-৫১		১৫১	৪	
উত্তর মদারাট দাশনগর প্রাঃ বিঃ	১-৮-৭৩		১৭২	৪	
মদারাট বালিকা প্রাঃ বিঃ	২-২-৩৩		১২০	২	
কাঁটাপুকুর প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		২১২	৪	
মাঝেরহাট প্রাঃ বিঃ	৬-৭-৮৪		১৩২	৩	
মদারাট পপুলার একাডেমী (প্রাঃ বিভাগ)	১৯২২		৩৫০	৫	
টগরবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	১৯৮১		১৩৫	৩	
			৪২২১	৬৪	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
কালীনগর প্রাঃ বিঃ	২২-১-৫৪		১৩৩	২	
কল্যাণপুর প্রাঃ বিঃ	৬-১২-৬১		৬২	২	
পুরন্দরপুর পুরাতন প্রাঃ বিঃ	১৯৬১		১৮৫	৪	
পুরন্দরপুর মঠ সাধন-সমর শিক্ষায়তন	১-১-৭৩		১৬০	৫	
টংতলা প্রাঃ বিঃ	১-৩-৫২		২১৪	৩	
ধোপাগাছি প্রাঃ বিঃ	৫-৪-৫৫		২১৬	৩	
নিহাটা প্রাঃ বিঃ	১৯৭১		১৩১	৩	
ঘোষপুর নিঃ বুঃ	২-১-৪৯		২৫৪	৫	
সাউথগড়িয়া পঃ পাড়া নিঃ বুঃ	১-৮-৫৫	যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭	৪	
সাউথগড়িয়া অমিয় বালা প্রাঃ বিঃ	১৯৩১	ঐ	৩৯৪	৬	
তেগাছি প্রাঃ বিঃ	৪-৪-৬৩		৭০	২	
সাউথ গড়িয়া যদুনাথ প্রাঃ বিঃ	১৯১৪		২৪৬	৪	
ভাঁটা বাহিরামপুর প্রাঃ বিঃ	২৬-৭-৮৪		২০১	৩	
ওড়ঞ্চ	১-৩-৬১		৬৮	২	
মলঙ্গা	১-১-৭৩		৫১	৩	
বেলেগাছি স্পেশাল প্রাঃ বিঃ	৭-২-৫৫		২৯১	৩	
পদ্মপুকুর ইউ. পি.	১৯-১০-৭০		১৮৪	৪	
বারুইপুর জি. এস. এফ. পি.	১-৯-৪৯		১২২	৪	
সূর্যসেননগর জি. এস. এফ. পি.	১-৫-৭২		১৬০	৩	
অমিয়প্রভা স্মৃতি জি. এস.এফ. পি	১৫-১২-৮২		১১৬	৩	
			৩৩৪৫	৬৮	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়	১৫-৮-৪৭		৫৭৬	৬	
রামসাধন স্মৃতি প্রাঃ বিঃ	১৯-১-৭০		১৯২	৪	
ননিলাল স্মৃতি বিদ্যামন্দির	১৯৭৪		৯৬	৪	
সুকান্ত জি. এস. এফ. পি.	১১-১-৮২		১১৪	৩	
বিশালক্ষ্মী বিদ্যামন্দির	১-৩-৭২		২৬৫	৪	
আনন্দময়ী পাঠশালা (বারুইপুর)	১৮৫৪	রায়চৌধুরী পরিবার	১৪৯	৫	পরে নাম পরিবর্তন হয়
শিবানী বিদ্যাপীঠ	১০-১২-৮২		৯০	২	
শিশু শিক্ষা সদন	১-৮-৮৮		১৩৮	৩	
শাসন প্রাঃ বিঃ	১৯-১০-৭০		৩০৯	৪	
শ্যামসুন্দর প্রাঃ বিঃ	১৯-১০-৭০		২০২	৩	
মণ্ডলপাড়া প্রাঃ বিঃ	১-১১-৭৩		১০৮	২	
সরস্বতী প্রাথমিক হিন্দি বিদ্যালয়	১-৫-৭২		১৩২	৪	হিন্দী মাধ্যম
বেগমপুর রঘুনন্দপুর প্রাঃ বিঃ	১৯-৩-৭৩		১৬৭	৩	
বেগমপুর কলোনী প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৭		৯৫	২	
হাড়াল নিঃ বুঃ	২-১-৫০		২৪৬	৪	
কামরাতেঁতুলিয়া নিঃ বুঃ	১৫-৭-৫৪		১২৭	১	
পুঁড়ি প্রাঃ বিঃ	২-১-৫৪		১৯৯	২	
পুঁড়ি আবাদ প্রাঃ বিঃ	১৩-১২-৫৪		৯৯	২	
উত্তরভাগ কলোনী নিঃ বুঃ	১-১০-৫৭		১৭১	২	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
হাড়দহ প্রাঃ বিঃ	১৫-১২-৫৪		৩৯৬	৪	
কালাবড়ু প্রাঃ বিঃ	৩-১-৫৫		১৯৮	২	
সাহাপুর প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৩		২৭২	৩	
মাঝেরহাট বাহা সরস্বতী প্রাঃ বিঃ	২২-১২-৭০		১৯১	২	
চক্রবর্তী আবাদ প্রাঃ বিঃ	১-৮-৭৩		২১৬	৩	
বলি-বাউমনি প্রাঃ বিঃ	৬-৭-৮৪		১৯৬	৩	
বাজে মাখালতলা প্রাঃ বি	১০-১০-৫৫		২০০	২	
জেলের হাট প্রাঃ বিঃ	৫-১০-৫৫		২০১	২	
হরিমূল নূতন প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		১৬২	৩	
বেলেগাছি ৩য়, ৫ম বার্ষিক পরিকল্প	১৬-১-৬২		৫২৫	৩	
বেতবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	১৯৬২		১৮৬	৩	
কোটলপুর-কুন্দরালী প্রাঃ বিঃ	১-১-২২		৩৭১	৪	
সীতাকুণ্ড নিঃ বুঃ -সীতাকুণ্ড	২-১-২৬		৯৯৫	৬	
চন্দনপুকুর নিঃ বুঃ-দুর্গাপুর	১৯৩৪		২৬২	৪	
ইন্দ্রপালা নিঃ বুঃ-ইন্দ্রপালা	১-৯-৩৭		১৩২	৩	
পদ্মজলা নিঃ বুঃ - ধপধপি	১৯৪২		৬৬০	৫	
মজলিশপুকুর নিঃ বুঃ-ধপধপি	২১-৭-৪৪		২৮০	৩	
শেরপুর নিঃ বুঃ-ধপধপি	২-১-৪২		৪২১	৩	
ধপধপি প্রাঃ বিঃ – ধপধপি	২-১-৪২ (১৮৬৫)		৫১৪	৪	
হরিরাজ চটারপাড় নিঃ বুঃ সীতাকুণ্ড	২-৭-৪৫		৩৯৪	৫	
			৬৭৭২	৬৭	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
রামনগর নিঃ বুঃ— দক্ষিণ রামনগর	২০-১২-৪১		৯৪৫	৫	
খানপুর মিরপুর নিঃ বুঃ-মিরপুর দৌলতপুর	১-১-৪৪	সরদার পরিবার	২৭৫	৪	
কাঁঠালবেড়িয়া হরিহর নিঃ বুঃ শঙ্করপুর	১-৩-৪২		৪২৪	৪	
বলবলিয়া নিঃ বুঃ – কেয়াতলা	২০-১-৪১		৬৫০	৫	
নোড় নিঃ বুঃ – কেয়াতলা	৪-১-৪১		৫৫১	৪	
শিখরবালী নিঃ বুঃ–শিখরবলী	২-১-৪২		২২৬	৩	
বৃন্দাখালী প্রাঃ বিঃ – বৃন্দাখালী	১৮-২-৪২		২৮৭	২	
দমদম প্রাঃ বিঃ - বৃন্দাখালী	১০-১-৪৪		৩৪৯	৩	
নবগ্রাম প্রাঃ বিঃ— নবগ্রাম	১-১-৪২		৩৪০	৩	
কুমোরহাট চাঁদখালী নিঃ বুঃ	২৯-৬-৪৮		৫৮৮	৫	
রানা বেলিয়াঘাটা নিঃ বুঃ	২-১২-৪২		৫১৯	৭	
উত্তর পদ্মজলা, প্রাঃ বিঃ	১৯-১২-৫৫		২৪২	৪	
মদনপুর নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ	১৬-১১-৭১		২১৩	৪	
সূর্যপুর নাচনগাছা প্রাঃ বিঃ	১-১২-৭১		১৬৪	৩	
ওলবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৭		১৩৪	২	
আলিপুর সূর্যপুর নিঃ বুঃ	১৯৪২		২৬৪	৫	
পুরুষোত্তমপুর সরদারপাড়া, পুরকাইতপাড়া, ভাটপোয়া	১-১-৭৩		২৮২	৪	
চিত্রশালী নিঃ বুঃ	২-১-৫২		২৬০	৪	
শশাড়ী রক্ষিতচন্দ্র প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		১৮৯	২	
কাজিরাবাদ প্রাঃ বিঃ	২৩-২-৮১		১৬৭	৩	
			৭১৬৯	৭৯	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
চঙ্গগ্রাম প্রাঃ বিঃ	১৮-১২-৬৩		২২৫	৩	
শাঁখারীপুকুর নিঃ বুঃ	১-৯-৪৯		১৫৩	৪	
দুধনই প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৭		১৭৭	৪	
নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ প্রাঃ বিঃ	১-৪-৭১		২৩২	৪	
উত্তরভাগ জি. এস. এফ.পি.	২-১-৫৯		২৮৮	৩	
গুরুমিরচক ছাওয়ালফেলী প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		১৮২	৩	
গাজিরহাট রতনপুর নিঃ বুঃ	১-৩-৫৫		৪৭৪	৪	
মিরপুর প্রাঃ বিঃ	৩০-৫-৮১		৩১২	৪	
খড়গেশ্বর প্রাঃ বিঃ	২-১-৫৫		২৬৯	৪	
শঙ্করপুর অঞ্চল প্রাঃ বিঃ	১৯৪২		৩১৫	৩	
টেঁকা প্রাঃ বিঃ	১০-১-৫৪		২৫৯	৪	
কেশবপুর নিঃ বুঃ	১-৪-৪৯		৩২৬	৩	
দক্ষিণ গঙ্গাদুয়ারা প্রাঃ বিঃ	২০-২-৫৪		১৩০	৩	
রাজগড়া প্রাঃ বিঃ	১৯৭১		৩২৪	৩	
বনবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	২৮-৩-৫০		১৬৫	৩	
দঃ শাসন প্রাঃ বিঃ	১-২-৫৪		১৬০	৩	
দঃ কল্যাণপুর নিঃ বুঃ	৪-৫-৫৩		১১১	৪	
ত্রিপুরানগর মাধবপুর প্রাঃ বিঃ	৮-১-৬২		১১৯	৩	
রামগোপালপুর জি.এস.এফ.পি.	২-১-৫০		১৬১	৪	
গোয়ালবাড়ী এফ. পি.	১-৯-৭৩		৪৬	২	
			৪৪২৮	৬৮	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
মামুদপুর প্রাঃ বিঃ	১-১-৫৫		১৫৮	৪	
দক্ষিণ ইন্দ্রপালা প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		৩১৮	৩	
ধনবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	১৯৭৩		৮১	২	
সোনাগাছি প্রাঃ বিঃ	২৫-২-৫৫		১৩০	৩	
বাগদা প্রাঃ বিঃ	১-১-৬০		৯৩	১	
গোপালপুর প্রাঃ বিঃ	৩০-৫-৮১		১০৫	৩	
দেবীপুর প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		১৩২	৩	
কালিকাপুর প্রাঃ বিঃ	১৫-১২-৫৪		১৩৭	২	
খুঁটিবেড়িয়া প্রাঃ বিঃ	১৯-১২-৫৫		২০৪	৩	
মাঝপুকুর প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৭		৪৯৮	৩	
পারুলদহ প্রাঃ বিঃ	২০-২-৫৪		২৭১	৪	
ঘাটকান্দা প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		৩০৩	৩	
জয়াতলা নিঃ বুঃ	১৯৭৩		৪৬১	২	
সালেপুর কদমপুর প্রাঃ বিঃ	১-৯-৪৭		৩৩০	৪	
দুমনান প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৩		১৫৬	২	
তেউরহাট প্রাঃ বিঃ	১-৩-৫৪		১৯৫	৩	
হিমচি প্রাঃ বিঃ	১৯৫৩		৬৫৮	৪	
উঃনবগ্রাম আদিবাসী প্রাঃ বিঃ	১-৪-৭১		৫১	২	
রামচন্দ্রপুর প্রাঃ বিঃ	২৫-১১-৭১		১৮৮	২	
কেয়াতলা প্রাঃ বিঃ	১-৪-৫৪		৪২৪	৩	

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
পূর্ব পাঁচগাছিয়া প্রাঃ বিঃ	১-৩-৬৩		১৪৭	২	
কাষ্ঠগড়া পাঁচগাছিয়া প্রাঃ বিঃ	২-১-৫৪		১৪২	৪	
পঃ পাঁচগাছিয়া প্রাঃ বিঃ	১৫-১২-৫৪		১০৭	৩	
মোল্লাপাড়া (গোচরণ) প্রাঃ বিঃ	১-১-৭৩		১০৪	৩	
রতনপুর এফ.পি.	২০০১		১৪৪	১	
ধপধপি সূর্যপুর প্রাঃ বিঃ	২০০১		১১৭	১	
গৌড়দহ প্রাঃ বিঃ	২০০১		১৪০	২	
উত্তর রামনগর প্রাঃ বিঃ	২০০২		২০	২	
জয়তলা নতুন প্রাঃ বিঃ	২০০২		২৯	২	
চন্দনপুকুর প্রাঃ বিঃ	২০০২		৩৯	১	
মল্লিকপুর উর্দু প্রাঃ বিঃ	২০০১		২৭০	২	উর্দুমাধ্যমের
সালেপুর অবৈতনিক প্রাঃ বিঃ	২০০১		৮০	১	
খোলাখাটা প্রাঃ বিঃ	২০০১		১২৬	১	
বেলেগাছি আটনিরমিষা হরেন্দ্রপল্লী	২০০২		১৪০	১	
পেটুয়া দাসপাড়া প্রাঃ বিঃ	২০০১		৯১	১	
হাট মনেষপুর প্রাঃ বিঃ	২০০১		০৬	১	
পূঃ মল্লিকপুর হাড়দহ প্রাঃ বিঃ	২০০১		১১৮	১	
			৪১৩৬৩	৫৬৮	

একনজরে বারুইপুর

বারুইপুর থানার

গ্রাম পঞ্চায়েত —	১৯
পৌরসভা —	১
এলাকা —	২১৬.২২ বঃ কিমি
জনসংখ্যা (২০০১)	৩,৯৬,৫৩৩ জন
পুরুষ	২,০৪,৪৬৬
মহিলা	১,৯২,০৬৭
গত দশবছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	৪৮.৩৯
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৮৩৪ প্রতি বঃকি
স্ত্রী পুরুষের অনুপাত — প্রতি হাজারে	৫১২.২ পুরুষ
সাক্ষরতার হার	৮০.৬৮
পুরুষ	৮৬.২২
মহিলা	৭৪.৭৭
০ — ৬ শিশুর সংখ্যা	৫১,৩৫৫
৫ — ৯ শিশুর সংখ্যা	৪৪,৬৪১
১০-১৪ বালকবালিকার সংখ্যা	৪৮,৫২৫
বিদ্যালয়হীন গ্রাম (মৌজা)	০
বিদ্যালয়ের সংখ্যা (২০০২)	—
উচ্চতর মাধ্যমিক	১১
মাধ্যমিক	১৭
নিম্নমাধ্যমিক	৪
নিম্নবুনিয়াদী ও প্রাথমিক	১৭৭
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা — (২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষ)	
উচ্চতর মাধ্যমিক	১৭,২০৮
মাধ্যমিক	১৩,৭৯৬
নিম্নমাধ্যমিক	১,০৭৫
নিম্নবুনিয়াদী ও প্রাথমিক	৪১,৩৬৩
বেসরকারী বিদ্যালয়ের (যা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)	সংখ্যা ১২ + ছাত্রছাত্রী ৩৪৬৭

অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান –	
শিশুশিক্ষাকেন্দ্র	৪১
শিশু	১৫০০
সাক্ষরতা কেন্দ্র	১৮
সাক্ষরোত্তর কেন্দ্র	১৮০
টাইপ শর্টহ্যান্ড	২ +
ফল সংরক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র	১
নারীশিক্ষা কেন্দ্র (মহিলা সমিতি পরিচালিত)	১
ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার	১
কম্প্যুটার ট্রেনিং সেন্টার	৩ +
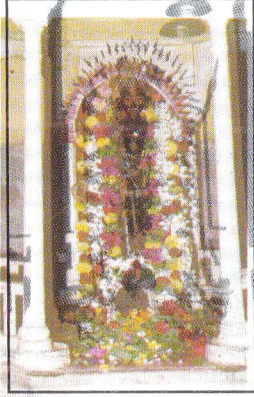
আনন্দময়ীমা, চৌধুরীবাড়ি
পুরাতন বাজার, বারুইপুর
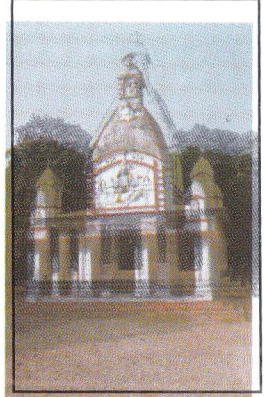
কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব মন্দির
দক্ষিণ কল্যাণপুর

চিত্রশালী মঠ
চিত্রশালী
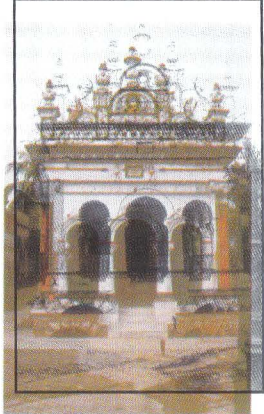
দক্ষিণরায়ের মন্দির
ধপধপি

বিশালাক্ষী মন্দির
পুরাতন বাজার, বারুইপুর
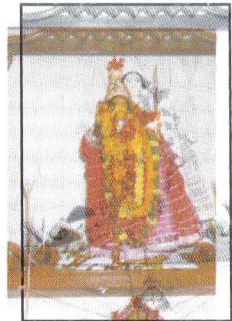
বিশালাক্ষীমা, বারুইপুর

জোড়া মন্দির, পুরন্দরপুর
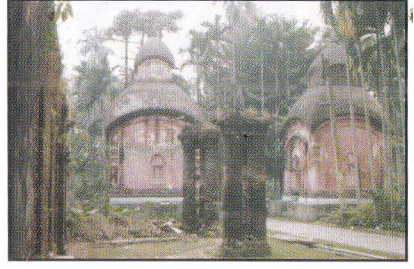
জোড়া মন্দির, শাসন ব্যানার্জীপাড়া
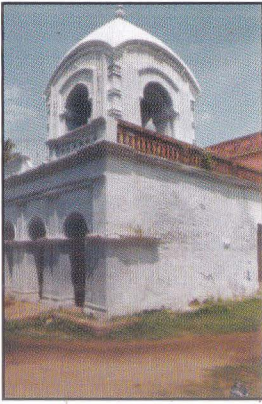
দোল মঞ্চ, বারুইপুর,
পুরাতন বাজার
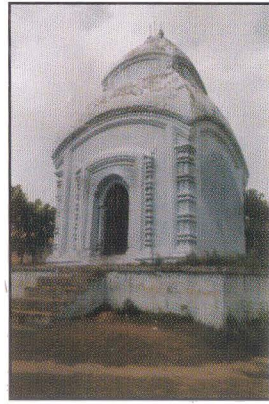
ধর্ম মন্দির
নড়িদানা
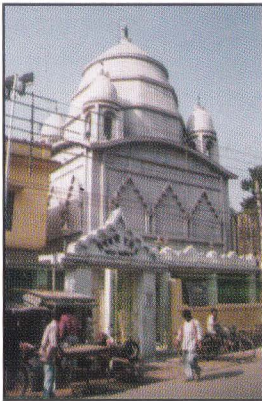
বিশালক্ষী মন্দির , কাছারী বাজার
বারুইপুর

অনন্ত আচার্যের গৃহ (মহাপ্রভুতলা)
আটিসারা

ব্যানার্জীদের দুর্গাদালান
উত্তর কল্যাণপুর

রায়চৌধুরীদের বিবিমাতলা
বারুইপুর

বারইপুর শহর গ্রন্থাগার
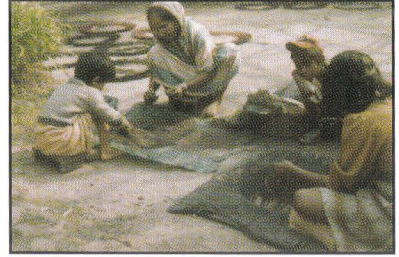
ধূপশিল্প, বারুইপুর
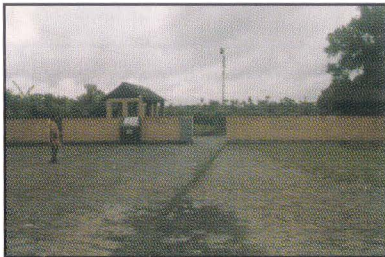
কীর্তনখোলা শ্মশান

সেন্টপিটার্স গীর্জা
বারুইপুর
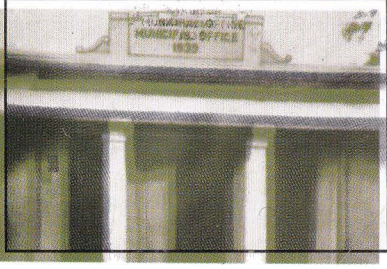
বারুইপুর পৌরসভা পুরাতন ভবন
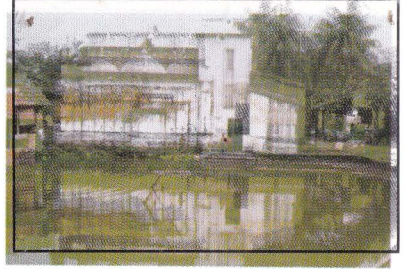
ভাটপুয়া মস্‌জিদ
সূর্যপুর

বারুইপুর রবীন্দ্রভবন

সীতামায়ের মন্দির
সীতাকুণ্ড
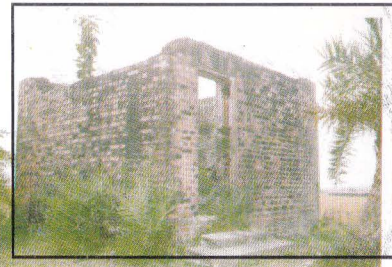
ইংরেজ স্থাপত্য, খুটিবেড়ে, উত্তরভাগ

মণ্ডলদের বাড়ি
কল্যাণপুর

বারুইপুর থানায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা
(নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর)

বিদ্যালয়ের নামঠিকানা	প্রথম প্রতিষ্ঠা বছর	প্রতিষ্ঠাতার নাম	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
বারুইপুর হাই স্কুল	১৮৫৮/৫৪	বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার	১৭৭১	৩৪ (৩৯)	
ধপধপি হাই স্কুল	১৮৬৫	ধপধপি ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ	১৮৬৫	২১ (২৫)	
কোটালপুর মধুসূদন হাইস্কুল	১৮৯৮	গ্রামবাসী, পরে মণ্ডল পরিবার	৯১১	১৫ (১৮)	
ঘোলা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯১০	পাঁচকড়ি ব্যানার্জী, পরে সুবর্ণকুমার নাইয়া	৮৩৩	১০ (১২)	
সাউথগড়িয়া যদুনাথ বিদ্যামন্দির	১৯১৪	যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৫	১২	
মদারাট পপুলার একাডেমী	১৯০৯ ১৯২২	তৎকালীন বারুইপুর আদালতের বিশেষ আইনজীবী ও মদারাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ	১৯৯৪	৩৯ (৪২)	
দমদম হাই স্কুল	১৯৩০	গ্রামবাসীগণ	৭১৭	১১ (১২)	
অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়	১৯৩৮	ঁযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৬৬	১৩ (১৫)	
দুর্গাপুর কে. সি. হাইস্কুল	১৯৪৬	ঁকৃষ্ণচন্দ্র পুরকাইত	১৫৭৬	১৩ (২২)	
রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়	১৯৪৮	বারুইপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ	২২৪৫	৪৫ (৫৪)	
কাঁঠালবেড়িয়া হরিহর বিদ্যালয়	১৯৫০	ঁহরিহর সরদার ও সরদার পরিবার	৬৫৫	৬ (১২)	
পদ্মপুকুর মধ্য বিদ্যালয়	১৯৫০	স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৮৭০	১১ (১২)	
রামনগর হাই স্কুল	১৯৫৩	স্থানীয় জনসাধারণ	১৮৮৯	১৫ (১৯)	

বিদ্যালয়ের নামঠিকানা	প্রথম প্রতিষ্ঠা বছর	প্রতিষ্ঠাতার নাম	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
মল্লিকপুর আবদুস সুকুর হাই স্কুল	১৯৫৪	আবদুস সুকুর	১০৫২	১৭ (১৯)	
কুলাড়ী ছয়ানী জনপ্রিয় বিদ্যামন্দির	১৯৫৬	স্থানীয় জনসাধারণ	১১১০	১৩ (১৬)	
কেয়াতলা হাই স্কুল	১৯৫৯	হবিবর রহমান নস্কর এর উদ্যোগে	১৪৩৫	১৫ (১৭)	
দুর্গাপুর তিলোত্তমা বিদ্যালয়	১৯৬০	সতীশচন্দ্র পুরকাইত	১২৫০	১৫ (১৭)	
মেলিয়া রাইচরণ বিদ্যাপীঠ	১৯৬০	পুলীনবিহারী মণ্ডল	৭৯০	১০ (১২)	
নড়িদানা ঘোষপুর সুশীল কর বিদ্যানিকেতন	১৯৬৫	সুশীলকুমার কর	৭৪৬	১১ (১২)	
বারুইপুর গার্লস হাইস্কুল	১৯৬৬	শ্রী বিজলী ভূষণ কর	৯১৫	১৭	
মদারাট ঈশানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়	১৯৬৬	নিতাইচন্দ্র পালের উদ্যোগে বিশিষ্টব্যক্তিবর্গ	১০৬১	২৩ (২৫)	
চম্পাহাটি নীলমণি কর বিদ্যালয়	১৯৬৮	পশুপতি কর	১০৩৪	১৫ (১৬)	
বারুইপুর জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠ	১৯৭০	ভূপতি দাস বাগীশ	৫১০	৭ (১২)	
মল্লিকপুর গার্লস হাইস্কুল	১৯৭১	গ্রামবাসীগণ	৯৮০	৯ (১২)	
সীতাকুণ্ডু বিদ্যায়তন	১৯৭১	ডাঃ সুশীলকুমার লস্কর	১৪৭২	১৮ (২০)	
বেগমপুর জ্ঞানদা প্রসাদ ইন্সটিটিউশন	১৯৭৩	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৭৪৫	১২	
পুরন্দরপুর মঠ সাধন সমর নারী শিক্ষায়তন	১৯৮০	মহারাজ কালিকাচৈতন্য ব্রহ্মচারী পন্ডিতমশাই	২৭৫	৯	
নেতাজীনগর নিবেদিতা হাইস্কুল	১৯৮৩	কালোনী কমিটি	৪৫০	৭ (১২)	
কালীকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ	১৯৮৫	মানিকচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে	২০০	৫ (৬)	
রানাবেলেঘাটা জুঃ হাই স্কুল	২০০০	স্থানীয় জনসাধারণ	৩০০	৬	
জয়াতলা জুঃ হাই স্কুল	২০০০	স্থানীয় জনসাধারণ	৩০০	৫ (৬)	
চাম্পাহাটি গার্লস হাই স্কুল	১৯৫৯	মেথডিস্ট চার্চ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	৭৩০	৯ (১২)	
			৯৭১৮	১৫৩	
			৩২০৭৯		১৭৭

বারুইপুরে অবস্থিত বেসরকারী বিদ্যালয়ের তালিকা (আংশিক)

নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	প্রতিষ্ঠাতা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র বেতন
শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট	১৯৬৭	শ্রী বাঁশরীমোহন হালদার	১৬১৯	৬৫	১৫০.০০
সাউথ সেন্টার স্কুল	১৯৮৩	শ্রী সন্তোষকুমার মণ্ডল	২৮৫	১০	১০০.০০
সাউথ সেন্টার ইন্স্টিটিউট	২০০১	শ্রীমতী সংগীতা মাইতি	২১৫	৮	১০০.০০
মাইকেল স্কুল	১৯৮১	মঃ রিয়াজুল মিস্ত্রী	২৪০	১১	৭০.০০
রাজেন্দ্র নার্সারী স্কুল	১৯৯১	শ্রী অমিতাভ মণ্ডল	১৫০	৯	৯০.০০
টাইনিটট নার্সারী এণ্ড কেজি স্কুল	১৯৯৩	শ্রী অভিজিৎ মিত্র	১৪৪	৯	১০০.০০
ক্রাউন পাবলিক স্কুল	১৯৯২	সূর্যপুর মহম্মদ আলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	১১২	৭	৫০.০০ ৭০.০০
ড্রীম চিলড্রেন	১০০২	শ্রী সত্যব্রত বসু ও শ্রীমতী রত্না সেন	৫০	৬	১০০.০০
জগদীশচন্দ্র বোস	১৯৯৯	শ্রী সুজিত মজুমদার	১১২	৯	৭০.০০
অন্নপূর্ণা শিশু নিকেতন	২০০২	শ্রী লালমোহন ব্যানার্জী	৫৭	৬	৮০.০০
মহাতীর্থম বিদ্যামন্দির	১৯৮১	শ্রী দীপক মুখার্জী	৩৭	৪	৯০.০০
			৩০২১	১৪৪	৫০-১৫০
Holy Cross Baruipur	1994	Sister of the cross of Chovard-Kol	446	18	300.00
			৩৪৬৭	১৬২	

বারুইপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সাধারণ পরিচয়

(একনজরে) ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষ

সারণী – ২

ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলি

৫০ বা তারও কম ছাত্রছাত্রী আছে	–	৮
৫১ থেকে ১০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	১৬
১০১ থেকে ১৫০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	৩৭
১৫১ থেকে ২৫০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	২২
২৫১ থেকে ৩০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	২০
৩০১ থেকে ৪০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	১৭
৪০১ থেকে ৫০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	১০
৫০১ থেকে ৬০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	৭
৬০১ থেকে ৭০০ ছাত্রছাত্রী আছে	–	৪
৭০১ এর অধিক ছাত্রছাত্রী আছে	–	২
	মোট-	১৪৩

সারণী – ৩

শিক্ষক সংখ্যার ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলি

১জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	–	১২
২জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	–	৩৯
৩জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	–	৬১
৪জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	–	৪৩
৫জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	-	১৭
৬জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	-	৩
৭জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন এমন বিদ্যালয়	–	২
	মোট	১৭৭

সারণী – ৪

শিক্ষকছাত্রের অনুপাতের ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলি

একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ২৫ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	—	১৫
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ২৬–৫০ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	–	৪৪
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ৫১–১০০ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	–	৮৩
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ১০১-১৫০ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	–	৩০
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ১৫১-২০০ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	–	২
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ২০১–২৫০ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	–	২
একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ৪০১ বা তার কম ছাত্রছাত্রী	—	১
	মোট	১৭৭

সারণী – ৫

ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষকসংখ্যা

মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা –	শি	ক্ষ	ক	সং	খ্যা	মোট বিদ্যালয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)(৫)(৬)(৭)		(৮)
০—৫০	৩	৫				৮
৫১—১০০	২	১০	২	২		১৬
১০১—১৫০	৬	৯	১৭	৩	২	৩৭
১৫১—২০০	–	৮	১৪	৮	৪	৩৪
২০১—২৫০	–	২	১১	৮	১	২২
২৫১—৩০০		৩	৬	১০	১	২০
৩০১—৩৫০	–		৭	৪	১	১২
৩৫১—৪০০	–			২	২-১	৫
৪০১—৫০০	–	১	২	৩	৩-১	১০
৫০১—৬০০	–			১	২-১-১	৭
৬০১—৭০০	–	–	–	১	২–১	৪
৯০১ বা তার ঊর্ধ্বে ছাত্রছাত্রী	–	–	–	–	১ ১ -	২

বারুইপুরে নারীশিক্ষার ধারা

কৃষ্ণকলি মুৎসুদ্দি

'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্' – অমৃতের জন্য, অমরত্বের জন্য এই আকুতি বৈদিক যুগের বিদুষী নারী ঋষিযাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীর । এই আর্তি ঐ যুগের ঐ বিশেষ নারীরই শুধু নয়। সকল যুগের সকল পরিশীলিত, সংস্কৃত, মননশীল আত্মার এই-ই চিরন্তন চাওয়া। প্রকৃত শিক্ষাই হোলো এই অমৃত লাভের পথ। নারীর সেই অমৃতের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো বৈদিক যুগোত্তর সমাজ, মনুর বিধান। ভারত ইংরাজশাসনমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার পথ, অমৃতের পথ ভারতীয় নারীদের কাছে কার্যতঃ রুদ্ধই ছিলো। বঙ্গদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। রামমোহন, বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগরের মতো অচলায়তনভাঙ্গা মানুষেরা এগিয়ে না এলে আজও হয়তো আমাদের শুনতে হোতো — 'মেয়েমানুষ আবার লেখাপড়া শিখবে কি ? লেখাপড়া শিখলে যে বিধবা হবে।'

'আগে মেয়েগুলি ছিলো ভালো
ব্রতধর্ম করতো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে ?

'ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।'

নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে ঈশ্বর গুপ্তের এই কবিতার মতো কবিতা এখনো হয়তো লেখা হোতো।

স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী হলেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কিছু নেতার বিরোধিতার জন্য সেই চেষ্টা সফল হয় নি। ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে প্রখ্যাত শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী প্যারীচরণ সরকার ও কালীকৃষ্ণ মিত্র এখনকার উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দু বছর পরে ১৮৪৯ সালে বিদ্যালয়টি সরকারী অর্থসাহায্য পায়। এই কাজ করতে তাঁদের অবশ্যই প্রচুর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বারাসতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বারাসতের নিকটবর্তী নিবাধই গ্রামে এবং বাঁশবেড়িয়ায় দুটি বালিকা বিদ্যালয়

নির্মিত হয়। বারাসত এবং নিবাধই- এর নারী শিক্ষায় উৎসাহ সে যুগের শিক্ষা জগতে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছিলো। শোনা যায় বারাসতের এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে বেথুন সাহেবের কোলকাতায় একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা জাগে। তার ফলশ্রুতি - ১৮৪৯ সালে লর্ড ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন্ সাহেবের প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ঘুরে স্থাপন করেছিলেন বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বারুইপুর অঞ্চলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই নারীশিক্ষা আন্দোলনের কোনো ঢেউই এসে পৌঁছয় নি।

বারুইপুর জনপদ হিসেবে যথেষ্ট প্রাচীন হলেও নারীশিক্ষার দিক থেকে নিতান্তই আর্বাচীন। এই অঞ্চলের প্রথম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা এখনো বর্তমান সেটি হোলো মদারাট বালিকা বিদ্যালয় প্রাথমিক যা আনুমানিক একশ বছরেরও আগে স্থাপিত হলেও সরকারী অনুমোদন পায় ১৯৪৮ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারী। তার ছয়মাস পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট বারুইপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ) । এই আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ই আজকের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয় যেটি আজ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সর্ববৃহৎ বালিকা বিদ্যালয়।

তাহলে কি তার আগে এখানকার মহিলারা পড়াশুনা একেবারেই জানতেন না ? লেখাপড়ার আদৌ কোনো চলই ছিল না মেয়েদের মধ্যে ? এই ইতিহাস জানবার জন্য কোনো নথীভুক্ত প্রামান্য দলিল নেই। এই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবেই কিছু প্রবীণ মানুষের স্মৃতিনির্ভর।

বারুইপুরে নারীশিক্ষার সূত্রপাত ঠিক কবে এবং কোথায় হয়েছিল তা আজ আর অভ্রান্তভাবে বলা যায় না। বারুইপুরে সম্ভবতঃ ১৮২০ সালে খ্রীশ্চান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসকদের হাত ধরে এসেছিলেন ক্রীশ্চান মিশনারিরা। তাঁরা চেয়েছিলেন এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম এবং ইংরাজি শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে। কিন্তু শাসক ইংরাজরা এ ব্যাপারে রাজী ছিলেন না দুটি কারণে। এক, এতে এদেশের হিন্দু-মুসলমান সংস্কারের উপর আঘাত আসতে পারে, তাতে মানুষজন ইংরাজদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে অধীনস্থ মানুষ আত্মসচেতন হয়ে উঠবে এবং তখন তারা ইংরজেদের আধিপত্য ও শাসনকে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পথ ছেড়েই দিতে হয় কিছুটা সময়ের গতির জন্য, কিছুটা নিজেদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য। এই মিশনারিরাই প্রথম বাংলাদেশে মেয়েদের পড়াশুনার জন্যও উদ্যোগ নেন। তাঁরা এদেশে কয়েকটি বালিকা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বারুইপুরেও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্লাউডেন সাহেব বারুইপুরের নিমকমহলে বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে বালক ও বালিকা উভয়েই শিক্ষালাভ করতে পারতো। পরে ১৯২৩ সালে এই বিদ্যালয়টি ক্রীশ্চান মিশনের অধীনে চলে যায়। (সূত্র - 24 Parganas Gazitier by L.S.S.O' Malley pg-79) তবে সেই সময় মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘাটে বেরোনোতে সাধারণ মানুষের আপত্তি ছিল। সেই কারণে মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে পড়াশুনা করা মেয়েদের

সংখ্যাও ছিল নগণ্য।

কিন্তু তা বলে মেয়েরা যে সবাই নিরক্ষর ছিলেন তা নয়। তাঁরা অধিকাংশই বাড়ীতে তাঁদের গুরুজনদের কাছে কিছুটা লেখাপড়া শিখতেন। সে সময় মেয়েরা রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারবে, চিঠিপত্র লিখতে পড়তে পারবে -- এরকম শিক্ষা হলেই সেটা যথেষ্ট বলে মনে করা হোতো। এই শিক্ষার প্রচলন সীমিত ছিল উচ্চবর্ণের পরিবারগুলির মধ্যে। তবে নিম্নবর্ণের ধনী পরিবারের মেয়েরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ আজ থেকে আনুমানিক দেড়শ বছর আগে কল্যাণপুর গ্রামে মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রচলন যে ছিল সেকথা বলেন গ্রামের জমিদার বংশের এ সন্তান শ্রী মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার উত্তর কল্যাণপুরের তেঁতুলতলার মোড়ে একটি সহশিক্ষামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। অনুমান করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময় প্রাথমিক শিক্ষা দুটো বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বলা হোতো নিম্ন প্রাথমিক বা Lower Primary সংক্ষেপে L. P. এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ছিল উচ্চ প্রাথমিক বা Upper Primary সংক্ষেপে U.P. কল্যাণপুরের এই বিদ্যালয়টি ছিল নিম্ন প্রাথমিক স্তরের। যতদূর জানা যায় এ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক আসেন বাঁকুড়া জেলা থেকে। তাঁর পুরো নাম জানা যায় নি, সরখেল মশাই বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে জমিদার বাড়ীর মেয়েরা বিদ্যালয়ে বিশেষ যেতেন না, তাঁরা বাড়ীতেই পড়াশুনা করতেন।

বারুইপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত সীতাকুণ্ড গ্রামের প্রাচীন নারীশিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন ঐ গ্রামের বর্ধিষ্ণু মণ্ডল পরিবারের সদস্য শ্রী জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে জীবনকৃষ্ণের এক পূর্বপুরুষ শ্রী নটবর মণ্ডল নিজগ্রামের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপন করেন। সেই সময় ঐ পরিবারের এক বধূ শ্রীমতী মোক্ষদামণি মণ্ডল ছিলেন U.P. পাশ। তিনি গ্রামের মেয়েদের তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে ডেকে এনে পড়াতেন। এছাড়াও নানান হাতের কাজ, সেলাই এবং অবসর কাটানোর মাধ্যম হিসাবে কয়েকটি ঘরে-বসে-খেলা যেমন তাস, পাশা, বিশেষতঃ দাবা ইত্যাদি শেখাতেন।

মোক্ষদামণির স্বামী শ্রী দ্বিজপদ মণ্ডল ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত লোককবি। তিনি নিজে গান বাঁধতেন ও গাইতেন। তাঁর রচিত ও গীত লোকগানে নারী চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো। ঐ সব গান তখন মেয়েদের অনেকাংশে উদ্দীপিতও করেছিল। আনুমানিক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বিজপদ মণ্ডলের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী মারা যান। তখন মূলতঃ মোক্ষদামণির উদ্যোগে এবং উৎসাহে গ্রামের এক বিধবা মেয়ের সঙ্গে বিপত্নীক জামাতার বিবাহ দেওয়া হয়। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে এই রকম একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বিধবাবিবাহের মতো সাহসী ঘটনা শিক্ষিত, প্রগতিশীল মানসিকতার একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

বারুইপুরের পূর্বদিকের সন্নিকটস্থ একটি গ্রাম মদারাট। ঐ গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রী নিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় অল্পবয়সী বালিকাদের একটি পাঠশালা গড়ে ওঠে মদারাট দক্ষিণপাড়ার পাঠশালা গৃহে। বালিকাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল সকালবেলায়।

বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন পায় ১৯৪৮ সালে। (সূত্র – বীরেন মিশ্র লিখিত রচনা 'ইতিহাসের পায়ে পায়ে– গ্রাম মদারাট, বান্ধব পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৯) ঐ গ্রামের অতি প্রবীণ শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে জানা যায় যে ১৯১৪ - ১৫ সালের আগেও এই পাঠশালাটি বর্তমান ছিল। এই পাঠশালাটি ছিল নিম্ন প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত।

চণ্ডীপুর ও মলয়াপুর – বারুইপুরের পশ্চিমদিকের দুটি গ্রাম, গ্রাম দুটি একত্রে মলয়াচণ্ডীপুর বলেই সাধারণের কাছে পরিচিত। অতি প্রত্যন্ত গ্রাম হওয়ায় সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে এই দুটি গ্রামেই শিক্ষার আলো পৌঁছয় গ্রামবাসীদেরই উদ্যোগে। চণ্ডীপুরের অধিবাসী শ্রী বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর থেকে জানা যায় ১৯১৫ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রামের ভানুলাল সর্দার ও চক্রবর্তীপাড়ার অধিবাসীদের উৎসাহে ও ব্যবস্থাপনায় গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় বালক ও বালিকা উভয়কেই শিক্ষাদানের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে ভানুলাল সর্দারের চেষ্টায় গ্রামের বটতলায় বিদ্যালয়গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে বালক-বালিকা নির্বিশেষে পড়াশুনার সুযোগ পেত। চণ্ডীপুরের লাগোয়া গ্রাম মলয়াপুর নিবাসী ৯৬ বৎসর বয়স্ক শ্রী শৈলেন সরকার জানান তাঁর মাতৃদেবী শ্রীমতী কিরণশশী দেবী ১৯১৬ বা ১৭ সালে নিজগৃহে বালিকাদের জন্য দিবা ও বালকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। অর্থ রোজগার বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিরণশশী দেবীর এই উদ্যোগ কেবল প্রশংসাই -ই নয়, নজির সৃষ্টিকারীও নিশ্চয়।

বারুইপুরের অনতিদূরে রামনগর একটি পরিচিত গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসী বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস গবেষক, প্রবীণ শ্রী অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রামের ক্লাব 'সেবক সংঘ' একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নি বিদ্যালয়টি। যে সব ব্যক্তি এই বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ও বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্ত্রী হরিধন চক্রবর্তী, শ্রী নিশিকান্ত সরকার, শ্রী অনাথ বিশ্বাস প্রমুখ। এর পরে ১৯৩২ সালে ক্ষেত্রমণি বালিকা বিদ্যালয় ও সাউথ রামনগর বালিকা বিদ্যালয় নামে দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও কয়েক বছর পর দুটি বিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যায়।

বারুইপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ গরিয়া একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামেরই জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন বিখ্যাত সুদর্শন অভিনেতা শ্রী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবী। অল্প বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন তিনি। কন্যার দুঃখ ভোলাতে, তার শূন্য জীবনে একটি অবলম্বন তৈরি করে দিতে পিতা শ্রী যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অমিয়বালার জীবিত অবস্থাতেই ঐ বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন শ্রীমতী সুস্থিরা দেবী। বলা বাহুল্য ঐ সময় বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক শিক্ষাদানই শুধুমাত্র হোতো।

গ্রামের মানুষের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও অমিয়বালা (ডাক নাম ছিল উজ্জ্বলা) গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্রী জোগাড় করতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা আসতেন প্রধানতঃ চম্পাহাটির ক্রীশ্চান সম্প্রদায় থেকে। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান অভিহিত হতেন গুরুমা নামে। ১৯৩৫ সালে বিদ্যালয়ের প্রথম স্থায়ী গুরুমা ছিলেন কল্যাণী বসাক। অন্যান্য শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন কুলবালা সরকার, কনক সরকার, সুখময়ী পাল, এইসব শিক্ষিকা ছাড়াও প্রয়োজনে গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত, উচ্চশিক্ষিত পুরুষরাও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানা করণে বিদ্যালয়ের affiliation বন্ধ হয়ে যায়, তবে ১৯৫৩ সাল আবার তা ফিরে পাওয়া যায়। এই সময় থেকে নারীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রবর্তিত হয় শিক্ষামেলা। সরস্বতীপুজোর দিন থেকে সাত দিন ধরে চলত ঐ মেলা। মেলায় থাকত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, প্রদর্শিত হোতো মেয়েদের তৈরী বিভিন্ন হস্তশিল্প, থাকতো তরজা গান, পুতুল নাচ ইত্যাদি।

উপরে লিখিত তথ্যাবলী জানান শ্রীমতী অমিয়বালার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাউথ গরিয়া নিবাসী প্রবীণ শ্রী অজিত চট্টোপাধ্যায়।

পদ্মপুকুর নিবাসী প্রয়াত খ্যাতনামা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায় ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ বারুইপুর পুরাতন বাজার এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। শ্রী শশাঙ্কদেবের সুযোগ্যা কন্যা ইরা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা যায় যে ইরাদেবীর মাতামহী অর্থাৎ শ্রী শশাঙ্কদেবের মাতা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবী ছিলেন U.P পাশ। তিনি ঐ সময় পুরাতন বাজার অঞ্চলের ছোটো ছেলে মেয়েদের নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে লেখাপড়া শেখাতেন। পরে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে (আনুমানিক) তিনি পদ্মপুকুর পাঠশালা এবং পরে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন।

স্বাধীনতার পরে নারীশিক্ষা আন্দোলনে এক শক্তিশালী জোয়ার আসে। স্থাপিত হতে থাকে নতুন নতুন বিদ্যালয়। মেয়েদের জায়গা যে শুধুমাত্র অন্তঃপুরে নয়, ঘরের বাইরের বহির্বিশ্বেও যে তাদের স্থান আছে, অধিকার আছে– এই চেতনা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে। এই অধিকার লাভ করতে হলে মেয়েদের আগে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া এ যোগ্যতা অর্জন সম্ভব নয়। ফলে শুধু প্রাথমিক নয়, উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনও অনুভূত হতে থাকে।

বারুইপুর অঞ্চলে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে কোনো উচ্চস্তরের নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতদঞ্চলে ছিলো না। এই অভাব দূর করার জন্য এই অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী , উদ্যমী, নারীশিক্ষায় আগ্রহী কিছু মানুষ ১৯৪৮ সালের ১৩ই জুন বারুইপুর স্টেশন পার্শ্বস্থ 'কমলা ইনস্টিটিউট' ভবনে একটি সভা আহ্বান করেন এবং ঐ সভায় 'বারুইপুর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। পদ্মপুকুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অকুণ্ঠ সাহায্যে পাওয়া যায় ঐ বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাবপত্র এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত প্রায় চল্লিশজন ছাত্রী। এই

এবং মাত্র ১৪৯.০০ টাকা সম্বল করে ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট যাত্রা শুরু করে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। এই দিনটি অর্থাৎ ১৫ ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমনই গৌরবময় একটি দিন, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বারুইপুরের নারীশিক্ষার ইতিহাসেও।

১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয় স্বর্গতঃ ধীরেন্দ্রনাথ নস্কর প্রদত্ত জমির ওপর নির্মিত নতুন ভবনে। ১৯৫৮ সালে শ্রী নস্করের মাতা রাসমণি দেবীর নামানুসারে বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয় 'রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী ভক্তি দাস। পরে বিদ্যালয়টি অনুমোদিত হওয়ার পর ১/৩/৪৯ থেকে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রধান ছিলেন শ্রীমতী অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বিপুল বিকাশ সম্ভব হয়েছে সমগ্র বারুইপুরবাসীর আন্তরিক উৎসাহ এবং সহযোগিতায়। তবু তার মধ্যে যে কয়েকজনের নাম অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে তঁরা হলেন – সর্বশ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ নস্কর, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস মারিক, অর্ধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়, পতিতপাবন বসু প্রমুখ।(সূত্রঃ রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবের স্মরণিকা)

এর পরে পরে সমগ্র বারুইপুর অঞ্চলে ক্রমশঃ বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন গোবিন্দপুর জ্ঞানদা দেবী গার্লস হাই স্কুল, চাম্পাহাটি গার্লস হাই স্কুল, মদারাট ঈশান চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সময়ে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এই অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা রচনার শেষে সংযোজিত হয়েছে।

ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বারুইপুর অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় (কলেজ) স্তরের শিক্ষালাভের জন্য এতদঞ্চলে কোনো কলেজ ছিলো না। যাতায়াতের অনেক অসুবিধা সহ্য করে, সময়ের অনেক অপব্যয় ঘটিয়ে তাদের কোলকাতায় যেতে হোতো কলেজে পড়ার জন্য। এসব অসুবিধা যাতে ছেলেমেয়েদের না ভোগ করতে হয় তার জন্য কলেজ স্থাপনের চিন্তা ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেলাম চম্পাহাটির সুশীল কর কলেজ। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর এই কলেজের জন্ম। অল্প ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট। তার মধ্যে ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাও লক্ষণীয়। ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বারুইপুরে একটি কলেজ স্থাপনের ভাবনা এখানকার শিক্ষায় আগ্রহী মানুষজনের মধ্যে ছিল। নানা অসুবিধার জন্য এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রায় কুড়ি বছরের মতো সময় লেগে যায়। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর এই স্বপ্ন সার্থক বাস্তব রূপ পেলো। বারুইপুর আমতলা পথে জোড়ামন্দিরের সন্নিকটে বারুইপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা হোলো। প্রথম শিক্ষাবর্ষে কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল পনেরো, তার মধ্যে দুজন মাত্র মেয়ে, বাকী তেরোটি ছেলে। আর আজ ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ছাত্রের সংখ্যা কলাবিভাগে ৫৬৪ যার মধ্যে ২১২ টি মেয়ে এবং বাণিজ্যবিভাগে ৫০ যার মধ্যে ৫ টি মেয়ে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার চিন্তাও স্বাধীনতার পর থেকেই ক্রমশঃ

প্রসারিত হতে থাকে। তাই প্রধানতঃ মহিলারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে স্থাপন করতে থাকেন মহিলা সমিতি যেখানে মেয়েদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা নিজেরা আয়ের একটি পথ তৈরি করে নিতে পারে। এমনই একটি উদ্যোগের ফলে জন্ম হয়েছিল ধোপাগাছি মহিলা সমিতির।

ধোপাগাছি গ্রামটি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। সেইখানে ১৯৪৮ - ৪৯ সালে গ্রামের দুই বধূ শ্রীমতী মনোরমা চক্রবর্তী ও শ্রীমতী সুশীলা মণ্ডল ছিলেন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা অর্থাৎ U.P পাশ করা মহিলা। এরা গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন মহিলাকে (শ্রীমতী চারুবালা কর, শ্রীমতী রেণুকা হালদার) সাথী করে স্থাপন করেন একটি মহিলা সমিতি । মহিলাদের এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের কিছু সহৃদয় পুরুষ । এদের মধ্যে ছিলেন তারাপদ মণ্ডল, গোলাম হোসেন, ধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও অমর চক্রবর্তী (অধুনা হরিনাভি নিবাসী)। পরবর্তী সময়ে বারুইপুর BDO অফিসে যোগাযোগ করে সমিতিটি সরকারী স্বীকৃতি পায়, নামকরণ হয় ধোপাগাছি মহিলা সমিতি। মনোরমা দেবীর গৃহেই পরিচালিত হোতো সমিতির কাজকর্ম। সমিতির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার পরবর্তীকালে সমিতিকে মাসে কুড়ি টাকা করে সাহায্য মঞ্জুর করেন।

এই সমিতিতে বয়স্ক, কমবয়সী সব বয়সের দুঃস্থ মহিলাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা তো ছিলই; সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার পর নানা ধরণের প্রশিক্ষণ দানের কাজও এখানে শুরু হয় যেমন আসনবোনা, পুঁতির মালা তৈরি, চরকায় সূতো কাটা, পাপোশ তৈরি, তন্দুরি রুটি তৈরি, দরজির কাজ বা টেলারিং, ব্রতচারী, নাচ, গান ইত্যাদি। এমনকি সমিতির মেয়েদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হোতো। দুইজন আমেরিকান সাহেব ঐ সমিতি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। সমিতির কাজকর্ম তাঁদের খুবই ভালো লাগে এবং তাঁরা সমিতিকে একটি শংসাপত্র (Certificate) দেন যেটি এখনও মনোরমা দেবীর বাড়ীতে সযত্নে রাখা আছে। এই সমিতির প্রথম যুগের ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন পদ্ম মণ্ডল, আঙুর মণ্ডল প্রমুখ। (সূত্রঃ মনোরমা চক্রবর্তীর পুত্র তপন চক্রবর্তী ও সুশীলা মণ্ডলের পুত্র কৃষ্ণকালী মণ্ডল)

পূর্বোক্ত সমিতি গঠনের পূর্বে আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ সালে বারুইপুরে একটি অনুরূপ উদ্যোগের সূত্রপাত হতে দেখা গিয়েছিলো শ্রীমতী বীণা সেন চৌধুরীর প্রচেষ্টায়। নবতিপর বৃদ্ধা শ্রীমতী সেন চৌধুরী জানান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কোলকাতা থেকে বারুইপুরে আসেন এবং একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। ঐ সময় সুবুদ্ধিপুর নিবাসী, সদাশয় শ্রী বিষ্ণু দত্ত তাঁর বাড়ীর একটি টিনের ঘর সমিতির কাজের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেন। পঞ্চাশ জন কর্মী নিয়ে ১৯৫৩ সালে সমিতিটি নিবন্ধীকৃত হয় ও নামকরণ হয় বারুইপুর মহিলা সমিতি। সমিতি গঠনের কাজে শ্রীমতী সেন চৌধুরীকে সাহায্য করেন বারুইপুরের বীণা সেনগুপ্ত, সরসীবালা দেব, মালতীপ্রভা দাস, মল্লিকপুরের অরুণা ভৌমিক, জাহিদা খাতুন প্রমুখ মহিলাবৃন্দ। এদের মধ্যে প্রায় সবাই এখন প্রয়াত হয়েছেন। সমিতির কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মেশিনে সেলাই চরকায় সূতোকাটা, বয়স্কদের শিক্ষাদান, বয়স্ক বিধবাদের বিভিন্ন

ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। পঞ্চাশের দশকে এই সমিতিটি বারুইপুর ক্রীড়া সংঘের পিছনদিকে সমিতির নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। পূর্বের সেই কাজের পরিসর এবং গতি অনেকাংশে সীমিত ও স্তিমিত হয়ে এলেও আজও বারুইপুর মহিলা সমিতি তার কার্যধারা অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের অধীনস্থ Training cum fruit proccssing centre বা ফল ও সবজি সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বারুইপুরের মানুষকে বিশেষতঃ মহিলাদের স্বনির্ভরতার একটি নূতন পথের সন্ধান দেয়। সব্জি ও ফলের জায়গা হিসাবে বারুইপুরের প্রসিদ্ধি অনেকদিনের সেই কারণে বারুইপুরে তৈরী হয় এই কেন্দ্র। আনুমানিক ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বারুইপুরের জমিদার রায় চৌধুরীদের গৃহে প্রথম এই কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। পরে ১৯৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে তা স্থানান্তরিত হয় পদ্মপুকুরে, ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রটি সরে আসে ঋ ষি বঙ্কিমনগরের অধুনা ভবনে। এখানে ফলের জ্যাম, জেলি, আচার, সস্, স্কোয়াশ এবং ফল ও সব্জিকে টিনজাত করে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি (Canning) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি বছর ২০ জনের তিনটি করে ব্যাচ প্রশিক্ষণ পায়। এই কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই (প্রধানতঃ মহিলা) আজ আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। (সূত্রঃ Instructor cum Production Officer, Training cum Fruit Processing Centre, Rishi Bankim Nagar, Baruipur)

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং বারুইপুর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় C.D.S (Community Development Scheme) ও D.W.C.U.A. (Development of Women & Children in Urban Area) প্রকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বারুইপুরে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রচলিত আছে। এইসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেক মহিলা অর্থোপার্জন করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

বারুইপুরের নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৯৭৪ -৭৫ সালে। ঐ বছরে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ দপ্তরের অধীনস্থ নেহরু যুবকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের জন্য তিনটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই তিনটির মধ্যে একটি কেন্দ্র খোলা হয় মধ্য সীতাকুণ্ড গ্রামে। এই শিক্ষাক্রম ছিল ছয় মাসের। এই কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বয়স্ক ছাত্রীদের উৎসাহ সে সময় ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোনো কারণেই হোক দুই বৎসর পরে এই কেন্দ্রের সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ কিন্তু তাতে হতোদ্যম হয়ে পড়েন নি। গ্রামেরই সংস্থা 'কর্মী সমাজ' কেন্দ্রটি চালু রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে কিছুকাল চলার পর অবশ্য অর্থাভাবে কেন্দ্রটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। (সূত্র ঃ- শ্রী জীবন মণ্ডল)

এভাবেই একশো, সোয়াশ বছর আগে থেকে বারুইপুরের গ্রামে গ্রামে, কোণায় কোণায় জ্বলে উঠতে শুরু করেছিলো নারীশিক্ষার প্রদীপ। সেই প্রাচীন প্রদীপগুলির অধিকাংশই আজ নিভে গেছে কিন্তু নতুন প্রদীপ জ্বালানোর রসদটি দিয়ে গেছে। একালে নারীশিক্ষার (সাধারণ ও বৃত্তিমূলক উভয়ই) যে বিপুল বিস্তার এতদঞ্চলে আমরা দেখছি, যার সুফল

ভোগ করছি তার গোড়াপত্তন হয়েছিলো প্রাচীন্ কালে গৃহীত ঐ নারীশিক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগুলির মধ্য দিয়ে। তাই অতীতের প্রতিটি উদ্যোগই গুরুত্বপূর্ণ কেননা অতীতের সিঁড়িতে পা রেখেই আসে বর্তমান যার মধ্যে উপ্ত থাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

বারুইপুর থানার অন্তর্গত বালিকা বিদ্যালয়গুলির তালিকা ঃ

বিদ্যালয়ের নাম	স্থাপিত	অনুমোদিত মাধ্যমিক	অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক	বর্তমান ছাত্রী
রাসমণি বালিকা বিদ্যালয় (উঃমাঃ)	১৫/৮/৪৮	১/১/৫৭	১/৭/৭৬	২৩২৭
বারুইপুর গার্লস্ স্কুল (মাঃ)	১৯৫১	১/১/৬৬	—	৯৯৬
চম্পাহাটি গার্লস হাই স্কুল (মাঃ)	—	১/৩/৬১	—	৮১৯
তিলোত্তমা বালিকা বিদ্যালয় দক্ষিণ দুর্গাপুর (উঃ মাঃ)	১৮/৭/৬০	১/১/৬৭	৩০/৫/২০০০	১৩৫০
অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয় সাউথ গড়িয়া (উঃ মাঃ)	১৯৩১	১/১/৬৭	১৯৯৯	৯২৬
ঈশান চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, মদারাট মদারাট অঞ্চল বালিকা বিদ্যাঃ (পূঃনাম)	১৯৬৩	১/১/৬৬	১৯৯৯	১১০০
মল্লিকপুর গার্লস্ স্কুল (মাঃ)	১৯৬৯	১/১/৭১	—	১০৪৮
গোবিন্দপুর জ্ঞানদাদেবী গার্লস হাই স্কুল (উঃ মাঃ)	—	১৯৫১	২০০২	১০০০
পুরন্দরপুর মঠ সমর সাধন নারী শিক্ষায়তন (জুনিয়ার হাই)		১/১/৮০	—	—

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বারুইপুর ও বারুইপুরের সাহিত্যের ধারা

শক্তি রায়চৌধুরী

বারুইপুর নামটি হালের। তার আগেও দক্ষিণবঙ্গের এই স্থানটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু নাম ছিল পৃথক। আটিসা'রা, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, বলবন ইত্যাদি ছোট ছোট জায়গা ঘিরে প্রচুর গ্রামনাম ছিল, সেই নামগুলিকে প্রায় আত্মসাৎ করে বারুইপুর আজ দক্ষিণবঙ্গের একটি উজ্জ্বল স্থান।

মুসলিম আমলে গঠিত ২৪টি পরগণার অন্যতম মেদনমল্ল পরগণার মধ্যে বারুইপুরের অবস্থান। ভারতের মানচিত্রে ভৌগোলিক অবস্থানটি হলো, বিষুবরেখার কৌণিক দূরত্বে অক্ষাংশে-২২° ৩০´ ৪৫´ ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশে ৮৮° ২৫ ৩৫´ ডিগ্রি।

নাম যাইহোক, সুদূর অতীতেও বারুইপুরের অবস্থান ছিল। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও ছিল। গাঙ্গেয় পাললিক মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত বলে এই অঞ্চল নেহাত অর্বাচীন নয়। এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকাতল থেকে দু'হাজার বছরেরও আগেকার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানে যে একদিন লোকবসতি ছিল এবং এস্থান যে নানা দিক থেকে খুব সমৃদ্ধ ছিল, তার প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাগরের মোহনায় অবস্থিত বলে এই অঞ্চল প্রচণ্ড ঝড়ে, তুমুল জলোচ্ছ্বাসে এবং ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে যেমন বারবার ভূগর্ভে বসে গিয়েছে তেমনি হিংস্র জন্তুর আক্রমণে এবং মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে এ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে।

বারুইপুর গ্রামনামটি কতদিনের প্রাচীন, সঠিকভাবে সেকথা বলার উপায় নেই। এই স্থাননামটি প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রীঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই (চক্রবর্তী)-এর 'মনসাবিজয়' কাব্যে –

> "কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পূজিয়া।
>
> চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
>
> ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
>
> বাহিল বারুইপুর মহাকোলোহলে।।"

এরপর এই অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে, ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল –

> "হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে ।
>
> উত্তরিলা আসি আটিসারার নগরীতে।।
>
> সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
>
> আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্তনাম।।"

আটিসারা গ্রামে শ্রী অনন্তঠাকুরের গৃহটি বর্তমানে বারুইপুর পুরাতন বাজারের কাছে ৮ নং ওয়ার্ডের শাঁখারীপাড়ায় অবস্থিত।

১৫৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ-এর ভিতর রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই অঞ্চলের কিছু গ্রামনামের উল্লেখ আছে –

"তীরের প্রয়াণ যেন চলে তরীবর।

তাহার মেলানি বাহে মাইনগর।।

বৈষ্ণবঘাটা নাচনগাছা বামদিকে থুইয়া।

দক্ষিণে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া।।

ডাহিনে মেদনমল্ল বামে বীরখানা।

কেটুয়ালের কটকটি নদী জুড়্যাকেনা।।"

উপরোক্ত কাব্য থেকে আমরা নাচনগাছা ও মেদনমল্ল পরগণার অবস্থান জানতে পারি। নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৭৬ থেকে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেছিলেন 'রায়মঙ্গল' কাব্যটি। এই কাব্যেও ও অঞ্চলের গ্রামনামের উল্লেখ আছে –

"অকুল পবনে ডিঙ্গা চলিন গুনধাম।

পূজিয়া কল্যানপুর প্রভু বলরাম।।

গগনে আওয়াজে হয় মহা কুতুহলে।

তাহার মেলান গেল ডিহি মেদনমল।।"

রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল অষ্টাদশ শতকের রচনা। গ্রন্থটি খণ্ডিত । গ্রন্থে রায় গাজী যুদ্ধ, বতা বাউলের কাহিনী ও পুষ্পদেব বণিকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পুষ্পদত্ত বণিকের বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে এসেছে এই অঞ্চলের গ্রামনাম ঃ-

"কল্যানপুরে পূজিয়া করি মকয় স্নান।

শিঙ্গাকিড়া বাদ্যে শবদ তৎপার।।

বারিপুরি বিশালক্ষ্মী পুজি কুতুহলে।।"

দ্বিজ রঘুনন্দনের পঞ্চাননমঙ্গল রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই কাব্যে পঞ্চানন ঠাকুরের 'বারাঝারা' আনার জন্য রাজপুত্র গুণবীর যাত্রা করেছে নৌ-পথে অমূল্যপাটনে এই বারুইপুর গ্রাম অতিক্রম করে –

"বাহ বাহ বলে তবে রাজার নন্দন।

বোড়ালের ত্রিপুরার বন্দিল চরণ।।

বোড়ালের ত্রিপুরার চরণ বন্দিয়া।

বাঁকুইপুরেতে শিশু উত্তরিল গিয়া।।

বিশালনয়ণী তারে চরণ বন্দিয়া।"

১৭২৬ খ্রীঃ কবি অযোধ্যারাম রচনা করেন 'সত্যপীরের পাঁচালী'। এই কাব্যে রত্নাকর সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে এই অঞ্চলের গ্রামনাম এসেছে –

"সাকু বানুমরে ভাঁটা বাইল বৈষ্ণবঘাটা।

বারুইপুর করিল পশ্চাৎ।।

বারাশত গ্রামে গিয়া নানা উপাচার দিয়া

পূজা দৈল অনাদি বিশ্বনাথ।।"

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার পুরাতনী মঙ্গল-কাব্যগুলিতে এইরূপ ভাবে স্থান করে নিয়েছে বারুইপুর। যে কোন দেশের প্রবহমান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হল সেই দেশের সাহিত্য সৃষ্টি। যুগোপযোগী নব চেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ ও প্রচারের জন্য সাহিত্য একটি সর্বোৎকৃষ্ট সহজসাধ্য উপায়। স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে কুমারটুলীর এক স্বদেশী সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একটি কবিতায় বলেছিলেন —

"বাঙ্গালীর আছে ইতিহাস

বাঙ্গালীর আছে ভবিষ্যৎ"।

অথচ আমাদের সেই ইতিহাস কেউ রচনা করে যায়নি। তাই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন — "আমরা ইতিহাস বিমুখ আত্মবিস্মৃত জাতি"। এই আক্ষেপ কতটা বাস্তব সত্য তা বুঝতে পারি যখন আমরা বাংলা গ্রন্থজগৎ বা পত্রপত্রিকা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি অর্থাৎ সাহিত্যের সর্ব-বিভাগে। অথচ বাল্মীকি থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলের সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল আত্মপ্রকাশে। আরো সাদা বাংলায় আত্মপ্রচার। সেই ইতিহাস কেন থাকবে না?

বাংলাভাষার জন্ম কবে হয়েছিল তার সঠিক সাল, তারিখ নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। সাহিত্য ভূগোলের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে আর যাইহোক সাহিত্য বিচার অচল। তবে এমন এক প্রসঙ্গের উত্থাপন কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। উত্তরে বলা যায়, যে অঞ্চলে বাসস্থান বা জন্মস্থান সেই স্বল্প আয়তন স্থানের সাহিত্যসাধকদের আবির্ভাব ও অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্তের স্পষ্ট তিনটে ভাগ আছে। আদি, মধ্য ও আধুনিকযুগ। আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও বারুইপুরের অবদান আছে। আর আধুনিক যুগে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বইএর দোকানে বারুইপুরের সাহিত্যসাধকদের সৃষ্টি মহাসমারোহে প্রদর্শিত। বাংলা দেশের

শ্যামল মাটি যেমন ভাবপ্রবণ বাঙালীর জন্ম দিয়েছে, তেমনি যুগ যুগ ধরে বিশাল আর বিপুল সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেছে। দীনেশ সেন বলেছেন – ''বাংলা দেশের এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে দু'একজন কবির সন্ধান পাওয়া যাবে না।'' কেবল কবিতাই নয়, সাহিত্যের প্রতিটি দিকেই এই প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে বা হয়েছিল। বারুইপুরও এর ব্যতিক্রম নয়। আমরা এখানে বারুইপুরে বসবাসকারী কবি, গল্পকার, ছড়াকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিকদের যেমন পরিচয় দেবো তেমনি সাহিত্যের অপরদিক পত্রপত্রিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

বিশিষ্ট পুঁথিবিশারদ অক্ষয়কুমার কয়াল 'আদিগঙ্গা' পত্রিকায় রাজারাম দাসের 'ধর্মের গীত' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখান থেকে আমরা তিনশো বছর আগে বারুইপুর থানার শিখরবালী গ্রামের এক কবির সন্ধান পাই। কবির নাম রাজারাম দাস । রাজারাম শোভা সিংহের রাজত্বকালে 'নারায়ণী মঙ্গল' রচনা করেন। 'ধর্মের গীত রচনা' নিম্নলিখিত শকে –

'পক্ষ পক্ষ রস মহী শক সম্বৎসর

বাদশা অরঙ্গাশাহী দিল্লীর ঈশ্বর।'

(পক্ষ– দুই । রস-ছয় । মহী-এক; অঙ্কস্যবামা গতিতে)

১৬২২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত – আজ থেকে ৩০৩ বছর আগে বারুইপুরে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সন্ধানপ্রাপ্ত বারুইপুরে প্রকাশিত মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে নবগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতীর অনুবাদই সবচেয়ে প্রাচীন। সুকুমার সেন তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন 'মেদনমল্ল পরগণায় ' আধুনাতম ২৪পরগণা জেলার বারুইপুর চৌকির ভিতরে নবগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত [illegible]র্গা সপ্তশতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৯৫ শকাব্দে পদটিকায় তিনি বলেন –

''শাকে শর নবগ্রহে সুখেন্দু মনোনে

দেবীর মাহাত্মকথা রহিল ইহাতে।''

মুখ – ৬ , শাকে স্থানে – 'সালে ধরিলে ১১৯৫ হয়। ইহাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।

১৮৪২ সালে ২৩শে জুলাই বারুইপুর থানার শাসন গ্রামে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬২খানা বই যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি বিদূষক, পূর্ণশশী নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাইশ বৎসর তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সহসম্পাদনা করেন। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক বসুমতীও প্রকাশিত হয়। রহস্য সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বাংলা ইতিহাস তাঁর অমর কীর্তি। কিছুদিন তিনি বারুইপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমাশাসক হিসাবে ৯ই মার্চ, ১৮৬৪ থেকে ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত বারুইপুরে বসবাস করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখানে তিনি

রচনা করেন 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। বাংলার নবজাগরণের জনপ্রিয় পুরুষ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি বারুইপুর থানার নবগ্রাম নামক স্থানে। বাংলাসাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের আলোচনা করার পর আধুনিক সাহিত্যে বারুইপুরের অবস্থানটা এবার আলোচনা করবো।

প্রবীণ প্রয়াত পালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মাহুতি, ধর্মবল, চক্রছায়া, পলাশী পারে প্রভৃতি ২০টি নাটক তিনি রচনা করেন। বঙ্কিমকাহিনীর প্রথম যাত্রার নাটক তিনি লিখে কৃতিত্ব দেখান। চিৎপুরে যাত্রা জগতে সৌরীন্দ্রমোহনই প্রথম যাত্রাকে আধুনিক রূপদান করেন। বাংলা যাত্রা জগতে সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এক স্মরণীয় নাম। তাঁর যোগ্য ছাত্র সজল রায়চৌধুরী বাংলা নাট্যজগতে আজ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি শুধু নন, গণনাট্য আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতাও ছিলেন বটে। তাঁর গণনাট্য কথা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নাট্যকার প্রসাদ ভট্টাচার্যও বারুইপুরের নাগরিক। ইতিমধ্যে তিনি বাংলা যাত্রা জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্যকার। এছাড়াও বারুইপুরে বসবাস করেছেন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় – যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। আজ বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু আলোচিত তাঁর নাম। প্রাবন্ধিক শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায় আজ আর বারুইপুর বা জেলার প্রাবন্ধিক নন, তিনি বাংলার বিদগ্ধ সমাজে এক প্রতিষ্ঠিত লেখক বটে। শিশির বসুর গবেষণাধর্মী লেখা 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' নামক গ্রন্থ; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে বইটির গুরুত্ব।

প্রাবন্ধিক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী বাংলা লোকসংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাঁর লেখা 'মদনপালা' যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত প্রবন্ধ। এছাড়াও প্রাবন্ধিক সন্তোষকুমার দত্ত, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ডঃ দেবব্রত নস্কর, ডঃ শংকরপ্রসাদ নস্কর, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, পূর্ণেন্দু ঘোষ, সাগর চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ কুমুদরঞ্জন নস্করের গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাংলার পাঠক সমাজে সমাদৃত। এঁদের বইগুলি কলেজ স্ট্রীটের পাশাপাশি বইয়ের দোকানে বিক্রিত। জয়কৃষ্ণ কয়াল আজ আর বারুইপুরের গল্পলেখক নন। তাঁর গল্পগুলি আজ বাংলাসাহিত্যে আলোচিত গ্রন্থ তালিকায় নিজগুণে স্থান করে নিয়েছে। যেমনি পূর্ণেন্দু ঘোষ-এর গল্প বহু সমাদৃত হয় পাঠক সমাজে তেমনি প্রয়াত পূর্ণেন্দু ভৌমিক, রঞ্জন দত্তরায়, মানিক দাস, রণজিৎ পাল ও নরনারাণ পুতুতুণ্ডুর গল্প সংকলনগুলি স্থান করে নিয়েছে বইপাড়ায়– কলেজ স্ট্রীটে। কেউ কেউ সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশে কবিতা লিখলেও বারুইপুরের ভূমিপুত্র হিসাবে বাংলাসাহিত্যে তিন প্রতিষ্ঠিত কবিকে আমরা পাই – যথাক্রমে বাংলাসাহিত্যের সনেটের লেখক কবি উত্তম দাশ, কবি পরেশ মণ্ডল ও কবি মৃত্যুঞ্জয় সেনকে।

কবি উত্তম দাশ জীবন ও শিল্পকে পৃথক দেখতে চাননি বলেই শিল্পের সঙ্গে জীবনকে চিরকাল একই সূত্রে অঙ্গীভূত করতে চান। কবির উচ্চারণ তাই "তুমি যে শিল্পের কথা বলতে তার উৎস বা বেদনার সঙ্গে / তোমার কি যথার্থ কোন যোগাযোগ আছে ...।" এই জিজ্ঞাসাই কবিকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়।

কবি পরেশ মণ্ডল দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা'

উল্লেখ্য, সমস্ত জীবন ধরে যে-কবির মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না পাঠকদের। আসলে তাঁর কবিতায় মৃত্যু যে জীবনের সৃষ্টি, তা বোধ হয় তাঁর কবিতা পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত।

কবি মৃত্যুঞ্জয় সেন দীর্ঘদিন ধরে লিখে চলেছেন কবিতা। 'ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর, প্রার্থনা, তিনি ছুঁলে, মানুষ হয়েছি বলে, বুলুদি ও আমি কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর সম্পর্কে বলে দেয় কবিমন বড় স্পর্শকাতর। এছাড়াও বাংলা কবিতা জগতে অনেকেই ভালো কবিতা লিখেছেন।

বারুইপুরে বসবাসকারী তপন গায়েন, সুনীল দাশ, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সৌরেন বসু, স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়, ভগীরথ মাইতির নাম উল্লেখ করতেই হয়। তরুণ প্রজন্মের কবি জয়দীপ চক্রবর্তী, তৃষ্ণা ভট্টাচার্য (বসাক)-রা ইতিমধ্যে কলেজস্ট্রীট বইপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত। শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে ছড়া মানুষের ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ, মুক্তির স্বাদ। নয়ের দশকের প্রথম থেকে ছড়ার জগতে বারুইপুরের নাম আলোচিত হয়। ছড়াকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায় থাকেন সাউথ গড়িয়ায়। ছড়ার হাত খুবই সুন্দর। হান্নান আহসান বয়সে তেমন প্রবীণ নাহলেও ছড়ার জগতে অনেকই প্রবীণ, এই ছড়াকারও বসবাস করেন বারুইপুরে। ছড়াতে সুন্দর হাত, লেখেনও ভালো ছড়াকার আনসার-উল-হক। কবি মনোরঞ্জন পুরকাইতের নাম বাদ দিয়ে আজ আর বাংলা ছড়া জগতের কথা চিন্তা করা যায় না। সুন্দরবনের জীব ও জীবমণ্ডলকে নিয়ে মূলত তাঁর চিন্তাভাবনা। সুন্দরবনের ফেলে আসা দিনগুলি তাঁর ছড়ায় স্থান পায় সহজেই। তিনি সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। ছড়াশিল্পী মনোরঞ্জন পুরকাইত, আনসার-উল-হক, হান্নান আহসানরা আজ বাংলা ছড়াজগতে স্বগুণে প্রতিষ্ঠিত। নতুন প্রজন্মের বারুইপুরে ছড়া লিখছেন। বিশ্বনাথ রাহা, কাশীনাথ ভট্টাচার্য, মানস চক্রবর্তী পঙ্কজ ব্যানার্জীর ছড়ার হাত খুবই মিষ্টি।

দেশে যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় চলে তখন সাংবাদিকদের একটা ভূমিকা নিতে হয়। সাহিত্য-সাংবাদিকতা হলো একটা দিক। সাংবাদিকদের অনেকেই লিট্‌ল্ ম্যাগে তাঁদের জীবন শুরু করেছিলেন গল্প, কবিতা দিয়ে।

বারুইপুরে যে কজন সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত তাঁরাও একই পথের পথিক। কবি শিখর রায় আজ কবিতা লেখেন কম। আকাশবাণীর এফ.এম.তরঙ্গ-এর সাথে যুক্ত। কবি শমীক ঘোষ-এর কবিতা আর দেখা যায় না। তিনি নিজে কর্মসংস্থান ও সাফল্য নামক দুটি পত্রিকার পরিচালক। এমন কবি জয়ন্ত দাসের কবিতা বা ছড়া কখনসখন চোখে পড়লেও মূলত আনন্দবাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সময় পান কম। তরুণ কবি কৃষ্ণকুমার দাস সংবাদ প্রতিদিন-এর নিজস্ব সাংবাদিকতা করে আর কাব্যরচনার সময় পান না। এঁরা সকলেই আজ প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমে বহু পিরিচিত।

আমরা বারুইপুরের কবি সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় করার পর সাহিত্যের আর এক ধারা ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের বারুইপুরে 'রেজিস্টার্ড' পত্রপত্রিকার চেয়ে 'আন-রেজিস্টার্ড' পত্রপত্রিকার সংখ্যা অনেক বেশী। তাছাড়া যেসব পত্রপত্রিকা বারুইপুর

থানা থেকে বেরিয়েছে তাদের অধিকাংশের আয়ু অতি স্বল্প। এই স্বল্পায়ু পত্র-পত্রিকার তালিকা পাওয়া বা সংরক্ষণ করা আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, আজ থেকে ১৩২ বছর আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা বিদূষক পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে বারুইপুরের লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বহু অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই তালিকা। এই তালিকা একেবারে নির্ভুল তালিকা তাও দাবী করছি না। এখন পর্যন্ত ১২৮টি পত্রিকার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, কিছু পত্রিকার প্রকাশকাল জানা নেই, সেই তথ্যও দিলাম। এছাড়াও হাতে লেখা পত্রিকারও অভাব নেই। নবারুণ, প্রগতি, শিখা, কিশলয়, মৈত্রী, অঞ্জলিকা, বাণী, জাগৃতি, লিপিকা, ফরমান সেই ধারা বেয়ে চলছে। পরিশেষে নিবেদন এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কিছু পত্রিকার নাম বাদ গিয়ে থাকে তবে ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা আকাদেমির পরিচালনায় সরকারী উদ্যোগে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের মেলা হচ্ছে। প্রথম বছর থেকেই বারুইপুরের পত্রিকার মধ্যে মহাদিগন্ত, লাল পলাশ, দিবারাত্রির কাব্য ও আদিগঙ্গা উল্লেখযোগ্য। আরো উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা আকাদেমি এই উপলক্ষ্যে সেরা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করে থাকেন। আর প্রথম বছর এই পুরস্কার জিতে নেয়। আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত দিবারাত্রির কাব্য। কলিকাতা বইমেলা ভারতবর্ষে সব থেকে বড় বইমেলা। এখানে পাঠক সমাগম বছরের পর বছর রেকর্ড সৃষ্টি করে। এইরূপ আন্তর্জাতিক খ্যাত বইমেলাতেও বারুইপুরের মহাদিগন্ত। দিবারাত্রির কাব্য, আদিগঙ্গা ও ছোটদের সোনারকেল্লা, অভিযাত্রী, নাগরিক, গণিত অন্বেষা ইত্যাদির উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

তালিকা

ক্রমিক	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
১)	বিদূষক	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বারুইপুর	১৮৭০
২)	আর্যোদয়	প্রিয়নাথ গুপ্ত	বারুইপুর	১৮৭১
৩)	বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব	ডাঃ পূর্ণেন্দু দাস	বারুইপুর	১৮৭১
৪)	পূর্ণশশী	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বারুইপুর	১৮৭৩
৫)	কালবৈশাখী	শরৎ বিশ্বাস	বারুইপুর	১৯২৩
৬)	অগ্নিশিখা	অজ্ঞাত	বারুইপুর	১৯৩৩
৭)	সংযম	সজল রায়চৌধুরী	বারুইপুর	১৯৫৩
৮)	বন্ধু	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী/নিখিলরঞ্জন ধর	বারুইপুর	১৯৫৬
৯)	মৈত্রী	ডাঃ বিমল নস্কর/নিখিলেশ ঘোষ	বারুইপুর	১৯৬৫
১০)	হোমিওপ্যাথ	ডাঃ শরৎ বিশ্বাস	বারুইপুর	১৯৫৭
১১)	সোমপ্রকাশ	ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য/ সজল রায়চৌধুরী	বারুইপুর	১৯৫৮
১২)	২৪ পরগণার ডাক	শংকর বসু	বারুইপুর	১৯৫৮
১৩)	সবুজ পত্র	—	সাউথ গড়িয়া	১৯৫৯
১৪)	বহ্নিশিখা	উত্তমকুমার দাস	শাসন	১৯৫৯
১৫)	পিয়ালী	দেবপ্রসাদ ঘোষ	রামনগর	১৯৫৯

১৬)	পল্লীশিখা	অবনী রায়	বারুইপুর	১৯৬৩
১৭)	ভাস্বর	গোপেশ পাল	বারুইপুর	১৯৬৬
১৮)	পুষ্পাঞ্জলি	বি.এল.নস্কর/দুলাল বৈদ্য	বারুইপুর	১৯৭০
১৯)	সোপান	সূর্যকান্ত বসু	বারুইপুর	১৯৭০
২০)	দ্বিধারা	রণজিৎকুমার মজুমদার/পাঁচুগোপাল রায়	বারুইপুর	১৯৭০
২১)	সকাল সন্ধ্যাবেলা	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৭১
২২)	রূপবতী	গৌতমকুমার চক্রবর্তী	চম্পাহাটী	১৯৭১
২৩)	গাঙ্গেয়	শিখর রায়	বারুইপুর	১৯৭২
২৪)	অনন্য	শান্তি ব্যানার্জী	বারুইপুর	১৯৭৩
২৫)	সাধনা	নরনারায়ণ পূততুণ্ড	বারুইপুর	১৯৭৩
২৬)	অরুণোদয়	জীবনকুমার মণ্ডল	সীতাকুণ্ড	১৯৭৪
২৭)	কথক	দুলাল বৈদ্য	উকিলপাড়া	১৯৭৪
২৮)	সূর্য্যপুর হাট	অশ্বিনীকুমার মাইতি	সূর্য্যপুর	১৯৭৪
২৯)	সিম্বল	নরনারায়ণ পূততুণ্ড	চাম্পাহাটি	১৯৭৪
৩০)	মহাদিগন্ত	উত্তমকুমার দাস	বারুইপুর	১৯৭৫
৩১)	দেশিক	নারায়ণ পূততুণ্ড	চম্পাহাটি	১৯৭৫
৩২)	পদাতিক	অসিত গুহঠাকুরতা	বারুইপুর	১৯৭৫
৩৩)	এখন	শমীক ঘোষ / শিখর রায়	বারুইপুর	১৯৭৫
৩৪)	অনুশীলন	গুরুপ্রসাদ বসু/রণজিৎকুমার মজুমদার	বারুইপুর	১৯৭৬
৩৫)	পল্লীভাষা	অবনীচন্দ্র সরদার	বারুইপুর	১৯৭৬
৩৬)	কোহরা	তপন ঘোষ	বারুইপুর	১৯৭৬
৩৭)	অবহি	তপন চট্টোপাধ্যায়	বারুইপুর	১৯৭৬
৩৮)	স্বরাজ	দেবপ্রসাদ ঘোষ	বারুইপুর	১৯৭৭
৩৯)	বান্ধব	শ্যামল মুখোপাধ্যায়	বারুইপুর	১৯৭৭
৪০)	লোক স্বরাজ	শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়	বারুইপুর	১৯৭৭
৪১)	কালবৈশাখী (নবপর্যায়)	বাসুদেব বিশ্বাস	বারুইপুর	১৯৭৮
৪২)	শনিবারের আড্ডা	শিখর রায় /শমীক ঘোষ	বারুইপুর	১৯৭৮
৪৩)	শরৎ	বাসুদেব বিশ্বাস	সুবুদ্ধিপুর	১৯৭৯
৪৪)	বিপ্রতীপ	রাজাগোবিন্দ ঘোষাল	সাউথ গড়িয়া	১৯৭৯
৪৫)	অনু	সলিল চক্রবর্তী	কালিকাপুর	১৯৮১
৪৬)	ছড়া দিলেম ছড়িয়ে	হান্নান আহসান	বারুইপুর	১৯৮১
৪৭)	সুচয়নী	বাণীকুমার রায়	বারুইপুর	১৯৮১
৪৮)	দিক-দিগন্ত	এম. এ. মান্নান	বারুইপুর	১৯৮১
৪৯)	প্রচয়	শ্রীধর মুখোপাধ্যায়/দেবযানী চট্টোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫০)	লোনা ঝড়	সলিল ঘোষাল	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫১)	দেবযান	সন্তোষকুমার দত্ত	বারুইপুর	১৯৮৩
৫২)	চালচিত্র	তাপস দে	বারুইপুর	১৯৮৩
৫৩)	মেদনমল্ল সংবাদ	দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়/প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫৪)	অনার্য সাহিত্য	শ্রীধর মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫৫)	কাছাকাছি	তুষার মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫৬)	সাগ্নিক	বিশ্বনাথ রাহা	বারুইপুর	১৯৮৫
৫৭)	মঞ্জরী	গৌতম রায়	বারুইপুর	১৯৮৫

৫৮)	রুথযুক	দেবাশিষ চট্টোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮৫
৫৯)	ছড়া দিলাম ছড়িয়ে	হান্নান আহসান	বারুইপুর	১৯৮৫
৬০)	উদীরণ	ছত্রধর দাস	বারুইপুর	১৯৮৬
৬১)	রানার	রবিশংকর মণ্ডল/আফিফ ফুয়াদ	চম্পাহাটি	১৯৮৬
৬২)	আবাদের দিন	প্রদীপ মুখোপাধ্যায় /স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু ঘোষ	চম্পাহাটি	১৯৮৭
৬৩)	বিবেক	সুপ্রিয়কুমার পাল	মদারাট	১৯৮৮
৬৪)	সূর্যাবর্ত	আনসার উল হক	পদ্মপুকুর	১৯৮৯
৬৫)	আল মাহামুদ	মহম্মদ নাসিরুদ্দিন	সূর্য্যপুর	১৯৮৯
৬৬)	নাগরিক	তপন গায়েন/নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	পুরন্দরপুর	১৯৯০
৬৭)	অভিমুখ	নভীশ বাণীকণ্ঠ	চম্পাহাটি	১৯৯০
৬৮)	কন্যাকুমারিকা	সুব্রতশোভন দাস	পুরন্দরপুর	১৯৯০
৬৯)	ভারতশৈলী	নির্মলকুমার বিশ্বাস	বারুইপুর	১৯৯০
৭০)	কোরক	শান্তনু নন্দী / তুষার সরকার	বারুইপুর	১৯৯০
৭১)	সবিতৃ	চঞ্চল মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৯১
৭২)	অন্তঃসার	আশিষ সরদার	সাউথ গড়িয়া	১৯৯১
৭৩)	দিবারাত্রির কাব্য	আফিফ্ ফুয়াদ	চম্পাহাটি	১৯৯২
৭৪)	সুন্দরবন সংবাদ	শ্যামল রায়চৌধুরী	জি.বোস কলোনী	১৯৯২
৭৫)	ছোটদের সোনারকেল্লা	মনোরঞ্জন পুরকাইত	বারুইপুর	১৯৯৩
৭৬)	অন্বীক্ষা	ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক/নির্মল ব্যানার্জী	বারুইপুর	১৯৯৩
৭৭)	উৎসাভাস	রাজ দেবজিৎ মিত্র, জয়দীপ চক্রবর্তী	বারুইপুর	১৯৯৩
৭৮)	গাথা	সৃজন পাল	উকিলপাড়া	১৯৯৩
৭৯)	দর্পণ	বিপদবারণ সরকার/শম্ভুনাথ ঘরামী	উকিলপাড়া	১৯৯৫
৮০)	বিস্মন	কমল দাস	দুর্গাপুর	১৯৯৪
৮১)	নববিবেক বার্তা	অহীন কাঞ্জিলাল	চম্পাহাটি	১৯৯৪
৮২)	পূর্বেদ	সুদীপ্ত সরকার	চম্পাহাটি	১৯৯৪
৮৩)	লাল পলাশ	মনোরঞ্জন পুরকাইত	বারুইপুর	১৯৯৫
৮৪)	আলোড়ন	ইমান বাগানী	বারুইপুর	১৯৯৫
৮৫)	সুচেতনা	তনুশ্রী রায়	চম্পাহাটি	১৯৯৫
৮৬)	আকাশলীনা	সন্দীপ বসু /অরিন্দম বসু	বারুইপুর	১৯৯৬
৮৭)	ঋত	অভিষেক ঘোষ	সুবুদ্ধিপুর	১৯৯৬
৮৮)	গণিত অন্বেষা	আব্দুল হালিম সেখ	কুমারহাট	১৯৯৬
৮৯)	সময়কাটানো	নরনারায়ণ পূততুণ্ড	চম্পাহাটি	১৯৯৬
৯০)	গ্র থন	ইন্দ্রাণী ঘোষাল	সাউথ গড়িয়া	১৯৯৭
৯১)	সুচেতনা নবচেতনা	তনুশ্রী রায়	চম্পাহাটি	১৯৯৬
৯২)	ঢিল	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৯৭
৯৩)	গঙ্গা মহানন্দা	তপন গায়েন	বারুইপুর	১৯৯৭
৯৪)	খোঁজ	রাজু দেবনাথ	সাউথ গড়িয়া	১৯৯৭
৯৫)	আলপথ	হান্নান আহসান	বারুইপুর	১৯৯৭
৯৬)	চুয়াত্তরের পথে পথে	পাঁচুগোপাল রায়	ছয়ানী	১৯৯৭
৯৭)	চেতনা	সুকুমার মণ্ডল	রাজগড়া	১৯৯৭
৯৮)	আলোর পাখি	কাশীনাথ ভট্টাচার্য	ব্যানার্জীপাড়া	১৯৯৭

৯৯)	আদিগঙ্গা	শক্তি রায়চৌধুরী	বারুইপুর	১৯৯৮
১০০)	নীলাকাশ	দেবাশীষ ঘোষ	আটঘরা	১৯৯৮
১০১)	কথানক	অংশুদেব / রবীন রায়	–	–
১০২)	অভিযাত্রী	মানিক দাস	বারুইপুর	১৯৯৮
১০৩)	ভোরের ট্রেন	সুবলসখা চক্রবর্তী	বারুইপুর	১৯৯৮
১০৪)	পরিকথা	দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৯৮
১০৫)	জনজীবন	গোবিন্দ সরকার	বারুইপুর	১৯৯৮
১০৬)	শব্দাঞ্জলি	অরুণোদয় সরকার	বারুইপুর	১৯৯৮
১০৭)	শারদার্ঘ্য	তপতী মজুমদার	বিশালক্ষিতলা	১৯৯৯
১০৮)	মন-লোক	পূজন চক্রবর্তী / উৎপল পাল	চম্পাহাটি	১৯৯৯
১০৯)	একবিংশতির আলো	মঃ আব্দুল মান্নান	বারুইপুর	১৯৯৯
১১০)	পদ্যচর্চা	শুভ্রাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় / শুভ চট্টোপাধ্যায়		
		প্রসূন মজুমদার	বারুইপুর	১৯৯৮
১১১)	ডানা	নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	২০০০
১১২)	হিং-টিং-ছট	নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	২০০০
১১৩)	জন্মভূমি দর্পণ	শুভময় মিত্র	বারুইপুর	২০০০
১১৪)	সেরা খবর	গোবিন্দ সরকার/সৈকত হালদার	বারুইপুর	২০০০
১১৫)	পাঞ্চজন্য	ছত্রধর দাস	পুরন্দরপুর	জানা নেই
১১৬)	ঋতুপত্র	শিশির চক্রবর্তী	নতুনপাড়া	জানা নেই
১১৭)	ত্রিধারা	রণজিৎ মজুমদার/পাঁচুগোপাল রায়	নিরালা রোড	জানা নেই
১১৮)	সুচেতনা	পুলিনবিহারী মণ্ডল	স্টেশন রোড	জানা নেই
১১৯)	উদয়ন	পঙ্কজকুমার দাস	জয়কৃষ্ণ নগর	জানা নেই
১২০)	বন্দনা	ইমাম বক্স	বারুইপুর	বারুইপুর
১২১)	ঋত্বিক	সুব্রত মুখোপাধ্যায়	বারুইপুর	জানা নেই
১২২)	সাহিত্যমেলা	পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য	বারুইপুর	জানা নেই
১২৩)	আমাদের দিন	সলিল চক্রবর্তী	বারুইপুর	জানা নেই
১২৪)	কুহেলী	নীলিমা নস্কর	চম্পাহাটি	জানা নেই
১২৫)	কৃষ্টি	অনিল ঘোষ	বারুইপুর	জানা নেই
১২৬)	ছড়াকাশ	টিউলিপ গায়েন	বারুইপুর	১৯৯৮
১২৭)	নাগরিক রুটিন পত্রিকা	পাভেল গায়েন	বারুইপুর	১৯৯৪
১২৮)	কৃষ্টিমন	গোপেশ পাল	বারুইপুর	২০০০
১২৯)	ভোর	মানস চক্রবর্তী	বারুইপুর	২০০১
১৩০)	রূপসী বাংলা	কাশীনাথ ভট্টাচার্য	বারুইপুর	২০০৩
১৩১)	প্রতিবিম্ব	অলোক চক্রবর্তী	বারুইপুর	২০০৩
১৩২)	উজ্জ্বণী	শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	রামধারী/বারুইপুর	২০০৪

তথ্যসূত্র ঃ

১) বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন।
২) অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ।
৩) প্রভাত ভট্টাচার্য ।
৪) লিটিল ম্যাগাজিন-এর তথ্যপঞ্জি – গীতা মুখোপাধ্যায়

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনায় বারুইপুর

সন্তোষকুমার দত্ত

তৈরী-করা শহর আর হয়ে ওঠা গ্রামের পার্থক্য অনেকখানি, যেমন শহর কলকাতার সঙ্গে বারুইপুরের। গ্রামীণ সংস্কৃতির বনিয়াদ তৈরি হয়েছে গ্রামের মানুষের প্রাণ-রসে, আর শহরের সংস্কৃতির নেপথ্যে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে বসবাস-করা মানুষের অবদান। অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত নিতান্ত অসঙ্গত নয়। প্রথম – হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামের রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বারুইপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতি শহর থেকে আমদানী করা নয়, তার সঙ্গে মাটির সম্পর্ক নিবিড়। বর্তমান আলোচনা তারই রেখাচিত্র।

সাহিত্য সৃষ্টিতে বারুইপুরের ইতিবৃত্ত রচনা সহজ নয়, কারণ যে-সংস্কৃতি মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, তাকে মাটি থেকে তুলে আলাদা করে দেখানো কঠিন। তবু তা করতে গিয়ে প্রায় দু'শতক আগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রায় মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা যায় যখন বারুইপুর সংলগ্ন শাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২--১৯১৬) । তাঁর গদ্য রচনা সমাজ কুচিত্র, হরিদাসের গুপ্তকথা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কথিত আছে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অসম্পূর্ণ 'মায়াকানন' নাটকখানি সম্পূর্ণ করেন। ভূবনচন্দ্র একসময় 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং 'বসুমতী' ও 'জন্মভূমি' কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

প্রায় সমসাময়িককালে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখি, যিনি বারুইপুর মুন্সেফ আদালতের বিচারক হিসাবে পাঁচ বছরের অধিককাল এখানে অবস্থান করেছিলেন (১৮৬৪-৬৯)। বারুইপুরের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিতান্ত অল্প নয়। এখানে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা শেষ করেন এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৬৫)। এই সময় থেকেই তাঁর উপন্যাসের ধারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে।

অতঃপর নাট্যকার হিসাবে পরিচিত সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্মর্তব্য। তাঁর নাটকের আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তিনি যে গল্প-কথিকা-প্রবন্ধ রচনায় সুলেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর 'পিয়াসী' নামে একটি কথিকা এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় ঐ 'কল্লোলেই' একটি গল্প প্রকাশিত হয়, নাম – 'চলে নাগরী কাঁখে গাগরী'। এছাড়া ঐ পত্রিকাতেই তাঁর একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' নামে সৌরীন্দ্রমোহনের একটি প্রবন্ধ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার 'ধূপছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুবক্তা, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সাথে সমাদৃত। এপ্রসঙ্গে ক্ষিতিপ্রসাদ দাস ও দেবপ্রসাদ ঘোষ-এর নামও শ্রদ্ধা সাথে উচ্চারিত হয়।

এরপর 'সোমপ্রকাশ' (নবপর্যায়) পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত দঃ

২৪ পরগণার লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই অঞ্চলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সুশীল বাবুর 'রবি প্রদক্ষিণ' নামে একখানি গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত। কালিদাস দত্তের দঃ ২৪ পরগনার লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি দুটি খণ্ডে সম্পাদনা করেছেন ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ও হেমেন মজুমদার।

নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে সজল রায়চৌধুরীও সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

লোকসাহিত্য সম্বন্ধীয় রচনায় অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অমরকৃষ্ণের 'মদনপালা' বিখ্যাত। লোকসাহিত্য কর্মী হিসাবে কৃষ্ণকালী মণ্ডল, কালিচরণ কর্মকার এবং দেবব্রত নস্করের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকালী মণ্ডলের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়'; 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা,' 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ', পুরাতত্ত্বে বারুইপুর, সাগরদ্বীপের অতীত, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুরাকথা প্রভৃতিগ্রন্থ; ডঃ কালিচরণ কর্মকারের 'কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব', 'বারুইপুর সার্জিক্যাল শিল্পের ইতিহাস', এবং 'মৌন মুখর' গ্রন্থ এতদঞ্চলে সমাদৃত। ডঃ দেবব্রত নস্করের গবেষণা গ্রন্থ 'চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' লোকসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই প্রসঙ্গে ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিকের নাম মনে রাখার মত। তাঁর উপন্যাস 'বিনিদ্র রজনী' এবং 'নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ'। প্রবন্ধ রচনায় ও তিনি দক্ষ ছিলেন। 'অন্বীক্ষা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সংগে তিনি যুক্তও ছিলেন। নাট্যকার প্রাবন্ধিক, সমালোচক শিশির বসুর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে।

বারুইপুর থেকে দীর্ঘদিন ধরে 'মহাদিগন্ত সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক উত্তম দাশ শুধু কবি হিসাবে পরিচিত নন, তাঁর কয়েকখানি প্রবন্ধ পুস্তক বিদগ্ধ পাঠক ও ছাত্রমহলে সমাদৃত। ডঃ উত্তম দাশের 'বাংলাছন্দের অন্তঃ প্রকৃতি', 'বাংলা সাহিত্যে সনেট', 'বাংলা কাব্যনাট্য', 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সম্পাদিত কয়েকখানি গ্রন্থও আছে।

পরেশ মণ্ডল মূলত কবি হলেও 'বিদ্রোহী ক্রীতদাস' নামে একখানি গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। কবি মৃত্যুঞ্জয় সেনের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্পের বই আছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত সম্পাদক।

বর্তমান প্রবন্ধ লেখক একসময় গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চেনামুখ অচেনামন' নামে একখানি গল্পগ্রন্থ ও 'দ্বিধারা' নামে একটি উপন্যাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিনি প্রধানত প্রাবন্ধিক হিসাবে পরিচিত। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রবাহের বিপক্ষে', 'উজান পথে রামমোহন সমীক্ষা', 'বিভূতিভূষণ ঃ স্বকাল ও একাল', 'প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ বিদূষণ', তারাশঙ্করের সাহিত্য ও গান' এবং 'নিঃসঙ্গ পথিক মোহিতলাল' বিদ্বৎ সমাজের সুপরিচিত ও সমাদৃত। 'দেবযান' নামে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন।

প্রবীণ গল্প ও উপন্যাস লেখক রণজিৎ পালের গল্পগ্রন্থ 'অচেনা পাখির ডাক' 'প্রেমের গল্প'

এবং উপন্যাস 'অস্লগ্ন' পাঠক সমাজে পরিচিত লাভ করেছে। তাঁর রচিত নাটিকাও আছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে ডঃাঙ্করপ্রসাদ নস্করের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'শরৎপ্রতিভার সীমারেখা' গ্রন্থখানি শরৎসাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর আরও দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম 'বঙ্কিমাচার' এবং 'বাংলা উপন্যাসে রোমান্টিসিজম ঃ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র'।

তরুণ গল্পলেখক দীপ দাস, উৎপল দত্ত, রঞ্জন দত্তরায়ের কথা এই এলাকার অনেকেই জানেন। প্রদীপ দসর গল্প সংকলন 'দৌড়পথ', উৎপল দত্তের 'মান্দাস,' রঞ্জন দত্তরায়ের 'ক্যাকটাস ও অনন্য গল্প' সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ। প্রশান্ত সরদারের ছোট দের জন্য গল্প সংকলন 'কাগজেনৌকা', আনসার উল হকের 'যাদুকরের মেয়ে,' মনোরঞ্জন পুরকাইতের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সুন্দরবঃ শিশুসাহিত্যের আকরভূমি' প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনেকগুলি জন্য ছড়ার বইওাছে ।

কবি, প্রাবন্ধিক, হিত্য সমালোচক ও সাংবাদিক গালিব ইসলাম-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চম্পাহাটি ও সাউ গড়িয়ার 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর সম্পাদক আফিফ ফুয়াদ ও 'পরিকথা' পত্রিকার সম্পাদ দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পত্রিকায় বিষয়ভিত্তিক গল্প এবং প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এবং তারা দুজনেই খ্যাতনামা গল্প এবং প্রবন্ধ খক।

নরনারায়ণ পূততু কবিতা ছাড়াও গল্প লিখে থাকেন। তাঁর 'রবিবার' নামে একটি উপন্যাস আছে। গানের উর সরস ভাষায় রচিত তাঁর একখানি গ্রন্থ সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে সমাদর পেয়েছে। তিনি 'দশিক' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক।

জয়কৃষ্ণ কয়ালে'নাভিমূল', 'রাঙা মাটির পথে পথে' গ্রন্থ দুটি পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

মমতা সেনের 'আপথ' এটি সুন্দর গল্প সংকলন।

তরুণ লেখক অসকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প ছাড়াও 'সিন্দূর' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'অভিত্রী' পত্রিকার সম্পাদক মানিকচন্দ্র দাসের 'অপরিচিতা' নামে গল্পগ্রন্থ সুপরিচিত। তাঁরার একখানি গ্রন্থও বর্তমান।

বারুইপুরে আর কিছু গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক আছেন যাঁদের নাম জানা না থাকায় আমরা দুখিত। প্রাবন্ধিক ও গল্প লেখক হিসাবে হীরেণ দাশগুপ্ত, হেমেন মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র নির্মল ব্যানার্জী, সজল রায়চৌধুরী, ডঃ কুমুদরঞ্জন নস্কর, ডঃ সৌরেন বসু, শক্তি মিত্র, ন্যকুমার মণ্ডল, শিখর রায়, সজল ভট্টাচার্য্য, শমীক ঘোষ, সূর্যকান্ত বসু, তপন ভট্টাচার্য্য,জয়কৃষ্ণ কয়াল, পূর্ণেন্দু ঘোষ, সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী,

ওঙ্কারেশ্বর শূর, সাগর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দীপন ভট্টাচার্য, সজল ভট্টাচার্য, ডঃ সনৎ নস্কর, ডঃ ইন্দ্রানী ঘোষাল, বিকাশকান্তি সাহা, তৃষ্ণা বসাক, জয়ন্ত দাস, শঙ্কর ঘোষ, কৃষ্ণকুমার দাস, সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জিষ্ণু বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া যাঁরা মাঝে মধ্যে স্থানীয় ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধ লেখেন তাঁদের মধ্যে সুশান্ত চক্রবর্তী, রমাপদ গায়েন, হাননান আহ্সান, ভগীরথ মাইতি, বাসুদেব সাহা, গোপেশ পাল, শক্তি রায়চৌধুরী, সুবর্ণকুমার দাস, পুজন চক্রবর্তী, বিপদবারণ সরকার, সুবলসখা চক্রবর্তী, মানস চক্রবর্তী, জয়দীপ চক্রবর্তী, নবারুন চক্রবর্তী, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুদের নিয়ে গল্প রচনাকারগণের মধ্যে বিশ্বনাথ রাহা, জয়দীপ চক্রবর্তী, প্রভৃতি আছেন। মনোরঞ্জন পুরকাইত 'সোনারকেল্লা' নামে একটি শিশু পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ছোটদের সোনারকেল্লার দশম বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে একটি সংগ্রহযোগ্য ছোটদের জন্য গল্পের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আদিগঙ্গা, অন্বীক্ষা, সাগ্নিক, ভোর প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ভোর' বারুইপুর থেকে প্রকাশিত কেবলমাত্র বড়দের জন্য ছোটগল্পের পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে সন্দীপ বসু সম্পাদিত 'আকাশলীনা' পত্রিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটিও আত্মপ্রকাশ করে গল্পের পত্রিকা হিসাবে।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় এই এলাকার অনেক সাহিত্য কর্মী নানাধরনের রচনায় নিযুক্ত। তাঁদের সকলেরই রচনা যে কালোত্তীর্ণ অথবা সৃষ্টি তা নয়, তবে তাঁদের আন্তরিকতার অভাব নেই। সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এখানে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। সাধারন মানুষের সঙ্গে তাঁদের যে সেতু রচিত হয়েছে, সেই সেতুবন্ধনের কাজে নল-নীলের মত কারিগরেরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন কাঠবেড়ালীর মত অনেক ছোটখাট লেখক – যাঁদের হয়ত একটি দুটি রচনাও সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁরাও অবহেলার যোগ্য নন।

সম্ভবত সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন বারুইপুরের সাহিত্য-সাধকদের সাধনা বাংলাসাহিত্যের স্রোতস্বিনীতে গতিবেগ সঞ্চার করবে। কালের সেই যাত্রার ধ্বনি আজ আর দূরশ্রুত নয়।

শিশুসাহিত্য ও বারুইপুর

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বারুইপুরের সাহিত্য চর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন ও গৌরবময়। যে তথ্য সংগৃহীত আছে তার ভিত্তিতে বলা যায় নবগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দুর্গাসপ্তশতী'র অনুবাদ গ্রন্থ সবচেয়ে প্রাচীনগ্রন্থ। বইটি ১২৩১ সালে ছাপা হয়। তারপর রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, নিমচাঁদ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় থেকে হালফিলের কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকারদের লেখা প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে বহু পত্রপত্রিকা। এই পত্র-পত্রিকার বিষয় ভাবনার বৈচিত্র থাকলেও ছোটদের জন্য বিশেষভাবে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এখানে শিশুসাহিত্যের চর্চা প্রাচীনকাল থেকে তেমন ভাবে হয়নি। সেই চর্চা শুরু হলো নয়ের দশকের শুরু থেকে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে ছোটদের জন্য পত্রিকা বা বই প্রকাশ করলেও তা এই ভূখন্ডে তেমন ভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। অনেকেই বড়দের জন্য প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প লেখার ফাঁকে ছোটদের জন্য কিছু কিছু লিখলেও ধারাবাহিকতার অভাব ছিল খুব সুস্পষ্ট।

'১৯৯৩ সালের ১৫ই আগষ্ট মনোরঞ্জন পুরকাইতের আহ্বানে ষ্টেশন ফিডার রোডে হরিদাস রায়ের ''আনন্দধাম হিন্দু হোটেল' এ কয়েকজন সাহিত্যমনস্ক মানুষ এক সভায় সমবেত হন। প্রতিষ্ঠা করা হয় 'দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ'' উদ্দেশ্য দক্ষিণবঙ্গের শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করা। নতুন প্রতিভার সন্ধান করা হয়। এবং ছোটদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রথম দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সংগঠিত ভাবে শিশু সাহিত্য চর্চার জন্য মঞ্চ গঠন ও পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন পুরকাইত সহ উত্থানপদ বিজলী, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রাহা, তপন নস্কর, বিনয় সরদার, আনসার উল হক্, অজিত ত্রিবেদী, চন্দ্রচূড় ঘোষ, সৈকত হালদার ও প্রবোধ হালদার ও আব্দুল রফিক শেষ। পরে সুখেন্দু মজুমদার, হাননান্ আহসান ও পরেশ সরকার যোগ দেন। এবং কার্যকরী সমিতিতে স্থান পান। আরো পরে ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক, প্রণবকুমার পাল, পুণ্ডরীক চক্রবর্তী, কল্পনা ভট্টাচার্য, স্বপনকুমার রায়, তপন ভারতী, রফিক উল ইসলাম, বিপদবারণ সরকার এই সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

১৯৯৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশ পায় দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদের ছোটদের জন্য পত্রিকা ''ছোটদের সোনারকেল্লা''। রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছোটদের সোনারকেল্লার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায়। একই অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিশুসাহিত্যিক হরেন ঘটক এর স্মৃতিকে জাগরুক রাখার প্রয়াসে এবং শিশুসাহিত্যিকদের সম্মান জানানোর জন্য ''হরেন ঘটক পুরস্কার'' - প্রদান শুরু হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এইপ্রথম শিশুসাহিত্য পুরস্কার শুরু হয়। প্রায় শতাধিক শিশুসাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে বারুইপুর। এইভাবে বারুইপুরে শুরু হয় শিশুসাহিত্য চর্চা ।

বারুইপুরের সাহিত্যে সে এক স্মরণীয় দিন। স্মরণীয় দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিশু সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে। সেদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী পতিতপাবন পাঠক, তৎকালীন পৌরপ্রধান মৃণাল চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক হেমেন মজুমদার, সাহিত্যক শৈলেন ঘোষ, সরল দে, পূর্ণেন্দু ভৌমিক ও আবুল বাশারসহ প্রায় শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক। সভাপতিত্ব করেন কবি উত্থানপদ বিজলী। ১৯৯৪ সাল থেকে দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ নিয়মিত প্রকাশ করছে "ছোটদের সোনারকেল্লা"। প্রতি বছর নিয়মিত "হরেন ঘটক পুরস্কার" প্রদান করছে। এ পর্যন্ত পুরস্কৃত হয়েছেন - অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক্, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জ্যোতিভূষণ চাকী, গৌরী ধর্মপাল, তপন চক্রবর্তী, সুখেন্দু মজুমদার, হান্নান আহসান, অমল ত্রিবেদী, অবি সরকার, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অপূর্বকুমার কুন্ডু, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, দীপ মুখোপাধ্যায়, সমর পাল, সুনির্মল চক্রবর্তী, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অপূর্ব দত্ত, ও ব্রজেন্দ্রনাথ ধর প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শিশুসাহিত্যিকগণ।

সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে- সরল দে, শৈলেন ঘোষ,বলরাম বসাক, নির্মলেন্দু গৌতম, নরোত্তম হালদার, কার্তিক ঘোষ, অরুন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দোপাধ্যায়, রাসবিহারী দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ শুর প্রমুখ শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মহোদয়গণকে।

দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ ও ছোটদের সোনারকেল্লা-র অনুপ্রেরণায় দক্ষিণবঙ্গে শিশুসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা শুরু হয়। প্রকাশিত হতে থাকে ছোটদের জন্য বই ও ছোটদের জন্য সুন্দর সুন্দর পত্রিকা। কাশীনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত - আলোর পাখি, কল্পনা ভট্টাচার্য সম্পাদিত - কিশোর কল্লোল, স্বপনকুমার রায় সম্পাদিত - এলোমেলো, হান্নান আহসান সম্পাদিত - অজগর, রাজকুমার বেরা সম্পাদিত - ছন্দচয়ন, নারায়ণ আচার্য সম্পাদিত - ছোটদের বন্ধু, নন্দলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদত হিং টিং ছট, শিশির পাইক সম্পাদিত হাসিখুশি, অবশেষ দাস সম্পাদিত - একতারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারুইপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি শিশুসাহিত্য চর্চার সুন্দর সাহিত্যবলয়।

বারুইপুরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুসাহিত্য চর্চাকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্যে পরিষদের শিশুসাহিত্যের কর্মশালা, শিশুসাহিত্য উৎসব, শিশুসাহিত্য সম্মেলন ও বিশালাক্ষ্মী স্পোর্টিং এ্যাণ্ড কালচারাল ক্লাবের শিশু বইমেলা বারুইপুরের শিশুসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মনোরঞ্জন পুরকাইতের উৎসাহে নবীন ও প্রবীন লেখকগণ শিশুসাহিত্যে চর্চার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। মূলত তাঁরই উৎসাহে বারুইপুর এবং দক্ষিণবঙ্গে শিশু সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। তিনি তাঁর যোগ্য সহযোগী হিসাবে পান বিশ্বনাথ রাহা, সুখেন্দু মদুমদার, হান্নান আহসান, বিনয় সরদার, স্বপনকুমার রায়, আনসার উল হক, প্রণবকুমার পাল, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস চক্রবর্তী, কাশীনাথ ভট্টাচার্য, তপন গায়েন, ভগীরথ মাইতি, জয়দীপ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় সরদার, তপন নস্কর, শক্তি রায়চৌধুরী, কল্পনা ভট্টাচার্য, স্বপনকুমার মান্না, রাজকুমার বেরা, স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়, এন. জুলফিকার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দুবিকাশ দাস,সেকেন্দার আলি সেখ, শান্তিকুমার ব্যানার্জী, অমলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, প্রবীররঞ্জন মণ্ডল, তাপস বন্দোপাধ্যায়, সুবলসখা চক্রবর্তী প্রমূখ কবি সাহিত্যিকগণকে। উত্থানপদ বিজলী, পাঁচুগোপাল

রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরেশ সরকার, শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, উত্তম দাশ, পরেশ মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় সেন, বিমলেন্দু হালদার, কালীপদ মনি, কালিচরণ কর্মকার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ধূর্জটি নস্কর, সন্তোষ কুমার দত্ত, নির্মল ব্যানার্জী, সৌরেন বসু, অচিন্ত্য হালদার, প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষকগণের আন্তরিক সহযোগিতায় শিশুসাহিত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপ্ত কবি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একসময় বারুইপুর নতুন পাড়ায় বাস করতেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ— হীরু ডাকাত, সাদা ঘোড়া প্রভৃতি।

মনোরঞ্জন পুরকাইত সম্পাদিত - ছোটদের সোনারকেল্লা প্রকাশিত হওয়ার আগে হান্নান আহসান সম্পাদিত "ছড়া দিলেম ছড়িয়ে" প্রকাশিত হতো বারুইপুর থেকে। বারুইপুরে সংগঠিত হয়েছে শিশু বইমেলা। আয়োজক বিশালাক্ষী স্পোর্টিং এ্যাণ্ড কালচারাল ক্লাব। বারুইপুরের আলোর পাখি, হিং টিং ছট ও অজগর পত্রিকার উদ্যোগে বিভিন্ন শিশুসাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এইভাবে বারুইপুরে শিশুসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হলো। সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো জেলার নানা প্রান্তে। মূল কেন্দ্র হিসাবে বারুইপুর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো। নানা অনুষ্ঠান ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিশুসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বারুইপুর হয়ে উঠলো সবার কাছে সমাদৃত । আজ কেবলমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা নয় সারা বাংলার সাহিত্য সমাজের কাছে বারুইপুর একটি আদৃত নাম।

ছোটদের জন্য বারুইপুরের কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থ, সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্রিকার তালিকা পেশ করা হল।

পত্রিকা	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
ছড়া দিলেম ছড়িয়ে, অজগর	হান্নান আহসান	কবি নজরুল সরণি
ঢিল	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া, চম্পাহাটি
ছোটদের সোনারকেল্লা	মনোরঞ্জন পুরকাইত	স্টেশন রোড (পশ্চিম)
আলোর পাখি	কাশীনাথ ভট্টাচার্য	চক্রবর্তী পাড়া
ছড়াকাশ	টিউলিপ ও পাভেল গায়েন	কল্যানপুর রোড, পুরন্দরপুর মঠ
হিং টিং ছট	নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া, চম্পাহাটি
মণিমুক্ত	আব্দুল রফিক শেখ	পাইকপাড়া, মদারাট

অন্য পত্রিকা যেখানে ছোটদের জন্য লেখা প্রকাশিত হয়

দেবযান	সন্তোষ কুমার দত্ত	বৈদ্যপাড়া রোড
সাগ্নিক	বিশ্বনাথ রাহা	সুবুদ্ধিপুর, (বেলতলা)
দর্পন	তপন ভারতী	শরৎপল্লী
বিস্বন	বাদলচন্দ্র বিশ্বাস	দক্ষিন দুর্গাপুর

সাহীন	আব্দুল রাজ্জাক খান	মন্ডলপাড়া, গোলপুকুর
নাগরিক	তপন গায়েন	
	নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	দক্ষিণরায়পল্লী
আদিগঙ্গা	শক্তি রায়চৌধুরী	রাসমাঠ; চৌধুরী বাজার
ডানা	নন্দলাল মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া, চম্পাহাটি
অন্বীক্ষা	নির্মল ব্যানার্জী	চক্রবর্তী পাড়া
উৎসাভাষ	জয়দীপ চক্রবর্তী	অরবিন্দ নগর
ঋত	অভিষেক ঘোষ	সুবুদ্ধিপুর, (বেলতলা)
ভোর	মানস চক্রবর্তী	রবীন্দ্র নগর
মঞ্জরী	মৌসুমী দাশগুপ্ত, সীমা দাশগুপ্ত	দক্ষিণরায় পল্লী
লাল পলাশ	মনোরঞ্জন পুরকাইত	ঋষি বঙ্কিম নগর
অভিযাত্রী	মানিকচন্দ্র দাস	সাজাহান রোড
কৃষ্টিমন	রথীনদেব, গোপেশ পাল	নতুন পাড়া
নীলাকাশ	দেবাশীষ ঘোষ	আটঘরা, মদারাট
আধুনিক [illegible]নিত অন্বেষা	আব্দুল হালিম সেখ	কুমোরহাট
শব্দাঞ্জলি	অরুনোদয় সরদার	মাষ্টারপাড়া
অঙ্কুর	তাপস নস্কর	কল্যানপুর
মিলনমেলা	বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, চঞ্চল নস্কর	দক্ষিণ দুর্গাপুর

তথ্যসূত্র ঃ-

১। স্মরণিকা, বারুইপুর বইমেলা, ২০০২।

২। পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬।

৩। মোহনা (সাহিত্য পত্র) ১৯৯৭ - ৯৮।

৪। ছোটদের অমনিবাস (যোগীন্দ্রনাথ সরকার)।

৫। দক্ষিণবঙ্গ, সাহিত্যের চালচিত্র, সম্পাদনা ঃ বিপদবরণ সরকার, সুবর্ণ দাস।

৬। ছোটদের সোনারকেল্লা, সম্পাদনা - মনোরঞ্জন পুরকাইত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভাষা

ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার

বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুকে উপলব্ধি করাই বিজ্ঞান। প্রাচীন ভারতের ঋষিকবিরা তাই বলতেন – 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। সেই এক থেকেই বহুর উৎপত্তি। ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই পদ্ধতি দেখতে পাই। অর্থাৎ এক থেকে বহু এবং বহু থেকে এক – এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে সৃষ্টি হয়েছে 'ভাষাবিজ্ঞান' শাস্ত্রের। ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা শুধু ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করি না; এর সাহায্যে মানবসমাজের সকল দিক, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য সবকিছু সম্পর্কে নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকি। তাই ভাষাবিজ্ঞান আজ একটি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র।

এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করেছি 'ইন্দো-ইউরোপীয়' নামে একটি ভাষা থেকে ভারত ও ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ ভাষার জন্ম। ঐ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিবর্তিত হতে হতে আজকের বাঙলা-হিন্দি-ইংরাজি-জার্মান-ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হয়েছে। এইসব ভাষার মধ্যে আজও এমন কিছু কিছু লক্ষণ থেকে গেছে, যা থেকে প্রমাণ করা যায় যে, এই ভাষাগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উত্তরাধিকারী।

কেমনভাবে একভাষা বহু ভাষায় পরিণত হল? তার একমাত্র উত্তর আঞ্চলিকতা। অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদে একভাষা বহুভাষায় রূপান্তরিত হল। ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দুটি প্রধান আঞ্চলিক ভেদ হল - 'কেন্তুম' ও 'শতম'। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরকণ্ঠ 'ক' ধ্বনি কেন্তুম উপভাষাগুলিতে রক্ষিত হল; কিন্তু 'শতম্' উপভাষাগুলিতে তা 'শ' তে রূপান্তরিত হল। সাধারণভাবে বললে পশ্চিম ইউরোপের ভাষাগুলি কেন্তুম এবং পূর্ব-ইউরোপ পারস্য ও ভারতের ভাষাগুলি শতম্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে শাখাটি ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, সেটি ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যভাষা। ইরাণে এই ভাষা আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক এবং পরবর্তীকালে পহ্লবী এবং আধুনিক ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইন্দো-ইরাণীয় শাখার যে উপশাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে তাকেই বলে ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার সঙ্গে ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষার বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। এ থেকে ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্যশাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে। এই বৈদিক আর্যভাষা আবার অঞ্চল ভেদে প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ হয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বাংলা-হিন্দী-গুজরাটী-মারাঠীতে পরিণত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে এবং সেই আঞ্চলিক রূপভেদ থেকেই পরবর্তিকালে নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

যা হোক, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। সে যুগের তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল — 'উদীচ্য', 'মধ্যদেশীয়', 'প্রাচ্য'। সম্ভবতঃ আরও একটি উপভাষা ছিল, যার নাম 'দাক্ষিণাত্য'। উপরিউক্ত তিনটি উপভাষা উত্তর - পশ্চিম-মধ্য ও পূর্ব ভারতে এবং শেষোক্ত উপভাষাটি দক্ষিণভারতে প্রচলিত ছিল। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও চারিটি অঞ্চলভেদে বিভক্ত ছিল— উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা এবং প্রাচ্যা। শুধু ভারতীয় নয়, ইউরোপের প্রাচীনভাষা গ্রীকেরও বহু আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল – "Attic-Ioyic, Arcadian - Cnprian, Acolic, Doric হোমারের মহাকাব্যে Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভাষাগুলি উপভাষার মাধ্যমে বিবর্তিত হতে হতে নতুন-নতুন আধুনিক ভাষার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আধুনিক ভাষার সৃষ্টি করেই সে থেমে থাকে নি। কালের গতির মতো অগ্রসর হয়ে চলেছে। যতদিন ভাষা থাকবে ততদিন সে এইভাবে এগিয়ে যাবে। চলার পথে, নদীর মতোই নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ও নাম ধারণ করবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, সে কখনও ছিন্নমূল হবে না। অজ্ঞাত কুলশীল হবে না। শত-সহস্র শাখা-প্রশাখার মধ্যেও, বিভিন্নতার মধ্যেও তার মূল রূপটি, বংশ-পরিচয়টি ঠিক বিদ্যমান থাকবে। সেই রূপ ধরে আবার আমরা 'বহু থেকে একে' ফিরে আসতে পারবো।

তাই দেখি আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও নানাবিধ আঞ্চলিক রূপভেদ রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানে এদের বলে 'উপভাষা'। প্রথমে ধরা যাক, পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরাজির কথা। ইংরাজির দুটি প্রধান উপভাষা – ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরাজির আবার দুটি ভেদ Northern ও Southern English । জার্মান ভাষায় উপভাষা আরও বেশি । তাই আলোচনার সুবিধার জন্য এগুলিকে তিনটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা হয়। উচ্চ-জার্মান-গুচ্ছ, পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছ, পূর্ব মধ্য জার্মান গুচ্ছ। উচ্চ জার্মানগুচ্ছে রয়েছে দুটি উপভাষা Alemanic ও Bavarian । Alemanic উপভাষা আবার দুটিভাগে বিভক্ত High এবং Low Alemanic । এই High Alemanic আবার তিনভাগে বিভক্ত । সুইজারল্যান্ডে schwyzersutsch, জুরিখে Zurituutsch আর বের্ণে Barudutsch । পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছেও বহু উপভাষা রয়েছে। প্রথমে এই গুচ্ছকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় --- Upper francouion এবং Middle franconican , এদের আবার নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, নানা আঞ্চলিক নাম। পূর্ব-মধ্য জার্মান গুচ্ছেও অনেক উপভাষা রয়েছে। ক্লপস্টক, লেসিং, হের্ডার, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতি জার্মান সাহিত্যিকদের রচনা এই উপভাষার মূল কাঠামো অবলম্বন করে গঠিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সমস্ত ভাষারই নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা আঞ্চলিক উপভাষা রয়েছে। জার্মান ভাষার এতগুলি উপভাষার কথা বলা হল এইজন্য যে, বাঙলা-ভাষার উপভাষা-বৈচিত্র্যকে আর অবিশ্বাস্য মনে হবে না। বাংলা ভাষার উপভাষা -সংখ্যা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। স্যার আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর মহাগ্রন্থ

linguistic survey of India-র পঞ্চম খণ্ডে বাঙলার উপভাষার সংখ্যা নির্ণয় করেছেন ন্যূনাধিক চল্লিশটি। তবে সেগুলিকে জার্মানভাষার মতো গুচ্ছবদ্ধ করলে চার-পাঁচটি গুচ্ছে আনা যায়। পরবর্তিকালে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা না-হওয়ায় বাঙলার উপভাষা সম্পর্কে সর্ববাদী সম্মত কোনো সংখ্যায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। বহু ভাষাবিজ্ঞানী রাঢ়ী– বাঙ্গালী– বরেন্দ্রী – কামরূপী – এই চারিটি মাত্র উপভাষার কথা বলেছেন, আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য এই দুই প্রধান বিভাগ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত রাঢ়ী-ঝাড়খণ্ডী-বরেন্দ্রী-পশ্চিমকামরূপী-মধ্যপূর্বী এবং পূর্বদেশী দক্ষিণ পূর্ব, পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমা – এই তিনটি ভাষা গুচ্ছের কথাও বলে থাকেন। নামে বা সংখ্যায়, যত মতভেদ থাক না কেন, বাঙলা ভাষার প্রধান দুটি উপভাষা হল – রাঢ়ী ও বঙ্গালী। অপরগুলি এদের কোন-না কোনো একটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। যাহোক, এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের বিভাগগুলি সর্ববাদীসম্মত – রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালী, কামরূপী। এইসব উপভাষারও নানা 'বিভাষা' আছে। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে এইসব উপভাষাও নানা ভাগে বিভক্ত।

উপরিউক্ত পাঁচটি উপভাষার অবস্থান-অঞ্চলগুলি হল – রাঢ়ী-মধ্যপশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব-বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম। বাঙ্গলী – পূর্ব ওদক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ। অর্থাৎ ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর , ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম। বারেন্দ্রী – উত্তরবঙ্গ । অর্থাৎ মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বাদশাহী, পাবনা। ঝাড়খন্ডী – দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবঙ্গও বিহারের কিছু অংশ। অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুর, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম। কামরূপী – উত্তরপূর্ববঙ্গ। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, রঙপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা।

এখন প্রশ্ন, যে উপভাষা নিয়ে আমাদের আলোচনা, সেই উপভাষার সংজ্ঞা কি ? এই প্রসঙ্গে আগে জানতে হবে, ভাষা কাকে বলে ? ভাষা হ'ল কতকগুলি অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। আর যে জনসমষ্টি একটি ভাষার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে বলেন 'ভাষা সম্প্রদায়'। যেমন – 'আমরা বই পড়ি'। এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে একটি বিশেষভাবে করা হয়েছে, তা কেবল বাঙালীরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালীরা একটি ভাষা সম্প্রদায় এবং বাঙলা একটি ভাষা। অনুরূপভাবে ইংরেজ-ফরাসী-জর্মান-রুশী এরাও এক একটি পৃথক ভাষা সম্প্রদায়। এক একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সমান নয়। যেমন, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় একই বাঙলাভাষা প্রচলিত হলেও উভয় বাঙলার উচ্চারণ ও প্রয়োগরীতি সমান নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য তাকেই বলে উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় – "A specific form of a given language spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient

difference from the standard or literary form of that language, as the pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialets of the language to be regarded as a different language ." -- A dictionary of linguisties. তাহলে উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্‌ধারাগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে , অথচ পার্থক্যটা এমন বেশি হবে না, যাতে আঞ্চলিক রূপগুলি এক একটি সম্পূর্ণ পৃথকভাষা হয়ে ওঠে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে; কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য চরমে পৌঁছালে পৃথক ভাষার জন্ম হবে। যেমন বাঙলা ও অসমীয়া। কিন্তু সমস্যা হল, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যটি কোনস্তর পর্যন্ত এলে উপভাষা এবং পৃথকভাষা হবে তার নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি আপেক্ষিক; চূড়ান্ত নয়। মাত্রাগত, শ্রেণীগত নয়। ফলে ভাষা ও উপভাষার নির্ণয় বেশ কঠিন। তবে ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন – (ক) ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত ; উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত। (খ) ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপ থাকে, উপভাষার তা নেই। (গ) ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হয়, উপভাষায় রচিত হয় লৌকিক সাহিত্য। (ঘ) ভাষার ব্যাকরণ আছে, উপভাষার ব্যাকরণ নেই। কেননা উপভাষার স্বতন্ত্র সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হলে সেই উপভাষা ধীরে ধীরে পৃথক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। বিশেষ রীতিতে বাঙলা বলে থাকি। আমাদের কথ্য বাঙলায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা

আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অধিবাসীরা, রাঢ়ী উপভাষা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের 'ভাষা' বাঙলা; 'উপভাষা' রাঢ়ী এবং 'বিভাষা' দক্ষিণ মধ্য রাঢ়ী। অর্থাৎ আমরা একটি যা বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। তাই আমাদের কথ্য বাঙলাকে 'বিভাষা' (sub dialect) বললে অত্যুক্তি হয় না। বিভাষা হল উপভাষার অন্তর্গত আরও ক্ষুদ্র বিভাগ। ভাষার মধ্যে যেমন উপভাষা; উপভাষার মধ্যে তেমনি বিভাষা। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজ-নিজ অঞ্চলে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করলেও সাহিত্যে শিক্ষায়, আইন-আদালতে, সভাসমিতিতে, সংবাদপত্রে আদর্শভাষা ব্যবহার করে। বহু উপভাষার মিলিত রূপ হল সেই আদর্শ ভাষা। তেমনি বহু বিভাষার মিলিত রূপ হল উপভাষা। উপভাষার তুলনায় বিভাষার ক্ষেত্র অনেক ছোট, পরিধি অনেক ক্ষুদ্র। তেমনি আবার ভাষার তুলনায় উপভাষার ক্ষেত্র অনেক ছোট, পরিধি অনেক ক্ষুদ্র। বাঙলার উপভাষা সমূহের মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গলীর বিস্তার খুব বেশি হওয়ায় এদের অভ্যন্তরে বহু বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা রাঢ়ী। যদিও মোটামুটিভাবে রাঢ়ীর দুটি প্রধান বিভাগ – পূর্বী ও পশ্চিমা; তবু সূক্ষ্ম

বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ চারিটি – পূর্বমধ্য, পশ্চিমমধ্য, উত্তরমধ্য এবং দক্ষিণমধ্য। একটি সারণীর সাহায্যে রাঢ়ীর 'বিভাগ' গুলির পরিচয় ও অবস্থান অঞ্চল দেখানো হল।
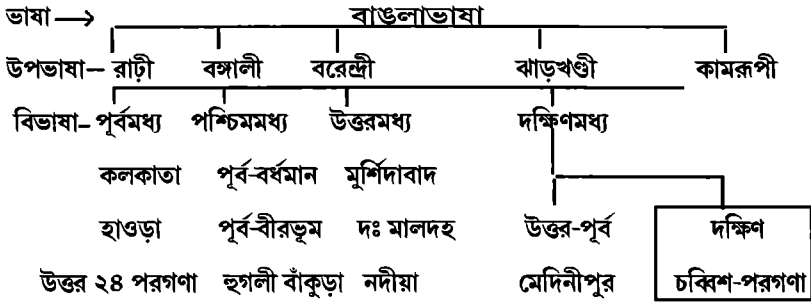
সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার অধিবাসীরা রাঢ়ী-উপভাষার অন্তর্গত 'দক্ষিণ মধ্য' বিভাষায় কথা বলি। এটি আমাদের বিভাষা (sub-dialect) । নানা কারণে ভাষা থেকে উপভাষা, উপভাষা থেকে বিভাষার সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে প্রধান হল, উচ্চারণ-বিকৃতি। এই উচ্চারণ বিকৃতির মূল কারণ আবার জলবায়ু ও দৈহিক-গঠন। যেমন বৈদিক যুগের মানুষ ঋ এবং ৯ স্বরধ্বনি দুটি যথার্থ উচ্চারণ করতে পারতো। পরবর্তিকালে জলবায়ুর প্রভাবে জিহ্বার জড়তার জন্য 'ঋ ' ধ্বনিটি উত্তর এবং পূর্ব ভারতে 'রি' এবং দক্ষিণ ভারতে 'রু' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। আর ৯ ধ্বনিতো নেই বললেই চলে। এইভাবে বিভিন্ন ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ ঘটছে। আবার অন্যভাষা থেকে নতুন ধ্বনি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। যেমন আর্যভাষায় 'ট' বর্গীয় মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি এসেছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে। এভাবে দেখা যায়, নানা প্রভাবের মধ্যে দিয়ে একটি ভাষা উপভাষা ও বিভাষার গতিপথ ধরে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় এই রূপান্তর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উপভাষার সংজ্ঞা-আলোচনা কালে আমরা দেখেছি ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি আপেক্ষিক কিন্তু চূড়ান্ত নয় ; মাত্রাগত, কিন্তু শ্রেণীগত নয়। ঠিক তেমনি, উপভাষা ও বিভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ উপভাষার সঙ্গে বিভাষার পার্থক্যও আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়, মাত্রাগত কিন্তু শ্রেণীগত নয়। কারণ চূড়ান্ত বা শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি হলেই তা নতুন ভাষায় পরিণত হবে। এখন মোটামুটিভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাক। প্রসঙ্গ তঃ মনে রাখতে হবে, 'রাঢ়ী' উপভাষার অন্তর্গত হওয়ায় রাঢ়ীর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এই 'বিভাষা তে থাকবে। তবে কোন কোন বৈশিষ্ট্য এই বিভাষাতে প্রকট, কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য অপ্রকট এবং কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য একেবারে ভিন্ন তা আলোচনাকালে দেখানো হবে।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ - ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। কারণ ধ্বনিই ভাষার প্রাণ। মানুষ প্রথমে ভাষা বলে; তারপর লেখে। আগে ধ্বনি পরে বর্ণ।

(ক) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো। আমাদের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বিভাষায় এই প্রবণতা অত্যন্ত বেশি।

(খ) সাধারণভাবে দেখা যায়, 'ঋ ' কারটি 'ই' কার এবং 'এ' কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

একটি 'রাঢ়ী' উপভাষার তুলনায় আমাদের 'বিভাষা'-তে বেশি প্রকট। যেমন – ঘৃত > ঘেত /ঘি, বৃদ্ধি > বিদ্ধি, বৃষ্টি > বিষ্টি, ঋষি > ইঁসি, কৃমি > কিরমি, বৃহস্পতি > বেস্পতি, বৃন্দাবন > বেন্দাবন, পৃথক > পেথক।

(গ) আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভাষায় 'র' ধ্বনিটি 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হবার প্রবণতা খুব বেশি। এটি রাঢ়ী উপভাষার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ না হলেও আমাদের বিভাষায় এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রকট। যেমন – রস >অস, রাক্ষস > আক্কস, রাজা > আজা, রক্ত > অক্ত, রঙ > অঙ, রাম > আম। পক্ষান্তরে, 'অ' ধ্বনিকে 'র' ধ্বনি রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা কেবলমাত্র আমাদের এই বিভাষাতেই দেখতে পাওয়া যায় যেমন – আশু > রাশু, আমতলা > রামতলা, অবনী > রবনী; অজয় > রজয়।

সাধারণভাবে 'রাঢ়ী' উপভাষায় 'ল' কে 'ন' রূপে উচ্চারণ করার একটি ক্ষীণ প্রবণতা থাকলেও আমাদের বিভাষায় এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যেমন - লাউ > নাউ, লাল >নাল, লাটাই > নাটাই, লোকসান > নোকসান। প্রসঙ্গতঃ, একটা কথা বলা দরকার র > অ এবং ল > ন এই পরিবর্তন কেবল পদাদি 'র' এবং 'ল' এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য , অন্যত্র নয়।

(ঙ) পদমধ্যস্থিত 'হ' কারের লোপ প্রবণতা রাঢ়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের 'বিভাষায়' এর ব্যবহার নিতান্ত কম নয়। যেমন – তাহার > তার, কহি > কই, নহি >নই, গাহি > গাই , চাহি > চাই।

(চ) 'দ্বিমাত্রিকতা' ও 'ব্যঞ্জনদ্বিত্ব' রাঢ়ীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের 'বিভাষায়' এদুটির প্রভাবে খুব গভীর। যেমন– হইতেছে > হচ্ছে; বড় > বড়্ডো, সবাই > সব্বাই।

(ছ) রাঢ়ী উপভাষায় এ> অ্যা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হলেও আমাদের 'বিভাষায়' এই প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। বরং 'এ' কারটিকে যথার্থ উচ্চারণ করার প্রবণতা বেশি। যেমন – গেছে > গ্যাছে কিন্তু গেছে। অনুরূপভাবে দিয়েছে > দেছে, নিয়েছে > নেছে।

(জ) রাঢ়ী উপভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, অভিশ্রুতির বহুল ব্যবহার। অভিশ্রুতি হল'– অপিনিহিতি জাত ই/উ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার পরবতী স্বরধ্বনিকে পরিবর্তিত করে। যেমন – করিয়া > কইর‍্যা > করে (অভিশ্রুতি)। এখানে 'ই' কার পূর্ববর্তীস্বর 'অ' কারের সঙ্গে মিশে যাওয়ায়, পরবর্তী স্বর 'আ' পরিবর্তিত হয়ে 'এ' কারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভাষায় শুধু অভিশ্রুতি নয়; অপিনিহিতিরও ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। অথচ আমরা সাধারণভাবে জানি; অপিনিহিত 'বাঙ্গালী' উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপিনিহিতি হল পদস্থিত ই/উ-কার যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা। যেমন – করিয়া > কইর‍্যা, সাধু >সাউধ, আশু > আউশ (ধান) আমাদের বিভাষায় 'ই' কারে অপিনিহিত বহু দেখা গেলেও 'উ' কারের অপিনিহিত বড় বিরল। যেমন – করিয়ে >কইরে, পালিয়ে > পাইলে, গুলিয়ে > গুইলে, ফাটিয়ে > ফাইটে, গড়িয়ে > গইড়ে, বলিয়ে > বইলে, মাড়িয়ে > মাইড়ে।

(ঝ) রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল – স্বরসঙ্গতির ফলে পদমধ্যস্থ পরস্পর সন্নিহিত বিষম স্বরধ্বনির সুষম স্বরধ্বনিতে পরিণতি। যেমন – বিলাতি > বিলিতি। বিষম স্বরধ্বনি ও সুষম স্বরধ্বনি ব্যাপারটি কী ? আমরা যখন স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করি তখন জিহ্বার উত্থানপতন এবং অধরোষ্ঠের আকুঞ্চন-প্রসারণ হয়। সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে বর্গীকরণ করা হয়। নিচের সারণিতে তা দেখানো হল –
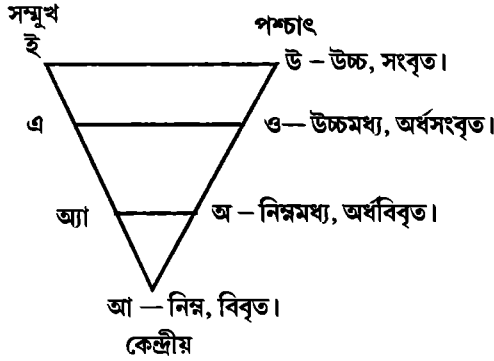
ই–এ- অ্যা স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার সম্মুখভাগ উন্নত হওয়ায় এগুলি সম্মুখ স্বরধ্বনি। উ–ও– অ স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ উন্নত হয় বলে এগুলি পশ্চাৎস্বর ধ্বনি। 'আ' উচ্চারণে জিহ্বা সমতল থাকে বলে এটি কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি। ই– উ উচ্চারণ কালে জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ সর্বাধিক উন্নত হওয়ায় এ দুটি উচ্চ স্বরধ্বনি। আবার আ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা উন্নত হয় না বলে এটি নিম্ন স্বরধ্বনি ? বাকি স্বরধ্বনিগুলি পর্যায়ক্রমে উচ্চমধ্য ও নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি। আবার ই– উ স্বরধ্বনি দুটির উচ্চারণে অধরোষ্ঠের আকুঞ্চন সর্বাধিক ঘটে বলে এ দুটিকে সংবৃত স্বরধ্বনি এবং 'আ' উচ্চারণকালে অধরোষ্ঠ সর্বাধিক প্রসারিত হয় বলে এটিকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। অবশিষ্ট স্বরধ্বনিগুলি উভয় দিক থেকে তুলনামূলকভাবে কম আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হওয়ায় অর্ধ-সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃত বলে পরিচিত। সুতরাং স্বরধ্বনিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় দাঁড়ায় এমন – 'ই'– সম্মুখ – উচ্চ– সংবৃত স্বরধ্বনি । আ– কেন্দ্রীয় – নিম্ন – বিবৃত স্বরধ্বনি। তাহলে ই এবং আ বিষম স্বরধ্বনি। এই বিষম স্বরধ্বনিকে সুষম স্বরধ্বনিতে পরিণত করার পদ্ধতি হল 'স্বরসঙ্গতি'। যেমন – বিলাতি > বিলিতি। এখানে আ > ই রূপান্তরিত হল। এই স্বরসঙ্গতির প্রভাব আমাদের বিভাষায় অত্যন্ত প্রকট। সাধারণভাবে পদমধ্যস্থিত বিষম স্বরকে সুষম স্বরে পরিবর্তন করা স্বরসঙ্গতির কাজ। কিন্তু আমাদের বিভাষায় স্বরসঙ্গতি এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে তা পদের সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করেও ঘটে থাকে। যেমন – আমি একাজ পারবু নি (পারবো না)। এখানে 'পারবো ' এবং 'না' দুটি পৃথক পদ হওয়া সত্ত্বেও 'না' যখন 'নি' হলো, তখনই 'পারবো' হয়ে গেল 'পারবু'। এভাবে দুটি পদের মধ্যে স্বরসঙ্গতি হয়ে গেল। আমাদের বিভাষায় এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন – যাবো না > যাবু নি, খাবু নি, পারবু নি, কাঁদবু নি, বলবু নি, লিখবু নি, পড়বু নি।

(ঞ) নাসিক্যীভবন রাঢ়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পদমধ্যস্থিত নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পেলে পূর্ববর্তী

স্বরের অনুনাসিকতাই নাসিক্যীভবন। যেমন – চন্দ্র > চাঁদ, বন্ধ > বাঁধ। এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন' লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বর 'আ' কে 'আঁ' তে রূপান্তরিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, স্বতোনাসিক্যীভবনও বহুক্ষেত্রে ঘটে। স্বতোনাসিক্যীভবন হল, আনুনাসিক ব্যঞ্জনের উপস্থিতি ছাড়াই স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যায়। যেমন – পুস্তক> পুথি > পুঁথি। এখানে 'পুস্তক' শব্দে অনুনাসিক বর্ণ না থাকলেও 'পুঁথি' তে অনুনাসিকতা এসে গেছে। আমাদের বিভাষায় এই উভয় প্রকার নাসিক্যীভবনই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। যেমন – কোন্দল > কোঁদল, হোঁদল, কোঁদন (নাচন), কাঁপন, বাঁধন, গাঁ, কাঁকুই, কাঁকল, কাঁক।

(ট) অল্পপ্রাণীভবন রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য। পদের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকার জন্য পদান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়ার পদ্ধতিকে অল্প প্রাণীভবন বলে। আমাদের এই বিভাষায় এই বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। যেমন – মাথা > মাতা, দুধ > দুদ্, বাঘ > বাগ, বোধন > বোদন, গোষ্ঠ > গোষ্ট,

(ঠ) অঘোষীভবন রাঢ়ীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভাষায় এর প্রভাব নেহাৎ কম নয়। এই পদ্ধতি অনুসারে পদান্ত সঘোষ ধ্বনি, অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – গুলাব > গোলাপ, গুবাগ > গুবাক। অঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া সঘোষীভবনও রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য। অঘোষধ্বনি, সঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'লে তাকে সঘোষীভবন বলে। যেমন – ছাত > ছাদ, কাক > কাগ, বক > বগ। সঘোষীভবন ও আমাদের বিভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন – যা হোক (জা হোক) > ঝাহোক । যাক্‌গে > ঝাক্‌গে, জ্বালিয়ে > ঝালিয়ে।

(ড) সমীভবন আমাদের বিভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যদিও রাঢ়ী উপভাষায় এর প্রয়োগ খুব একটা ব্যাপক নয়। পদমধ্যস্থিত বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে সুষম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন – পদ্ম > পদ্দ। গর্ভ > গব্‌ভো, গর্ত > গত্তো, গর্দান > গদ্দান, কীর্তন > কেত্তন, দুর্গা > দুগ্‌গা প্রভৃতি প্রচুর উদাহরণ আমাদের বিভাষায় পাওয়া যায়।

(ঢ) তালব্যধ্বনির প্রভাবে পদমধ্যস্থিত দন্ত্য বা অন্য কোনো ধ্বনি যদি তালব্য ধ্বনিতে পরিণত হয়; তবে তাতে তালব্যীভবন বলে। যেমন – সন্ধ্যা > সাঁঝ। আমাদের বিভাষায় এই প্রক্রিয়ার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। যেমন – কুৎসা > কেচ্ছা, কুচ্ছো।

(ণ) স্বরভক্তি রাঢ়ী উপভাষার নগণ্য হলেও আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এর প্রভাব নিগূঢ় । যুক্ত ব্যঞ্জনকে স্বরধ্বনির সাহায্যে বিভক্ত করার পদ্ধতি হল স্বরভক্তি। যেমন – শ্রাদ্ধ> ছেদ্দা, শ্রী > ছিরি, প্রাচীন > পেরাচিন, পরামানিক।

(ত) সঙ্কোচন আমাদের বিভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করার জন্য কোনো কোনো শব্দের সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণ না করে সংক্ষেপে কিছু ধ্বনি বাদ দিয়ে উচ্চারণ করার পদ্ধতিকে সংকোচন বলে। যেমন – পেঁয়াজ > প্যাঁজ, শেয়াল > শ্যাল, দেয়াল > দ্যাল, বেয়াই > ব্যাই (বৈবাহিক)।

(থ) বর্ণলোপ ও বর্ণবিপর্যয় আমাদের বিভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যদিও রাঢ়ী উপভাষায় এ দুটি পদ্ধতি সুলভ নয়। পদস্থিত বর্ণ, উচ্চারণকালে লুপ্ত হওয়াকেই বর্ণলোপ এবং পদস্থিত পাশাপাশি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তনকে বর্ণ-বিপর্যয় বলে। যেমন বর্ণলোপ হ'ল – স্বাদ > সদ্, স্থিত > থিতু, স্থানু > থানু, স্থান > থান, স্থাপন > থাপন; স্তবক > তবক।

(দ) বিমূর্ধ্যনীভবন আমাদের বিভাষার উল্লেখযোগ্য এক বৈশিষ্ট্য। মূর্ধন্যধ্বনি যদি দন্ত্য বা অন্যকোনও ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তবে তাকে বিমূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন– বিষ > বিশ, বিষন্ন > বিশন্ন, প্রাণ > পরান, পার্বণ > পাব্বন। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, বাঙলা ভাষায় 'ণ' /'ষ' ধ্বনির উচ্চারণ নেই বললেই চলে। 'ণ' > ন তে, এবং ষ > শ/খ-তে পরিণত হয়ে গেছে ? আবার আমাদের বিভাষাতে তো মূর্ধন্য ধ্বনি বিশেষত 'ণ' ও 'ষ' একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা বর্তমানে এই ধ্বনি দুটি উচ্চারণে একেবারে অক্ষম।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ- রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভাষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে আমরা ভাষার গঠনগত দিকটি বিচার করে থাকি

(ক) তির্যককারকে বহুবচন বিভক্তির ব্যবহার রাঢ়ী উপভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কর্তৃকারক ছাড়া অন্যকারকে বহুবচনে 'দের'বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন, কর্মকারকে আমাদের কলম দাও। করণকারকে – তোমাদের দ্বারা যুদ্ধ হবে না। এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের বিভাষাতেও দেখতে পাই।

(খ) সাধারণভাবে দেখা যায়, অধিকাংশ সকর্মক ক্রিয়ারই দুটি কর্ম থাকে – মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়াকে 'কি' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্যকর্ম এবং 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি গৌণকর্ম। রাঢ়ী উপভাষায় গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তি হলেও মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি থাকে না। যেমন – শিক্ষক মহাশয় সমীরণকে বই দিলেন। এখানে গৌণকর্ম সমীরণে 'কে' বিভক্তি এবং মুখ্যকর্ম বই বিভক্তিহীন। আমাদের বিভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) অধিকরণকারকে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হ'লেও আমাদের 'বিভাষায়' 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ বেশি। যেমন – ঘরেতে শেখো। বাড়িতে থাকো।

(ঘ) করণকারকের অনুসর্গ 'সঙ্গে' রাঢ়ী ভাষার বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের বিভাষায় 'সঙ্গে' পদটির থেকে 'সনে' পদটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আমার সনে খরখর আয়।

(ঙ) বহুবচন – বিভক্তি– অনুসর্গ হল – 'গুনি গুলো', রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের বিভাষায় এই পদদুটি যথাক্রমে 'গুলি, গুনো' রূপে উচ্চারিত হয়। ছেলেগুনো ভারি বদমায়েস, মেয়েগুনি এমন নয়।

(চ) সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের বিভাষায় এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মাস্টারে ছেলেকে মেরেছে। ছাগলে কিনা খায়। পাগলে কি না বলে।

(ছ) সদ্য অতীতকালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি – 'ল' । কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি 'লে' । যেমন – রাম গেল। সে বললে । সদ্য অতীতকালের উত্তমপুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি – 'লুম'। যেমন – আমি বললুম। আমাদের বিভাষায় 'লুম' বিভক্তির অত্যধিক প্রাধান্য থাকায় অন্যান্য উপভাষা–ভাষী লোকেরা পরিহাস করে আমাদের সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে তুলনা করে। কেননা, বাঘের ডাক– 'হালুম– হুলুম'।

(জ) মূল ধাতুর সঙ্গে আছ ধাতু যোগ করে সেই আছ ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন – কর্ +ছি = করছি – আমি করছি , কর্ +ছিল = করছিল – সে করছিল। আমাদের বিভাষায় এইরকম অবস্থায় ক্রিয়াপদের রূপ হয় – কর্তেছি < করিতেছি, বল্তেছি < বলিতেছি। মনে হয়, দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে এই রকম ক্রিয়াপদ তৈরি হয়েছে। তবে ঘটমান অতীতের ক্রিয়াপদ গঠনে আমাদের বিভাষায় ভিন্ন প্রথা নেই; রাঢ়ী উপভাষার প্রথা-ই প্রচলিত।

(ঝ) ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষে 'বে' এবং উওম পুরুষে 'র' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন – সে করবে। আমি করব। কিন্তু যখনই নঞর্থক 'নি' < না অব্যয় উত্তম – পুরুষের 'ব' বিভক্তির পরে ব্যবহৃত হবে তখনই 'ব' > 'বু' তে পরিণত হবে। যেমন – করবু নি < করব না। খাবু নি, যাবু নি, পারবু নি। আমাদের বিভাষায় স্বরসঙ্গতির গভীর প্রভাব থাকায় ক্রিয়াপদে এমন পরিবর্তন ঘটে থাকে। স্বরসঙ্গতি আমাদের বিভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ঞ) রাঢ়ী উপভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ নিয়া > নিয়ে, গিয়া > গিয়ে – তে পরিণত হয়েছে। আমাদের বিভাষায় তা আরও সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করেছে। যেমন নিয়ে > নে, দিয়ে > দে, গিয়ে > গে । অনুরূপ বিশেষ্য পদেও এমন দেখা যায়। বিয়ে > বে।

(ট) তুমর্থে (infinitive) 'তে' বিভক্তির ব্যবহার রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলেও আমাদের বিভাষায় 'তি' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় বেশি। যেমন – কানে কী হয়েছে, এত হরেন (Horn)দিচ্ছি, শুনতি < শুনতে পাওনা। অনুরূপভাবে – যাতি, খাতি, করতি।

(ঠ) নঞর্থক ক্রিয়াপদের 'না' অব্যয় আমাদের বিভাষায় 'নি' তে পরিণত হয়েছে। যেমন - - করিস না > করিস নি, খাস নি, যাস নি। শুধু বর্তমানকালে নয়, ভবিষ্যৎকালেও এই প্রবণতা থেকে গেছে। যেমন – করবু নি, খাবু নি, যাবু নি।

(ত) শব্দভাণ্ডারগত বৈশিষ্ট্য ঃ- ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশ ক্ষমতার উপর। এই প্রকাশ ক্ষমতার মূল উৎস হল শব্দভাণ্ডার । আমাদের বিভাষার নিজস্ব কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল। কুরুণ্ডে (পোকা ধরা – সুডৌল নয়) হাঁসা (ফ্যাকাশে ফর্সা) গালা (ধার) কুশো (রোগা) চিটে (রোগা) গুলে (বেঁটে মোটা) ধইছে (লম্বা– রোগা) ধজি (লম্বা আকুশি) বাঁটুল (বেঁটে) নোনো (শিশু) ওলা (নাসা) কচ্ছানি (কচি ছেলে) মনি (ছোট মেয়ে) ঘোনা (মোটাসোটা) ঘুনসি (কোমরের মাদুলি) ইত্যাদি। এরকম বহু শব্দ আছে যা আমাদের বিভাষার একান্ত আপন শব্দ।

(৪) বাগ্‌ধারাগত বৈশিষ্ট্য ঃ- বাগ্‌ধারা ভাষার আপন সম্পদ। আমাদের বিভাষায় এমন বহু বাগ্‌ধারা আছে, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন – র্নকড়ে– ছ'কড়ে (খুব সস্তা)। 'হালীর হাল ধারা তো, পোয়াতীর পুত ধরো না। বহু প্রবচনমূলক ছড়াও আমাদের বিভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন – 'দূর থেকে শুনি শতগোলা ধান; কাছে গে দেখি বাবলা বাগান।' 'মা রেঁদেচে নাউ (লাউ)/ তাইতে ছেলে করছে কাঁউ–কাঁউ / বউ রেঁদেচে মূলো, তাই হয়েছে তুলো।' 'ছোট সরাটা ভেঙে গেছে বড় সরাটা আছে! নাচো আর কোঁদো বধু আমার হাতের আটকোল (আন্দাজ) আছে।

আমাদের বিভাষায় আরও বিবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে আমরা মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করলাম। অন্যান্য বিভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন প্রকট, আমাদের বিভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে প্রচ্ছন্ন। কারণ, কলিকাতার মতো মহানগরী আমাদের নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানকার ভাষার প্রভাবে আমাদের বিভাষা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে নি। তাছাড়া, আধুনিক উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্র – দূরদর্শন– বেতারযন্ত্র, সর্বোপরি শিক্ষার প্রসার হওয়ায় সর্বত্র আদর্শ কথ্যভাষার প্রভাব ও প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, বিভাষাগুলি আপন বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। হয়তো এমন দিন আসবে, সেদিন 'বিভাষা' বলে আর কিছু থাকবে না; বিভাষার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়ে, কোনো বলবান উপভাষীর কুক্ষিগত হবে।

বৈচিত্র্য-ই প্রাণসত্তার প্রমাণ। ভাষা– উপভাষা– বিভাষার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার প্রাণসত্তাকে বিকশিত করছে। তাই পৃথিবীতে এতোরকমের ভাষা, এতো রকমের পোশাক, এতো রকমের মতামত। তবু, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আমাদের এই শিক্ষা দেয় – 'বিশ্বম ভবত্যেকনীড়ম।' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই একটি মাত্র নীড়। সমস্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও ভাষাবিজ্ঞান আমাদের ঐক্য শিক্ষা দেয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম কর্তব্য। ভাষাবিজ্ঞান দেখায়– 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি।' সেই এক থেকেই বহুর উৎপত্তি। ভাষা > উপভাষা > বিভাষা – এতো মহাকালের গতি। সুতরাং ভাষা – উপভাষা – বিভাষা নিয়ে বিবাদ নয়, বিরোধ নয়; বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে বিশ্বের কল্যাণে , মানবজাতির হিতাকাঙক্ষার আত্মনিয়োগ করাই ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষা। আজও পৃথিবীতে জাতিবৈরিতা– ধর্মবৈরিতার সঙ্গে সমানতালে চলেছে ভাষাবৈরিতা। ভাষাবিজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ভাষাবৈরিতা দূর করতে সাহায্য করে। সকল নদী যেমন শেষ পর্যন্ত সাগরে মিলিত হয়, সমস্ত ভাষা-উপভাষা বিভাষাও তেমনি একদিন মহামানবের মহাসাগরে মিলিত হবে। সেদিন আজ নিকটবর্তী। বিশ্বভাষা 'এসপেরান্তো' সেই মহাসাগর।

বারুইপুরের সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যম

প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন সংবাদপত্রই একমাত্র গণমাধ্যম। এই সংবাদপত্রের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে বেছে নিয়ে সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। তবে সেই অঞ্চলের সংবাদপত্রের প্রচার, প্রসার, প্রকাশ ও জনসংযোগ কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারও একটা ইতিবৃত্তেরও বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে। আবার এটাও ঠিক যে সংবাদপত্রের ভূমিকা সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র কতখানি গণসংযোগ বা গণ সচেতনতা বিস্তারে সহায়ক হয়, সেটাও কিন্তু ইতিহাসেরই অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়। আবার অতীতের সংবাদপত্র আর বর্তমান যুগের সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনেকাংশে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মত হয়ে মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে – সভ্যতার একটি অঙ্গ হিসাবে। যদিও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আধুনিক যুগে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে যে কোন সংবাদ পৃথিবীর এক কোণ থেকে অন্য কোণে প্রচার করতে পারছে তেমনি প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্র সেই সংবাদকেই আরও প্রাঞ্জল আরও বিস্তৃতভাবে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করছে। যারা এই আধুনিক যুগে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে পরস্পর সংঘাত বলে মনে করে তা কিন্তু আদৌ কোন সংঘাত নয়– তবে একই সংবাদ পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রয়োজনীয়তা হয়তো দু'রকমের হবে, তাতে কিন্তু কোন একটি সংবাদের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বই কমবে না। এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এই ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে নয় অন্য ফোরামে।

বারুইপুরে সংবাদপত্র কবে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল এবং কে বা কারা বা কোন গোষ্ঠীভুক্তরা সেই সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। বারুইপুরের মত একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ কবে তার সন তারিখ ইত্যাদি সংগ্রহ করার একটি আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। এরজন্য বারুইপুরের বর্তমান পৌর বোর্ডের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান উচিত। বারুইপুরের ইতিহাস রচনার সঙ্গে বারুইপুর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শুধু তাই নয় যে সব সংবাদপত্র বারুইপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা বা বিচ্ছিন্নতার কারণ কি ছিল তার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে রাখাও ইতিহাস প্রণয়নের অঙ্গ। এই সব সংবাদপত্র প্রকাশের প্রেরণা তদানীন্তন কালে কতখানি বাস্তব চেতনা সম্পন্ন ছিল তার সঙ্গে বারুইপুর থেকে প্রকাশিত বর্তমান সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রের তুলনামূলক বিচার কতখানি প্রয়োজনীয় তার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে রাখা একান্তই প্রয়োজন। সে যুগে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে কতখানি গতিশীলতার প্রয়োজন ছিল তারও ইতিবৃত্ত থাকা দরকার।

সংবাদপত্র যে একটি বিশেষ গণমাধ্যম এই স্বতঃসিদ্ধ আজ সর্বজনস্বীকৃত। বারুইপুরের মত একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত গ্রাম্য শহর, কলকাতা শহর থেকে দূরত্ব কম হওয়ায়, কলকাতা শহরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিশেষ আকর্ষণ এই গ্রাম্য শহরের সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের অনুকরণে সংবাদপত্র প্রকাশ করার মানসিকতা তদানীন্তনকালে সংবাদপত্র প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অবশ্যই ছিল এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে সেই সংবাদপত্রের অবয়ব থেকে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রের অবয়ব ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এই সব গ্রামীণ সংবাদপত্র স্থানীয় সংবাদ, স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় সংস্কৃতির সংবাদ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৭১ সালে বারুইপুর থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল এটুকু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও পরবর্তিকালে একে একে বহু সংবাদপত্র বারুইপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় সেগুলির মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় চিকিৎসকদের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদ পত্রও ছিল যেগুলির অস্তিত্ব এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এক সময় যে এই ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ধরনের সংবাদপত্র চিকিৎসকদের মধ্যে মতামতের আদানপ্রদান করার প্রয়োজনে প্রকাশিত হতো বলে আমার মনে হয়। এছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের দ্বারাও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে – যার সম্পাদক ছিলেন একজন স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এইভাবে বারুইপুর থানা এলাকা থেকে কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলি বিভিন্ন সংবাদপত্রপ্রেমিক বা সংস্কৃতিবান আবার কোন সহৃদয় প্রগতিশীল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সংবাদপত্রপ্রেমী সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে প্রচারের আলোকে আলোকিত হতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে একটা কথা বলা যায়, এই সব সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বারুইপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রকাশ, প্রচার এবং জ্ঞান বিতরণের কাজকে আরও দ্রুত প্রসার লাভ করার সুযোগ পান।

আপাতদৃষ্টিতে বারুইপুর থানা এলাকা থেকে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে বা এখনও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির একটি তালিকা এর সঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। জানিনা এই তালিকা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ। তবে একটা বিষয় সম্পূর্ণ তা হচ্ছে, সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাস প্রণয়নের সদিচ্ছা যে সফল হচ্ছে সেটাই বড় কথা।

(১) গাঙ্গেয় – শিখর রায় – ১৯৭২

(২) স্বরাজ – দেবপ্রসাদ ঘোষ – ১৯৭৭

(৩) লোকস্বরাজ – শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায় – ১৯৭৭

(৪) দিক্-দিগন্ত – এম.এ.মান্নান – ১৯৮১

(৫) মেদনমল্ল সংবাদ – দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।
(১৯৮৫– সাউথ গড়িয়া থেকে প্রকাশিত)

(৬) সুন্দরবন সংবাদ – শ্যামল রায়চৌধুরী – ১৯৯২

(৭) জনজীবন – গোবিন্দ সরকার , সৈকত হালদার,– ১৯৯৮

(৮) একবিংশতির আলো – মহঃ আবদুল মান্নান – ১৯৯৯

(৯) কৃষ্টিমন – রথীন দেব , গোপেশচন্দ্র পাল – ২০০০

(১০) অজানা বার্তা -- বৈশালী চক্রবর্তী – ২০০১

(১১) ইতিকথা– অরিন্দম রায়চৌধুরী – ২০০০

(১২) সংবাদ পুরপঞ্চায়েত – সুব্রত রায় – ২০০০

(১৩) সেরা খবর – সৈকত হালদার — ২০০০

(১৪) আলপথ – হান্নান আহসান — ২০০০

(১৫) জন্মভূমি দর্পণ – শুভময় মিত্র – ২০০০

(১৬) সুবর্ণলেখা – সুবীর দে – ২০০০

(১৭) হালচাল – সুধীরকুমার ভট্টাচার্য – ২০০৪

(১৮) রূপসী বাংলা – কাশীনাথ ভট্টাচার্য – ২০০৪

(১৯) প্রতিবিম্ব – অলক চক্রবর্তী – ২০০৪

এছাড়াও বারুইপুর অঞ্চলে যেসব সংবাদ মাধ্যম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন বা এখনও করে চলেছেন তাদের তালিকা–

(১) সেরা খবর – সৈকত হালদার / পরে কৃষ্ণকুমার দাস

(২) জেলাবার্তা – সুদীপ মৃধা

বিঃ দ্রঃ- সংবাদপত্রের তালিকাটি অসম্পূর্ণ থাকতে পারে।

বারুইপুরের যাঁরা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতায় রত আছেন ঃ-

শমীক ঘোষ, অলোক বন্দোপাধ্যায়, শিশির চক্রবর্তী, সাগর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার দাস, সৈকত হালদার, জয়ন্ত দাস, স্বাতী চৌধুরী, সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক চক্রবর্তী, বিনয় সরদার, সঞ্চারী চক্রবর্তী, হান্নান আহ্সান্, প্রদীপ দাস, আনসার উল হক্, রাজপ্রসেনজিৎ মিত্র, অজয় ঘোষ ও বাণীব্রত মাইতি ।

বারুইপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গ্রন্থাগার

সুবর্ণ দাস

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর মীরজাফর নবাব হবেন চার নম্বর চুক্তি অনুযায়ী কলকাতা থেকে কুলপী পর্যন্ত ২৪টি পরগনা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। জন্ম হয় অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার। প্রশাসনিক কারণে ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ অভিক্ত ২৪ পরগনা জেলা ভেঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আত্মপ্রকাশ করল। এই দঃ ২৪ পরগনা জেলার অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আদিগঙ্গা নদীর বুকে গড়ে ওঠা এক প্রাচীন জনপদ বারুইপুর। মহা প্রভু শ্রীচৈতন্য, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরিন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদা বাগচি, বিপ্লবী দেবন্দ্রনাথ মিশ্র, বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম বৈদ্য, সজল রায়চৌধুরী, সুশীল ভট্টচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্র বারুইপুর। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাস পিল্লাইয়ের মনসার ভাসান, বৃন্দাবন দাস প্রণীত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বারুইপুরের উল্লেখ আছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বারুইপুর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৮৭৫ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পরে। আর এই ঢেউয়ের প্রভাব থেকে বাদ পড়েনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাংলার অন্যতম পীঠস্থান বারুইপুর। ১৮৬৭ সালে কলকাতার জাতীয়তার প্রতীক হিন্দুমেলা নবগোপাল মিত্রের সম্পাদকত্বে এবং বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু, মজিলপুরের শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বারুইপুরের জমিদার রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই হিন্দুমেলা ১৮৬৯, ১৮৭১, ১৮৭২ সালে বারুইপুর রাসমাঠে অনুষ্ঠিত হয়ঙ্গ এই মেলায় গ্রন্থাগার বা সংঘগুলিকে গুপ্ত ঘাঁটি করে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এই বক্তব্যে পরবর্তীকালে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল বারুইপুরের তৎকালীন দুই বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রঙ্গ ১৯০৮ সালে বারুইপুর কাছারি বাজারে অমৃতলাল মারিকের গৃহাঙ্গনে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে এক রাজনৈতিক সভা হয়ঙ্গ এই সভায় এম.এন. রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবক নেতা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরাই ছিলেন বারুইপুরের বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে আরো জোরদার করবার জন্য ১৯১০ সালে পুরন্দর স্মৃতি পাঠাগার গড়ে তোলেনঙ্গ বারুইপুর অঞ্চলে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালাতেন এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কাজে সহায়তা করতেন বিপ্লবী সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, তুলসী মন্ডল, জানকী চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ ব্রহ্মচারী প্রমুখ যুবকগণ। এরা সবাই যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন আর ১৯৩৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজস্থানের দেউলি জেলে সাতকড়ি মারা যান। বারুইপুরে বিপ্লবী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাময়িক ভাঁটা পড়ে।

দঃ চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামের রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) দেশের মানুষের মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব জাগানোর জন্য ১৮৬১ সালে জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা স্থাপন করেনঙ্গ বলা বাহুল্য এই সভার অন্যতম লক্ষ ছিল সংঘ, সমিতি বা গ্রন্থাগার গড়ে তুলে সেখান থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করা। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিলঙ্গ।প্রখ্যাত নাট্যকার ও বারুইপুরে স্বদেশী চৈত্র বা হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনমোহন বসু বারুইপুরে স্বদেশী মেলার মাধ্যমে স্বদেশ প্রেমের চেতনার প্রসার ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা তুলে ধরেনঙ্গ বারুইপুরসহ অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনে আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বিপ্লবীদল, সাধন সংঘ, ছাত্রসংঘ, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, স্বারাজ্য পার্টি প্রভৃতি বিপ্লবী দল ও সংঘ অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনে বারুইপুর সন্নিহিত অঞ্চলে ঘাঁটি বেঁধেছিল। বারুইপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনে এই সব দল ও সংঘের লোকজন পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন।

কোদালিয়ার বিজয় দত্ত (১৯০৩-১৯৯২) ১৯০২ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুদিন পালনের অভিযোগে ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ্য পার্টি'র সক্রিয় সদস্য ছিলেনঙ্গ ১৯২৭ সালে তিনি বারুইপুর, রাজপুর, জগদ্দল, হরিনাভী প্রভৃতি গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র সংঘ (Student Association) গড়ে তোলেন। এই ছাত্র সংঘ পাঠাগারের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালাত। ছাত্রদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য (পালুদা), সুশীল ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, বিজন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ছিলেন।

হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এর দৌহিত্র অলক

চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বারুইপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সংঘ বা পাঠাগারকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রচারকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে তাঁদের অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এইভাবে আস্তে আস্তে আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন সংঘ এবং গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবী সমিতির সূচনা আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, লবন আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বারুইপুর ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রন্থাগার বা সংঘগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯১০ সালে বারুইপুর মদারাটের নিকটবর্তী প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহিনগরে ১৯১০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি সাধারণ পাঠাগার। মদারাটের তৎকালীন যুবকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে তোলেন 'মদারাট বান্ধব পুস্তকালয়,' যাঁদের প্রচেষ্টায় সে সময় পাঠাগারটি গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী সুবোধ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্থানীয় অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়ের একখানি ঘরে ১৯১৩ সালের ৯ মে বাংলা ১৩২০ সনের শুভ অক্ষয়তৃতীয়াতে প্রতিষ্ঠিত হল পাঠাগার। পাঠাগারের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঙ্গ মাত্র ১৯৬ খানি পুস্তক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও মাত্র ৪ বছরের প্রচেষ্টায় পুস্তক সংখ্যা ২১০০ তে পৌছায়। বাইরে থেকে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র দানবীর বিজয়চন্দ্র সিংহ, বারুইপুর পদ্মপুকুর নিবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গসহ ভূপেন্দ্রনাথ মন্ডল, হরিপদ দাস প্রমুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালের ১৮ জুন বারুইপুরের প্রথম মুন্সেফ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মিশ্র পরিবারের দান করা জমিতে নব উদ্যমে নবনির্মিত ভবনের কাজ শুরু হয়—ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই যুগে, পাঠাগারের দুটি শাখা খোলা হয়, একটি মদারাটের নিকটবর্তী, আটঘরায়, অপরটি বারুইপুর স্টেশনে দেবেন্দ্র মিশ্রের সুলভ ফার্মেসীতে। ১৯৫৩ সালে গ্রামের বালকদের দুটি পাঠাগার তরুণ সংঘ পাঠাগার ও কিশোর পাঠাগারকে সংযুক্ত করে বান্ধব পাঠাগারেই 'বালক বিভাগ' খোলা হয়। ১৯৬০ সালে কিছু কিছু যুবক পাঠাগারের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলে পাঠাগারের কর্মে জোয়ার আসে। ১৯৬১ সালে পাঠাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব পত্রিকা 'বান্ধব' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

রোডে শিক্ষাব্রতী প্রয়াত অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর বাসগৃহে শিশুদের জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়ঙ্গ এই শিশু গ্রন্থাগারটি রাজ্যের কোন পৌরসভা পরিচালিত প্রথম শিশুগ্রন্থাগারঙ্গ বর্তমান পৌরবোর্ড এই শিশু গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে বারুইপুরের শিশুদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছেন। এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র উদ্বোধন করেন মাননীয় বিধায়ক অরূপ ভদ্র মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নির্মলেন্দু গৌতম।

ঃ বারুইপুর অঞ্চলের গ্রন্থাগার ঃ

- বারুইপুর শহর গ্রন্থাগার ঃ পোঃ বারুইপুর দঃ ২৪পরগণা,
- বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার ঃ পোঃ বারুইপুর দঃ ২৪পরগণা
- মিলন সংঘ পাঠাগার ঃ পোঃ বারুইপুর, দঃ ২৪পরগণা,
- মদারাট বান্ধব পাঠাগার ঃ পোঃ মদারাট, বারুইপুর, দঃ ২৪পরগণা,
- রামনগর গ্রন্থাগার ঃ পোঃ রামনগর, বারুইপুর, দঃ ২৪পরগণা,
- রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ঃ
  পোঃ সূর্যপুর হাট, কেয়াতলা, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা
- রামতরন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী

  পোঃ সাউথ গড়িয়া, বারুইপুর দঃ ২৪ পরগণা
- বারুইপুর পৌর শিশু গ্রন্থাগার (পৌরসভা পরিচালিত)
  কে.সি.মিত্র রোড, পোঃ বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা
- কমলাক্লাব পাঠাগার ঃ শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায় রোড
  পোঃ বারুইপুর দঃ ২৪পরগণা
- শরৎ স্মৃতি সদন ঃ গ্রাম - মদারাট (মাস্টার পাড়া)
  পোঃ বারুইপুর দঃ ২৪পরগণা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যেসব গ্রন্থাগার, ক্লাব কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল কিছু গ্রন্থাগার তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল –

১) দক্ষিণ দুর্গাপুরের উদয়ণ সংঘ ক্লাব ও গ্রন্থাগারঙ্গ।

২) রামনগরের তিমির আদিত্য স্মৃতি পাঠাগার।

১৯৩৫ সালে আনন্দময়ী পাঠশালায় কতিপয় বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতিতে একটি পাঠাগার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেইদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অজিতকুমার ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমূল্যধন ব্যানার্জী, কুমুদকান্ত চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ মুখার্জী, গৌরকিশোর ঘোষ, কালিদাস সাহা, প্রভাতকুমার মুখার্জী, সুবোধনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত, মৌলবী আজিজুর রহমান, নিশীথকুমার রায়চৌধুরী, অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস ব্যানার্জী, নিহারলাল রায়চৌধুরী, সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ এইসব ব্যক্তিগণের চিন্তায় জন্ম নিল বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার। রমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর বৈঠকখানায় প্রথম এর সূচনা। পরবর্তিকালে বারুইপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী পৌরসভা থেকে এই লাইব্রেরীর গৃহ নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। আজ সেখানে সাধারণ পাঠাগার অবস্থিত। পরবর্তিকালে রাধাকান্ত দত্ত, নিরোদলাল রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী ও নির্মল ব্যানার্জী এই পাঠাগারে উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

ধপধপি গ্রামে কতিপয় যুবক দক্ষিণরায় মন্দিরের পেছনে বেণী মিত্রের বাড়িতে একটি ঘরোয়া পাঠাগার নির্মাণ করেছিলেন। এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করে বারুইপুর থানার কতিপয় যুবক মার্কসবাদ লেনিনবাদ-এর শিক্ষা শুরু করেন।

শতবর্ষ ও অর্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত গ্রন্থাগারগুলি ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটিঙ্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বিপ্লবীরা বই পত্র-পত্রিকার মধ্যে লুকিয়ে রাখতঙ্গ তাই ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থাগারগুলির প্রতি তীক্ষ্ন নজর রাখত এবং প্রয়োজনে গ্রন্থাগারগুলি তল্লাশী চালাত। তবে একথা ঠিক যে, দঃ ২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আদিগঙ্গা তীরবর্তী বারুইপুর-রাজপুর-হরিনাভী প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু জনপদকে কেন্দ্র করে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কবি-সাহিত্যিক-সমাজসেবী, রাজনীতিবিদদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল করতে সমর্থ হয়েছেঙ্গ বারুইপুরে গ্রন্থাগার আন্দোলনে দুজন ব্যক্তির নাম পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া যেসব ব্যক্তি নিরলসভাবে বারুইপুর অঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরদার করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা হলেন অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রয়াত পূর্ণেন্দু ভৌমিক, প্রয়াত নাট্যকার সজল রায়চৌধুরী, বারুইপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হেমেন মজুমদার, সবাজসেবী প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র, সুভাষ বসু, প্রশান্ত পুরকাইত, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালে বারুইপুর পৌরসভা কর্তৃক ৫নং ওয়ার্ডের কে.সি.মিত্র

৩) খোদারবাজার লায়ন্স ক্লাব ও স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।

৪) উত্তর উকিলপাড়া ভাই ভাই সংঘ পাঠাগার।

৫) সোনালী সংঘ ক্লাব ও গ্রন্থাগার।

৬) সাউথ গড়িয়ায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাব ও পাঠাগার।

৭) নড়িদানা ক্লাব ও পাঠাগার।

৮) পুরন্দরপুর মিলনী সংঘ ক্লাব ও গ্রন্থাগার।

৯) শাসন যুবক সমিতির গ্রন্থাগার।

১০) আটঘরা সুপ্রভাত পাঠাগার।

১১) প্রগতি সাহিত্যচক্র ও পাঠাগার।

১২) রামসাধন স্মৃতি পাঠাগার।

বারুইপুরে শিশুসাহিত্যিক অতিথিবৃন্দ

অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমৃদ্ধশালী জনপদ। আদিগঙ্গার তীরে সবুজের দেশ। আজ মহকুমা শহর। স্মরণাতীত কাল থেকে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প , সাহিত্য ও সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত। সাহিত্য চর্চার শুরু সেই প্রাচীন কাল থেকেই । মুদ্রন ব্যবস্থা যখন এই ভূখন্ডে পৌছায়নি তখন সাহিত্যের সৃষ্টি লিপিবদ্ধ হতো পুঁথিতে। সে যুগ পেরিয়ে সাহিত্য প্রবেশ করেছে আধুনিক যুগে।

এই যুগে সাহিত্যের সব ধারায় এসেছে নতুনত্বের ছোঁয়া, এসেছে গতি। সেই প্রবাহে বারুইপুরের সাহিত্যও সামিল হয়েছে। বাংলার সাহিত্যে করে নিয়েছে উজ্জ্বল স্থান। শিশুসাহিত্য তার অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করেছে।

নয়ের দশকের প্রায় শুরু থেকে একটি সংগঠিত মঞ্চের মাধ্যমে সম্মিলিত ভাবে বারুইপুরে শিশুসাহিত্যের পথ চলা শুরু হয়। মনোরঞ্জন পুরকাইতের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালের ১৫ই আগষ্ট তৈরী হয় 'দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ'। শিশুসাহিত্যের নতুন মঞ্চ। 'ছোটদের সোনারকেল্লা' নামে ছোটদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন – অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উত্থানপদ বিজলী, বিশ্বনাথ রাহা, চন্দ্রচূড় ঘোষ, বিনয় সরদার, তপন নস্কর, আনসার উল হক, অজিত ত্রিবেদী, সৈকত হালদার ও প্রবোধ হালদার। ঐ বছরই ১০ই নভেম্বর মাষ্টারদা হরেন ঘটক পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন শিশুসাহিত্যিকদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য 'হরেন ঘটক পুরস্কার' প্রদান করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহন করেন এবং বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হন – পাঁচুগোপাল রায়, ড. পূর্ণেন্দু ভৌমিক, হান্নান আহসান, সুখেন্দু মজুমদার, পরেশ সরকার, স্বপনকুমার রায়, প্রণব কুমার পাল, শান্তিকুমার ব্যানার্জী, কল্পনা ভট্টাচার্য, রফিকুল ইসলাম, তপন গায়েন, মানসী বালা, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিল আহমেদ, রিয়াদ হায়দার, প্রদীপ দাস, জয়দীপ চক্রবর্তী, রাজকুমার বেরা, মানিক চন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভগীরথ মাইতি বিপদবারণ সরকার, মানস চক্রবর্তী, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, শক্তি রায়চৌধুরী, প্রশান্ত সরদার, পুণ্ডরীক চক্রবর্ত্তী, অমলেন্দু বিকাশ দাস, শশাঙ্ক শেখর মৃধা, প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল, নারায়ন আচার্য, আব্দুল রফিক সেখ, নবারুন চক্রবর্তী, অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য চক্রবর্তী, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গৌতম কুমার দাস, সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আজিজুল হক, সুবর্ণ দাস, জ্যোতি নন্দী, কালীপদ মনি, সৌম্যদীপ দাস,

ঋষি সরকার, স্বপনকুমার মান্না, তীর্থ ব্যানার্জী, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, নরনারায়ন পূততুন্ড, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় বাদল চন্দ্র বিশ্বাস , চঞ্চল নস্কর, আব্দুলহালিম শেখ, আশীষ ভারতী, সুবলসখা চক্রবর্ত্তী, আমিনুদ্দিন বৈদ্য, ত্রিনয়ন দাস, দেবাশীষ ঘোষ, ভরত মুখোপাধ্যায়, এম. তাবারুক আলি, এন. জুলফিকার আলি, আব্দুল মজিদ মল্লিক, জ্যোতির্ময় সরদার, শমীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিক।

দক্ষিণবঙ্গ শিশুসাহিত্য পরিষদ-এর প্রথম পরিচালন সমিতি

উপদেষ্টা মণ্ডলী – পবিত্র সরকার, পূর্ণেন্দু ভৌমিক, আবুল বাসার, জয়কৃষ্ণ কয়াল। সভাপতি – উত্থানপদ বিজলী। সহসভাপতি – অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরেশ সরকার, রফিকুল ইসলাম।

প্রধান সম্পাদক – মনোরঞ্জন পুরকাইত। সম্পাদকমণ্ডলী – সুখেন্দু মজুমদার, বিশ্বনাথ রাহা, আনসার-উল-হক, হাননান আহসান, বিনয় সরদার, অজিত ত্রিবেদী। বিজ্ঞাপন ও বিপনন – তপন নস্কর । কোষাধ্যক্ষ – চন্দ্রচূড় ঘোষ।

১৯৯৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাননীয় মন্ত্রী পতিত পাবন পাঠক, প্রাক্তন বিধায়ক হেমেন মজুমদার, পৌরপ্রধান মৃণাল চক্রবর্তী, জাতীয় শিক্ষক ডঃ পূর্ণেন্দু ভৌমিক, শ্রী শৈলেন ঘোষ, আবুল বাসার, তপন চক্রবর্তী, সুদেব বক্সী, নির্মল ব্যানার্জী, রূপক চট্টরাজ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ শতাধিক শিশু সাহিত্যিকগনের উপস্থিতিতে অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় কে 'হরেন ঘটক পুরস্কার' প্রদান করা হয়। আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সরল দে মহাশয়কে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাষ্টারদার ভাইপো বরুন ঘটক, পুত্রবধু সুজাতা ঘটক ও নাতনী মিঠু। সভাপতিত্ব করেন কবি উত্থানপদ বিজলী।

এই দিন প্রকাশিত হয় ছোটদের সোনারকেল্লার প্রথম সংখ্যা। পত্রিকার সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পঞ্চানন মালাকর। মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কলকাতার গোয়াবাগানের দক্ষিণেশ্বরী প্রেস। সেই পথ চলা শুরু। দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য পরিষদ ও ছোটদের সোনারকেল্লা-র পথ চলায় পঞ্চানন মালাকরের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করি। প্রথম দিন থেকেই অধ্যাপক পঞ্চানন মালাকর, আমাদের প্রিয় পঞ্চাননদা হয়ে সব সময়ে পাশে থেকেছেন। পবিত্র সরকার, শৈলেন ঘোষ, নির্মলেন্দু গৌতম, সরল দে, আবুল বাসার, ডঃ রাসবিহারী দত্ত, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার , তাপস মুখোপাধ্যায়, পার্থজিৎ গঙ্গেপাধ্যায়, সুনির্মল চক্রবর্তী, সমর পাল প্রমুখের সান্নিধ্য আমাদের পথ চলাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৯৪ থেকে আজ পর্যন্ত এই দশ বছর ধরে 'হরেন ঘটক পুরস্কার' প্রদান ও ছোটদের সোনারকেল্লা-র প্রকাশ নিয়ম মতোই চলছে। বারুইপুর শ্রী চৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল,

ঋষি অরবিন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এর বহু মহাপুরুষের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। সাতের দশকে রামনগরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ। শিশুসাহিত্যকে কেন্দ্র করে বারুইপুরে এসেছেন বহু নমস্য ও খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিকগন। দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য পরিষদ গঠিত হওয়ার আগে বাংলা ১৩০০ সালের শেষ সন্ধ্যায় বারুইপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়াসংঘ ভবনে সোনালী সংঘের ব্যবস্থাপনায় মনোরঞ্জন পুরকাইতের উদ্যোগে মাস্টারদা হরেন ঘটককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সরল দে প্রধান অতিথি, কৃষ্ণ ধর বিশেষ অতিথি ও ড. পূর্ণেন্দু ভৌমিক সভাপতি সহ প্রায় একশ জন শিশুসাহিত্যিক ছড়া, কবিতা আর গানে অংশ গ্রহন করেন। সে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

শৈলেন ঘোষ, নির্মলেন্দু গৌতম, গৌরী ধর্মপাল, জ্যোতিভূষণ চাকী, পবিত্র সরকার, সামসুল হক, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তপন চক্রবর্তী, বলরাম বসাক, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ বেরা, সনৎকুমার চট্টোপ্যায়, নরোত্তম হালদার, উত্থানপদ বিজলী, অরুন চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোক কুমার মিত্র, কার্ত্তিক ঘোষ, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রূপক চট্টরাজ, আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়, গৌর সেন, অনির্বান রায়চৌধুরী, শ্যামলী দাস, শেফালী চক্রববর্ত্তী, বিনয় দেব, তাপসী আচার্য, অনুকূল মণ্ডল, অরুন চট্টোপাধ্যায় , প্রবীর জানা , লক্ষ্মীকান্ত রায় , বরুণ মণ্ডল, তুলসী বসাক, চন্দন নাথ, ইভা চক্রবর্তী, ফারুকিয়া বেগম, সৈয়দ রেজাউল করিম, কালিদাস ভদ্র, আশিস ভুঁইয়া, সুজাউদ্দীন গাজী, সেখ মহিউদ্দিন , পরিতোষ কুরি, নির্মলেন্দু শাখারু , নরহরি দাস, প্রণব সেন, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায় , অমিতাভ রায়, কে এম সহিদুল্লা, সুধীর বেরা, অবি সরকার, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, রূপক চট্টরাজ , অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ সরকার, রামচন্দ্র ধাড়া, রফিকুল ইসলাম, অমল ত্রিবেদী, সমর পাল, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, শিখা দেব, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, হিমাংশু সরকার, নীলাদ্রি বিশ্বাস, ভাগ্যধর হাজারী, শিশির সাঁতরা, রাসবিহারী দত্ত, তাপস মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস অপূর্ব কুমার কুণ্ডু, সুব্রত ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন ঘাটী, শৈলেন্দ্র হালদার, বিজন দাস, অজয় হালদার, কানাই লাল পরমান্য, অজিত নস্কর, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পুরকাইত, মুরারী মান্না, মোহন নস্কর, বিমল পন্ডিত, তপন কুমার দাস, অলোক দত্ত চৌধুরী, সুদেব বক্সী, ড. সত্যেন্দ্রনাথ নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, শেখ মুস্তাক আহমেদ,সেকেন্দার আলি সেখ, সমর চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটি নস্কর, অঞ্জলি চক্রবর্তী, ওয়াজেদ আলি , গালিব ইসলাম, শাজাহান সিরাজ, অসিত দত্ত, বিমল পন্ডিত, বরুন চক্রবর্ত্তী, বিকাশ পন্ডিত, সায়ন্তনী পাল, সুবল নস্কর রবীন্দ্রনাথ পান্ডে, তাজিমুর রহমান, শশাঙ্কশেখর মৃধা,

সুধারানী মৃধা, প্রবীররঞ্জন মণ্ডল, রাজকুমার বেরা, এল ওয়াজেদ, অবশেষ দাস, শিশির পাইক, সমীর হালদার, তাপস ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ ঘোষাল, বিকাশচন্দ্র সেন, মনোজকান্তি ঘোষ, শমীন্দ্র ভৌমিক, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, জয়শ্রী মৃধা, শঙ্করকুমার চক্রবর্ত্তী, দয়াময় হালদার, আদম সফি, অমৃতলাল পাড়ুই, স্বপন পাল, প্রদীপ দেববর্মন, আবুল বাসার হালদার সহ শিশু সাহিত্যের প্রায় সব লেখক লেখিকা কোন না কোন অনুষ্ঠানে বারুইপুরে এসেছেন। তাঁদের পদস্পর্শে এবং সাহচর্যে বারুইপুরের শিশুসাহিত্যের চর্চা পল্লবিত হয়েছে। পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে আমরা হয়েছি সমৃদ্ধশালী। দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য পরিষদ ও ছোটদের সোনারকেল্লার সাফল্য-সাহিত্য চক্রবর্ত্তী, পাভেল গায়েন, টিউলিপ গায়েন, সুদেষ্ণা রায়চৌধুরী, দুর্বা পাইক, পায়েল মাইতি, সপ্তক ভট্টাচার্য প্রমুখ নতুন প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি। ছোটদের জন্য পত্রিকা, ছড়া, কবিতা , গল্প ও শিশুসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বারুইপুরে জোয়ার এসেছে। পূর্ণ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার। বারুইপুর বইমেলা ও বারুইপুর শিশুবইমেলার আমন্ত্রনেও বহু শিশুসাহিত্যিক বারুইপুরে এসেছেন। ছোটদের সোনারকেল্লা, ছড়া দিলেম ছড়িয়ে, আলোর পাখি, হিং টিং ছট, অজগর প্রভৃতি পত্রিকা আয়োজিত শিশুসাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা প্রান্ত থেকে সাহিত্যিকগন বারুইপুরে আতিথ্য গ্রহন করেছেন। কলকাতাস্থ্ বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মহঃ তৌহিদ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিন্‌হা, গনেশ মন্ডল, নিশীথ অধিকারি প্রমুখ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শিশুসাহিত্যের আমন্ত্রনে বারুইপুরে এসেছেন।

যাঁদের আর্শীবাদ ও আন্তরিক সহযোগিতা বারুইপুরের শিশুসাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করেছে তাঁরা হলেন – অন্নদাশঙ্কর রায়, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার কয়াল, সন্তোষকুমার দত্ত, পরেশ মণ্ডল, উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতুন ঘাটী, কমল চৌধুরী, দেবাশিষ বন্দোপাধ্যায়, কালিচরণ কর্মকার, বিমল পাল, নির্মল ব্যানার্জী, জয়কৃষ্ণ কয়াল, সৌরেন বসু, বিনোদ বেরা, সুনীল দাস, সজল ভট্টাচার্য, সম্পাদক মণ্ডলীর সব সদস্য, তিন প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক হেমেন মজুমদার, সুজন চক্রবর্তী ও অরূপ ভদ্র, তিন প্রাক্তন ও বর্তমান পৌরপ্রধান মৃনাল চক্রবর্তী, রবীন সেন ও ইরা চট্টোপাধ্যায়, সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান পৌরসভার কাউন্সিলার বৃন্দ, এবং প্রাক্তন মহকুমা শাসক অমল দাস, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রবিকর পালিত, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মুক্তি মজুমদার সহ দক্ষিণবঙ্গ ও বারুইপুরের সমস্ত সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী ও সামাজিক সংগঠন।

বারুইপুরের লোকায়ত শিল্প ও লোকসংস্কৃতি

ডঃ কালিচরণ কর্মকার

স্থাননামরূপে বারুইপুরের লিখিত পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৪ খ্রীঃ বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যে –

"কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে,
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে।"

অতঃপর ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যেও বারুইপুর নামটি উল্লিখিত-

"সাধুঘাটা পাছে করি
সূর্য্যপুরে বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।"

সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্বেও যে, বারুইপুরে বারুজীবী বারুই সম্প্রদায় বসবাস শুরু করেছিলো তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার বারোভুঁঞাদের অন্যতম প্রতাপাদিত্য সমগ্র চব্বিশ পরগনা সহ সুন্দরবন অঞ্চলে এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে এই অঞ্চলকে জনসমৃদ্ধ করে তোলে। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটলে এই অঞ্চল পুনরায় পোর্তুগীজ, মগ, বোম্বেটে প্রভৃতি লুটেরাদের দ্বারা এবং উপর্যুপরি বেশ কয়েকবার ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসলীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুনরায় ইংরাজ আমলে সুন্দরবনের অন্তর্গত রূপে বারুইপুর অঞ্চলে জঙ্গল পত্তন করে মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠে, বিশেষ করে এই অঞ্চলের জমিদার দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী এবং পরে রাজবল্লভ রায়চৌধুরী তাঁদের পূর্ববর্তী বাসস্থান রাজপুর পরিত্যাগ করে বারুইপুরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আগমন করেন এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত অর্থে তখন থেকেই বারুইপুর অঞ্চলে লোকায়ত গার্হস্থ্য শিল্পের ক্রমবিকাশ ঘটে। অবশ্য সুদূর অতীতে অর্থাৎ পাল, সেন, গুপ্ত, কুষাণ, মৌর্য ও প্রাক্ মৌর্যযুগের যে সব প্রত্ন নিদর্শন এখানকার মৃত্তিকার গর্ভ থেকে উত্তোলিত বা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্তিকাশিল্প, দারুশিল্প, ধাতুশিল্প ইত্যাদিতে এখানকার প্রাচীন লোকসমাজ নিয়োজিত হয়েছিল।

বারুইপুর থানার লোকায়ত শিল্প ও তৎসংক্রান্ত লোকসংস্কৃতি আলোচনার প্রারম্ভেই ঐতিহাসিক কারণেই এখানকার দু-একটি প্রাচীন লোকশিল্প যা অধুনা অবলুপ্ত, সেগুলির উপর স্বল্প আলোকপাতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

লবণশিল্প ঃ একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা না-গেলেও বৃহৎ সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমান যুগ

থেকেই এক শ্রেণীর অনেকাংশে ভবঘুরে মানুষকে এখানকার লোনাজল ও লোনামাটি থেকে লবণ তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এদের বলা হত মলঙ্গী। জমিদারী আমলে এরা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে লবণ প্রস্তুতের উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট পরিমান খাজনা দিয়ে জমা নিত এবং লবণ প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই লবণাক্ত স্থান 'খালারি' বা স্থানীয় ভাষায় 'মেলাঙ্গী মহল' (নিমক মহল) নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তিকালে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুন্দরবনের লবণ উৎপাদক অঞ্চল বা নিমক মহলগুলি (সল্ট এজেন্সি) হস্তগত করেন। তখন দেশীয় মলঙ্গীরা আর পূর্বের মত স্বাধীনভাবে লবণ তৈরী করতে পারতো না। তাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদারদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে লবণ প্রস্তুত করতে হত এবং সেই লবণ তারা ইজারাদারদের কাছে তাঁদের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী বিক্রী করতে বাধ্য হত।

এই সময় বারুইপুর অঞ্চলে লবণাম্বু পিয়ালী নদী ও তার শাখা খালগুলির আশেপাশের লোনা অঞ্চল যথা কালিকাপুর, পাঁচঘরা, মলঙ্গা (নামটি উল্লেখযোগ্য), রঘুনন্দনপুর, কামরা, তেঁতুলিয়া, পুঁড়ি, বিদ্যাধরপুর, আকনা, টগরবেড়ে, ভুরকুল, বেগমপুর, কৈলাসবাবুর আবাদ, উত্তরভাগ, মাঝপুকুর, দমদমা, বৃন্দাখালি প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মানুষজন লবণ প্রস্তুত শিল্পের সংগে সংযুক্ত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে এই লবণ ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ও লোভনীয় হয়ে উঠলে লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইংরাজ সরকার সুন্দরবন অঞ্চলে রায়মঙ্গল সল্টএজেন্সী এবং চব্বিশ পরগণা সল্টএজেন্সী স্থাপন করেন। পরে রায়মঙ্গল সল্ট এজেন্সী চব্বিশ পরগণা সল্টএজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত হয়। বৃহত্তর চব্বিশ পরগণা সল্টএজেন্সীর অন্তর্গত হয় বারুইপুর সল্টএজেন্সী। বারুইপুর শহরের অধুনা রবীন্দ্রভবনের সম্মুখে নিউ ইন্ডিয়ান মাঠের উত্তরপশ্চিম কোণে বারুইপুর সল্ট এজেন্সীর প্রধান কার্যালয়টি আজও জমিদার রায়চৌধুরী বংশের অধিকারভুক্ত হয়ে বর্তমান। এটি নীলকর সাহেবদের বড়কুঠীরূপেও পরিচিত লাভ করেছিল।

বারুইপুর অঞ্চলের মানুষ তৎকালে যথারীতি ছাঁকন পদ্ধতি ও আগুনের তাপে লবণাক্ত জল ফোটানো পদ্ধতি– এই দুভাবে লবণ প্রস্তুত করতেন। নদী বা খালে জোয়ারের সময় লবণাক্ত জল পার্শ্ববর্তী স্থান ডুবিয়ে দেওয়ার পর ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে ঐ সব স্থানে লোনা স্তর পড়ত কিংবা গর্তের মধ্যে যে লোনা জল জমে থাকত তা থেকে উপরোক্ত দুই পদ্ধতিতেই লবণ প্রস্তুত হত। গর্তে জমে-থাকা লোনাজলকে নালা কাটিয়ে অন্যস্থানে অপসারণ করার সময় এঁরা ঐ জলে শুকনো পাতা, খড়কুটো ফেলে দিত, তাতে এগুলি ব্লটিং পেপারের মত জল শুষে নিত আর পড়ে থাকতো লবণ। দ্বিতীয়ত ভাঁটার পর শুকিয়ে-যাওয়া লবণাক্ত মৃত্তিকা নারকেল মালা দিয়ে চেঁচে নিয়ে ঐ মৃত্তিকা একটি বিশেষ ভাবে তৈরী মাটির ভাঁড় বা পাত্রে এঁরা ভরে দিতেন। ঐ ভাঁড় বা পাত্রে পূর্ব থেকে কিছু ধুলা, বালি, খড়, খেঁজুরপাতা, নারকেলপাতা ইত্যাদি থাকতো। এরপর ঐ পাত্রে ক্রমাগত জল ঢালতেন, তখন লবণ-মৃত্তিকা থেকে লবণ ঐ জলে মিশে যেত আর মৃত্তিকার ভাগ তল-দেশে রাখা বস্তুগুলিতে

আটকে গিয়ে শুধু ছেঁকে যাওয়া লবণাক্ত জল ভাঁড় বা পাত্রের নীচের একটি ছিদ্র দিয়ে টপে টপে নীচে রাখা আর একটি পাত্রে সঞ্চিত হত। পরে ঐ ছেঁকে যাওয়া লবণাক্ত জল আগুনে ফুটিয়ে বাষ্পীভূত করে পাত্রে পড়ে থাকা মিহি শুভ্র লবণ সংগ্রহ করতেন। এইভাবে এক সময় লোকায়ত লবণ শিল্প এই অঞ্চলের লোকসমাজের একটা বড় অংশের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হয়েছিল। অবশেষে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারি তত্ত্বাবধানে লবণ তৈরী বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বাইরে থেকে কলে তৈরী লবণ আমদানী করা হয়।

লোকশিল্পজাত এই লবণকে কেন্দ্র করে অখণ্ড ২৪ পরগণায় একদা যে লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যাপক অনুশীলন বারুইপুর অঞ্চলের লোকজীবনে পরিলক্ষিত হয়। 'যার খাই নুন/তার গাই গুণ' থেকে শুরু করে 'জোঁকের মুখে নুন', 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়', 'যতটা আদা ততটা নুন/ তবে বুঝবে আদার গুণ', 'নুন পুটুলীর সাগর মাপা', 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচন এখানে মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। মুড়ি ভাজার ক্ষেত্রে নুনের ভূমিকা নিয়ে এখানে একটি ছড়ায় শোনা যায় – 'খোলায় মুড়ি চড়বড় করে একটু পরেই চুপ/ কোন সাগরে নুনের কেটো সাগরেতেই ঝুপ্'। 'খই দই লবণ চিনি' – বলে ছড়া কাটতে কাটতে এখানকার শিশুরা এক হাতের তালুর উপর আর এক হাতের তালু উল্টো বা সুল্টো করে ফেলে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লুকোচুরি বা কুমীরডাঙা খেলায় কে প্রথম চোর বা কুমীর হবে তা নির্ধারণ করে। গাদি খেলায়ও নুনচুরি করে মালিকের নুনের গাদিতে পৌছে দেওয়া এবং নুন চোরের পিছনে দারোগার অনুসরণ ইত্যাদি ঘটনাই ক্রীড়াচ্ছলে ব্যক্ত হয়। গাদি এই অঞ্চলের লোকায়ত সমাজের একটা জনপ্রিয় খেলা। ঝাড়ফুঁকেও বারুইপুর থানার গ্রামাঞ্চলের ওঝা গুণীনরা নুনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রপড়া নুন মানুষকে খেতে দেন – এটি একটি যাদুবিশ্বাসজাত চিকিৎসা পদ্ধতি। 'নুন নুন নোনতা হেমসাগরে জন্ম/ ঢেউ এসে ঢেউ যায় / ঢেউ চিরে পাণি খায়/ কার আজ্ঞে /বড়পীর গোঁসাইয়ের আজ্ঞে/ অমুকের (রোগীর নাম) পেটের কাঁটা খোঁচা/ সব দূর হয়ে যাক গে / ফুঃ ফুঃ ফুঃ।' লোকায়ত সংস্কারে লবণ অশুভ শক্তিনাশক, তাই এই অঞ্চলে রাত্রিবেলায় কোন খাদ্যবস্তু স্থানান্তরের সময় খাদ্যপাত্রের উপরিভাগে কিঞ্চিৎ লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বারুইপুর থানার আরও দুটি এককালের জনপ্রিয় কিন্তু অধুনা অবলুপ্ত লোকশিল্প হল দধি প্রস্তুত শিল্প ও হস্তচালিত তাঁতশিল্প।

দধিশিল্প ঃ থানা বারুইপুরের অন্তর্গত ধপধপি রেল স্টেশন সংলগ্ন চাঁদোখালি গ্রামের ঘোষপাড়ার দইয়ের সুনাম চাঁদোখালিকে এক দিন বিখ্যাত করেছিল। এই ঘোষপাড়ার বেশ কিছু পরিবার বিশেষ করে বীরেন ঘোষের পরিবার সুখ্যাত দইশিল্পকে অবলম্বন করে সুনামের সংগে জীবনজীবিকা নির্বাহ করতেন। বীরেনবাবুকেই চাঁদোখালি দইশিল্পের প্রবাদপুরুষ বলা যায়। এই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ভাপা দইয়ের খ্যাতি একদা সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু বিখ্যাত বনেদী পরিবার ও ব্যক্তিত্ব চাঁদোখালির দই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার থেকে শুরু করে বর্ধমানের রাজ পরিবারেও চাঁদোখালির ভাপা দইয়ের সুনাম ছিল।

চাঁদোখালির দইশিল্পীরা তাঁদের দই প্রস্তুতির জন্য মোষের দুধ, খেঁজুরগুড়ের তৈরী চাবড়া বাতাসা, চিনি, লঠকন গাছের দানা (এই দানা ভিজিয়ে লালচে ও সুগন্ধী জল দুধের সংগে মেশানো হত) ইত্যাদি উপকরণ রূপে ব্যবহার করতেন।

কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চাঁদোখালির এই অতুলনীয় স্বাদের দই প্রস্তুত হত। প্রথমে খড় দেওয়া টিন ভর্তি মোষের দুধ সাদা কাপড়ে ভালো করে ছেঁকে কড়াইতে ঢেলে 'ঝোলা'তে (বড় উনান) বসিয়ে তেঁতুল কাঠ বা পেয়ারা কাঠ বা ঘুঁটের আগুনে জ্বাল দেওয়া হত। যতক্ষণ না দুধের রঙ ঈষৎ হলুদাভ হত ততক্ষণ চলত খন্তি দিয়ে দুধ ক্রমাগত নাড়ানোর পর্ব। তারপর কড়াই নামিয়ে চিনি, খেঁজুরগুড়ের চাবড়া বাতাসা এবং লঠকন দানা ভেজানো জল দুধের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হত। সবশেষে মাটির হাঁড়ির মধ্যে একটু করে দম্বল দিয়ে ঐ দুধের মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে হাঁড়িগুলির মুখ সরা দিয়ে ঢেকে উত্তমরূপে কাঁথা, কম্বল,বস্তা ইত্যাদি ঢেকে দেওয়া হত। প্রায় সাত-আট ঘন্টা পর হাঁড়িতে দই বসে যেত। চাঁদোখালির বীরেন ঘোষের ভাপা দই ছিল এমন এক মিষ্টান্ন যে, শোনা যায়, একবার খেলে তার স্বাদ রসনায় এমন এক তৃপ্তি এনে দিত যা দীর্ঘদিন ভোলা যেত না, খোয়া ক্ষীর, ছানা, চিনি এবং একটু টক দই ভালো করে মেড়ে মাটির ভাঁড়ে মাখন মাখিয়ে নিয়ে তারপর ঐ মেড়ে রাখা মিশ্রণটি ভাঁড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড় ফুটন্ত জলে পূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ভাঁড়টিকে বসিয়ে দেওয়া হতো, একে ভাপানো বলে। যখন ঐ ভাপানো দই হাতের আঙুলে আর লাগতো না তখন ভাঁড়টিকে নামিয়ে ফেলতে হতো। এই দই এতো শক্ত হতো যে চামচ দিয়ে কেটে খেতে হতো।

বীরেন ঘোষের মৃত্যুর সংগে সংগে চাঁদোখালির দই শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। পরবর্তী প্রজন্ম অপেক্ষাকৃত লাভজনক অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করলে এবং এই ধরনের উৎকৃষ্ট দই তৈরী করার জন্য যে নিষ্ঠা, যত্ন, পরিশ্রম এবং ঝামেলা তাতে অনাগ্রহ বৃদ্ধি পেলে চাঁদোখালির ঘোষপাড়ার দই শিল্প ক্রমশ অবলুপ্তির পথে পা বাড়ায়। কিন্তু আজও বীরেন ঘোষের ভাপা দইয়ের সুনাম মানুষের মুখে প্রবাদের মত হয়ে আছে –

বীরেন ঘোষের ভাপা দই
তার তুলনা জগতে কই !

তাঁত শিল্প ঃ আমাদের থানায় বর্তমানে তাঁতি সম্প্রদায় বিরল হলেও একসময় অধুনা ১নং রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডু গ্রামে চটারপাড় নামক স্থানে মল্লিক উপাধিধারী বেশ কিছু তাঁতী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান পরিবার হস্তচালিত তাঁত চালিয়ে মোটা গামছা, ধুতি, কাপড় ইত্যাদি তৈরী করতেন। স্থানীয়ভাবে এঁদের তৈরী তাঁতবস্ত্রের ও গামছার সুনাম ছিল। ৪০/৫০ বছর পূর্বেও এঁদের তাঁত শিল্প কর্ম সচল ছিল। পরে যন্ত্রচালিত তাঁতের উৎপাদন ও বাজার দামের কাছে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না-পেরে এই অঞ্চলের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অপমৃত্যু ঘটে।

এবার এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সচল লোকায়ত শিল্পগুলির ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবো। মনে রাখতে হবে লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত অধিকসংখ্যক সাধারণ মানুষ যখন

মোটামুটি ভাবে বাড়ীতে বসে কিংবা বাড়ীর আশেপাশে তাঁদের ছোটখাটো কর্মশালায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বা অল্প সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে হাতে অথবা ছোটখাটো যন্ত্রের সাহায্যে যে শিল্প কর্ম ছোট উদ্যোগে সম্পন্ন করে থাকেন তাকেই লোকায়ত শিল্প বলা যায়। বারুইপুর থানায় নিম্নালোচিত শিল্পগুলিকে সেই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

মৃৎশিল্প ঃ- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের থানার আটঘরা, সীতাকুণ্ডু, বিড়াল, ধর্মনগর (ধামনগর), পুরন্দরপুর, সূর্যপুর, নাচনগাছা, শাসন প্রভৃতি স্থানের মাটির তলা থেকে যে সব প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সে গুলির মধ্যে মৃত্তিকা নির্মিত দ্রব্যাদির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানে মৃৎশিল্পীরূপে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল বহু প্রাচীন যুগে। পরবর্তিকালে অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের শাসনের অবসান ঘটলে বৃহত্তর সুন্দরবন অঞ্চলে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং বিদেশী জলদস্যুদের অত্যাচারে মনুষ্যবসতির উল্লেখযোগ্য বিলোপ ঘটে। পুনরায় ইংরাজ আমলে বৃহত্তর সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলেও জনবসতি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সূত্রে আটঘরা, শিখরবালি, কুমোরহাট, সূর্যপুর, চম্পাহাটী অঞ্চলে কুম্ভকার সম্প্রদায় চাক ঘুরিয়ে মাটির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করতে শুরু করেন। এঁরা চাকের মাধ্যমে এবং হাতের দ্বারা যে সব মাটির দ্রব্যাদি তৈরী করতে সিদ্ধহস্ত যে গুলি হল হাঁড়ি, কলসী, জালা, তিজেল, ম্যাজলা, মেটে, কুঁজো, মালসা, সরা, নানা ধরনের ঘট ও ভাঁড়, চাটু, টব, গামলী, খুলি, কটরা, ধুনুচি, কলকে, লক্ষ্মীর ভাঁড়, প্রদীপ, হাতখোলা, পিটেখোলা, দেরকো, দীপাধার, ফুলদানি, খাপরি, খোলা, ইটুলী, মটকা, পুতুল ইত্যাদি। কর্মের ভিত্তিতে এখানে দুধরনের কুম্ভকার সম্প্রদায় আছেন। চলতি কথায় এঁরা হলেন যথাক্রমে হাঁড়িগড়া কুমোর ও কুচোল কুমোর। মাটির ছোট ছোট দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারকদের কুচোল কুমোর বলা হয়। কুম্ভকার সম্প্রদায়ের নারীগণের চাক স্পর্শ করা নিষেধ। তবে তাঁরা মাটির তৈরী কাঁচা জিনিসপত্রগুলি রোদ্দুরে শুকাতে দেন, সেগুলিতে রং করেন, সেগুলি দিয়ে পণ সাজান। এছাড়া ছাঁচের মাধ্যমে সরা, মালসা, হাতখোলা, পিঠেখোলা, প্রদীপ, টব, ছোট ছোট পুতুল ইত্যাদি তৈরী করে এই লোকায়ত শিল্পটিতে নিজেদের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বারুইপুর থানার কুম্ভকারদের অধিকাংশই যে চাক ব্যবহার করেন তার বেড়টি বাঁশের চ্যাড়া কিংবা লোহা দিয়ে তৈরী হয় আর চাকের পৃষ্ঠের দিকে মধ্যভাগে থাকে সাধারণত কাঁঠাল কাঠের তৈরী গোলাকার একটি অংশ, তাকে বলা হয় 'পদ্ম'। পদ্মের উপর দিয়ে দুটি তালকাঠ বা শালকাঠ '+' চিহ্নের মত একে অপরকে ছেদ করে থাকে। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে বেগো। মাটি বা সিমেন্টের বেড়ের দিকের শেষপ্রান্তে একটা ছোট ছিদ্রযুক্ত আমকাঠের তৈরী স্থান থাকে যার স্থানিক নাম 'গোঁড়ি'। ঐ গোঁড়ির ছিদ্রের মধ্যে একটি কাঠের সরু দণ্ড দিয়ে চাকটিকে ঘোরানো হয়। পদ্মের ঠিক মাঝখানটিতে থাকে তেঁতুলকাঠের সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত একটি দণ্ড, যেটি 'আল' নামে পরিচিত। এই আলের পীনোন্নত অংশ নীচে অবস্থিত একটা পাথরের গোল খাঁজের উপর বসানো থাকে। আলের উপর ভর করে সম্পূর্ণ চাকাটি যত জোর ঘোরানো সম্ভব হয় তত জোর ঘুরতে পারে। আজকাল এই অঞ্চলের অনেক সম্পন্ন কুম্ভকার বলবিয়ারিংযুক্ত ইলেকট্রিক মোটর চালিত চাক ব্যবহার করছেন।

এছাড়া হাঁড়ি, বড় কলসী, বড় ম্যাজলা, বড় জাল্মা, বড় মেটে ইত্যাদির তলদেশ একটি মাটির বা সিমেন্টের তৈরী উত্তল আকৃতির বস্তুর উপর রেখে পিটানী দিয়ে পিটিয়ে বিশেষ রূপ দিয়ে থাকেন। এই উত্তল বস্তুটিকে স্থানীয় ভাষায় 'বোলে' বলে। আবার এই বোলের সাহায্যে এই সব পাত্রের তলদেশের সঙ্গে চাকে তৈরী উর্দ্ধ অংশের (মুখপাত) জোড়োনের কাজ করা হয়। এই লোকায়ত মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হল উত্তল মাটি। আঞ্চলিক কুমোর সম্প্রদায় বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে মাটি তৈরী করে থাকে। মাটি তৈরীর জন্য থাকে 'মাস্কেল' নামক বিশেষ ভাবে তৈরী করা স্থান। একটি স্থানে মাটি ঝুরো করে ফেলে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে পা দিয়ে ভালো করে মাড়িয়ে কুম্ভকার সম্প্রদায় কাদা করেন। তারপর এই কাদা থেকে কুটি, কাঁকর ইত্যাদি বেছে ফেলে দেন, পরে ঐ মাটি মাস্কেলের মধ্যে ফেলে হাত দিয়ে ভালো করে মাখান। একে বলে 'হেতে নেওয়া'। হেতে নেওয়ার পরও তাঁরা একটি লোহার তার দিয়ে ঐ মাটি চেঁচে চেঁচে পুনরায় কাঁকর বাছার কাজ করেন। এই মাস্কেলকে আঞ্চলিক কুম্ভকার সম্প্রদায় অতি পবিত্র জ্ঞান করেন। তাঁদের বিশ্বাস মাস্কেল হল মহাদেবের আশ্রয় স্থান। তাই প্রতিদিন সকালে তাঁদেরকে মহাদেবের নাম স্মরণ করে ভক্তি বিনম্রচিত্তে ফুল জল অর্পণ করে প্রণাম করতে এবং মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধি প্রার্থনা করতে দেখা যায়। আজকাল অবশ্য অনেকেই একটি চটের উপর মাটি ফেলে মাটি মাখা ও মাটি বাছার কাজ করে থাকেন।

চৈত্রসংক্রান্তি থেকে যথারীতি বারুইপুর থানার কুমোর সম্প্রদায় চাকের কাজ বন্ধ রাখেন। পয়লা বৈশাখে চাকের উপর মাটির গৌরীপট্ট সহ একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শুভ্রবস্ত্রে ভক্তিনম্রভাবে মনমন্ত্রে পূজা করেন। তারপর ঐ মৃন্ময় শিবলিঙ্গটিকে গৃহের ঠাকুরথানে কিংবা ঘরে প্রতিষ্ঠা করে সারা বৈশাখ মাস ধরে নিত্যপূজা করেন। তবে বৈশাখে মাটি পা দিয়ে মাড়ানো বন্ধ কারণ, তাঁদের বিশ্বাস তাতে কুমোর-আরাধ্য দেব শিব ক্রুদ্ধ হন। তাই মাটির গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ তৈরীর জন্য তাঁরা বৈশাখের পূর্বেই যখন মাটি প্রস্তুত করেন তখন মন্ত্রাকারে একটি ছড়া কাটেন —

মাটি বাছা মাটি বাছা
মাটি মাতা সার,
যদি থাকে খোলা কাঁকর
বাবা মহাদেবের গলার হার।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম মঙ্গলবার এবং শনিবার এখানকার কুমোর সম্প্রদায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হরপার্বতীর পুজো দিয়ে পুনরায় চাকের কাজ শুরু করেন। নমনীয় হাতের আঙুলের সূক্ষ্মকলা কৌশল ও মোলায়েম চাপে মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্যগুলি সুন্দর নিটোল ভাবে এঁরা তৈরী করে থাকেন। ছেলেবেলা থেকেই চাকের কাজ শিখতে শুরু করলে হাতের নমনীয়তা এবং কলা কৌশল বজায় রেখে দক্ষ শিল্পী হওয়া সম্ভব। তাই একটি আঞ্চলিক ছড়ায় বলা হয়েছে—

শিখতে হলে চাকের কাজ
ল্যাংটোবেলা থেকেই সাজ।

কুমোরদের তৈরী দ্রব্যাদি পনে পোড়াবার পূর্বে রঙ করা হয়। মেয়েরাই সাধারণত এই কাজ বেশি করে থাকেন। চন্দ্রকোণা রঙ, উপরিবনক রঙ, গেরিমাটি, নলেমাটি ইত্যাদিও জলে গুলে রঙ রূপে ব্যবহার করেন। তবে এখানকার কুমোররা খাবার সোডা, লালমাটি ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে ঐ মিশ্রণটিকে জলে গুলে ফুটিয়ে ঘন করে যে রঙ তৈরী করে থাকেন তা হল এক নম্বর রঙ। এই সব রঙ পাটের ন্যাতা দিয়ে বিভিন্ন পাত্র ও দ্রব্যাদির গায়ে বুলিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটু শুকিয়ে নিয়ে পোড়াবার জন্য পনে সাজানো হয়।

এখানে দু-ধরনের পন দেখা যায় – গোলাকার বেড়ি পন ও কুলোপন। কুচোল কুমোররা বেড়িপনে তাঁদের দ্রব্যাদি কাঠের আগুনে বিশেষ পদ্ধতিতে পোড়ায়। আর হাঁড়ি গড়া কুমোররা সাধারণত কুলোপন ব্যবহার করেন। পনে পোড়াবার কাজে এরা সাধারণত বেলকাঠ ও শালকাঠ বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু আজকাল কাঠের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আম, লিচু, জাম, খিরিশ ইত্যাদি কাঠ ব্যবহার করছেন। পোড়াবার পর মাটির জিনিসপত্রগুলি লাল টুকটুকে রঙ ধারণ করে। এ সম্পর্কে এখানকার লোকসমাজে একটি প্রচলিত ধাঁধা আছে–

কাঁচাবেলা তলতলে
পাকলে পরে লাল।

এই অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লৌকিক ছড়ায় কুমোরদের মৃৎশিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদির প্রসঙ্গ আছে। যেমন –

তুলসিতলায় বারি ঝারা
আশ্বিনদিনে মুণ্ড বারা।
আবার
মাটি আমার সোনামণি
সাঁঝবেলাতে সন্ধ্যামণি।

একটি ধাঁধা ---

সাজালে সাজে
বাজালে বাজে
হেনফুল ফুটে আছে
বাজারের মাঝে।

কুমোররা 'নাড়ি কাটা জাত' – এই প্রবাদটি এই অঞ্চলে প্রচলিত। মনে হয় চাক থেকে বাঁশের পাতলা চেড়ি দিয়ে দ্রব্যাদি কেটে তুলে নেওয়া হয় বলেই প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে।

বারুইপুর থানার কুমোর সম্প্রদায়ের মৃৎশিল্পের দুটি বড় কেন্দ্র হল শিখরবালি ও আটঘরা। এছাড়া কুমোরহাটে (বর্তমানে কুমারহাট) একসময় কুমোর সম্প্রদায়ের বাস ছিল বলে জানা যায়। কুমোরহাট নামই তার প্রমাণ দেয়। শিখরবালির কুমোরপাড়ার চিত্তরঞ্জন পাল, কবীর পাল, ভূতনাথ পাল, মানিক পাল, পান্না পাল, অদ্বৈত পাল প্রমুখ এবং আটঘরার পাঁচুগোপাল পাল, রবীন পাল, সাধন পাল, কালীপদ পাল, মণ্টু পাল, গোকুল পাল, পান্না পাল,

শম্ভু পাল, কাশীনাথ পাল, পঞ্চানন পাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিড়াল, বৈকুণ্ঠপুর এবং জাফরপুরের কয়েকজন কুম্ভকারও এই শিল্পে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী।

মৃন্ময় শাস্ত্রীয় দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী, বিভিন্ন দেবদেবীর ছলন, মাটির পুতুল, পাখি, ছোট ছোট জীবজন্তু ইত্যাদি নির্মাণে এই অঞ্চলের পটুয়াদের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। বিশেষ করে বারুইপুর থানার বিভিন্ন গ্রামের পটুয়াগণ বারুইপুর শহরের মধ্যে কিংবা পৌর এলাকার মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করে পটুয়া বৃত্তির মাধ্যমে মৃত্তিকাশিল্প অবলম্বন পূর্বক জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন অনিলকুমার পাল, নির্মল পাল, সুবল পাল, ধীরেন্দ্রনাথ হালদার, বিশ্বনাথ পাল, রবীন পাল প্রমুখ। আরো বহু পটুয়াশিল্পী এই থানার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন।

বেশ কিছুদিন হল টেরাকোটা শিল্পের কয়েকজন শিল্পী যথেষ্ট দক্ষতা ও সুনামের অধিকারী রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে শিখরবালির মোহিত পাল, বিশ্বনাথ দাস, অলোক পাল, বারুইপুর দোলতলার অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বারুইপুরের অভিজিৎ সরদার, উকিলপাড়া পঞ্চাননতলার সঞ্জীব রায়চৌধুরী, শাসন গ্রামের নীলরতন নস্কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শিখরবালি পাল পাড়ার মোহিত পাল টেরাকোটা শিল্পকর্মে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। কলকাতার একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস, ক্যালকাটা আইস স্কেটিং, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তশিল্প মেলা প্রভৃতি স্থানে বহুবার তাঁর টেরাকোটা শিল্পকর্ম প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। সল্টলেকে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর টেরাকোটা শিল্পকর্মের প্রদর্শনী করেছিলেন। রাজ্য ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তরের জেলা ভিত্তিক টেরাকোটা কর্মশালায় তিনি প্রশিক্ষকের কাজ করেছেন। আনন্দবাজার, স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি হয়েছে এবং কলকাতার দূরদর্শনেও তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি গ্রীস, মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় শিল্পকলার সঙ্গে বাংলার নিজস্ব ঘরানাকে তার টেরাকোটা শিল্পকর্মের মধ্যে যুক্তকরার কর্মে নিয়োজিত। বারুইপুরে এবং বারুইপুরের বাইরে বহু পরিবারের গৃহসজ্জায় এবং বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সজ্জায় তাঁর নির্মিত টেরাকোটা শিল্পকর্ম শোভিত আছে। এই কীর্তিমান শিল্পী বারুইপুরের গর্ব বিশেষ। টেরাকোটা শিল্পের বিস্তার ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এই অঞ্চল দাবি করে।

বারুইপুর থানার অধিকাংশ মৃৎশিল্পীদের কাছে যথেষ্ট মূলধন এবং উৎকৃষ্ট মৃত্তিকার সমস্যাই প্রধান সমস্যা। তাছাড়া পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চাকের কাজের প্রতি নানা কারণে অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাকরী ও অন্যান্য বৃত্তির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ এই শিল্পের ভবিষ্যৎকে কতখানি সম্ভাবনাময় করে তুলবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

বাঁশশিল্প ঃ-আমাদের থানার লোক-লোকায়ত শিল্পগুলির মধ্যে বাঁশশিল্পের উল্লেখ না করলে এই আলোচনার অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। বাঁশ শিল্পের কাঁচামালরূপে কয়েক ধরনের বাঁশ আমাদের থানায় গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত না-হলেও মোটামুটিভাবে বাঁশবাগানগুলি থেকে পাওয়া যায়। এই বাঁশের ওপর নির্ভর করে রামনগর গ্রামের সরদারপাড়া, সীতাকুণ্ডু গ্রামের কাওরা পাড়া, চঙ্গ, ধোপাগাছি গ্রামের সরদারপাড়া, টংতলা গ্রামের ঘরামীপাড়া, ধাড়াপাড়া,

গায়েনপাড়া প্রভৃতি এলাকার তপশিলি জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত বহু পরিবারের জীবনজীবিকা নির্বাহিত হয়।

বংশপরম্পরায় বারুইপুর থানার এইসব এলাকার অধিকাংশ পরিবারের নারীপুরুষ ঢুলিভালকো ও বেশিনীবাঁশ এবং কঞ্চি দিয়ে ঝোড়া, ঝুড়ি, ঝাঁকা, চাঙাড়ী, মাছের চাকন, পেয়ারার টুকরি, চুপড়ি, ঘুনী, আটল তৈরী করে থাকেন।

বিশেষ ক্ষেত্রানুসন্ধান ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রামনগর গ্রামের বাঁশশিল্পী শংকর সরদার, ধোপাগাছি গ্রামের সরদারপাড়ার গুরুপদ সরদার ও গৌর সরদার এবং টংতলা গ্রামের ঘরামীপাড়ার সূর্য ঘরামী ও রণজিৎ ঘরামীর কাছ থেকে এই থানার বাঁশশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা গিয়েছে। বাঁশশিল্পের জন্য তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন দা, কাটারি, বঁটি, কেড়োবাড়ি বা শলাবাড়ি, মুগুর, কাস্তে, হাতুড়ি, পাথরের শিল, করাত ইত্যাদি। ঝোড়া, ঝাঁকা, ঝুড়ি, চুপড়ি, চাঙাড়ি, দাঁড়িপাল্লার পাল্লা, পেয়ারার টুকরি, মাছের চাকন ইত্যাদি শিল্পবস্তু বোনার পূর্বে একজন বাঁশশিল্পী সর্বপ্রথম বাঁশঝাড় থেকে দেখেশুনে ভালো ঢুলিভালকোবাঁশ, বেশিনীবাঁশ ও প্রয়োজনমতো কঞ্চি পরখ করে কেটে আনেন। তারপর কুড়ুল দিয়ে বাঁশের পাও বা গাঁট মেরে প্রথমে বাঁশটিকে ফেড়ে দুভাগে ভাগ করে ফেলেন। পরে প্রত্যেকটি ভাগকে আবার মাঝখান থেকে ফেড়ে ফেলেন। এই ফেড়েফেলা অংশগুলিকে স্থানীয়ভাবে চেড়া বলা হয়। চুপড়ি তৈরীর জন্য কঞ্চিগুলিকেও এইভাবে ফেড়ে সরু সরু অংশে ভাগ করা হয়। এরপর বাঁশের সরু সরু চেড়াগুলিকে ও কঞ্চির সরু সরু অংশগুলিকে মুগুরের উপর রেখে তলায় সরু কঞ্চির বিঘত খানেক কেড়োবাড়ি বা শলাবাড়ি ধরে আর উপরে দা বা কাটারি দিয়ে চেঁচে প্রয়োজন মতো সরু ও মসৃণ করে ফেলেন। উক্ত শিল্প বস্তুগুলির তলদেশ তৈরীর জন্য শিল্পীরা পাতলা চওড়া চেড়া ব্যবহার করে থাকেন। একে বলা হয় বাও। বাও থেকে আবার চারদিক ব্যাপী যে চেড়াগুলিকে তুলে উপরদিকে উচ্চতা বজায় রাখেন সেগুলির স্থানীয় নাম জাঙী। আর প্রত্যেকটি জাঙীর একবার উপরদিক দিয়ে এবং একবার নিচের দিক বাঁশ বা কঞ্চির যে সরু সরু অংশ গুলির মাধ্যমে শিল্পীরা আড়াআড়িভাবে বুনন দিয়ে থাকেন সেটিকে তাঁরা বেঁতি বলে থাকেন। কাম্য উচ্চতাপর জাঙী বেরিয়ে থাকলে বাঁশশিল্পীগণ সেগুলিকে দা দিয়ে সমান করে কেটে দেন। সবশেষে ঐ শিল্পবস্তুর উপরের কানাতে প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা কঞ্চি বা পাতলা চেড়ার মুকো ক্লিপের মতো এমনভাবে আটকে দেন যাতে বেঁতিগুলি আর খুলে যেতে পারে না। একজন বাঁশশিল্পী সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় দুটি ঝাঁকা কিংবা চার-পাঁচটি ঝোড়া বানাতে সক্ষম হন। সাক্ষাৎকারে আরো জানা যায় যে, একটি প্রমাণ সাইজের বাঁশ থেকে ছটি মাঝারি ঝোড়া, কিংবা পাঁচটি ঝাঁকা তাঁরা তৈরী করতে পারেন। বর্ষাকালেই বারুইপুর থানার বাঁশশিল্পীদের মরসুম। কারণ, বর্ষাকালে এখানকার অন্যতম ফল পেয়ারা বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়, আর এর জন্য প্রয়োজন হয় ঝোড়া, ঝুড়ি, ঝাঁকা, চাঙাড়ি, টুকরি এবং চুপড়ি। মরসুমে বারুইপুর কাছারি বাজার ও বারুইপুর পুরাতন বাজারের হাটে এখানকার বাঁশশিল্পীরা তাঁদের তৈরী করা উক্ত শিল্পবস্তুগুলিকে বিক্রি করে থাকেন। একটি মাঝারি ঝোড়ার বর্তমান দাম তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে এবং একটি মাঝারি ঝাঁকার

বর্তমান দাম কুড়ি থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে বলে সাক্ষাৎকারকালে জানা যায়। তাঁরা প্রসঙ্গত জানান যে, বর্তমানে একটি প্রমাণ আয়তনের ঢুলিভালকো বাঁশের দাম সত্তর থেকে আশী টাকা এবং বেশিনীবাঁশের দাম পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা।

টংতলা গ্রামের ঘরামীপাড়া, গায়েনপাড়া ও ধাড়াপাড়ার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারই নারীপুরুষ নির্বিশেষে বাঁশের ঘুনী তৈরীর কাজ করে থাকেন। এই শিল্পকর্মে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন বাঁশ ও কঞ্চির অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সরু সরু কাঠি যা প্রধানত মেয়েরা ধারালো বঁটি দিয়ে চেঁচে তৈরী করে থাকেন। আর লাগে তালের বাকরা থেকে তৈরী বুননের সুতোর মতো অংশ যা তৈরী করতে এখানকার বাঁশশিল্পীরা তালের বাকরাগুলিকে পাথরের শিলের ওপর ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নমনীয় করে তার থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। ঘুনী তৈরী করতে প্রথমে প্রায় বত্রিশটি সরু সরু কাঠি খুব স্বল্প ফাঁকে বিন্যস্ত করে তারপর একটি করে অপেক্ষাকৃত মোটা কাঠি সংযোজন করেন। এই একেকটি ভাগকে দাগ বলা হয়। প্রথম থেকে এই ধরনের পাঁচটি দাগের বিশেষ বিশেষ পৃথক নাম আছে। যেমন প্রথম দাগের নাম পোঁদাড়, দ্বিতীয় দাগের নাম একতার, তৃতীয় দাগের নাম কুলি, চতুর্থ দাগের নাম কুলির দাগ এবং পঞ্চম দাগের নাম মাঝেরদাগ। পাঁচটি দাগের পর থেকে পুনরায় ঐভাবে একই নামে আবার পাঁচটি দাগ অভিহিত হয়। এরপর দাগের অন্তর্গত কাঠি গুলিকে তালের বাকরা থেকে তৈরী সুতো দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বুনন করে দেওয়া হয়। এই বুননের সারিগুলিকে স্থানীয়ভাষায় বান বলে। সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত একেকটি ঘুনীতে বান থাকে। এখানকার বাঁশশিল্পীরা ঘুনী বুনতে সাদা মোটা এঁতো কাঠি এবং সরু নীলকাঠি ব্যবহার করে থাকেন। পোঁদাড়েই একমাত্র এঁতো কাঠি ব্যবহৃত হয় আর অন্যদাগে সরু নীলকাঠি ব্যবহৃত হয়। ঘুনী তৈরীর বাঁশশিল্পীদেরও মরসুম বর্ষাকাল। কারণ, এই সময় মাছ ধরার জন্য প্রচুর ঘুনীর চাহিদা হয়।

তালের কুড়িটি বাকরার বর্তমান দাম আশি টাকা বলে টংতলা গ্রামের বাঁশশিল্পীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, তালের বাকরা থেকে নির্মিত এই সুতোগুলির বুনন জলে কিছুতেই সহজে নষ্ট হয় না। এখানকার বাঁশশিল্পীরা দু-ধরনের ঘুনী তৈরী করে থাকেন – ঘন ঘুনী এবং অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ফাঁকের ফরসা ঘুনী। তাছাড়া আয়তন অনুযায়ী ছোটো, মাঝারি, বড় ঘুনীও আছে। এঁদের ঘুনী বিক্রির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হলো বারুইপুর পুরনো বাজারের রবিবার ও বুধবারের হাট। ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে ধোপাগাছির বাঁশশিল্পী গুরুপদ সরদার জানান যে, তাঁদের অবিক্রীত শিল্প বস্তুগুলি বারুইপুর থানার পিছনে স্টেশন রোডের পাশে অবস্থিত দুলালের হিন্দু হোটেলে অপেক্ষাকৃত একটু কমদামে তাঁরা বিক্রি করে দেন।

বারুইপুর থানার বাঁশশিল্পীরা শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা পূজার দিন তাঁদের এই শিল্পকর্মে ব্যবহৃত বিশেষ করে লোহার যন্ত্রপাতিগুলিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিজেরাই মনমন্ত্রে বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন। পূজার পরদিন থেকে তিনদিন বাঁশশিল্পকর্মে দা, বঁটি ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ যা এখানকার বাঁশশিল্পীদের বিশেষ ট্যাবুরূপে গণ্য হয়।

বারুইপুর থানার বাঁশশিল্পীগণের মৌখিক ধারার ঐতিহ্যে এই লোকায়ত শিল্পসংক্রান্ত এমন

কিছু প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা শোনা যায় যা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। যেমন – কঞ্চির চুপড়ির টেকসই বোঝাতে তাঁরা কথায় কথায় বলে থাকেন —

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়
তাই দিয়ে চুপড়ি গড়।

বাঁশবাগান থেকে বাঁশ কেটে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য কর্ম। একটু অসাবধান হলেই শরীরের মাংস ছিঁড়ে, কেটে রক্তপাত হবার সম্ভাবনা। তাই এই অঞ্চলের বাঁশশিল্পীদের মুখে মুখে একটি প্রবাদ শোনা যায় – বাঁশ চায় মাস।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোকলোকায়ত জীবনধারায় বাঁশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানকার বাঁশশিল্পীদের মুখে শ্রুত অপর একটি সুন্দর প্রবাদ – হলি বাঁশ মলি বাঁশ।

ঘুনীতে মাছের আটকাপড়া ব্যাপারটিকে একটি ধাঁধা জাতীয় ছড়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে পরিবেশন করে থাকেন এখানকার বাঁশশিল্পীগণ। ঘুনী যেন আটক মাছের উদ্দেশ্যে বলছে–

আমি বসে আছি ভালো
তুমি এলে কেন বলো !
আমায় দেখতে আসবে যে
তোমায় নিয়ে যাবে সে।

পরিশেষে বলা যায় যে, থানা বারুইপুরের দরিদ্র, অশিক্ষিত বাঁশশিল্পীরা কোনোরকমে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন। তাঁরা সন্তানদের ভালো করে সাক্ষর করে তুলতে পারছেন না। এই অবস্থায় নৈতিক অধঃপতন গ্রাস করছে তাঁদের সন্তানদের। এখানে প্রচলিত একটি ছড়ায় তারই প্রতিফলন দেখা যায় –

ওরে দুর্যোধন
লেখাপড়া ত্যাজ্য করে
আটল ঘুনী বোন।

এঁদের বাঁচাতে এই শিল্পটির প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ দৃষ্টিদান ও আর্থিক অনুদানের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

কর্মকার শিল্প ঃ কর্মকার সম্প্রদায় এখানকার কর্মভিত্তিক আদি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম। কর্মকারদের চলতি কথায় কামার বলা হয়। এঁরা কামারশালে বসে হাপর টেনে কাঠকয়লার আগুনে লোহা পুড়িয়ে লাল করে সেটিকে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নেহাইয়ের উপর ফেলে হাতুড়ি ও হাম্বোরের আঘাতে প্রয়োজন মাফিক রূপ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির দ্রব্যাদি তৈরী করে থাকেন। বিশেষ করে কৃষিকর্মের ও সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এঁদের হাত দিয়েই আমরা পেয়ে থাকি। দা, শাবল, কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গলের ফাল, নিড়ানী, কুড়ুল, টাঙ্গি, বঁটি, খুন্তি, হাতা, ছেনি, বাটালী, সাঁড়াশি, হাতুড়ি, ঢাল, বল্লম , তলোয়ার, ছুরি, ছোরা, কাঁচি, ক্ষুর,

গরুর গাড়ীর চাকার লোহার বেড়, কুম্ভকার ও সূত্রধর কর্মের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিনের ও বিভিন্ন যানবাহনের ছোট ছোট অংশ কর্মকারশিল্পীগণ তৈরী করে থাকেন।

বারুইপুর থানার ধোপাগাছি, কল্যাণপুর, চণ্ডীপুর, কুমোর হাট, দুর্গাপুর, সীতাকুণ্ডু, চম্পাহাটী, চীনের মোড়, রামনগর এবং মূল বারুইপুর পুরসভায় কর্মকার সম্প্রদায়ের শিল্পীদের শিল্প চর্চা করতে দেখা যায়। তবে বর্তমানে কর্মকারশিল্পীগণ সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ও ফিশিং ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীতে অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন। কারণ, এই কর্মে সারা বছর কাজ পাওয়া যায় এবং উপার্জনও বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সপ্তাহে দুটি দা এবং একটি বঁটি তৈরী করে যেখানে মাত্র ১৫০ টাকা উপার্জন করতে হয় সেখানে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের শুধু গড়া কাজ করে কমপক্ষে সপ্তাহে ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা উপার্জন করা সহজেই সম্ভব, আর ভালো সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ শিল্পী হলে তো কথাই নেই। তাই একটি ছড়ায় বলা হয়েছে –

বারুইপুরের কামারশাল।
সার্জিক্যালের ধরল হাল।

বারুইপুরের বিশ্ববন্দিত সার্জিক্যালশিল্পের ইতিহাস পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। তবে এখানে কর্মকারশিল্পকে উদ্দেশ্য করে লোকায়ত মানুষের মুখে নানা রকমের ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন শোনা যায়। যেমন –

ঘরের কাছে কামার –

দা গড়ে দে আমার

কিংবা

কামারের কাজ কুমোরে করে

ধরতে জানে না পুড়ে মরে।

বা

বারো কামারে দা নষ্ট। ইত্যাদি।

সার্জিক্যালশিল্প ঃ বারুইপুর থানার শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প অর্থাৎ সার্জিক্যালশিল্প শুধু ভারতবর্ষে নয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বন্দিত। তাই এই শিল্পটির জন্য বারুইপুরবাসী হিসাবে আমরা যথার্থই গর্বিত। যদিও প্রাচীন ভারতবর্ষে শল্যচিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো যা আমরা চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থে পেয়ে থাকি তথাপি তার ধারাবাহিকতায় যে ছেদ পড়েছিলো তা বলাই বাহুল্য। আমরা ডঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি যে, তৎকালে ১২৭ রকমের শল্যচিকিৎসা যন্ত্রের প্রচলন ছিলো এবং সেকালের কবিরাজগণ শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু এই থানার ধোপাগাছি, পুরন্দরপুর, খোদারবাজার, মধ্যকল্যাণপুর, উত্তরকল্যাণপুর, দক্ষিণ কল্যাণপুর,

বিড়াল-বৈকুণ্ঠপুর এবং অবশ্যই বারুইপুর শহরকে কেন্দ্র করে এই শিল্পের যে উদ্ভব ও বিকাশ তার ইতিহাস কিন্তু শুরু হয়েছিলো ইংরেজ আমল থেকে যার একটা সংহত রূপরেখা আলোচনার প্রয়াসের মধ্যে খুঁজে পাবো বারুইপুর সার্জিক্যালশিল্পের ইতিহাস।

আধুনিক সার্জারী বা শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি বলতে আমরা যা বুঝি তা ইউরোপ থেকে মূলত বাংলার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র ক্রমবিকাশ লাভ করে। বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষের প্রথমদিকে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বা শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরীর কোনো স্বদেশী কারখানা ছিলো না। যতদূর জানা গেছে ; তখন বদ্গেট, এ্যালেন এণ্ড হ্যানবুরিস লিমিটেড (Allen & Hanburys Ltd.), ডাউন ব্রাদার্স (Down Brothers), জন উইস (John Weiss), কার্ল স্টর্জ (Karl Storz), চ্যাস. এফ. থ্যাকরে লিমিটেড (Chas.F.Thakray Ltd.) অ্যালবার্ট হেইস (Albert Heiss) প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী বা সংস্থা এদেশে বিশেষ করে কলকাতায় বিদেশী সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আমদানী করে ব্যবসা করত। কলকাতায় এদের শোরুম এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ডাক্তারখানায় ব্যবহৃত এইসব বিদেশাগত সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলির পালিশ নষ্ট হয়ে গেলে কিম্বা দীর্ঘ ব্যবহারজনিত ত্রুটি, বিচ্যুতি, গোলযোগ, ক্ষয় ইত্যাদি মেরামত করার প্রয়োজন হলে সেগুলি কোলকাতার যন্ত্রপাতি সারাই, ঝালাই এবং পালিশ করা কিছু স্থানীয় মিস্ত্রীদের কাছে নিয়ে আসা হতো। এইভাবে তাদের মধ্যে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক কৌতূহল ও ধারণার জন্ম হয়। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক জটিলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হলে ইউরোপ থেকে বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আমদানী ব্যাহত হয়। তাছাড়া ভারতস্থিত যেসব ব্রিটিশ সার্জিক্যাল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির রিপেয়ারিং ডিপার্টমেন্টে কোলকাতা ও কোলকাতার আশেপাশের মিস্ত্রীদের কাজের জন্য নেওয়া হতো তাদের দ্বারাই কোলকাতায় সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যতদূর জানা যায়, ঐ সময় কোলকাতার কাঁসারীপাড়ার তুলসীচরণ নন্দন সর্বপ্রথম সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর স্বদেশী কারখানা স্থাপন করেন। অতঃপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গড়িয়ার ফরতাবাদ গ্রামের হরি কর্মকার নামে এক যুবক তুলসীচরণ নন্দনের কারখানা থেকে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর কাজ শিখে আসেন এবং নিজ উদ্যোগে গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন তেঁতুলবেড়িয়ার খালপাড়ে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর একটি ছোটো কর্মশালা গড়ে তোলেন। তিনি মূলত অর্থোপেডিক (Orthopaedic) ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন।

ঘটনাক্রমে বারুইপুর থানার ধোপাগাছি গ্রামের পূর্ব কর্মকারপাড়ার বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকার আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে সম্পর্কসূত্রে হরি কর্মকারের কাছ থেকে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর হাতেখড়ি নিয়ে কোলকাতার বাদাম ব্রাদার্স এবং এ্যালেন এ্যাণ্ড হ্যানবুরিস লিমিটেডে স্বল্পদিনের জন্যে চাকরি করেন। তারপর তিনি নিজের পাড়ায় পতিতপাবন কর্মকার নামে এক বালককে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোটো মাটির দেওয়াল যুক্ত খোড়োচালের ঘরে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে সেদিন বারুইপুর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী শিল্পের আঁতুড়ঘর তৈরী হয়েছিলো ঐ খোড়োচালের

লায়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকারের মৃত্যু হলে তাঁর সহযোগী
িতিতপাবন কর্মকার দৃঢ়তা, বুদ্ধি, ধৈর্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে এই শিল্পটির অগ্রগতি
বং বিস্তারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা তাঁর কৃতিত্বের ও উচ্চ প্রশংসার দাবি
াখে। সেদিক দিয়ে পতিতপাবন কর্মকারই ছিলেন বারুইপুর থানার সার্জিক্যাল শিল্পের
থার্থ স্থপতি ও গুরু। পরবর্তিকালে তিনি তাঁর বসতবাড়ি সংলগ্ন স্থানে যে ছোটো কর্মশালাটি
তরি করলেন সেখানে আশপাশের অঞ্চলের বহু যুবক এই শিল্পের কাজ শিখে ওস্তাদ ও
ক্ষ কারিগরে পরিণত হন এবং এই শিল্পের কার্যকরী বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। এঁদের
ধ্যে গৌর কর্মকার, নিতাই কর্মকার, হীরুলাল দাস, নিমাই কর্মকার, সুবল নস্কর, কালীপদ
র্মকার, নিরঞ্জন কর, নীলরতন সাঁতরা, পতিতপাবন সাঁতরা , গৌর দাস, অমূল্য মণ্ডল,
গাপীনাথ দাস, গান্ধী কর্মকার, মানিক কর্মকার, রঞ্জন কর্মকার, কার্তিক মণ্ডল, ভদ্রেশ্বর
র্মকার, যতীন্দ্রনাথ কর্মকার, বলাই কর্মকার, বদন দাস, কেষ্টপদ কর্মকার, আশুতোষ দত্ত,
াজিত মণ্ডল, তপন কর্মকার, অনন্ত দাস, দুলাল কর্মকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বলা
াহুল্য যে, এঁরা সকলেই বারুইপুর থানার বাসিন্দা।

বচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম
নস্ট্রুমেন্টগুলি তৈরী করতে তৎকালে এইসব কারিগরগণ ব্যবহার করতেন অত্যন্ত সহজমানের
িছু দেশীয় যন্ত্রপাতি, যথা – ভাইস (Vice), ফাইল (File), নিজের হাতে প্রস্তুত ড্রিল
Handmade drill), নেহাই (Anvil), হাতুড়ী (Hammer), সাঁড়াশী (Tongs), ডাবিং
মশিন (Doubing machine), হাপর (Blower), ছেনি (Chisel), করাত (Saw),
াস (Plush) ইত্যাদি। এইসব যন্ত্রপাতি দিয়ে নানা ধরনের কাঁচি (Scissors), আর্টারী
রসেপ্স (Artery forceps), স্ক্যালপেল (Scalpel), চিজেল (Chisel) ও বিভিন্ন
রনের অর্থপেডিক ইনস্ট্রুমেন্টস যথা– হুইল (wheel), বোনপিন (Bonepin) কৃত্রিম
া (Artificial leg), এছাড়াও ডেলিভারি ফরসেপস (Delivery forceps), ওভাম
রসেপস (Ovum forceps) এবং ভেটিনারী ইনস্ট্রুমেন্টস যেমন ব্রান্ডিং আয়রন (Brand-
ng iron), ক্যাস্ট্রেটার (Castrater), এ্যামপুটেশান হ্যামার (Amputation ham-
ner), এ্যামপুটেশান শ (Amputation saw), বেবি ক্যাস্ট্রেটার (Baby castrater)
। সামান্য কিছু আই ইনস্ট্রুমেন্টস প্রভৃতি তাঁরা তৈরী করতেন।

াতিতবাবুর ও ধীরেনবাবুর অবদান সম্পর্কে ১৯৯০ সালের পনেরোই মে 'গণশক্তি' পত্রিকায়
ামীণ ও কুটির শিল্প কলামে অমিতকুমার কর মহাশয় যথার্থই লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষের
ল্য চিকিৎসার ইতিহাসে ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকার ও পতিতপাবন কর্মকার উল্লেখযোগ্য নাম।
ামদুটির আগে হয়তো কোনো ডাঃ উপাধি নেই কিন্তু আধুনিক শল্যচিকিৎসার উপকরণ
ই দুজনেই প্রথম ভারতবর্ষে তৈরী করতে শুরু করেন। তার আগে পর্যন্ত আমাদের বিদেশী
াষ্ট্রগুলির ওপর নির্ভর করতে হতো।'

৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অধুনা
ারুইপুর পৌর এলাকার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে যে পিয়ালী শিল্প উপনগরীটি স্থাপন করেন সেখানে

অন্যান্য কারখানার সঙ্গে তাঁরই পরামর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সার্ভিসিং স্টেশান' যার দ্বারোদ্‌ঘাটন স্বয়ং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ই করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বুঝেছিলেন যে, বারুইপুর অঞ্চলের কুশলী সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর শিল্পীরা অর্থ, যন্ত্রপাতি, ভালো স্টীল ও সুব্যবস্থার অভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ঐসব কারিগরদের এই সার্ভিসিং স্টেশানের প্রতি আকৃষ্ট করে এখানকার উন্নত যন্ত্রপাতি, উত্তম স্টীল ও সুব্যবস্থা প্রদানের সুযোগ দিয়ে তাঁদের সর্বতোভাবে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা দান। এই উদ্দেশ্যে এখানকার তৎকালীন প্রোজেক্ট অফিসার শৈজাকিংকর রায় এবং সুপারিনটেন্‌ডেন্ট শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় বারুইপুররের সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কারিগরদের একরকম প্রায় ডেকে ডেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত এই সার্ভিসিং স্টেশানের উন্নতমানের মেশিন ও যন্ত্রপাতিগুলিকে ন্যুনতম খরচ দিয়ে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু কালক্রমে এই শিল্পের স্থানীয় কারিগরগণ সংকোচজনিত পিছুটানেই হোক কিম্বা সরকারী আশ্বাস অনুযায়ী ব্যবহার না পেয়েই হোক তাদের দিক থেকে তেমন সাড়া দেননি। তাই এখানকার কর্তৃপক্ষও সরাসরি সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট উৎপাদন করে ব্যবসায় নেমে পড়েন। স্থানীয় কিছু সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কারিগর এখানে চাকরী নিলেও অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ, কুশলী, চৌকস এবং বুদ্ধিমান শিল্পীরা এই কারখানায় চাকরী গ্রহণ করেননি। কারণ, এখানে সরকারী যে হারে বেতন ধার্য করা হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ তাঁরা তাঁদের ছোটো ছোটো কর্মশালাগুলি থেকে উপার্জন করতেন।

পরবর্তিকালে এই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সার্ভিসিং স্টেশানে উৎপাদনহারে ক্রমশ ভাঁটা পড়তে শুরু করে। এর পিছনে কতগুলি কারণ বিদ্যমান ছিলো। প্রথমত এখানকার কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন ও করিৎকর্মা মানুষের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। দ্বিতীয়ত অফিসার্স স্টাফের মধ্যে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর প্রকৌশল সম্পর্কে কার্যকরী বাস্তব অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব ছিলো। তৃতীয়ত অফিসস্টাফের সঙ্গে কারখানার কর্মচারীদের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি ছিলো। চতুর্থত অফিসারদের সঙ্গে কর্মচারীদের বেতনের এবং সুযোগসুবিধার আসমানজমিন ফারাক ছিলো। পঞ্চমত শ্রম বিভাগের ফলে একজন কর্মচারী প্রয়োজনে একটি ইনস্ট্রুমেন্টের সব অংশের কাজ করতে পারতেন না। এবং আরো কিছু কারণে এই শিল্পটি এখানে বর্তমানে ধুঁকছে। বাইরের দু-একটি সংস্থা মাঝেমধ্যে এখান থেকে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট শর্তসাপেক্ষে তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন বটে তবে এই কর্মশালাটির পালে আর তেমনভাবে হাওয়া লাগেনি। তাই বিশেষ ক্ষতির বোঝা বহন করে সরকার এখনোও এই কারখানার কর্মচারী ও অফিসস্টাফের বেতনভার বহন করে চলেছেন।

বারুইপুরের যেসব কর্মচারী এই কর্মশালায় বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছিলেন এবং আজো করছেন তাঁদের নামের ও ঠিকানার একটি তালিকা আমরা সাধ্যানুযায়ী পেশ করছি।

ফোর্জিং বিভাগ / হাম্বোরম্যানিং ঃ নকুলচন্দ্র কর্মকার (ঘোষপুর), দাশুরথি কর্মকার (ঘোষপুর), কালীপদ কর্মকার (ধোপাগাছি), গৌরগোপাল দাস (পিয়ালী টাউন), প্রফুল্ল দাস (মধ্যকল্যাণপুর), স্বপন ছাটুই (সীতাকুণ্ড)।

ফিটিং বিভাগ ঃ- গৌরচন্দ্র কর্মকার (পুরন্দরপুর), গান্ধী কর্মকার (ধোপাগাছি), হীরুলাল দাস (পুরন্দরপুর), নিরঞ্জন কর (ধোপাগাছি), নিমাই কর্মকার –১ (ধোপাগাছি), বলাইচন্দ্র ঘোষাল (ধোপাগাছি), পালানচন্দ্র দাস (মধ্যকল্যাণপুর), আশারাম মণ্ডল(ওড়ঞ্চ), অজিত মণ্ডল (ধোপাগাছি), গৌরচন্দ্র দাস (মধ্যকল্যাণপুর), রণজিৎ নস্কর (বারুইপুর), গোপীনাথ দাস (মধ্যকল্যাণপুর), গোবিন্দ মণ্ডল (আটঘরা), মিহিরকুমার ধাড়া (চম্পাহাটি), বিশ্বনাথ দাস (মধ্যকল্যাণপুর), শশধর মণ্ডল (বারুইপুর)।

পলিশিং বিভাগ ঃ ফণিভূষণ বেরা (বারুইপুর), গৌরাঙ্গ দে (বারুইপুর), শেখ ফজল করিম (বারুইপুর), সন্তোষ মণ্ডল (পারুলদহ), মহাদেব প্রামাণিক (ঘোষপুর), মদন কয়াল (বারুইপুর)। বলা বাহুল্য এঁদের অনেকেই পরে চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে নিজেরা সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী করতেন।

বর্তমানে বারুইপুর থানার যেসব সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট শিল্পী এঁদের কর্মশালায় আধুনিক মানের সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মহম্মদ গিয়াসউদ্দীন মণ্ডল (খোদার বাজার), জয়দেব কর্মকার (ধোপাগাছি), নিমাই কর্মকার-২ (ধোপাগাছি), শ্যামল কর্মকার (ধোপাগাছি), দুলাল কর্মকার (ধোপাগাছি), দীনেশ কর্মকার (ধোপাগাছি), দুর্গাদাস কর্মকার (ধোপাগাছি), বাসুদেব কর্মকার (ধোপাগাছি), জয়দেব মাকাল (ধোপাগাছি), অহীন হালদার (ধোপাগাছি), শ্রীকুমার কর্মকার (ধোপাগাছি), সতীশচন্দ্র কর্মকার (মৃত-ধোপাগাছি), পঞ্চানন কর্মকার (মৃত- ধোপাগাছি), নিশি দাস (বারুইপুর), দেবাশিস মণ্ডল (বারুইপুর), পঞ্চানন বেরা (বারুইপুর), প্রবীর চট্টোপাধ্যায় (বারুইপুর), মধ্যকল্যাণপুরের বিমল দাস, কমল দাস , অটল দাস, রবীন দাস, মদনমোহন দাস, বৈদ্যনাথ দাস, ষষ্ঠীচরণ দাস, হিমাংশু দাস, তপন দাস, নিতাই নস্কর, সাধন দাস, সুশান্ত দাস, শম্ভু দাস, বিপুল মণ্ডল; পুরন্দরপুরের তপন কর্মকার, দুলাল নস্কর, সুপ্রেন কাঞ্জিলাল, বিশ্বনাথ সাঁতরা, মনোজ দাস; আটঘরার সনাতন মণ্ডল, নিমাই পাল; সীতাকুণ্ডুর মোবারক লস্কর, অজেদ লস্কর, অনাদি চক্রবর্তী; ওড়ঞ্চর বাসুদেব মণ্ডল; বেগমপুরের বাবলু মণ্ডল, পঙ্কজ মণ্ডল, হারান মণ্ডল; শংকরপুরের বিপিন সরদার, আসগার আলি কাজী; বারুইপুরের বলাই পাল, পিন্টু নন্দী, ফনী বেরা, শচীন মণ্ডল; উত্তর কল্যাণপুরের দুর্গা নস্কর, গোবিন্দ নস্কর, তারাপদ পাল; দক্ষিণ কল্যাণপুরের অজয় বারিক, সত্যচরণ দাস, মন্টু বারিক; বৈকুণ্ঠপুরের মহাদেব দাস, রবীন দাস, সহদেব দাস, রামপ্রসাদ দাস, বসন্ত দাস এবং বিড়ালের নকুল দাস।

আধুনিক যুগে সার্জারিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আমরা মাইক্রো সার্জারির যুগে এসে পৌঁছেছি। এই যুগে যেসব অতিসূক্ষ্ম সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী হচ্ছে এবং যেভাবে উন্নতমানের পলিশ, নিকেল ও কালার হচ্ছে সেক্ষেত্রে বারুইপুরের সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ শিল্পের শিল্পীদের কৃতিত্ব সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সার্জারির প্রায় সমস্ত বিভাগেরই ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী করে থাকেন। তবে বারুইপুরে অপারেশন থিয়েটারের এ্যাপারেটাস তৈরীর কাজ একেবারে হয়না বললেই চলে। এখানকার শিল্পীদের তৈরী সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে

মূলগত আকৃতি অনুসারে কতগুলি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। যেমন – সার্জিক্যাল নাইভস (Surgical Knives), সার্জিক্যাল সিজরস (Surgical Scissors), ফরসেপস (Forceps), নীডল হোল্ডারস (Needle Holders), ক্ল্যাম্পস (clamps), রিট্র্যাক্টরস (Retractors), এলিভেটরস (Elevators), কিউরেটরস (curetors), চিজেল্স গাউজেস অ্যাণ্ড অসটিওটম্স (Chisels, Gouges and Osteotomes), প্রোব্স, ডাইরেকটরস, ডায়লেটর্স (Probes, directors, dilators), রনজার্স অ্যাণ্ড নিব্লারস (Rangeurs & Nibblers) ইত্যাদি।

বারুইপুর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ শিল্পে সূচনাপর্বে কার্বন স্টীলের প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু এই স্টীলে পলিশিং ভালো হতো না। নিকেলও সহজে উঠে যেতো। তাই পরবর্তিকালে স্টেনলেস স্টীলের ব্যবহার শুরু হয়। গ্রেড-এ আই-এস-আই-৪১০, গ্রেড-এ-আই-এস-আই-৪২০ এ দুটি ম্যাগনেটিক কোয়ালিটির স্টীল এবং গ্রেড-এ-আই-এস-আই-৩০৪ অথবা ৩১৬ এল ননম্যাগনেটিক স্টীল এখানকার সার্জিক্যাল কারিগরগণ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীতে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া ব্রাস (Brass) এবং টাইটানিয়াম (Titanium) ধাতুর ইনস্ট্রুমেন্টও তৈরী হচ্ছে। টাইটানিয়াম এমন এক ধরনের এ্যালয়মেটাল (Alloymetal) যা ব্যবহারের পক্ষে হালকা এবং রাস্টপ্রুফ।

কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিগত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বারুইপুরের সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরীর কারিগরগণ তাঁদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে ব্যবহারযোগ্য সম্পূর্ণতাদান করেন। মূল পর্যায়গুলিকে সাধারণ ভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ফোর্জিং (Forging), (২) ফিটিং (Fitting), (৩) পলিশিং (Polishing) ও কালারিং (Colouring) (৪) চেকিং (Checking) এবং প্যাকিং (Packing)। ফিটিং-এর মধ্যে আবার কতগুলি পর্যায় রয়েছে। (ক) গ্রাইন্ডিং (Grinding), (খ) টেম্পার লুজিং (Temper loosing) (গ) ড্রিলিং (Drilling) (ঘ) অ্যাঙ্গলিং (Angling) (ঙ) ভাইসিং বা ভাইস ম্যানিং (Vicing or Vicemanning) এবং টেম্পারিং বা হার্ডেনিং (Tempering or Hardenning) ইত্যাদি। অবশ্য ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন অনুসারে এইসব পর্যায়ের গুরুত্ব নির্ভর করে।

ফোর্জিং পর্যায়ে ইনস্ট্রুমেন্টের স্যাম্পেল অনুযায়ী কাঁচা স্টীল কামারশালে পুড়িয়ে পিটিয়ে প্রাথমিক আকৃতি দান করা হয়। ফিটিং পর্যায়ে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে প্রথমে গ্রাইন্ডিংযন্ত্র বা শানের সাহায্যে অবাঞ্ছিত আয়তন, ওজন ও অমসৃণ ভাবকে দূর করা হয়। প্রয়োজনে ইনস্ট্রুমেন্টগুলির কাঠিন্য দূর করতে সেগুলিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে আবার ধীরে ধীরে শীতল করা হয়। একে টেম্পার লুজিং বা স্থানীয় ভাষায় মাল পোড়ানো বলে। নন ম্যাগনেটিক স্টীলের ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে টেম্পার লুজিং করার প্রয়োজন হয় না। টেম্পার লুজিং-এর পর ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে পাঞ্চিং করে প্রয়োজন মতো ড্রিলিং করা হয়। এরপর সেগুলিকে স্যাম্পেল অনুযায়ী অ্যাঙ্গলিং অর্থাৎ বাঁকানো হয়।

পরবর্তী ভাইসিং বা ভাইসম্যানিং উপপর্যায়ে বিভিন্ন ছোটো ছোটো টুল্সের সাহায্যে

ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে স্যাম্পেল অনুসারে মাপ, আকৃতি ও ওজন ঠিক রেখে সূক্ষ্ম নিখুঁত ও মসৃণভাবে রূপদান করা হয়।

পলিশিং পর্বে ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে গ্রাইন্ডিং যন্ত্র বা শানের সাহায্যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে স্থায়ীভাবে মসৃণ ও উজ্জ্বল করা হয়। এইসময় স্ট্যাম্পিং-এর কাজও সেরে নেওয়া হয়। প্রয়োজনে কালারিংও করা হয়। সবশেষে চেকিংয়ের পর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে অর্ডার অনুযায়ী বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। আজকাল বারুইপুরের বহু সার্জিক্যালশিল্পী ফিসিং টুলস তৈরী করে জীবিকানির্বাহ করছেন। এগুলি দেশ ও বিদেশে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। মনে রাখা দরকার যে, ফিসিং টুলসগুলি কিন্তু সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতীত ও বর্তমান ফোর্জিং কারিগরদের মধ্যে বারুইপুর থানার ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকার, পতিতপাবন কর্মকার, সতীশচন্দ্র কর্মকার, গৌরচন্দ্র কর্মকার, নিমাইচন্দ্র কর্মকার-১, পঞ্চানন কর্মকার, ভদ্রেশ্বর কর্মকার, দাশরথি কর্মকার, জহর কর্মকার, সন্ন্যাসী কর্মকার, রঞ্জন কর্মকার, নিমাই কর্মকার, কার্তিক মণ্ডল, সুনীল কর্মকার, প্রফুল্ল কর্মকার, জয়দেব কর্মকার, কানুরাম কর্মকার, দুর্গা কর্মকার, মানিক কর্মকার, রঞ্জন কর্মকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাম। বলা বাহুল্য, এঁদের অনেকেই ফোর্জিং থেকে শুরু করে একটি সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সমস্ত পর্যায়ের কাজ করতে সুযোগ্য।

আবার বারুইপুর থানার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট উৎপাদকগণ এই থানার আশেপাশের দু-একটি থানার ফোর্জিং মিস্ত্রীদের দিয়ে স্যাম্পল ও ক্যাটালগ অনুযায়ী ইনস্ট্রুমেন্ট অর্ডার দিয়ে ফোর্জিং করিয়ে নেন। এমন কয়েকজন দক্ষ ফোর্জিং মিস্ত্রীদের নাম উল্লেখ করা হলো--পুলিন কর্মকার, বাদল কর্মকার, কানাই কর্মকার (মগরাহাট থানা); বংশী কর্মকার, গোবর্ধন কর্মকার, শান্তি কর্মকার, ভবেন কর্মকার, বীরেন কর্মকার, সুকুমার কর্মকার, শৈলেন কর্মকার, মেহের আলি, হাসেম আলি, অজিত সরদার, অসিত কর্মকার, পরেশ সরদার, প্রভাস সরদার (বিষ্ণুপুর থানা); রঞ্জিত কর্মকার (জয়নগর থানা); অশোক কর্মকার (যাদবপুর থানা) ।

বারুইপুর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলি প্রধানত চারভাবে বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসা হয়। প্রথমত এখানকার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাতাগণ কলকাতাসহ প্রায় সারা ভারতবর্ষে বড় বড় কোম্পানীগুলির কাছ থেকে স্যাম্পেল ও অর্ডার নিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী করে তাঁদের কাছে সরাসরি বিক্রি করেন। সেক্ষেত্রে ওইসব বড় কোম্পানীগুলি ইনস্ট্রুমেন্টের উপর তাঁদের নামের স্ট্যাম্প ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত কিছু ডিষ্ট্রিবিউটর বা ডিলার মিডিয়েটর রূপে এখানকার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাতাদের কাছ থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে সারা ভারতবর্ষের বড় বড় সার্জিক্যাল কোম্পানীগুলির কাছে বিক্রী করে থাকেন। তৃতীয়ত এখানকার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট শিল্পীদের বেশ কিছু পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা করে থাকেন এবং চতুর্থত এখানকার কয়েকজন সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট শিল্পী তাঁদের তৈরী কিছু উৎকৃষ্ট ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে রাজ্যভিত্তিক বা সর্বভারতীয় অফথ্যালমোলজিক্যাল কনফারেন্সে স্টল দিয়ে বিক্রি করে থাকেন।

অন্যান্য শিল্পের মতো বারুইপুর সার্জিক্যাল শিল্পও সমস্যামুক্ত নয়। ঘন ঘন লোডশেডিং,

শিক্ষার অভাব, ইনস্ট্রুমেন্টের দাম নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দক্ষ শিল্পীদের ভিনরাজ্যে পাড়ি, ডাক্তারবাবুদের পক্ষপাতিত্ব, অনুন্নত মানের স্টীল, শিল্পীদের উপযুক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার অভাব, শ্রমবিভাজনের অভাব, উন্নতমানের মেশিনের অভাব, কোক কয়লার আকাশছোঁয়া দাম, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ব্যাংক থেকে সুলভে, কম সুদে ও সহজ পদ্ধতিতে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা এবং সর্বোপরি শিল্পীদের মধ্যে একতার অভাব এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে এক ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে এখানকার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাতাগণ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি কো-অপারেটিভ তৈরী করার চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে করে আসছেন যার উদ্দেশ্য হবে দেশের বড়ো বড়ো সার্জিক্যাল কোম্পানী বা এজেন্টদের টেন্ডার নিয়ে অর্ডার অনুযায়ী এখানকার দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে ইনস্ট্রুমেন্টগুলিকে তৈরী করে নিয়ে সেগুলিকে ন্যায্য দামে কো-অপারেটিভ কিনে নেবেন এবং তারপর ঐসব বড়ো বড়ো কোম্পানী ও এজেন্টদের কাছে সঠিক বিশেষ দামে বিক্রী করবেন। বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের কো-অপারেটিভ তৈরীর কাজ কিছুটা সফল হলেও নানা মতান্তর ও বিভেদ রয়েছে। এর সর্বসম্মত রূপায়ণ আশু প্রয়োজন।

বারুইপুর সার্জিক্যালশিল্পের এই যান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক দিকের উর্ধ্বে একটি সাংস্কৃতিক দিকও আছে যা বিশেষ করে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। এই পূজা উৎসবের দু-একদিন পূর্ব থেকেই ছোটো ছোটো সার্জিক্যাল কর্মশালার মালিকসহ কর্মচারিগণ সানন্দে কর্মশালাটি এবং ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি উত্তমরূপে ঝাড়ামোছা করে পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত করেন। শুধু তাই নয়, কর্মশালার মধ্যে কিম্বা কর্মশালা সংলগ্ন স্থানে ছোটো ছোটো সুদৃশ্য মণ্ডপ তৈরী করে বিশ্বকর্মার বিগ্রহ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ এসে কর্মশালার যন্ত্রপাতিগুলিকে সিঁদুর, চন্দন চর্চিত করে বিশ্বকর্মাপূজা সমাপন করেন। মালিক ও কর্মচারিগণ দু-তিনদিন ধরে আইনানুগ মাইক বাজান, ভিডিও শো উপভোগ করেন এবং ভাত, লুচি, মাংস, মিষ্টির ভূরিভোজ ব্যবস্থা থাকে। কয়েকদিন তাস ও লুডোখেলা অবাধে চলতে থাকে। এমনকী মালিক মুসলমান হলেও এই উপলক্ষ্যে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেন এবং কর্মচারীদের মিষ্টি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে পরিতৃপ্ত হন।

বারুইপুর সার্জিক্যালশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একথা বলতেই হয় যে, এই শিল্পের সূচনাপর্ব থেকে আজকের অগ্রগতির বিশেষ স্তর পর্যন্ত এখানকার কর্মকার সম্প্রদায়ের আধিপত্য অবিসংবাদিত। একথা অনস্বীকার্য যে, বারুইপুরের কামারশাল থেকেই এখানকার সার্জিক্যালশিল্পের সূচনা। তাই একটি ছড়ায় আছে –

"বারুইপুরের কামারশাল
সার্জিক্যালের ধরলো হাল।"

এ বিষয়ে বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার মনোরঞ্জন পুরকাইত মহাশয়ের একটি সুন্দর ছড়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য –

"বারুইপুর দিয়েছে তৃপ্তি
মিষ্টি পেয়ারা আর জামে
বিশ্বে তার মিলেছে খ্যাতি
সার্জিক্যাল শিল্পের নামে।

টুং টাং হাতুড়ী হাপর
দুই তীরে করে কলরব
সৃষ্টির নেশায় নেশায়
সার্জিক্যাল শিল্পী সরব।"

বাস্তবিকই বারুইপুরের সার্জিক্যালশিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। এখানকার শিল্পীদের হাতেগড়া ইনস্ট্রুমেন্টগুলি বিশ্ববন্দিত। বর্তমানে বারুইপুর থানায় প্রায় দুশো পঞ্চাশটির মতো ছোটোবড়ো সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ কর্মশালা লোকায়ত কুটির শিল্পরূপে গড়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বহু অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অধুনা শিক্ষিত ছেলে এই কুটির শিল্পটির মাধ্যমে জীবনজীবিকা নির্বাহ করছেন। সম্প্রতি দু-একজন মহিলাও এই শিল্পে সামিল হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে শুভ সংবাদ।

বারুইপুরের এই জনপ্রিয় শিল্পটির আরো সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের আনুকূল্য ও সক্রিয় সহায়তা বেশি করে প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের স্টীল, উন্নত বিদেশী প্রযুক্তি, উন্নত মেশিন, কার্যকরী গবেষণা, ন্যায্যমূল্যে বিক্রি ব্যবস্থা, স্বল্পসুদে, দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে এবং সর্বোপরি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ। এইটুকু প্রত্যাশা পূর্ণ হলে বারুইপুরের সার্জিক্যালশিল্প একদিন যে বিশ্বজয় করবে সেকথা অমূলক নয়। আশার কথা সম্প্রতি ইউ.এন.ডি.পি. পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কটি সমবায় ভিত্তিতে ক্লাস্টার প্রজেক্ট করার উপর জোর দিয়েছেন, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরী তার অন্যতম।

বিড়িশিল্প ঃ থানা বারুইপুরের একটি উল্লেখযোগ্য লোকায়ত শিল্প হলো বিড়িশিল্প। এখানকার লোক-লোকায়ত সমাজের একটা বিরাট অংশ বিড়িশিল্পকে আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বিশেষ করে বারুইপুর শহরের উত্তরপূর্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গ্রামগুলি তথা কপিন্দপুর, নাজিরপুর, বাগবেড়ে, মধুবনপুর, বিনোদপুর, টগরবেড়িয়া, ভুরকুল, কালীনগর, কাঁটাপুকুর, ওড়ঞ্চ, বেগমপুর, নোয়াপুকুর, মলঙ্গা, সিমলাবাদ, মাধবপুর, আগনা, মল্লিকপুর, পেটুয়া, পাঁচঘরা, কামরা, নড়িদানা, রঘুনন্দনপুর, উলুঝাড়া, তেঁতুলিয়া এবং দক্ষিণপূর্বে উত্তরভাগ, বৃন্দাখালি, দমদমা, পারুলদহ, রামনগর, ধপধপি প্রভৃতি অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলির পুরোপুরি কিম্বা আংশিক উপার্জনের উৎস হলো এই বিড়িশিল্প।

এইসব অঞ্চলে লোকায়ত শিল্পরূপে বিড়িশিল্পের একদেশীভবনের কারণের পিছনে দায়ী বিদ্যাধরী ও পিয়ালী নদীদুটির বিলুপ্তি। এই দুটি নদীর খাত মজে গেলে এখানকার বিস্তীর্ণ ধানচাষের বাদা জলজমে জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে ধানচাষ বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বাঁচার তাগিদে বিড়িশিল্পে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আড়াপাঁচ খালের মাধ্যমে উত্তরভাগে জল পাম্পিংস্টেশান চালু হলে জলাভূমির জল নিকাশ হয়। তবে আজো উপরোক্ত গ্রামগুলির অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের মানুষজন বিশেষ করে মেয়েরা বিড়িশিল্পটিকে সচল রেখেছেন জীবন জীবিকার তাগিদে। এই অঞ্চলের একটি গ্রামীণ লোকসঙ্গীতে সুন্দরভাবে সেই আবেদন ব্যঞ্জিত হয়েছে –

বউ তুই বিড়ি পাকানা
করবো বিড়ির কারখানা
জীবনজীবিকা চলবে আমার
ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবো
দেবতাদের পূজা দেবো
করবো মা-বাপের আরাধনা
বউ তুই বিড়ি পাকানা

(কিবাইৎপুর নিবাসী সনাতন মণ্ডলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

বিড়িশিল্পের উপকরণরূপে লাগে কেন্দুপাতা, তামাকপাতা কুচোনো, কাণ্ডি (তামাক পাতার মাঝখানের শিরার টুকরো), কঞ্চির কলম, রঙীন সুতো, কাঁচি, বিশেষ ধরনের কুলো এছাড়া আলাদা করে কয়লার আঁচ, আঁচের চারদিকে মাটির উঁচু ঘর বা কাঁতি , কাঠের চৌকো বাক্স ও হাতের আঙুল দ্রুত চালনার জন্য ছাই বা নুনজল ব্যবহার করে থাকেন। বিড়ি তৈরীর সময় বিড়িশ্রমিকগণ কাঁচি দিয়ে কেন্দুপাতাগুলিকে বিশেষ আকৃতিতে সাইজমতো টুকরো টুকরো করে কেটে নেন। সাইজ একরকম রাখার জন্য জ্যামিতিক ট্রাপিজিয়াম আকৃতিবিশিষ্ট টিনের পাত ব্যবহার করা হয়।

এরপর মশলা সহ কুলোটিকে কোলের উপর নিয়ে একেকটি বিড়িপাতার টুকরোর উপর পরিমাণমতো মশলা আঙুলের মৃদুচাপে বিছিয়ে দিয়ে হাতের কৌশলে বিড়ির পাতাটিকে পাকিয়ে গোল করে বিড়ির মতো আকৃতি দান করেন এবং বিড়ির গোড়ার দিক থেকে একটু উপরে রঙীন সুতো জড়িয়ে হাতের টানে সুতোটিকে ছিঁড়ে দেন । অতঃপর কঞ্চির কলম দিয়ে দক্ষহাতে দ্রুত বিড়ির উপরের মুখ সুন্দরভাবে মুড়ে দেন। একে মুখমারা বলে। এইভাবে পঁচিশটি বিড়ি নিয়ে একেকটি বাণ্ডিল তৈরী হয়। বেশ কিছু বিড়ির বাণ্ডিল প্রস্তুত হলে পর একটি আঁচকে কাঁতি বা একটি চৌকো কাঠের বাক্সের মধ্যে বসিয়ে তার উপর একটি তারের জাল বিছিয়ে বিড়ির বাণ্ডিলগুলিকে ঐ তারের জালের উপর সাজিয়ে আঁচের উত্তাপে সেঁকা হয়। এই কর্ম সাধারণত কারবারীগণ করে থাকেন। তামাকের ভাগ এবং আঁচের উত্তাপের কমবেশীর উপর ভিত্তি করে তিনপ্রকারের বিড়ি তৈরী হয় – কড়াবিড়ি, মিঠেকড়াবিড়ি ও নরমবিড়ি। তামাকপাতাও অনেক রকমের আছে। বিড়ির পক্ষে এক নম্বর তামাকপাতা হলো নেপানি। এছাড়া ঘুন্টুর, বিহারী ও গুজরাটী, তামাকপাতা আছে। আর এক ধরনের তামাকপাতা হলো ক্যালকাতি। এই তামাকপাতার স্বাদ একটু নোনতা বলে নোনাপাতি নামেও এই তামাকপাতা পরিচিত। এইসব তামাকপাতা ছাড়াও বিড়ির মশলাতে আগুনকে ভালো ভাবে ধরে রাখার জন্য কাণ্ডি থাকে। বিড়ি তৈরীর জন্য কেন্দুপাতা আসে সাধারণত বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট থেকে।

আকৃতি অনুযায়ীও বারুইপুর থানায় বিভিন্ন রকমের বিড়ি দেখা যায়। যেমন– বেশ লম্বা আকৃতির বিড়ি, তলা চ্যাপ্টা মাথা সরু বিড়ি, ডিমাকৃতির মাথামোড়া আণ্ডাকুটুরি বিড়ি ইত্যাদি। নোনাপাতির নোনতা স্বাদযুক্ত বিড়ি এই অঞ্চলের তাড়ি, মদ ও পান্তাসক্ত মানুষের কাছে

খুব প্রিয়। তবে বর্ষাকালে এই ধরনের বিড়ি ড্যাম্প হয়ে যেতে পারে বলে খুব একটা চলে না। আর সাধারণ বিড়ি তো আছেই। বিড়ির বড় বড় দোকানদারগণ তাঁদের বিড়িতে এক এক রঙে সুতো ব্যবহার করে থাকেন। যেমন – লালসুতোর বিড়ি, কালোসুতোর বিড়ি, সবুজসুতোর বিড়ি, সাদাসুতোর বিড়ি, নীলসুতোর বিড়ি ইত্যাদি।

বারুইপুর থানার বিড়িশিল্পীরা যাদবপুর, গড়িয়া, বারুইপুর, ক্যানিং অঞ্চলের বড় বড় দোকানদারদের কাছ থেকে হয় সরাসরি কিম্বা মিড্‌লম্যানরূপী বিড়ি কারবারীদের মাধ্যমে বিড়িপাতা, তামাকপাতা বা মশলা কিম্বা উক্ত উপকরণগুলি কিনে নেবার দাম নিয়ে বিড়ি তৈরী করেন ও বিড়ি চালান দেন।

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৫০ সাল নাগাদ এই থানার বিড়িশ্রমিকরা হাজার বিড়ি বেঁধে একটাকা থেকে দেড়টাকা পেতেন। অধুনা সেখানে বারুইপুর শহরের পুরুষ বিড়িশ্রমিকরা পাচ্ছেন পঞ্চাশ থেকে ষাটটাকা এবং গ্রামের বিড়িশ্রমিকরা পাচ্ছেন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা। এই থানার গ্রামাঞ্চলের বিড়িশিল্পনির্ভর পরিবারগুলিতে পুরুষদের সঙ্গে সমানে মহিলারাও বিড়ি বেঁধে থাকেন।

যতদূর জানা গেছে ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ বারুইপুর থানার বিড়িশ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদেরকে একত্রিত করার জন্য বারুইপুর শহরে একটি বামপন্থী বিড়িশ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিলো। পরে ডানপন্থী ইউনিয়নও গঠিত হয়। এই ইউনিয়ন গ্রামে গ্রামে বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মঙ্গলার্থে ও স্বার্থরক্ষার্থে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে বিড়িশ্রমিক ইউনিয়ন বিশেষ করে গ্রামে অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

বারুইপুর থানার মধুবনপুরের নবারুণ সংঘ ১৯৯৪ সাল থেকে ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রকের অধীন লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানকার বিড়িশ্রমিকদের স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের অনুদান স্বরূপ কিছু অর্থ বরাদ্দ করে আসছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন স্কুলে ফর্ম পাঠিয়ে দেন। বিড়িশ্রমিকদের স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা ঐ ফর্ম সংগ্রহ এবং পূরণ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের সীল ও স্বাক্ষর সহ ক্লাবে জমা দিলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেগুলি ভারত সরকারের লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে স্কুলগুলিতে বিড়িশ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের নাম বরাবর নির্ধারিত অর্থ যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বারুইপুর থানার বিড়িশিল্পকে কেন্দ্র করে লোকায়ত সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার পূজার প্রচলন বিড়িশিল্পে ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে। এখানকার বিড়িশিল্পীদের মধ্যে এই পূজাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উৎসাহ, ভক্তিপ্রদান এবং আমোদপ্রমোদ করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বিড়িশিল্পীদের অভাব-অনটন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কষ্টদুঃখ তাঁদের কথায়, ছড়ায় ও গানে কখনো কখনো রূপ পরিগ্রহ করে। এই থানার সীতাকুণ্ডু গ্রামের বিড়িশ্রমিক কবি সুনীল বর্গীর একটি ছড়ায় তারই পরিচয় পাই–

আড়াই প্যাঁচের এমন ফল
দেখলে আসে নোলায় জল
আমার মরদ খায় এই মাল
তবুও দেয় মার ও গাল,
তাই বাপের বাড়ি চলে এলাম
বিড়ি বাঁধায় হাত দিলাম।
হাজার পাছায় সুতো ধরি
ছাওয়ালটারে মানুষ করি
বাছা যদি মানুষ হয়
আমার তবে দুঃখ যায়।

আবার বেগমপুর গ্রামের ভূমিসন্তান খ্যাতিমান লোকসংস্কৃতি গবেষক ডঃ দেবব্রত নস্কর মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে বিড়িশিল্প সম্পর্কে একটি সুন্দর ছড়া উদ্ধৃত হল –

আড়াই পাকে পুঁটকি মুড়ে

সরু সুতোয় ঘুনসি হয়।

বাঁশের কলম মাথায় মেরে

তবেই তারে বিড়ি কয়।

বারুইপুর থানার এই ব্যাপক গ্রামীণ লোকায়ত শিল্পটিকে বাঁচাতে গ্রামপঞ্চায়েতকে সর্বতোভাবে দুঃস্থ বিড়িশিল্পীদের পাশে সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে দাঁড়ানো জরুরী দরকার।

দড়িশিল্প ঃ রূপকথায় চাঁদে বসে চাঁদের বুড়ি পাটের দড়ি তৈরী করার কল্পনা বহুশ্রুত কিন্তু আমাদের থানার শিখরবালি গ্রামে বাস্তবে পাটের দড়ি তৈরীর ঐতিহ্য আজও প্রবহমান। বহু পরিবার এই লোকায়ত শিল্পটিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। একসময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই গ্রামে ব্যাপকভাবে শন ও পাটের দড়ি তৈরীতে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সবাই অংশগ্রহণ করতেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শনের কাছির সাহায্যে বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা প্রতিরোধ করা হত। তাই তখন শন থেকে নির্মিত কাছির বিপুল চাহিদা ছিল। তখন শনের দড়ি ও কাছি তৈরী করে অনেক পরিবার যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তিকালে শনের দড়ি বা কাছির চাহিদা কমে যায় ও পাটের দড়ি তৈরীতেই শিল্পীরা মনোনিবেশ করেন।

প্রথমদিকে সুন্দর নস্কর, সন্তোষ ঘোষ, সন্তোষ মণ্ডল, বিমল দাশ, গোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই দড়িশিল্পে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তখন শিখরবালি ও দক্ষিণ শাসনে এই দড়িশিল্প বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ শাসনের গোবিন্দ মণ্ডল সে যুগের একজন নামকরা গোলাদার ছিলেন। এইসব গোলাদারগণ তাঁদের গোলায় পাট সঞ্চয় করে রাখতেন

আর দড়িশিল্পীরা তাঁদের কাছ থেকে পাট নিয়ে কিংবা পাট কিনে বিশেষ পদ্ধতিতে দড়ি প্রস্তুত করতেন। অনেক শিল্পী মহাজনদের কাছ থেকে দাদন ও পাট নিয়ে দড়ি কেটে মহাজনদের কাছেই দড়ি জমা দিতেন। একে বলা হত দাদনি কারবার। আর অনেকে আবার গোলাদারদের কাছ থেকে পাট কিনে দড়ি কেটে সেই দড়ি সরাসরি বড়বাজারে বড় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রী করতেন। একে বলা হত আড়ৎদারি কারবার। বলা বাহুল্য শিখরবালি গ্রামের ঘোষপাড়া, সরদারপাড়া, নস্করপাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি পাড়ায় দড়ি কর্মশালা গুলিতে আজও এই দুধরণের দড়ি-কারবার চলে। দাদনি কারবারে দড়ি শিল্পীর যে পরিমাণ পাট মহাজনদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন সেই পরিমাণ দড়ি কেটে মহাজনদের দিতে হয়। কিন্তু পাট থেকে দড়ি তৈরী করার সময় স্বভাবতই নানা কারণে পাটের পরিমাণ কমে যায়। আর তার ফলে দড়ির পরিমান কমে গেলে প্রতি কিলোতে দড়ি শিল্পীকে প্রায় ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা জরিমানা দিতে হয়। তাই পাটের পরিমান ও দড়ির পরিমান সমান রাখতে দড়ি শিল্পীরা পাটে জল মিশিয়ে পাট ও দড়ির ওজন বৃদ্ধি করেন এবং পাটের ভুষিগুলি থেকেও দড়ি কেটে থাকেন।

অধুনা শিখরবালি গ্রামের উক্ত পাড়াগুলিতে ক্ষেত্রানুসন্ধান করে দেখা গেছে যে গোপাল মণ্ডল, মীনা মণ্ডল, গোবিন্দ মন্ডল, ললিত নস্কর, ছিদাম নস্কর, সনাতন নস্কর প্রমুখ বহু পুরুষ ও মহিলা দড়ি তৈরী শিল্পী খুব সাধারণ পদ্ধতিতে কয়েকটি পর্যায়ে পাট থেকে দড়ি তৈরীর কাজ সুসম্পন্ন করছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সংগে।

পাটের দড়ি তৈরী ব্যাপারটি মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। (১) পাট ছোলা, (২) খে কাটা ও (৩) বেটে পাকানো। প্রথমে পাট ছোলার জন্য এঁরা ব্যবহার করেন একটা ভারি মোটা তক্তার উপরে আটকানো প্রায় দেড় ফুট লম্বা লম্বা আঙুলের মত সরু ৪০ টা লোহার কাঁটা। তক্তাটির দুদিকে দুটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে দুটি খোঁটা পুঁতে মাটির সংগে কাঁটা যুক্ত তক্তাটিকে দৃঢ় ভাবে আটকে দড়িশিল্পীরা লম্বা পাটের গাঁটগুলিকে ঐ কাঁটার উপর দিয়ে টেনে টেনে পাটের ভুসিগুলিকে পৃথক করেন ও পাটের গাঁটগুলিকে পরিষ্কার করে নেন। এরপর দড়িকাটা কলে বিশেষ পদ্ধতিতে পাট থেকে প্রথমে সরু 'খে' কাটা হয় এবং তারপর দুটি খে একসঙ্গে পাকিয়ে তৈরী করা হয় বেটে। বাঁশনির্মিত ছোট মই আকৃতির এই দড়ি কাটা কল শিল্পীরা নিজেরাই হাতে তৈরী করে নেন। মাটিতে আট ইঞ্চি থেকে এক ফুট ফাঁক দিয়ে দুদিকে দুটো প্রায় ফুট চারেক লম্বা বাঁশের মাঝখান থেকে চেরা দুটি অংশ পুঁতে নীচে থেকে এক ফুট উঁচুতে প্রথম একটি গোলসরু কাঠি দুটি খুঁটির সংযোজক হিসাবে এমনভাবে লাগানে হয় যা সহজে ঘুরতে পারে কিন্তু বামদিকে একটা পাতলা চওড়া ছোট চেড়ার টুকরো ঐ সংযোজকের সংগে লাগিয়ে সেটিকে উভয় খুঁটির মাঝখানে ধরে রাখা হয়। ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে যেতে পারে না। এটিকে ফিনকি বলে। ফিনকির বামদিকে খুঁটির বাইরে সরুকাঠির মুখে সাইকেলের স্পোক্ বা ছাতার শিকের ছোট টুকরো আটকানো থাকে। নীচের এই সংযোজকটিকে বেটের কল বলা হয়। বেটের কলের ফুটখানেক উপরে অনুরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় খে'র কল। আর খে'র কলের ফুটখানেক উচুঁতে আর একটি ঐ ধরনের সংযোজক থাকে যার সংগে ছাতার শিক বা সাইকেলের স্পোকের টুকরো লাগানো থাকেনা।

উপরের সংযোজকটিকে অবলম্বন করে দুটি মোটা সুতোর একটির সাহায্যে খে'র কলটিকে এবং অন্যটির সাহায্যে বেটের কলটিকে একজন প্রয়োজন মত ঘোরাতে থাকেন। এই সময় আর একজন বামহাত দিয়ে পাটের গোছা ধরে এবং বামপায়ে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে পাটের গোছার নীচের অংশ জড়িয়ে খে'র কলের মুখে ঘুরন্ত ছাতার শিক্ বা সাইকেলের স্পোকের অংশে পাটের অগ্রভাগ একটু জড়িয়ে দিয়ে তারপর অল্প অল্প সরু সরু ভাগে ডান হাতে পাট যোগান দিতে দিতে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকেন। এইভাবে পাট পাক খেতে খেতে খে' তৈরী হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দুটি খে একত্র করে বেটে কলের সাহায্যে পাক দিয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা বেটে তৈরী করা হয়। এই দুই পর্যায়ে সাধারণত মেয়েরাই বেশী অংশ নিয়ে থাকেন।

তিনটি বেটে একত্র করে আধ পোয়ে এবং চারটি বেটে একত্র করে এক পোয়ে মোটা দড়ি তৈরীর সময়ে দড়িশিল্পীরা একধরনের লোহার তৈরী কল ব্যবহার করেন। এই ছোট কলটিতে দুটি পেনিয়ান যুক্ত চাকা থাকে। একটি হ্যান্ডেলের দ্বারা প্রথম চাকাটিকে ঘোরালে প্রথম চাকাটি আবার দ্বিতীয় চাকাটিকে ঘোরায়। তারপর দ্বিতীয় চাকাটি পেনিয়ানযুক্ত চারটি হুককে ঘোরাতে থাকে। এই হুকগুলির সংগে যুক্ত থাকে এক-একটি বেটে। বেটেগুলির অপর প্রান্ত একটি লোহার তৈরী ঘুরুনীর অগ্রভাগে আটকানো ইংরাজী এস আকৃতির হুকের মধ্যে আটকানো হয়। একজন ব্যক্তি ঘুরুনীর শেষপ্রান্তে লাগানো একটা দড়ি ধরে থাকেন। আর একজন কাঠের তৈরী নারকুলের চারটি খাঁজের মধ্যে এক-একটি বেটে লাগিয়ে নেন। এবার একজন অন্যপ্রান্তে স্থাপিত লোহার দড়ি-কলের হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করলে উল্টো দিকের ঘুরুনীটি ঘুরতে আরম্ভ করে আর সংগে সংগে মাঝখানের ব্যক্তিটি নারকুলে হাতে চারটি বেটে ধরে একটু একটু করে পাকের সংগে সংগে ঘুরুনীর কাছ থেকে লোহার কলের দিকে এগিয়ে আসেন। এইভাবে তিনটি বা চারটি বেটে পাক যুক্ত হয়ে আধপোয়ে কিংবা এক পোয়ে মোটা পাটের দড়িগুলি ২৬ হাত বা ২৮ হাত লম্বা হয়। এগুলিকে মাঝখান থেকে কেটে ১৩ হাত বা ১৪ হাত দড়ি বিক্রয়যোগ্য হয়। এই সব দড়ি থেকে দোলনা, ডাব পাড়ার কাছি, গরুর মুখোশ, গবাদি পশু বাঁধার দড়ি, নৌকা বা ছোট ছোট জলযানে ব্যবহৃত কাছি কিংবা কোন কিছু বাঁধনের কাজে ব্যবহৃত মোটা দড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। এই দড়ি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চালান যায়।

শিখরবালি ছাড়াও বারুইপুর থানার শাসন, ত্রিপুরানগর, বেগমপুরেও একসময় বেশকিছু পরিবার এই দড়িশিল্পে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমানে দু একটি পরিবার এই শিল্পের সংগে জড়িত আছেন। আজকাল বিশেষ করে শিখরবালি গ্রামের দড়িশিল্পের সংগে জড়িত পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে কেউবা চাকরী, কেউবা অন্য ব্যবসা আবার কেউবা চাষবাসের দিকে চলে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য আরও অধিক উপার্জন করা। কারণ, বর্তমানে উৎকৃষ্ট পাটের অপ্রাচুর্যতা, দামবৃদ্ধি, চাহিদার হ্রাস, বাজার সংকোচন ইত্যাদির কারণে পাটের দড়ি শিল্পে নানা সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে আজও শিখরবালির দড়িশিল্প অনেকাংশে সচল, বিশেষ করে অনেক দরিদ্র মানুষ এই লোকায়ত কুটির শিল্পটিকে অবলম্বন করে কায়ক্লেশে জীবিকা উপার্জন করছেন, বিশেষ

করে পরিবারের মহিলারা। এঁদের জীবনজীবিকা ও শিল্পের ছন্দোময়তা আঞ্চলিক কবি ও ছড়াকার শ্রী অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ভূমিসন্তানকে ও ছড়া লিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই তিনি লেখেন —

"শণ সুতুলি পাটের দড়ি
পাট কেটে যে খাই
তেউড়ে কড়াই, বিউলি বড়ি
বেচতে হাটে যাই,
তোমরা যে যা বলো ভাই
তোমরা যে যা বলো ভাই।"

ধূপকাঠিশিল্প ঃ লোকলোকায়ত সমাজে গন্ধদ্রব্য পুড়িয়ে সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া তৈরী করার পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। উদাহরণ স্বরূপ ধুনো ব্যবহারের কথা বলা যায়। পরবর্তিকালে ধূপকাঠি তৈরীর পদ্ধতি মানুষ আয়ত্ত করে। ধূপকাঠি একদিকে যেমন পরিবেশের পবিত্রতা দান করে তার সুগন্ধ বিতরণে অন্যদিকে তেমন এর ধোঁয়ায় সংলগ্ন পরিবেশ থেকে অপকারী মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ সাময়িকভাবে হলেও অপসারিত হয়। তাই পূজানুষ্ঠানে কিম্বা কোনো শুভকর্মে ধূপকাঠি জ্বালানো ধর্মীয় বিধানে পরিণত হয়। মানুষ নিজ গৃহ পরিবেশকেও সুগন্ধময় পবিত্র রাখতে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে থাকে।

সুগন্ধী ধূপকাঠি নির্মাণ একটি বিশেষ শিল্পকর্ম। জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানায় ধূপকাঠি নির্মাণ একটি লোকায়ত কুটিরশিল্পরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এবং ক্রমশ আশেপাশের অঞ্চলগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। বারুইপুর থানার বহু সাধারণ দরিদ্র মানুষ ধূপকাঠি নির্মাণ করে, জীবনজীবিকা অতিবাহিত করে থাকেন। এই অঞ্চলের অনেকেই এই ব্যবসায় বর্তমানে অবস্থাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন।

ক্ষেত্র গবেষণায় জানা গিয়েছে এই থানার অন্তর্গত পিয়ালীটাউন নামক শিল্পাঞ্চলে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে অনিল দাস, নারায়ণ মজুমদার এবং নিকটবর্তী কোমরহাট অঞ্চলের অরুণ দত্ত প্রমুখ শিল্পীগণ সর্বপ্রথম বারুইপুর থানায় ধূপকাঠি নির্মাণ শিল্পের সূত্রপাত করেন। শুধু তাই নয়, এঁরা নির্মিত ধূপকাঠিগুলিকে প্রথমদিকে বিক্রির জন্যে ট্রেনেও হকারী করেছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে তাপস হালদার, নারায়ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শিল্পকে আরো সম্প্রসারিত করেন। শাঁখারীপুকুর গ্রামনিবাসী শংকর মণ্ডল ধূপকাঠিশিল্পের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সংগঠক। তাছাড়া পিয়ালী টাউনের রবীন মুখার্জী, আশুতোষ দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ মেশিন বসিয়ে কাঠকয়লার গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রী করেন। এঁরা এবং আরো কিছু ব্যক্তি যথা অনিল দাস, মনোজ বণিক, তাপস হালদার, মহীতোষ সরকার, শঙ্কু সাহা, কৃষ্ণপদ রায়, বিব্রত রায়, শক্তি ঠাকুর প্রমুখ পিয়ালী টাউনের বাসিন্দাগণ বারুইপুর থানার এবং আশেপাশের থানার শ্রমিকদের দিয়ে ধূপকাঠি তৈরী করিয়ে থাকেন। আবার অমল সাহা, বড়দা অর্থাৎ মনোজ বণিক, অশোক বণিক (পিয়ালীটাউন); কালীপদ নস্কর (শাঁখারীপুকুর)

ভানুপদ মণ্ডল (শাসন) প্রভৃতি ধূপকাঠিকে সেন্ট করিয়ে ব্যবসা করেন। এঁদের অনেকেই সরাসরি ধূপকাঠির হকারীও করে থাকেন।

ধূপকাঠি নির্মাণ শিল্পের প্রধান উপকরণ রূপে এখানকার শিল্পীরা অ্যালামাটি, কাঠকয়লার গুঁড়ো, কালি, মাইসোর ডাস্ট, গরানকাঠের গুঁড়ো, নার্গিস পাউডার, জিকেট পাউডার (গুজরাট, আসাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলির জঙ্গলে প্রাপ্ত এক ধরনের জিউলি জাতীয় বৃক্ষের ছাল থেকে প্রস্তুত গুঁড়ো), বাঁশের সরু সরু কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। এইসব উপকরণ তাঁরা সাধারণত কোলকাতার বড়বাজার থেকে কিনে আনেন। বাঁশের সরু সরু কাঠি বড়বাজারে আসে ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি থেকে। একটি বাণ্ডিলে আধকিলোগ্রাম এবং একটি বস্তায় চল্লিশ কিলোগ্রাম করে কাঠি থাকে। শাঁখারীপুকুরের কিছু মানুষ বাঁশ থেকে ধূপকাঠি তৈরীর কাজও করে থাকেন।

বারুইপুর থানায় ধূপকাঠিশিল্পীগণ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে ধূপকাঠি তৈরী করে থাকেন। (১) ডলা পদ্ধতি ও (২) টানা পদ্ধতি। ডলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে কাঠকয়লা গুঁড়ো, গরানকাঠের গুঁড়ো, মাইসোর ডাস্ট, নুরুয়া বা নার্গিস ডাস্ট, জিকেট পাউডার, কালি, হোয়াইট চিপ ইত্যাদি বিশেষ ভাগে মিশিয়ে ও ভালো করে চেলে নিয়ে ধূপের মশলা তৈরী করেন। অতঃপর তাতে প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে লেই তৈরী করে থকথকে করেন এবং ওই লেইকে সরু লম্বা মতো করে নিয়ে ধূপকাঠিটিকে তার মধ্যে দিয়ে একটা মসৃণ পিঁড়ি কিম্বা স্থানের উপর ফেলে ডলতে থাকেন। ডলার সুবিধার জন্য তাঁরা মাঝে মাঝে একটু শুকনো মশলা লাগিয়ে নেন। আর টানা পদ্ধতিতে ধূপকাঠিনির্মাতারা ওই লেইকে অপেক্ষাকৃত পাতলা করে সাধারণত বামহাতে নিয়ে ডানহাত দিয়ে ধূপের কাঠিটিকে ধরে লেইয়ের মধ্যে দিয়ে কাঠিটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনে আনেন। তখন ওই লেই ধূপকাঠির গায়ে লেগে যায়। পুনরায় ধূপকাঠিটিকে ঝুরো মশলার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ট্রের উপর একের পর এক হেলিয়ে প্রতিস্থাপন করে শুকিয়ে নেন এবং সবশেষে মসৃণ পিঁড়ি কিম্বা কোনো স্থানে ফেলে ডলে নিয়ে কাঠিগুলিকে ভালো করে শুকিয়ে নেন।

এভাবে ধূপকাঠি তৈরীর পর ধূপকাঠিগুলিকে সুগন্ধযুক্ত করতে এই অঞ্চলের ধূপকাঠি নির্মাণ শিল্পীগণ বাজার থেকে বিভিন্ন ব্যাণ্ডের সেন্ট কিনে তার সঙ্গে ডি.পি.সুপার হোয়াইট ইত্যাদি কেমিক্যাল মিশিয়ে ধূপকাঠিগুলির উপর ঐ মিশ্রণ ছড়িয়ে কিম্বা ওই মিশ্রণের মধ্যে ধূপকাঠিগুলিকে ডুবিয়ে সুগন্ধযুক্ত করেন।

অধুনা বারুইপুরের মতো নামকরা ধূপকাঠিনির্মাণ কেন্দ্রে ধূপকাঠি মশলার জন্য বিভিন্ন গাছের ছাল কিম্বা শ্মশান-কাঠকয়লা গুঁড়োর কল স্থাপিত হওয়ায় ধূপকাঠিনির্মাণ শিল্পীরা স্থানীয়ভাবে ধূপের মশলা সংগ্রহ করার সুবিধা পাচ্ছেন।

বারুইপুর অঞ্চলে ধূপকাঠিশিল্পের সংগে জড়িত বহু শ্রমিক, মালিকদের কাছ থেকে মশলা ও ধূপের কাঠি নিয়ে বাড়িতে বসে ধূপকাঠি বানিয়ে জীবনজীবিকা নির্বাহ করছেন। আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, এঁদের প্রায় পঁচানব্বুই শতাংশই মহিলা। বারুইপুর থানায় নির্মিত এইসব

ধূপকাঠি কোলকাতার বড়বাজার ছাড়াও দার্জিলিং, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি রাজ্য ও দেশে রপ্তানী হচ্ছে। এখানকার ধূপ ব্যবসায়ীরা তাঁদের ধূপের প্যাকেটগুলির উপর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিসহ ব্রাণ্ডের নাম লেখা লেবেল মেরে দেন। এই লেবেল মারা ধূপের প্যাকেট ও আবরণগুলিও এখানে অনেকে তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

ত্রিপুরার বাঁশকাঠি আঞ্চলিক বাঁশকাঠি অপেক্ষা অনেক বেশি টেঁকসই, তাই দামও বেশি। একবস্তা প্রায় পাঁচশো টাকা। আর আঞ্চলিক বাঁশকাঠি একবস্তা প্রায় চারশো টাকা। ডলাকাঠির উপযোগী কাঠকয়লাগুঁড়ো বস্তাপিছু প্রায় তিনশো পঞ্চাশটাকা আর টানাকাঠি উপযোগী বস্তা পিছু প্রায় দুশো পঞ্চাশ টাকা। জিকেট বস্তাপিছু প্রায় দু'হাজার টাকা। কাঠের গুঁড়ো বস্তা পিছু প্রায় দুশো টাকা। নুরুয়া (নার্গিস ডাস্ট) বস্তা পিছু প্রায় পাঁচশো টাকা। ডলাকাঠি একহাজার তৈরী মূল্য চার টাকা – সাড়ে চার টাকা এবং টানা কাঠি এক হাজার তৈরী মূল্য দেড়টাকা – দুটাকা।

ধূপনির্মাণ শিল্পের সঙ্গে গণেশের বাৎসরিক পূজা এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে যুক্ত হতে দেখা যায়। বিশেষত পয়লা বৈশাখ নববর্ষের দিন অথবা অক্ষয়তৃতীয়াতে এখানকার ধূপসঞ্চয় কক্ষে এমনকী ধূপ শ্রমিকদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভক্তি সহকারে গণেশপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করেন। আবার কোথাও ধূপ শ্রমিকরা মনমন্ত্রে গণেশপুজো করে থাকেন। সাধ্যমতো নৈবেদ্যও দেওয়া হয়। এঁরা গণেশের প্রতিমূর্তির সামনে ধূপকাঠি বা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে মনমন্ত্রে বলেন—

নমি তোমায় গণপতি

জ্বালিয়ে দিয়ে ধূপকাঠি।

গণেশপূজা ছাড়াও স্থানীয় ধূপশিল্পের কর্মিগণ ভক্তিভরে শিল্পদেব বিশ্বকর্মার পূজাও করে থাকেন। সেদিন তাঁরা প্রাণভরে ধূপকাঠি জ্বালান। এমনিভাবে এখানকার লোকসংস্কৃতির সংগে লোকায়ত ধূপশিল্প জড়িয়ে পড়ছে।

বাজিশিল্প ঃ থানা বারুইপুরের পূর্বপ্রান্তিক অঞ্চল চম্পাহাটির প্রায় লাগোয়া গ্রাম হাড়াল এবং তৎসংলগ্ন চিনের মোড় বাজিশিল্পের জন্যে সমধিক খ্যাত। মূলত এদুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আশেপাশের দু'চারটি গ্রামের প্রায় হাজারদুয়েক মানুষ কুটিরশিল্প রূপ এই বাজিশিল্পকে অবলম্বন করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এখানকার বাজিশিল্পের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। আজ থেকে প্রায় বছর চল্লিশ আগে হাড়াল এবং চিনের মোড় অঞ্চলে বাজিশিল্পের সূত্রপাত ঘটেছিলো। ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে যতদূর জানা গেছে চিনের মোড়ের তারাপদ সরদার এখানকার বাজিশিল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরো শোনা যায় যে, তারাপদবাবুর তৈরী বাজির গুণগত মান এবং সৌন্দর্য এত উচ্চস্তরের ছিলো যে, বারুইপুরের জমিদারবাড়ী রাজবল্লভ ভবনের সম্মুখস্থ রাসমাঠে রাস উৎসব উপলক্ষ্যে সারারাত ধরে যে বিপুল বাজিপোড়ানো হতো তার সিংহভাগই যোগান দিতেন তারাপদবাবু।

এমনকি চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা উৎসবেও নাকি একসময় তারাপদবাবুর বাজির চাহিদা ছিলো।

পরবর্তিকালে প্রধানত হাড়াল গ্রামকে কেন্দ্র করে বাজিশিল্পের রমরমা শুরু হয় এবং এখানকার বাজিশিল্প জনপ্রিয়তার উচ্চ আসন লাভ করে। হাড়ালের বাজির চাহিদা এতই বৃদ্ধি পায় যে, জনসাধারণের মুখে মুখে কথিত হতো –

"হাড়ালের বাজি!

দাম দিতে রাজি।"

বিশেষ করে মরসুমে অর্থাৎ আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ এই তিনমাস ধরে গ্রাম হাড়াল এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি বিপুল পরিমাণে বাজি তৈরী এবং বাজি বিক্রি শুরু হয়ে যায়। চিনের মোড়, পুঁড়ি, বেগমপুর, ওড়ঞ্চ, মেজোবাবুর আবাদ, রঘুনন্দনপুর, মলঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকী শিক্ষিত মানুষজন আট থেকে আশী অধিকাংশই বাড়িতে বসে এই কুটির শিল্পটির মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখে অন্তত কয়েকমাসের জন্য।

হাড়াল গ্রামের সুদীপ্ত মণ্ডল, তাপস মণ্ডল, পাঁচু নস্কর, তপন মণ্ডল, স্বপন সাহা, ভানু সাঁতরা, উদয় মণ্ডল, স্বপন দত্ত প্রমুখ বাজিশিল্পীদের বাজির গুণগত মান অতি উৎকৃষ্ট। এঁরা সাধারণত চরকা, ফুলঝুরি, ইলেকট্রিক তার, রংমশাল, হাত চরকি, দড়িবাজি, রানার কলি, ফ্লাওয়ারফর, কাগজের তুবড়ী, হাইউ, বসানো তুবড়ী, উড়ন তুবড়ী এবং বিশেষ করে উৎকৃষ্টমানের শব্দবাজি যথা দোদমা, চকলেট, পাটবোমা ইত্যাদি তৈরী করে থাকেন। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর আইনত শব্দবাজি তৈরী নিষিদ্ধ করায় হাড়াল এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বাজিশিল্পে যথেষ্ট মন্দা দেখা দিয়েছে। এখানকার বাজিশিল্পীরা তাই কেউবা ক্ষুব্ধ, কেউবা হতাশগ্রস্ত।

এখানকার বাজিশিল্পীরা বাজি তৈরীর উপকরণ রূপে সোরা, গন্ধক, বেরিলিয়াম চুর, লোহাচুর, এ্যালুমোনিয়ামচুর এবং কাঠকয়লা ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণত কুলকাঠ, বেগুনকাঠ শুকিয়ে পুড়িয়ে তারপর মাটিচাপা দিয়ে কাঠকয়লা তৈরী করতেন। কিন্তু কয়লার ব্যাপক চাহিদা মেটাতে শ্মশানঘাটের কয়লা বস্তায় সংগ্রহ করে পিয়ালী টাউনে ঐ কয়লা মেশিনে গুঁড়ো করে নেন।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশের পূর্বে বারুইপুর থানার এই হাড়াল গ্রাম এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের শব্দবাজির সুনাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আশ্বিন মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের ঘরে ঘরে বাজিশিল্পীরা দিনরাত বাজি তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একই সঙ্গে চলে অর্ডার সাপ্লাই এবং স্থানীয়ভাবে বিক্রীর কাজ। এই সময় এই অঞ্চলে ঢুকলে রাস্তার দুপাশে নির্মিত ছোটো ছোটো চালাঘরে, ঘরের বাইরের বারান্দায় এবং অবশ্যই স্থায়ী দোকানে বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন বাজি বিক্রী হতে দেখা যায়। দলে দলে খরিদ্দার দূর-দূরান্তের গ্রামগঞ্জ এবং শহরতলী থেকে এখানে বাজি কিনতে ভিড় জমায়। অনেকে সদ্য বাজি পুড়িয়ে বা ফাটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেও নেয়। সব মিলিয়ে যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। কয়েকবছর

আগে বাজিশিল্প থেকে এই অঞ্চলের বাজিশিল্পীরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। তাই এখানে তারা মা ফায়ার ওয়ার্কস, সত্যনারায়ণ ফায়ার ওয়ার্কস, চণ্ডিমাতা ফায়ার ইণ্ডাস্ট্রি প্রভৃতি ছোটো ছোটো বাজি তৈরীর কর্মশালা গড়ে উঠেছিলো যেগুলি বর্তমানে শব্দবাজি তৈরী নিষিদ্ধ হওয়ায় মৃতপ্রায়। ফলে শিল্পীদের উপার্জন গেছে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

সম্প্রতি আতসবাজির চাহিদা পূরণ করতে এখানকার বাজিশিল্পীরা চেন্নাই থেকে কলকাতার বড়বাজারে আমদানীকৃত বিভিন্ন ধরনের ফুলঝুরি, রঙমশাল, সাপবাজি, কালীপটকা, ধানিপটকা, পানপটকা ইত্যাদি কিনে এনে বিক্রী করেন। কারণ, উক্ত আতসবাজিগুলি তৈরী করতে গেলে এই অঞ্চলের শিল্পীদের যে খরচ পড়ে তাতে চেন্নাই আগত বাজির দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁরা পেরে উঠতে অক্ষম।

মূলত এই থানার হাড়াল গ্রামকে কেন্দ্র করে এই বাজিশিল্প আশেপাশের বেশকিছু গ্রামে বিস্তার লাভ করেছে এবং বেশকিছু মানুষের জীবনজীবিকার অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে উত্তরপুঁড়ির সুকুমার সরদার; বেগমপুরের বাসুদেব মুখার্জী, গণেশ মুখার্জী; ওড়ঞ্চ গ্রামের সুশীল মণ্ডল; মেজোবাবুর আবাদের সুবল মণ্ডল, রতন মণ্ডল; কিবাইৎপুরের রেখা মণ্ডল; রঘুনন্দনপুরের দক্ষিণা মণ্ডল প্রমুখের নাম দক্ষ বাজিশিল্পীরূপে উল্লেখযোগ্য।

বারুইপুর থানার হাড়াল এবং তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির লোকায়ত এই শিল্পীভাইবোনেরা যদি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নির্ধারিত ডেসিবিলের সীমার মধ্যে শব্দবাজির শব্দকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বাজি তৈরী করেন তাহলে দু'কূল রক্ষা পায় বলে মনে করি। মনে রাখতে হবে, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সকলেরই কাম্য।

ফুচ্‌কাশিল্প ঃ বারুইপুর থানার লোকায়ত শিল্পগুলির মধ্যে ফুচ্‌কাশিল্পটি অন্যতম। এটি প্রকৃত অর্থেই কুটির শিল্প। বারুইপুরের মৃতপ্রায় শিল্প উপনগরী পিয়ালী টাউন (ফুলতলা) ছাড়িয়েই দক্ষিণপূর্বে শাঁখারীপুকুর গ্রামের শুরুতেই ধাড়াপাড়ার ঘরে ঘরে জীবন জীবিকার প্রধান উৎসই হলো ফুচ্‌কাশিল্প। প্রায় পনেরোষোলোটি পরিবার এই ফুচকাশিল্পের ওপর নির্ভর করে দিন গুজরান করছেন। শুধু ধাড়াপাড়াই নয়, ধাড়াপাড়ার পূর্বে দুধনই গ্রামের শুরুতেও সরদারপাড়ার অধিকাংশ পরিবারে ঐ একই চিত্র। এখানেও দশ-বারোঘর ফুটকাশিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন। এছাড়া এই থানার মাধবপুর, রামনগর প্রভৃতি গ্রামেও বেশকিছু পরিবারের আর্থিক অবলম্বন ফুচ্‌কাশিল্প।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে শাঁখারীপুকুরের ধাড়াপাড়া নিবাসী ধীরেন হাজরা এবং ভানু হাজরা বারুইপুর থানায় সর্বপ্রথম ফুচ্‌কাশিল্পের সূত্রপাত ঘটান। অতঃপর এই শিল্পটি আশেপাশে এবং পূর্বোক্ত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুচ্‌কার মতো লোভনীয় খাদ্যশিল্পের কাঁচামাল বা উপকরণরূপে লাগে আটা, ময়দা, সুজি, সোডা, আলু, তেঁতুল, লবণ, বীটলবণ, শুকনো লংকাগুঁড়ো, ধনে, জিরে, মরিচ, গোলমরিচ, মৌরী, গরম মশলা, জায়ফল, জৈত্রী, আদা, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, কাঁচালংকা, গন্ধরাজ লেবুর রস ইত্যাদি এবং অবশ্যই রিফাইন তেল।

ফুচ্‌কা তৈরী পদ্ধতির প্রথমেই বিশেষ অনুপাতে সূক্ষ্ম চালনা দিয়ে চেলে নেওয়া আটা, ময়দা, সুজি ভালো করে মিশিয়ে তার সঙ্গে খাবার সোডা দিতে হয়। ফুচ্‌কা ভালো করে ফোলার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয় আর মচমচে করার জন্য ব্যবহৃত হয় সুজি। মিশ্রণটিকে জল দিয়ে কমপক্ষে আধঘন্টা উত্তমরূপে মাখাতে হয়। একটি বড়ো আয়তাকার পিঁড়ির উপর ফেলে মাখানো শেষ হলে মাখানো তালটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে চাপড়ে চাপড়ে একইঞ্চি পুরু প্লেটে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর একটি ছুরি দিয়ে ঐ প্লেটটিকে এক ইঞ্চি অন্তর অন্তর চিরে বেশ কয়েকটি খণ্ড করা হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি খণ্ডকে পিঁড়িতে ফেলে পাকিয়ে গোল করে লম্বা করা হয় এবং একটি ছুরি দিয়ে ঐ লম্বা গোল অংশটিকে ছোটো ছোটো টুকরো করা হয়। টুকরোগুলি এক-একটি লেচি। সবশেষে ছোটো চৌকো মসৃণ পাথরের উপর রিফাইন তেলের প্রলেপ দিয়ে লেচিগুলিকে সরুকাঠের বেলন দিয়ে দেড় ইঞ্চি গোলাকার করে বেলা হয়। এই বেলার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা ও পারদর্শিতা প্রয়োজন। বেলার সময় প্রত্যেকটি লেচিকে সমানভাবে পুরু রাখতে হয়। কোথাও মোটা বা পাতলা হয়ে গেলে ফুচকা ভালো ফুলবে না। আবার বেলার সময় কোনো কারণে সামান্য ভাঁজ পড়ে গেলে কিম্বা নখ লেগে ফুটো হয়ে গেলে অথবা বেলা লেচিগুলি কোনো কারণে বেশি শুকিয়ে গেলে ভালো ফুলবে না। বেলা লেচির উপরিভাগ শুকিয়ে গেলেও তলদেশ কাঁচা থাকা প্রয়োজন। পরিশেষে ভাজার পর্ব। এই পর্বে দেখা যায় সাধারণত আঁচের উনুনের মধ্যে ছোটো ছোটো কাঠের টুকরো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদিও ফুচকাশিল্পীদের কাছে জানা যায় যে, কয়লার আঁচ ফুচ্‌কাভাজার পক্ষে আদর্শ। কারণ, একভাবে কড়ার তেলকে উত্তপ্ত রাখা যায়। তথাপি কয়লার খরচ বেশি হওয়ায় গরীব ফুচ্‌কাশিল্পীরা কাঠের আগুনেই ফুচ্‌কাভাজার কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। প্রচণ্ড উত্তপ্ত কড়া রিফাইন তেলেই ফুচ্‌কা ফুলে বড়ো গোলাকার আকার ধারণ করে। অন্যথায় ফুচ্‌কা ছোটো হয়ে যায়। তাই কথায় আছে – 'তেল যত তাতবে /ফুচ্‌কা তত ফুলবে।' ফুচ্‌কাভাজুনী বাঁহাতের তালুর উপর প্রায় দশ থেকে বারোটা গোলাকার বেলা লেচি গোল করে সাজিয়ে নিয়ে কড়ায় উত্তপ্ত তেলের উপরে হাত উল্টে লেচিগুলিকে ছেড়ে দেন এবং একটি ঝাঁঝরি নিয়ে কড়ার মাঝখানে তেলে আড়াআড়িভাবে ডুবিয়ে দুপাশে অল্প অল্প নাড়তে থাকেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফুচ্‌কাগুলি ছোটো ছোটো বলের মতো গোলাকার হয়ে ভাজারূপ ধারণ করে। সংগে সংগে ভাজুনী ঝাঁঝরি দিয়ে ফুচ্‌কাগুলিকে তেল থেকে তুলে পাশে রাখা ডিম বা বিস্কুটের পেটিতে ঢেলে দেন।

ফুচ্‌কাখাদকদের কাছে ফুচ্‌কা পরিবেশিত হয় যে আলুরপুর এবং টকঝাল জলসহ তা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়। এখানকার ফুচ্‌কা প্রস্তুতকারকগণ পুদিনাপাতা, তেঁতুল, লবণ, বীটলবণ, হামানদিস্তে দিয়ে গুঁড়ো করা ভাজা লংকা, ভাজা জিরে, ভাজা ধনে, ভাজা মৌরী, ভাজা মরিচ এছাড়া গরম মশলা গুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, ধনেপাতা, আদার রস, গন্ধরাজ লেবুর রস, টুকরো টুকরো করে কাটা কাঁচালংকা ইত্যাদির মিশ্রণ বিশুদ্ধ পানীয় জলে অনুপাত মতো মিশিয়ে টকঝাল জল তৈরী করেন, অন্যদিকে তেমনি ঐ একই মিশ্রণ সিদ্ধ আলুর সংগে মিশিয়ে ফুচকার পুর তৈরী করেন যা স্বাদে অতুলনীয়।

বারুইপুর থানার শাঁখারীপুকুর গ্রামের ধাড়াপাড়াই হোক কিম্বা দুধনই গ্রামের সরদারপাড়া বা মাধবপুর, রামনগর হোক সর্বত্রই ফুচ্‌কাশিল্পীদের বাড়ী গেলে একই চিত্র দেখা যায়। সকালে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সেরে পরিবারের পুরুষমহিলারা বসে গিয়েছেন ফুচ্‌কাতৈরীর বিভিন্ন কাজ সারতে। কেউ আটা, ময়দা, সুজি, সোডা মিশিয়ে জল দিয়ে মাখাচ্ছে, কেউ ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লেচি বানাচ্ছে, কেউ বেলছে, কেউ ফুচ্‌কা ভাজছে, আবার কেউ কেউবা হামানদিস্তে দিয়ে মশলা গুঁড়ো করে টকঝাল জল প্রস্তুত করছে বা আলুসিদ্ধ করছে। ধাড়াপাড়ার নবীন হাজরা, শংকর হাজরা, নিরাপদ দলুই, অশ্বিনী হাজরা, নিতাই হাজরা, কাছারি হাজরা, বাবলু দাস, যগেন দাস, অরুণ ধাড়া, সুশীল ধাড়া, শম্ভু বাগ, শম্ভু প্রধান , বাদল হাজরা, শম্ভু হালদার, রাজু হালদার, বিজয় দাস; সরদারপাড়ার শ্রীকান্ত দলুই, রাধাকান্ত দলুই, কেত্তে সরদার, বিজয় সরদার, কমল সরদার, শ্যামল সরদার, বাপী দলুই, সোমনাথ সরদার, মংগল প্রামাণিক প্রমুখ ফুচ্‌কাশিল্পীগণ বেলা বারোটার মধ্যেই নিজেদের ভ্যানের উপর কাঁচের শোকেসে ফুচ্‌কা সাজিয়ে মাটির হাঁড়ি কিম্বা, স্টীলের হাঁড়িতে টকঝাল জল, অন্যপাত্রে মশলা মাখানো আলুসিদ্ধ, শালপাতার বাটি, মোড়া, মোমবাতি ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে বিক্রয়স্থানের দিকে যাত্রা করেন। এই একই দৃশ্য দেখা যায় মাধবপুর ও রামনগর গ্রামের ফুচ্‌কাশিল্পীদের বাড়ীতে গেলে। এঁরা ফুচ্‌কা বিক্রী করতে নিকট থেকে দূরদূরান্তের স্কুল, কলেজ, কারখানা, হাটবাজার, শহরতলি ও গ্রামগঞ্জের মোড়, বাসস্টপ, খেয়াঘাট, রেল স্টেশান, বিভিন্ন মেলাপ্রাঙ্গণ ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বেহালা, ঠাকুরপুকুর, গড়িয়া, ক্যানিং, ঘটকপুকুর, গাববেড়ে, শিরাকল, বোড়াল, কামালগাছি, মহামায়াতলা প্রভৃতি স্থানে এখানকার ফুচ্‌কাশিল্পীদের গতিবিধি। পূজার মরশুমে অনেক সময় এঁরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে তাঁবু ফেলেও দু-একদিন থেকে যান বলে জানা গেছে। বৈশাখমাস থেকেই প্রধানত ফুচ্‌কা বিক্রির মরশুম শুরু হয়ে যায়। তবে শরতের পূজা মরশুমে ফুচকাবিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গড়ে প্রতিদিন দু-তিনকিলো আটা-ময়দার ফুচ্‌কা বিক্রি হয় বলে ধাড়াপাড়ার ফুচকাশিল্পী নবীন হাজরার কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জানা যায়। তিনি আরো জানান যে, বর্ষাকালে ফুচ্‌কাশিল্পে মন্দা দেখা দেয়। কারণ, বৃষ্টিতে ফুচকাবিক্রির অসুবিধা। ভাজা ফুচ্‌কাগুলিকে ঠিকমতো রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে পারলে প্রায় এক সপ্তাহ রাখা যায় কিন্তু টকঝাল জল ও মশলা মাখানো আলুর পুর একদিনের বেশি রাখা যায় না – গন্ধ হয়ে যায়, তাই ফেলে দিতে হয়। বারুইপুরের ফুচ্‌কাশিল্পীদের কাছ থেকে ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে জানা গেছে এককিলো আটা-ময়দার ফুচ্‌কাতে প্রায় ছশো গ্রাম রিফাইন তেল লাগে ভাজতে । আর আলুসিদ্ধ লাগে পাঁচকিলো, শালপাতার বাটি লাগে প্রায় দশবাণ্ডিল এবং প্রায় পনেরো টাকার মশলা এবং আট টাকার তেঁতুল। মোট প্রায় একশো টাকা খরচ। এছাড়া মেলায় বিক্রি করতে গেলে চাঁদা, আলো (মোমবাতি), হাতখরচা ইত্যাদি মিলিয়ে আরো প্রায় পঞ্চাশটাকা। আর এককিলো আটা-ময়দার ফুচ্‌কা বিক্রি করে পাওয়া যায় দুশো থেকে দুশো পঁচিশ টাকা। তাহলে লাভ থাকে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকা। বর্তমান দুর্মূল্যের যুগে ঐ টাকায় একটি পরিবারের জীবনজীবিকা নির্বাহ করা যে কত কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়।

তাই বারুইপুর থানার দরিদ্র ফুচ্‌কাশিল্পীদের আবেদন, গ্রামপঞ্চায়েত থেকে যদি এই শিল্পটিকে

এবং এর শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে খুব সুলভ সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই কুটির শিল্পটি আরো বিস্তার লাভ করতে পারে।

করমচা থেকে চেরিশিল্প ঃ আমরা আমাদের আশেপাশের পরিবেশে কেক, মোয়া, আইসক্রীম কিম্বা কোনো মিষ্টান্নের উপর টকটকে লাল যে চেরির টুকরোগুলো দেখে থাকি তা কিন্তু প্রকৃত চেরিফলের টুকরো নয়। প্রকৃত চেরিফল ইউরোপে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লালবর্ণের পরিপক্ক জামজাতীয় এই চেরিফলের নামটি কিন্তু এসেছে ইউরোপের সেরেসাস শহরের নামানুসারে । Cherries got their name from a city called Cerasus.* তাহলে আমরা চেরির টুকরোরূপে যা দেখে থাকি তা কী জিনিস ? আসলে এগুলি করমচা থেকে তৈরী বিশেষ শিল্প পদ্ধতিতে উৎপন্ন নকল চেরি । করমচা থেকে উৎপন্ন এই চেরিশিল্প বারুইপুর থানায় একটি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র শিল্পরূপে স্থান করে নিয়েছে। তাই এই অঞ্চলের কেউ কেউ মজা করে বলে থাকেন —

"ছিল করমচা হয়ে গেল চেরি
বাংলার কমলিকা হল মেম মেরি।"

ক্ষেত্র গবেষণায় যতদূর জানা গেছে বিগত শতাব্দীর আশির দশকে বারুইপুর থানার পদ্মপুকুর অঞ্চলের কাশেম আলি পৈলান এই চেরিশিল্পের প্রথম সার্থক প্রতিষ্ঠাতা। মুম্বাই থেকে কলকাতার মেছুয়াবাজারে আগত করমবীর ঠক্কর ও তাঁর বন্ধু নারায়ণ ঠক্কর করমচা থেকে চেরি তৈরীর যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন সেখানে কাঁচামাল রূপে বারুইপুরের করমচা সাপ্লাই দিতে গিয়ে কাশেম আলি পৈলান এই শিল্পটি শিখে নিয়ে বারুইপুরের পদ্মপুকুর অঞ্চলের কাজীপাড়ায় করমচা থেকে চেরি তৈরীর কর্মশালার সূচনা করেন। পরবর্তিকালে ঐ কাজীপাড়ায় পাশাপাশি আরো কয়েকটি চেরি তৈরির শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এছাড়া পদ্মপুকুরে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন স্থানে আরো একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এগুলি হলো যথাক্রমে সালমা ফুড প্রোডাক্টস, জনতাফুড প্রোডাক্টস (বর্তমানে বন্ধ আছে), নিউ ইন্ডিয়া ফুড প্রোডাক্টস, সুপার ফুড প্রোডাক্টস, নিউ জনতা ফুড প্রোডাক্টস এবং অজন্তা ফুড প্রোডাক্টস, ন্যাশানাল ফুড্ প্রোডাক্টস যথাক্রমে রেহেনা খাতুন, হায়দার আলি মণ্ডল, সিরাজুল মোল্লা, গিয়াসউদ্দিন ও আনোয়ার পৈলান, সামসুল মোল্লা ও কাশেম আলি পৈলান উপরোক্ত চেরি তৈরী শিল্পকেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করেন। এছাড়া বারুইপুর থানার মধ্যে আটঘরা সীতাকুণ্ডু অঞ্চলের বিমল ঘোষের 'বিমল ঘোষ ফ্রুট প্রোডাক্টস' সমসের নস্করের সুলতানপুরে রনিফুড প্রোডাক্টস, ধোপাগাছীতে নাসির শেখের পারস ফুড প্রোডাক্টস, চাকার বেড়িয়ার মস্তাফা লস্করের রয়্যাল ফুড প্রোডাক্টস, খাসমল্লিকে পান্নালাল মহাবীর প্রসাদের কোয়ালিটি ফুড প্রোডাক্টস এবং বৈষ্ণবপাড়ার ক্যালকাটা ফ্রুট্ ইন্ডাষ্ট্রি নামে চেরি তৈরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এই থানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শেষোক্ত কারখানাটি বহুদিন পূর্বে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটি প্রথম চালু করেছিলেন রঞ্জন প্রামাণিক ও হোসেন মোল্লা, পরে কোলকাতার মেছুয়া বাজারের রেণু আগরওয়াল এটি ক্রয় করে চালাতে থাকেন। কয়েক বছর পর বিভিন্ন কারণে এটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। অধুনা পদ্মপুকুর নিবাসী কাশেম আলি পৈলান ও আব্দুল গফুর

মোল্লা বন্ধ কারখানাটি পুনরায় ক্রয় করেছেন বলে জানা যায়। তবে এখনও উৎপাদন শুরু হয় নি। এই থানার হাড়দা গ্রামে হানিফ বৈদ্যও একটি চেরি তৈরীর কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

করমচা থেকে চেরি তৈরীর শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ কাঁচা করমচা লাগে তা মূলত স্থানীয় বাজার থেকে কিনে স্টক্ করে রাখা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা হয়। স্থানীয় করমচা সাধারণত বারুইপুর থানার ধপধপি, সূর্যপুর, সীতাকুণ্ড, বিড়াল-বৈকুণ্ঠপুর, আটঘরা প্রভৃতি গ্রাম এবং জয়নগর থানা থেকে উৎপন্ন হয়। করমচা বিক্রীর অন্যতম কেন্দ্র হল বারুইপুর থানার কাছারিবাজার। আঞ্চলিক করমচার ঘাটতি দেখা দিলে বিশেষ করে বর্ষায় ভাদ্রমাসের দিকে যখন স্থানীয় করমচা পাওয়া যায় না তখন এলাহাবাদ, বেনারস, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান থেকে আগত করমচা এই শিল্পের ঘাটতি মেটায়। দশ-বারো টাকা থেকে শুরু করে প্রায় কুড়ি-বাইশ টাকা পর্যন্ত দামে প্রতি কেজি করমচা এঁদের কিনতে হয়। এছাড়া লাগে চিনি, সোডিয়াম সালফেট, মেটাবাই সালফেট ইত্যাদি কেমিক্যাল, পঞ্চু কোম্পানী বা অন্য কোম্পানীর রং, জল, উত্তাপ ইত্যাদি। বড় বড় উনানে জ্বালানীর জন্য লাগে হারকোল কয়লা এবং ঘুঁটে। হারকোল কয়লা সাধারণত ধানবাদ থেকে আসে।

কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে করমচা থেকে চেরি তৈরী হয়। প্রথমে বড় বড় পলেথিন ড্রামে জলের সঙ্গে কেমিক্যাল মিশিয়ে তার মধ্যে ধুয়ে পরিষ্কার করা করমচাগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় করমচা একসপ্তাহ জারিত হয়। ঐ সময়ে কেমিক্যালের প্রতিক্রিয়ায় করমচার রঙ মারবেল পাথরের মতো সাদা হয়ে যায়। এবার করমচাগুলিকে ড্রাম থেকে ঢেলে ছোটো ছোটো সরু স্ক্রুড্রাইভারের ডগা দিয়ে করমচার ভিতর থেকে দানাগুলিকে বের করে দেওয়া হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় কাটিংপর্যায়। স্থানীয় মহিলা শ্রমিকরাই এই পর্যায়ে কাজ করে থাকেন। এরপর করমচাগুলিকে ভালো করে ধুয়ে বড় বড় উনানে বসানো ডেকচিতে গরমজল করে ঐ জলে করমচাগুলিকে ঢেলে দিয়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিট রাখা হয়। পরবর্তিপর্যায় পাঞ্চিং পর্যায়। তাঁরা গরমজল থেকে তুলে-নেওয়া সিদ্ধ করমচা ঠাণ্ডা হলে এক ধরনের পাঁচ-ছটা কাঁটাযুক্ত ছোটো যন্ত্র দিয়ে করমচা গাত্রে পাঞ্চিংকরে দেন যাতে পরে রং এবং চিনির রস করমচার মধ্যে প্রবেশ করে করমচাগুলিকে জারিত করে ফুলিয়ে ছোটো ছোটো বলের আকৃতিতে পরিণত করে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চিংয়ের পর বিশেষ অনুপাতে রঙ মেশানো ঈষৎ উষ্ণ জলে ড্রাম ভর্তি করে পুনরায় পাঞ্চিং করা করমচাগুলিকে ডুবিয়ে দিয়ে তিনদিন রেখে দেওয়া হয়। এবার করমচাগুলি টকটকে লাল আকার ধারণ করে। সব শেষ পর্যায়ে বড় বড় ধাতব ডেকচিতে প্রথমে পাতলা চিনির রসে তিনদিন এবং তারপর আরো তিন-চার বার ক্রমান্বয়ে ঘন চিনির রসে ভরা ডেকচিতে প্রতিবারই তিনদিন করে করমচাগুলিকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লাল চেরিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং একেবারে শেষ পর্যায়ে চেরিগুলিকে ড্রামে ঢেলে এককেজি পরিমাণে মেপে মেপে পলেথিন প্যাকেটে ভরা হয়। এইরকম চোদ্দোটা প্যাকেট নিয়ে এক-এক বাক্স বা কার্টুন তৈরি হয়। কলকাতার বড় বড় পার্টিকে চেরির এই কার্টুন বা বাক্সগুলিকে বিক্রি করা হয়।

বারুইপুরের চেরি তৈরীর কেন্দ্রগুলিতে পঞ্চান্ন কেজি, আশি কেজি, এবং একশো কেজি,

পলেথিন ড্রাম সাধারণত ব্যবহার করা হয়। আর ব্যবহৃত ডেকচিগুলি দু'কেজি সাড়ে তিনকেজি ইত্যাদি মাপের হয়। একেকটি একশো কেজির ড্রামের দাম প্রায় তিনশো পঞ্চাশ টাকার মতো। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায়, করমচা কাটিংয়ের জন্য মহিলা শ্রমিকরা কিলোপ্রতি একটাকা দশ পয়সা এবং পাঞ্চিংয়ের জন্য তাঁরা কিলোপ্রতি পঞ্চান্ন পয়সা পেয়ে থাকেন। এছাড়া প্রতিটি চেরিশিল্পকেন্দ্রে গড়ে যে চার-পাঁচজন করে পুরুষ কর্মচারী থাকেন তাঁরা থাকার ঘর, তেল, সাবান, গামছা ইত্যাদি বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন আর মাসিক দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা বেতন পান। এঁরা কাটিং ও পাঞ্চিং ছাড়া অন্য সবরকম কাজ করে থাকেন। এঁরা আবার প্রতিটি চিনির বস্তা বিক্রির অর্থ থেকে একটাকা হিসাবে কমিশন পান। বারুইপুরের পদ্মপুকুর এবং কাজীপাড়া অঞ্চলের কর্মরত পুরুষ শ্রমিকদের অধিকাংশই বিহারের মজঃফরপুর, বৈশালী, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলা থেকে আগত। প্রতিটি চেরিশিল্প কেন্দ্রে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন মহিলা শ্রমিক কাজ করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বারুইপুরের চেরিশিল্প কেন্দ্রগুলিতে একটি বিশেষ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সমস্যাটি পরিবেশদূষণ ঘটিত। করমচা ধোয়ার জল থেকে একটা প্রকট দুর্গন্ধ উত্থিত হয়। অবশ্য এই সমস্যা সমাধানের জন্য কারখানার মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে ঐ জল সঞ্চয় করে তার উপর ঘন ঘন ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর ঐ জলকে পয়প্রণালীর মাধ্যমে খাল বা পগার পথে নির্গত করা হয়। এ বিষয়ে আরো সচেতনতা দরকার।

বারুইপুরের করমচা থেকে উৎপন্ন চেরি শুধু দেশেই নয় পরন্তু বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে আরব দুনিয়া পর্যন্ত রপ্তানী হচ্ছে। স্থানীয় ভূমিসন্তান কবি ও ছড়াকার বিনয় সরদারের একটি লেখাতে তার সুন্দর প্রমাণ মেলে —

দূর দেশেতে দিচ্ছে পাড়ি

বারুইপুরের করমচা

মা-বোনেদের হাতের ছোঁয়ায়

হচ্ছে দেখি নরম গা

কাঁচাফল খুব টক

মিষ্টিরসে হয় চেরি

খাও যদি হাতে নাও

কেন আর করো দেরি।

পরিশেষে বলা যায়, বারুইপুরের চেরিশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের পিছনে রয়েছে যেমনি ক্রমবর্ধমান চিনির দাম তেমনি রয়েছে করমচা চাষের প্রতি স্থানীয় চাষীদের অনীহা। এই অবস্থায় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া চেরিশিল্পের মতো একটি উজ্জ্বল শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা কতদিন সম্ভব হবে তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে।

বড়ি শিল্প ঃ শিখরবালি ১নং গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন গোয়ালবাড়ি গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবনজীবিকা নির্বাহের একটি অন্যতম উৎস হল লোকায়ত বড়িশিল্প । খেসারি, মুসুরি, বিউলি, মটর, ছোলা ইত্যাদি ডালের বড়ি এখানে তৈরী হয়। বড়িশিল্পে মহিলাদের প্রাধান্য অবিসংবাদিত। পুরুষেরাও অনেক ক্ষেত্রে বড়ি তৈরী কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই গ্রামে যে ধরণের বড়ি তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে খেসারি ডাল দিয়ে খুব ছোট ছোট ফুলবড়ি, মুসুরির ডাল দিয়ে লালবড়ি, বিউলির ডাল দিয়ে কুমড়ো বড়ি, মটরের বা ছোলার ডাল দিয়ে বড় বড় বড়ি উল্লেখযোগ্য। প্রথমে শিল নোড়া দিয়ে ভালো করে ডাল বাটতে হয়, তারপর সাধারণত সবধরনের বাড়িতেই উপকরণ হিসেবে স্বল্প নুন ও কালো জিরে দেওয়া হয়। কোনো ক্ষেত্রে পোস্তও মেশানো হয়। তবে বিউলির ডালের কুমড়ো বড়িতে পরিমাণ মতো চালের গুঁড়ি, ছাঁচি কুমড়ো বা বলি কুমড়ো বাটা, মানকচু বাটা, সময়ে ফুল কপি বাটা, চন্দনি ও মৌরী বাটা দেওয়া হয়।

এখানকার বড়িশিল্পীগণ বড়ি প্রস্তুতির পূর্বে বড়ির ফেঁটানো লেই দিয়ে বুড়োবুড়ীর যুগলাকৃতি রচনা করে মনমন্ত্রে পুজো করে তবেই প্রথম বড়ি দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

একটা ডেকচির মধ্যে কাঠের তাডু বা হাত দিয়ে বড়ির উপকরণ মেশানো ডালবাটাকে উত্তম রূপে ফেঁটাতে থাকেন। এক গামলা জলে বড়ি দিয়ে যখন তাঁরা দেখেন যে, বড়ি ভেসে উঠেছে তখনই ফেঁটানো কর্ম সমাপ্ত হয়। এবার হাতের মুঠোয় বড়ির লেই নিয়ে কলাপাতা বা কাপড় বা বড় বড় টিন কিংবা থালার উপর ফোঁটা কাটিয়ে কাটিয়ে সাইজমত বড়ি দিয়ে থাকেন। এখানকার বড়িশিল্পীরা এ কর্মে এতই দক্ষ যে মনে হয় যেন তাদের হাত মেশিনের মত চলছে।

বড়ি দেওয়ার পর শুরু হয় শুকানো পর্ব। বড়ি সমেত পাত্রগুলিকে সাধারণতঃ উন্মুক্ত স্থানে খোলা রৌদ্রে শুকনো করতে হয় উপযুক্তভাবে। সাধারণভাবে বর্ষাকালে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির জন্য বড়ি শুকানোর কাজ ব্যাহত হয়। এই গ্রামের বড়ি শিল্পীদের মধ্যে নিমাই সরদার, গনেশ সরদার, পাঁচু সরদার, জীবন মণ্ডল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বড়ি নিয়ে একটি লৌকিক গানের অংশ এখানে শ্রুত হয় —

পুঁটি মাছের ঝাল চচ্চড়ি।

তাতে দিও ফুলের বড়ি।।

গোয়ালবাড়ি গ্রামের বড়িশিল্পীরা তাদের প্রস্তুত বড়ি ঝাঁকায় সাজিয়ে কলকাতার বড় বাজারে মালিকের কাছে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এই ভাবে লোকায়ত শিল্প রূপে বড়িশিল্প এখানকার সাধারণ মানুষের আর্থিক সাশ্রয়।

বারুইপুর থানার লোকায়ত শিল্পের ইতিহাস আলোচনার শেষ পর্যায়ে দু-একটি এই ধরনের শিল্পের উল্লেখ না-করলে আলোচনা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে বেশকিছু পরিবার বা লোকজনের মধ্যে এই শিল্পগুলি চর্চিত হয় না তথাপি সারা

বারুইপুরে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক সাধারণ মানুষ এই সব শিল্পের সংগে জড়িত। সেক্ষেত্রে এই ধরনের দুটি প্রধান শিল্প হল দারুশিল্প ও রৌপ্যশিল্প। এই থানার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দু চারজন দারুশিল্পী কাঠের আসবাব পত্র, বৃষকাঠ, পারিবারিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, গরুর গাড়ীর চাকা, মৌমাছি প্রতিপালনের বাক্স ইত্যাদি তৈরী করে থাকেন। বারুইপুর শহরে এই দারুশিল্পীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। রৌপ্যশিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এরা রূপোর নানা অলঙ্কার, ঘর সাজাবার সৌখিন দ্রব্যাদি নির্মাণ করে থাকেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আর একটি বিখ্যাত লোকায়ত শিল্প বারুইপুর থানার বিস্ময়কর ভাবে বিরল — তা হল শোলাশিল্প – মাত্র একটি-দুটি পরিবারের মধ্যে এখানে এই শিল্প অনুশীলিত হতে দেখা যায়। এই থানার রামগোপালপুর গ্রামের প্রফুল্ল আচার্যের মুখে জানা গেল, তিনি পুরুষানুক্রমে এখানে শোলাশিল্পের কাজে দক্ষতা অর্জন করে এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সম্প্রতি সুবুদ্ধিপুরে একটি ছোট কর্মশালায় শোলাশিল্পের কাজ হয় বলে জানা গেছে। রামগোপালপুর নিবাসী প্রফুল্ল আচার্যের পিতা ঁপশুপতি আচার্যও একজন ওস্তাদ শোলা শিল্পী ছিলেন। এঁরা নিজেদের কর্মের ভিত্তিতে মালাকার বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন না। শোলাশিল্পী প্রফুল্ল আচার্য মহাশয় দক্ষ নিপুণ হাতে শোলা দিয়ে টোপর, মুকুট, মাছ, চাঁদমালা, কদমফুল, পাখী, টুপি, নৌকো, ছিপি, ময়ূর, মালা, লতাপাতা, প্রজাপতি, কলকা, প্রতিমার ডাকের সাজ, আর্টের সাজ,পশুর মূর্তি, মানুষের মূর্তি ইত্যদি তৈরী করেন। এই শিল্পকর্ম সমাধার জন্য শিল্পীগণ ছুরি, কাঁচি, বাটালি, নরুন, হাতুড়ি, কাঠ, আঠা, পুঁতি, রঙীন কাগজ, মোম, মুরগীর পালক, সার্টিন কাপড়, চুমকি, সুতো, রঙ, পীচ বোর্ড, বাঁশের চেড়ি, জরি, তুলি, আর্ট পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। শোলাশিল্পজাত টোপরকে নিয়ে এই অঞ্চলে বহু শ্রুত একটি ধাঁধা –

জলে জন্ম ডাঙায় কর্ম

কারিগরে গড়ে,

দেব নয় দেবতা নয়

মাথার উপর চড়ে।

বিশেষ দারুশিল্প ঃ বারুইপুর থানার পূর্ব-প্রান্তিক হাড়দা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনস্থ হাড়দা গ্রামের বিশেষ দারুশিল্প বিদেশে তথা অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বাজারে উচ্চ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই গ্রামে শিল্পীদের তৈরী কাঠের খেলনা বাতিদান, ধূপদান, ফটো ফ্রেম, হ্যাঙার, অ্যাসট্রে, পেনসিল বক্স, গেম বক্স, দরজার হ্যান্ডেল, বডি ম্যাসাজের বিভিন্ন উপকরণ, হাতা, চামচ, ইনলে করা গয়নার বাক্স,শেভিং ব্রাশের ও হেয়ার রোলিং ব্রাশের হ্যান্ডেল আরও কত রকমের কাঠের জিনিসপত্র আজ যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে তার পিছনে রয়েছে জোহর আলি মণ্ডলের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। একসময় হাড়দা গ্রামে শেভিং ব্রাশের ও হেয়ার রোলিং ব্রাশের কাঠের হ্যান্ডেল ঘরে ঘরে তৈরী হত। কিন্তু পরবর্তিকালে জোহর আলি মণ্ডল কলকাতার বিধাননগরে হিটাচি কোম্পানীতে কাঠের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দ্রব্য নির্মাণের কাজ শিখে গ্রামে

ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি ছোট কর্মশালা 'মণ্ডল হ্যানডিক্রাফ্‌ট' স্থাপন করেন এবং নিজের পুত্রদের ও গ্রামের বহু ছেলেকে এই কাজ শিখিয়ে দক্ষ কারিগর করে তোলেন। তাঁর পুত্র আজিজুল মণ্ডল, সইদুল মণ্ডল(হিরো) এখন কুশলী শিল্পী। জোহর আলিরই অনুপ্রেরণায় এই গ্রামের মিজানুর রহমান লস্কর এবং তাঁর পুত্রগণ এই দারুশিল্পের আর একটি ছোট কর্মশালা গড়ে তুলেছেন। এই সব কর্মশালাগুলিতে প্রায় ৮/১০ জন করে কারিগর বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত। কয়েকটি ছোট খাট যন্ত্রের সাহায্যে এই বিশেষ দারুশিল্প সুসম্পন্ন হয়। এগুলি হল যথাক্রমে ড্রিল, স্যান্ডিং, সারকুলার, টার্নিং, বব্‌শান, রাউটার, প্লেমার-জয়েন্টার, মোল্ডিং, ব্যান্ডশ, স্প্রে-মেশিন ইত্যাদি। গড়িয়া, যাদবপুর, কামারহাটি প্রভৃতি স্থানের কিছু বড় বড় মিডিয়েটার কোম্পানীর মাধ্যমে এঁরা নানা রকমের সূক্ষ্ম দারুশিল্পের ক্যাটালগের ভিত্তিতে অর্ডার পেয়ে থাকেন। এই সব কোম্পানীগুলি এঁদের তৈরী কাঠের জিনিসপত্র বিপুল লাভে দেশ বিদেশে রপ্তানি করেন। আর এইসব প্রান্তিক শিল্পীরা কিন্তু মিডিয়েটারদের তুলনায় বেশ কম অর্থ পান। সাধারণত এই বিশেষ দারুশিল্পে করমফোলা, পশুর, সুন্দরী, ধোন্দল, তাল, পাইন, আম ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নরম ও ফাইবার যুক্ত কাঠ ব্যবহৃত হয় যার অধিকাংশই আসে সুন্দরবনাঞ্চল থেকে। এই সব কাঠের সময়োপযোগী সংগ্রহ খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার উপর যথেষ্ট অর্থ ও ভালো রাস্তা ঘাটের অভাব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মিডিয়েটারদের বঞ্চনা এই শিল্পের সমস্যা হয়ে উঠেছে। কিন্তু জোহর আলি মণ্ডলের মত উদ্যোগী ব্যক্তিগণ সমস্ত সমস্যা অতিক্রম করে এই কুটির শিল্পটির আরও প্রসারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এস.এস.আই. রেজিস্ট্রেশানের মাধ্যমে সরকারী লোন পাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর উদ্যমের সফলতা হাড়দা গ্রামকে এই শিল্পের পীঠস্থান করে তুলবে এবং গ্রামের মানুষের অর্থনীতি সচ্ছল হবে, এই কামনা করি। আশার কথা এই যে, ইতিমধ্যে সইদুল মণ্ডলকে সম্পাদক করে এই শিল্পের শিল্পীরা গড়ে তুলেছেন 'হাড়দা হস্ত শিল্প উন্নয়ন সমিতি'।

পরিশেষে বলা যায় যে, বারুইপুর থানার লোকায়ত কুটির শিল্পের শিল্পীগণ দলবদ্ধভাবে সঠিক পরিকল্পনা করে গ্রামপঞ্চায়েত, পৌরসভা সমষ্টি উন্নয়ন অফিস, জেলা ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ইত্যাদি সংস্থার সংগে যোগাযোগ করে তাদের উপদেশ মত উদ্যোগ নিলে বিভিন্নভাবে সরকারী ঋণ পেতে পারেন। অভাব অভিযোগ, সংকোচ ইত্যাদি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, কুটির শিল্পের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পথ খোলা আছে, শিল্পীদের যোগাযোগ ও উদ্যম-ই তাঁদের সফলতার চাবিকাঠি।

লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে লোকদেবতা

ড. দেবব্রত নস্কর

লোকদেবতাকেন্দ্রিক বারুইপুরে যে লোকসংস্কৃতিচর্চার ধারা প্রত্যক্ষ করা যায় তা মানবসভ্যতা ক্রমবিকাশের ঐতিহ্যানুসারী ইতিহাস বহন করে। সমাজ বিবর্তনের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের অনেক লুপ্ত ইতিহাস এই অঞ্চলের লোকদেবতাকেন্দ্রিক আচার আচারাণাদির মধ্যেই পাঠ করা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় বারুইপুর থানার মধ্যে যে সমস্ত লোকদেবতার পরিচয় লাভ করা যায়, তা কেবল বারুইপুর থানার নিজস্ব সংস্কৃতি নয়, তা সমগ্র বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষুদ্র সংস্করণ। এরই মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সঙ্গত কারণেই বারুইপুরের লোকদেবতার পরিচয় প্রদানকালে অন্যান অঞ্চলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়েছে। অল্প পরিসরে সমস্ত লোকদেবতার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান অসম্ভব। সে কারণে প্রতিনিধি স্থানীয় ও অনালোকিত কতিপয় লোকদেবতার পরিচয় ও উৎস-তাৎপর্য সংক্ষেপে প্রদত্ত হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেক উপাদন লোকদেবতার মন্দির বা থানকে কেন্দ্র করে প্রচ্ছন্ন আছে। সেগুলির যথাযথ উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে যে সমস্ত লোকদেবতার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে তা হল লোকদেবতা- চণ্ডী, নারায়ণী, বিশালাক্ষী, ভগবতী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, সীতেমা, দেওয়ানগাজী, দক্ষিণরায়, বারাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, বৈদ্যনাথ, ভূতনাথ, ভূতবাবা, পেঁচোপাঁচী, মাকালঠাকুর, মানিকপীর, খোকাপীর, বনবিবি ও সাতবিবি। পরিশেষে বহুপরিচিত ও 'জাগ্রত' কতিপয় লোকদেবতার থানের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

লোকদেবতা ঃ দেবীচণ্ডী

বারুইপুর থানার লোকসমাজে বহুপূজিত লোকদেবতা হলেন দেবীচণ্ডী। বিভিন্ন নামে এই দেবীর পূজানুষ্ঠান করা হয়। যথা – ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, হাড়িঝিচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী প্রভৃতি। বারুইপুর তথা সমগ্র চব্বিশপরগনায় প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারের কুমারী ও এয়োগণ মঙ্গলচণ্ডীর বার ও পূজাদি সংস্কার পালন করেন। সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি কামনায় দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। কুমারীগণ জৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করেন। ভাল বর ও সচ্ছল সংসারলাভ তাদের প্রধান প্রত্যাশা থাকে। এয়োগণ সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি ও সন্তানাদির মঙ্গল কামনায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতাদি সংস্কার পালন করেন। লোকবিশ্বাস, দেবীর কৃপায় সন্তানহীনা ও মৃতবৎসা সন্তানলাভ করতে পারেন ও রোগশোক দূর হয়, মামলা মকদ্দমায় জয়লাভ হয়। ব্রতিনীগণের বিশ্বাস'মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপা হলে মনের সব ইচ্ছা পূরণ হয়।'

লোকদেবী চণ্ডীর দুই প্রকার পূজা প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা –

(১) চণ্ডীর নুড়িশিলা ও ঘটপূজা,

(২) চণ্ডীর মূর্তিপূজা,

এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে দেবীচণ্ডীর প্রতীক নুড়িশিলা ও 'মঙ্গলঘট' ঠাকুর ঘরে থাকে। প্রত্যহ মহিলাগণ স্নান করে নুড়িশিলায় তেলসিন্দূর মাখিয়ে ঘটে জল দিয়ে প্রণাম করেন ও প্রার্থনা জানান। কোন কোন গৃহস্থের বাড়িতে দেবীচণ্ডীর মূর্তি থাকে। মূর্তিপূজা সাধারণত 'সাধারণী থানে' হয়ে থাকে। এছাড়া দেবীচণ্ডীর নামে গৃহের বাইরে মুণ্ডপ্রতীক, উঁচুবেদী, খেঁজুরগাছ, ইত্যাদি পূজা করা হয়।

লোকদেবী চণ্ডীর মূর্তি অতি সুশ্রী। দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা চণ্ডীমূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবীর বাহন স্বর্ণগোধিকা (গোসাপ)। বাহনহীন দেবীমূর্তি বিরল নয়। লোকদেবী চণ্ডীর গাত্রবর্ণ হরিদ্রা। দেবী সালংকারা ও শাড়ীব্লাউজ পরিহিতা। দেবীর দুটি চোখ টানা, কোথাও কোথাও ত্রিনয়নী চণ্ডীমূর্তি দেখা যায়।

দেবীচণ্ডীর বিবিধ গুণের প্রকাশ স্বীকার করে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। দেবীচণ্ডীর যে গুণ মানুষের ধন ঐশ্বর্য প্রদান করে ও গৃহস্থের মঙ্গল করে, সেই গুণসম্পন্ন চণ্ডী হলেন লোকবিশ্বাসে মঙ্গলচণ্ডী। দেবীচণ্ডীকে বাণিজ্যলক্ষ্মীরূপেও কল্পনা করা হয়। মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় 'ভরা ভাসান' একটি প্রধান সংস্কাররূপে পালিত হয়। ভরা ভাসান হল বিবিধ ফল, ফুল, পত্র, দূর্বা ইত্যাদির 'ডালা'। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতিনীগণ জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবার ১৭টি ফল, ১৭টি ফুল, ১৭টি দূর্বা, পত্র ইত্যাদি সাতের সংখ্যায় বস্তু লালসুতোয় এক একটি তাড়ি বেঁধে ডালায় সুসজ্জিত করেন। বুধবার তা দক্ষিণ দিকে মুখ করে মাথার উপরে ডালা নিয়ে পুকুরে বা নদীতে ডুব দেন। ভরার সমস্ত বস্তুকে দক্ষিণ দিকে জলের ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সংস্কারকেই 'ভরা ভাসান' বলা হয়। এইরূপ সংস্কার প্রকৃত তাৎপর্যে এই অঞ্চলের মানুষের দক্ষিণদেশসমূহে যথা – সিংহল, আন্দামান-নিকোবর, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে ব্যবসাবাণিজ্যযাত্রার ইতিহাসের ইঙ্গিত বহন করে। সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় যাতে প্রিয়জনদের কোন বিঘ্ন না-ঘটে তারজন্য তাঁদের মঙ্গল কামনায় বিঘ্ননাশকারী মঙ্গলচণ্ডীর নামে 'ভরা' (বিবিধ দ্রব্যাদিতে বোঝাই জাহাজের প্রতীক) ভাসানর সংস্কার অদ্যাপি পালিত হয়। প্রতিটি লোকদেবতার পূজানুষ্ঠানের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত নিহিত থাকে তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণরূপে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার 'ভরা ভাসান' সংস্কারকে মান্য করা যায়।

লোকদেবী চণ্ডীর প্রধান সেবক নিম্নবর্ণের হিন্দু হলেও বর্তমানে প্রায় সব বর্ণের হিন্দু চণ্ডীদেবীর পূজার্চনায় অংশগ্রহণ করেন। গৃহে মহিলাগণই দেবীর বারব্রতাদি সংস্কার পালন করেন। পূজানুষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ নিজেরাই করেন। কেহ কেহ পুরোহিতের দ্বারা পূজানুষ্ঠান করান। সাধারণত ফলমূল, চিনি-সন্দেশ, বাতাসা পূজার অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদিত হয়। বারোয়ারী থানে চণ্ডীপূজায় ফলবলি দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও পশুবলির ব্যবস্থা থাকে। চণ্ডীপূজা উপলক্ষে দেবীর পালাগান, কীর্তনগান পাঁচালীপাঠ ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

দেবীচণ্ডীর উৎস-তাৎপর্যের সূত্রনির্দেশ বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। বৈদিক যুগ থেকে আদ্যাশক্তির আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদের যুগে কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। উমা হৈমবতীরও উল্লেখ আছে। মহাভারতের কালে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুরমর্দিনীর পরিচয় আছে। কেবল মার্কণ্ডেয় পুরাণেই প্রথম চণ্ডিকার পরিচয় মেলে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ খ্রীঃ তৃতীয় শতকে রচিত বলে মনে করা হয়। এর পূর্বে 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থে যে সমস্ত বৌদ্ধদেবীর উল্লেখ আছে তা মাতৃকামূর্তির অনুরূপ। খ্রীঃ দশম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে ঐতিহ্যগত ভাবে দেবীচণ্ডিকার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অসুরবিনাশিনী ও হরগৃহিণী দুর্গা-পার্বতী এক হয়ে গেছে। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমূর্তির পাদদেশে স্বর্ণগোধিকার মূর্তি কল্পিত হয়। স্বর্ণগোধিকা বাহন চণ্ডীকে নিয়ে লেখা হয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব প্রমুখ কবিগণ এই আখ্যানকাব্যের সার্থক রচয়িতা। চণ্ডীমঙ্গলের দেবীচণ্ডীর মাহাত্ম্য বিকাশের মূলে মেয়েলী ব্রতকথা। আর্যেতর প্রভাব যার ভিত্তি। চণ্ডী নাম্নী এক শিকারের দেবী উপজাতীয়দের মধ্যে পূজিতা হন। সেকারণে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী অস্ট্রিক (আদিবাসী) বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আর্যেতর দেবী বলে মনে করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী থাকায় লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ মনে করেন দেবীচণ্ডীর অনার্য থেকে আর্যীকরণ ঘটেছে। কারণ, কালকেতু ব্যাধসমাজের প্রতিভূ এবং ধনপতি সদাগর সম্ভ্রান্ত বণিক শ্রেণীর প্রতিভূ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আচার আচরণাদির পর্যালোচনা সূত্রে অনুমিত হয়, লোকদেবী চণ্ডী আদিতে একমাত্র মাতৃকাদেবীরূপে আদিম সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীর নিকট পূজালাভ করেছিলেন। তারপর সমাজ বিবর্তনের ধারায় তাঁর বিবিধ গুণের কথা ভেবে ভিন্ন রূপ ও বিবিধ নামে পরিচিতি ঘটে। ভারতীয় লোকবিশ্বাসে আদি পুরুষ ও আদি প্রকৃতি রূপে সাধারণত শিব ও পার্বতীকে কল্পনা করা হয় । আর যত দেব বা দেবী তাঁদেরই অংশ বিশেষ । লোকদেবী চণ্ডীকে তেলসিঁদুর দিয়ে প্রত্যহ স্নান করান সংস্কারের মধ্যে বাঙালী সংস্কার প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁকে হরগৃহিণী সতীর বা মহাপ্রকৃতির সাথে একীভূত করা হয়েছে।

লোকদেবতা ঃ দেবীনারায়ণী

বারুইপুর থানার এক বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন দেবীনারায়ণী। ইনি নারায়ণের পত্নী নারায়ণী নন। লোকবিশ্বাসে এই দেবী মহাদেবের শক্তি নারায়ণী। দেবীর দুই বা চার হাত বিশিষ্ট মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। সিংহ অথবা ব্যাঘ্র তাঁর বাহন। তীর-ধনুক বর্ম প্রভৃতি নানা অস্ত্র দেবীর হাতে শোভা পায়। কোন কোন নারায়ণীমূর্তির কোন বাহন থাকে না। এইরূপ দেবীর হাতে পদ্ম, শস্যগুচ্ছ বা শস্যবীজ থাকে। এই দেবীর শান্ত সৌম্যমূর্তি বরাভয় দায়িনীরূপ ভক্তের দ্বারা পূজিত হয়। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা দেবীর রণংদেহী মূর্তি হয়ে থাকে। লোকদেবী নারায়ণীর মূর্তি সাধারণত হরিদ্রা বর্ণের হয়, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। দেবী নারায়ণীর নুড়িপূজাও বিরল নয়। ইনি গৃহদেবী, গ্রামদেবীরূপেও পূজিতা হন।

বারুইপুর থানার বেগমপুর গ্রামে দেবীর পাকা থান প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামের

বারোয়ারী পূজা স্থানে দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়। পূজা উপলক্ষে নারায়ণীর পালাগান, গীত হয়। কোথাও কোথাও যাত্রা, পুতুলনাচ ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

লোকদেবী নারায়ণীর থান সাধারণত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে যে সমস্ত নারায়ণীর থানের নিকট নদী নেই, ক্ষেত্রগবেষণায় জানা যায়, অতীতে সেখানে নদীর স্রোত ছিল এবং বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাঝিমাল্লা, মৌলে বাউলেগণ এই দেবীর পূজা দিয়ে জঙ্গলে মধু ও কাঠ সংগ্রহে যেতেন। এখন জঙ্গল নেই, ফলে এই দেবী আর্তমানুষের রোগশোক প্রতিকারিকা শক্তিরূপে ভক্তের নিকট পূজিতা হন। এই দেবীর কৃপায় সমস্ত কঠিন রোগব্যাধির মুক্তি, মামলা-মকদ্দমায় জয়লাভ, সাংসারিক সমৃদ্ধি, মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকুরী প্রভৃতি ইহলৌকিক প্রাপ্তি ঘটে বলে লোকবিশ্বাস।

লোকদেবী নারায়ণীর উৎস-তাৎপর্য উদঘাটন লোকধর্মের বিবর্তন ধারার ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভব। এই দেবী অঞ্চল বিশেষে ভিন্ন নামে পূজিত হন। মহিষাসুরমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী, সঙ্গেতি আম্মান, অঙ্গলাপরমেশ্বরী, মারিআম্মান, দুর্গা, বনদুর্গা, ভাণ্ডালী, মশালকালী, অম্বিকা প্রভৃতি নামে দেবীর প্রকাশ আছে। এঁরা প্রত্যেকেই বাঘ বা সিংহবাহন দেবী । বারুইপুর থানায় বিভিন্ন অঞ্চলে ও সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে দেবীনারায়ণী বনদুর্গা নামে পূজিতা হন। এখানে দেবীর মৃন্ময়মূর্তি বা দারুমূর্তি উভয়ই দৃষ্ট হয়। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা নামে দেবীকে পূজা করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাঘ্রবাহন ভাণ্ডালী দেবীর চতুর্ভুজামূর্তি পূজা করা হয়। দেবীকে এই অঞ্চলে কেহ কেহ দুর্গার বোন বলেন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার টুংগাইল বিলপাড়াগ্রামে কার্তিকমাসের অমাবস্যা তিথিতে সিংহবাহনা মশালকালীর পূজা করা হয়। বিহার, উড়িষ্যা, অসম প্রভৃতি রাজ্যে দুর্গা সিংহ ও ব্যাঘ্র উভয় প্রকার বাহনে পূজিত হন। জৈনদেবী অম্বিকাও সিংহবাহনা-দ্বিভূজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা এমনকি বিংশতিভুজা পর্যন্ত হয়ে থাকেন। গুজরাটের পাটিদার সম্প্রদায় ষড়ভুজা, বলদবাহন, উমিয়া দেবীর পূজা করেন। এই দেবীকে পার্বতীজ্ঞানে কুলদেবীরূপে পূজা করা হয়। উত্তর গুজরাটের উনঝা অঞ্চলে দেবীর বিখ্যাত মন্দির আছে। রামনবমীতে এই দেবীর পূজা হয়। রাজপুতগণ আশাপুরাদেবীর আবক্ষমূর্তি দুর্গা অষ্টমীর দিন পার্বতীজ্ঞানে পূজা করেন। মাতানামাড় নামক স্থানে এই দেবীর বিখ্যাত মন্দির আছে। দক্ষিণভারতের রাজ্যগুলিতে সিংহবাহনা দেবীমূর্তি সঙ্গেতিআম্মান, অঙ্গলাপরমেশ্বরী, মারিয়াম্মান প্রভৃতি নামে পূজা করা হয়। দক্ষিণভারতের এই সমস্ত দেবীর পাথরের মূর্তি দৃষ্ট হয়। ভারতের বাইরেও সিংহ বা বাঘ বাহনা অনেক দেবীর কথা পাঠ করা যায়। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় এক বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক ভাবে শক্তি সাধনার প্রসার লাভ ঘটেছিল। তারও পূর্বে একাদশ শতকে বাংলায় সিংহবাহিনী দেবীদুর্গার পূজাচার প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহন দুর্গার ইতিহাস আরও প্রাচীন। সুতরাং সিংহবাহনা দেবীনারায়ণী সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে লোকদেবীরূপে পূজিতা হলেও উৎসগত তাৎপর্যে তিনি মহামায়া দেবীমহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার নামান্তর। দেবীদুর্গাকে বিভিন্ন গুণের আধাররূপে ভক্তগণ কল্পনা করেন। জলেজঙ্গলে শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশে তিনি ভক্তের নিকট নারায়ণী বা বনদুর্গারূপেই পূজিতা হন।

লোকদেবতা ঃ দেবী বিশালাক্ষী

বারুইপুর থানার ঐতিহ্যময় লোকদেবতা হলেন দেবীবিশালাক্ষী। বারুইপুর আদিগঙ্গার তীরে দেবীবিশালাক্ষীর দুটি প্রাচীন থান আছে। একটি থান বারুইপুর পুরাতন বাজারের নিকট, অপরটি কাছারিবাজার বা শখের বাজারের নিকট অবস্থিত । আর একটি প্রাচীন অথচ অজ্ঞাত কালের বিশালাক্ষীর থান মলঙ্গা গ্রামের পশ্চিম সীমায় আগ্গার বাদার নিকট বিশালাক্ষীতলায় অবস্থিত। এটি উত্তরভাগ-গড়িয়া খালপাড়ের পাশেই দেখা যায়। বিশালাক্ষীর থানটি বিদ্যাধরীর একটি সুঁতির পাশে অবস্থিত। এই সুঁতি ধরে পরবর্তিকালে খাল খনন করে উত্তরভাগ পাম্পহাউস দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মলঙ্গার দেবীবিশালাক্ষীর থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, এটি প্রায় আড়াইশ বছরের পুরান। আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ঐতিহ্যময়, বিশালাক্ষীর থানের উল্লেখ কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে পাঠ করা যায়। শ্রেষ্ঠী পুষ্পদত্ত তুরঙ্গপটন হতে নদীপথে স্বগ্রাম বড়দহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই পথের বর্ণনায় কবি উল্লেখ করেছেন –

"সাধুঘাটা পাছে করি সূর্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুর আসি ।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি ।। ৯২৮
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল ।"

এই বর্ণনায় পর পর কয়েকটি বিখ্যাত নদীঘাটের নাম পাওয়া যায়। যেমন সাধুঘাটা– সূর্যপুর – বারুইপুর – কল্যাণপুর ও দূরে মালঞ্চ। গঙ্গার গতিপথ অনুযায়ী বারুইপুর বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, তারপর কল্যাণপুর কল্যাণমাধব (যার বর্তমান নাম বুড়ো শিবতলা) এবং দূরে মালঞ্চ ঘাট অবস্থিত। মালঞ্চ ও বুড়ো শিবতলার মাঝে আদিগঙ্গার তীরে কাছারী বাজারের বিশালাক্ষীর থান অবস্থিত। সম্ভবত কৃষ্ণরাম দাস বারুইপুরের পুরাতন বাজারের নিকট বিশালাক্ষীর থানের কথা বলতে চেয়েছেন। ডঃ কালিচরণ কর্মকারের লেখায় এই মতের সমর্থন মেলে। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল রচনার সময়কাল ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তারও পূর্ব হতে এই বিশালাক্ষীর মহিমা মানুষকে প্রভাবিত করেছিল– এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বারুইপুর পুরাতন বাজারের বিশালাক্ষীর মন্দির নির্মাণ করেছেন বারুইপুরের চৌধুরীবাবুদের বংশধরগণ। এই মন্দিরে যে বিশালাক্ষীদেবীর মূর্তি পূজিত হয় এটি দারুনির্মিত। দেবী দ্বিভুজা, বটুক ভৈরবের উপর দণ্ডায়মানা। বটুক ভৈরব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। দেবীর বামহাতে সিন্দূর কৌটা ও ডানহাতে খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, পরিধানে শাড়িব্লাউজ, পায়ে নূপুর ও সর্বাঙ্গে নানা অলংকার। যাঁরা পূজা দিতে আসেন তাঁরা শাঁখা ও নোয়া দিয়ে যান। দেবীর

সামনে বাঁদিকে ষষ্ঠীর নুড়ি, শিবলিঙ্গ, মাঝে শীতলা, ধারে মনসা, দেবীর ডানদিকে নারায়ণের শিলা আছে। দেবীর নিত্যপূজা হয়। বেলপাতা ও জবাফুলসহ লাল নটেশাক মায়ের পূজার প্রধান উপকরণ। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দুর্গা অষ্টমীতে খুব জাঁকজমক সহকারে দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়। বাৎসরিক পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়। 'কর্মকার' ছাগবলি দেন। যাঁরা বলি দেওয়ার কাজ করেন তাঁদের কর্মকার বলা হয়। নির্দিষ্ট খাঁড়া মায়ের পায়ে স্পর্শ করে ছাগের গলায় ঠেকান হয়। তারপর কর্মকার সেই খাঁড়া দিয়ে পুরোপুরি ছাগের দেহ হতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন। এই পূজা উপলক্ষে নাম সংকীর্তন হয়।

কাছারিবাজারের নিকট যে বিশালাক্ষীর থান এটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। আদিতে এখানে মাটির ঘরে মাটির বিশালাক্ষীর মূর্তি ছিল। বর্তমানে সেই মূর্তির আদলে সিমেন্টের ঢালাই মূর্তি নির্মিত হয়েছে এবং সুদৃশ্য পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছে। অতীতে বারুইপুরের সঙ্গতিসম্পন্ন চিংড়ি পরিবার মন্দিরের দেখভাল করতেন। বর্তমানে ১১ জনের একটি ট্রাস্টির হাতে মন্দিরের সেবার ও উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বিশালাক্ষীর থানটি গড়ে উঠেছে। প্রথমে 'বিশালাক্ষীমাতা ট্রাষ্ট ডীড্' নামে যে ট্রাষ্ট ডীড্ হয়েছিল তাতে সাতজন সদস্য ছিলেন। বিরাটমোহন ঘোষ, কিশোরীমোহন দাস, অমৃতলাল মারিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন প্রথম ট্রাষ্টী।

কাছারিবাজারের বিশালাক্ষীর মূর্তিটি সুশ্রী। দেবী শিবের উপর দণ্ডায়মানা। দেবীর গাত্রবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং সালংকারা। তাঁর বামহাতে খড়্গ, ডানহাতে ঢাল ও গলায় মুণ্ডমালা। ত্রিসন্ধ্যা দেবীর ভোগারতি হয়। প্রতি শনি, মঙ্গল, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং বিশেষ পূজার দিন বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। পুরোহিত নিরামিষ নৈবেদ্য পূজা দেবীকে অর্পণ করেন।

বারুইপুর থানার যোগী বটতলার কিয়দ্দূরে ডিহিমেদনমল্ল গ্রামে পূর্বদিকেও শিবের আর একটি বিশালাক্ষীর থান আছে। এখানকার মূর্তিটি দ্বিভুজা, রক্তাম্বরা ও শিবের উপর দণ্ডায়মানা। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় এবং দুর্গাষষ্ঠীর দিন বাৎসরিক পূজা হয়।

উৎসগত তাৎপর্যে লোকদেবী বিশালাক্ষী মাঝিমাল্লা, মউলে-বাউলে, জেলে, কাঠুরিয়া প্রভৃতি পেশার মানুষ, যাঁরা জলপথে জীবনজীবিকার জন্য চলাফেরা করেন , তাঁদেরই বিশ্বাসজাত দেবী। জলপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি হতে এই দেবী অসহায় মানুষকে রক্ষা করেন। সেকারণে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বিশালাক্ষীর থান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে উন্নত জলযান আবিষ্কারের ফলে নদী বা সমুদ্রপথে বিপদের ঝুঁকি কমে গেছে। ফলে দেবীবিশালাক্ষীর উল্লিখিত প্রধান মাহাত্ম্যের পরিচয় তেমন দৃষ্ট হয় না। এখন এই দেবী মানুষের ইহলৌকিক কামনা পরিপূর্ণ করেন। দেবীর কৃপায় যেমন কঠিন রোগব্যাধি সারে, তেমনি ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধিও লাভ হয়। ফলে দেবীবিশালাক্ষীর থানেতে অসংখ্য মানতের ঢিল বাঁধা থাকতে দেখা যায়, যা অন্যান্য লোকদেবতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

দেবী বিশালাক্ষী সম্পর্কিত বিশ্বাস অতি প্রাচীন। দশম শতাব্দীতে চর্যাপদেও বিশালাক্ষী নামক লোকদেবীর কথা উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাতান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের লেখা 'বৃহৎতন্ত্রসার' গ্রন্থে বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র আছে। পঞ্চদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীবিশালাক্ষীর বন্দনাদি পাঠ করা যায়। আটঘরা ও বেগমপুরের লোককবি গোষ্ঠ মণ্ডল ও সুদিন মণ্ডল দেবীবিশালাক্ষীর পালাগান লিখেছেন। তাঁদের লেখা পালাগান আসর করে গীত হয়।

লোকবিশ্বাসে দেবীবিশালাক্ষী রোগশোক প্রতিকারের দেবী। মাঝিমাল্লাদের সমুদ্র বা নদীতে ঝড়বৃষ্টির ন্যায় আধিদৈবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষাকারীদেবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও কালে কালে তিনি তান্ত্রিকদেবী, বৌদ্ধদেবী, শাস্ত্রীয়দেবী, যোগিনী, ডাকিনী ও ষোড়শ শতকে চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণবী হয়ে উঠেছেন। দেবী ঘোড়ামুখী, মুণ্ডমূর্তি, শিলাখণ্ড রূপে পূজিতা হন,আবার পূর্ণ নারীমূর্তিতেও পূজিতা হন। ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায়, সুন্দরবনের কোন কোন অংশে বিশালাক্ষী বনবিবিরূপে পূজিতা হন। উদাহরণ স্বরূপ পাথরপ্রতিমা থানার হেরম্বগোপালপুর গ্রামের বিখ্যাত বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর বৈশাখমাসের শেষ মঙ্গলবার এখানকার বিশালাক্ষী বনবিবি হিসাবে পূজিতা হন। বিবর্তনের ধারায় দেবী বিশালাক্ষী শাস্ত্রপুরা তন্ত্র এবং বৌদ্ধ বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে যুক্ত হলেও মৌলিক বৈশিষ্ট্যে অরণ্যচারী লৌকিকদেবী হিসাবেই জনসমাজে পূজিতা হন। অধিকাংশক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ ধীবর মাঝিমাল্লারাই দেবীর সেবক। ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে নদী-জঙ্গলের মানুষকে রক্ষা করাই দেবীর মাহাত্ম্য। এই দিক থেকে বিচার করলে বিশালাক্ষীর আদিম ও লৌকিক চরিত্র বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমানে দেবীবিশালাক্ষী শক্তিরূপেই পূজিতা হন। প্রচলিত লোকবিশ্বাসে তিনি মহামায়াদুর্গারই অংশবিশেষ। মহামাতৃকার সাথে এ দেবীর কোন প্রভেদ করা হয় না।

লোকদেবতা ঃ দেবীভগবতী

বারুইপুর থানা অঞ্চলে বহুপূজিত লোকদেবতা হলেন দেবীভগবতী। প্রতি বৎসর বাংলা নববর্ষের দিন প্রায় প্রতিটি হিন্দু কৃষক পরিবারে গোয়ালঘরে এই দেবীর পূজা হয়। মাটি বা চালের গুঁড়ো দিয়ে দুটি দেবতার প্রতীক নির্মিত হয়। যার একটিকে দেবীভগবতী, অপরটিকে তাঁর অনুচরী বা সখি বলা হয়। অবয়বহীন মূর্তিদুটির ভিন্ন নামে পরিচয় পাওয়া যায়। অঞ্চল বিশেষে একে হরপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, গজপীর-মানিকপীর প্রভৃতি বলা হলেও এই পূজা ভগবতীপূজা নামে অধিক পরিচিত। ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করেন। দেবীর নির্দিষ্ট কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। শিবদুর্গার ধ্যানে বা লক্ষ্মীনারায়ণের ধ্যানে ফুলজল দিয়ে দেবীর পূজা করা হয়। বেলা ১২ টার পর দেবীর পূজানুষ্ঠানের লোক বিধান থাকলেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্থানিক ফলমূলাদি দেবীর পূজার অর্ঘ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেকে গোয়ালঘরে আতপচালের ক্ষীর প্রস্তুত করে দেবীভগবতীর উদ্দেশে নিবেদন করেন। গৃহের প্রধানমহিলা অনেক ক্ষেত্রে নিজেই পূজানুষ্ঠান করেন। গোয়ালঘরে গো-সম্পদ বৃদ্ধির কামনায় এই দেবীর পূজা করা হয় বলে একে গোঠপূজাও বলা হয়।

গোঠপূজা বা ভগবতীপূজার উৎসগত তাৎপর্য ভিন্ন পরিচয় প্রদান করে। 'ভগবতী' শব্দের

সাধারণ অর্থ হল দেবীদুর্গা, ঋগ্বেদ সংহিতায় 'দুগ্ধবতী গাভী'। আবার 'ভগ' আছে যাঁর, তিনিই প্রকৃত অর্থে ভগবতী। যেক্ষেত্র হতে নতুন প্রাণের জাগরণ ঘটে সেই ক্ষেত্রকে 'ভগ' বলা হয়। ব্যাপক অর্থে এই ক্ষেত্রটি হল ভূমি। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার পূজা হল ভগবতী পূজা। ঋগ্বেদে ভগবতী সম্পর্কে যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ –

সূয়বসাদ্ভগবতী হি ভূয়ং অথ বয়ং ভগবন্ত স্যাম
অদ্ধিতপম্‌ধেম্য বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদক মা চরন্তী।।

১/১৬৪/৪০

এই ঋকের অর্থ হল "হে অহননীয়া গাভী! তুমি শোভন শস্যতৃণাদি ভক্ষণ কর এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তাহলে আমরাও প্রভূত ধনবান হব। সর্বকাল ধরে তৃণভক্ষণ কর এবং সর্বত্র গমন করে নির্মল জলপান কর।"

ঋগ্বেদে ভগবতী বন্দনার যে তাৎপর্য উল্লিখিত হয়েছে তা ভগবতীপূজা বা গোঠপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে নববর্ষে অনুষ্ঠিত গোঠপূজার সাথে অসমের গোরুবিহু উৎসবের মিল আছে। 'বিহু' হল অসমীয়াদের নববর্ষের উৎসব। কৃষির প্রধান সহায়ক গোরু ও মহিষের বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে 'গোরুবিহু' উৎসব পালিত হয়। এই অঞ্চলের গো-পরিচর্যার মাধ্যমে গোঠপূজা বা ভগবতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

লোকদেবতা ঃ দেবীলক্ষ্মী

বারুইপুরের বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন দেবীলক্ষ্মী। দেবীলক্ষ্মীর পৌরাণিক পরিচয় থাকলেও লৌকিক ধারায় লক্ষ্মীকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য বাঙালী মায়েদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবীলক্ষ্মীর ন্যায় আর অন্য কোন দেবীকে নিয়ে বাঙালী মায়েরা এত উচ্ছ্বাস দেখান না। দেবীলক্ষ্মী শ্রী, সম্পদ, ও শস্যদায়িনী কৃষিলক্ষ্মী রূপে এ অঞ্চলের লোকসমাজে পূজিতা হন। জীবনের যেক্ষেত্রে সৌভাগ্যলাভের প্রসঙ্গ থাকে, সেক্ষেত্রে দেবীলক্ষ্মীর কল্পনা করা হয়। বাংলায় দেবীলক্ষ্মী যশোলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, বাণিজ্যলক্ষ্মী, কৃষিলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, ইত্যাদি নামে বিশেষিত হন। আবার ধৈর্যশীল, ধীর রমণীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্মী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'শ্রী' শব্দে লক্ষ্মীকে বোঝায়। বাংলার হিন্দু পুরুষদের নামের প্রথমেই 'শ্রী' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রতিটি উন্নতিসূচক কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর পূজা সংক্রান্ত সংস্কার জড়িয়ে থাকে।

বারুইপুর অঞ্চলে দেবীলক্ষ্মীর দুই প্রকার পূজাচার পালিত হয়। যথা (১) দেবীর দিব্যমূর্তি পূজা । (২) দেবীর নুড়িশিলা পূজা। দেবীলক্ষ্মীর মূর্তি খুবই সুশ্রী ও সালংকারা। দেবীর বামকাঁখে শস্যপূর্ণ পাত্র এবং ডানহাতে প্রদান-মুদ্রা। প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি দেবীলক্ষ্মীকে, বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাবণের গৃহে দেবীলক্ষ্মী ছিলেন গজলক্ষ্মীরূপে। দেবীর এই মূর্তিতে দুটি গজ দুদিক থেকে শুঁড়ে জলকুম্ভ নিয়ে দেবীকে স্নান করাচ্ছেন। এরূপ মূর্তি ইলোরা চিত্রশালায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত মনিনাগেশ্বরের মন্দিরের প্রবেশদ্বারে, গুপ্তরাজাদের মুদ্রায়, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশে

জয়নাগ নামে এক রাজার তাম্রমুদ্রায়, হর্ষবর্ধনের পর খ্রীষ্ট্রীয় সপ্তম শতকে পূর্ববঙ্গে খড়গবংশীয় যে রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়, তাঁদের ভূমিদানের একটি তাম্রপট্টে এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে সাঁচীতে। বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীর কল্পনা অদ্যাবধি আছে। এক্ষেত্রে দেবীলক্ষ্মী হলেন দ্বিভুজা, তাঁর দক্ষিণহস্তে পদ্ম ও বামহস্তে বিল্ব। ব্যতিক্রমও লক্ষ্য কার যায় – অনন্তশয্যায় নারায়ণ এবং লক্ষ্মী তাঁর পদসেবায় রত। এক্ষেত্রেও তিনি দ্বিভুজা। বাংলাদেশে পাল সেনযুগের নির্মিত লক্ষ্মীমূর্তির সাথে বিষ্ণু ও সরস্বতীর ত্রয়ীমূর্তি পাওয়া গেছে, তাতে বিষ্ণুর অপর স্ত্রীর নাম ভূমিদেবী। ভূমিদেবী, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর যে ত্রয়ীমূর্তি পাওয়া গেছে ; লক্ষ্মী বিষ্ণুর দক্ষিণপার্শ্বে ও ভূমিদেবী বামপার্শ্বে । এইরূপ মূর্তি তামিলনাড়ুতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে এই দেবতা মাদুরাইবীরণ নামে পূজিত হন। লক্ষ্মীর কয়েকটি একক মূর্তিও আছে। বগুড়ার চতুর্ভুজা লক্ষ্মীর একহাতে লক্ষ্মীর সুপরিচিত ঝাঁপি আছে যা বাংলার লক্ষ্মীপরিকল্পনার পরিচায়ক। এছাড়া চতুর্ভুজা লক্ষ্মীমূর্তির দক্ষিণহস্তে মৃণাল ও বিল্ব এবং বামহস্তে অমৃতঘট ও শঙ্খ আছে। বাংলার ভিন্ন জেলায় বর্তমানে লক্ষ্মীর যে মূর্তি দেখা যায় তাতে লক্ষ্মীর বাহন হল পেঁচা। দেবীর দুই হাত, সদাপ্রসন্ন মুখ, ধানের শিষ হাতে। লক্ষ্মীর রূপসৌন্দর্য প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী'। এই লক্ষ্মী সমুদ্রমন্থনকালে উঠেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে । প্রচলিত পালাগানে দেবীলক্ষ্মী হলেন নারায়ণঘরনী নারায়ণী, তাঁর সাথী নীলাবতী, কেউ কেউ বলেন বিমলা। গরুড় তাঁর আজ্ঞাবাহী, অজগর দেবীর শুভশক্তির বিরুদ্ধে অনিষ্টকারী।

বাংলায় দেবীলক্ষ্মীর কেবল মূর্তিপূজা নয়, দেবীর ঘটপূজাও হয়। মূর্তি ও ঘট ছাড়া দেবীর আর একপ্রকার পূজা প্রচলিত আছে। একে দেবীর আচারসর্বস্ব পূজা বলে। যেমন ধানের গাদাপূজা, গোলাপূজা, ক্ষেত্রপূজা, খাদ্যভাণ্ডারপূজা, খন্দপালা পূজা ইত্যাদি। বৃহস্পতিবার দেবীলক্ষ্মীর পূজার প্রশস্ত দিন বলে বিবেচনা করা হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন বার থাকে না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্ণিমাতিথিতে কোজাগরীলক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন দেবীর মূর্তিপূজা করা হয় এবং প্রায় প্রতিটি হিন্দু গৃহে এই দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়। পুরোহিত দেবীর পূজা করেন। আচারসর্বস্ব পূজার জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থ মহিলাগণ নিজেরাই দেবীর কোন প্রকার আড়ম্বর ছাড়াই পূজানুষ্ঠান করেন। এক্ষেত্রে কোন মন্ত্রতন্ত্রও ব্যবহৃত হয় না।

দেবীলক্ষ্মীর লৌকিক পরিচয় আছে। লোকবিশ্বাসমতে লক্ষ্মী হলেন মহামায়া অন্নপূর্ণার কন্যা; শিব তাঁর পিতা; কার্তিক, গণেশ তাঁর ভাই ও সরস্বতী তাঁর বোন এবং নারায়ণ তাঁর স্বামী। তিনি ধনসম্পদের দেবী। তাঁর কৃপায় সৌভাগ্যলাভ হয়, নির্ধন ধনলাভ করে। দেবী পদ্মালয়ে থাকতে ভালবাসেন। সে কারণে তাঁর আর এক নাম পদ্মালয়া। যেখানে কদাচার সেখানে তিনি থাকেন না। সদাচার ও পবিত্রতার মাঝে তাঁর অক্ষয় আসন পাতা থাকে। লৌকিকদেবী লক্ষ্মীকে নিয়ে পালাগায়কগণ পালাগান করেন। দেবীলক্ষ্মীর যত পালাগান বাংলায় প্রচলিত আছে বা সৃষ্টি হয়েছে, এমনটি আর অন্য কোন লোকদেবীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। প্রায় প্রতিটি পালাগানের বিষয়বস্তুতে দুর্ভাগ্য কবলিত মানুষ দেবীর কৃপায় কিভাবে সৌভাগ্যলাভ করেছে তারই বৃত্তান্তের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে ।

লোকদেবতা ঃ অলক্ষ্মী

বারুইপুর থানায় বহুপূজিত লোকদেবতা হলেন দেবী অলক্ষ্মী। ইনি দেবীলক্ষ্মী বা শুভলক্ষ্মীর বিপরীত গুণধর্মী বলে অলক্ষ্মী। লোকবিশ্বাসে এই দেবী শ্রী ও সম্পদ লাভের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। বারুইপুর অঞ্চলে দেবীর নির্দিষ্ট কোন মূর্তিতে পূজা হয়.না। গোবরের লাডু দিয়ে যে মূর্তি বানান হয় তার দ্বারা অলক্ষ্মীর নির্দিষ্টরূপ বলে কিছুই চিহ্নিত হয় না। তবে বোধায়ন ধর্মসূত্রে অলক্ষ্মীপূজার বিবরণ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে অলক্ষ্মীর আটপ্রকার আকৃতির উল্লেখ আছে, পদ্মপুরাণে অলক্ষ্মী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হল, সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মীর পর দ্বিতীয় যে দেবী ওঠেন তিনিই অলক্ষ্মী। এই দেবী দ্বিভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবসনা, লৌহ অলংকারভূষিতা, সম্মার্জনী (ঝাঁটা) হাতে, শর্করাচন্দনচর্চিতা, গর্দভারূঢ়া, কুরূপা ও কুৎসিত স্থান বিলাসিনী। অলক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র হতে পাওয়া যায়ইনি কষায়গন্ধলিপ্তা, তৈললিপ্ত শরীর, বামহাতে ভস্মপাত্র ও বিকৃতদংস্ট্রা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এ অলক্ষ্মী সম্পর্কিত পরিচয়ে বলা হয়েছে, অলক্ষ্মী দুর্ভাগ্যের দেবী, লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী তিনি জ্যেষ্ঠা দেবী, কালকর্ণিকা, কালকর্ণী, নিঋতী, পাপীলক্ষ্মী, দুষ্টলক্ষ্মী ইত্যাদি নামে পরিচিতা হলেও অলক্ষ্মী বা আলক্ষ্মীরূপেই পূজিতা হন।

পুরোহিত দর্পণে অলক্ষ্মী সম্পর্কে কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। অলক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণগণ পূজা করেন বামহাতে। কোন মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করেন না, কেবল 'অনুগ্রহ করে গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে গৃহ হতে বের হও' বলে অনুরোধ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ এই দেবীর পূজা করেন ও পূজান্তে গৃহের বাইরে রেখে আসেন।

দেবীঅলক্ষ্মীর পূজাচারের মধ্যে কোন পবিত্রতা নেই, আছে কেবল অনাদর। প্রতি বৎসর কালীপূজার দিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের বুড়ো অমাবস্যা তিথিতে শুভলক্ষ্মী স্বরূপিনী শ্যামামায়ের পূজারম্ভের পূর্বে এই দেবীর পূজা করা হয়। অলক্ষ্মীর পূজা অন্তে তেমাথায় স্থাপনের সময় এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শিশুরা ঢাক-ঢোলের পরিবর্তে কুলো বাজায়। যাত্রাকালে দেবীর প্রশস্তির পরিবর্তে গালাগাল দিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে দেবীকে অপমান করে। যাতে এই দুর্ভাগ্যের দেবী কোনদিনই গৃহে প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এরূপ বিকৃত আচরণ করা হয়।

অলক্ষ্মীর উৎস-তাৎপর্য প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অলক্ষ্মী প্রকৃত তাৎপর্যে আদিলক্ষ্মী। আর্যপূর্ব যুগে ইনি শুভলক্ষ্মীরূপে এদেশে পূজিতা হতেন। পরবর্তী কালে দ্বন্দ্বসমন্বয়ের যুগে ইনি দুর্ভাগ্যের দেবীরূপে পূজিতা হন।' ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অলক্ষ্মীর উৎস সম্পর্কে যে তথ্য লাভ করা যায় তা হল – অলক্ষ্মী মানুষের নিষ্ঠুর অতীত। অতীতের যে সময়ে মানুষ কেবল দুঃখদুর্দশা পায়, তারই অনাদরে পূজা হল অলক্ষ্মীপূজা। একে বিদায় করে মানুষ সুখসমৃদ্ধিময় নতুন জীবন কামনা করে। অলক্ষ্মীর পূজা হল বিড়ম্বনাময় অতীতের পূজা। একে লাভ করা নয়, ত্যাগ হওয়ার জন্য পূজা। অলক্ষ্মী সম্পর্কে যে পূজা প্রচলিত আছে, তাতে অতীতকে বিস্মৃত হওয়া নয়, অতীতকে অবজ্ঞায় বিদায়ের সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে।

লোকদেবতা ঃ দেবীমনসা

বারুইপুর থানা এলাকায় বহু পূজিত লোকদেবতা হলেন দেবীমনসা। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারের ঠাকুরঘরে অথবা বাস্তুঠাকুরের থানে মনসাগাছের গোড়ায় দেবীমনসার ঘট পূজিত হয়। কোন কোন পরিবারে দেবীমনসার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গৃহদেবীরূপে নিত্যসেবা করতে দেখা যায়। পাড়ায় বা গ্রামের সাধারণী থানেও দেবীমনসার মূর্তি খুব জাঁকজমক সহকারে পূজা করা হয়। মনসাপূজার এমন ব্যাপকতা দেবীলক্ষ্মী ব্যতীত অন্যকোন দেবীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

দেবীমনসাকে সর্পদেবী বলা হয়। সর্পপূজা ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই আছে। দক্ষিণভারতে সর্পপূজার প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। এখানে জীবন্ত সর্পকেও অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করা হয়। এছাড়া লোকসমাগমপ্রধান অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে পাথরের উপর খোদাই করা যুগ্ম সর্পমূর্তি চোখে পড়ে । বাংলার সংস্কৃতির সাথে সর্পের যেমন গভীর সম্পর্ক আছে তেমনি দ্রাবিড় সংস্কৃতির সাথেও সর্পের সম্পর্ক অতিশয় নিবিড়। মধ্যযুগে বাংলায় মঙ্গলকবিদিগের লেখা মনসামঙ্গল কাব্য সর্পকেন্দ্রিক সংস্কৃতি প্রচারে জোয়ার এনেছে, কিন্তু খ্রিষ্টপূর্বকাল হতে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সর্পকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে সর্পের নানা ভূমিকার কথা পাঠ করা যায়। এখানে সর্প অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনুষ্য চরিত্র লাভ করেছে। সুতরাং সর্প সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী হলেও তার মনুষ্যরূপ ও গুণলাভ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়।

বারুইপুর থানা এলাকায় প্রধানত চার প্রকার মনসাপূজার রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা–

১) মনসার মূর্তিপূজা,
২) মনসার বৃক্ষপূজা,
৩) সর্পফণাপূজা,
৪) মনসার ঘট ও নুড়িশিলা পূজা।

দেবীমনসার মূর্তি সুশ্রী, শাড়ীব্লাউজ পরা ও সালংকারা। দেবীপদ্মের আসনে উপবিষ্টা এবং কোথাও পদতলে বাহন হংস। দেবীর চার হাত, উপরের হাতে শঙ্খ ও সর্প এবং নিচের হাতে পদ্ম ও বরাভয়মুদ্রা থাকে। এইরূপের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। দ্বিভুজা মনসামূর্তিও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে মনসার মূর্তিপূজা সাধারণত সাধারণী থানে হলেও অনেকে কুলদেবী রূপে গৃহে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজা করেন।

মনসার বৃক্ষপূজা প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবীমনসার প্রতীক হল মনসাগাছ। একে অঞ্চল বিশেষে স্নায়ুহীবৃক্ষ বা সিজমনসা বলা হয়। এই বৃক্ষের নিচে বেদি করে তার উপর কাদামাটির সর্পফণা নির্মাণ করে কাঁচাদুধ ও পাকাকলা দিয়ে পূজা করা হয়। দশহরা, নাগপঞ্চমী, ভাদ্রসংক্রান্তিতে দেবীমনসার পূজানুষ্ঠান পালিত হয়।

সর্পফণাপূজার রীতি পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের কালচার। বারুইপুর অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের যে সমস্ত হিন্দু পরিবার বাস করেন, সাধারণত তাঁদের গৃহে সর্পফণাপূজার সংস্কার পালিত

হতে দেখা যায়। এই পূজাকে তাঁরা 'নাগপূজা' বলেন। সর্পফণাসমূহ বিভিন্ন রঙের হয়। সাধারণত দশহরার দিন নাগপূজার প্রশস্ত দিন বলে বিবেচিত হয়। মনসার ঘট ও নুড়িশিলা প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারের ঠাকুরঘরে নিত্যসেবা হয়। মহিলাগণ এই পূজা করেন। অন্যান্য পূজায় ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করলেও মহিলাদের তৎপরতাই অধিক থাকে।

দেবীমনসা সম্পর্কে লোকবিশ্বাস হল, এই দেবী মানুষের সর্পভীতি দূর করে। মায়ের কৃপা থাকলে সর্প কোনরূপ অনিষ্ট করে না। আর এক শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস. সর্প বংশরক্ষা করে, সন্তানহীনা সন্তানলাভ করেন, সংসারের শ্রীসম্পদলাভ হয়। জাগতিক সমস্ত তাপ দেবীর কৃপায় দূর হয়। সাধকের ভাবনায় মা মনসা হলেন মনস্বিনী, কুলকুণ্ডলিনী, আদ্যাশক্তি মহামায়া ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী। লোকসংস্কৃতির গবেষক ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মনে করেন, মনসার অনেক গুণের মধ্যে আরোগ্য ও পুষ্টি আছে। এই গুণ দুটি দেবীষষ্ঠীর সহিত মিলিত হয়ে মনসাকে শুধু সর্পদেবতায় পরিণত করেছে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে মনসার মূর্তিতেই ষষ্ঠীপূজা করা হয়, ষষ্ঠী ও মনসার নিকট সম্বন্ধই সূচিত হয়। (শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা)।

মূলত সর্প উপাসনা আদিম নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার ফলশ্রুতিরূপে বিবেচিত হয়। পৌরাণিক যুগে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির উপর মনুষ্যরূপ ও মনুষ্যচরিত্র আরোপ কালে সর্প ও নাগ সর্পদেবতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় এ দেবতা কখনো পুরুষ ও কখনো নারী রূপে কল্পিত হয়েছে। কখনো সর্প বংশরক্ষক, কখনো সংহারকরূপে কল্পিত হয়েছে। মহাভারতে বসুদেবের সন্তান কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করার পর নন্দালয়ে যাত্রাকালে, বসুদেব ও কৃষ্ণের মাথায় সহস্রফণায় ছত্রধরে নদীপার করে বসুদেবের বংশরক্ষা করেছে। সম্ভবত সেই কারণেই নাগ বংশরক্ষক দেবতারূপে কল্পিত হয় ও সর্পের উপর বংশরক্ষার গুণ আরোপিত হয়। আবার সর্প তক্ষকরূপে রাজা পরীক্ষিতের দংশন করে, কালীয় নাগরূপে ব্রজবালক ও পশুদের ধ্বংস করে সংহারকের ভূমিকায় কল্পিত হয়েছে। সমুদ্রমন্থনকালে বাসুকী রজ্জু হয়ে সমুদ্রমন্থনে সাহায্য করে দেবতা ও অসুরদের মহার্ঘ্যলাভে সহায়তা করেছে। এই কাজের জন্য নাগ মানুষের সম্পদ প্রদানকারী দেবতার আসনে পূজিত হয়েছে। পৃথিবীর ভার বহনকারী বাসুকীনাগ ধরিত্রীদেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পূজিত হয়েছেন। আবার মহাপ্রলয়কালে জলমগ্ন পৃথিবীর উপর অনন্তশয্যায় (সর্পশয্যা) মহাবিষ্ণু ও লক্ষ্মী সৃষ্টি-রক্ষার কাজ করেছেন। সুতরাং পুরাণাদিতে সর্পকেন্দ্রিক নানা কথা উপকথায় মানবজীবনে সর্পের প্রাসঙ্গিকতাকেই স্মরণ করায়। সর্পের এই প্রাসঙ্গিকতার স্তর বিন্যাসটি নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা-

কুলপ্রতীক　জীবনধারণের সহায়ক শক্তি　চরমপ্রাপ্তি দাতা　মনুষ্যরূপ　মনুষ্যগুণ　অলৌকিক শক্তি (magical belief)

দেবীমনসা ও মনসাকেন্দ্রিক পালাগানাদির উদ্ভবের নেপথ্যে উল্লিখিত ভাবনাসমূহ ক্রিয়াশীল, এরূপ মত পোষণ করা যায়।

লোকদেবতা ঃ দেবীশীতলা

বারুইপুর থানার বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন দেবীশীতলা। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামে শীতলার থান আছে। এমনকি প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে ঠাকুরঘরে দেবীশীতলার নুড়িশিলা থাকে, যা প্রত্যহ তেল দিয়ে স্নান করিয়ে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়ে পূজা করা হয়। এসব সত্ত্বেও শিখরবালী গ্রামে যে শীতলার থান আছে তা অতি 'জাগ্রত থান' বিবেচনা করে যাত্রিগণ এখানে এসে মায়ের পূজা দেন। এখানে দেবীর নিত্যপূজা হয় । শনি ও মঙ্গলবার মায়ের বিশেষ পূজাব্যবস্থা থাকে। প্রতি বৎসর দোলের পরের অষ্টমীতিথিতে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। কথিত হয়, ঐ দিনটি মায়ের জন্মদিন। যে সমস্ত যাত্রী এখানে মানত নিয়ে আসেন মানত অনুযায়ী তাঁরা দেবীর ছলন দেন, গণ্ডিকাটেন, পূজা দেন। কোন কোন যাত্রীর 'দেবীর ভর' হতে দেখা যায়। হাম-বসন্ত রোগে এখান থেকে ওষুধ নিলে অনেকের আরোগ্য লাভ হয়। ওষুধ দেন পুরোহিত। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে (৩-৫-১৯৯২) জানা যায়, জীবন চক্রবর্তীর পুত্র নোনো চক্রবর্তী ঐ সময় এ্যালোপ্যাথি ওষুধ মধু ও মকরধ্বজসহ রোগীকে খেতে দিতেন, আর দিতেন মায়ের চরণামৃত। শম্ভুনাথ পালের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, তাঁর পিতা এখানে পক্সের টীকা দিতেন। কেবল হামবসন্তের সমস্যা নিয়ে যাত্রিগণ এখানে আসেন তা নয়, সন্তানহীনা সন্তান কামনায়ও মায়ের কাছে মানত করেন। জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী এখানে বন্ধ্যানারীর ওষুধপত্রাদি দিতেন। হামবসন্তের ভেষজ ওষুধও তিনি দিতেন ।

শিখরবালীর দেবীশীতলা দ্বিভুজা মৃন্ময়ী মূর্তি। দেবী গাধার পিঠে সন্তান ক্রোড়ে উপবিষ্ট। তাঁর ডানদিকে উষ্ণীষ মস্তকে চতুর্ভুজ জ্বরাসুর । সামনে সখী রক্তাবতী ও নিয়ে লীলাবতী এবং বিজয় (?)। সামনে আছেন নিতাই গৌর; পাথরের মাটিতে শিবলিঙ্গ। ভক্তদের দেওয়া শাঁখাসিন্দূর ও পূজার সামগ্রী সামনে রাখা আছে। দেবীর প্রায় সর্বাঙ্গ লালপেড়ে সাদা শাড়ীতে ঢাকা।

শিখরবালীর শীতলামায়ের মন্দিরের একটি ইতিহাস আছে। প্রথমে এই দেবীর থানটি ছিল বৈকুণ্ঠ পালের পুত্র ননী পালের গৃহে। ননী পালের পুত্রগণ সুশীল ও গোবিন্দ পাল এখনো তাঁদের পুরান ঐতিহ্য অনুযায়ী বাড়িতে থানটি রেখেছেন। প্রথমে এখানে প্রচুর যাত্রী সমাগম হত। বাড়ির মধ্যে স্থান দেওয়া যেত না। ফলে পুরান মন্দির বা থান থেকে প্রায় দেড়শগজ দূরে রাস্তার পাশে নতুন থান নির্মাণ করা হয়। ১৩৬২ সালে এটি প্রথমে টালির ঘর করে মায়ের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পরে বারুইপুর নিবাসী কার্তিক দত্ত ও দাদা নগেন দত্ত এই মন্দিরের অনেকাংশ তৈরি করে দিয়েছেন বলে জানা যায়। নতুন থানটির জমির পরিমাণ ৫–৬ কাঠার মত। একটি পাথরের ফলকে লেখা আছে, 'যদুনাথ পালের পুত্র ডাঃ নরেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক মন্দির স্থাপিত হইল'। (সাক্ষাৎকার ঃ ভদু পাল, ক্ষীরমণি পাল, কুঞ্জ পাল ও মানিক পাল, সুধীরকুমার চক্রবর্তী ও ভরতকুমার সান্যাল)।

লোকসমাজের বিশ্বাস দেবীশীতলা বসন্ত ও কলেরারোগের দেবী। এছাড়া কামলা, গলগণ্ড, কোরণ্ড, সান্নিপাত, পীলে, ফোঁড়া, বাত, উদরী প্রভৃতি চৌষট্টি ব্যাধি তাঁর আজ্ঞাবহ। এই সমস্ত মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্তির জন্য বাংলার মানুষ দেবীশীতলাকে রোগ নিরাময়ী শক্তিরূপে কল্পনা করে পূজা করেন। কেবল বাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই দেবীর পূজার্চনা পালিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে দেবী শীতলাম্মা নামে পূজিতা হন। তামিলনাড়ুতে দেবী মারীয়াম্মান নামে পরিচিতা।

প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে দেবীশীতলার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পিচ্ছিলাতন্ত্র ও স্তবকবচমালায় দেবীর ধ্যানমন্ত্র আছে, যার সাথে ময়ূরভঞ্জের ধর্মের মন্দিরে খোদিত শীতলামূর্তির সাদৃশ্য আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠাদেবীর মাহাত্ম্যে দেবীকে বিঘ্নসৃষ্টিকারী অলক্ষ্মী বলা হয়েছে, তাঁর অস্ত্র ঝাঁটা ও বাহন গাধা। নেপালের বহু ধর্মচৈত্যে শীতলার মূর্তি আছে বলে জানা যায়। এছাড়া বিক্রমপুরে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর মূর্তির সাথে বসন্তরোগ ও গাধার অস্তিত্ব থাকায় অনেকে পর্ণশবরী ও শীতলা একই বলে মন্তব্য করেছেন। পর্ণশবরী হলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী। বৌদ্ধ হারিতীর সাথে শীতলাদেবীর সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

বাংলায় শীতলাদেবীর তিনপ্রকার পূজার প্রচলন আছে। যথা – ক) নিত্যপূজা, ২) সাপ্তাহিক পূজা ও ৩) বাৎসরিক পূজা । সাপ্তাহিক পূজা শনি ও মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক পূজার দিন অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে নতুবা স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট হয়। পূজা উপলক্ষে দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পালাগান গাওয়া হয়। পালাগায়কগণ দেবীর পালাগানের মধ্য দিয়ে পূজাচারের নিয়মনীতি প্রকাশ করেন। দেবীর পূজার দিন অথবা পূর্ব হতে ব্রতিনীগণ উপবাসে থেকে মাগুন করেন ও মাগুনের চালপয়সায় দেবীর পূজা দেন। এই পূজাকে স্থানীয় ভাবে দেশপালা পূজাও বলা হয়। পূজার দিন গরম কিছু খওয়া হয় না, পান্তাভাত খাওয়া হয়। পূজায় হাঁস, ছাগল, বলি দেওয়া হয়, ভক্তগণ কেহ গণ্ডি কাটেন, কেহ বুকচিরে রক্ত মায়ের পায়ে দেন। ব্রাহ্মণ দেবীর প্রধান পূজারী। বাংলায় বিশেষত চব্বিশপরগণা জেলাতে দেবীর পালাগায়কের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চলে দেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক বহুল প্রচলিত পালাগানগুলি হল –

১) শ্রী শ্রী ঁ শীতলা মাহাত্ম্য – রচয়িতা – দ্বিজপদ মণ্ডল (সীতাকুণ্ডু),

২) শীতলার গান – দ্বিজমাধব ও নিত্যানন্দ,

৩) রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্রপালা – সুদিন মণ্ডল (বেগমপুর),

৪) শীতলামঙ্গল (লোকনাট্যের ধারা) – গোষ্ঠ মণ্ডল (আটঘরা),

৫) শীতলামঙ্গল (লোকনাট্যের ধারা) – দীপক মণ্ডল (ধোপাগাছি),

এই সমস্ত পালাগানের উল্লেখযোগ্য পালাগায়ক হলেন – নিতাই ছাটুই, কলমুদ্দিন গায়েন, দীপক মণ্ডল, সুদিন মণ্ডল, গোষ্ঠ মণ্ডল, অনিল হাজরা প্রমুখ। এঁরা সবাই চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার বাসিন্দা।

দেবীশীতলা হামবসন্তের দেবীরূপে মান্য হলেও ভক্তগণ দেবীর নিকট আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক সমস্তরকম দুঃখকষ্ট প্রতিকারের জন্য মানত করেন। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে দেবীর নিকট গানপূজা ও বিবিধ সংস্কার পালনের মাধ্যমে মানত চুকোন।

লোকদেবতা ঃ দেবীষষ্ঠী

বারুইপুর থানার বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন দেবীষষ্ঠী। এই অঞ্চলে পারিবারিক জীবনে দেবীলক্ষ্মীর ন্যায় ষষ্ঠীর পূজা সংক্রান্ত আচার-আচরণ পালিত হয়। দেবীষষ্ঠী সন্তানদাত্রী, শিশুদিগের প্রতিপালনকারিনী ও ত্রিভুবনধাত্রী দেবী। তাঁর কৃপায় সন্তানহীনা সন্তানলাভ করেন ও সন্তানাদি সুস্থ থাকে বলে লোকবিশ্বাস। মহিলাগণ বারমাস ষষ্ঠী সংক্রান্ত নানা বারব্রতাদি পালন করেন। যেমন – বৈশাখমাসে চন্দনষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়মাসে কার্দমীষষ্ঠী, শ্রাবণমাসে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে চপেটীষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকমাসে নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূলাষষ্ঠী, পৌষমাসে অন্নষষ্ঠী, মাঘমাসে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনমাসে গোরূপিণী ষষ্ঠী ও চৈত্রমাসে অশোকষষ্ঠী। এছাড়া সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করলে ষষ্ঠীপূজা সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

পুরাণাদিতে দেবীষষ্ঠীর নানা পরিচয় পাঠ করা যায়। যেমন – স্কন্দপুরাণে দেবী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপা, কার্তিকেয় ভার্যা, মাতৃকা বিশেষ। মহাভারতে মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধের বিবরণে জানা যায়, ষষ্ঠী জরারাক্ষসীর নামান্তর। ইনি গৃহস্থের গৃহে ভ্রমণ করতেন বলে ব্রহ্মা তাঁর নাম দিয়েছেন 'গৃহদেবী'। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেবীষষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে। সেখানে ষষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে, মূল প্রকৃতির অংশে দেবীর জন্ম। মাতৃকাগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা। তাঁকে পূজার্চনা করলে পুত্র-পৌত্র, ধনসম্পদ ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃন্দাবন দাসের 'ভাগবত', মুকুন্দরাম দাসের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ আছে।

দেবীষষ্ঠীর দ্বিবিধ পূজার প্রচলন আছে। যথা– ১) দেবীর দিব্যমূর্তি পূজা, ২) দেবীর নুড়ি-শিলা পূজা। দেবীর দিব্যমূর্তি অতি সুশ্রী। তাঁর বাহন বিড়াল। বিড়াল কোথাও সাদা কোথাও কালো দৃষ্ট হয়। দেবীর ক্রোড়ে শিশুসন্তান। দেবীর দুই হাত, প্রাচীন স্থাপত্যে দেবীর চার হাত দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেবী হারিতীর সাথে দেবীষষ্ঠীর সাদৃশ্যের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করেছেন। হারিতীর শিশু অনিষ্টকারী গুণটিও ষষ্ঠীতে আরোপিত হয়েছে। দেবী ষষ্ঠীর মূর্তিপূজা অপেক্ষা নুড়িশিলা পূজা অধিক দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি হিন্দুগৃহে দেবস্থানে ষষ্ঠীর নুড়িশিলা আছে।

পুরাণাদিতে দেবীষষ্ঠীর বিবিধ পরিচয় আছে, কিন্তু বাংলার লোকসমাজে সম্পূর্ণ লৌকিক ধারায় এই দেবীর বারব্রতাদি পালিত হয়। সন্তানাদি সংসারের সুখসমৃদ্ধির আকর। বিবাহিত জীবনে সন্তান না-হওয়া ও সন্তান হলে তাকে রোগব্যাধির কবল থেকে বাঁচান, একসময় বাঙালী পিতামাতার নিকট ছিল প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই লোকদেবী ষষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। এই অঞ্চলের লোকসমাজ দেবীষষ্ঠীকে মহামায়ার অংশবিশেষ বলে

মনে করেন। মহামায়া দেবীদুর্গার সন্তানসৌভাগ্য দানের গুণটি দেবীষষ্ঠীর উপর আরোপিত হয়েছে। সেকারণে বারমাসে পালিত ষষ্ঠীর ব্রতাদির সাথে আশ্বিনের দুর্গাষষ্ঠী ও চৈত্রের অশোকষষ্ঠী ব্রতিনীদিগের নিকট মাহাত্ম্যগত বিচারে এক ও অভিন্নরূপে বিবেচিত হয়, কেবল সংস্কার পালনের কিছু ব্যতিক্রম থাকে। দেবীষষ্ঠীর মাহাত্ম্যপ্রচুর কেন্দ্রিক সমস্ত পালাগানের মধ্যে দেবীর সন্তানহীনার সন্তানদান ও সন্তানরক্ষার গুণটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লোকদেবতা ঃ সীতেমা ও দেওয়ানগাজী

বারুইপুর থানার এক বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন সীতেমা। সীতাকুণ্ডু ও আটঘরা গ্রামের সীমানায় সীতাকুণ্ডু-মদারাট পাকা সড়কের পাশেই থানটি অবস্থিত। এই থানের পূর্বদিকে আছে ফাঁসিডাঙ্গা, শূলিপোতা, পশ্চিমদিকে – দমদমা ঢিপি, দক্ষিণদিকে দেওয়ানগাজীর মাজার। সীতেমার থানের সামনে প্রায় চারবিঘের মত স্থান জুড়ে একটি পুকুর আছে। এটি 'সীতেমার পুকুর' নামে খ্যাত। পুকুরের দক্ষিণপূর্বে পাল-সেনযুগের (?) পুরাকীর্তির উপর দেওয়ানগাজীর মাজার আছে। সীতেমার পুকুরের পূর্বদিকে অজ্ঞাত কোন এক রাজা, জমিদার বা শ্রেষ্ঠীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্তমানে যেখানে সীতাকুণ্ডু হাই ও প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠেছে, এই স্কুলের মাঠটি আজও ঘোড়াশালা বলে কথিত হয়। সীতেমার থানের পশ্চিমদিকে 'দমদমা' (উঁচু ঢিপি)-এর কাছে প্রাচীন গড়ের প্রাচীর আছে। এই থানের আশেপাশে অনেক দীঘি আছে। এগুলির প্রাচীন নাম পাত্রপুকুর, পদ্মপুকুর, চালধোওয়াপুকুর; নিরামিষপুকুর ইত্যাদি। এইসব পুকুর ও এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদি, মূর্তি, মুদ্রা পাওয়া গেছে। সীতেমায়ের পুকুর থেকে শিশুপাল রাজার নাম খোদাই করা একটি আংটি পাওয়া গেছে বলে স্থানীয়ভাবে কথিত হয়। তবে এইরূপ নিদর্শন ক্ষেত্রগবেষণায় দেখা যায়নি। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে জীবনকুণ্ড ও মরণকুণ্ড নামে লোককথার পুকুর আছে, যা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেহ কেহ বলেন, সীতেমার পুকুরটিই জীবনকুণ্ড যার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মরণকুণ্ড বা নলকুণ্ডর কোন অস্তিত্ব নেই। সীতেমার থানের পিছন থেকে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত ছিরেজাঙাল-এর লুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব এখনও বর্তমান আছে।

সীতেমার বর্তমান থানটি একটি ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের উপর নতুনের প্রক্ষেপযুক্ত । এখানে একটি টালির চালযুক্ত ইটের ঘর এবং ঘরের মধ্যে বিরল কয়েকটি প্রত্নবস্তু দেবতারূপে পূজিত হয়। যেমন– গণেশমূর্তি, পাথরের নৃসিংহমূর্তির আদিরূপ, পাথরের গায়ে খোদিত বিরল প্রজাতির চতুষ্পদ প্রাণীর মূর্তি (ডঃ কালিচরণ কর্মকার একে সিন্ধুঘোটক বলেছেন) শালগ্রামশিলা ও ভক্তদের দেওয়া রামসীতার মাটির ছলন ইত্যাদি। প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী শিবচতুর্দশী, বিপত্তারিণী ব্রতের দিন এখানে যাত্রী সমাগম হয়। বৈশাখমাসের সীতানবমীর তিথিতেই বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। পূজানুষ্ঠানের দিন ছাগাদি বলির ব্যবস্থা থাকে।

সীতেমা অতি জাগ্রত এক লোকদেবতা। এই দেবীর কৃপায় সন্তানহীনা সন্তানলাভ করেন, মৃতবৎসার সন্তান দীর্ঘজীবন পায় অর্থাৎ 'মড়াঞ্চেদোষ' কেটে যায়, বন্ধ্যা গাভীর বাচ্চা হয়। আমকাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষে ফল বাঁধে। এ সবই সম্ভব হয় মায়ের পুকুরের জলের গুণে।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শনি ও মঙ্গলবার মায়ের পুকুরের জল 'মনশোভা' নিয়ে ব্যবহার করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে লোকবিশ্বাস। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ভক্তগণ মায়ের থানে এসে বিভিন্ন উপচারে পূজা দেন, গণ্ডি কাটেন ও মায়ের পুকুরে স্নান করে সর্বব্যাধিমুক্ত হন। মায়ের নামে ভক্তগণ 'দেশপালা মাঙন' করেন। মাঙনকারী মাঙনে প্রাপ্ত চালপয়সাদির একটি অংশ সীতেমায়ের থানে পূজা দেন এবং আর একটি অংশ দেওয়ানগাজীর থানে পূজার জন্য রাখেন। ভক্তগণ দেওয়ানগাজীর ও সীতেমায়ের মধ্যে মাহাত্ম্যগত তারতম্য করেন না। সংসারে সার্বিক উন্নতি, রোগব্যাধি হতে মুক্তি, গৃহপালিত পশুর সুস্থতা ও ভাল ফসল ইত্যাদি কামনা করে এই দুই লোকদেবতার পূজা দেন। দেওয়ানগাজী ও সীতেমা হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির প্রতীকরূপে বিবেচিত হয়।

সীতেমায়ের নামে অনেক সম্পত্তির কথা সেবাইতের নিকট হতে জানা যায়। সীতেমায়ের সেবাইত শ্রীমতী দুর্গা ব্যানার্জী (১/১১/১৯৯১) এক সাক্ষাৎকারে জানান,মায়ের নামে ৭-৮ বিঘা জমি মন্দির সংলগ্ন আছে, যা সম্পূর্ণ বেদখল। এছাড়া রামনগরের ভুঞ্জুবাবু সীতেমায়ের নামে তেত্রিশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন। এটি শুভ দত্ত, অমর দত্ত, দেবনাথ দত্ত প্রমুখ দত্তদের তালুক ছিল বলে দুর্গাদেবী জানান। বর্তমানে কোন সম্পত্তির আয় এ মন্দিরে আসে না। ভক্তদের দেওয়া সাহায্য থেকে মন্দিরের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয় বলে জানা যায়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, সীতেমার থান সীতাকুণ্ডু গ্রামের শেষসীমায় অবস্থিত। 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ বৃহৎ জলাশয়। বৃহৎ হ্রদের মত জলাশয়কে কুণ্ড বলে। যেমন বিহারের সরস্বতী কুণ্ডী (বিভূতিভূষণের লেখা সরস্বতী কুণ্ডীর রূপমায়া) । আবার 'হাঁদ' শব্দের অর্থ হ্রদের ন্যায় বিশাল জলাশয়। সীতেকুণ্ডর নিকট (সীতেমার পুকুর) হাঁদ নামে নিচু একটি স্থান অদ্যাপি আছে। সুদূর অতীতে এই হাঁদের একটি অংশ বাঁধ দিয়ে সীতেমায়ের নামে জীবনকুণ্ড ও মরণকুণ্ডু নামের দুটি পৃথক লোককথার জলাশয় হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে এই জলাশয়টি আদিগঙ্গার স্রোতের একটি অংশ। ডঃ কালিচরণ কর্মকার উল্লেখ করেছেন, আটঘরার নিকটবর্তী ফর্দা বা ফর্দী আদিগঙ্গার একটি মজা স্রোত (মৌনমুখর)। সুতরাং সীতেমার থান ও দেয়ানগাজীর থান আদিগঙ্গার তীরবর্তী বলেই বিবেচিত হয়।

লোকদেবী সীতেমার উৎস ও তাৎপর্য নিয়ে লোককথায় নানা তথ্য লাভ কার যায়। যেমন - সীতেমা হলেন রামঘরনী সীতামা। এই দেবীর নামানুসারে সীতাকুণ্ডু গ্রামের নামকরণ হয়েছে। এখানে সীতাদেবীর পূজা করা হয়। আর একটি মত হল, সীতা হলেন কোন এক রাজার কন্যা। দেওয়ানগাজীর সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে সীতেমার থানের সামনের পুকুরটি সীতাকুণ্ডু হয়েছে। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, ঐ রাজা যশোহরের রাজা রামচন্দ্র খাঁ হওয়া সম্ভব। এই দেবী সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত কথা হল, ইনি একজন লোকদেবী । কোন এক শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরে রামনগরের ভুঞ্জুবাবুর নিকট হতে শাঁখার দাম নিতে বলেন। শাঁখারী ভুঞ্জুবাবুর নিকট দাম চাইতে গেলে ভুঞ্জুবাবু কে শাঁখা পরেছে তা দেখতে সীতেকুণ্ডুর নিকট এলে মা পুকুরের মাঝখান থেকে হাত উঁচু করে দেখান। সেই থেকে এখানে সীতেমায়ের পূজা হয়।

সীতেমার উৎসসন্ধানে উল্লিখিত লোককথাসমূহের মধ্যে শেষ লোককথাটি সিদ্ধান্ত সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। এই দেবীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যে মত পোষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলে রামসীতা উপাসনার কোন চল নেই এবং রামকেন্দ্রিক কোন সংস্কার পালিত হয় না। সুতরাং ইনি সীতামা নন তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। প্রকৃত তাৎপর্যে এই দেবী হলেন সতীমা। দক্ষকন্যা সতীমা শিবঘরনী সতীরূপে বাঙালীর ঘরে পূজ্যা। স্থানীয়ভাবে সতীমাকে 'সীতেমা' বলা হয়। মায়ের সামনের পুকুরের নাম সীতেমার পুকুর ও থানকে সীতেমার থান বলা হয়। 'সীতাকুণ্ডু' গ্রামনামের অন্তরালে সীতেমা বা সতীমায়ের নাম মহিমা থাকা সম্ভব, রামায়ণের রামঘরনী সীতাদেবী নন।

আর একটি বিবেচ্য বিষয় হল পূর্বভারত শক্তিক্ষেত্র। এখানে শক্তির বিভিন্ন নামে তীর্থক্ষেত্র আছে। সীতেমার থান এমনই একটি বিস্মৃত তীর্থক্ষেত্র। বহুকাল পূর্বে এখানকার সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। ফলে সীতেমার স্থানমহিমাও ধ্বংস হয়েছে। গঙ্গানদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় মধ্যযুগের মঙ্গলকবিদের কাব্যেও এই থানের মহিমা ধরা পড়েনি। অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতে এই স্থানটি 'সতীকুণ্ড' নামে একটি শক্তিক্ষেত্র ছিল। আঞ্চলিকতার প্রভাবে লোককথায় তা সীতেকুণ্ড নামে প্রচলিত আছে। সীতেমায়ের থানের পার্শ্ববর্তী মুসলিমপ্রধান গ্রামটির নাম 'সীতাকুণ্ড', এটি সতীমায়ের প্রভাবপ্রসূত এবং তথাকথিত শিক্ষিতগণের দেওয়া নাম। অতএব সীতাকুণ্ডু গ্রামনাম থেকে দেবীসীতেমার থানটি সীতামার থান হওয়া সম্ভব নয়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, সতীমায়ের থানের দক্ষিণদিকে দেওয়ানগাজীর থান অবস্থিত। এটির চারিদিকে পাল ও সেন যুগের ইট কবর খুঁড়তে গিয়ে উঠে আসছে। দেওয়ানগাজীর থানটি শিবমন্দিরের আদলে নির্মিত এবং এটির পশ্চিমদ্বার নয়, দক্ষিণদ্বার। ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকের দিকে এখানে একজন ফকির দীর্ঘদিন ছোট একটি কুঁড়েঘর করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। তিনি মারা গেলে তাঁর মৃতদেহটি এই থানের মধ্যে কবর দিয়ে দেওয়ানগাজীর মাজার নামে প্রচার করা হয়। 'মাজার' শব্দটির অর্থ সমাধিক্ষেত্র। (সাক্ষাৎকার ঃ মতিউর রহমান, সীতাকুণ্ডু) সুতরাং দেওয়ান গাজীর থানের মাঝে সমাধিটি অর্বাচীন কালের। অথচ দেওয়ানগাজীর মাজারের ইট পাল-সেন যুগের যা বাহ্যিক প্রলেপে বর্তমানে বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফার্সী ভাষায় খাজনা আদায়কারীকে দেওয়ান বলে, আবার প্রাচীন তামিল ভাষায় 'দেবন' শব্দের অর্থ শিব। 'দেবন' শব্দ থেকে দেওয়ন বা দেয়ান শব্দের উৎপত্তি ধরা যায়। (Migration Theory অনুযায়ী সমুদ্রোপকূলবর্তী পশ্চিমবাংলায় তামিল প্রভাব স্বীকৃত) এই অঞ্চলে ইসলামীকরণের সময় 'দেবন' শব্দের সাথে 'গাজী' শব্দটি যুক্ত হয়ে দেবনগাজী বা দেওয়ানগাজী নামক এক সুফীসাধকের ভাবমূর্তি আরোপিত হয়েছে। অতএব দেওয়ানগাজীর মাজার বা থানটির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সাপেক্ষ।

ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আরও জানা যায় মহিলাগণ 'দেশপালা মাগুন' করে মাগুনের

চালপয়সায় সীতেমা ও দেওয়ানগাজীর থানে পূজা দেন। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু মহিলাগণ এইরূপ সংস্কার পালনে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত শক্তিক্ষেত্রের পাশে শিবমন্দির প্রত্যক্ষ করা যায়। মহিলাগণ শক্তির থানে পুজো দিয়ে শিবের থানে পুজো দেন। সেই সংস্কার এখানেও শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। সীতেমার থানে 'পুজো' দেওয়া হয়, দেওয়ানগাজীর থানে 'হাজত' দেওয়া হয়। শিব ও শক্তি সম্পর্কিত Ritual belief এখানে প্রত্যক্ষ করা যায় । তাছাড়া সীতেমায়ের শাঁখাপরার কাহিনীটি দুর্গার শাঁখা পরার কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং সীতেমার থানটিকে লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক বিচারে কোনমতেই সীতামার থান বলা যায় না। এটি প্রকৃত তাৎপর্যে সতীমার থান, লৌকিকভাবে সীতেমার থান বলা হয়। সীতেমার থান বর্তমানে একটি ঐতিহ্যময় শাক্তপীঠের অবশেষ বলে অনুমিত হয়। অবশ্য এব্যাপারে ঐতিহাসিক ও লোকসংস্কৃতিগত গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসমর্থিত ও অনুসন্ধান সাপেক্ষ একটি সূত্র হতে জানা যায় যে, চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডু নামে একটি স্থান আছে। এখানে সীতামায়ের একটি মন্দির আছে। চাক্‌মা আদিবাসী মহিলা এই মন্দিরের সেবাইত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু টেম্পলস অফ বাংলাদেশ' গ্রন্থে এই মন্দিরের পরিচয় আছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু থেকে কয়েকটি মুসলমান পরিবার বারুইপুরের সীতাকুণ্ডু গ্রামে এসে বসবাস করেন। তাঁদের দেওয়া নাম হল 'সীতাকুণ্ডু' নামক গ্রাম।

লোকদেবতা ঃ দক্ষিণরায়

বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধপধপি গ্রামের এক বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন দক্ষিণরায়। এমন সুশ্রী লোকদেবতার মূর্তি কমই দেখা যায়। দেবতার সেনাপতি সাজ, উঁচুবেদীর উপর এক হাঁটুমুড়ে অপর হাঁটু সামনে রেখে বসে আছেন। দীর্ঘ ও বিশাল দুটি চোখ দূরে কাউকে যেন নিরীক্ষণ করছে বা ক্রোধাগ্নি ঠিকরে বেরুচ্ছে। দেবতার হাতে বন্দুক, কোমরে তরবার, পায়ে নাগরা জুতো, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মোজা, গায়ে বর্ম আকৃতির কালো জ্যাকেট, আঁটোসাঁটো কাপড়-পরা। দেবতার মূর্তির পিছনে দেওয়ালে আটকানো তূণ, তীরধনুক, কুঠার, ঢাল ও ত্রিশূল আছে। দেবতার সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা, একজোড়া খড়ম, তুলাদণ্ডের ন্যায় ঝোলান ঝাবি, একটি চামর, পাথরের পদচিহ্ন, শিবলিঙ্গ, দামোদর, গণেশ, শক্তি প্রভৃতি মূর্তি আছে। দক্ষিণরায়ের অঙ্গে বিভিন্ন অলংকার, যথা– হাতে আংটি, কানে রূপার ধুতুরা, রুপার পদক, মাথায় উঁচু চূড়া আছে। দক্ষিণরায়ের এইরূপ মূর্তি দেখে অধিকাংশ লোকসংস্কৃতিবিদ বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে, মনে হয়। কেহ বলেন ইনি বাঘের দেবতা, কেহ বলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। আবার কেহ বলেন ইনি মুকুট রাজার সেনাপতি।

ধপধপির দক্ষিণরায়ের নিত্য পূজা হয়। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার জাঁকজমক করে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়। প্রতিবছর ১লা মাঘ দক্ষিণরায়ের অঙ্গরাগ ও 'জাঁতালপূজা' অনুষ্ঠিত হয়। এটাই এই দেবতার বাৎসরিক পূজা। পূজার দিন ছাগবলি হয়। ভক্তগণ হাঁসা হাঁস বাবার - কাছে ছেড়ে দেন; গণ্ডি কাটা, হাতে মাথায় ধুনো পোড়ানো প্রভৃতি অনেক প্রকার মানুতে

সংস্কার পালন করেন। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে গাজনের অনুরূপ বাতি দেওয়া, আগুনঝাঁপ, ঝাঁপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হয়। দেবতাও বড় 'জাগ্রত'। দেবতার কৃপায় দেহারোগ্য, মেয়ের বিয়ে,ছেলের চাকুরী, ভাল শস্য, বন্ধ্যানারীর পুত্রলাভ ইত্যাদি ইহলৌকিক প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে থাকে। দক্ষিণরায়ের কৃপায় প্রধানত বাতবেদনা, চক্ষুরোগ, যে কোন চর্মরোগ সেরে যায়, এমত লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

দক্ষিণরায়ের বর্তমান সেবাইতগণ উদ্ধব পণ্ডিতের বংশধর। এঁরাই মন্দিরের পূজার্চনা, যাত্রীদের ওষুধপত্র দেওয়া , মন্দিরের উন্নয়ন প্রভৃতি সকল দিক দেখাশুনো করেন। বর্তমানে যাঁদের যে বৎসর বাৎসরিক পূজার পালা পড়ে তাঁরাই ১লা মাঘ জাঁতালের মধ্যরাতে পূজা করেন। আনুমানিক ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে এক লাল কাপড়-পরা কাপালিক রাত ২টার পর জাতাল পূজা করতেন। পূজায় অসংখ্য পশুবলি হত ও স্ত্রী/পুরুষ নেশার ঘোরে বুঁদ হতেন। বর্তমানে এসব হয় না।

বর্তমান গবেষক কর্তৃক প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধান ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের Contextual Theory পূর্বসূত্রের সাথে আবদ্ধ তত্ত্বঅনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে আদিতে এই থানটি ছিল দক্ষিণরায় নামক ধর্মঠাকুরের থান । এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা করা হত। রাঢ়অঞ্চলে 'রায়' পদবীযুক্ত প্রতিটি ধর্মশিলা ধর্মঠাকুররূপেই পূজিত হয় এবং আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত থানগুলি অবস্থিত। বাঁকুড়ারায়, কালুরায়, মেঘরায়, চাঁদরায়, ক্ষুদিরায়, সুন্দররায়, বুড়ারায়, জগৎরায়, দলুরায় প্রভৃতি ধর্মশিলার 'রায়'যুক্ত নামের সাথে দক্ষিণরায় নামটি বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং নাম সাদৃশ্যে দক্ষিণরায় ধর্মঠাকুরের একটি নাম তা বলা যায়।

ধপধপি গ্রামে বর্তমানে দক্ষিণরায়ের জাঁদরেল মূর্তি পূজিত হয়। অতীতে এইরূপ মূর্তি পূজিত হত না বলে জানা যায়। প্রথমে এখানে এবড়োখেবড়ো পাথরের একটি টুকরো দক্ষিণরায় নামে পূজা করা হত। দক্ষিণরায়ের মূল মন্দিরের বাইরে অদ্যাপি এটি পূজিত হয়। জাঁতালপূজার দিন এই থানে প্রথম পূজা হয় তারপর মূল মন্দিরে পূজা হয়। পূর্বে বাওয়ালীগণ এই পাথরকে পূজা দিয়ে জঙ্গলে কাঠ, মধু সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করতেন। ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ধপধপি নামক গ্রামটি অতীতে সুন্দরবনের একটি অংশ ছিল। তখন এর নাম ছিল ভর্তৃমারীর জঙ্গল। সাধারণভাবে একে ভাতারমারীর জঙ্গল বলা হত। পরবর্তিকালে এই অঞ্চলে লোকবসতি গড়ে উঠলে ভিক্ষুতাড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। কোন সময় থেকে এই অঞ্চলের নাম ধপধপি হয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। আদিতে এই থানের পাশ দিয়ে যে পথ ছিল সেটি এই অঞ্চলের সুন্দরবনে প্রবেশের অন্যতম পথ বলে কথিত হয়। জলে জঙ্গলে রক্ষাকারী দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। সুতরাং ধপধপির দক্ষিণরায় হলেন ধর্মঠাকুরের নামান্তর।

ধপধপির দক্ষিণরায়ের মূর্তির সামনে কতকগুলি কল্পিত দেবতার প্রতীক অদ্যাপি পূজিত হয়। যেমন – পাথরের যুগ্ম পদচিহ্ন, যা সামনের পুকুর থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। একজোড়া কাঠের খড়ম যাকে দক্ষিণরায়ের পাদুকা বলা হয়। বড়ডিমের আকারের

শ্বেতপাথরের নুড়ি, যা দেমোর মাঠের নিকট ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে বলে কথিত হয়। এছাড়া শক্তিমূর্তি, কূর্মশিলা, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পূজিত হয়। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে পূজার প্রচলন আছে সেখানে সাদা বা কালো দুই ধরনের নুড়িশিলা পূজিত হয়। ধর্মশিলার পাশে থাকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, শীতলা, মনসা, গঙ্গা প্রভৃতি লোকদেবতার প্রতীক নুড়িশিলা। বারুইপুর থানার অন্তর্গত নড়িদানা গ্রামে ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও ধর্মশিলার পাশে উল্লিখিত দেবতার প্রতীক পূজিত হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন। ধর্মপূজার পুরোহিতেরা তাঁদের গলায় একখণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা ঝুলিয়ে রাখেন (বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৪৮৬) । আবার রাঢ়অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের হাতিয়ার রূপে গদা,তীর, ধনুক, কুঠার ইত্যাদি পূজা করা হয়। বীরভূমের বাতিকার (ইলামবাজার) গ্রামে গাছতলায় ধর্মঠাকুরের পূজাস্থানে নব্যপ্রস্তরযুগের ডজনখানেক হাতকুঠার আছে বলে জানা যায়। ধপধপির দক্ষিণরায়ের হাতিয়ার হিসাবে বল্লম, ঢাল, তলোয়ার, তীরধনুক ও কুঠার প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলি দক্ষিণরায়ের মূর্তির পিছনে দেওয়ালে আটকান আছে। অনেক সময় ভক্তগণ এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মানত চুকোয়। (বর্তমানে দক্ষিণরায়ের হাতে একটি বন্দুক (এয়ারগান) আছে, পূর্বে একটি গাদা বন্দুক ছিল)। কুঠার ধর্মঠাকুরের হাতিয়ার হিসাবে কল্পনা করা হয়। আবার দক্ষিণরায়ের হাতিয়ারের মধ্যে কুঠার বিদ্যমান থাকায় উভয় দেবতার অভিন্নতা প্রকাশ করে।

দক্ষিণরায়ের অতীত সম্পর্কিত তথ্য দক্ষিণরায়ের স্বরূপ উদঘাটনের সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করেছি, উদ্ধব পণ্ডিতের বংশধরগণ বর্তমানে এই মন্দিরের সেবাইত। উদ্ধব পণ্ডিত এসেছিলেন নদীয়ার হরিণঘাটার নৌপালা গ্রাম থেকে। ইনি নৌকাযোগে সূর্যপুর শ্মশানঘাটে এসে ডোমেদের সাথে থেকে মড়াপোড়ানোর কাজ করতেন। পরে দক্ষিণরায়ের থানে সেবার দায়িত্ব পেলেও তাঁকে 'মুড়িপোড়া ব্রাহ্মণ' বলা হত। অদ্যাপি এঁর উত্তরসূরিগণ 'পতিতব্রাহ্মণ' বলে স্থানীয় ভাবে পরিচিত। বারুইপুরের চৌধুরীবাবুগণ (মদন রায়চৌধুরী ?) উদ্ধব পণ্ডিতকে এই মন্দিরের সেবার দায়িত্ব দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নড়িদানা গ্রামের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে সেবাইতগণও পণ্ডিত পদবীযুক্ত। এঁরা যুগী সম্প্রদায়ের মানুষ। বর্তমানে পদবী পরিবর্তন করে ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করলেও ঐ বংশের কোন কোন পরিবার পণ্ডিত পদবী বহন করে চলেছেন। এঁদের পূর্বপুরুষকে চন্দননগর থেকে আনয়ন করে ধর্মমন্দিরের সেবার দায়িত্ব চৌধুরীবাবুরা দিয়েছিলেন এবং নিষ্কর ভূমিদান করেছিলেন। উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, নড়িদানা ধর্মঠাকুরের থান ও দক্ষিণরায় থানের সেবাইতগণের পূর্বপুরুষ রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। ডোম, যুগী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবক। অতএব দক্ষিণরায় নামক লোকদেবতা প্রকৃত অর্থে ধর্মঠাকুর এবং এই থানের সেবার দায়িত্ব উদ্ধব পণ্ডিত শ্মশানকর্মী বলেই পেয়েছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। পাথরপ্রতিমা থানার ১৮ নং লাটের ঘেরিয়াপুর গ্রামের (গান্ধীনগর) দক্ষিণরায়ের সেবাইত ও মথুরাপুর থানার বটীশ্বর গ্রামের দক্ষিণরায়ের সেবাইতগণ উদ্ধব পণ্ডিতেরই বংশধর। পারিবারিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণরায়ের মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করে পূজা করেন। বাসন্তী থানার জয়গোপাল গ্রামে ধপধপির দক্ষিণরায়ের আদলে মূর্তি নির্মাণ করে

চিন্তামণি হালদার দক্ষিণরায় নাম দিয়ে পূজা করেন। তিনি ধপধপি থেকে ওষুধ নিয়ে যাত্রীদের দেন। বলাবাহুল্য চিন্তামণি হালদার মৌখালি গ্রামের আদি বাসিন্দা, বর্তমানে জয়গোপালপুর গ্রামে বাস করছেন।

ধপধপির দক্ষিণরায়ের পূজার প্রাচীনত্ব কিংবদন্তী অনুযায়ী ২৫০-৩০০ বৎসর-এর মধ্যে। কথিত আছে, রাজপুরের জমিদার মদন রায়চৌধুরীর মায়ের ইচ্ছাতে এখানে দক্ষিণরায়ের থানের সংস্কার করা হয়। মদন রায়চৌধুরীর সময়কাল আনুমানিক ১৭শ শতকের শেষ দশক। এই থানে প্রথমে এবড়োখেবড়ো শিলায় দক্ষিণরায়ের পূজা করা হত। (অশোক মিত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, পৃঃ ১৬৩) তারপর দেমোর মাঠের নিকট ষষ্ঠীতলার ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত বড় ডিম্বাকৃতি নুড়িশিলা এই থানে ঠাঁই পায়। (অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুদক্ষিণা, ১৪০১, পৃ.৪০) তখন ছিল আটচালা ঘর। তারপর এই আটচালা ঘরেই উদ্ধব পণ্ডিত খড় মাটি দিয়ে বিশালাকার দণ্ডায়মান ঘোটকবাহন জাঁদরেল মূর্তিগড়ে পূজা করেন। তারপর উদ্ধব পণ্ডিতের ৪র্থ পুরুষ হারানচন্দ্র চক্রবর্তী দক্ষিণরায়ের মূল মন্দিরটি পাকাপাকি ভাবে তৈরি করান। ১৯০৯ সালে মণিমোহন চক্রবর্তীর উদযোগে নাটমন্দিরটি এবং বর্তমান জানুভঙ্গ জাঁদরেল মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। অদ্যাবধি সেই মূর্তিই পূজিত হয়। সুতরাং প্রাচীনত্বের বিচারে দক্ষিণরায়ের মূর্তি অর্বাচীন কালের। এই মূর্তি দেখে দক্ষিণরায়ের প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটন সম্ভব নয়।

ধপধপির লোকদেবতা দক্ষিণরায়ের থান আবিষ্কৃত হয় এই অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করার সময়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায় এই থানের প্রথম সেবাইত ছিলেন কালাচাঁদ চক্রবর্তী নামক দাক্ষিণাত্যের এক বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁর পৌত্র হলেন দক্ষিণরায়ের পালাগায়ক হীরালাল চক্রবর্তী। কথিত আছে নিষ্ঠাবান কালাচাঁদ চক্রবর্তী দক্ষিণরায়কে নিরামিষ উপচারে পূজা দিতেন, কিন্তু বাবার স্বপ্নাদেশ হয়– আমিষ, মদ ও মাংস, শোলমাছ পোড়া, লাউ, কাঁকড়ায় পূজা দেওয়ার জন্য। বাবার এই স্বপ্নাদেশ হওয়া সত্ত্বেও নিরামিষাশী কালাচাঁদ চক্রবর্তী আমিষ পূজা দিতে রাজী হননি। তারপর চৌধুরীবাবুরা উদ্ধব পণ্ডিতকে পূজার দায়িত্ব দেন। সুতরাং মদ-মাংস, শোলমাছ পোড়া ইত্যাদি উপাচার সহযোগে মধ্যযুগে ধর্মঠাকুরের পূজার বিধান আছে বলে জানা যায়। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৪৮৬)। আবার শ্মশানকর্মী কর্তৃক দেবতার পূজার বিধান ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব দক্ষিণরায়ের পূজা ধর্মঠাকুর পূজা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকে না। এছাড়া দেবতার ঘোটক বাহন, রোগশোক প্রতিকারক শক্তি, ১লা মাঘ পূজার রীতি ইত্যাদি Ritual সমস্ত অনুষ্ঠানাদি ধর্মঠাকুরের পূজার ইঙ্গিতবহ। উপর্যুক্ত আলোচনা সূত্রে বলা যায়, দক্ষিণরায়ের যে মূর্তিই পূজিত হোক না কেন প্রকৃত তাৎপর্যে তা ধর্মঠাকুরের পূজার সংস্কার বহন করে চলেছে।

লোকদেবতা ঃ বারাঠাকুর

বারুইপুর থানার এক বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন বারাঠাকুর। বারাঠাকুরের পূজাকে বারাপূজা বলা হয়। বারাপূজা বহু আলোচিত এক লৌকিক পূজা। গৃহের বাইরে অথচ বাস্তুর মধ্যে

সাধারণত ঈশান কোনে এই দেবতার স্থান নির্মিত হয়। মনসাগাছের তলায় দক্ষিণদিকে মুখ করে যুগ্মবারা বসান হয়। গৃহস্থালির বাইরে এই দেবতার পূজানুষ্ঠান হয় বলে একে বারাঠাকুর বলা হয়।

বারাঠাকুরের পূজা বলতে বোঝায় দুটি জ্যোতির্ময় নৃমুণ্ডের পূজা, যা কুমারেরা গড়েন। চাকে ফেলে বড় আকৃতির দুইমুখ খোলা ঘটাকৃতি তৈরি করে গায়ে আকর্ণ বিস্তৃত বিস্ফারিত চোখ, টিকাল নাক, মানানসই কানসহ আদিম গড়ন তৈরী করা হয়। ঘটের মাথার উপর শিরোভূষণটি মুণ্ডের তুলনায় অনেক বড়। পানপাতা সদৃশ অথবা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপশিখার ন্যায় চওড়া শিরোভূষণ ছাঁচে তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চূন লাগিয়ে সাদা করে তুলি কালি দ্বারা চোখমুখ, গোঁফ ও শিরোভূষণ, ঊর্ধ্বগতি লতাপাতা ইত্যাদি অঙ্কন করা হয়। যুগ্মবারার একটির গোঁফ থাকে এবং অপরটির গোঁফ থাকে না। গোঁফযুক্ত বারাটি অধিক তেজস্বী গড়ন। গোঁফহীন বারাটি অপেক্ষাকৃত ম্লান বলে মনে হয়। সম্ভবত এই কারণেই একটিকে পুরুষ এবং অপরটিকে নারী বলা হয়। অঞ্চল বিশেষে এই যুগ্মবারার ভিন্ন নামে পরিচিতি আছে। সাধারণভাবে যুগ্মবারার পুরুষটিকে দক্ষিণরায় ও নারী বলে কথিত বারাটিকে দক্ষিণরায়ের জননী নারায়ণী বলা হয়। আবার কেউ কেউ যুগ্মবারাকে দক্ষিণরায় ও বনবিবি, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, দক্ষিণরায় ও বড়খাঁগাজী, দক্ষিণরায় ও কালুরায়, বারা ও ঝারা বলে পরিচয় প্রদান করেন। এইরূপ বিভ্রান্তিমূলক নামকরণ থেকে অনুমিত হয়, ঐ নামগুলি সবই মনগড়া এবং অঞ্চল বিশেষে তা কথিত হয়।

প্রতিবছর ১লা মাঘ হতে মাঘসংক্রান্তি অবধি বারাঠাকুর বা বাস্তুঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণব্রাহ্মণ এই দেবতার পূজানুষ্ঠান করেন। ফলমূল, চিনিবাতাসা, আতপচাল দিয়ে দেবতার পূজার নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজার শেষে 'লুট' হয়। সাধারণত দিনে এই পূজানুষ্ঠান হলেও রাতের বেলা পূজা হতে বাধা নেই। বাস্তুর মঙ্গল কামনায় বাস্তুপূজা করা হয়। কোন প্রকার 'অশুভ দৃষ্টি' যাতে বাস্তুর মানুষজন ও পশুর উপর না-পড়ে তার জন্য বাস্তুপূজা প্রায় প্রতিটি হিন্দুপরিবারে অনুষ্ঠিত হয়। লোকবিশ্বাস, বাস্তুপূজা দিলে বাস্তুর কোন প্রাণীর অকালপ্রয়াণ ঘটে না।

বাস্তুপূজার উৎসগত তাৎপর্য অতীব গভীর। এই পূজা সম্পর্কে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দক্ষিণরায় বারাঠাকুর মৌলিক উৎস ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে আদিম উর্বরতা জাদুবিশ্বাস সঞ্জাত কর্তিত নৃমুণ্ডপূজার অবশেষ এবং মূলত কৃষি-জাদু-সহায়ক লৌকিকদেবতা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ গবেষকগণ দক্ষিণরায় এই নাম সাদৃশ্যে বারাঠাকুরকে বাঘের দেবতা বলেছেন। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধ বাগচী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষকগণ দক্ষিণরায়কে একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বলেছেন। যে সকল গৃহস্থ যুগ্ম মুণ্ডমূর্তিপূজা করেন তাঁরা এই লোকদেবতাকে দক্ষিণরায় বলে মানতে চান না। তাঁরা বারাঠাকুর ও বাস্তুঠাকুর বলেন এবং এই দেবতার পূজাকে বাস্তুপূজা, বসুমাতার পূজা বা বারাপূজা বলেন।

দক্ষিণরায় ও বারা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত পর্যালোচনা, আলোচনা ও ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে স্বীকার করা যায় যে, লোকদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাভাবনা পরিবর্তিত সামাজিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কালের গতিধারায় সংস্কৃতির যে ভিন্নরূপ আত্মপ্রকাশ করে তারই সুস্পষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণরায়ের উৎস ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দক্ষিণরায় নামাঙ্কিত পূজা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ করা যায়। যথা–

ক) দক্ষিণরায়ের বারাপূজা,

খ) দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তিপূজা।

দক্ষিণরায়ের বারাপূজা বা বাস্তুপূজা ও দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রবাহন দিব্যমূর্তিপূজা সম্পূর্ণ দুটি পৃথক পূজাভাবনা। কেবল নাম সাদৃশ্যে এই দুই প্রকার পূজাভাবনাকে একই পূজার ভিন্নরূপ বলে দাবি করা যায় না। প্রকৃত তাৎপর্যে বারাপূজা (মুণ্ড প্রতীক) বা বাস্তুপূজা গৃহের মঙ্গল তথা কৃষিসহায়ক চন্দ্রসূর্যের পূজা এবং ব্যাঘ্রবাহন দিব্যমূর্তিপূজা আদিম সমাজের ব্যাঘ্রপূজার ইঙ্গিতবহ বলে বিবেচিত হয়।

সূর্যের সাথে দক্ষিণরায় বারাঠাকুরের শিরোভূষণের বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এই শিরোভূষণের সঙ্গে বাংলার লৌকিক ইতুব্রত বা সূর্যপূজার আল্পনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যা বারাপূজার সঙ্গে উর্বরতাবাদের নিকট সম্পর্ককে ভিন্ন দিক থেকে সমর্থন করে (ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার পূজাপার্বণ ও মেলা)। আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দ্ব্যর্থহীন ভাবে ধর্মঠাকুরের পূজাকে সূর্যপূজা বলেছেন (বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস)। গোঁফহীন বারাঠাকুরের শিরোভূষণে লতাপাতা যেমন আছে তেমন আছে লালকালো ফোঁটা। এগুলি রাতের আকাশের গ্রহনক্ষত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতির ইঙ্গিতবহ। সুতরাং যুগ্মবারার শিরোভূষণ মহাজ্যোতির দ্যোতক যা কেবল সূর্য ও চন্দ্রের জ্যোতির সঙ্গে তুলনীয় এবং যুগ্ম-বারার পূজা সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীক পূজা বলে বিবেচিত হয়। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'অল ইন্ডিয়া ফোকলোর কংগ্রেস - ২০০৩)-এ, যা সময় সাপেক্ষে প্রকাশিত হবে।)

লোকদেবতা ঃ পঞ্চানন্দ

বারুইপুর থানা অঞ্চলে পূজিত বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন পঞ্চানন্দ। এই দেবতা জঙ্গল-দেবতা, বৈদ্যরাজ, বাবাঠাকুর ইত্যাদি নামে পরিচিত। বনবিবি, বিশালাক্ষী, নারায়ণী ধর্মঠাকুর প্রমুখ লোকদেবতার স্থান যেমন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তেমনি লোকদেবতা পঞ্চানন্দের থান জঙ্গলময় স্থানে গড়ে উঠেছে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে লোকদেবতা পঞ্চানন্দের থান গড়ে ওঠার পশ্চাতে স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ থাকা সম্ভব। জঙ্গল হাসিল করে যখন নতুন বসতি স্থাপন হয় তখন নতুন বসতির মানুষদের শক্তি, সাহস ও বাঁচার প্রেরণা যোগাতে পঞ্চানন্দের ভূমিকা লোকসমাজের খুবই বিশ্বাসযোগ্য ছিল। লোকবিশ্বাস, বাবা পঞ্চানন্দের কৃপায় চোরদস্যুর উৎপাত লাঘব হয়। কথিত হয়, পঞ্চানন্দ তাঁর ভক্তের বাড়িতে আক্রমণকারী চোরডাকাতকে অন্ধকরে তাঁর মন্দিরে বা থানে বসিয়ে রাখেন। আবার

ডাক্তার বৈদ্যহীন পরিবেশে পঞ্চানন্দের থানের ওষুধ রোগীর নিকট অব্যর্থ ফলপ্রদ বলে আজও লোকসমাজ বিশ্বাস করে। সুতরাং জঙ্গলময় স্থানে পঞ্চানন্দের থান গড়ে ওঠার নেপথ্যে বাঁচার তাগিদই মুখ্য ছিল। গ্রামদেবতারূপেও পঞ্চানন্দ পূজিত হন।

পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন এই দুই দেবতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। পঞ্চানন্দ হলেন অশাস্ত্রীয় দেবতা এবং পঞ্চানন হলেন শাস্ত্রীয় দেবতা। পালাগানসমূহে পঞ্চানন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিনি শিবের অংশজাত সন্তান হলেও মাতা নিম্নবর্ণের হিন্দু। এইরূপ লোককথার অন্তরালে সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিভেদবোধ অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চানন্দ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পূজিত দেবতা এবং পঞ্চানন উচ্চবর্ণের পূজিত শাস্ত্রীয় দেবতা। আসলে উভয় দেবতাই এক ও অভিন্ন। বর্তমানে ছুঁৎমার্গিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে প্রতিক্ষেত্রে পূজানুষ্ঠান করেন বর্ণব্রাহ্মণ এবং থান প্রতিষ্ঠা করেন নিম্নবর্ণের হিন্দু।

পঞ্চাননের চেহারার সাথে পঞ্চানন্দের চেহারার সৌসাদৃশ্য থাকলেও পঞ্চানন্দের গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাতী সূর্য সদৃশ এবং পঞ্চাননের গাত্রবর্ণ শুভ্র। পঞ্চানন অহিভূষণ, পঞ্চানন্দ রূদ্রাক্ষের অলংকারে অলঙ্কৃত। ক্ষেত্র বিশেষে অহি ও রুদ্রাক্ষ উভয় দেবতার ভূষণ; কেবল গাত্রবর্ণ দেখে দুই দেবতাকে পৃথক করতে হয়। পঞ্চানন্দের বাহন ব্যাঘ্র, গোভূত, ঘোটক। এছাড়া মামদো, মৃগ, বৃষ, ভল্লুক এমনকি বৃশ্চিকবাহন পঞ্চানন্দের কথা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এইরূপ বাহন বারুইপুর অঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দেবতার দুই হাত, একহাতে থাকে ত্রিশূল অন্যহাতে বরাভয় মুদ্রা। এই দেবতার পূজানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হলেও নির্দিষ্ট কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। পঞ্চাননের ধ্যানমন্ত্রে পঞ্চানন্দের পূজা করা হয় বলে জানা যায়। পূর্ণ অবয়ব ছাড়া পঞ্চানন্দের শিলামূর্তিও পূজিত হয়। এছাড়া একই থানে ষষ্ঠী, শীতলা, শিবলিঙ্গ, বাইরে বিবিমা, মানিকপীর ইত্যাদি দেবতা পূজিত হতে দেখা যায়।

পঞ্চানন্দের পূজার নৈবেদ্য আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকারে ব্যবস্থা হয়ে থাকে। পঞ্চানন্দের নামে ছাগ, হাঁস, পাখি, মুরগী বলি হতে দেখা যায়। আবার থান হিসাবে প্রাণীর পরিবর্তে লাউ-কুমড়ো ও অন্যান্য ফলবলি হয়। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বাবার বিশেষ পূজানুষ্ঠান হলেও অনেক থানে নিত্যপূজা হয়। এছাড়া বাৎসরিক পূজা স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত হয়। বাৎসরিক পূজার দিন পঞ্চানন্দের পালাগান, হরিনাম সংকীর্তন, গোষ্ঠগান ইত্যাদি হয়ে থাকে। বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে বাবার দয়ায় উপকৃত ব্যক্তিগণ গণ্ডিকাটা, ছলন দেওয়া, পূজা দেওয়া ইত্যাদি নানা সংস্কার পালন করেন। বাবা পঞ্চানন্দের দোরধরা বহু শিশুর নাম পঞ্চানন, পাঁচু ইত্যাদি রাখা হয়। পঞ্চানন্দের থান সাধারণত বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শেওড়া, বকুল অথবা নিমগাছের গোড়ায় দেখা যায়।

বারুইপুর থানায় বিশিষ্ট কয়েকটি পঞ্চানন্দের থান ঃ

১) চম্পাহাটী – পঞ্চানন্দতলা ঃ সেবাইত সুবলচন্দ্র বিশ্বাস। শনি, মঙ্গলবার বিশেষ পূজা; ২৬শে ফাল্গুন থেকে ২৬শে চৈত্র নাম সংকীর্তন (১মাস), জ্যৈষ্ঠমাসে – যেকোন তিনদিন

হরিনাম সংকীর্তন।

২) বলবন ধোপাপাড়া – পঞ্চানন্দের থান।

৩) কুন্দরালী পঞ্চানন্দের থান ।

৪) বারুইপুর শাঁখারীপাড়া পঞ্চানন্দের থান ঃ বৈশাখে যেকোন মঙ্গলবার বাৎসরিকপূজা

৫) ছাটুইপাড়া পঞ্চানন্দের থান ।

৬) বারুইপুর সাহাপাড়া পঞ্চানন্দের থান ।

৭) সিটকোর মোড়, উকিলপাড়া পঞ্চানন্দের থান ।

৮) নাজিরপুর পঞ্চানন্দতলা ঃ নিত্যপূজা, শনিমঙ্গল বিশেষ পূজা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে শনিবার বাৎসরিক পূজা, বেলা ২টার পর পূজা হয়। (১৯৭৫ সালে তৈরি সিমেন্টের মূর্তি ।

লোকদেবতা ঃ বৈদ্যনাথ

বারুইপুর থানার অন্তর্গত কুন্দরালি গ্রামের এক 'জাগ্রত' লোকদেবতা হলেন 'শ্রী শ্রী বৈদ্যনাথ বড় কাছারি'। স্থানীয়ভাবে একে ভূতের কাছারি বলা হয়। সাধারণভাবে এই দেবতার থানকে 'বদ্যিনাথের থান' বা 'বড়হাকিমের থান' বলা হয়। পূর্বে এখানে একটি টিনের ঘরে নুড়িশিলা পূজা হত। বর্তমানে ছাদ দেওয়া ঘরে একটি শিবলিঙ্গ পূজিত হয়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মণ্ডলের পুত্র গোপালপদ মণ্ডল ও দয়ালচন্দ্র নস্করের পুত্র সীতাদাস নস্কর মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক বছর নুড়িশিলার পরিবর্তে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। মন্দিরের পাশে কাঠা দুই পরিমাণ একটি ছোট পুকুর (ডোবা) আছে। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের স্মৃতিতে তাঁর পুত্রকন্যাগণ এই পুকুরে একটি সান বাঁধিয়ে দিয়েছেন।

বৈদ্যনাথের থানটি একটি প্রাচীন বটঅশ্বত্থ গাছের নিচে অবস্থিত। গাছটির চারদিকে ইট দিয়ে গাঁথা, যাত্রীরা এখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। গাছের গোড়ার মাটি ও শিকড় 'চন্দনমৃত্তিকা' ও 'মাদুলি' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, কোন এক ব্যক্তির গরু হারিয়ে গেলে বাবার কাছে মানত করে। এবং তা ফিরে পান এবং বটঅশত্থ গাছ দুটি বসিয়ে 'বিয়ে' পূজা দেন।

বদ্যিনাথের থানে কোন ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠানের কাজ করেন না। যাঁরা পূজা দিতে আসেন তাঁরা নিজেরাই দেবতার কাছে প্রার্থনা করে পূজা দেন ও বাতাসা লুট দেন। ভক্তজন মানত অনুযায়ী বদ্যিনাথের উদ্দেশ্যে হাঁস, শোলমাছ, মদ, গাঁজার কলকে, পৈতা, বাছুর, রূপার জিনিস, সোনার জিনিস, বাবার ছলন ইত্যাদি প্রদান করেন। পূজা দেওয়া বিষয়ে স্থানীয়ভাবে একটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। প্রবাদটি নিম্নরূপ –

"ভরায় বলে সরায় দেয়

আশি কেত্তন কেউ দেয় না।"

বদ্যিনাথের প্রধান মাহাত্ম্য – তাঁর কৃপায় সন্তানহীনার সন্তানলাভ হয় ও মৃতবৎসার 'মড়াঞ্চে দোষ' কেটে যায় এবং সন্তান দীর্ঘজীবন লাভ করে। বদ্যিনাথের থানে 'জলচাখান' সংস্কার পালনের পর সন্তানের অন্নপ্রাশন হয়। বহুদূর স্থান থেকে মায়েরা এসে শিশুকে বদ্যিনাথের জলচাখিয়ে যান। এছাড়া নানা রোগব্যাধি মুক্তির জন্য বদ্যিনাথের নিকট মানত করে ফল পাওয়া যায়, এমত লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। এখানে ঢিল বেঁধে, চিঠি লিখে মানত করার পদ্ধতি চালু আছে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বাবার বিশেষ পূজার দিন বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে যাত্রী সমাগম বেশি হয়। বাৎসরিক পূজা হয় 'নীলবাতির' আগের দিন। জয়রামপুরে ঝাঁপ দিয়ে এসে বৈদ্যনাথের থানে পূজা দেওয়া হয়। এই দিন এখানে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

আদিগঙ্গার তীরে পর পর তিনটি ভূতের কাছারি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমত ঝিঁকুরবেড়িয়া (বাখরা) একটি ভূতের কাছারি। এটি বড়কাছারি নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ত কুন্দরালি গ্রামে শ্রী শ্রী বৈদ্যনাথের বড়কাছারি বা ভূতের কাছারি এবং তৃতীয়ত শূলিপোতা গ্রামে ভূতবাবা বা ছোটকাছারি। এই তিনটি থানের মাহাত্ম্য ও পূজা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস প্রায় একই। ক্ষেত্রগবেষণায় অনুমিত হয়, ঝিঁকুরপোতা গ্রামের ভূতের কাছারিটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং তারপরেই কুন্দরালি গ্রামের ভূতের কাছারি থানটি গড়ে উঠেছে। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, থানটি কমপক্ষে দুইশত বছরের প্রাচীন। শূলিপোতা গ্রামের ভূতবাবা বা ছোটকাছারি থানটি খুব প্রাচীন নয়। এ বিষয়ে 'ভূতবাবা' প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বৈদ্যনাথের বড়কাছারি থানটির সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম । জলাজঙ্গল অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মানুষের জীবনধারণের সমস্যা প্রকট ছিল। যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল সেখানে বৈদ্যনাথের দাওয়াই একমাত্র ভরসারূপে ছিল। পূজার প্রধান উপকরণের মধ্যেই নিহিত আছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান। একসময় বৈদ্যনাথই ছিল এই অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার সহায়ক শক্তি।

লোকদেবতা ঃ ভূতবাবা

বারুইপুর থানার বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন ভূতবাবা। আদিগঙ্গার তীরে শূলিপোতা রেলগেটের নিকট 'জাগ্রত দেবতা' ভূতবাবার থানটি অবস্থিত। স্থানীয় ভাবে এই থানকে ছোটকাছারি বলে। বিষ্ণুপুর থানার ঝিকুরবেড়িয়া গ্রামে বড়কাছারির থান আছে। সেটিও গঙ্গার তীরবর্তী থান। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, পূর্বে বড়কাছারির নিকট যেতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হত এবং মানতাদি চুকোতে যেতে অনেক পথের কষ্ট সহ্য করতে হত। সেকারণে অতীতে কোন এক ভক্ত এই থানটি নির্মাণ করে 'ছোটকাছারি' নাম দিয়ে পূজা শুরু করেছিলেন। সেই থেকে ভূতবাবার থানটি ছোটকাছারি নামে পরিচিত। বর্তমানে ভূতবাবার যে পাকা ইটের ঘরটি দেখা যায়, এটি মহিম মণ্ডল নামে এক ভক্ত চাকুরীলাভ করে ১৯৭০ সালে নির্মাণ করিয়েছেন এবং ভূতবাবার একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদিতে কোন মূর্তি ছিল না। 'দুধে-আশ-শ্যাওড়া' (স্থানীয় নাম) গাছের গোড়ায় ভূতবাবার থান ছিল।

প্রথমে শ্যাওড়া গাছকেই ভূতবাবার গাছ বলে পূজা করা হত। এখনও সে গাছটি আছে। ভক্তগণ এই গাছের গোড়ার মাটি ও শিকড় ওষুধরূপে ব্যবহার করেন।

ভূতবাবার যে মূর্তিটি মহিম মণ্ডল নির্মাণ করিয়েছেন, এটির শিল্পী মর্যাদাগ্রামের ভুবন মণ্ডল। এটি মাটির মূর্তি। এই মূর্তির গঠন পরিকল্পনা কার এবং কোথা থেকে তা সংগৃহীত তা জানা যায় না। ভূতবাবা সিংহাসনের উপর বামপদ ঝুলিয়ে দক্ষিণপদ বামজানুর উপর রেখে উপবিষ্ট। হাতেগলায় রুদ্রাক্ষের ভূষণ; আকর্ণ বিস্তৃত মোচাগোঁফ, ত্রিনয়ন, স্থূল পেশিবহুল পঞ্চানন্দ গড়ন। দেবতার দুই হাত, একহাতে কলকে ও অপর হাতে আশিষমুদ্রা। তাঁর মাথার চুল বাবরি ও সৌম্যমুখ। ভূতবাবার ডানদিকে এক সহচর ও বামদিকে নৃত্যের ভঙ্গিতে সালংকারা এক সহচরী আছেন। ভূতবাবার সহচর/সহচরীসহ মূর্তিটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে পূজিত ধর্মঠাকুরের মূর্তির সাথে তুলনা করা যায়।

ভূতবাবার বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয় ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের যেকোন শনিবার। দিনটি স্থানীয় ভাবে নির্ধারিত হয়। এছাড়া প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে ২টার মধ্যে দেবতার পূজা হয়। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পূজানুষ্ঠান করলেও পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ এ দেবতার পূজানুষ্ঠান করতেন না। দেবতার পূজানুষ্ঠানে কোন মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে ব্রাহ্মণ শিবের ধ্যানমন্ত্রে পূজা করেন। শোলমাছ, মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, বাতাসা ও ফলমূল পূজার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাতাসা লুট দেওয়া এখানকার পূজার সাধারণ পদ্ধতি। পূজায় পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের আগ্রহ বেশি।

লোকদেবতার পূজানুষ্ঠানের একটি প্রধান মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক উপলক্ষ থাকে। যেমন, শীতলাদেবী বসন্তরোগ নিবারণী শক্তি, ওলাবিবি ওলাওঠা রোগ (কলেরা) নিবারণী শক্তি ইত্যাদি। তেমনি ভূতবাবার কৃপায় 'ঘাড়ে লাগা' বা 'খটকা' ব্যথা সেরে যায়। যাঁদের এই ধরনের ব্যথা লাগে তাঁরা ভূতবাবার নিকট মানত করেন এবং আরোগ্য লাভ করলে মদ, গাঁজা, শোলমাছ, ইত্যাদি দিয়ে পূজা দেন। ক্রন্দনপ্রবণ শিশুর স্বাভাবিকতার জন্যও মানত করে পূজা দেওয়া হয়। এছাড়া মানত করে রিকেট রোগাক্রান্ত শিশুর সুস্থতা লাভ ও মৃতবৎসা জননীর সুস্থ সন্তান লাভের নিমিত্ত বাবার নিকট নাড়ুগোপাল, কিশোরকৃষ্ণ বা মহাদেব ছলন দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এছাড়া মেয়ের বিবাহ, ছেলের চাকুরী, ভাল ফসল লাভ, নানা রোগপীড়া হতে মুক্তি ইত্যাদির জন্য ভূতবাবার কৃপা মাঙা হয়।

ভূতবাবাকেন্দ্রিক উল্লিখিত বিশ্বাস সমূহ ঝিকুরবেড়িয়া গ্রামে বড়কাছারির থানে ও কল্যাণপুর গ্রামে বদ্যিনাথের থানে লক্ষ্য করা যায়। ভূতবাবা ও বদ্যিনাথের থানে ঢিল বেঁধে মানত করার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু বড়কাছারির নিকট চিঠি লিখে মানত করার রীতি দেখা যায়।

ভূতবাবার উৎস তাৎপর্য বিশ্লেষণে জানা যায়, এই দেবতা মহাদেবের গুণসম্পন্ন। ভূত শব্দ দিয়ে মহাদেবের একাধিক নাম পাওয়া যায়। যথা ভূতনাথ, ভূতভাবন, ভূতেশ, ভূতপতি

ইত্যাদি। পঞ্চভূতের যিনি অধিপতি তিনি ভূতনাথ। পৃথিবীতে পঞ্চভূত হল ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পঞ্চভূত নিয়ে জীবদেহ গঠিত। সুতরাং পঞ্চভূত ও সমস্ত জীবজগতের যিনি প্রভু তিনিই ভূতপতি বা ভূতবাবা। ভূতবাবার অন্তরালে শিবশক্তিকেই কল্পনা করা হয়। বর্তমানে ইনি একজন লোকদেবতা রূপেই পূজিত হন।

লোকদেবতা ঃ পেঁচোপাঁচী

বারুইপুর থানা অঞ্চলে বহুপূজিত লোকদেবতা হলেন পেঁচোপাঁচী। লোকসমাজে এঁরা শিশুরক্ষক দেবতারূপে পূজিত হন। পেঁচো হলেন পুরুষ এবং পাঁচী নারী। লোকমত হল, পেঁচোঠাকুর পাঁচীঠাকুরাণীর ভাই বা দাদা। আবার কেউ কেউ বলেন এঁরা স্বামীস্ত্রী। পেঁচোঠাকুরের অনেক নামে পরিচিতি আছে। যেমন - পেঁচোখেঁচো, চোরাপেঁচো, পাঁচুগোপাল, গুমোঠাকুর প্রভৃতি। প্রত্যেকটি নামের বিশেষ তাৎপর্য আছে। পাঁচুঠাকুর যখন নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে নিজেই খান, তখন তাঁকে পেঁচোখেঁচো বলে। এরূপ মূর্তি পঞ্চানন্দের চৌকির নিচে বা গোভূতের পেটের নিচে থাকে। চোরাপেঁচোর মূর্তি চোরের মত ধূর্ত গড়ন। লোকবিশ্বাস, এই দেবতা শিশুসন্তানের প্রাণ চুরি করে তালগাছে উঠে পড়ে এবং এর অনুচরেরা নানা ভাবে তাকে সাহায্য করে। সে কারণে একে চোরাপেঁচো বলে। পাঁচুঠাকুরের দোরধরা সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হয় বলে লোকবিশ্বাস। শিশুর প্রতি প্রসন্ন পাঁচুঠাকুরের মূর্তি পাঁচুগোপাল নামে পরিচিত। এই মূর্তির পেঁচকবাহন, কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণমূর্তি। পেঁচোঠাকুরকে গুমোঠাকুর বলা হয়। কিছু মানুষ ঘুমের ঘোরে বিকট শব্দ করে গোঁগোঁ আওয়াজ করে। লোককথায় একে বলে গুমো রোগ। পেঁচোঠাকুরকে ভক্তিভরে পূজা দিলে গুমো রোগ সেরে যায়। সে কারণে এই দেবতাকে গুমোদেবতা বলে। পাঁচুঠাকুরের তিনপ্রকার পূজাচার প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা –

১) পেঁচোপাঁচীর মূর্তিপূজা,

২) পেঁচোপাঁচীর বৃক্ষপূজা,

৩) পেঁচোপাঁচীর ঝারাপূজা।

পেঁচোপাঁচীর মূর্তিপূজা জাঁকজমক করে হয়ে থাকে। উপরে বর্ণিত পাঁচুঠাকুরের বিভিন্ন মূর্তিপূজা করা হয়। এই দেবতার থানে পূজার সময় মানত অনুযায়ী হাঁসমুরগী, শোলমাছ, পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন থানে এই সমস্ত প্রাণীবলি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভক্তরা দেবতার নিকট বাদ্যিবাজনা করে ছলন আনেন। ব্রাহ্মণ সাধারণত পেঁচোপাঁচীর পূজা করেন। যদিও এ দেবতার নামে নির্দিষ্ট কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই বা পুরোহিত দর্পণে কোন পূজাচারের কথা উল্লেখ নেই। পুরোহিত রোগীর নামে সঙ্কল্প করে পূজা দেন ও রোগীর মঙ্গলকামনা করেন। অনেকে আবার রোগীকে মাদুলী দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা ইত্যাদি সংস্কার পালন করেন।

পেঁচোপাঁচীর বৃক্ষপূজা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। পেঁচোপাঁচীর বৃক্ষপূজা সংক্রান্ত সংস্কার পালনের মধ্য দিয়ে এই দেবতার উৎস আদিম মানবসমাজ তা অনুমিত হয়। মহিলাগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় পাড়ার কোন এক নির্দিষ্ট তালখেঁজুর গাছের গোড়ায়

অথবা কেবল তালগাছের গোড়ায় ডালাপূজা দেওয়া, বাতাসা লুট, ধূপদীপ দান ইত্যাদি সংস্কার পালন করেন। পেঁচোপাঁচী ভূতদেবতা বলে অনেকে ধূপদীপ দেন না। কারণ, লোকবিশ্বাস, ভূত আগুন ও লোহা দেখলে ভয় পায়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনেকে লোহার মাদুলীও পর্যন্ত পরে না। মাতৃস্থানীয়েরা ভূতঠাকুরের উদ্দেশ্যে ডালা দিয়ে গাছের গোড়ায় ফুলজল প্রদান করে পূজা সমাপন করেন। পূজা করা হয় বেলা ২টার পর থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত। অনেকে সন্ধ্যেবেলায় তালগাছের গোড়ায় পেঁচোপাঁচীর উদ্দেশ্যে চাল-জল ভোগ দেন। এই দেবতার আদি থান ভাঙ্গড় থানার বাদীগ্রাম বলে কথিত হয়, কিন্তু বারুইপুর অঞ্চলে এ দেবতার ব্যাপক পূজাচার পালিত হয়।

পেঁচোপাঁচীর ঝারাপূজার সংস্কার ব্যাপক প্রত্যক্ষ করা যায়। মাতৃস্থানীয়াগণ ঘরের বা দাওয়ার ছাঁচে (যেখানে চালের জল ঝরে পড়ে) পেঁচোপাঁচীর পূজাকেন্দ্রিক সংস্কার পালন করেন। প্রথমে ঘরের ছাঁচে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ভালো করে গোবর ছিটিয়ে একটা পিঁড়ি পাতা হয়। তার উপর কাদার তাল রেখে তাতে পুকুরের বা গঙ্গার জলে পূর্ণ একটি তামা বা পিতলের ঘটি স্থাপন করা হয়। ঘটের মুখে আমের পল্লব দেওয়া হয় এবং ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে 'মাতৃচিহ্ন' বা স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। তারপর সেইস্থানে রোগাক্রান্ত শিশুকে (১–৬ বছরের মধ্যে) শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটি আঁশচুবড়ীতে বিভিন্ন ফুল সাজিয়ে তাতে সোনারূপার গহনা দিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়। এরপর অন্যপাত্রে জল নিয়ে ঘরের চালে ছুঁড়ে দিয়ে আঁশচুবড়ীতে সেই জল ধরে নিচে রাখা আর একটি পাত্রে ভরা হয়। এবার চালে থেকে ঝরে পড়া সোনারূপা ও ফুল ধোয়া আঁশচুবড়ীর জল রোগাক্রান্ত শিশুকে খাওয়ান হয় এবং সর্বাঙ্গে মাখান হয়। লোকবিশ্বাস, পেঁচোপাঁচীর ঝারাপূজার এই জল খেয়ে ও মেখে শিশু সমস্ত রোগব্যাধিমুক্ত হয় এবং সু-স্বাস্থ্য ফিরে পায়। শিশুর তিনচার বছর বয়স পর্যন্ত পেঁচোপাঁচীর নামে এইরূপ টোটকামূলক চিকিৎসা করা হয়।

পেঁচোপাঁচী দেবতার উৎসগত তাৎপর্য লোকঐতিহ্যের অনেক গভীরে। তালগাছের গোড়ায় পূজা, দেবতাকে ভূতরূপে কল্পনা করা, ঝারাপূজার মত আদিম সংস্কার পালন, ঘটের পরিবর্তে ভাঁড়ের ব্যবহার,মহিলা কর্তৃক পূজাসংক্রান্ত সমস্ত সংস্কার পালন এ সবই আদিম পূজাপদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। পূজা উপলক্ষে নরনারীর নেশা করা, শোলমাছ পোড়া পূজার উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের মধ্যে অনার্য সংস্কারের আদিম ধারার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। পেঁচাপেঁচীর ভূতগঠন বা মূর্তি সম্পর্কে ভূতভাবনা, অনার্য সংস্কারকেই সমর্থন করে। ভূতনাথ, ভূতপতি, ভূতবাবার সাথে পাঁচুঠাকুরের নিকট সম্পর্কের কথা মান্য করায় পাঁচীঠাকুরাণীকে ভূতবাবার স্ত্রীরূপে বন্দনা করা হয়। সুতরাং পেঁচাপেঁচীর পূজার সংস্কার শিবপার্বতীর পূজা অপেক্ষা প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। এই দেবতা থেকে পরবর্তিকালে শিব পার্বতীর কল্পনা করা হয়েছে এমন ধারণা পোষণ করা যায়।

লোকদেবতা ঃ মাকালঠাকুর

বারুইপুর থানা এলাকায় পূজিত বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন মাকালঠাকুর। মাকালঠাকুর জেলে সম্প্রদায়ের দেবতা। নদী-খাল-বিলে যাঁরা মাছ ধরে জীবনজীবিকা নির্বাহ করেন

তাঁরাই মাকালঠাকুরের প্রধান সেবক। বর্তমানে বিদ্যাধরী ও আদিগঙ্গার স্রোত এ অঞ্চল দিয়ে আর বয়ে যায় না। ফলে জেলে সম্প্রদায় অন্য পেশায় লিপ্ত হয়েছেন কিন্তু মাকালঠাকুরের পূজাকেন্দ্রিক সংস্কার একেবারে হারিয়ে যায়নি। পুকুর বা খালবিল ছেঁচে যখন মাছধরা হয় তখন পুকুরের খোলে মাকালঠাকুরের মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। মাকালঠাকুরের দুটি মূর্তি নির্মিত হয়, যার একটি পুরুষ ও অপরটি নারী। কেউ কেউ বলেন মূর্তি দুটির একটি মাকালঠাকুর, অপরটি তাঁর অনুচর। পুকুরের খোল থেকে নেওয়া আঠাল কাদামাটি দিয়ে চারপাঁচ ইঞ্চির দুটি মূর্তি গড়া হয়, যা পরিচয় নাদিলে মাকালঠাকুর বলে চেনা যায় না।

মাকালঠাকুরের মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি অতি সাধারণ। পুকুর ছেঁচাকালে পুকুরের খোলে জলছাড়া কিছুটা উপরে গোবরমাটি দিয়ে খানিকটা জায়গা লেপে মূর্তি দুটি বসান হয়। যে কয়দিন পুকুরছেঁচার কাজ চলে সেই কয়দিন সন্ধ্যেবেলা দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ-বাতি জ্বালা ও ফলমূলের অর্ঘ্য দেওয়া হয়। জেলেবাড়ির যে কেউ সন্ধ্যাপূজার ব্যবস্থা করেন। এ পূজায় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে আমন্ত্রণ জানান হয় না। মাছধরা শেষ হলে শিশু ও বড়দের ডেকে মাকালঠাকুরের নামে বাতাসা লুট দেওয়া হয়। এই লোকদেবতার মুণ্ডমূর্তিও পূজা হতে দেখা যায়। ভেড়ি অঞ্চলে এইরূপ মুণ্ডমূর্তি পূজার প্রচলন আছে।

মাকালঠাকুরের উৎসতাৎপর্য লোকবিশ্বাসের অনেক গভীরে। 'মহাকাল' শব্দ থেকে ধ্বনিলোপ করে মাকাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পুরাণাদিতে শিবকে মহাকাল বলা হয়েছে। তিনি একদিকে যেমন সৃষ্টি রক্ষক দেবতা, অপর দিকে সংহারকের গুণও তাঁর মধ্যে নিহিত আছে। মহাদেব কৃষিদেবতা বলে পরিচিত, আবার লোককথানুসারে তিনি ছদ্মবেশিনী গৌরীর সাথে মাছধরে মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত বেরিয়েছেন। মহাদেবের মৎস্য ধরার গুণকে স্মরণ রেখে জেলে সম্প্রদায় তাঁকে মৎস্যদেবতা রূপে পূজা করেন। দক্ষিণ ভারতে Thiruvilaiyadal Puranam-এ শিবকে মাঝিদের প্রধান দেবতা বলা হয়। শিব সম্পর্কিত চৌষট্টিটি ব্যালাডের মধ্যে মাঝি ও শিব সম্পর্কিত ব্যালাডটি অন্যতম। এই ব্যালাডের মূল কথা – শিব হলেন সমুদ্রে রাজা। একদিন তিনি মাঝির ছদ্মবেশে জেলেমাঝিদের মধ্যে নৌকা নিয়ে আসেন। তিনি জেলেদের সাথে মিশে এক জেলে কন্যাকে বিয়ে করে জেলেপাড়ায় থেকে যান। তিনি মাঝিদের বিপদে আপদে নানারকম ভাবে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে সাহায্য করেন। তখন জেলেরা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে পরিচয় জানাতে প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব স্বমূর্তি দেখিয়ে আপন পরিচয় প্রদান করেন। সেই থেকে মাঝিরা শিবের পূজা করেন এবং সমুদ্র থেকে যে মাছ তারা ধরে তার একটা অংশ শিবের মন্দিরে অর্ঘ্য হিসাবে দিয়ে তবেই বাজারে বিক্রি করে।

দক্ষিণভারতে জেলেশিব সম্পর্কিত ব্যালডটির সাথে বাংলার কুচুনীবাগদিনীর স্বামী শিব সম্পর্কিত ব্যালাডের যথেষ্ট মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। অতএব জেলেদের দেবতা মহাকাল শিবের সাথে মাকালঠাকুরের অভিন্নতা প্রমাণ করে। মাকালঠাকুরের যুগ্মমূর্তির পূজা হরপার্বতীর পূজা বলেই বিবেচিত হয়। এই দেবতার কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই, কেবল পূজাকেন্দ্রিক কিছু সংস্কার পালন করা হয়।

লোকদেবতা ঃ মানিকপীর

বারুইপুর থানায় বহুজন পূজিত লোকদেবতা হলেন মানিকপীর। মানিকপীর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান আদরণীয় এক লোকদেবতা। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কণ্ঠে এখনও মানিকপীরের সেই পরিচিত 'বয়েত' শোনা যায়।

> আর হালে আছে হেলো বাছা, গইলে আছে দোয়াল
> মানিকপীরের দোয়াতে সব থাকিবে কুশল
> গজ মানিক উঠে বলে পীর মানিক ভাই –
> এ বাড়ি হতে চল মোরা ও বাড়িতে যাই।

এক শ্রেণীর ফকির তাঁরা বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা মাগেন না। পথে পথে গান গেয়ে ও শিঙায় ফুঁ দিয়ে গ্রামের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিক্ষা করেন। বর্তমানে তাঁদের তেমন আর নজরে পড়ে না। কিন্তু তাঁদের গাওয়া পথের গান আজও স্মৃতিতে সুখানুভূতি জাগায়। তাঁদের গাওয়া পরিচিত সেই গান–

> মুশকিল আসান কর দয়াল মানিকপীর
> বাড়ি বাড়ি যাবনা জননী পথে গাইতে হয়
> চালপয়সা যা কিছু মা পথে দিতে হয়
> পীরের নামে দান করিলে মা বাড়ির মঙ্গল হয় –

এইরূপ লম্বা বয়েৎ লোকদেবতা মানিকপীরের মাহাত্ম্যকে স্মরণ করায়।

লোকবিশ্বাসে মানিকপীর গোরক্ষক দেবতা। মানিকপীরের কৃপায় বন্ধ্যাগরু বাচ্চা দেয়, দুগ্ধহীন গাভীর দুগ্ধ হয়, হালের গরু ভাল থাকে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে গো-সম্পদ সেরা সম্পদ রূপে বিবেচনা করা হত। গোয়াল ভরা গরু, পুকুরভরা মাছ ও গোলাভরা ধান যার আছে সেই প্রকৃতপক্ষে বনেদি ও সঙ্গতি সম্পন্ন বাঙালি পরিবার বলে বিবেচিত হত। ফলে গোসম্পদ রক্ষার্থে গোরক্ষক দেবতা মানিকপীরের পূজার্চনা ও পূজাকেন্দ্রিক নানা সংস্কার পালনের ব্যাপকতা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। বর্তমানে লোক সমাজ মানিকপীরকে চক্ষূরোগ নিরাময়ের দেবতা বলে মনে করে। এছাড়া সাংসারিক সুখ-শান্তি লাভ এই দেবতার কৃপায় হয়ে থাকে। প্রায় প্রতি গ্রামে মানিকপীরের থান এই দেবতার জনপ্রিয়তাকেই স্মরণ করায়। মানিকপীরের পাঁচালী লেখক মুনসী মোহম্মদ পিজিরুদ্দিন এর বাড়ি বারুইপুর থানার দক্ষিণে রাণা গ্রামে। তাঁর লেখা জনপ্রিয় পাঁচালিটি হল– 'মানিকপীরের কেচ্ছা' কলিকাতার ৩০ নং মেছুয়া বাজার 'গওসিয়া লাইব্রেরী' থেকে 'আদি ও আসল মানিকপীরের কেচ্ছা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে দুটি কাহিনী আছে, যার একটিতে মানিকপীরের জন্মবৃত্তান্ত ও অপরটিতে মানিকপীরের মাহাত্ম্য প্রচার বর্ণিত হয়েছে। মানিকপীরের পালাগায়ক বারুইপুর থানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কলমুদ্দিন গায়েন, নিতাই ছাটুই, প্রবোধ ছাটুই, কেনারাম মণ্ডল(সীতাকুণ্ডু) , জ্যোতিষ কয়াল (শাঁখারীপুকুর) প্রমুখ। বর্তমানে এঁদের শিষ্যসামন্ত গান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুদিন মণ্ডল, অনিল হাজরা (বেগমপুর) গোষ্ঠ

মণ্ডল (আটঘরা) করুণা গায়েন(ওড়ঞ্চ) প্রমুখ লোকশিল্পীবৃন্দ। এই দেবতার 'জাগ্রত' থান শশাড়ীর নিকট কন্দমালা গ্রামে।

বারুইপুর অঞ্চলে মানিকপীরকেন্দ্রিক যে আচার আচরণ, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, পালাগান ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাতে মানিক পীরের সাথে এই অঞ্চলে বহুপূজিত ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের গভীর মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন –পালাগানে মানিকপীরকে সনাতন ও নিরঞ্জন বলা হয়েছে – 'আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি, পীররূপে তুমি সনাতন।'' সনাতন নামটি ধর্মঠাকুরের অনেক নামের মধ্যে একটি। দ্বিতীয়ত – মানিকপীরের ভ্রাতা বা সঙ্গী হলেন গজপীর, তেমনি ধর্মঠাকুরের প্রধান অনুচর বা ভ্রাতা হলেন দক্ষ বা কালুরায়। তৃতীয়ত- মানিকপীরের আজ্ঞাবহ হল হংস পক্ষি, ধর্মঠাকুরের আজ্ঞাবহ তেমনি হংস ও উলুক। চতুর্থত- মানিকপীরের মূর্তি সাদা, ধর্মঠাকুরের মূর্তি ও সাদা। পঞ্চমত- মানিকপীর রুষ্ট হলে কুষ্ঠ ব্যাধি দিয়ে দুর্বিনীতকে শাস্তিদেন। তেমনি ধর্মঠাকুর রুষ্ট হলে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। ষষ্ঠত - ষাঁড়কে ধর্মঠাকুর কল্পনা করে ছেড়ে দেওয়া হয় (ধর্মের ষাঁড়) তেমনি মানিকপীরের প্রতীক ষাঁড়। মানিক পীরের উদ্দেশ্যে ষাঁড় ছলন দেওয়া হয়। মহাদেবের সাথেও এই ক্ষেত্রে মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। সপ্তমত- মানিকপীরের পূজা হাজত হয় শুক্লপক্ষে অথবা পূর্ণিমার দিন গোয়াল ঘরে। ধর্মঠাকুরের জাত পূজাও হয় জাতপূর্ণিমার দিন। এছাড়া সন্তানহীনার সন্তানলাভ, চক্ষুরোগারোগ্য, গোসম্পদ রক্ষা, চর্মরোগ আরোগ্য ইত্যাদি উভয় দেবতার অনুগ্রহে লাভ হয়। এইরূপ আরও সাদৃশ্য উভয় দেবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পঞ্চদশ শতকে বাংলায় মুসলিম বিজয় হলে পর, দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমান হয়েছেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ তাঁদের পূর্বের সংস্কৃতি একেবার ভুলতে পারেন নি। তাঁরা পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে পূর্বের সংস্কার সংস্কৃতিকে ইসলামিকরণ করে পূজার পরিবর্তে ইসলামি কায়দায় হাজত দিয়েছেন। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের উপাস্য লোকদেবতা ধর্মঠাকুর সুফী সাধকদের সুফী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দয়ার মানিকপীররূপে পূজিত হয়েছেন । এই মন্তব্যের আংশিক সমর্থন মেলে সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যে। '' হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনীকে মুসলমান পীর পীরাণীর মাহাত্ম্য কাহিনীতে ঢালাই করার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ইতিমধ্যে একাধিক লৌকিক দেবদেবী যাঁদের মাহাত্ম্য জনসাধারণ অকুন্ঠিতভাবে স্বীকার করে এসেছে তাঁদের প্রতিরূপ মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। ফকির মোহাম্মদের মানিকপীরের গানে দেখেছি যে মানিকপীর সময়ে সময়ে যেন শিবের ছদ্মবেশ।'' (ড. সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা/সাহিত্য) সুতরাং আলোচনাসূত্রে বলা যায় মানিকপীর, ধর্মঠাকুর মহাদেব প্রকৃত অর্থে এক ও অভিন্ন কেবল সামাজিক বিবর্তনের ধারায় লোকসমাজে ভিন্নরূপে প্রকাশ ঘটেছে।

লোকদেবতা ঃ খোকাপীর

বারুইপুর থানার এক বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন খোকাপীর। বারুইপুর থানার মধ্য কল্যাণপুর গ্রামে চম্পা বাগানীর মাঠের (চাম বাগানীর মাঠ) দক্ষপদ দাসের পিয়ারা বাগানের মধ্যে

খোকাপীরের 'জাগ্রত' থানটি অবস্থিত। এই থানের পশ্চিমে 'বড়আল' ও ধাড়িঙ্গে মাঠ, (লক্ষ্মণসেনের তাম্রপট্টে' উল্লিখিত দাড়িম্ব ক্ষেত, বর্তমানে চাকার বেড়ে গ্রাম), পূর্বদিকে নিহাটা ও আদিগঙ্গার মজাস্রোত, উত্তরদিকে ধোপাগাছি, ধামনগর বা ধর্মনগর, দক্ষিণদিকে চণ্ডীপুর ও শাসন এবং থানটির পাশ দিয়ে 'লম্বাখানা' নামে জলপথ আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায়, লম্বাখানা অতীতে আদিগঙ্গার অপ্রশস্ত জলপথ বা সুঁতি ছিল। নারায়ণ দাসের পূর্ব-পুরুষ থানটি সংস্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁরা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্বে খোকাপীরের থানের কাছে প্রাচীন নিমগাছ, শ্যাওড়াগাছ ও খেঁজুরগাছ ছিল। বর্তমানে তার পরিবর্তে উন্নত জাতের পিয়ারা গাছের বাগান বসান হয়েছে। বর্তমানে খোকাপীরের থান বলতে ঘাস ও আগাছা ঢাকা মাটির বেদি ছাড়া কিছুই নেই। কেবল বাৎসরিক পূজার দিন স্থানটি পরিষ্কার করে পূজার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতি বৎসর ১লা মাঘ খোকাপীরের বাৎসরিক পূজা হয় ও এই উপলক্ষে মেলা বসে। পূর্বে স্থানীয় হিন্দু পরিবার পূজানুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতেন। বর্তমানে মৌলবীর দ্বারা পূজানুষ্ঠান করান হয়। পূজানুষ্ঠান হয় সন্ধ্যেবেলা। বিকেল থেকে যাত্রীরা মিছিল করে খোকাপীরের থানে আসেন। তাঁরা সমবেতস্বরে 'খোকাপীরের নামে আমির আমির বল' এই ধ্বনি দিতে দিতে আসেন। পূজানুষ্ঠানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণই বেশি অংশ গ্রহণ করেন। ভক্তদের কেহ ধূপবাতি জ্বেলে সন্দেশ বাতাসা দিয়ে পূজা দেন কেহ পীরের পুকুরে স্নান করে। গণ্ডি দিয়ে থান প্রদক্ষিণ করেন। সন্দেশ, বাতাসা, পাটালী, খই, মুড়ি প্রভৃতি পূজার প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক ভক্ত খোকাপীরের মূর্তি গড়ে আনেন। বেশির ভাগক্ষেত্রে নাড়ুগোপালের মূর্তি গড়া হয়। নাড়ুগোপালের ছলনের হাতে লাটু, ঘেঁটু, লাড্ডু থাকে। খোকাপীরের পূজার শিশুদের প্রাধান্য থাকে। যাঁরা পূজা দিতে আসেন তাঁরা খোকাপীরের প্রসাদ আগে শিশুদের হাতে দিয়ে তবে বড়দের মধ্যে বিতরণ করেন।

খোকাপীরের পূজার প্রধান বিশেষত্ব হল নেশা করা। নারীপুরুষ নির্বিশেষে পূজাস্থানে খেঁজুর রস (তাড়ি) পান করে মাতাল হতে চান। বর্তমানে মহিলাগণ এই মাতাল অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তাঁরা সন্ধ্যায় পূজা দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ফিরে যান। পুরুষরা গভীর রাত পর্যন্ত নেশা করে হল্লা করেন। খোকাপীরের পূজার আর একটি বিশেষত্ব এখানে কোন প্রাণী বলি দেওয়া হয় না। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী বলির পরিবর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

খোকাপীর সম্পর্কে লোকবিশ্বাস, ইনি শিশু রক্ষক দেবতা। বিশেষত গাছ থেকে পড়া ও জলে ডোবা দুর্ঘটনা থেকে তিনি শিশুদের রক্ষা করেন। এই বিষয়ে নানা লোককথাও প্রচলিত আছে। খোকাপীরের কৃপায় মৃতবৎসা ও সন্তানহীনা সন্তান লাভ করেন। অম্ল, হাঁপানী প্রভৃতি রোগ এই দেবতার কৃপায় আরোগ্য হয় বলে স্থানীয় লোক বিশ্বাস আছে। ৫/১১/২০০০ তারিখে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় পদ ময়রা হাঁপানী ও অম্লরোগের ওষুধ দেন।

লোকদেবতা খোকাপীরের উৎস বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্ররূপ এই দেবতার নাম ও সংস্কারাদির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমত 'খোকাপীর'

শব্দের বিশ্লেষণে দেখা যায় 'খোকা' ও 'পীর' এই দুটি শব্দ নিয়ে খোকাপীর শব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ তাঁদের আদরের দুলালকে 'খোকা' বলেন। মুসলমানগণ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক বা ফকিরকে পীর বলেন। অনুমান করা যায় কোন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় স্থানীয় কোন 'জাগ্রত' লোকদেবতা খোকাপীর নামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান আদরণীয় ছিল। খোকাপীরের থানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন শ্যাওড়া, নিম ও খেঁজুর গাছের গোড়ায় ছিল বলে জানা যায়। শ্যাওড়া, নিম , অশ্বত্থ গাছের তলায় সাধারণত পঞ্চানন্দের মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। পঞ্চানন্দ অনেক সময় কিশোর বা বালকরূপে নানারকম মাহাত্ম্য প্রচার করেন বলে লোক বিশ্বাস। সুতরাং খোকাপীর আদিতে পঞ্চানন্দ ছিলেন কি না তার পাথুরে প্রমান পাওয়া যায় না। খোকাপীরের থানে ধূপ বাতি জ্বেলে পূজা দেওয়ার রীতি মুসলমানী সুফীবাদী কালচারে প্রত্যক্ষ করা যায়। তা ছাড়া মিছিল করে খোকাপীরের থানে পূজা দিতে আসা এটিও মুসলমান সম্প্রদায়ের তবারুক সাজিয়ে সোঁদল নিয়ে পীরের থানে যাবার সংস্কারকে স্মরণ করায়। খোকাপীরের থানে হাঁস, মুরগী, পাখি প্রভৃতি প্রাণী বলি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া এটি বৌদ্ধ প্রভাবপ্রসূত সংস্কার। ১লা মাঘ, সন্ধ্যেবেলা খোকাপীরের পূজা হয়। এইরূপ পূজার রীতি দক্ষিণরায়ের জাতাল পূজাতে প্রত্যক্ষ করা যায়। পূজার দিন নারী ও পুরুষের তাড়ি জাতীয় মাদক দ্রব্য গ্রহণ জাতাল পূজাতেই আছে। মুসলিম কালচারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ অশাস্ত্রীয় বলে বিবেচিত হয়। এটি হিন্দুকালচার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া বাতাসা লুট, সন্দেশ, পাটালি, খই -মুড়ি ফলমূল বিতরণ এসবই হিন্দু সংস্কৃতিরই প্রভাব রূপে মান্য করা যায়। মৃতবৎসা ও সন্তানহীনার সন্তান লাভ সাধারণত পঞ্চানন্দের ও ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাভ হয় বলে লোক বিশ্বাস। এছাড়া এই দেবতার কৃপায় অম্লরোগ, হাঁপানীরোগ সারে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষের বিপদ হতে রক্ষা করেন ধর্মঠাকুর। এইরূপ বিশ্বাস খোকাপীরকেন্দ্রিক সংস্কারে আছে। সুতরাং লোককথা, পূজাচার লোকবিশ্বাস, পূজাস্থান ইত্যাদির পর্যালোচনায় অনুমান করা যায়, আদিতে খোকাপীরের পূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাস্য মহাদেব পঞ্চানন্দ বা ধর্মঠাকুরের পূজার অবশেষ। খোকাপীর সমাজ বিবর্তনের ধারায় মিশ্র সংস্কৃতিজাত একটি লোকদেবতারূপেই সবশ্রেণীর মানুষের কাছে পূজিত ।

(প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধান ও ড. কালিচরণ কর্মকারের সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রবন্ধটি লিখিত)

লোকদেবতা ঃ বনবিবি

বারুইপুর থানা অঞ্চলে পূজিত বিশিষ্ট লোকদেবী হলেন বনবিবি। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামে একাধিক বনবিবির থান প্রত্যক্ষ করা যায়। বনবিবির কোথাও মূর্তি আছে, কোথাও নেই । যেখানে বনবিবির মূর্তি নেই সেখানে বেদীর উপর এক বা একাধিক 'স্তুম্ভক' আছে। এই স্তুম্ভক পাঁচটি, সাতটি বা নটি হয়ে থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে জলও জঙ্গলের সাথে যাঁদের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক তাঁরাই দেবীর প্রধান সেবক। একসময় এই অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত। নদীনালা বিধৌত এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ একদা জল ও জঙ্গ-লের সাথে জীবিকার তাগিদে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। জঙ্গল অনূপ প্রান্তে

শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশে বনবিবিই ছিল তাদের প্রধান ভরসা।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকদেবতা মানুষের রোগতাপ হতে পরিত্রাণ করেন। কিন্তু বনবিবি প্রধানত জঙ্গলে জীবিকাসন্ধানী মানুষকে হিংস্র শ্বাপদের কবল হতে রক্ষা করেন। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান, খ্রিষ্টান প্রভৃতি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দেবী তিনি নন – যাঁরাই জীবিকার সন্ধানে জঙ্গলে যান তাঁরাই তাঁর পূজার্চনা করেন। সেকারণে জেলে, মৌলে, কাঠুরে, বাউলে, দেবীর প্রধান সেবক।

সুন্দরবনে জীবন জীবিকা সম্পৃক্ত অরণ্যদেবী হলেন বনবিবি। বাঙালীর মাতৃভাবনার সাথে যুক্ত হয়ে তিনি বনবিবিমা নামে পরিচিতা। শাজঙ্গুলী তাঁর ভাই ও অনুচর। শা-জঙ্গুলী শব্দের অর্থ জঙ্গলে যিনি ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরা করেন। বনবিবির কোলে একটি সন্তান আছে, তার নাম দুখে। জঙ্গলে দুখী ও আর্তমানুষের প্রতীক এই দুখে, যাকে বনের জননী বনবিবিমা কোলে তুলে রাখেন। বনবিবির মূর্তি কোথাও ভয়ঙ্করীরূপে নয়; শান্ত-সৌম্য , ভক্ত বৎসল ও দয়াবতী রূপেই তিনি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিতা। পৌরাণিক দেবীদের মতই তিনি লাবণ্যময়ী ও সালংকারা। দেবীর বাহন বাঘ, সিংহ, কোথাও মুরগী। বাহনহীন বনবিবির মূর্তিও প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবীর দুটি হাত, এক হাতে আশাদণ্ড থাকে। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে দেবীর মূর্তি বাঙালী পোষাক পরা ও সালংকারা। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এ দেবীর খান্দানী মুসলিম কিশোরীর পিরাণ, পাজামা, জুতা-মোজা পরা ও গায়ে পাতলা ওড়না থাকে। বারুইপুর অঞ্চলে দেবীর পূজা হয় অতি সাধারণভাবে। ধূপ জ্বেলে বাতাসা সন্দেশ দিয়ে দেবীর হাজত দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও নৈবেদ্য হিসাবে ফলমূলের ডালা দেওয়া হয়। এখানে ভক্তির আতিশয্য থাকে না। অবশ্য জঙ্গলের পূজা ভিন্ন রূপ। সেখানে দেবীর নামে মোরগ বা মুরগী ছেড়ে দিয়ে পূজা হাজত দেওয়া হয়। এখানে ভক্তির অধিক্য থাকে।

বনবিবির উৎসতাৎপর্য নিরুপণ বাঙালীর মাতৃসাধনার ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব। বনবিবি হলেন মাতৃস্বরূপা, তাঁর কোলে সন্তান দুঃখে। যেমন গণেশ ক্রোড়ে মাতা দুর্গা, কৃষ্ণক্রোড়ে মাতা যশোদা, বসন্তরায় ক্রোড়ে মাতা শীতলা, সন্তান ক্রোড়ে মাতা ষষ্ঠী, ওলাবিবি, আসানবিবি, যীশু ক্রোড়ে মাতা মেরী প্রমুখ অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এই বিচারে বনবিবি চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতীক। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাথে তাঁর গুণগত মাধুর্য্যের সম্পর্ক আছে। আবার মহামায়া দেবীদুর্গা সম্পর্কে লোকবিশ্বাস, তিনি জলে জঙ্গলে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন, সে কারণে তাঁর আর এক নাম বিপদতারিণী। বনবিবির মধ্যেও বিপদতারিণী দেবীদুর্গার ত্রাণকর্ত্রীর গুন লোক সমাজ বিশ্বাস করে। তাছাড়া দেবীদুর্গার বাহন কোথাও বাঘ কোথাও সিংহ। বনবিবির বাহন কোথাও বাঘ কোথাও সিংহ । দেবী মহিষাসুর মর্দিনীর আর এক নাম চণ্ডী, বনবিবির এক নাম বনচণ্ডী।. সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত অরণ্যদেবীর দুটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় যথা– একটি হিন্দু অপরটি মুসলিম। হিন্দুরূপটি নারায়ণী, চণ্ডী, বনদুর্গা হিসাবে পরিচিত এবং মুসলিম রূপটি বনবিবি রূপে খ্যাত। সুতরাং বনবিবি হিন্দু মুসলিম ধর্মচিন্তার একমিশ্র সংস্কৃতির অরণ্যদেবী, যাঁর উৎসগত তাৎপর্য নিহিত আছে প্রচলিত লোক বিশ্বাসের অনেক গভীরে।

একটি প্রাচীন স্থান

বেগমপুর ষাট কলনীর বনবিবিতলা একটি প্রাচীন স্থান। উত্তরভাগ পাম্পিং স্টেশন হতে এক কিমি দূরে বেগমপুর ষাট ও তের কলনীর মাঝে 'বনবিবিতলা'। এটি মজেযাওয়া বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত।প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বনবিবির পূজানুষ্ঠান হয়। দেবীর থানটি পূর্বে ফাঁকা মাঠে ছিল। বর্তমানে ইটের ঘর হয়েছে। এখানে বনবিবি – শস্যদেবী, রোগনিরাময়কারী দেবী, গৃহপালিত পশু পক্ষি রক্ষাকারীদেবী, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি বিধানকারী দেবীরূপে পূজিতা হন। দেবীর নামে একবিঘা জমি আছে। মেজবাবুর আবাদের মানুষ পূজার দায়িত্ব পালন করেন ও ষাটকলনীর মানুষ পূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করেন। এখানকার মেলায় 'গ্রামীন মেলার' আদর্শ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। মেলা ও পূজা উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়ান দীর্ঘদিনের সংস্কার হিসাবে পালিত হয়।

লোকদেবতা ঃ সাতবিবি

বারুইপুর থানা এলাকায় বহুপূজিত লোকদেবতা হলেন সাতবিবি। লোকবিশ্বাস, সাতজন মুসলিম কন্যা (বোন) সাতবিবি নামে পরিচিতা। মতান্তরে সাতবিবি হলেন সাতটি কালান্তক রোগ। এই সাতটি রোগ হল – ওলা, ঝোলা, টান, টংকার, বাত, বাতবল ও ঝেটুনে; (এই নামের ব্যতিক্রম আছে) । ওলাওঠা (কলেরা) রোগের এই সাত লক্ষণ থাকায় এদের সাতবোন বা সাতবিবি বলা হয়েছে । এই রোগ কোন গ্রামে প্রবেশ করলে মহামারী রূপে দেখা দেয়। সে কারণে গ্রামের বাইরে সাতবিবির থান নির্মাণ করে পূজা-শান্তি করা হয়। বারুইপুর থানা অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গ্রামের প্রান্তে সাতবিবির থান দেখা যায়।

সাতবিবির থান বলতে বোঝায় উঁচু বেদির উপর সাতটি 'স্তূম্ভক'। নারকেলের অর্ধ বড়মালা উপুড়করে বসালে যেরূপ আকৃতি হয় সেইরূপ কাদা বা সিমেন্টের স্তূপাকৃতিকে স্তূম্ভক বলে। সাধারণত বট; অশ্বত্থ, পাকুড়, শেওড়া প্রভৃতি গাছের গোড়ায় সাতবিবির থান নির্মিত হয়। উল্লেখ্য স্তূম্ভক তিনটি, পাঁচটি , সাতটি, নয়টি এমনকি একুশটিও দেখা যায়। একুশটি স্তূম্ভকের একুশটি নামের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি নিতান্তই কাল্পনিক নাম। সাতবিবির থানের পাশে বনবিবির পৃথক থান লক্ষ্য করা যায়। আবার একই থানের মধ্যে স্তূম্ভক ও বনবিবির মূর্তি বা ছলন থাকে। কোন কোন থানে তিনটি স্তূম্ভক দেখা যায়। এই তিনটি স্তূম্ভক মানিকপীর, ওলাবিবি ও বনবিবি নামে কল্পনা করা হয়। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই লোকদেবতার থানে হাজতপূজা দেন। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে সাতজন বিবির মূর্তি নির্মাণ করেও পূজা করা হয়।

সাতবিবির উৎস ও তাৎপর্যের বিষয়টি লোকবিশ্বাসের অনেক গভীরে। এরমধ্যে আছে বাংলার সমাজবিবর্তনের ইতিহাস। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মাতৃসাধনার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। মাতৃসাধনার একটি অঙ্গ হল সাতবিবির পূজা। সাতবিবি প্রকৃতঅর্থে সপ্তমাতৃকা। এঁরা হলেন ব্রাহ্মীমহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী ও মা-অসুরী। দক্ষিণভারতে এই নামেই সপ্তমাতৃকার পূজা হয়। বীরভূম বাঁকুড়া জেলার সাতবাউনী বা সাতবনদেবী হলেন চমকিনী, রঙ্কিনী, সনকিনী প্রমুখ। জঙ্গল মহলের অন্যান্য পল্লীতে পূজিতা জামমালা দেবীর সাত ভগিনী হলেন বিলাসিনী, কাজিজম, বাসলী,

চণ্ডী প্রমুখ। সপ্তমাতৃকা বা সাতটি দেবীর একত্র অবস্থায় পূজার প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। Mr. Earnest Maky তাঁর Early Indus Civilization নামক পুস্তকে মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রাপ্ত মৃন্ময়ফলকে সাতটি দণ্ডায়মান নারীমূর্তিকে দেবী বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ঐ দেবী হলেন শীতলা ও তাঁর ছয় ভগিনী (গো- কৃষ্ণ বসু, 'বাংলার লোকদেবতা' - পৃঃ ২১৪) দক্ষিণভারতে তামিলনাড়ুতে প্রস্তর ফলকে -ইরূপ সাতটি নারীমূর্তি পূজিত হয়। মূল মহাদেবের মন্দিরের বাইরে এই দেবীর বলি বা পিণ্ড প্রদান করা হয়। এই দেবীকে স্থানীয়ভাবে 'ভুত' বলা হয়। এছাড়া সাতটি স্তূম্ভক পূজাও দক্ষিণভ-রতে ব্যাপক প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং বারুইপুর অঞ্চলে যে সাতবিবির স্তূম্ভক পূজিত হতে দেখা যায় তার অনুরূপ মূর্তিও স্তূম্ভক দক্ষিণভারতের তামিলনাড়ু, কেরালাতেও ক্ষেত্রগবেষণা কালে প্রত্যক্ষ করা গেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপ্তমাতৃকার সামনে দুটি বড় স্তূম্ভক থাকে। একে চন্দ্র ও সূর্য বলা হয়, যা বারুইপুর অঞ্চলে দেখা যায় না। তামিলনাড়ুতে পাথরের বেদীর উপর তিনটি ও নয়টি শঙ্কু সদৃশ স্তূম্ভক দেখা যায় তিনটি স্তূম্ভক তিনবোনের এবং নয়টি স্তূম্ভক নয় কন্যার । তিন বোন হল চেলিআম্মান, গেঙ্গেআম্মান ও আঙ্গালাম্মান। এখানে এগুলি সর্পদেবী বলে পরিচিত। নবকন্যার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল -- কৌমারী, তিরিপুরী, কল্যাণী, রোহিণী, কালিকা, চণ্ডীকা, সামবেভী, সুভদ্রা ও দুর্গা। এই নবকন্যার দুই দিকে রাহু ও কেতু নামে দুটি সর্প আছে। একে সূর্য ও চন্দ্র বলা হয়।

উল্লিখিত আলোচনা সূত্রে বলা যায় সপ্তমাতৃকার পূজার প্রচলন সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী। বারুইপুর তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় একে সাতবিবি বলার কারণ হল সমাজবিবর্তনের দাবী। পূর্বভারত মাতৃপূজার পীঠস্থান। এখানে সপ্তমাতৃকার পূজার প্রচলন বহু প্রাচীন কাল হতে বহমান আছে। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর এখানকার অঞ্চল বিশেষের কিছু লোকদেবতার নামের পরিবর্তন করে ইসলামীকরণ হয়েছে। যেমন, মহাদেব হয়েছেন বড়পীর সাহেব, বনচণ্ডী বনবিবি, ওলাইচণ্ডী ওলাবিবি ইত্যাদি। তেমনি সপ্তমাতৃকা সাতবিবি নামেই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়েছে এবং পূর্বের ঐতিহ্য আদ্যাপি বহমান। বাংলায় নদী বা সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে দক্ষিণভারতের সংস্কৃতির প্রভাব পর্যালোচনা করে অনুমান করা যায়। সাতবিবিকেন্দ্রিক সংস্কার দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়সংস্কৃতির প্রভাব।

তথ্যসূত্র

১) ড. কালিচরণ কর্মকার, মৌনমুখর।
২) সুধীর সরকার সঙ্কলিত পৌরাণিক অভিধান।
৩) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, জুন ১৯৮৭
৪) ডঃ দেবব্রত নস্কর, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা , মে ১৯৯৯
৫) কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা , ১মপর্ব, জানুয়ারী ২০০১
৬) ড. দেবব্রত নস্কর, লোকশ্রুতি – ১৮, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানু -২০০১
৭) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য – বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
৮) সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত – কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা।
৯) অশোক মিত্র সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা।
১০) সাক্ষাৎকার ঃ ডঃ জয়রামন সুরেশ (তামিলনাড়ু)
রঞ্জন চক্রবর্তী, রঞ্জিত চক্রবর্তী (ধপধপির দক্ষিণরায়ের সেবাইত) দীনবন্ধু তরফদার প্রমুখ।

বারুইপুর থানার লোকদেবতার থান

লোকদেবতা	গ্রাম	মূর্তি	বিশেষপূজা	বার্ষিক পূজা	উৎসব দিন
দক্ষিণ রায়	ধপধপি	আছে		১লা মাঘ	১
ভূতবাবা (ছোট কাছারী)	শূলিপোতা	আছে	শনি ও মঙ্গল	ফাল্গুনমাস, কৃষ্ণপক্ষ	১
বৈদ্যনাথ (ভূতের কাছারী)	কুন্দরালী (কল্যানপুর	আছে	শনি ও মঙ্গল	নীলবাতির পূর্বদিন	১
ধর্মঠাকুর	সীতাকুণ্ডু (ছাটুইপাড়া), নিহাটা (কল্যাণপুর), নড়িদানা, বিদ্যাধরপুর				
পাঁচুঠাকুর	মধ্যসীতাকুণ্ডু (হালদারপাড়া)	আছে		জ্যৈষ্ঠমাস	১
পঞ্চানন্দ	চাম্পাহাটী, বলবন (ধোপাপাড়া), কুন্দরালী, বারুইপুর (শাঁখারীপাড়া) ছাটুইপাড়া, বারুইপুর (সাহাপাড়া), নজিরপুর, উকিলপাড়া (সিটকোরমোড়)	আছে			
বারাঠাকুর	প্রায় প্রতি হিন্দু পরিবারে	আছে			
মাকাল ঠাকুর	প্রায় প্রতি হিন্দু পরিবারে	নেই			
ব্রহ্মাঠাকুর	বারুইপুর (পুরাতন বাজার)	নেই			
নন্দিকেশ্বর বাবাঠাকুর	চিত্রশালী	নেই		চৈত্র ২৭শে	১
নারায়নী	বেগমপুর	আছে	মঙ্গলবার	ফাল্গুন /চৈত্র	১

বিশালক্ষ্মী	বারুইপুর(রাসমাঠ), বারুইপুর (কাছারিবাজার),ডিহিমেদমল্ল,মলঙ্গা	আছে			
অলক্ষ্মী	প্রতি হিন্দু পরিবারে	নেই			
সীতেমা	সীতাকুণ্ড	নেই			
শীতলা	রামনগর, কল্যানপুর, শিখরবালী, ধপধপি, বেগমপুর,(সরদারপাড়া) শশাড়ী স্কুল মাঠ	নেই			
চণ্ডী/তুলোচণ্ডী	বেগমপুর(মাঠ), চণ্ডীতলা(উলুঝাড়া), তুলোরবাদা নলতে হাটের নিকট	নেই			
মনসা	আলমপুর, শশাড়ী নস্করপাড়া, সীতাকুণ্ড(নস্করপাড়া), শশাড়ী (সরদারপাড়া) বিদ্যাধরপুর প্রভৃতি অঞ্চল।	আছে			
সন্তোষীমা	সাউথ গড়িয়া (জগন্নাথপুর)	আছে	শুক্রবার	অগ্রহায়ণ শেষ শুক্রবার	৪
মানিকপীর	কন্দমালা, বেগমপুর(শিঙ্কেরপুকুর), উঃমদারাট নন্দীপাড়া ফুলতলা (শাঁখারীপুকুর মাঠ)	নেই	সোম, শুক্র	১লা মাঘ	
দেওয়ান গাজী	সীতাকুণ্ড				
খোকাপীর	মধ্যকল্যানপুর চম্পাবাগানীর মাঠ	নেই			
বদরপীর	বারুইপুর (জোড়া মন্দিরের নিকট)	নেই			
বরকনগাজী/বড়খাঁ গাজী	নন্দীপাড়া (উঃ মদারাট), আলমপুর গ্রাম, বারুইপুর (পুরাতন বাজার, ধোপাগাছী, কাজীরাবাদ			১লা মাঘ	৭
সাহাচাঁদপীর	মসলন্দপুর (আঁধারমানিক)				
রক্তান গাজী	পুঁড়ির আবাদ				
বনবিবি	ষাটকলনী(বেগমপুর), মধ্যসীতাকুণ্ড, শশাড়ী (হেবলোর মাঠ)	আছে		১লা মাঘ	
বিবিমা	রামসাঁতাল (উত্তর শাগান), তেগাছি, ফুলতলা, রামনগর, রামনগর (পুরান হাটখোলা				

বারুইপুরের সংস্কৃতি ঃ পূজাপার্বণ ও মেলা

পূর্ণেন্দু ঘোষ

মেদনমল্ল পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরের অবস্থান ২২° ৩০´ ৪৫´´ অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৫´ ৩৫´´ দ্রাঘিমাংশে। এর চতুঃসীমায় রয়েছে পূর্বে ক্যানিং, পশ্চিমে আমতলা, উত্তরে সোনারপুর ও দক্ষিণে মগরাহাট। আজকের মেগাসিটি কলকাতাকে দেখে যেমন জলা-জঙ্গলময় সেদিনের সাবেক কলকাতাকে উপলব্ধি করা যায় না, খুঁজে পাওয়া যায় না পঞ্চান্নটি গ্রামের ঠিকুজি; তেমনই শহরতুল্য বারুইপুরকে ছাপিয়ে নামের মাহাত্ম্যে চোখের সামনে দৃশ্য হয়ে ওঠে না আটিসারা, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, পদ্মপুকুর, বলবন সহ আরও কয়েকটি গ্রাম্য জনপদ। হয়তোবা বারুইপুরকে লায়েক করে গড়ে তুলবার জন্য স্বয়ং—সম্পূর্ণ উপরোক্ত গ্রামগুলি নিজেদেরকে আত্মাহুতি দিয়েছিল। এমনকি বারুইপুর শহরের কাঁধছোঁয়া কয়েকটি গ্রামের সাবেক নাম - পরিচয়টুকুও হারিয়ে গেছে। যেমন কিনা, ধপধপি গ্রামের বিশিষ্ট লোকদেবতা দক্ষিণ রায়ের মন্দির যেখানে অবস্থিত সে-অঞ্চলের যে একদা পরিচয় ছিল ভিখ্‌তাড়া > ভিক্ষুতাড়া, সে কথা কবুল করার মতো স্মৃতিধর মানুষও তো হারিয়ে গেছেন। বারুইপুর থানার অন্তর্গত আরও কয়েকটি সমৃদ্ধ গ্রাম্য জনপদ লুপ্ত হয়ে গেছে; শুধু কোনক্রমে বেঁচে আছে তাদের নামটুকু । যেমন আক্‌না'র পার্শ্ববর্তী আউলিপুর, সিদ্ধিবেড়িয়া, (চম্পাহাটি), চঙ্গো, বুড়ির আবাদ, কুঁড়েভাঙা, গুড়মির চক, মহেশ্বরপুর, ভারাগাছি, মালসাভাঙি, ছাওয়ালফেলি, টুনিমারী এবং ব্যাসাল। মহামারীতে উজাড় হয়ে যাওয়া ব্যাসাল বর্তমানে শুধুমাত্র নাম হিসাবে বেঁচে আছে স্থানীয় মানুষের কাছে। আবার কোন কোন গ্রাম সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে গেছে। আজকের চিনা গ্রামকে দেখে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে প্লাবিত সেকালের বর্ধিষ্ণু পল্লীর কথা ভাবাই যায় না।

যাক সে কথা, খোদ্ বারুইপুরের প্রসঙ্গে আসি। বারুইপুর পান চাষের জায়গা। 'বারু' শব্দের অর্থ পান (সংস্কৃত ঃ পর্ণ > পণ্ণ > পান)। বারু যিনি রোপণ করেন, তিনি বারুই। আর বারু যেখানে রোপণ করা হয় সেই ক্ষেত্রের পরিচয় 'বরোজ'। আংশিকভাবে বাংলার এই দুটি দেশি শব্দ এসেছে অনার্যদের ভাষা থেকে। কারণ আদি যুগে আর্যদের কাছে পান অজ্ঞাত ছিল। এমনকি পান অর্থবাচক তাম্বুলও আদিতে ছিল কোল জাতীয় শব্দ। 'বারুই' শব্দের প্রাচীন রূপ 'বারয়ী'। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একটি তাম্রশাসনে 'বারয়ী-পড়া'(বারুইপাড়া) রূপে লিখিত একটা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। জগন্মোহন পণ্ডিতের লেখা 'ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশাবলী' বা 'দেশাবলি বিবৃতি' নামক গ্রন্থ অনুসারে বারুইপুরের পূর্ব নাম ছিল 'বারুয়িগ্রাম'। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম থেকে পুর বা নগরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বারুইপুরকে অনেকগুলি জনপদকে গ্রাস করতে হয়েছিল। যাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বারুইপুরের পূজাপার্বণ ও মেলার বিবরণ লিখতে বসে প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত মুখবন্ধ স্বরূপ কথাগুলি এসে গেল। বারুইপুর ব্লকের মৌজার সংখ্যা ১৩৮টি আর গ্রামের সংখ্যা ১৬৯ টি।

এতগুলি গ্রামের প্রতিটি পূজা, পার্বণ ও মেলার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার এবং বিপজ্জনকও বটে। বিপজ্জনক এই কারণে যে পাছে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রামের কোন অবশ্য-উল্লেখ্য পার্বণকে হয়তোবা অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় পাশ কাটিয়ে যাওয়ার দায়ে নিবন্ধকার অভিযুক্ত হতে পারে। তথাপি কুঞ্জের গিরি লঙ্ঘন করতে হবে। অতএব বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন। এটা পাঠকের প্রতি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আলোচনার সুবিধার্থে পূজাপার্বণ ও মেলাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। যথা ;

ক) শাস্ত্রীয়
খ) লৌকিক
গ) বিবিধ

তবে এই নিবন্ধে শাস্ত্রীয় অপেক্ষা লৌকিক বিষয় বেশি করে প্রাধান্য পাবে। এই যুক্তিতে যে শাস্ত্রীয় পূজানুষ্ঠান শাস্ত্রের অনুশাসনে যতটা দৃঢ়ভাবে বাঁধা থেকে কালের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে, লৌকিকের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে না। লৌকিক পাল-পার্বণ, পূজা ও মেলা চিরাচরিতভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে হয়ে আসে। এর কোন শাস্ত্রীয় অনুশাসন নেই। তেমনই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে বাধা নেই। এ কারণে বহু লৌকিক পূজানুষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গেছে বা লুপ্তপ্রায় হতে বসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হাড়িঝি চণ্ডী ও পেঁচোপেঁচি পূজা। এই দুটি লৌকিক দেবদেবীর পূজা একসময় ব্যাপক হারে জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তলানিতে এসে ঠেকেছে। অবশ্য কালের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় উভয়বিধ পূজানুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত অথবা বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এর প্রত্ন-দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার প্রাক্কালে একটা নিরিখ নির্ধারণ করে নেওয়া যেতে পারে। বারুইপুরের পূজা, পার্বণ ও মেলা সম্পর্কিত আলোচনা কোন্ কালপর্ব থেকে আমরা শুরু করবো? নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় ও পেশাজীবী মানুষের বসবাস বারুইপুরে। এ মুহূর্তে হাতের কাছে নেই কাগুজে নৃতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান। কিন্তু কয়েকবারের ক্ষেত্র-সমীক্ষার সময় আমরা মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বহু জাত বা সম্প্রদায় লক্ষ্য করেছি। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ঃ ব্রাহ্মণ (দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, কনৌজিয়া), কায়স্থ, নবশাখ, মাহিষ্য, নমঃশুদ্র, বৈদ্য, পদ্মরাজ সদ্‌গোপ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কাওরা, মুচি, তিলি, শাঁখারী, স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, বারুই, কর্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদি। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন প্রচলিত আছে বৈদিক উপাসনা ও পূজাবিধি তেমনই প্রচলিত আছে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও তান্ত্রিক ধর্মমত। আবার এসব ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষেরা জাঁকজমক সহকারে জঙ্গলপত্তনী লৌকিক দেবদেবী মনসা, বিবিমা, বিশালাক্ষ্মী, মানিকপীর, শীতলার পূজায় অংশ নেন। শীতলার জাগরণে রাতভোর গান শোনেন। জাগ্রত থানে হত্যে দেন, মানত করে ঢেলা বাঁধেন। অথবা পীরের উরুস কিংবা ফাতেয়া উৎসবে যোগ দিতে ছুটে যান মল্লিকপুর ও বাঁশড়ার গাজীর মাজারে। বহু সম্পন্ন পরিবারে কুলবিগ্রহ বিষ্ণুর প্রতীক রূপে নারায়ণ শিলার পাশাপাশি থাকে বাবা পঞ্চানন্দ। বাড়ির সীমানা সংলগ্ন সিজ্‌মনসা গাছের তলায় শোভা পায় বারাঠাকুর। আবার এমনও বহু পরিবার আছে, যেখানে বৈদিক

পূজানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু পালিত হয় না; কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো থাকে বাবাঠাকুর দক্ষিণ রায় কিংবা পীর মে রক গাজীর মাজারের ছবি। ফলে বিচিত্র এই পূজা-পালা-পার্বণে অংশ নেওয়ার ফলে এখানকার মানুষের মধ্যে আচরিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি, তার প্রতি একপেশে বিশ্বাস এবং তার বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড আর শাস্ত্রীয়ভাবে বিশুদ্ধ থাকছে না। সমাজের অলিখিত নিয়মে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পীরের হাজোতে অর্ঘ্য নিচ্ছে যেমন; তেমনই মুসলমান সম্প্রদায়ের উদার মনের অধিকারী ব্যক্তি ও নওজোয়ানরা হিন্দুর দুর্গাপূজায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক মিশ্রায়ণ ঘটছে। ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজানুষ্ঠান ও উৎসবে যোগদানের ফলে এখানকার সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। বঙ্গসংস্কৃতির এ এক অন্যতর রূপ নিঃসন্দেহে।

আটিসারার বৈষ্ণবচূড়ামণি সাধু অনন্ত আচার্যের ঘরে নদীয়াদুলাল শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রথম বৈদিক ধর্মের ছোঁয়া পেল বারুইপুর। কিন্তু তাঁর আগমনের আগেও তো ছিল আটিসারা ও তৎসন্নিহিত আরও কয়েকটি গ্রাম। কারা সেদিন বাসবাস করতো এখানে? কেমন ছিল তাদের পুজো-আর্চা? এসব জানতে কারই না বা কৌতূহল হয়! কিংবা এর চেয়েও সুদূর অতীতে আজকের বারুইপুরের ভৌগোলিক এলাকায় কি মানুষের বসবাস ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। এর সাক্ষ্য দিচ্ছে অজস্র প্রত্ন-দৃষ্টান্ত। যেমন বারুইপুরের আটঘরা, সীতাকুণ্ডু, রামনগর, চিনা, ভাঁটা, কল্যাণপুর, ধোপাগাছি ইত্যাদি প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গেছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম ও তৃতীয় শতকের যক্ষিণী, পঞ্চচূড় যক্ষিণী, সূর্য, সরস্বতী, বুদ্ধ, বিষ্ণু, বরাহ-অবতার ইত্যাদি পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তি। প্রত্নবিশারদরা এসব মূর্তি দেখে গুপ্ত, শুঙ্গ, পাল ইত্যাদি যুগের বলে কাল নিরূপণ করেছেন। এগুলো নিশ্চয়ই গৃহসজ্জার উপকরণ ছিল না। পূজিত হতো। আর আরাধ্য এই দেবদেবীর মূর্তিগুলোকে ঘিরে সেকালের জনসম্প্রদায় সম্বৎসর উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। তৎকালীন পূজানুষ্ঠানের এই ধারা বর্তমানে লুপ্ত। মজা পুকুরের দহ কিংবা প্রাচীন কোন ঢিবি থেকে এগুলোর নতুন করে প্রাপ্তির ফলে হয়তো নতুন উদ্দীপনায় পুজিত হচ্ছে; কিন্তু তা ভিন্ন নামে, ভিন্ন চেহারায়। আর এভাবেই জৈন পার্শ্বনাথ মূর্তি হয়ে গেছেন ধর্মরাজ অথবা বিষ্ণুমূর্তি হয়ে গেছেন ব্রহ্মময়ী কালীমূর্তি।

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। ছন্দ-মাধুর্য আনার জন্য হয়তো এই প্রবাদের একসময় জন্ম হয়েছিল। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে প্রবাদটির সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, তের পার্বণ নয়, আরও অজস্র পুজো -আর্চা-পাল-পার্বণ শুঙ্গ যুগে যেমন পালিত হতো, এখনও তেমনই পালিত হয়। চোখ খোলা রাখলে বারুইপুরের পথে-ঘাটে আজও দেখা যাবে, শীতলা, মনসা, মানিকপীর, ওলাবিবির পুজোর জন্য মাগুন তোলা, কাওরা-বাজনা সহযোগে মাথায় করে ঠাকুরের ছলন নিয়ে যাওয়া, চৈত্র মাসের চড়ক, সন্ন্যাস ব্রত করা, নীলষষ্ঠী, ঝাঁপ, ঘোড়াছুটের মেলা ইত্যাদি। এর সঙ্গে সোম্বচ্ছর পালিত হয় এয়োতী স্ত্রীদের সাঁজপুজনী, ছড়াঝাঁট, অলক্ষ্মী বিদায়, ষষ্ঠীপুজো, বাউনি পুজো, মহিলাকৃত্য বারব্রত, একাদশীর উপবাস, হবিষ্যি করা সহ হরিবাসর ও ধুলোট, প্রভাতী সংকীর্তন, ঘটপুজো, পান্তা পালা, রাত জাগানিয়া দেশমালা, চোদ্দশাক, গোটা রান্না, মসজিদে

মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়া, ফকিরের তিরোধান উপলক্ষে বাৎসরিক উরুস এবং পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের গির্জায় উপাসনা ও খ্রিস্ট বিষয়ক নগর সংকীর্তন। বর্তমানে, আশির দশকের সময় থেকে বারুইপুর থানা এলাকার বিশেষত ছাওয়ালফেলির বাদা সংলগ্ন স্থানে, সাউথ গড়িয়ায় এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ঠাকুর সত্যানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, বালক ব্রহ্মচারী, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং আরও কয়েকজন আধ্যাত্মিক জগতের গুরুদেবতুল্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আশ্রম ও উপাসনাস্থল গড়ে উঠেছে। এসব জায়গাগুলিতেও নানা ধরনের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিবন্ধের বিশেষ জায়গায় এদের প্রসঙ্গও চলে আসবে।

আজকের বারুইপুরের উল্লেখযোগ্য দেবস্থান, পুজো-আর্চা, পাল-পার্বণ ও মেলাগুলির ওপর আলোকপাত করার আগে সর্বপ্রথমে বারুই সম্প্রদায় ও তাঁদের পুজো-আর্চার কথায় আসা যাক। কারণ বারুই সম্প্রদায় ব্যতিরেকে বারুইপুরের আলোচনা প্রায় শিবহীন যজ্ঞের সমান। বারুই সম্প্রদায় সঠিক ভাবে কতদিন আগে 'বারুইপুর' গ্রামে প্রথম উপনিবেশিত হয়, সে সালতামামি হলফ করে বলা যায় না। তবে পান উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী এই জনগোষ্ঠীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে রাঢ়—তাম্রলিপ্তে। এই অঞ্চলের মাহিষ্য জাতির দুটি উপজীবিকা ছিল পান চাষ ও বস্ত্র বুনন। এজন্য কেউ কেউ বলেছেন, বারুই জাতি মাহিষ্য বা এর সমগোত্রীয় কোন এক মূল জাতির শাখা বা Sub-caste। বারুই জাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তী মূলক কাহিনী প্রসঙ্গক্রমেই উল্লেখ করছি। কাহিনীটি হলো-জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন শিবের উপাসক। কিন্তু সময়ের অভাব অথবা আলস্যের জন্য তিনি প্রতিদিন ঠিক সময়ে শিবঠাকুরকে পুজো করতে পারতেন না। একদিন শিবঠাকুর তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "কি হে বাপু, তুমি তো দেখছি পান চাষ নিয়ে মশগুল হয়ে আছো। ভুলে গেছ আমার কথা। তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পূজা করো। তোমার সমস্ত অভাব আমি দূর করে দেব।" কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ব্রাহ্মণ তথাপি ডুবে রইল তার বৈষয়িক কাজে। পূজা না পেয়ে ক্ষুব্ধ শিবঠাকুর তখন ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিলেন – "তুমি বারজীবী হও।"

শিবের দ্বারা অভিশপ্ত সেই ব্রাহ্মণই নাকি বারুই জাতির আদিপুরুষ। বারুইদের চারটি থাক্ বা উপবিভাগ আছে। যথা ঃ গোউর, গৌতম, রূপ ও সনাতন। এই প্রত্যেকটি থাকের কুলদেবী হলেন সিংহবাহিনী চণ্ডী। বারুইপুরের বারুইরা সম্ভবত দত্তপাড়ায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন। দত্তপাড়া ছাড়াও এই সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে মদারাট, দুধনই (বারুই পাড়া) ও শিবপুরে। একসময় বারুইরা ব্যাপকহারে পান চাষে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় লুপ্তই বলা চলে। 'আদি বারুইপুর' দত্তপাড়ায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করে একটিও পানের বরোজ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মদারাটে এখনও নাকি অল্পস্বল্প পান চাষের চল্ আছে।

বারুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার হলো, শুদ্ধ শরীর নিয়ে পানের বরোজে ঢুকতে হয়। রাতের ব্যবহৃত কাপড় ও অশুদ্ধ দেহ নিয়ে বরোজে ঢুকলে অনাচার অনিবার্য। এতে মা চণ্ডী রুষ্ট হন। এবং বরোজ নষ্ট হয়ে যায়। দেহশুদ্ধির জন্য পানচাষীকে স্নান করতে হয়।

স্নানের বিকল্প শরীরের অর্ধেক নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে নেওয়া অথবা নিদেনপক্ষে মাথায় একতালু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেওয়া। বরোজ ঢোকার সময়ে পানচাষী ও তার পরিবারের লোকেরা সর্বপ্রথমে মা চণ্ডীকে শরণ করে প্রণাম নিবেদন করেন। বরোজে মা চণ্ডীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসের শুক্লাপঞ্চমী অথবা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার সময়ও বরোজ পূজার রীতি আছে। আর পূজা-পদ্ধতিও খুব অনাড়ম্বর– সাদামাঠা। মাটির তৈরি দেবীমূর্তি বরোজের উত্তর বা পুবদিকে প্রতিষ্ঠা করে চাঁদমালা, ফুল, বেলপাতা দিয়ে পূজা করা হয়। তবে বারুইপুরের বারুইরা বরোজে মূর্তি স্থাপন করেন না; এর পরিবর্তে দেবীর ঘট বসিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করেন। পূজার দিনে নিরামিষ অবশ্য পালনীয় প্রথা।

বৈষ্ণব-তীর্থ আটিসারা – আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত এই গ্রামে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বসবাস করতেন পরম বৈষ্ণব-ভক্ত সাধু অনন্ত আচার্য। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নেওয়ার পর পুরী যাত্রার উদ্দেশ্যে শান্তিপুর থেকে পায়ে হেঁটে আটিসারা আসেন। চৈতন্য ভাগবত-এ লেখা আছে ঃ

"হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কাহিতে কহিতে
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরীতে।
সেই আটিসারাগ্রামে মহাভাগ্যবান
আছেন পরম সাধু -শ্রী অনন্ত নাম।"
(অন্ত্যখণ্ড/ ২য় অধ্যায়)

১৫১০ খ্রিস্টাব্দের গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা বলা বাহুল্য বারুইপুরের সমজ-মানসে নবজাগরণের জোয়ার আনে। স্থানীয় মানুষের চিত্তের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। সাধু অনন্ত আচার্যের ঘরে এক রাতের আতিথ্য গ্রহণ করেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। দুজনের মধ্যে সারারাত ব্যাপী কৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্গূঢ় আলোচনা চলে। এরপর বারুইপুর শ্মশান-ক্ষেত্রে সপারিষদ্ শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হয়ে সাধু অনন্তের গাওয়া কীর্তনে অংশ নেন। সেই থেকে বারুইপুরের শ্মশানের নাম 'কীর্তনখোলা'। অনন্ত আচার্য তাঁর বসত-বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌর-নিতাই-এর দারুময় বিগ্রহ। সাধু অনন্তের মৃত্যুর পর দেবসেবার ভার নিয়েছিলেন স্থানীয় পুজারীরা। এই বৈষ্ণব তীর্থের মাহাত্ম্যের কথা বারুইপুরের বাইরে খুব একটা প্রচারিত ছিল না। বহু পরে আটিসারার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারকল্পে আসেন পুরীর রামদাস বাবাজী। পূজারী সেবায়েতরা সাধু অনন্তের শ্রীপাটের দায়িত্ব তুলে দেন এঁর হাতেই। বর্তমানে এই শ্রীপাটে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন বরানগর পাটবাড়ির কর্তৃপক্ষরা। তাঁরাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। আটিসারার মহাপ্রভু বাটিতে গৌর নিতাইয়ের নিত্য পূজা হয়। সেই সঙ্গে চলে অখণ্ড সংকীর্তন। বৈশাখ মাসে এক পক্ষকাল্ ব্যাপী একটি মেলা বসে এখানে।

বৈষ্ণবদের আর একটি কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় বেগমপুর গ্রামে। এখানকার 'শ্রীগুরু সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয় আনুমানিক পনের বছর আগে। প্রতিষ্ঠাতা বক্রেশ্বরের বৈষ্ণব-সাধক বনমালী দাস বাবাজী। এঁর জন্মস্থাননদীয়ার খানাকুলে। এই আশ্রমে বাবাজীর প্রতিষ্ঠা করা

নিমকাঠের গৌর-নিতাই এর বিগ্রহ আছে। বিগ্রহ দুটির কারিগর ছিলেন নাজিরপুরের শ্রীমন্ত মিস্ত্রী। বহুদিন হলো বাবাজী গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা করা আশ্রমের দেখ্ভাল করে চলেছেন তাঁর পরম ভক্তবৃন্দ। বর্তমানে এখানে মঠ তৈরির জন্য পাকা অট্টালিকার কাজ চলছে। জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ও গুরুপূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে এই সেবাশ্রমে নানারকম উৎসব পালিত হয়। উৎসব হয় বাবাজীর তিরোধান দিবসেও। সেই সঙ্গে হয় মালসা ভোগ। অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন মাসের অমাবস্যার শিবচতুর্দশীর দিনে।

রায়চৌধুরীদের পুজো-পার্বণ – ষোড়শ শতকের পর অষ্টাদশ শতক। সদর বারুইপুরের সমাজ- মানস নতুন করে আন্দোলিত হয় এই সময়ে। জমিদার রায়চৌধুরীবাবুদের বদান্যতায় ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর জমিদান, সদাব্রত উদ্‌যাপন, মঠ-মন্দির-দরগা প্রতিষ্ঠা এবং রাসযাত্রা, দোল, দুর্গোৎসবের ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক মন মুগ্ধতা পায়; চিত্ত-বিনোদনের হরেক প্রকার রসদ পায় মানুষ।

বারুইপুরের রায়চৌধুরীবাবুদের আদিপুরুষ হরিপলাশ দত্ত। বসবাস করতেন বিহার রাজস্থানের সীমান্তবর্তী গ্রাম উজ্জনীতে। এঁর বংশধর রাজা মদন রায় দিল্লির মুঘল বাদশার ফরমান অনুযায়ী আলিপুর মহকুমার মেদনমল্ল এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত পেঁচাকুলি নামে দুটি পরগনার শাসক হিসাবে দায়িত্ব পান। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' হরিনাভি গ্রামের কবিকেশরী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দুর্গামঙ্গল', 'হরপার্বতী মঙ্গল', 'বাঁশড়ার গাজীর গান' এবং 'মদনপালা' পুঁথিতে মদন রায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ঢাকার নবাব নাজিম শায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক ছিলেন। সোনারপুর থানার রাজপুরে তাঁর গড়বেষ্টিত প্রাসাদ ছিল। এই বংশের একটি শাখা আজও তাঁর ভগ্ন প্রাসাদে নতুন বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। রায়চৌধুরীদের সদর কাছারী ছিল বারুইপুরে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জরীপের সময় বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে যায় রাজপুর ও হরিনাভি গ্রাম। গ্রামদুটি কিনে নেন রাজপুরের দুর্গারাম কর চৌধুরী। তখন রাজবল্লভ রায়চৌধুরী বসবাসের জন্য চলে আসেন বারুইপুরে। বর্তমান রাসমাঠের পাশে প্রাসাদ তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। এঁর সময়েই বারুইপুরের বিভিন্ন জায়গায় মাথা তুললো মঠ-মন্দির-মসজিদ ও গির্জা। রাজা মদন রায়ের বংশ বৈষ্ণবতীর্থ আটিসারার প্রভাবে বৈষ্ণব বলে পরিচিত হলেও তাঁদের পারিবারিক পুজো-আর্চায় তান্ত্রিক –শাক্তমত লক্ষ্য করা যায়। রাজবল্লভের পিতামহ দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী অনেক আগেই আটিসারার মাহাত্ম্যের কথা শুনেছিলেন। এ কারণেই তিনি রাজপুরের গঙ্গাঘাটে উদ্‌যাপন না করে শ্রীচৈতন্যদেব আটিসারার যে স্থান থেকে ছত্রভোগ পরিক্রমার জন্য নৌকায় ওঠেন সেখানেই সদাব্রত করেন এবং এক লক্ষ ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেন। তাঁর সদাব্রতের স্থান বর্তমানে সদাব্রত ঘাট নামে পরিচিত। যাত্রীনিবাসের ঘর সহ এই ঘাটটি বেঁধে দিয়েছিলেন এই বংশেরই উত্তর-প্রজন্ম জমিদার রাজকুমার রায়চৌধুরী। অধিকন্তু জমিদার দুর্গাচরণ যশোহর জেলার ধুলিয়াপুর গ্রাম থেকে ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণ এবং মেদিনীপুরের ক্ষেপুৎ গ্রাম থেকে পাঠক পরিবারকে এনে বারুইপুরের নিষ্কর ভূমিতে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ সুযোগ থেকে অন্যান্য বৈদিক

ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও বঞ্চিত হয়নি। দাক্ষিণাত্য বৈদিক পাঠকরা এসেছিলেন বর্গীর হাঙ্গামা হওয়ার আগে। এঁদের বংশধররা আজও জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী দেবীর পূজা করে থাকেন। রায়চৌধুরীদের গৃহদেবতা 'মাতা আনন্দময়ী' কালীমূর্তি। আনন্দময়ীর পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ রাজপুরে আছে। তান্ত্রিক মহন্ত আনন্দগিরির প্রতিষ্ঠিত এই আনন্দময়ী পরে জমিদার বাড়িতে চলে আসে। তাঁর জন্য তৈরি হয় দেবালয়। দেবালয়ে দেবীর বেদী ছাড়াও পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। তান্ত্রিক মতে দেবীর পূজা ও বলি হয় প্রতি অমাবস্যায়। আনুমানিক ১৭৫০ সাল নাগাদ আনন্দগিরির অনুরোধক্রমে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় মায়ের আসনের নিচে। মায়ের ভোগের জন্য শিখরবালি গ্রামের এক চাষী পরিবার প্রতিবছর কড়াই শাক ও ধানক্ষেতের চিংড়ি মাছ দিয়ে যেতেন। এই প্রথার পিছনে একটা কিংবদন্তী আছে। আনন্দময়ী ছাড়াও জমিদারবাবুরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুর্গাদালান, রাধামাধবের মন্দির, শিবমন্দির ও জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি। জমিদারদের পারিবারিক দুর্গাপূজায় আজও নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। এর জন্য সুন্দরবনের জনৈক আদিবাসী পরিবার নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে হাজির হয় নবমী তিথির দিনে। দুর্গার আগমন বার্তা মহাদেবের কাছে পৌছানোর জন্য সেই পাখিকে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয় দশমী তিথিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের পরেই।

জমিদারবাড়ির নিজস্ব দেবালয়গুলি ছাড়াও বারুইপুরের কয়েকটি দেবালয় ও পীর-পীরানীর থানের সঙ্গে জমিদারদের কিছু না কিছু সূত্র জড়িয়ে আছে। এমনকি বারুইপুরের বাইরে বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজীর দরগা ও মক্কাপুকুর খনন কর্মের সঙ্গে রাজা মদন রায়ের সম্পর্ক আছে। জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত ওলাবিবিমার দরগা আছে পুরাতন বাজারের বাগানী পাড়ায়। এর জন্য তাঁরা জমিদান করেছিলেন। দেবীর প্রাত্যহিক পূজার খরচ আজও তাঁরাই বহন করেন। বিবিমার বার্ষিক হাজোত হয় পৌষমাসের শুক্লপক্ষের শনিবারে। জমিদার বাড়ির বয়স্কা মহিলারা বেলা বারোটা পর্যন্ত উপবাসে থেকে প্রথম হাজোত দেন। এর পরেই হাজোত দেয় মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা। বার্ষিক হাজোতের সময় বিশেষ রীতি হিসাবে জমিদার বাড়ির বয়স্কারা কড়ি দিয়ে বিবিমার মূর্তি গড়েন। এটা তৈরি করা হয় সন্ধ্যায় আনন্দময়ী মাতার আরতি হওয়ার পর। মূর্তি তৈরির পর মনস্কামনা জানিয়ে চৌকাঠে জল ঢালা হয়। এরপর দেয়ালে আঁকা হয় সিঁদুর-কাজল ও চন্দনের বিবিমা-র মূর্তি। বাগানী পাড়ার এই বিবিমার পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় যাত্রা, পুতুলনাচ ও বিবিমার গান।

প্রজাদের আধ্যাত্মিক তুষ্টি ও মনোরঞ্জনের জন্য জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরী তাঁদের প্রাসাদ সংলগ্ন আট বিঘা ময়দান তথা রাসমাঠে রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও চড়ক উৎসবের সূচনা করেন। বারুইপুরের রাসমেলা খুবই বিখ্যাত। মেলাটির বয়স দুশো বছরেরও বেশি। রাধামাধবের মিলনোৎসবকে কেন্দ্র করে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আষাঢ় মাসে এই রাসমাঠেই এক সপ্তাহেরও বেশিদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রার সবচেয়ে বড় মেলা। এই মেলাকে বাগান-ব্যবসায়ীদের মেলা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

দূর-দূরান্তর থেকে বাগান-বিলাসী ক্রেতাদের ভিড়ে মেলার মাঠ জমজমাট হয়ে ওঠে। এখানকার ফল-ফুলের চারা ভারতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে যায়। চড়কের মেলা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্রসংক্রান্তি থেকে দু'দিন ধরে।

জমিদার বাড়ির প্রায় পাশে পুরাতন বাজারের কাছেই রয়েছে প্রাচীন দোলমঞ্চ। একসময় দোলমঞ্চটির সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত ছিল অজস্র নক্সাদার টেরাকোটায়। বর্তমানে তার সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া লিপিফলকে উৎকীর্ণ ছিল '১৩৭৩ শকাব্দ' অর্থাৎ ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ। সে কারণে এখানকার বিশিষ্ট গবেষকরা এই দোলমঞ্চকে বারুইপুরের প্রাচীন স্থাপত্য রূপে নির্ধারণ করেছেন। ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলের সময় এই দোলমঞ্চকে কেন্দ্র করে এখানে একদিনের মেলা বসে।

দক্ষিণ রায়ের জাঁতাল উৎসব – দক্ষিণ রায় এক বিচিত্র লোকদেবতা। বাংলার বহু গবেষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ এঁকে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। আজও গবেষণা চলছে তাঁকে নিয়ে; কিন্তু লোকপুরাণকথিত ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত আজও সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ রায়, দক্ষিণ দার ও দাক্ষিণেশ্বর একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। জঙ্গল করা বাওয়ালিদের পূজার ফলে দক্ষিণ রায় 'বাঘের দেবতা' বলেই খ্যাত। কিন্তু বৃহত্তর লোকসমাজ রোগ শোক-আধিব্যাধির সংহারক, শিশুর মঙ্গলকামী এবং কৃষিসহায়ক দেবতা হিসাবেই তাঁকে পূজা করেন। উপরন্তু দক্ষিণ রায়ের কাটা মুণ্ড 'বারামূর্তি' পূজিত হয় ফসল রক্ষাকারী ক্ষেত্রপাল রূপে। এঁকে অনেকে বাস্তুঠাকুরও বলে থাকেন। বারামূর্তি কোথাও একটা আবার কোথাও যুগ্ম। বোঝাই যায় মূর্তিদুটির একটি পুরুষ, অপরটি স্ত্রী। লোকপুরাণ অনুসারে এই দ্বিতীয় বারামূর্তিটি দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর।

হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, খুলনা, নোয়াখালি ও যশোহরে দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন থাকলেও এই দেবতার পূজার মূল কেন্দ্র বারুইপুরের ধপধপিতে। এখানেই আছে প্রায় আট ফুট উচ্চতার যোদ্ধা-শিকারীর বেশধারী দক্ষিণ রায়ের মূর্তি। তাঁর দেহের রঙ সাদা। হাতে রয়েছে বন্দুক। পরিধানে রয়েছে হলদে রঙের আঁটসাঁট ব্রিচেস ও বেনিয়ান। তার ওপরে হাতকাটা গলাবন্ধ কালো পিরান। পায়ে রয়েছে নীল রঙের মোজা ও শিকারী-জুতো। চুমরানো গোঁফ ও টানা টানা চোখ নিয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ীর ভঙ্গিমায় তিনি বসে আছেন। ধপধপির দক্ষিণ রায়ের মন্দির সমতল ছাদ বিশিষ্ট। ১৯০৯ সালে এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন বারুইপুরের জমিদাররা। সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন অনেক দেবোত্তর জমি। এই মন্দিরে নিত্যপূজা ও শনি-মঙ্গলবারে বারের পূজা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পৌষ-সংক্রান্তি বা তার পরের দিন 'আখিন-দিনে'। দক্ষিণ রায়ের এই বাৎসরিক পূজাকে বলা হয় 'জাঁতাল উৎসব।' এই পুজোতে ঠাকুরের ভোগের জন্য দেওয়া হয় কাঁকড়া, শোল মাছ পোড়া, মাংস ও মদ। পুজোর দিনে ঠাকুরের মাথায় পরানো হয় রজনীগন্ধার মালা, গলায় ঝোলানো হয় গাঁদা ফুলের মালা। দক্ষিশ রায়ের 'দোর ধরা' বহু পরিবারের মানুষ এবং মানতকারী ভক্তরা মন্দিরের পুকুর থেকে স্নান করে দণ্ডী কাটেন। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে

মানতের উৎসর্গ হাঁস ছেড়ে দেওয়া হয় বাবার পুকুরে। এই জাঁতাল উৎসবকে কেন্দ্র করে ১লা ও ২রা মাঘ দুদিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয় মন্দিরের সামনে। মেলাটি দুশো বছরের পুরাতন। এই থানার দুধনই গ্রামে বারাঠাকুরের থান আছে। চিনা গ্রামের সুপ্রাচীন পঞ্চানন্দ থানের পাশে এখনও ধুমধাম করে বাস্তুপুজো অনুষ্ঠিত হয়। নড়িদানার সরদারহাট পাড়ায় বন্দুকধারী দক্ষিণ রায়ের মূর্তি ও থান আছে।

ধর্মের পূজা ও ধর্মের জাতের মেলা – ধর্মঠাকুর মিশ্র লৌকিক দেবতা। এই দেবতার প্রকৃত উত্থানভূমি রাঢ় অঞ্চল। এবং পূজকরা হলেন হাড়ি, শুঁড়ি, ডোম, কাপালী ইত্যাদি নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ সম্প্রদায়। ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত ছিলেন সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ত্রেতা ও দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত। রামাই পণ্ডিত ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ইনি দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তি। ধর্মঠাকুরের আদি প্রচারগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'ও রামাই পণ্ডিত বিরচিত। বিশিষ্ট গবেষকদের ধারণা, ধর্মঠাকুর প্রাচীন ভারতের অনার্য সম্প্রদায়গুলির কোনও এক কৌম গোষ্ঠির নিজস্ব দেবতা। পরে গুপ্তযুগের সময়ে এই দেবতার পূজার বিধানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে।

মধ্যসীতাকুণ্ডুর মণ্ডল পাড়ায় একটি ধর্মঠাকুরের থান আছে। এখানে বিশেষ পূজার প্রচলন আছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যে মূর্তিটি ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হয়, সেটি আসলে বহু পুরাতন কালের ছোট আকারের একটি বিষ্ণুমূর্তি। মূর্তিটিকে সাধারণ মানুষের নজরের বাইরে রাখার জন্য একটা কুলুঙ্গির মধ্যে রাখা থাকে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে চড়কের সময় এই ধর্মঠাকুরের নামেও ঝাঁপ কাটা হয়। বারুইপুর থানার সবচেয়ে পুরাতন ধর্মঠাকুরের মন্দির রয়েছে নড়িদানায়। ফুলতলা থেকে চম্পাহাটি যাওয়ার পথে পাকা রাস্তার পাশে এই গ্রাম অবস্থিত। ধর্মঠাকুরের এই দেবস্থানটি 'ধর্মের জাতের মন্দির' নামেই পরিচিত। চারচালা বিশিষ্ট মন্দিরটি তৈরি করে দেন রাজপুরের ধর্মপ্রাণ জমিদার দুর্গারাম কর। মন্দিরে রাখা কূর্মমূর্তিটি 'নারায়ণ ধর্মঠাকুর' নামে আখ্যাত। এঁর পাশে রাখা কতকদুলো শিলাখণ্ডকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, শীতলা, মনসা ও গঙ্গার প্রতীকরূপে পূজো করা হয়। কূর্মমূর্তি সহ শিলাখণ্ডগুলোকে পাওয়া যায় ঘোষপুরের 'চৌধুরী পুকুর' খননের সময়। যিনি পেয়েছিলেন তাঁর নাম জানা যায়নি। তবে তাঁর বংশধর: গোপালচন্দ্র নস্কর দিগর এখনও আছেন।

ঠাকুরের নিত্যপূজা করেন মন্দিরের সেবায়েত ভট্টাচার্য বংশের পুরোহিতরা। এঁদের পূর্বপুরুষের আদি বসবাস ছিলো বর্ধমান জেলায়। অভিষ্ট সিদ্ধিলাভের পর মন্দিরের শ্বেত পাথরের বেদী নির্মাণ করে দেন সাউথ গড়িয়ার জমিদার তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শুভঙ্করী দেবী। ঠাকুরের নিত্যপূজা ছাড়াও মানতপুজো, সোম ও শুক্রবারে বারের পুজোর প্রচলন আছে। বিশেষ পূজা অর্থাৎ 'ধর্মের জাত' অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। ঐ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় নীলের বাতি, চড়ক ও ধর্মের গাজন। ধর্মের জাতের অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় পঞ্চমী থেকে এবং শেষ হয় বৈশাখী পূর্ণিমার পরদিন। সামগ্রিকভাবে এই পুজোর নাম 'সৃষ্টিপত্তন'। মন্দিরের সামনে বসে ধর্মমঙ্গলের গানের আসর। উৎসবের দিনে ধর্মঠাকুর চৌধুরী পুকুরে

স্নানে আসেন। ঠাকুরের সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ব্রতীদের শোভাযাত্রা। ব্রতীরাও স্নান করেন পুকুরে। একে বলা হয় 'মুক্তস্নান' বা মহাস্নান। ব্যাধি মুক্তির কামনায় এই পুকুরের জল সংগ্রহ করেন অনেকে। জাতের পূজা উপলক্ষে একসময় বারুইপুরের জমিদারদের স্টেট থেকে পূজার নানাপ্রকার উপচার আসতো। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে সেবায়েতদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এখনও জমিদারদের বংশধরগণের নামে পুজো ও সংকল্প হয়। এই মন্দিরে হত্যে, মানসিক বা মানতের প্রচলন আছে। শ্বেতী, ধবল, কুষ্ঠ, চুলকানি, পদ্মকাঁটা, আব ও পায়ের গুপো থেকে নিবারণের উদ্দেশ্যে ভক্ত ব্রতীরা এখানে মানত করেন। মানত-পুজোর উপচার কাঁঠাল, ওল, আনারস ও পদ্মফুল। জাতের পুজোয় নয় রকম বলি প্রচলিত। যথা; আখ, শশা, শিঙ্গিমাছ, পাঁঠা, ডাব, নটেশাক ইত্যাদি। এখানে আচরিত ধর্মের গাজন চৈত্র মাসের শৈব গাজনের অনুরূপ। জাতের পুজো উপলক্ষে মন্দিরের সামনে এক রাতের বিরাট মেলা বসে। নিহাটা গ্রামেও ধর্মের থান আছে। বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমায় এখানে বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশালাক্ষ্মী পূজা – নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা পূজিত লৌকিক দেবী বিশালাক্ষ্মী বাংলার অন্যতম লোকপ্রিয় শক্তিদেবী। তাঁকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কেউ বলেন, ইনি শাস্ত্রীয়; কেউ বলেন ইনি অনার্যদের দেবী; আবার কেউবা বলেন ইনি বৌদ্ধদের অন্যতম শাখা বজ্রযান কিংবা সহজযানীদের উপাস্যা। বাসলী, ডাকিনী, রঙ্কিনী, বিন্ধ্যবাসিনী – বিভিন্ন নামে বিশালাক্ষ্মী পরিচিতা। বিশালাক্ষ্মীর প্রকৃত উত্থানভূমি নাকি দ্রাবিড় দেশ। আদিতে ছিলেন অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের দ্বারা পূজিত তান্ত্রিক দেবী। পরবর্তীকালে তাঁর পূজাবিধিতে পৌরাণিক দেবসেবার প্রভাব পড়েছে। বারুইপুর থানা এলাকার মধ্যে তিনটি বিশালাক্ষ্মী দেবীর থান আছে। এই থানগুলির অবস্থিতি হলো মলঙ্গাগ্রাম, বারুইপুর পুরাতন বাজার ও কাছারী বাজারে। তিনটি থানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী রাখে পুরাতন বাজারের বিশালাক্ষ্মী মন্দির। মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন জমিদার রায়চৌধুরীবাবুরা। জনশ্রুতি এই মন্দিরের বিশালাক্ষ্মীর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আনন্দগিরির ধর্মপত্নী তারামণি দেবী। তাঁর মরদেহ প্রোথিত আছে নাকি মন্দিরের প্রাঙ্গণে। দ্বিভূজা দেবী বটুক ভৈরবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর নিত্যপূজা ছাড়াও বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গা-অষ্টমীতে। পূজা করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। পূজার প্রধান উপচার লাল নোটেশাক। এ নিয়ে আকর্ষণীয় একটি কিংবদন্তী আছে। এখানে ছাগবলির প্রচলন আছে। বার্ষিক পূজার সময় বহু মানুষের সমাগমে মেলার আকার ধারণ করে সমগ্র মন্দির-চত্বর।

আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত কাছারী বাজারের বিশালাক্ষ্মীর পূজাও জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজায় অংশ নেন মানতকারী মহিলারা। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন স্থানীয় বিত্তশালী চিংড়ি পরিবার। নড়িদানার কাটাখাল ধরে এগিয়ে গেলে পড়বে টগরবেড়িয়া, ভুরকুল ও মধুপুর নামে পাশাপাশি গ্রামগুলো। মধুপুর মৌজায় একটি পুরানো অশ্বত্থ গাছের তলায় বিশালাক্ষ্মীর থান আছে। অর্ধনির্মিত মন্দির আধুনিককালের কিন্তু থানটি বহুদিনের। এখানে বিশালাক্ষ্মীর বার্ষিক পূজা হয়।

শিব, পঞ্চানন্দ ও চড়কের মেলা – শ্মশানচারী শিব মূলত অনার্যদের দেবতা। পরে তাঁর আকৃতি ও পূজার রীতিতে আর্যীকরণ ঘটেছে। ত্রিশূল ও ডমরুধারী স্ফীতোদর মহাদেব বা শিবের নিম্নাঙ্গের পরিধানে থাকে বাঘছাল। খালি গায়ে তিনি বৃষভ বাহন হয়ে থাকেন। শিবের প্রচলিত মূর্তি এরকমই। মুক্ত জায়গা অথবা পাকা মন্দিরে গৌরীপট্ট সমেত পাথুরে লিঙ্গপ্রতীককেও শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়। শিশুরক্ষক লৌকিক দেবতা পঞ্চামন্দের কিন্তু লিঙ্গপ্রতীক দেখা যায়নি। শারীরিক অবয়ব ও বেশভূষায় শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও পঞ্চানন্দ স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবেই পূজিত হন। তাঁর মুখমণ্ডলের ভাব উগ্র– শিবের মতো শান্ত সৌম্য নয়। দেহের রং লাল, কোথাও তামাটে। পঞ্চানন্দ বিভিন্ন নামে পরিচিত – যেমন পাঁচু, পেঁচোঠাকুর, পঞ্চানন, বাবাঠাকুর ইত্যাদি। অবশ্য পেঁচো বা পাঁচুঠাকুর কোথাও কোথাও অপদেবতায় পর্যবসিত হয়ে গেছেন। এই লৌকিক দেবতার গায়ের রঙ কালো। চোখদুটি বেশ বড়, দেখলে ভয়ের উদ্রেক করে। পাঁচুঠাকুরের পাশে থাকে তাঁর স্ত্রী পাঁচিঠাকুরাণী। একত্রে এঁদেরকে ডাকা হয় পেঁচোপেঁচি নামে। পাড়াগাঁয়ে ধনুষ্টঙ্কার ও রিকেট আক্রান্ত শিশুর মঙ্গল কামনায় পেঁচোপেঁচিকে মানত ও পুজো করা হয়।

শিবপূজা হয় না-এমন কোন গ্রাম সম্ভবত বাংলা দেশের কোথাও নেই। বারুইপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। গৃহস্থ ও বারোয়ারী দুধরনের শিবমন্দির লক্ষ্য করা যায় এখানে। নিত্যপূজা ছাড়াও শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন করার ক্ষেত্রে বিশেষত কুমারী মেয়েদের মধ্যে উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। শিবের থান বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় চড়ক উৎসব। আবার কোথাও বা মন্দিরহীন খোলা মাঠে আয়োজিত হয় চড়কের ঝাঁপ ও চড়কমেলা। চড়কের কথা উঠলে অনেকেরই মনে পড়বে চড়ক গাছের কথা। এ গাছ লতাপাতা-শিকড়সহ জীবন্ত গাছ নয় – একটা বিশাল খুঁটি। চড়ক ছাড়া অন্য সময়ে যেটাকে ডুবিয়ে রাখা হয় পুকুরের জলে। পুকুর থেকে তোলা হয় উৎসবের প্রয়োজনে। ঝাঁপের সন্ন্যাসী ও মেলার দর্শকরা খুঁটির মাথা থেকে ঝোলানো দড়িতে ঝুলে এর চারদিকে চরকিপাক খায়। ইদানিং চড়ক-ঝোলার ব্যাপারটা কমতে বসেছে। শুধু মেলাটাই চলছে। উদাহরণ হিসাবে সাউথ গড়িয়ার চড়কডাঙার চড়কমেলার কথা উল্লেখ করা যায়। মেলাস্থানের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, একসময় এখানে চড়ক হতো; কিন্তু এখন আর হয় না। শুধু মেলাটাই চলছে। শতাব্দী প্রাচীন এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ যাত্রা ও পুতুল নাচ। তবে অন্যান্য মেলার মতোই 'ফড়' খেলা এই মেলাকে ভীষণ কুলষিত করছে।

এবার বারুইপুরের কয়েকটি অতি পরিচিত শিবমন্দিরের উল্লেখ করা যাক ঃ

কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব – মধ্য কল্যাণপুর গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায় অবস্থিত শিবমন্দিরের পুরাতন দেবালয় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান পঞ্চচূড় বিশিষ্ট মন্দিরটি তৈরি করে দেন নিহাটা গ্রামের বাসিন্দা ভবতারণ নস্কর মহাশয়। পরে সেই মন্দিরের সংস্কার কর্ম করেন সুরেন বারিক মহাশয়। আদি মন্দির তৈরি হয়েছিল আনুমানিক সেন যুগে। এই মন্দিরকে বেষ্টন করে একটি গড়ও ছিল। মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন এলাকাটি বুড়ো শিবতলা নামে খ্যাত। মন্দিরে স্থাপিত কালো কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গটি 'কল্যাণমাধব' নামে পরিচিত।

জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনৈক অজ্ঞাতনামা বণিক। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে পুণ্যস্থান কল্যাণপুর ও কল্যাণমাধবের উল্লেখ আছে। বর্তমান মন্দিরের সামনেই আছে 'শিবকুণ্ড' পুকুর। পূজার্থীরা এখানে স্নান করে পূজা নিবেদন করেন। বুড়ো শিবতলায় মেলা বসে বছরে দুবার। একটি হয় কৃষ্ণা চতুর্দশীর শিবরাত্রিতে এবং অন্যটি হয় চৈত্র-সংক্রান্তির নীলের পূজা উপলক্ষে। নীলপূজার রাতে গাজন গান অনুষ্ঠিত হতো একসময়। বর্তমানে তা আর হয় না। তবে শিবরাত্রি উপলক্ষে হরিনাম গানের প্রচলন আছে এখানে।

চিত্রশালী গ্রামের নন্দীকেশ্বর – সীতাকুণ্ডু গ্রামের অদূরে অবস্থিত চিত্রশালী গ্রাম। এই গ্রামের একতলা দালান বিশিষ্ট শিবমন্দিরটি 'চিত্রশালীর মঠ' এবং মন্দিরে রক্ষিত শিবলিঙ্গটি 'নন্দীকেশ্বর' নামে পরিচিত। প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে নন্দীকেশ্বর প্রতিষ্ঠার সঠিক সময়কাল আজও নিরূপণ করা যায়নি। স্থানীয় জমিদার জঙ্গলের মধ্য থেকে লিঙ্গটি খুঁজে পান এবং মন্দির তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্প্রতিক কালের মন্দিরটি তৈরি করেন বর্তমান সেবায়েত ইন্দুশেখরবাবুর পূর্বপুরুষ।

নিত্যপূজা ছাড়া নন্দীকেশ্বরের বারের পূজা হয় সোম ও শুক্রবার। সাড়ম্বরে পালিত হয় শিবচতুর্দশী। সর্বপেক্ষা বড় উৎসব হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে। শিবের মাথায় জল ঢালতে চিত্রশালীর মঠ সরগরম হয়ে ওঠে ২৫শে চৈত্র থেকে ।

পুরন্দরপুরের জোড়া মন্দির – আটচালা বিশিষ্ট জোড়ামন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ। এই জোড়ামন্দির 'পুরন্দরপুরের মঠ' নামেও পরিচিত। মন্দিরে রক্ষিত দুটি শিবলিঙ্গের পরিচিতি নারায়ণীশ্বর ও রামনাথেশ্বর। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধোপাগাছির জমিদার বংশের শ্রীকালীচরণ (শর্মা) হালদার মহাশয়। নিত্যপূজা ছাড়াও এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এর সঙ্গে আরও কয়েকটি শিবমন্দিরের কথা উল্লেখ করা যায়। যদিও উপরোক্ত মন্দিরগুলোর মতো মাহাত্ম্য এদের নেই। যেমন ঃ বারুইপুর জমিদারদের তৈরি শিবমন্দির। মন্দিরটি অবস্থিত কোষাঘাটা পুকুরের পাশে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে দুদিনের চড়কমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যপুর হাটের পাশে আছে একটি শিবমন্দির। মন্দিরে রক্ষিত শিবলিঙ্গটি জীর্ণ একটি মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্দিরটি তৈরি করে দেন স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রী মন্টু ঘরামী মহাশয়। ফুলতলায় আছে ছাঁটুই পরিবারের তৈরি শিবমন্দির। মন্দিরটি দালান আকৃতির । মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। মদারাট গ্রামের শিবঠাকুরের নাম দক্ষিণদার ঠাকুর। এ কারণে শিবের থান সংলগ্ন জায়গাটির নাম 'দক্ষিন্দর তলা'। ঠাকুরের নামে বারুইপুরের জমিদারদের দেওয়া নিষ্কর দেবোত্তর জমি আছে। এমনকি পূজার ঢাকিও বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করার জন্য জমি পেয়েছেন। দক্ষিণদারের বার্ষিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ৩১শে চৈত্র। পূজার যাবতীয় দেখ্‌ভাল ও ব্যয়ভার বহন করেন স্থানীয় মণ্ডল পরিবার। পারিবারিক পূজা হলেও একসময় গ্রামের সমস্ত বাড়িতে অরন্ধন পালিত হতো পূজার দিনে। অধিবাসীরা মণ্ডল বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। বর্তমানে চড়কের

ঝাঁপের কয়েকজন সন্ন্যাসী ওই পরিবারে আহারাদি করেন। গ্রামের সর্বজনীন উৎসব রূপে এখানে চড়কের দিনে আয়োজিত হয় বিশাল চড়কমেলা। এছাড়া এই গ্রামে জনৈক পাগলাবাবার শিবমন্দির আছে। এটা সাম্প্রতিক কালের তৈরি। মন্দিরে আছে কৈলাসপতি মহাদেবের যোগীমূর্তি। দেয়ালে জমানো আছে শিবের মাহাত্ম্য সূচক রিলিফ ভাস্কর্য। ২রা বৈশাখ পাগলাবাবা ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করেন। ৩রা বৈশাখ রাতের বেলায় এখানে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিগীতির বড় আসর।

সাউথ গড়িয়ার অতি পরিচিত শিবমন্দিরটি আটচালা বিশিষ্ট। মন্দিরের শীর্ষদেশে রয়েছে চূড়া ও আমলক। পূজার্থীদের বসার জন্য রয়েছে ছোটখাটো সম্মুখ বারান্দা। মন্দিরে স্থাপিত শিবলিঙ্গটির স্থানীয় পরিচিতি 'জীবনশ্বের শিব' নামে। বঙ্গাব্দের ১২৮০ সনে তৈরি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন চট্টোপাধ্যায়। গ্রামের প্রথম জমিদার ছিলেন চাটুজ্জেরা। রামজীবন সম্ভবত এই বংশেরই হবেন কেউ। শিবচতুর্দশী ছাড়াও ২রা ভাদ্র জন্মাষ্টমী তিথিতে এই মন্দিরে পূজা, ভোগ বিতরণ এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এই গ্রামের নস্করপাড়ার পঞ্চানন্দের থানে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজার প্রচলন আছে। একটি সিজমনসা গাছের পাশে শিবের বেদি করা আছে। বেদির ফলকে উৎকীর্ণ করা আছে – "প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম/শ্রী শ্রী পঞ্চানন জিউ সহায়/পরমেশ্বর ননীগোপাল চক্রবর্তী তস্য সহধর্মিণী পরমেশ্বরী সুরবালা দেব্যা / তাং ১৩২৭"। এখানকার বিগ্রহ বলতে একটি কষ্টিপাথরের দেড়ফুটের স্তম্ভ। কোন গৌরীপট্ট নেই। স্তম্ভের নিচে একটি গোলাকার গর্ত আছে। এই প্রত্নবস্তুটি পাওয়া যায় চক্রবর্তীদের পুকুর থেকে। স্থানীয় জনশ্রুতি হলো, উক্ত পুকুরে কেউ জল নিতে গেলে তার কলসী ভেঙে যেত। এরপর স্বপ্নাদেশ হয়, ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শিবলিঙ্গটি (?) সারা বছর পঞ্চানন্দের থানে রাখা হয় না। রাখা থাকে পূজারী সেবায়েতের বাড়িতে। এর পশ্চাতে কারণ কি – জানা যায়নি। নীলপূজার দিনে এই শিবলিঙ্গটি নিয়ে যাওয়া হয় নস্করপাড়ায়। পূজা সমাপন হয়ে গেলেই বিগ্রহ আবার ফিরে আসে পূর্বের জায়গায়। নস্করপাড়ার ঝাঁপ হয় সাউথ গড়িয়ার রক্ষাকালী থানের সামনে বারোয়ারীতলায়। পাড়ার অনুষ্ঠান ভিন্ন পাড়ায় হওয়ার কারণ ঠাকুরের নামে চিহ্নিত একটি সুউচ্চ খেঁজুরগাছ। এখানকার আকর্ষণীয় প্রথা হলো শিবের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসাবে ঝাঁপের মূল সন্ন্যাসী খেঁজুর কিংবা নারকেল গাছের একেবারে মাথায় চড়ে মাতি সংগ্রহ করে আনে। ঢাকের বাজনা সহকারে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয় দুপুরবেলা। সংগৃহীত মাতি পাতফলের ওপরে রেখে বিকেলবেলায় ঝাঁপ কাটা হয়। শোনা যায়, শিবের এই পূজা উপলক্ষে বারুইপুরের জমিদার সেবায়েত, ঢাকি এবং পূজার পরিচালককে জমিদান করেছিলেন। এই গ্রামের প্রতিবেশী গ্রাম খাড়ুপাতালিয়া। এখানে গোষ্ঠমেলা আয়োজিত হচ্ছে আনুমানিক কুড়ি বছর ধরে। সাউথ গড়িয়ার চারপাশের গ্রামগুলো ঢাকের বাজনায় জেগে ওঠে সংক্রান্তির দিনে। 'বাবা মহাদেবের চরণে সেবা লাগে' – এই ডাকে মুখর করে তোলে ঝাঁপ-সন্ন্যাসীরা। নীলপূজার দিবসে আগুন ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ ও কাঁটা ঝাঁপ অনুষ্ঠিত হয় চড়কডাঙা, তেগাছি, ঘোষপুর, আক্না, বাওড়া, মলঙ্গা, হাড়াল, নড়িদানা, বেগমপুর, শোলগোহালিয়া, রঘুনন্দনপুর ইত্যাদি গ্রামে।

মধ্য সীতাকুণ্ডুর মণ্ডল পাড়ার শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে চারদিনের উৎসব হয়। প্রথম দিন শিবপূজা। দ্বিতীয় দিন হাটসন্ন্যাস, তৃতীয়দিন নীলের বাতি এবং চতুর্থদিনে আয়োজিত হয় চড়ক। এখানে ঝাঁপ কাটা হয় হাটসন্ন্যাসের দিনে। এখানকার চৈত্র উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ঝাঁপ কাটার বাঁশের ভারার ওপরে রাখা একগোছা খড়ের আঁটি থেকে একটা করে খড় সংগ্রহ করা। লোকবিশ্বাস, এই খড় বাড়িতে রাখলে নাকি ছারপোকার উৎপাত বন্ধ হয়। চম্পাহাটির মণ্ডল পাড়ার শিবমন্দিরটি আটচালা রীতিতে তৈরি। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ২৫/৩০ বছর। এখানেও নীলপূজার দিনে ঝাঁপ অনুষ্ঠিত হয়। তেগাছির শিবতলার থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এখানে নিত্যপূজা হয়। শিবের থান আছে মাদারহাটে। শিবের গাজন উপলক্ষে এখানে চৈত্র মাসে একদিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আদিলপুর বা জয়কৃষ্ণনগরে যাওয়ার সহজতম পথ ঘুটিয়ারীশরিফ স্টেশন থেকে। চৈত্রমাসের ঝাঁপ এই গ্রামের প্রধানতম লোক-পার্বণ। এছাড়া বণিক পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় চড়ক-গোষ্ঠ মেলা। এটা চালু করেছিলেন বণিক ও দাস পরিবার। সম্প্রতি গ্রামের স্কুলমাঠে চালু হয়েছে গোষ্ঠ মেলা। মেলার অন্যতম আকর্ষণ গাজন গানের প্রতিযোগিতা ও লাঠিখেলা।

এবারে আসি পঞ্চানন্দের প্রসঙ্গে। বারুইপুরের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় পঞ্চানন্দের থান রয়েছে কয়েক জায়গায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য, চম্পাহাটি রেলস্টেশনের কাছে সিদ্ধিবেড়িয়ার পঞ্চানন্দ, বারুইপুরের পঞ্চাননতলা ও মদারাট গ্রামের শীতকো'র পঞ্চানন্দ।

সিদ্ধিবেড়িয়া মৌজায় অবস্থিত চম্পাহাটি। সিদ্ধিবেড়িয়ার পঞ্চানন্দের মন্দির প্রায় বিশেষত্বহীন। পাকা দেওয়াল ও টিনের চাল দেওয়া মন্দিরের ভেতর থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীপ্রাচীন একটা শিরিষগাছ। এই থানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, এই থানের বয়স প্রায় দেড়শ বছর। এখানে একদা একটি চাঁপাগাছের তলায় হাট বসতো। সেই চাঁপাহাটির হাটুরে ব্যবসায়ীরাই হয়তো পঞ্চানন্দের থানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই থানের সেবায়েত সাউথ গড়িয়ার ৺নেপাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ। থানের নবনির্মিত নাটমন্দিরে হরিনাম গানের আসর বসে বিশেষ বারের পূজার সময়। বারুইপুরের পুরাতন থানার অন্তর্গত পঞ্চাননতলার পঞ্চানন্দ খোলামেলা পরিসরে উঁচু ও পাকা প্রশস্ত বেদির উপর স্থাপিত। মূল বিগ্রহের দুপাশে রয়েছে পঞ্চানন্দের অজস্র ছলন। গোভূত-বাহন পঞ্চানন্দের সুন্দর মূর্তি দেখা যাবে মদারাটের শীতকো-তে। ষণ্ডরূপী গোভূতের চারটি পা-ই মানুষের পায়ের মতো। কাঠের ওপর সিমেন্টের পলেস্তারা লাগিয়ে অভিনব পঞ্চানন্দের মূর্তিটি তৈরি করেন নাজিরপুরের শ্রীমন্ত মিস্ত্রী। মূর্তির সামনে রাখা গোলাকার পাথর দুটির পরিচয় যথাক্রমে পঞ্চানন ও রুদ্রাক্ষ। বর্তমান দালান রীতির মন্দিরটি তৈরি হয়েছে সম্প্রতি - ১৯৯৭ সালে। মন্দিরের সামনে রয়েছে প্রাচীন বট ও তেঁতুল গাছ। গাছের তলায় কাঠের তৈরি হাড়িকাঠ। এর পাশেই রয়েছে আনুমানিক দেড় বিঘা আয়তনের 'শীতকূপ' পুকুর। এই পুকুর ও পঞ্চানন্দকে কেন্দ্র করে একটা কিংবদন্তিও আছে। এই থানের প্রাচীনত্ব জানা যায়নি। তবে সেবায়েত মুখোপাধ্যায় পরিবার এখানে চোদ্দ পুরুষ বসবাস করছেন। পঞ্চানন্দের সেবায়েত হিসেবে এই পরিবারকে প্রায় দুশো বছর আগে নিযুক্ত করেছিলেন

রায়চৌধুরী জমিদাররা। সেই সঙ্গে তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তিও দিয়েছিলেন। মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির আসন রয়েছে। এই আসনে বসেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেবায়েত ঁমনীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়। এখানকার পূজা অনুষ্ঠিত হয় মাঘী পূর্ণিমায়।

সাউথ গড়িয়ার নস্করপাড়ার শ্রী শ্রী পঞ্চানন জিউ মন্দিরটি পঞ্চানন তলায় স্থাপিত। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বালি-সিমেন্টে তৈরি পঞ্চানন্দের বিগ্রহসহ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমতী ঁশৈলবালা দাস। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের শ্রী শিবনাথ দাস ও শ্রীমতী রেণুকা দাস মন্দিরের দেখ্‌ভাল করেন। মন্দিরের সেবায়েত ঁনেপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার। পূজার সুষ্ঠুসম্পাদনার জন্য চক্রবর্তীরা ঢাকি ও অন্যান্যদের জমিদান করেছিলেন। এই থানের বার্ষিক পূজো অনুষ্ঠিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিনে। পশ্চিম ঘোষপুরের পঞ্চানন্দ থানের দেখাশুনা করেন মণ্ডল পরিবার। সেবায়েত ঘোষাল পরিবার। নড়িদানার পঞ্চানন্দের থান বহুকালের পুরাতন। পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছে ১৩৩৮ সনে। থানের প্রতিষ্ঠাতা ঁবিহারীলাল নস্কর ও কপিলমণি দাসী। আদিলপুরের পঞ্চানন্দের থান বহু পুরাতন। প্রতিষ্ঠাতা মণ্ডল পরিবার। সেবায়েত একাদশী ঠাকুরের বংশধরগণ। থানের পার্শ্ববর্তী একটি জবা-জিউলী গাছকে কেন্দ্র করে জনশ্রুতি আছে। কালিকাপুর স্টেশনের দিকে যেতে বাঁদিকে পড়ে ভাঁটা গ্রাম। এখানকার শীতলা ও পঞ্চানন্দের পাকা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ঁযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বারুইপুর থেকে চম্পাহাটি যাওয়ার পথে বামদিকে চিনা গ্রামের অবস্থান। চিনের মোড়ের পুরাতন পঞ্চানন্দের থানটি বহুদিন হলো অবলুপ্ত। সিমেন্টে তৈরি মূর্তি ছিল একসময়। পঞ্চানন্দের কবন্ধ বিগ্রহটি বিজ্ঞাসু পথিককে দাঁড় করিয়ে রাখতো কিছুক্ষণ। কিন্তু এখন তা স্মৃতি হয়ে গেছে। তবে এই গ্রামের প্রথম অধিবাসী মণ্ডল পরিবারের ঁযদুনাথ মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দের পাকা থানটি জাগ্রত আছে। এর বয়স আনুমানিক ১২৫-৩০ বছর। একই থানে রয়েছেন পঞ্চানন্দ, কালী, মনসা ও বনবিবি। পরপর তিনদিন এখানে পূজা ও মেলা হয়। মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। থানের নামে আনুমানিক ৫ কাঠা দেবোত্তর জমি আছে। ঁযদুনাথ মণ্ডলের ভদ্রাসনের থানেও কালী, শীতলা, মনসার সঙ্গে পঞ্চানন্দ পূজার রীতি আছে।

বিবর্তিত পূজাবিধি অনুসারে লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ কোথাও কোথাও আবার ধর্মঠাকুর হয়ে যেতে পারেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় বারুইপুরের সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম বোলিবামনি-তে। সুন্দরবনের ছাটুয়া নদীতে পাওয়া একটি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিকে ধর্মঠাকুর জ্ঞানে পূজা করতো এখানকার মৎস্যজীবী বাগদি সম্প্রদায়। সেই মূর্তি বেহদিশ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনি দেওয়া থানে স্থান পেয়েছে পঞ্চানন্দ, শিব-দুর্গা, মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায়, বিবিমা ও বারাঠাকুর। সবগুলির আলাদা পূজা হলেও বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমায় পঞ্চানন্দকে ধর্মঠাকুর রূপে পূজা করা হয় এখানে। এই থানের মূল সেবায়েত গয়ারাম পাটুনির পরিবার। যদিও পুজোর সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনা হয়।

পেঁচোপাঁচির পুজো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা তালগাছের গোড়ায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পাকা মন্দির ও মূর্তি সাধারণত থাকে না। এই লৌকিক দেবদেবীর পূজার চল হয়তো

বারুইপুরের গ্রাম্য এলাকার কোথাও-কোথাও আছে। একমাত্র পাকা মন্দির আছে দুধনই গ্রামের বারুইপাড়ায়। একটা তালগাছের পাশে বারুইসম্প্রদায়ের ˚কালিচরণ দে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পেঁচোপাঁচির থান। পাকা মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন ˚ললিতমোহন দের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী অনিল কুমার দে, ১৩৩৮ সনের ১লা আশ্বিনে। শোনা গেছে, এই থান খুবই জাগ্রত।

কায়িক দিক থেকে শিব ও পঞ্চানন্দের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায় ভূতবাবার। কেউ কেউ এঁকে ছোটকাছারীও বলে থাকেন। শ্মশানচারী শিবের মতো ভূতবাবাও শ্মশানে থাকতে ভালবাসেন। রানা, পশ্চিম রামনগরের শূলিপোতায় একসময় শ্মশানও ছিল। সেই শ্মশান এখন লুপ্ত, তার জায়গায় 'বুস্টার' নামে কারখানা শির উঁচু করে আছে। এরই পাশে কুলপি রোডের ধারে একটি প্রবীণ শেওড়া গাছের তলায় ভূতবাবার আস্তানা। মন্দির করে দিয়েছেন কেউ। সেই মন্দিরে ধুতিপরা ভূতবাবা গলায় রুদ্রাক্ষ নিয়ে রুদ্রমূর্তিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সামনে দাসদাসীবৃন্দ। ইনি শিশুরক্ষক দেবতা। বাবার দয়া পেতে এখানে উৎসর্গ করা হয় শোলমাছ। ভূতবাবার বার্ষিক পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার।

সীতাকুণ্ডুর সীতামা – সীতাকুণ্ডু গ্রামের দেবী সীতা। পৌরাণিক লৌকিক কিংবা ঐতিহাসিক কোন শ্রেণীতেই এই দেবীকে ফেলা যায় না। তবে মন্দিরে যে বিগ্রহ আছে, তা পৌরাণিক। 'জানকী' সীতার পাশে উপবিষ্ট আছেন 'দাশরথি' রামচন্দ্র। মন্দির ফলকে উৎকীর্ণ আছে এরূপই অভিজ্ঞান – রামসিতার মন্দির /২০০০ বছর পুরাতন / পূজারি˚বসন্ত ব্যানার্জী। মূল বিগ্রহের সামনে আছে কষ্ঠিপাথরের বরাহ অবতার ও গণেশ মূর্তি। জনশ্রুতিতে বলে, দেওয়ান গাজীর সঙ্গে সীতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আর সেই যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সীতা আত্মাহুতি দেন কুণ্ডের জলে। এই জনশ্রুতি তো রামায়ণের সঙ্গে মেলে না। ফলে এই সীতার পরিচয় অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়। রামনগরের শিশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে রামসীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেবীর পূজার্চনা করতেন তাঁর পুত্র তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা আনুমানিক একশ থেকে দেড়শ বছর আগের। কিন্তু সীতাকুণ্ডু গ্রাম নাম এরও পূর্বেকার। অতএব রহস্যাবৃত হয়ে আছেন সীতা-মা। তাঁর নামাঙ্কিত মন্দিরে প্রতিদিন বহু পূজারী -ভক্তের আগমন ঘটে। অনেকে ঢেলা বেঁধে মানত করেন, পূজা দেন।

ব্রহ্মদৈত্য পূজা – ভূতকুলের কুলীন বলে খ্যাত ব্রহ্মদৈত্য নাকি বসবাস করেন বেল কিংবা নারকেল গাছে। উত্তর পদ্মজালা গ্রামের একটি নারকেল গাছেও তিনি অধিষ্ঠান করেন। সেই গাছের পাশে বছর দশেক আগে গড়ে তোলা হয়েছে ব্রহ্মদৈত্যের থান। সিমেন্টের মূর্তি তৈরি করেছেন ঘোষপুরের শিল্পী সুদীপ মণ্ডল। মূর্তির কব্জি, বাহু ও গলায় রুদ্রাক্ষ আর দুহাতে রয়েছে আশাবাড়ি ও কমণ্ডলু। প্রতি বৈশাখ মাসের শনি বা মঙ্গলবার এখানে পূজা হয়। পূজার আবশ্যিক উপচার ব্রহ্মকপাটি ফুল। থানের সেবিকা প্রতিমা সরদারের ওপর ব্রহ্মদৈত্যের ভর হয়। এই ব্রহ্মদৈত্য একসময় হয়তো অপদেবতা থেকে প্রতিষ্ঠিত লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়ে যেতে পারেন।

শীতলা, মনসা ও হাড়িঝি চণ্ডী – লৌকিক দেবী শীতলা শিশুরক্ষয়িত্রী রূপেই পূজিতা। ইনি হাম, বসন্ত ও কলেরা রোগের সংহারক। স্নেহময়ীরূপা দেবীর বাহন গাধা। তাঁর একহাতে থাকে সম্মার্জনী ঝাঁটা, অন্য হাতের সাহায্যে কাঁখে ধারণ করে থাকেন কলসি। আর তাঁর মাথার পিছনে শোভা পায় কুলো। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী পর্ণশবরী ও হারিতী দেবীর সঙ্গে শীতলার সাদৃশ্য আছে। পল্লী অঞ্চলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলার বার্ষিক পূজা ও জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়। এঁর পূজায় বলির প্রচলন আছে। পূজার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় শীতলার পালা গান। পূজার আগে মানসিক চুকানোর জন্য শীতলার-মাগুন তোলা গ্রাম-বাংলার পরিচিত দৃশ্য। বারুইপুরের বহু গ্রামে শীতলা পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। শহর বারুইপুর ছাড়াও শীতলার থান আছে ভাঁটা, বেগমপুর, আদিলপুর, বাজে হাড়াল, নড়িদানা, ঘোষপুর ও বাওড়ায়। এসব জায়গার শীতলাপূজার দিনে উনুন ধরানো হয় না। এর জন্য আগের দিন রাতে পান্তা করে রাখা হয়। উচ্চবিত্তের বর্ণহিন্দু থেকে নিম্নবর্ণের সকলেই গ্রামীণ এই প্রথাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকেন।

শীতলা দেবীর বিখ্যাত থান আছে শিখরবালী গ্রামে। পাকা মন্দিরে আছে দেবীর অপূর্ব মূর্তি। পূজা উপলক্ষে এখানে একদিনের মেলা বসে। বারুইপুরের সদাব্রত গঙ্গার ঘাটে নবগ্রহ মন্দিরেও শীতলা দেবীর সুন্দর মূর্তি আছে। ভাঁটা গ্রামের একটি শীতলা পূজা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিচালনা করেন। পুজো হয় রক্ষাকালী পূজার রাতে। প্রথম সেবায়েত ছিলেন হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে মুখোপাধ্যায় পরিবারের লোকেরা পূজা করেন। এখানকার শীতলা থানে একটি কষ্টিপাথরের বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি আছে। মূর্তিশৈলীতে এটি পালযুগের ।

জগৎগৌরী মনসা সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অর্বাচীন কালের কয়েকটি পুরাণে বিষহরী মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসার পরিচয় পদ্মাবতী নামে। রাঢ় অঞ্চলের সাপের মন্ত্রে উচ্চারিত জাঙ্গুলী দেবীর সঙ্গে মনসার সাদৃশ্য আছে। মনসার বড় মন্দির খুব একটা দেখা যায় না; সাধারণ আস্তানায় তিনি অনাড়ম্বর ভাবেই পূজিতা হন। মূর্তি ছাড়াও ঘট, সিজমনসা গাছের ডাল কিংবা মাটির তৈরি ফণাধর সাপ স্থাপন করে দেবীর পূজা সম্পাদিত হয়। শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রান্নাপুজোর সময়ে মনসা পূজা এবং মনসার পালাগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মনসার থান আছে মদারাট, নড়িদানা, চিনা, ধনবেড়িয়া ও ইন্দ্রপালা গ্রামে। ইন্দ্রপালা গ্রামের মনসা থানের সংখ্যা–তিনটি। পূজা উপলক্ষে এখানে গাজন ও যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

হাড়ি-ঝি চণ্ডীর পূজা করেন তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা। এঁর থান দেখা যায় সাধারণত পদ্মরাজ ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামে। বারুইপুর থানার একমাত্র হাড়ি–ঝি চণ্ডীর থান আছে ধপধপির কাছে দমদমায়। থানটি সাদামাঠা– ইটের দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি দেওয়া। এখানে দেবীর কোন মূর্তি নেই। চারপায়া একটা বেলে পাথরের বেদিকে 'হাড়ি-ঝি' জ্ঞানে গ্রামের লোকেরা পূজা করেন। কোন পূজক পুরোহিত নেই। সাম্প্রতিক কালের তৈরি একটি চণ্ডীর থান আছে সাউথ গড়িয়ার পশ্চিমপাড়ায়। এখানে নিত্যপূজা নেই। তবে

মায়ের বার্ষিক পূজা খুবই জাঁক করে হয়।

কালী, রক্ষাকালী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা দীপাবলী উৎসবের সময় উদ্‌যাপিত বারোয়ারী কালীপূজা ব্যতিত বারুইপুরের বহু জায়গায় গ্রামদেবী রূপে কালীপূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। কালীর জাগ্রত থানকে ঘিরে রয়েছে অজস্র জনশ্রুতি। বারুইপুরের জমিদার বাড়ির পুজো-পার্বণ প্রসঙ্গে পূর্বে কয়েকটি শক্তিপূজার কথা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করছি। বারুইপুরের শিবানীপীঠের বিগ্রহ শিবানীমা। দেবীমূর্তি সাদা শাড়ি পরিহিতা। বৃহৎ নাটমন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে অজস্র শক্তিসাধকের তৈলচিত্র। সময়ের স্বল্পতায় এখানকার সেবায়েত ভট্টাচার্য পরিবার বিশদ তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। দেবীর পূজা বিভিন্ন তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুরের সদাব্রত ঘাটে রয়েছে গ্রহরাজ নবগ্রহ মন্দির। বিভিন্ন দেবদেবীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে এখানে। সেই সঙ্গে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই মন্দিরের সেবায়েত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিশ্বনাথ দাস। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন বিমলানন্দ ব্রহ্মচারী (তান্ত্রিক মন্ত্র) ও ওঙ্কারনাথের (কৃষ্ণমন্ত্র) কাছে। জমিদার ললিত কুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে মামলা হয়। সেই মামলার বিজয়ী হয়ে ১৩৬৭ সনে তিনি মন্দির তৈরি করেন। সদাব্রত ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেব এখানকার অধিবাসীদের নাকি খিচুড়ি ভোগ রান্না করে খাওয়ান। এখনও তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই অনুষ্ঠান। এছাড়া ভীম একাদশী, শিবচতুর্দশী ও বড়বাবার বার উপলক্ষে এখানে এক দিন করে মেলা উদ্‌যাপিত হয়।

বারুইপুরের বিখ্যাত কালীবাড়ি আছে রামনগরে। এখানকার আদ্যাশক্তি স্নেহময়ীরূপা। দেবীর পদতলে শায়িত আছেন শিব। নিমকাঠের বিগ্রহটি তৈরি করেন জীবন চট্টোপাধ্যায়। চক্রবর্তী পরিবারদের এই কালীবাড়ি প্রথমে ছিল টোলের। পরে চাঁচের ঘর হয়। বর্তমান পাকা মন্দির তৈরি করেন ১৩৪০ সনের ১২ই চৈত্র শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী। এই মন্দিরে দীপাবলীর সময়, দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথি ছাড়াও নিত্যপূজা ও মানত পূজার প্রচলন আছে। একসময় পাঁঠা বলি হতো, বর্তমানে স্বপ্নে নিষিদ্ধ হওয়ায় তা বন্ধ। 'তারা' ধ্যানে পূজিত এই দেবীর আসল মূর্তি রয়েছে সাধারণের আগোচরে। সে-টি আসলে বিষ্ণুমূর্তি। সেই মূর্তির আদলেই নাকি বর্তমানে বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছে। বিষ্ণুমূর্তি কিভাবে শাক্তমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করলো, তা জানা যায় না। শোনা যায়, মূর্তিটি কালীবাড়ির অদূরবর্তী একটি দহ থেকে পেয়েছিলেন তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ স্বামী। সেই মূর্তি আনুমানিক দুশো বছর আগে প্রতিষ্ঠা পায় এখানে। যাই হোক, পালযুগের এই মূর্তিটি 'ব্রহ্মময়ী কালী' নামে এখানে উপাসিত হচ্ছেন। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত সনৎ চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়।

সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার জাগ্রত মন্দির রয়েছে মদারাট গ্রামে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই দেবী প্রায় দুশো বছর আগে কনৌজের জনৈক তান্ত্রিক কাপালিক দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা হন। এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনও আছে। প্রাক্তন সেবায়েত অনাদিপ্রসাদ চক্রবর্তী নাকি এই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেন। পূজার্থীদের আনুকূল্যে তৈরি হয়েছে বর্তমান দোতলা মন্দির ও নাটমন্দির। সিদ্ধেশ্বরী পূজার সময় মন্দির সংলগ্ন জায়গাটি মেলার আকার ধারণ করে। এছাড়াও চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় রক্ষাকালীর পূজা। এটাই গ্রামের সর্বজনীন

উৎসব। সুন্দর মন্দিরটি তৈরি হয় ১৩৪৯ সনে। দেবীর নাটমন্দিরেই বর্তমানে বাজার বসে। রক্ষাকালীর মূর্তি পূজা এক রাতের মধ্যে। পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই বিসর্জন দিতে হয় প্রতিমা। পুজোর রাতে অজস্র ছাগবলি ও হাঁড়িভোগের আয়োজন হয়। বিশেষ পূজার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মন্দিরে রক্ষিত প্রতীককে সামনে রেখে নিত্যপূজা চলে।

রক্ষাকালীর পাকা থান রয়েছে উত্তরভাগ ঘাটের কাছে। এই থান নাকি বহু পূর্বের। মন্দির হয়েছে এক বছর আগে। মন্দিরে আছে কেবলমাত্র মূর্তির কাঠামো। কারণ রাত বারোটার সময় পূজা হয়ে ভোর হওয়ার আগেই ঠাকুর বিসর্জন করে দেওয়া হয়। পূজার সময় মেলার আকার ধারণ করে সমগ্র জায়গাটি। পুজোর রাতে এখানে মায়ের প্রসাদী খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। ভক্তরা দণ্ডী কাটেন, সেই সঙ্গে হয় পাঁঠাবলি। সাউথ গড়িয়া গ্রামের রক্ষাকালী পূজা শতবর্ষের প্রাচীন। এই পূজাও এক রাতের। প্রায় মহোৎসব তুল্য পূজাটি অনুষ্ঠিত হয় একটি নুয়ে পড়া প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের সামনে বারোয়ারীতলায়। রক্ষাকালী এই গ্রামের জঙ্গলপত্তুনী গ্রাম-দেবতা। দেবীর কোন স্থায়ী মন্দির গড়ার কথা কেউ কোনদিন ভাবেননি। একটা জরাজীর্ণ টালি ছাওয়া বারান্দায় দেবীর বেদি প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামের দুটি পারিবারিক কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় ৺রামতারণ মুখোপাধ্যায় ও ৺নেপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে। এই দুটি পরিবারের পূজিত মূর্তিগুলি যথাক্রমে শ্মশানকালী ও শ্যামাকালী। মুখোপাধ্যায় পরিবারের মাধবরাম থেকে ধরলে শ্মশানকালী পূজার বর্তমান বয়স হয় দুশো দশ বছর। তাঁর আগে থেকে এই পূজার প্রচলন থাকলে আড়াইশো বছরও হতে পারে। পূজায় একসময় বলি হতো। বর্তমানে তা বন্ধ। পূজার রাতে মুখোপাধ্যায় বাড়ির সামনে বাজি পোড়াতে আসেন গ্রামের হালদার পরিবার। প্রথম থেকেই নাকি এই রীতি চলে আসছে। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কালীপূজার বয়স একশ বছরেরও বেশি।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম – তেগাছি। এখানকার কালী খুবই জাগ্রত। দেবীমূর্তির পরিবর্তে ঘট পূজা এখানে প্রচলিত প্রথা। শোনা গেছে, আগে মূর্তি হতো। জনশ্রুতিতে বলে থানের নিত্যসেবিকা জনৈক গৃহবধূকে নাকি দেবী সুযোগ পেয়ে গিলে খেয়েছিলেন। এরপর থেকেই মূর্তি বানানো চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশন থেকে যেতে হয় সোনাগাছি গ্রামে। এই গ্রামে ১৩৬২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাশক্তি আদ্যাপীঠ। প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর পালানচন্দ্র। বর্তমান সেবায়েত অশোক কুমার সরকার। মন্দিরে রয়েছে বাইশ হাত কালীমূর্তি। প্রতিবছরের বৈশাখ মাসে এখানে মহামায়ার পূজা ও নানারকম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিনের পূজানুষ্ঠানে থাকে মায়ের পূজা ও স্তব আরতি, মানসিক পূজা, রাধাগোবিন্দের পূজা ও শীরণি ভোগ এবং শীতলা ও মনসা পূজা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা গীতিনাট্য ও যাত্রাপালা এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

বারুইপুর থানাগত এলাকার কোথায় কোথায় ঠিক কতগুলো বারোয়ারী দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই মুশকিল। বারুইপুর পৌরসভায় এ সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে কিনা নিবন্ধকারের জানা নেই। বারোয়ারীর আয়োজক সংঘ প্রতিষ্ঠানগুলো পূজার প্রশাসনিক ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন থানা, ব্লক অফিস,

এস.ডি.ও এবং ফায়ার ব্রিগেডে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সব বারোয়ারী পূজাকমিটি এই ধরনের নিয়ম -রীতির তোয়াক্কা করেন না। ফলে প্রকৃত তথ্য জানা যায় না। আবার বারোয়ারী পূজার আওতার বাইরে থাকা বনেদী বাড়ির পূজাগুলি অনুমোদন নিরপেক্ষ। শতবর্ষ অতিক্রান্ত পরিবারিক এই পূজাগুলিই ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এসব পূজার প্রতিমা পুরাতনী একচালা রীতিতে তৈরি হয়। পূজার আড়ম্বর ও আনন্দে থাকে পরিশীলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি। এই পূজাগুলির ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক বিবরণ সংগ্রহ করা ভাবীকালের প্রজন্মদের জন্যই জরুরি।

বারুইপুরের শহর ও গ্রামীণ এলাকার বহু জায়গায় অগুনতি ঠাকুর দালান, দুর্গামণ্ডপ ও নাটমন্দিরের অস্তিত্ব আছে। তার অনেকগুলিই আজ ভীষণভাবে জরাজীর্ণ। একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে সেগুলির ঠিক সময়ে যথোপযুক্ত সংস্কার করা হয়নি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সাউথ গড়িয়ার সর্দারপাড়ার অন্নপূর্ণা দেবীর নাটমন্দিরটি। এখানকার অন্নপূর্ণা পূজা একশ বছর পেরিয়ে গেছে। এদিক থেকে অবশ্যি ব্যতিক্রম এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় ও হালদার বাড়ির সুদৃশ্য দুর্গামণ্ডপ। এই দুটি পারিবারিক পূজার বয়স শতাধিক বছর। দুর্গামণ্ডপ আছে কিন্তু পুজো বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের জমিদার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের। চিনা গ্রামের কর্মকার (কর) পরিবারের বাসন্তী পূজার বয়স ১১৫বছরেরও বেশি। নড়িদানার বাগানী পরিবারের দুর্গাপূজা ১৫০ বছরেরও প্রাচীন। এই পুজো শুরু করেছিলেন নবীনচাঁদ বাগানী। বর্তমান ঠাকুর দালানটি তৈরি করেন এঁরই সুযোগ্য নাতি কার্তিক বাগানী। বিজয়া দশমীতে এখানকার প্রতিমা সাউথ গড়িয়ার জমিদার বাড়ির প্রতিমার সঙ্গে একযোগে ঠাকুরভাসান পুকুরে বিসর্জিত হয়। এটাই এখানকার আঞ্চলিক প্রথা। জমিদার যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে সেকালে বন্দুকে ট্রিগার টিপে গুলি ছুঁড়তেন। এখন সে জমিদারী নেই। ফলত এই প্রথা বন্ধ। সাউথ গড়িয়ার আর একটি পারিবারিক দুর্গাপূজা একসময় দারুণভাবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হতো রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারিক চণ্ডীমণ্ডপে। বহুকাল হলো সেই পূজা বন্ধ হয়ে গেছে ; সেইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে চণ্ডীমণ্ডপটিও।

সাহিত্যসম্রাটের দুর্গাপূজা দর্শন – মধ্য সীতাকুণ্ডু গ্রামের মণ্ডল পরিবারের দুর্গাপুজো প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। এই পরিবারের দুর্গামণ্ডপটি শিল্প সৌকর্যে অসামান্য। গ্রামের একমাত্র দর্শনীয় স্থাপত্য বললেও চলে। বিশেষত দুর্গামণ্ডপের দেয়ালে চিত্রিত উলুটির শিল্পকর্ম যে কোন কলারসিককে মুগ্ধ করবে। এই পরিবারের দুর্গাপুজো প্রায় সাত-আট পুরুষ ধরে চলে আসছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে পূজার জৌলুষ ও আড়ম্বরে খামতি থাকলেও এই পরিবারের পূজা কোনদিন বন্ধ হয়নি।

দুর্গার প্রতিমা তৈরি হয় একচালা রীতিতে। পূজার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, টবসহ একটা বেলগাছের চারা পূজার কয়েকদিন মণ্ডপে রাখা হয়। নবপত্রিকায় জোড়া বেল লাগে। এই বেল পাওয়া যায় একমাত্র বোধনের বেলগাছে। এই পরিবারের বেলগাছটির বয়স কেউই নিরূপণ করতে পারেননি। আশ্চর্যের ব্যাপার এ সময় গ্রামের কোন গাছেই বেল

পাওয়া যায় না। এই নবপত্রিকা বা কলাবউকে থালার ওপর বসিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ সন্ধিপূজায়। এদিন প্রসাদের ডালা সাজানো হয় দেবীপ্রতিমার নাক সমান উঁচু করে। পূজার এই অনুষ্ঠানের নাম 'নাকডালা' । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বারুইপুরের মহামান্য জেলাশাসক ও বিচারক। এই নাকডালা অনুষ্ঠানের বিবরণ শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রামে আসেন এবং মণ্ডল পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সুখকর ঘটনা মণ্ডল পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে আজও স্মৃতির সম্পদ হয়ে আছে।

পীর-পীরাণীর হাজোত – বারুইপুরের গ্রাম্য এলাকা পর্যটন করলে যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যাবে বনবিবির থান, বিবিমার থান, গাজীর মাজার ও পীরের দরগা। এসব পীর - পীরাণীদের কেউ কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, মানবহিতৈষণার কারণে তাঁরা পরবর্তীকালে দেবত্বের মর্যাদা পেয়ে গেছেন। হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এঁদের পূজা-হাজোত দেন। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর থানে যেমন আধিব্যাধি থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় মানত করেন, তেমনই এঁদের কাছেও দরবার করেন উভয় সম্প্রদায়। এদিক থেকে এই পীরস্থানগুলি হিন্দু ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের যোগসূত্র হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজীর কথা। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ রাজা মদন রায়ের সমসাময়িক। বাকি খাজনার দায়ে ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ যখন রাজা মদন রায়কে গ্রেপ্তার করেন তখন তাঁকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী মোবারক গাজী। মুক্তি পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রাজা ওই কল্যাণকামী পীরের সেবার জন্য ১৬৫৬ বিঘা লাখেরাজ জমি দান করেন এবং একটি মসজিদ তৈরি করে দেন। গাজীবাবার ইন্তেকালের পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় মসজিদের পাশে। তাঁর মরদেহের উপর পরবর্তীকালে গড়ে তোলা হয়েছে পবিত্র মাজার স্থাপত্য।

বাঁশড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের আগে মোবারক গাজী আরও কয়েক জায়গায় আস্তানা করেছিলেন। এসব জায়গা পরে হোজরা ও নজরগাহ নামে চিহ্নিত হয়েছে। বারুইপুর থানার অন্তর্গত এলাকার মধ্যে মোবারক গাজীর প্রসিদ্ধ দরগা আছে কুড়ালিতে। দরগাটি একসময় কাঁচা ছিল, বর্তমানে পাকা দালান করা হয়েছে। একটা মৃত শেওড়া গাছের তলায় গাজীবাবা প্রথম আস্তানা করেন, আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস, গাজীবাবা আসার পরই সেই মৃত গাছটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই দরগায় আসেন এবং মানত করেন, হাজোত দেন।

দেওয়ান গাজীর পবিত্র মাজার রয়েছে সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের পাশে। মাজার ঘরটি সাম্প্রতিক কালের তৈরি। বাংলার পীর-গাজীদের তালিকায় দেওয়ান গাজীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেহেতু আঞ্চলিক গবেষকদের কাছে দেওয়ান গাজী আজও অনির্ণেয় রহস্যময় ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। আঞ্চলিক জনশ্রুতি হলো, রাজকন্যা সীতার সঙ্গে দেওয়ান গাজীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সেই যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রাজকন্যা সীতা কুণ্ডে ঝাঁপ

দিয়ে আত্মহত্যা করেন। দেওয়ান গাজী দেহরক্ষা করলে তাঁকে এখানেই কবরস্থ করা হয়। তাঁর কবরের উপর পরে মাজার তৈরি হয়। মাজারটি স্থাপিত আছে একটি বিশাল প্রাচীন ঢিবির ওপর। যে ঢিবির চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন কালের ইটের টুকরো এবং খোলামকুচি। এখানে খনন করে কুষাণ, শুঙ্গ, পাল, সেন ইত্যাদি যুগের বহু প্রত্নসামগ্রীও পাওয়া গেছে। এই ঢিবি কোন অজ্ঞাতনামা রাজন্য পরিবারের বসতবাড়িকে ইঙ্গিত করে – এমন ধারণাও পোষণ করেন কেউ কেউ। এই ধারণা অমূলকও নয়।

দেওয়ান গাজীর মাজারের বর্তমান খাদেম আতিউর রহমান। প্রতিদিন বিকালে অসংখ্য মানুষ মাজারে আসেন এবং তাঁদের মনস্কামনা জানিয়ে হাজোত দেন। মাজার থেকে দেওয়া হয় তেলপড়া ও জলপড়া। অনেকে মাজারের গায়ে মানত করে ঢিল বাঁধেন। দেওয়ান গাজীর বড় হাজোত অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষের সমাগমে মাজারের চারপাশ মেলার আকার নেয়। ঢোল কাঁসি বাজিয়ে গাজীর মাজারে হাজোত দিতে আসেন ডেডাঙ্গি গ্রামের কাওরা সম্প্রদায়। দেওয়ান গাজীর বার্ষিক হাজোতকে বলা হয় 'দেশপালাপূজা'। এই পূজা দেওয়ার আগে ভক্তের দল একসপ্তাহ ব্যাপী পাড়ায় পাড়ায় গলায় খড়ের কুটো বেঁধে 'দেশপালামাঙন' সংগ্রহ করেন।

বারুইপুরের গ্রামীণ এলাকায় একসময় গইলে গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। গৃহস্থের গোধনের মঙ্গলকামনায় এই গান গাইতে আসতেন চামরধারী এক শ্রেণীর ফকিরের দল। তাঁদের মুখেই শোনা যেত 'মুশকিল আসান করো, দয়াল মানিক পীর'। গইলে গানের ফকিররা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু তাঁদের আরাধ্য মানিকপীর লোকমানস থেকে হারিয়ে যাননি। মানিকপীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। অথচ তিনি তাঁর ত্যাগ, তিক্ষা আর মানবিক গুণাবলীর সৌজন্যে লৌকিক দেবতায় পর্যবসিত হয়ে গেছেন। একাধারে তিনি গোধনের ত্রাণকর্তা, অপরদিকে তিনি ছা-পোষা গৃহস্থের কল্যাণকামী। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনের মতে, 'মাণিক সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যীশু স্থানীয়। ইনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শকাব্দে জরথুষ্ট্রীয় ও খ্রীষ্টধর্মের সংমিশ্রণে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন। " বঙ্গদেশে মানিকপীর এসেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও তিনি বাংলার উদার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন।

মানিকপীরর পূজাবিধি তিনপ্রকার ; যথা (ক) মূর্তিপূজা (খ) নিরাকার পূজা এবং (গ) প্রতীকপূজা। এই পীরের জাগ্রত থান আছে শশাড়ির কাছে কন্দমালা গ্রামে। থানটি একসময় ছিল অশ্বত্থ গাছের তলায়। বর্তমানে ইটের তৈরি পাকা ঘর হয়েছে। পূজার্থী–ভক্তদের দেওয়া অজস্র ছলন রয়েছে এখানে। এখানে হাজোতের দিন বৃহস্পতি অথবা শনিবার। পীরের বার্ষিক হাজোতও হয়।

মানিকপীর প্রতীক রূপে পূজা পান খাড়ুপাতালিয়া গ্রামে। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে এখানে পাশাপাশি দুটি থান লক্ষ্য করা যায়। পীরের কোন ঘর বা আস্তানা নেই। দুটি থানই উন্মুক্ত জায়গা অথবা গাছতলায় স্থাপিত। উন্মুক্ত জায়গার থানটি সম্ভবত এখানকার আদি থান। বার্ষিক

গান-হাজোতে হিন্দুরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশ নেন না। যদিও গ্রামের প্রবেশ পথেই গাজীপাড়া আছে, ইদানীং গাজীপাড়ার দু-চারজন মানিকপীরের পালাগানের সময় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকছেন। এখানে পীরের পালাগান অনুষ্ঠিত হয় দুই পর্বে। আদি থানে অর্ধেক পালা পরিবেশিত হওয়ার পর গাছতলার থানে পালার অবশিষ্ট অংশ পরিবেশিত হয়।

আদি থানটি গড়ে উঠেছে পাকাবেদির ওপর তিনটি স্তূপকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় অধিবাসী তারকনাথ দাসের স্মৃতিকথা থেকে এই থান প্রতিষ্ঠার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। থানটি স্থানীয়ভাবে পীরতলা বা পীকতলা নামে খ্যাত। বেনিয়াবউ গ্রামের জনৈক কাসিম আলি মোল্লা লাঠিয়ালের কাজ করতেন। একবার তাঁর পুত্ররা পীরতলার জমিতে চাষ করতে আসে। কিন্তু এক পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। মৃত্যু অনিবার্য জেনে কাসিম আলি মানত করে যে, যদি তাঁর পুত্র বেঁচে যায় তাহলে তিনি এই জমির উপর পীর সাহেবের থান বাঁধিয়ে দেবেন। সত্যসত্যই তাঁর পুত্র বেঁচে যায়। তখন তিনি এখানে ফাল্গুন মাসে পীরের থান বাঁধিয়ে দেন। সেই সঙ্গে দেন কয়েকবিঘা পীরোত্তর জমি। সেই জমি 'পীরের ভুঁই' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ রায়ের মতো বাঘের দেবতা রূপে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন বড় খাঁ গাজী। সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে এঁকে বরখান গাজী, জিন্দাপীর ও গাজীসাহেব নামেও সম্বোধন করা হয়। সুন্দরবনের নৌকাবাহক জেলে মালো এবং মাঝিমাল্লারা নৌকায় হাজোত দেওয়ার সময় উচ্চারণ করেন ঃ

আমরা আছি পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান।
শিরে গঙ্গা দারিয়া,
পাঁচ পীর বদর বদর।

এই পাঁচ পীরের অন্যতম হলেন আলোচ্য বড় খাঁ গাজী। বড় খাঁ গাজীর পূজা-হাজোত নিরাকার এবং মনুষ্য মূর্তিতে দুরকমভাবে সম্পাদিত হয়। এর প্রসিদ্ধ নজরগাহ্ আছে মদারাট গ্রামের পশ্চিমপাড়ায়। স্থানীয় মানুষের মুখে এই নজরগাহ্ বরকোন গাজীর দরগা নামেই পরিচিত। দরগাটি দেখাশুনা করেন হরেন্দ্রনাথ নাগ। আনুমানিক আড়াই শ বছর আগে স্থানীয় মানুষের আগ্রহে এবং জমিদারবাবুদের সহায়তায় পীরের এই দরগা গড়ে উঠেছিল বলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে। দরগার নামে সামান্য কিছু জমি (দু-আড়াই বিঘা) পীরোত্তর করা আছে। এখানে গাজীর কোন মূর্তি নেই, তার পরিবর্তে আছে পাকা বেদি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় এখানে হাজোত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১লা মাঘ। তৎ-উপলক্ষে সারারাত ব্যাপী জমজমাট মেলায় অনুষ্ঠিত হয় গাজীবাবার মাহাত্ম্য বিষয়ক পালাগান, কবির লড়াই, তরজা ইত্যাদি। বিবিমা ও মানিকপীরের সঙ্গে একত্রে বড় খাঁ গাজী পূজা পান বেলিয়াঘাটার একটি থানে। খাড়ুপাতালিয়া গ্রামের একেবারে ভিতরে বাঁশঝাড় ও কবরডাঙা পরিবৃত জঙ্গুলে জায়গায় একটি পীরস্থান আছে। এখানে মাঘ মাসে

বনবিবি, গাজীবাবার হাজোত-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। থানটি গাজীপাড়ার মধ্যে হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ দেন না। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মহিলারাই পরিচালনা করেন। সন্ধ্যা রাতে এখানে মহিলারা দলবদ্ধভাবে গাজনের মতো সঙ, নানারকম চটুল রঙ্গ করে থাকেন। সে সময় পুরুষের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ থাকে। পাঁচ পীরের নামে জাঁকালো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রপালা গ্রামে। এই উৎসব জমে ওঠে বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট দিনে।

রক্ত আমাশয় রোগের নিরাময়কারী রক্তান গাজী একজন কাল্পনিক পীর। এই পীরের থান রয়েছে পুঁড়ির আবাদে। এখানে পীরের কোন আস্তানা ঘর নেই। একটা পাকুড়গাছের তলায় ইটের বেদি রক্তান গাজীর নামে পূজিত হয়। এখান থেকে রক্ত আমাশয়ের ওষুধও দেওয়া হয়। সমুদ্রের দেবকল্প পীর হলেন বদর গাজী। এঁর পূজক সম্প্রদায় হলেন নদী-নালা ও সমুদ্রে মাঝিমাল্লারা। সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও বদরগাজীর থানে হাজোত দেন, মানত করেন। বারুইপুর থানার একমাত্র বদর গাজীর থান রয়েছে একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে আউলেপুরের বাদায়। পীরের আস্তানাটি খোলামেলা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। কোন ঘর নেই। মাটির তৈরি একটা কল্পিত কবরগাহের ওপরে লাল রঙের চাদর বিছানো আছে। আস্তানাটি দেখাশুনা করেন খিরিশতলার জনৈক মুসলমান পরিবার। জনশ্রুতি হলো; বদরপীরের এই দরগা বহু দিনের পুরাতন। আউলেপুরের বাদা একসময় জলময় স্থান ছিল। অনেকে মনে করেন আউলেপুরের বিস্তৃত জলা কোন লুপ্ত নদীর স্মৃতিবাহী। যে নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল বদর গাজীর থান। থানটি অগম্য জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বলে প্রাত্যহিক পূজাহাজোত এখানে হয় না। তবে শোনা গেছে, বার্ষিক হাজোত অনুষ্ঠিত হয়।

এখানকার লোকমানসে বিশালাক্ষ্মী, শীতলা, মনসার মতো শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন 'বিবিমা'। পূজিত পীরাণীদের মধ্যে সাত, নয় ও একুশজন বিবির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, মড়িবিবি, আসানবিবি, বহেড়াবিবি, আসগৈ বিবি, বাওড়ি বিবি, ঝেঁটুনে বিবি, চাঁদবিবি, জরিনা বিবি, আওরজ বিবি, দরবার বিবি, বনবিবি ইত্যাদি।

বারুইপুর থানা এলাকায় ওলাবিবি ও বনবিবি থানের আধিক্য আছে। কোথাও কোথাও আছে সাতবিবির থান। গ্রামীণ লোকেরা বলেন বিবিমার থান। ওলাবিবি কলেরা বা বিসূচিকা রোগের দেবী এবং বনবিবি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিবিমার একক থান খুবই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই থানে মানিকপীর, শীতলা, জ্বরাসুর, ঘন্টাকর্ণ প্রমুখ লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে বিবিমা পূজিত হন। বিবিমার এরকম থান দেখতে পাওয়া যায় রানা-বেলিয়াঘাটা, মধ্য সীতাকুণ্ডুর মণ্ডল পাড়া, ধোপাগাছি, বেগমপুর ইত্যাদি গ্রামে। এসব থানে পূজিত বিবি হলেন ওলাবিবি। উৎসবের সময় এখানে মাগুন, হাজোত এবং পাঁচাল গানের আসর—সবই অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিমার একক থান আছে দক্ষিণ দুর্গাপুরের জগাতিঘাটা, হিমচি, ভাঁটা, তেগাছি, বাওড়া, রামনগর, ধপধপি ইত্যাদি স্থানে। জাগাতিঘাটার বিবিমার হাজোত হয় প্রতি বছরের মাঘী পূর্ণিমায়। গ্রামের সর্বজনীন উৎসব হিসাবে এখানে চার-পাঁচদিন ধরে মেলা বসে। এই মেলা নাকি বহু দিনের পুরাতন। একজন মৌলভী হাজোতে পৌরোহিত্য করেন। হাজোতে অংশ

নেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই। বাওড়ার বনবিবির হাজোত উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয় দুদিন ব্যাপী। রামনগরে অনুষ্ঠিত হয় বনবিবির মেলা। নবগ্রাম মৌজার অন্তর্গত হিমচি'র জঙ্গলপত্তনী বনবিবির হাজোত হয় ১লা মাঘ। ভাঁটা গ্রামের বিবিমা অর্থাৎ বনবিবির হাজোতকে বলা হয় 'দেশমালা পূজা'। এখানে দেশমালা অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মাসে। হাজোতের মৌলভী আসেন বেনিয়াবহু গ্রামের বৈদ্য পরিবার থেকে। এখানে হাজোতের গান হয়। এই গান সমাপ্তির পরই গ্রামের সবাই একসঙ্গে রান্না শুরু করেন। রান্না বলতে, মাটির হাঁড়িতে দু-এক রকমের গোটা সব্জী চালের সঙ্গে ফুটিয়ে নেওয়া। এর সঙ্গে কোন তরকারী হয় না। রান্নার পর এখানেই তাঁরা খাওয়া -দাওয়া করেন। বিবিমার হাজোত উপলক্ষে এখানে সারারাত ব্যাপী একদিনের মেলা বসে। বনবিবির হাজোত উপলক্ষে তেগাছি গ্রামে এরকমই ' দেশমালা পূজা' ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মাসের শেষের দিকে। বনবিবির হাজোত উপলক্ষে আর একটি বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় বেগমপুর কলোনীতে। এই মেলাও বহুদিনের প্রাচীন। সাতবিবির একমাত্র হাজোত ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় সাউথ গড়িয়ার সরদার পাড়ায়। সাতবিবির থানটি জঙ্গলপত্তনী। প্রায় হাজার খানেক পূজার্থী এখানে হাজোত দিতে আসেন। মেলা চলে সারারাত ধরে।

নাখোদা সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ একটি দরগা আছে মল্লিকপুরে। দরগাটি হাবিব আবদুল্লা আল আত্তাসের দরগা নামে পরিচিত। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পীর সাহেব এখানে গড়ে তুলেছিলেন গনিমা তুল খয়ের ওয়াকফ স্টেট। এই স্টেটের একটা ছোট সংস্করণ আছে মায়ানমারের রেঙ্গুনে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব পীর সাহেবের এন্তেকাল হয় আরবে। সেহেতু এখানে তাঁর মাজার নেই। দরগার পরিসরে আছে সুদৃশ্য গম্বুজ ও মিনার শোভিত মসজিদ, গোলঘর, দোতলা কুয়াঘর এবং বিশাল আয়তনের প্রাঙ্গণ। ওয়াকফ স্টেটের কয়েকটি স্থাপত্যে ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পীরের দরগায় হত্যে ও মানতের জন্য এখানে সারাবছর অজস্র দর্শনার্থী ভক্তের সমাবেশ ঘটে। পৌষ মাসে ফতেহা দোয়াজ দাহাম উপলক্ষে এখানে একদিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই থানার মুসলিম-প্রধান এলাকাগুলি হলো – কমলপুর, মদারাট, সীতাকুণ্ডু, রামনগর, কুড়ালি ও ধপধপি। প্রতিদিন নামাজ পাঠের জন্য এসব জায়গায় বহুদিনের পুরাতন পাকা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। মসজিদের প্রাত্যহিক এবাদত ছাড়াও বাৎসরিক ইসলামি জলসায় কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। এর পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, ঈদ, মহরম, কাওয়ালী গানের আসর ও অন্যান্য পরব।

খ্রিস্টীয় উৎসব – নীল চাষ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সাগরপারের খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের নেকনজর পড়ে বারুইপুরের ওপর। নীলকর সাহেবদের আস্তানা ছিল সদর বারুইপুর ছাড়াও বেগমপুর শাঁখারীপুকুর গ্রামে। নীলচাষের ক্ষেত ছিল রাসমাঠের পাশে এবং শাঁখারীপুকুরে। এই সূত্রে খ্রিস্টধর্মের প্রসারকল্পে বারুইপুরে সর্বপ্রথম একটা রোমক চার্চ বা গির্জা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে 'খ্রিস্টধর্ম প্রচার সমিতি'। রেভারেন্ড সি.ই.ডিব্রারেজ নামে জনৈক ধর্মযাজকের উদ্যোগে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে গির্জা নির্মাণের কাজ শেষ হয়। স্থানীয়

অধিবাসীদের ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়ে বারুইপুরে একটা খ্রিস্টীয় সমাজের পত্তনও ঘটে।

অপরদিকে কার্নলিফ নামে এক ইংরেজ সাহেবের ইটখোলা ছিল চম্পাহাটি অঞ্চলে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মেথডিস্ট মিশনের ধর্মপ্রচারকরা এখানে একটা গির্জাশ্রয়ী মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। চম্পাহাটি খ্রিস্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৮ সালে। কলকাতার সেন্ট জর্জেস চার্চের অনুকরণে চম্পাহাটি খ্রিস্ট মন্দিরের ভিত গাঁথা হয় ১৯৫০–৫১ সালে। বর্তমানে এই গির্জা নতুন করে পুনর্নির্মীত হচ্ছে।

উপরোক্ত দুটি গির্জাকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা প্রাত্যহিক উপাসনা ছাড়াও বড়দিন ও নতুন বছরের নানারকম উৎসব পালন করে থাকেন। এই ধরনের উৎসবে শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্র কুমার বিশ্বাস নিজের লেখা গানে সুরারোপ করে চম্পাহাটিতে খ্রিস্ট-সংকীর্তন পরিচালন করতেন একদা।

আশ্রমিক উৎসব – বারুইপুর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি গুরুকেন্দ্রিক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবের নিরঙ্কারী সম্প্রদায়ের আস্তানা গড়ার পরিকল্পনা চলছে আউনেপুরের মাঠে। বিগত কুঁড়ি পাঁচিশ বছরের মধ্যে সাউথ গড়িয়া গ্রামে তৈরি হয়েছে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, রামকৃষ্ণ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের আশ্রম। ঠাকুরবাড়ি, মন্দির ও উপাসনা গৃহ আছে এখানে। প্রতি বছর দীক্ষা উৎসব পালিত হয় অনুকূলচন্দ্রের ঠাকুরবাড়িতে। বহু ভক্তের সমাগম ঘটে মতুয়া সম্প্রদায়ের মন্দিরে। রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরেই রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন। চম্পাহাটির পার্শ্ববর্তী গ্রাম কমলপুরেও সম্প্রতি একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বালক ব্রহ্মচারীর সন্তান দলের কোন আখড়া হয়তো এখনও গড়ে ওঠেনি; কিন্তু সন্তান দলের সভ্যসংখ্যা নেহাত কম নয় এখানে। ভক্তদের বাড়িতে বাড়িতে ভ্রাম্যমানভাবে তাঁদেরও কিছু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরভাগে যাওয়ার পথে বাঁদিকে ছাওয়ালফেলির মাঠে ১৯৯২ সালে অর্চনাপুরী মা প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শ্রী সত্যানন্দ মহাপীঠ'। বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা এখানে থাকেন। এই মহাপীঠের পরিচালনায় চলছে শিশুশিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্র। আধুনিক ধরনের হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনাও আছে। আশ্রমে নিত্যপূজা ছাড়াও গোপাষ্টমী, সত্যানন্দ জন্মতিথি ও অর্চনামায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে নানাপ্রকার ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর বিপরীত মাঠে অবস্থিত 'শ্রী অরবিন্দ অতিমানস যোগাশ্রম'। শ্রী অরবিন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মীত হয়েছে এখানে। এখানে যোগসাধনা ও উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য উৎসব ও ঐতিহ্যিক মেলা – বারুইপুরের বিবিধ উৎসব ও মেলা পরিক্রমার অবশিষ্ট অংশ যেমন গোষ্ঠ, রাসযাত্রা, দোল এবং ঘোড়াছুটের মেলা সম্পর্কিত আলোচনা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো। বারুইপুরের রাসমেলা বিখ্যাত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'রায়চৌধুরীদের পূজা পার্বণ' প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাদ পড়ে গেছে সাউথ গড়িয়ার চাটুজ্জে বাড়ির রাস উৎসব। স্থানীয় মানুষের কাছে উৎসবটি 'দোলোবাবুর রাস'

নামেই খ্যাত। দোলোবাবু প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু তাঁর পরিবারের লোকেরা এই উৎসবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উৎসবটির বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ /ষাট বছর। বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মিলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। উৎসবে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-পূজা যেমন হয়; তেমনি বিশাল সামিয়ানার নিচে আয়োজিত হয় খ্যাতনামা শিল্পীদের সমন্বয়ে লীলাকীর্তন ও ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান। লোক সমাগমও মন্দ নয়।

হোরি-খেলার দিনে পঞ্চম দোলযাত্রার মেলা হয় সাউথ গড়িয়া গ্রামে। মেলাটি হয় তিন-চারদিন ধরে। এক সময় সপ্তাহখানেক চলতো। এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদাররা। সেদিক থেকে হিসাব করলে এই মেলার বয়স দেড়শ বছরের কম নয়। রাধাকৃষ্ণের পূজা ও ঝুলন অনুষ্ঠিত হয় জমিদারদের অন্যতম শরিকের ভদ্রাসনে। আর মেলা বসে জমিদারবাড়ির সামনে। জমিদারী হস্তক্ষেপে এই মেলার সূত্রপাত হলেও মেলাটি বর্তমানে সর্বজনীন। শোনা যায়, বহু আগে এই মেলায় ভাঁড় যাত্রা ও ডবাই নাচ প্রদর্শিত হতো। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এই মেলায় অভিনয়–দক্ষতা দেখাবার জন্য আগে থেকে মহড়া দিতেন স্থানীয় যাত্রাদলের কুশিলবরা। কিন্তু সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। রাত-জাগানিয়া যাত্রার আসর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। পুতুল নাচ, নাগরদোলা এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। ইদানীং এসবেরও খামতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে এই মেলায় শুধু হাজির থাকছে হরেক পসরার দোকান। কয়েক হাজার দর্শকের ভিড়ভাট্টায় মেলাটি সরগরম হয়ে থাকে চারদিন ধরে। গোষ্ঠযাত্রার বিশাল মেলা বসে ইন্দ্রপালা গ্রামে। মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় একটা পুকুরের পাড়ে, বৈশাখ মাসে। মেলার বয়স একশ বছর। মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ঘোড়দৌড়, কবিগান, যাত্রা, গাজন ও পুতুলনাচ। অস্থায়ী দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে মনিহারী দ্রব্য, খেলনাপাতি, তেলেভাজা, মাটির তৈরি পাত্র, পোশাক, বাঁশ ও বেতের তৈরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এই মেলায় কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

ঘোড়াছুটের মেলা – দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাঠে ঘাটে ঠিক কবে থেকে ঘোড়া ছুটছে, তা হলফ করে বলা যায় না। তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, এখানকার ঐতিহাসিক রাজন্য যুগের প্রথম থেকেই ঘোড়ার ব্যবহার চলে আসছে। স্থানীয় বহু কিংবদন্তীতে হাতিশালের প্রসঙ্গে চলে আসে ঘোড়াশালের কথা। রাজকর্মচারী অথবা সৈন্যসামন্তরাই হয়তো ঘোড়াছুটের প্রথম পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে তা সমষ্টির উৎসবে পরিণত হয়ে গেছে। লৌকিক মেলা হিসাবে ঘোড়াছুটের মেলাগুলি প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। যদিও এবিষয়ে বিশদ গবেষণা হয়নি। নানারকম দোকানপাট, নাগরদোলা, পুতুলনাচ, গাজন গান থাকলেও এই মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ঘোড়ার দৌড়। আর তাই দেখতে কয়েক হাজার মানুষের সারিবদ্ধ মিছিল। আগে ছোটার উপযুক্ত সমান জমির মাঠ ছিল, অপর্যাপ্ত ছিল মেঠোঘাস। ঘোড়াও ছিল প্রচুর। সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাই ঘোড়া পোষেন, তাঁদের বাড়ির কমবয়সী হালকা শরীরের ছেলেরাই ঘোড়ার সহিস হয়। ইদানীং জমি কমে গেছে। কমে গেছে ঘোড়ার সংখ্যাও।

বারুইপুর থানার অন্তর্গত ফুলডুবি, হাড়াল, পালং হাউস ও আক্‌নায় একসময় ঘোড়াছুটের

মেলা বসতো। মানুষের বসতি হওয়ার জন্য এসব জায়গার ঘোড়াছুট বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বেঁচে আছে (১) পুঁড়ির আবাদ (৮ই বৈশাখ) (২) মেজবাবুর আবাদ (২৫ শে বৈশাখ) (৩) শশাড়ি (৪) ইন্দ্রপালা (চৈত্র মাসে) (৫) শোলগোহালিয়া এবং কল্যাণপুরের ঘোড়াছুটের মেলা।

শশাড়ির মেলাটি বহু বছরের পুরাতন। ইন্দ্রপালা গ্রামে দুটি ঘোড়াছুটের মেলা হয়। একটি গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে, অন্যটি হয় মনসা পূজার সময়। কল্যাণপুরের মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ৩রা বৈশাখ বদ্রিনাথ মন্দিরের পূজাকে কেন্দ্র করে। শোলগোহালিয়ার খিরিশতলার মাঠে ঘোড়া ছোটে ২১শে বৈশাখ। গ্রামের 'মুজাহিদ সংঘ' ২০০২ সাল থেকে মেলাটি চালু করেছে। এই মেলা উপলক্ষে সারারাত ধরে চলে গাজন গানের প্রতিযোগিতা।

তথ্যসূত্রপঞ্জি

গ্রন্থ

১। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত – কমল চৌধুরী
৩। কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব – কালিচরণ কর্মকার
৪। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপকথা ও লোকসংস্কৃতি – ড. অমলেন্দু হাজরা
৫। রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি – মাণিকলাল সিংহ
৬। বাংলার লৌকিক দেবতা – গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু
৭। মেদন মল্ল রায়চৌধুরী – নৃপেন দত্ত রায়চৌধুরী
৮। শ্রী শ্রী অনন্ত আচার্যের জীবন চরিত্রকথা ও কীর্ত্তনমালা

স্মারক পুস্তিকা

১। Centenary celebration of Baruipur Munsif Court
২। কালিদাস দত্ত জন্ম বার্ষিকী স্মারক-১৯৮৪
৩। লোকমেলা স্মরণিকা - ১৯৯৮
৪। চম্পাহাটী খৃষ্টীয় সমাজ, সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ
৫। শ্রী সত্যানন্দ মহাপীঠ স্মরণিকা – ২০০৩

পত্র-পত্রিকা

শরৎ , বান্ধব, সংস্কৃতি, আভাতি, তটতরঙ্গ, আদিগঙ্গা, মন-লোক এবং 'পশ্চিমবঙ্গ' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা

সাক্ষাৎকার

১. সুদাম দে (দত্তপাড়া/ বারুইপুর)
২. নিত্যানন্দ দাস বাবাজী (আটিসারা)
৩. বিশ্বনাথ দাস বাবাজী (সদাব্রত ঘাট)
৪. জীবন মণ্ডল (মধ্য সীতাকুণ্ডু)
৫. বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় (রামনগর)
৬. কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল (চিনা)
৭. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (মদারাট)
৮. কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মদারাট)
৯. কালীপদ সরদার (ভাঁটা)
১০. অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় ও সুবীর চট্টোপাধ্যায় (সাউথ গড়িয়া)
১১. হারাধন দাস (খাড়ুপাতালিয়া)

ক্ষেত্রসমীক্ষায় বিশেষ সহায়তা করেছেন ঃ বিপদবারণ সরকার ও পূজন চক্রবর্তী।

বারুইপুর থানার লোকায়ত অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্যা

ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষাল

চার্বাক মতের অপর নাম 'লোকায়ত', যে দর্শনে সাধারণ লোকের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। হরিভদ্রের মতে সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ই 'লোক' এবং এই 'লোক' বা প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ যাঁদের কাছে একমাত্র সত্য তাঁদেরই নাম 'লোকায়ত'। বর্তমান সমাজের নিম্নস্তরের জনগণ ক্রমশই ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষগোচর পৃথিবীকে একমাত্র সত্য বলে এগিয়ে চলেছে। [১] যুগ যুগ ধরে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত, নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে অবদমিত সেই 'ইতরজন'-এর কথাই আমার লেখার বিষয় । আমার আলোচনার ক্ষেত্র অবশ্য বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ — বারুইপুর থানা। এ অঞ্চলে অন্ত্যজ শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। এরা যেহেতু আমাদের দেশের মূল ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই বারুইপুর থানা এলাকার লোকায়ত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনার আগে চোখ ফেরানো যেতে পারে আমাদের দেশের ইতিহাসের ধারার দিকে।

ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জাতি বা বর্ণভেদের প্রসার ও তার কঠোরোতা বৃদ্ধি। ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদের সূচনা দেখা দিয়েছিল এবং সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র– বৃত্তি বা পেশা অনুসারে এই চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তখন শ্রেণীগত বিরোধ ছিল না। পরবর্তীযুগে বর্ণভেদ কঠোর হল এবং তা জন্মগত হল। ঋগ্বেদের উপান্তপর্বে আর্যদের পরাজিত ও পরিচ্যুত অংশ এবং বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠী শূদ্রে পরিণত হয়েছিল। শূদ্রকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল প্রাচীন শাস্ত্রে। শূদ্রের একমাত্র কাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা। কিছু ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ, রাজন্য ক্ষত্রিয় ও নব্যধনী বৈশ্যরা সমাজে বিত্তকৌলীন্য ভোগ করত। মৌর্যযুগে রাজতন্ত্র প্রধান হয়ে ওঠে। এই সময়ে আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণের মর্যাদা তো ছিলই। বৈশ্যদেরও প্রাধান্য ঘটেছিল। আর শূদ্র ক্রমশই নীচে নামতে থাকে। এরা শারীরিক পরিশ্রম করত বলে সমাজ এদের সম্মান দিত না। এদের অনেকেই অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিভক্ত হওয়াই নিম্নবর্ণের বড় দুর্বলতা। এ বিভাগ প্রথম দেখা যায় পাণিনির সময়ে। গুপ্তযুগে তা তীব্র হয়ে ওঠে। সমাজের তিনবর্ণের সেবা করা ও গৃহদাস হওয়া ছাড়া হাতের কাজ করা ও জনমজুর খাটাই শূদ্রদের সমাজনির্দিষ্ট পেশা। [২]

বৈদিকসাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্যরা প্রথমে পঞ্চনদের উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সেখানে তারা বাধা পেয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকেদের কাছে। প্রাচ্যদেশের মানুষদের তারা ঘৃণার চোখে দেখত এবং 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করত। এই ব্রাত্যরা ছিল বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগণ, বৈদিক আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র

নরগোষ্ঠী, বৈদিক আর্যরা ছিল নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। আর বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রাক্-দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দ্রাবিড় ও আর্যভাষাভাষী আলপীয়-দিনারিক নরগোষ্ঠীর মানুষ।[৩]

বাংলার ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল মৌর্যযুগ থেকেই । ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা এখানে আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের আগে বাংলাদেশে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। তখন এখানে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-বিন্যাস ছিল না। প্রথমে ছিল কৌমগোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না ছিল, পদাধিকারঘটিত বৃত্তিভেদ। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাংলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় না। তখনই বাংলার জাতিসমূহ সঙ্করত্বপ্রাপ্ত হয়। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। ফলে সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। তখন বাংলাদেশে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সংস্কার সেনযুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, যে গুপ্তযুগেই উত্তরভারত থেকে ব্রাহ্মণরা দলে দলে বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তখন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পালযুগেও একই ধরনের সমাজব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ তখনো ব্রাহ্মণেতর সমাজে পরবর্তিকালের মত কোনরকম জাতিভেদ ছিল না। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদে আমরা যে সকল জাতির উল্লেখ পাই তারা হল ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিক । এরা সকলেই নিম্নস্তরের লোক ছিল। এখানে একটি পদের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যায় —

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ।

ছোই ছোই জাহ সা ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।

আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সঙ্গ।

নিখিল কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।

তান্তি বিকণআ ডোম্বি অরবনা চাংগেড়া।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া ।।

ডোমরা যে নগরের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করত, বাঁশের তাঁত ও চাঙারি তৈরি করে বিক্রয় করত এবং ব্রাহ্মণস্পর্শ যে তাদের নিষিদ্ধ ছিল তার পরিচয় এই পদে পাওয়া যায়। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ ব্রাহ্মণেতর শুদ্রবর্ণের মানুষদের প্রথম সেই সময়ের বর্ণবিভাগ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তিনটি শ্রেণী হল – (১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর এবং (৩) অন্ত্যজ। সমসাময়িক 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জাতের তালিকা আছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ বাংলার জাতিসমূহকে সঙ্করজাতি বলা হয়েছে।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষেরা অনেকেই বজ্রযান – কালচক্রযান – সহজযান– মন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈব তান্ত্রিক, নাথধর্ম ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজগত আদর্শ এইসব অবৈদিক, অপৌরাণিক ধর্ম ও আচার ভালভাবে নিত না ।

নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন –

'ভূম্যধিকারী শ্রেণীপ্রধান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রপ্রধান, কৃষিপ্রধান সমাজে এইসব ভূমিহীন কৃষক ও অসংখ্য ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ সমাজ-শ্রমিকের কোনও অধিকারই যে ছিল না, ইহা অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার দরকার হয় না। সমসাময়িক স্মৃতিপুরাণই তাহার প্রমাণ।'[৪]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে আমরা জানতে পারি যে, মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য – এই তিন জাতির প্রাধান্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকল জাতির হাত থেকে জলগ্রহণ করতেন না। মাত্র নয়টি জাতি জল-আচরণীয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এদের 'নবশাখ' বলা হত। এরা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ অন্যান্য যে সকল জাতির উল্লেখ আছে, মধ্যযুগের বঙ্গীয় সমাজে তারাও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়ূরভট্ট তাঁর 'ধর্মপুরাণ'-এ বাংলাদেশের জাতিসমূহের এক তালিকা দিয়েছেন –

'সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বলি।

উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি ।।

যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার ।

নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর।।

হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।

মাজি ও বাগ্দী মেটে নাহি ভেদজাতি।।

স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার।

সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার।।

ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।

পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা।।[৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাংলার হিন্দুজাতি ছাড়া ছিল আদিবাসীরা – সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা ও লোধা। সাঁওতালই ছিল বাংলার আদিম অধিবাসী। বাংলার

আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ট্রাল বলা হয়। প্রাচীনসাহিত্যে এদের 'নিষাদ' বলা হয়েছে। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। [৬]

বাংলা বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলা বহুদিন আর্যধর্ম ও সভ্যতার আওতার বাইরে ছিল। লোকায়ত সমাজই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মূল বাসিন্দা। আর্যরা এখানকার আদিবাসী মানুষদের অসুর, রাক্ষস, বানর, নাগ, দানব ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছে। মধ্য-ভারতীয় আর্য-ব্রহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনো এখানকার আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেনি। তার ফলে একটা সমন্বয়ও গড়ে উঠেছে। তবে সেইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে-নিম্নবঙ্গে যে লোকায়ত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে তারা আধুনিক সভ্য মানুষের জীবনচর্যা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে এবং বৈষম্যের শিকারও বটে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানা অঞ্চলে এদের সাক্ষাৎ মেলে। এই অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের নিয়েই আমার বর্তমান আলোচনা।

এ অঞ্চলের কাওরা, মুচি, বাগদি, মেথর, বেদে, ডুলি প্রভৃতি বিভিন্ন অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে কয়েকটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি।

প্রথমত, এই সকল অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো বংশগত পেশা অবলম্বন করে আছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবনধারণের জন্য মূল পেশার পাশাপাশি অন্যান্য পেশাও অবলম্বন করতে হয়েছে। আবার অনেকে মূল পেশা থেকেই সম্পূর্ণ সরে গেছে।

দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। সঞ্চয় নেই বললেই চলে। দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা, এদের জীবনকে ক্লান্ত করে। আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদ এদের কাছে সার্থকভাবে এখনো পৌঁছায়নি।

তৃতীয়ত, শিক্ষা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানত প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। অর্থনৈতিক চাপে এদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে বেশিদূর এগোতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে চিন্তায় চেতনায় এরা অনেক পিছিয়ে।

চতুর্থত, এই শ্রেণীর মানুষ হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত। সভ্য মানুষদের থেকে এরা যে অনেক পিছিয়ে সে বিষয়ে সচেতন, কিন্তু এগিয়ে যাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এদের নেই। ফলে এদের মধ্যে ক্ষোভও লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চমত, পরিবারে উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

ষষ্ঠত, অনেক বাধা, অসুবিধার মধ্যেও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা এরা করে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে এবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

বারুইপুর থানা এলাকার অন্ত্যজশ্রেণীর যে সকল মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা বংশগত পুরনো পেশাই প্রধানত অবলম্বন করে আছে। যেমন বারুইপুরের নতুনপাড়া সংলগ্ন হরিজনপল্লীর মেথরবন্ধুরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নোংরা পরিষ্কারের কাজের সঙ্গেই প্রধানত যুক্ত। এই পাড়ায় প্রায় ৫০-৬০টি ঘর আছে। ধোপাগাছিতেও ১০-১২টি ঘর আছে যেখানে কাওরা সম্প্রদায়ের মানুষ বাঁশের নানারকম ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে। ঝুড়ি-ঝোড়া-চুপড়ি, পাখির খাঁচা, ঝাঁকা প্রভৃতি। সীতাকুণ্ডুতেও কয়েকটি পরিবার আছে যারা সবাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। বারুইপুরের নতুনপাড়া সংলগ্ন হরিজনপল্লীতে পুরুষরা তাদের মূল পেশার পাশাপাশি রিক্সাও চালায়। ধোপাগাছি ও সীতাকুণ্ডুর যে সব মানুষ বাঁশের কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা ভ্যানও চালায়, মেয়েরা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। তবে এদের জীবিকায় মূল পেশার প্রাধান্য আছে। অনেকক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, নানা কারণে মূল বা বংশগত পেশা থেকে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষজন সরে এসেছে। সেখানে অন্যান্য পেশাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যেমন – বেগমপুর গ্রামের দে-ডাঙ্গীর কাওরা পাড়াটি হল বাদ্যিপাড়া। ঢোলক শিল্পীদের বসবাস এখানে। ঢোল, কাঁসি, বাঁশি, তারসানাই প্রভৃতির বাজনদার এরা। কলকাতার আশেপাশের গ্রামগুলির বিভিন্ন পূজা-পার্বণে এরা বাজনা বাজায়। বাজনদার হিসাবে দে-ডাঙ্গীর মানুষরা পরিচিত হলেও এই পেশা তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। কারণ, বাজনাবাজিয়ে সংসার চলে না। মাছের ব্যবসা, ঝুড়ি-বোনা, জনমজুরি খাটাও এদের পেশা। মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে পরিশ্রম করে। জমিতে এরাও কাজ করে। তাছাড়া লোকের বাড়ি কাজ করতে এরা কলকাতায় যায়। বাজনদার হিসাবে পরিচিত হলেও এ পাড়ার সবার ঢোল নেই। ঢোল তৈরি করার মত অর্থও নেই। অনেক সময় ঢাক-ঢোল ধার করে অনুষ্ঠানে এরা বাজাতে যায়।

সাউথ গড়িয়া থেকে ঘোষপুর হয়ে চিনেরমোড় যেতে বাঁদিকে পড়ে মুচিপাড়া। এরই কাছাকাছি বাওড়া গ্রামটিও মুচি অধ্যুষিত এলাকা। এদের প্রধান পেশাই ছিল জুতো তৈরি, ঢাক বাজানো এবং বেতের কাজ। দু-একজন ছাড়া বেশিরভাগই জাতব্যবসা ছেড়ে অন্যান্য কাজ করছে। কারণ জানতে চাইলে এরা বলে, আগের মত ঘরে ঘরে গরু-ছাগল পোষার চল নেই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাগাড়গুলোও জনবসতি থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে এদের ব্যবসাও মার খাচ্ছে। মাংসের দোকান থেকেও এখন ছাল পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এখন গৃহপালিত গরুর দুধের নানা বিকল্প এসে গেছে। তাছাড়া জমিতে গরু-লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন খাটাল ছাড়া গরু-মহিষ পাওয়া খুব শক্ত। আগের মত ঢাকের কদরও উৎসবে আর নেই। তাছাড়া ঢাক তৈরি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঢাক বাজানোর জন্য এখন আর ডাক আসে না। 'ছলন' নিয়ে পুজো দিতে যাবার সময় অবশ্য ঢাকীদের ডাক পড়ে। বেতের কাজও এদের প্রায় বন্ধ। কারণ, প্লাস্টিক সরঞ্জাম বাজার দখল করে নেওয়ায় এদের ব্যবসা মার খাচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলের মুচিরা জনমজুরি,জমির দালালি, ভ্যান চালানো – এইসব করে রোজগার করছে। সাউথ গড়িয়া মুচিপাড়া বা বিড়ালগ্রামের রুইদাস পাড়াতেও দু-একঘর পশুর চামড়াছাড়ানোর কাজ করে। বেশিরভাগই এই পেশা থেকে অনেকদিন সরে গেছে। ভ্যানচালানো, রিক্সাচালানো, জনমজুরি ইত্যাদি পুরুষদের পেশা। আর মেয়েরা হাতের

কাজ যেমন, শোলার কাজ, সব্জি বিক্রি, অন্যের বাড়িতে কাজ করা ইত্যাদি করে সংসার চালায়। বারুইপুরের শাজাহান রোডে (উত্তর উকিলপাড়া) কয়েকঘর বেদে আছে যারা বর্তমানে তাদের নিজস্ব পেশার সঙ্গে যুক্ত নেই বহুদিন। ছেলেরা ব্যবসা বা অন্য কাজে যুক্ত। গোলপুকুর বিদ্যাসাগর পল্লীতেও বেশ কয়েকঘর বেদে আছে। এরাও বর্তমানে এদের জাতপেশা অর্থাৎ সাপধরা, সাপের খেলা দেখানো, ইত্যাদি থেকে সরে গেছে। কারণ, ১৯৭২-এ সরকার থেকে বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণ আইন বলবৎ হওয়ায় বন্য পশুহত্যা, পশুধরে তার মাধ্যমে উপার্জন প্রভৃতি বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ফলে এদের বংশগত পেশা ছেড়ে জনমজুরি খাটার কাজকেই প্রধানত বেছে নিতে হয়। চম্পাহাটির বাজেহাড়ালপাড়া এবং চিনেগ্রামের বেয়ারাপাড়ার বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষরা রিক্সা, ভ্যান চালিয়ে বা পরের জমিতে জনমজুরি খেটে রোজগার করে। মেয়ে-বৌরা পরের বাড়িতে কাজ করে।

বারুইপুর থানা এলাকার অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি তা হল দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা, হতাশায় ভারাক্রান্ত জীবন। সমাজের উচ্চ বা মধ্যবিত্ত স্তর অপেক্ষা এদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু। এদের বেশিরভাগেরই নিজস্ব চাষের জমি নেই। অনেকেই খাসজমিতে বাস করে। অনেকের নিজস্ব ভিটে আছে। তবে মাথা গোঁজার ঠাঁই অনেকেরই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বেগমপুরের দেডাঙ্গী পাড়ার রাস্তার দু-পাশে খুপরি খুপরি মাটির ঘরগুলির হতশ্রী অবস্থা, কোথাও আবার একটা ঘরে একাধিক পরিবার। দেডাঙ্গীর মোহন সরদার আমাকে বলেন – দেখুন, কীভাবে এখানকার মানুষ পশুর মত বেঁচে আছে। চম্পাহাটির বাজেহাড়ালপাড়াতেও নিম্নমানের বাসস্থান লক্ষ্য করেছি। বারুইপুরের হরিজনপল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চোখে পড়ল। অনেকের কাছ থেকে এদের নানা সমস্যার কথা শুনছিলাম। বসবাসজনিত সমস্যাই এদের মূল সমস্যা। এরা সবাই খাসজমিতে বাস করে। মদন রায়চৌধুরী এদের এনে বসান নোংরা পরিষ্কারের জন্য। এদের মধ্যে মুণ্ডা, মাহাতো, হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। ১৯৮৬ সালে পরিবার পিছু ১ কাঠা জমি ও ১০০০ টাকা দেবার বিনিময়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার চুক্তি হয় পৌরসভার সঙ্গে কিন্তু এখনো তা পালিত হয়নি –এই এদের অভিযোগ। ফলে বাসস্থানের অনিশ্চয়তা এদের বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কল, পায়খানা, আলোর সুব্যবস্থা নেই। ঝুপড়িগুলির নিদারুণ অবস্থা। এখান থেকে উঠে যাবার আশংকায় ঘরবাড়ি ঠিকও করতে পারে না। ইতরপ্রাণীর মত বেঁচে থাকা – এটিই এদের অভিযোগ। তবে আশার বিষয়, বর্তমান পৌরবোর্ডের উদ্যোগে মহকুমাশাসক এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। কাউন্সিলার স্বপন মণ্ডল, বকুল মণ্ডল এবং চেয়ারম্যান ইরা চট্টোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ফলে বারুইপুরের নতুনপাড়া সংলগ্ন হরিজনপল্লীর মানুষদের পুনর্বাসন চুক্তি হতে চলেছে। চিনেগ্রামের বেয়ারাপাড়া, সীতাকুণ্ডু, বিড়ালগ্রামের রুইদাসপাড়া, সাউথগড়িয়ার রুইদাসপাড়া ধোপাগাছির কাওরাপাড়ার অবস্থা মোটামুটি। এইসব অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের অভাবের সঙ্গে ওঠাবসা। দিন-আনা, দিন-খাওয়া অবস্থা। কাজে বেরুলে রোজগার,নয়তো অনাহার। সঞ্চয় নেই বললেই চলে। যেসব পরিবারে একাধিক সদস্য রোজগার করে সেখানে তবু খানিকটা সঞ্চয় বা স্বচ্ছলতা আছে। এদের দারিদ্র্যের আর একটিকারণ পরিবারগুলির সদস্যসংখ্যা অনেক, তুলনায় আয়

কম। বারুইপুরের হরিজন পল্লীতে প্রত্যেক পরিবারে ৯-১০ জন করে সদস্য। বেগমপুরের দে-ডাঙ্গীতেও পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি। চম্পাহাটির বাজেহাড়ালপাড়াতেও একই সমস্যা চোখে পড়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনটি কার্যকর হবার ফলে বেদেরা আর বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে পারে না। এতে এদের অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোলপুকুর বিদ্যাসাগরপল্লীর বেদেদের সঙ্গে কথা বলে সেরকমই মনে হল। সাপধরা বা সাপখেলা দেখানো প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে দীর্ঘদিনের জেল, জরিমানা সবই হয়। উপার্জনের ভিন্ন ব্যবস্থা না-করে পেশাটিকে বন্ধ করে দেওয়ায় এরা বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। জনমজুরি খেটে এদের যা উপার্জন হয় তা যৎসামান্য। এদের ঘর-গেরস্থালিতে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

বারুইপুর থানার অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এদের নবপ্রজন্ম স্কুলে যাচ্ছে। হাজার দারিদ্র্যের মধ্যেও বাবা-মায়েরা সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। সরকার থেকেও এখন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে, সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে অন্ত্যজ দরিদ্রশ্রেণীর মানুষদের সন্তানরা প্রাথমিক শিক্ষায় মোটামুটি শিক্ষিত হচ্ছে, তবে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষাস্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর যেতে পারছে না অভাবের জন্য। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেই বাবা-মারা বাচ্চাদের কাজে লাগিয়ে দেয় যাতে সংসারে দু'পয়সা আসে। তবে এর মধ্যেও যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার একেবারে হচ্ছে না তা বলা যাবে না। ডে-ডাঙ্গীর আঙুর সরদার জানালেন, তিনি অনেক কষ্টে তাঁর ছোট ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। গৌতম সরদার বেগমপুর হাইস্কুলে পড়ছে। সাউথগড়িয়া মুচিপাড়ার রুমা রুইদাস বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেছে। এখন সে চাকরিরতা। এরকম খোঁজ করলে আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, ঘোষপুরের মুচিপাড়া, বাওড়াগ্রামের মুচিপাড়াতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে বয়স্ক মানুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেখাপড়া না-জানার ফলে পিছিয়ে পড়েছে। এমনকি সরকার থেকে ব্যবসা করার জন্য লোন দিয়ে সাহায্য করলেও সে সাহায্য অজ্ঞতার জন্য কাজে লাগাতে পারে না। অনেকসময়ই তা খেয়ে ফেলে। ফলে লোন শোধ করতে পারে না।

নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জীবনচর্যায় আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেছি, তা হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপার্জনের ক্ষেত্রে সংসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ। মহিলাদের সংগ্রামরত জীবন লক্ষ্য করার মত। দে-ডাঙ্গীর আরতি ঢালির কাছে শোনা নিয়ত সংগ্রামের কথা এই রকম – আরতি রাত দু'টোয় ক্যানিং যান। সেখান থেকে ফুলচিংড়ি, নিহেড়ে মাছ কিনে মলঙ্গা, নাজিরপুর, কালীনগর, কাঁটাপুকুর, এইসব গ্রামে বিক্রি করেন। তারপর বাড়ি ফিরে রান্নাবান্না। তাঁর স্বামী অসুস্থ দীর্ঘদিন ধরে। ফলে সংসার তাঁকেই সামলাতে হয়। সাউথগড়িয়ার মুচিপাড়ার সবিতা দাসের কাছে শুনলাম সংসারের দায়ভার মূলত মেয়েরাই গ্রহণ করে। কারণ, পুরুষরা সবসময় কাজ পায় না। অনেকসময় বেকার বসে থাকতে হয়। তখন মেয়েরাই সংসার চালায়। পরের বাড়িতে কাজ করে, হাতের নানা জিনিস তৈরি করে অথবা অন্যান্য ব্যবসা করে এরা উপার্জন করে। সীতাকুণ্ডুর পিন্টু সরদারের বাবা ঝুড়ি বোনেন।

পিন্টু ভ্যান চালান, তাঁর স্ত্রী রেণু সরদার আলুর চপ ভেজে বিক্রি করেন। বিড়ালগ্রামের রুইদাসপাড়ার কবিতা রুইদাসের মা ভোর সাড়ে চারটেয় সব্জি নিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতে যান। এভাবেই এই অন্ত্যজশ্রেণীর নারীরা সংসার সামলিয়ে অর্থোপার্জনে অংশগ্রহণ করেন। তবে সমাজে এদের অবস্থান অত্যন্ত বেদনাদায়ক । আমাদের সমাজে উচ্চবর্ণের মেয়েরা আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ-সুবিধা পায়-এরা তা থেকে বঞ্চিত। শ্রেণীবঞ্চনা এবং লিঙ্গ -বঞ্চনার শিকার এই সব নারীরা। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের মন্তব্যটি উল্লেখ করতে পারি—

"বস্তুত নিম্নশ্রেণীর নারীদের ক্ষেত্রে শ্রেণীবঞ্চনা ও লিঙ্গবঞ্চনা এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে তাঁদের জীবন দুঃসহ করতে পারে। একদিকে নিম্নশ্রেণীর অভিশাপ এবং তারই সঙ্গে মেয়ে হয়ে জন্মানোর বঞ্চনা এই দুই দিক একত্রিত হবার ফলে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা নিদারুণ দৈন্য ও রিক্ততার মধ্যে পড়েন।" [৭]

জাতিবর্ণের ক্ষেত্রেও সমস্যাটি একইরকম। নিম্নজাতিতে জন্মালে বঞ্চিত হতে হয়। দারিদ্র্য থাকলে জাতিগত বঞ্চনা আরও বাড়ে। দলিত বা নিম্নবর্ণের মানুষ অথবা তপশিলিভুক্ত আদিবাসীরা দারিদ্র্যের কারণে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়। বারুইপুর এলাকার লোকায়ত অন্ত্যজ শ্রেণীর নরনারীর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আর এই বৈষম্য তাদের মনে সৃষ্টি করে হতাশা, হীনম্মন্যতা। নিজের জাতের পরিচয় দিতে গিয়ে বা পদবি বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। অনেকসময় সম্মান পাবার জন্য উচ্চবর্ণের পদবিও ব্যবহার করে। সর্বোপরি সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে সঞ্চিত আছে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। এই বঞ্চনা, হতাশা আর জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য পুরুষরা অনেক সময়ই নেশায় নিজেকে আচ্ছন্ন রাখে। ফলে সংসারের দায় অনেকটাই বইতে হয় নারীকে।

তবু এ সবের মধ্যেও তাদের আছে পালা-পার্বণ, একটু মুক্তির নিঃশ্বাসের মত। বিড়ালগ্রামের রুইদাসপাড়ায় মনসা, পেঁচোপাঁচি, লক্ষ্মী, শীতলার থান চোখে পড়েছে। বারুইপুর হরিজনপাড়ায়— ছটপুজো, শীতলাপুজো, কালীপুজো, হোলিউৎসব হয়। হোলিতে রঙের বদলে কাদা মাখামাখি করেই এরা আনন্দ করে। বেদে-বেদেনীদের আছে গান এবং নানা লৌকিক উপচার।

যুগযুগ ধরে আমাদের ভারতীয় সমাজে এই নিম্নবর্ণের লোকায়ত শ্রমজীবী মানুষেরা অবহেলা, বঞ্চনা সহ্য করে আসছে, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে। এদের জীবনে আলো এনে দেওয়া একদিনের কাজ নয়। তারজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ একনিষ্ঠ প্রয়াস। এদের পিছনে রেখে দেশ বা সমাজ কখনো এগোতে পারে না। লোকায়ত নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিদের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্য, মূঢ়তা, অজ্ঞতা, অশিক্ষা অনেক কিছুই এদের জীবনকে আবদ্ধ করে রেখেছে । মানুষের মর্যাদা দিয়ে এই মানুষগুলির সমস্যাগুলিকে নিয়ে ভাবতে হবে। আমার এ রচনা বারুইপুর থানা এলাকার লোকায়ত অন্ত্যজ শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে ছোঁয়ার সামান্য প্রয়াসমাত্র। আলোচনার বাইরে থেকে গেল অনেকে। লেখার মধ্যে তাই হয়ত রয়ে গেল অসম্পূর্ণতা।

তথ্যসূত্র

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত দর্শন' প্রবন্ধ, মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'লোকশ্রুতি' প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ৫—৬।

২। সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীনভারত, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃঃ ২২—৩৮।

৩। ডঃ অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১,

পৃঃ ৯৯—১০৫

৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ , আশ্বিন ১৪০২, পৃঃ ২৮০।

৫। ডঃ অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ২১৪।

৬। তদেব, পৃঃ ২১।

৭। অমর্ত্য সেন লিখিত প্রবন্ধ 'ভারতে শ্রেণী বিভাগের তাৎপর্য' দেশ ৭০ বর্ষ ৬ সংখ্যা, পৃঃ ৩৯—৪০।

সাপ ও বেদে

সজলকুমার ভট্টাচার্য

১৯৮৮ সালে 'সাপ ও বেদে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'আনন্দমেলা', 'আজকাল', ওভারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহুল প্রচারিত সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকায় সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় স্বল্পকালেই বইটি প্রকাশকের (কথাশিল্প) ঘর থেকে নিঃশেষিত হয়। দীর্ঘকাল বাদে বারুইপুর পুরসভা সাপ ও বেদেদের সম্বন্ধে লেখা দিতে অনুরোধ করায় বইটির নির্যাস ও সাপের রক্ত সঞ্চালন ও অভিকর্ষ বিষয়ে আলোচনা যোগে সংশেঅধন, সংযোজনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানে সাহায্য করিয়াছেন অধ্যাপক নবীনানন্দ সেন, প্রধান, বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ পার্থ প্রতিম রায়, প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

লেখাটি পড়িয়া পাঠক পাঠিকার যদি ভাল লাগে তাহা হইলে ধন্যবাদ প্রাপ্য পুরপ্রধান শ্রীযুক্তা ইরা চট্টোপাধ্যায় ও কমিশনার স্বপন মণ্ডল, কবি মনোরঞ্জন পুরকায়েত ও অনুজ প্রতি 'আদিগঙ্গা' সম্পাদক শ্রী শক্তি রায়চৌধুরী মহাশয়ের যাদের অনুরোধে এই লেখা।।

চলার পথে চোখ-কান খোলা রাখার উপদেশ আমরা ছোটবেলা থেকেই পেয়ে থাকি। গুরুজনদের এই উপদেশ নানাভাবে সাহায্য করে দৈনন্দিন জীবনে। চলার পথটা যদি কোন মহানগরী হয়, তবে তো চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে নিজের নিরাপত্তার জন্যই সেই মহানগরী যদি কলকাতার মতো বৃহৎ নগরী হয় তবে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনাও আচে। আপনার হাতে যদি কিছু সময় থাকে ও সামনে বিশেষ জরুরী কাজ না থাকে তবে চোখ-কান খোলা রেখে পায়ে হেঁটে চলার পথে বিচিত্র পেশায় নিযুক্ত বহু লোককে দেখতে পাবেন। এমনি করে কিছুদিন হাঁটলে দেশের নানা প্রান্তের মানুষের সাথেও আপনার পরিচয় হয়ে যেতে পারে। তাদের পোশাক, জীবনযাত্রা, পেশা, সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধেও জানা যায়।

এই সংসারে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ কত বিচিত্র পেশাতেই না নিজেকে নিয়োগ করেছে। মানব-ইতিহাসের প্রথম থেকেই মানুষ এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্যও এখানেই। এমনি করে চলার পথে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে গিয়ে আপনিও শহরের নানা জায়গায় দেখতে পাবেন নানাধরনের লোক। কেউ বা দোখাচ্ছে সাপখেলা, কেউ বসে রয়েছে জড়ি-বুটী-তাবিজ নিয়ে। বেদে ও সাপখেলা দেখানোর লোক অন্যদের তুলনায় বেশী। বেদেদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন ওদের বাসস্থানের ঠিকানা। তারপর সময়ে সুযোগে যদি কোনদিন উপস্থিত হতে পারেন ওদের ডেরায়—তবে দেখতে পাবেন এক অজানা জগতের হাতছানি। আমি এদের বারুইপুরের আস্তানাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছি—আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির সাথে এদের বক্তব্য মিলিয়ে যতটুকু পেরেছি পাঠকদের জন্য সাজিয়ে দিচ্ছি। কোন সমাজবিদ যদি

এদের উপর গবেষণা করতে চান, প্রয়োজনে আমি আমার সাধ্যমতো সাহায্য করব।

আমি মনে করি, এদের উপর গবেষণা করলে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যও আবিষ্কৃত হতে পারে। যেমন, আজ থেকে দেড়শো বছর আগেও এই বেদেদের অধিকাংশই ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু, কিন্তু আজ এদের অধিকাংশই নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এই সময়ের মধ্যে তো জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তরকরণের কথা বা পূর্ব-ভারতে বর্ণবৈষম্যের অত্যাচারে ধর্মান্তকরণের ঘটনাও শোনা যায় না। ভবঘুরে বেদেরাই বা করে থেকে পূর্বভারতে স্থায়ী বাসিন্দা হলো?

সাপ ও বেদেদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। সাপের নাম শুনলেই আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। সাপ সম্পর্কে ভয়-ভ্রান্তি, আষাঢ়ে গল্প পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। আদিমকাল থেকেই মানুষ যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারত না—তাকে হয় দেবতার আসনে বসাতো নতুবা ডাইনীর কাজ বলে সমীহ করত। কালে কালে সেগুলি ঘিরে গড়ে ওঠে নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। সৃষ্টির প্রথমাবধিই সাপ সম্পর্কে মানুষের মনে এক অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আজও রয়ে গেছে। যেখানেই সাপের সংখ্যা বেশী যেখানেই সাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা বেশী। সাপের নাম শুনলেই এক হিমশীতল ভয় নেমে আসে। রাত্রে সাপের নাম অবধি মুখে উচ্চারিতও হয় না ভয়ে। সারা পৃথিবীতেই বিশেষ করে আফ্রিকার মিশর ও অন্যান্য দেশে, এশিয়ার জাপান, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, মালয়েশিয়ায় সাপ দেবতার স্থান পায়।

ভবঘুরে যাযাবর বেদেদের সম্পর্কেও আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। ওদের জড়ি, বুটী, তুকতাকের মোহে আমরা আকৃষ্ট হই। কর-কোষ্ঠী গণনায় আশ্চর্য হয়ে প্রথমে জাদুকর, পরে ডাইনী বলে ওদের উপর যুগে যুগে নানা দেশে কম অত্যাচার হয়নি। আজও ওদের ভাষা, পেশা বা আচার-আচারণের সঠিক ইতিহাস অজ্ঞাত। সাপ নিয়ে বেদেদের ব্যবসা সেই আদিম কাল থেকেই। ওরা খালি হাতে যেকোন বিষাক্ত সাপ ধরতে পারে। সাপের বিষদাঁত ভাঙতে ও বিষ আহরণে ওদের কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ওরা খোলস দেখে সাপ চিনতে পারে।

প্রবাদ আছে, 'বেদে চেনে সাপের হাঁচি'। বেদে সাপ চিনলেও, বেদেকে চেনে কে? বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে এদের ভূমিকার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণায়, বারাসাতে, বারুইপুরে, ভাঙ্গড়ে, হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়, বাগনানে, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে মুর্শিদাবাদের কান্দি ও পাঁচথুপীতে, পুরুলিয়ায়, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের নানা জায়গায় বেদে বসতির খবর পাওয়া যায়। পূর্ববাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের নদীতে নৌকাতে বসবাসকারী বেদিয়া বা বাদ্য সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের সুখদুঃখ সাপের আমদানী-রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল। সাপের মূল্যের উপর নির্ভর করে এদের রুজি-রোজগার। শৈশব থেকেই এরা নানারকম সাপের সংস্পর্শে আসে। সাপের আচার, আচরণ, গতিবিধি, চরিত্র এদের অজানা নয়। সাপ-খেলানো এবং সাপের চামড়া, সাপের বিষ, সাপ বিক্রিই এদের পেশা।

মনসামঙ্গল কাব্যে নাগমাতা মনসাকে জগৎজননীরূপে বন্দনা করা হয়েছে।

'প্রণমোহ বিষহরি, বিশ্বরূপবিশ্বেশ্বরী, তুমি দেবী জগত জননী।
তুমি দেবী হর-সুতা, অস্তিক মুনির মাতা, নাগমাতা ভূবনমোহিনী॥
তুমি শিবের নন্দিনী, ত্রিভুবন উদ্ধারিণী, যোগনিদ্রা যোগসনাতনী।
অষ্টনাগ সঙ্গে লয়ে, পূজাস্থানে নাম গিয়ে সেবকের নিস্তারকারিণী॥'

মনসামঙ্গল কাব্যের কল্যাণে এবং গ্রামবাংলায় যেখানে 'পায়ে পায়ে সাপ' সেখানে সাপ নিয়ে নানারকম প্রবাদ, গাল-গল্পের প্রচার স্বাভাবিক।

সাপ দেখেনি, বোধহয়, এমন কেউ নেই। বনজঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে তো বটেই—ঘরের আনাচে-কানাচে, জলাশয়ে, ধানক্ষেতে, মাঠে ময়দানে, পাহাড়ে পর্বতে, খালে বিলে নদীতে, সমুদ্রে সর্বত্রই নানা জাতের সাপ দেখা যায়। সারা পৃথিবীর কথা ধরলে বলা যায় আইসল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং কিছু কিছু সামুদ্রিক দ্বীপ বাদে পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশী সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে ২৫০০-৩০০০ বিভিন্ন জাতের সাপ আছে। আদি মানব ইতিহাস ও ধর্ম ও পুরাণের কাহিনীতে সাপ ও সর্পদেবতার পূজা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

বেদেরা আদিমকাল থেকেই সাপ নিয়ে কারবার করে। সাপ সম্পর্কে এদের ধারণাও সাধারণ লোকদের চেয়ে অনেক বেশী। ওরা সর্পভয় জয় করে সাপকেই ওদের রোজগারের পণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

আধুনিক যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বৎসর লক্ষাধিক লোক সর্পাঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে, যদিও ২৫০০-৩০০০ জাতের সাপের মধ্যে মাত্র শতকারা ১৫ ভাগ বিষাক্ত ও মাত্র ২০০ প্রজাতির সাপ মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। প্রতি বৎসরই এই পৃথিবীতে সাপের কামড়ে মারা যায়। অবশ্য সাপের কামড়ে মরাণপন্ন হয় আরও কয়েকগুণ বেশী লোক। এর শতকরা দশভাগও সরকারী পরিসংখ্যানে স্থান পায় না। গ্রামাঞ্চলেই সাপের উপদ্রব বেশী। গ্রামাঞ্চলে উন্নত চিকিৎসার অভাব। গ্রাম থেকে শহরে চিকিৎসার জন্য আনবার পথেও অনেক রুগী মারা যায়। শহরে এনে সুচিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক ক্ষমতাও অধিকাংশ দরিদ্র গ্রামবাসীর নেই। দরিদ্র গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়েই এবং কিছুটা অন্ধবিশ্বাসেও ওঝা, গুণিন, বেদেদের কাছে যান চিকিৎসার জন্য। শহরে সরকারী হাসপাতালের কর্মব্যস্ত ডাক্তারবাবুদের চেয়ে গ্রামে বসবাসকারী ওঝা, গুণিন, বেদেদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পান ও তাঁদের কাছের লোক, আপনজনও মনে করেন গ্রামবাসীরা। চিকিৎসা-বিভ্রাটকে নিয়তির লিখন মনে করে আগামী বৎসরের মনসা পূজায় ডালা পাঠান গ্রাম্য পুরোহিতের কাছে। আমারা এখনও আমাদের গ্রামবাসীদের জন্য আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পৌছে দিতে পারিনি। শুধু ডাক্তার পাঠালেই হবে না, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

সাপের সঙ্গে মানুষের পরিচয় জন্ম থেকেই। ফসিল দেখে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন সাপ ক্রেটাসিয়াস (Cretaceous) যুগের প্রাণী। প্যালিওলিথিক (Paleolithic) যুগ থেকেই

সাপের খোদিত বা আঁকা-ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাস মাত্র চল্লিশ লক্ষ বৎসরের। সেই তুলনায় সর্পজাতির ইতিহাস কম করেও দশ কোটি বৎসরের। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে জন্মের প্রথমদিন থেকেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে। সর্পজাতির প্রতি মানুষের ভয় ও ভক্তি প্রথম থেকেই। এই ভয় থেকেই মা-মনসার ও তাঁর বাহনদের প্রতি আমাদের এত ভক্তি। সাপ পোষ মানেনা। একা থাকতে ভালবাসে। দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে না। এরা ছড়িয়ে আছে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে। এদের নির্মূল করাও সহজসাধ্য নয়। পরন্তু সাপ ইঁদুর, ব্যাঙ ও চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক নানাপ্রকার পোকা ও পাখি খেয়ে জীবনধারণ করে। তুলনামূলক বিচারে সাপের চেয়ে ইঁদুর মানুষের অনেক বেশী ক্ষতি করে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই—গড়ে আনুমানিক সহস্র কোটি টাকার শস্য নষ্ট করে ইঁদুরে। সাপের প্রধান এবং প্রিয় খাদ্য ইঁদুর। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে অনেক অঞ্চলের বাসিন্দারাই সাপ-মারা থেকে বিরত। কেরালার গ্রামাঞ্চলে, বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় মা-মনসা ও তাঁর বাহনদের জন্য বাস্তুসংলগ্ন কিছুটা জমি ও মন্দির বা থান করা হয়—সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহনদের হাত থেকে ক্ষেতের শস্য রক্ষা করার জন্য এবং মা-লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ভাল ফসল পারার কামনায়। দুধ ও কলা পূজার উপকরণ হিসাবে দেওয়া হয়, যদিও কোনটিই সাপের প্রিয় খাদ্য নয়। পুরানো সংস্কারের মধ্যে উপকারী ফলপ্রদায়ী ব্যবস্থাও লুকিয়ে থাকে। সুদূর আমেরিকা ও পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলিতে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী ও অন্যান্য শস্যবিনষ্টকারী প্রাণী ও সাপের তুলনামূলক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

বেদেরা সাপের চামড়া, সাপের বিষ, জীবিতসাপ, সাপের তেল ও চর্বির ব্যবসা করে জীবন ধারণ করছে সুদূর অতীতকাল থেকে। বেদেদের থেকেই ওঝা ও গুণিনরা প্রথম সাপের বিষের ব্যবহার শেখে। সাপের বিষ ব্যবহার করে সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতীয় আয়ুর্বেদিক বৈদ্যরা 'সূচিকা ভরণ রস' প্রস্তুত করে কলেরার ও যক্ষ্মার চিকিৎসা করছেন। সাপের অপরনাম 'বিষহরি'। মনসামঙ্গল কাব্যেও ওঝা, গুণিনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্পাঘাতের চিকিৎসা করতে দেখা যায়। কেউটের বিষের বহুল ব্যবহার দেখা যায় ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে—নানারকম ব্যথা—বেদনায়, কুষ্ঠ ও কলেরার চিকিৎসায়। হোমিওপ্যাথি ও ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থাও সাপের বিষ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক এ্যালোপাথিক চিকিৎসাতেও সাপের বিষের বিশেষ প্রয়োজন। সর্পঘাতের আধুনিক চিকিৎসাতেও সাপের বিষের সিরামের ব্যবহার করা হয়।

ভারতীয় লোকায়তে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে সাপ ও সর্পদেবতা। পল্লীগাথায়, পল্লীগীতিতে, ধর্মে এবং চিত্রে সাপের—বিশেষ করে কেউটে সাপের—উল্লেখ পাই মহাভারতের কাল থেকে। স্থান, কাল, পাত্রের পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও শোনা যায় মনসা পুঁথির পাঠ। দেখা যায় সারা ভারত জুড়ে নাগপঞ্চমী উৎসব। সমগ্র পূর্ব-ভারতের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরাঞ্চলেও মা-মনসার পূজা হয়। সাপের উপকারিতার ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই কি রচিত হয়েছিল 'মনসামঙ্গল কাব্য' 'কালীয়দমন', 'সমুদ্রমন্থন পর্ব'? সারাভারত জুড়ে দেখা যায় সর্প ও নাগ মন্দির। শিবের গলায় শোভা পায় সাপ। প্রাচীন

পুঁথি-পুরাণে সাপের পূজার ও সপচরিত্রের এক বিশেষ স্থান।

মনে হয়, ভবঘুরে যাযাবর বেদে সম্প্রদাই প্রথম জানতে পারে সর্পচরিত্র, সাপের খাদ্য, গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, নানা জাতের সাপের বিষের তীব্রতার তারতম্য। বেদেরা না—হিন্দু, না—মুসলমান, না-খ্রীষ্টান এক যাযাবর জাতি হওয়ায় ধর্মীয় কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে সাপকে এবং সর্পচরিত্রকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হয়। ওরা দেখল সতর্কতার সঙ্গে এগুলে খালি হাতেই সাপ ধরা যায়। সাপ ধরতে গেলে খুব সতর্কতার প্রয়োজন। সাথে শিকারী বেড়াল, বেজী বা বানর থাকলে তারাই বেদেকে আগেভাগে সাপের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় দেয়। সাপ প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাণী নয়। তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে শত্রুকে চিনে রেখে পরে বদলা নেওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ সাপ কেবলমাত্র আক্রান্ত বা আক্রমণের ভয় থেকেই চকিতে ছোবল মারে বা আক্রমণ করে। সাপের গতিবেগ খুবই সীমিত। স্বল্প সময়ই সাপ দ্রুতগতিতে দৌড়াতে পারে। সাপ ঘণ্টায় গড়ে ২ থেকে ৪ মাইল দৌড়ায়। একমাত্র আফ্রিকার মাম্বা জাতীয় সাপ খোঁচা খেয়ে বিরক্ত হলে ঘণ্টায় সাত মাইল পর্যন্ত দৌড়ায়। সাপের দেহের গঠনের জন্য ও দুর্বল ফুসফুসের জন্য খুব অল্পেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। সাপের তাড়া করলে সহজেই মানুষ দ্বিগুণ গতিতে পালাতে সক্ষম হয়। সর্পসঙ্কুল স্থানে জুতা পায়ে রাখলেই সর্পদংশনে অনিষ্টের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। সাপ শুধু কার্বলিক অ্যাসিড, কেন, যে-কোন তীব্র কীটনাশকের গন্ধই সহ্য করতে পারে না।

সাপ ধরার সবচেয়ে বড় অসুবিধা সাপ এক জায়গায় দল বেঁধে থাকে না। পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে একই সাপের বিভিন্ন জায়গায় গায়ের রং-এর হেরফের হতে দেখা যায়। সাপের লুকিয়ে থাকার দীর্ঘ সহজাত প্রবৃত্তিও শারীরিক অক্ষমতা থেকেই আসে। সাপ শীতল রাক্তের প্রাণী—আহার, রতিক্রিয়া এবং শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক রাখার জন্য যতটুকু নড়াচড়ার প্রয়োজন, সাপ তার চেয়ে বেশী নড়াচড়া পারতপক্ষে করতে চায় না। ক্ষুধার তাড়নায় শিকারের সন্ধানে বা কোন কারণে উত্যক্ত হলে সাপকে দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যায়। প্রায়োজনের তাগিদে সাপকে নানাভাবে শিকার করতে দেখা যায়। যে শিকার দ্রুত পালাতে পারে, বা কামড়াতে আঁচড়াতে পারে, সাপকে দেখা যায় সাধারণত তাকে পেঁচিয়ে দমবন্ধ করে মারতে ও আহার করতে। গেছো সাপরা প্রথম সুযোগেই শিকারের গায়ে বিষ ছিটিয়ে দিয়ে নির্জীব করে দিয়ে সহজেই আহারকর্ম সমাধা করে। সাপ গিলে খায়, চোয়াল আর দাঁতের গড়নের জন্য চিবিয়ে বা ছিঁড়ে খেতে পারে না। আবারে এই চোয়ালের বিশেষ গড়নের জন্যই স্বাভাবিকের চেয়েও বড় শিকার গিলতে পারে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো বেদেরা তাদের সহজাত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে এইসব জানতে পারে। তাদের কাছে সাপ-ধরা বিরাট কোন সমস্যাই নয়। একটু সতর্ক ও কুশলী হওয়া দরকার। যেকোন প্রাণী শিকারেই এই সতর্কতার ও কুশলতার প্রয়োজন। এই সতর্কতা, কুশলতা ও বুদ্ধির জোরে এরা সহজেই ২৫-৩০ ফুট দীর্ঘ সুবিশাল পাইথন সাপ আর ১০-১৫ ফুট দীর্ঘ বিষাক্ত শঙ্খচূড় ধরে আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও সুন্দরবনের বাদা

রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে পৌরপ্রধান
ইরা চ্যাটার্জ্জীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

মদারাট পপুলার একাডেমী

রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়
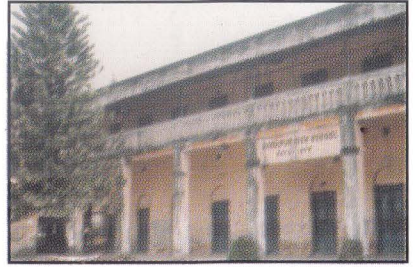
বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়

পাম্পিংস্টেশন, উত্তরভাগ

দুর্গাদালান, কৈলাস ভবন, রামনগর

চেরী শিল্প

বারুইপুরের লকেটফল
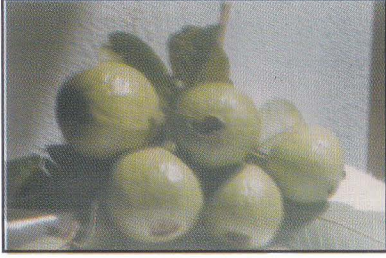
বারুইপুরের পেয়ারা

বারুইপুরের লিচু

ভূতেশ্বরের মন্দির
শুলিপোতাগেট

বারুইপুরের সার্জিক্যাল শিল্প

রাজবল্লভ ভবনের প্রবেশদ্বার
রাসমাঠ, বারুইপুর
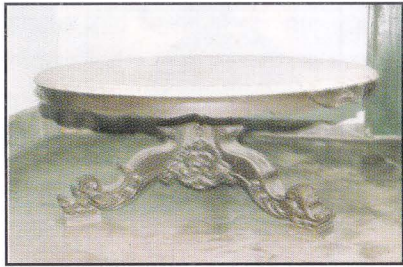
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার টেবিল
চৌধুরীবাড়ি

মধু শিল্প, শাসন, বারুইপুর
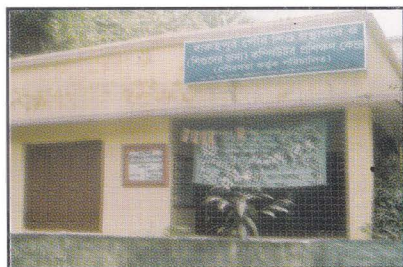
বারুইপুর পৌর শিশুগ্রন্থাগার

চড়কমেলা
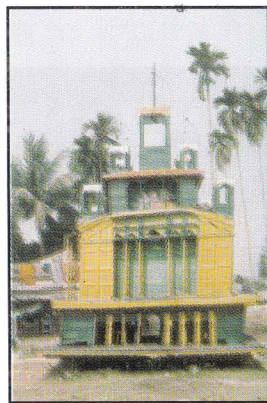
বারুইপুরের রথ

বিষ্ণুমূর্তি
বিদ্যাধরপুর

বরাহ্ অবতার
সীতাকুণ্ড
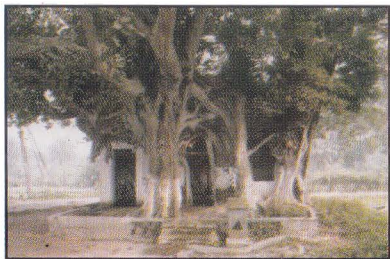
বাবা পঞ্চানন্দের মন্দির
কল্যাণপুর

দক্ষিণরায় (দক্ষিণেশ্বর)
ধপধপি

ব্রোঞ্জের মহিষাসুরমর্দ্দিনী
বেনেডাঙা

বারুইপুরের টেরাকোটা শিল্প

অঞ্চল থেকে। গোক্ষুর, ৫-৭ ফুট কেউটে, চন্দ্রবোড়াও তারা আখছার ধরে; আর ধরে কালাচ বা শিয়র চাঁদা বা শিয়র চাঁপা। এশিয়ার সবচেয়ে বিষাক্ত কেউটে গোষ্ঠীভুক্ত সাপ সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর আছে। বেদেরা সাপ ধরে, সাপ খেলা দেখায়, সাপ বিক্রী করে চিড়িয়াখানায়, সাপের বিষ বিক্রী করে গবেষণাগারের জন্য—সবই ব্যক্তি প্রচেষ্টায়।

দেশের সার্বিক উন্নতির কথা মনে রেখে চাষের জমিকে ইঁদুর, পোকা-মাকড়, পাখীর হাত থেকে রক্ষার জন্য কীটনাশক ঔষধের কুফলের কথা এবং আর্থিক অপচয়ের কথা মনে রেখে প্রকৃতির এই দানকে কাজে লাগানোর কথা ভাবলে ক্ষতি কী? কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়; তাই বলে গৃহস্থবাড়ীতে কুকুর থাকে না? আজ অবধি প্লেগে যত লোক মারা গিয়েছে, সাপের কামড়ে মৃতের হার তার চেয়ে অনেক কম। ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য হলে সর্প সংরক্ষণের জন্য রাজ্যে রাজ্যে সর্পদ্যানের ব্যবস্থা করতে অসুবিধা কোথায়? এটা কারোর ব্যক্তিগত প্রয়াসে হওয়া সম্ভব নয়। এগিয়ে আসতে হবে সরকারকেই। কাজে লাগাতে হবে নিরক্ষর বেদেদেরই। প্রয়োজনে সমবায় গঠন করতে হবে। বেদেরা সাপ ধরবে, সমবায় ঠিক করে দেবে ফসলরক্ষার কাজে লাগবে না বিষ তুলে গবেষণাগারে পাঠাবে অথবা বাইরে রপ্তানী করবে বা চর্ম-শিল্পে ব্যবহার করবে। ওষধ প্রস্তুতের জন্যও সর্পবিষের প্রয়োজন হবে। বিনিময়ে সমবায়কে নিতে হবে ওদের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষার দায়িত্ব। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এখন গড়ে উঠেছে বেদে-বসতি। পূর্বভারতে বেদেদের এক অংশ সুদীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমে বাস করেছে নদীমাতৃক নিম্ন বাংলায়। প্রয়োজনে এদের ব্যবহার করতে হবে। এরাও দীর্ঘকাল ধরে নিম্নবাংলার জল-হাওয়ায় থাকতে থাকতে হারিয়ে ফেলেছে পূর্ব-পুরুষদের যাযাবর বৃত্তি। এদের পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে এসে এদের দিয়েই এই কাজ করাতে হবে। নতুবা চোরাইপথে সাপের দুর্মূল্যে চামড়াও ও বিষ, এমনকি হিসাববহির্ভূত সাপও বাইরে রপ্তানী হবে, ক্ষেতের ধান ইঁদুরে খাবে! কীটনাশক ঔষধ বাড়ীর পোকা মাকড় মারতে, আর ইঁদুর মারতে সাপই ব্যবহৃত হোক। চাষের ক্ষেতে কীটনাশকের ব্যবহার সুদূরপ্রসারী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে। প্রয়োজনে কৃষি, বনবিভাগ ও সমবায় বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে মিলিতভাবে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিতে হবে।

বারুই পুরের বেদে

বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যার—এক কথায় পূর্বভারতের—এক বৃহৎ বেদে বা সাপুড়িয়া সম্প্রদায়ের বাস কলকাতার কাছে দক্ষিণ ২৪পরগণার বারুইপুরে। শতাধিক বেদে পরিবার বারুইপুরের গোলপুকুর, দত্তপাড়া, শাহজান রোড ও মাদারাট অঞ্চলে বাস করে। এরা নিজেদের মধ্যে মূলত দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মপদ্ধতি ও জীবিকার আলোচনায় যাবার আগে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বনেদী শহরে এরা এল কোথা থেকে, কবে ও কেন?

বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক পুরাতন ও বর্ধিষ্ণু শহর। অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরে বেদে সম্প্রদায়ের ইতিহাস মাত্র গত পাঁচ দশকের। যেদিন ভেট্

সাপুড়িয়া উত্তরভাগে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, বারুইপুর থেকে ক্যানিং যাবার পথে একটি গঞ্জ বিশেষ) নদীর ধারে তার একমাত্র সম্পত্তি নৌকাটি বিক্রি করে বারুইপুরে ডেরা বাঁধে সেদিন থেকেই বারুইপুরে বেদে সম্প্রদায়ের স্থিতি বলা যায়। ভেটু সাপুড়িয়ার মেয়ে ও জামাইরা নতুনভাবে জীবন শুরু করার আশায় ১৯৫০ সাল নাগাদ বারুইপুরে চলে আসে। আগে এদের জীবন ছিল নদী-মাতৃক নিম্নবাংলার খালে বিলে নৌকোয় ঘুরে বেড়ানো। তাদের ঘরবড়ী, নৌকায় করেই দূর দূর গ্রামে গিয়ে সাপ ধরত তারা, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করত এবং সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াত। তখন সুন্দরবন অঞ্চলে সাপের খেলা দেখানো অপেক্ষা সাপধরা অনেক বেশী লাভজনক ছিল। সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে নানাবিধ ওষুধের গাছ-গাছড়ার সন্ধান ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ। পেশাগত কারণেই নির্দিষ্ট স্থানে ডেরা বাঁধায় বেদেদের ছিল আপত্তি।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের সাথে সাথে সুন্দরবন অঞ্চলও দ্বিধাবিভক্ত হয়। ভবঘুরে ও যাযাবরের অসুবিধা হয় সীমানা মেনে চলা। স্বাধীনতা উত্তর সুন্দরবনের কোনো অংশে বেদেদের অর্ন্তকলহ ও পেশাগত বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করে। মূলত সেই কারণেই 'ভেটু ও তার সম্প্রদায়' শহর বারুইপুরে এসে ঘর বাঁধে। ভেটু বা তার জামাইরা আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের পরিবার-পরিজনদের ঘিরে গড়ে উঠেছে এক নতুন ধরনের বেদে সমাজ। প্রশ্ন জাগে, কি করে এই ভবঘুরে যাযাবর বেদেদের মন এক নতুন ছাঁচে গড়া হয়ে গেল? বারুইপুরের লোকসংখ্যার আনুপাতিক হারে এরা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এদের জীবনধারণের, আচার-আচরণের বৈচিত্রের জন্য এরা সহজেই সকলের দৃষ্টি কাড়ে। ভেটু, হেরমত, লেদুর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের ও পরিচিত মহলের নানাজন বিভিন্ন প্রয়োজনে আসত। সময়ে তাদেরই এক অংশ বারুইপুরে বসবাস শুরু করে। বারুইপুর শহরের শিথিল সমাজব্যবস্থা ও শহরবাসের আকর্ষণই বোধহয় এখানে এদের বসবাসের কারণ। এবং সহজ সুলভ যাতায়াত ব্যবস্থাও অপর একটি কারণ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যাতায়াত ব্যবস্থার (মূলত বাস ও রেল) কেন্দ্রস্থলে বারুইপুর।

বারুইপুরের বেদেরা অধিকাংশই নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এরা ধর্মান্ধ নয়। গোঁড়া মুসলমানও নয়। এরা হিন্দু দেব-দেবীকেও মান্য করে ঈদের নামাজও পড়ে, আবার কালীপূজার প্রসাদও গ্রহণ করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—এরা নিম্নবিত্ত, সামাজিক অবস্থা অস্থির। ধর্মভীরু নয়। মুলমান হওয়া সত্ত্বেও এরা কাঁকড়া খায়। এরা কোনো সময়েই দুর্বিনীত নয়। স্থানীয় প্রশাকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বারুইপুরের বেদেরা কোনো অবস্থাতেই স্থানীয় দলাদলিতে যোগ দেয় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে-কোনো মেলাতেই পসরাসহ বারুইপুরের বেদে বা বেদেনীকে দেখতে পাওয়া যায়। এদের নিজস্ব কোনো দেবদেবী বা পীর দরগা নেই। যদিও জন্মের ষষ্ঠদিনে চটিপালন ও ৩—৫ বৎসরের মধ্যে মুসলমানীকরণ বা ছুন্নৎ করা হয়। সাধারণ মুসলমান-ধর্মীয়দের মতো ওদেরও তালাকপ্রথা আছে, কিন্তু বারুইপুরের বেদে সমাজে ভুল বোঝাবুঝির অবসানে তালাক সত্ত্বেও পুনর্মিলনের সুযোগও আছে, যা সাধারণ মুসলমান সমাজে নেই।

ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তালাক চাইবে তাকে অপরজনের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। পরিমাণ নির্ধারিত হবে সমাজপতিদের নির্দেশে। ওদের মেয়েরা যে পেশাগত কারণেই পর্দানসীন নয় তা সবজবোধ্য। স্বাভাবিকভাবেই দু-চারজন হিন্দুকন্যা বেদে ছেলেদের প্রেমে পড়ে বারুইপুরে বেদেবধূতে রূপান্তরিত, বিপরীত চিত্র দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

বাইরে থেকে এরা হিন্দু না মুসলমান জানা যায় না। পেশাগত কারণে এরা অনেকেই একাধিক নাম ব্যবহার করে যার একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান। সবদিক বিচার করে এবং পূর্ববাংলার বেদিয়ারা অনেকেই হিন্দু একথা মনে রাখলে ও মূল বেদিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এদের না-হিন্দু না-মুসলমান একটি সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা যায়। এরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও এদের নিজস্ব যে গুপ্তভাষা আছে তার শব্দ সম্ভার বিশ্লেষণ করলেও উপরের ধারণাই বদ্ধমূল হয়। এদের নিজস্ব ভাষায় সঙ্গে পূর্বভারতের অপরাধ জগতের ভাষার অনেক মিল আছে। এদের ভাষা থেকে নিম্নলিখিত শব্দগুলো বাংলা ভাষায়ও ক্রমশ ব্যবহৃত হচ্ছেঃ ধূর (বোকা), বিলা (গোলমেলে), লাঠি (পুলিশ)।

বারুইপুরের বেদেরা ধর্মান্তরিত নিম্ন-বর্ণের হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত হবার সম্ভাবনাও আছে—এদের আচার-আচরণে দেবদ্বিতে, পীরদরগার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও অচলা ভক্তি নেই। কারণ হিসেবে বলা যায়, বহুল ভ্রমণে পোড়-খাওয়া জীবনযাত্রা ওদের অনেক বেশি বাস্তবধর্মী করে দিয়েছে। সাধারণ নিম্নবিত্ত লোকদের মতো ওরা সবকিছু খোদাতাল্লা বা মা কালী ভরসা করে ছেড়ে দেয় না। ওদের রুটি-রুজির জন্য অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়।

মারা গেলে ওরা নিজের জমিতে বা সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত স্থানে করব দেয়। বর্তমান ভারবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত। লেখকের ধারণা, বারুইপুরের বেদেরাও ধর্মান্তরিত; হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার শিকার হয়ে কোন এক সময়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে।

সুন্দরবনে প্রচুর বিষাক্ত সাপের দেখা মেলে। এখানকার চন্দ্রবোড়া, শাখামুটী, কালাচ (শিয়রচাঁদা) ও বিভিন্ন জাতীয় কেউটে পৃথিবীখ্যাত। কালাচ সাপের মতো বিষাক্ত সাপ ভারত কেন সমগ্র এশিয়ায় আছে কিনা সন্দেহ। বেদেরা তাদের কর্মস্থল শুধু সুন্দরবন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখল না। তাদের রক্তে আবহমানকাল ধরে ভ্রমণের নেশা। কাল কেউটে যার বশীভূত, ময়াল, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, শঙ্খচূড়, পদ্মগোক্ষুর যার ভ্রমণসঙ্গী, বেদের রক্ত যার শরীরে—তার আবার পিছুটান কিসের? ওরা বার বার হানা দিয়েছে আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার, মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের সর্পসঙ্কুল অঞ্চল এবং ফিরে এসেছে ঝোলা ভর্তি সাপ আর নানা রোমাঞ্চকর গল্পের নায়ক হয়ে। মাঝে মাঝেই ওরা হারিয়ে আসে ওদের প্রাণপ্রতিম দু'একজন ভ্রমণসঙ্গীকে। চলার পথে ওরা হারিয়েছে ফরমান, মিহিলাল, মোকসেদ, ননীকে। ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে। এটাকে ওরা নিয়তি বলেই গ্রহণ করেছে। বিনা যন্ত্রপাতিতে খালি হাতে ওরা যেভাবে বিষাক্ত সাপকে গর্ত

থেকে বার করে ধরে তা এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর দৃশ্য—কিন্তু সত্য সামান্য অসতর্ক বা হিসেবের ভুলে নেমে আসে হিমশীতল মৃত্যু কাউকে না হারিয়ে ভাল সওদা করে ঘরে ফিরে এলে ওদের আনন্দ দেখে কে? ওদের হাতে ১৪ফুট দীর্ঘ শঙ্খচূড় যার ফণার বিস্তারই দেড়ফুট—বা ২০ফুট দীর্ঘ ময়ালের বন্দীদশা দেখে অপার বিস্ময়ে ওদের নিখুঁত নৈপুণ্য বা অসীম দক্ষতার কথা মনে হয়। ওরা যে দক্ষতার সাপের বিষদাঁত ভাঙে বা সাপের বিষ বার করে তা নিখুঁত শিল্পকর্মের পর্যায়ে পড়ে। শঙ্খচূড় বা কালাচের মুখে হাসিমুখে হাত গলানো যায়-তা কর্ম নয়।

পঞ্চাশের দশক গেছে বারুইপুরের বেদেদের গর্বের দশক। এই দশকে ওরা সাপ ধরত, বিষ সংগ্রহ করত, বিষ রপ্তানী করত সুদূর ইউরেপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার নানা স্থানে। ওদের হাতে ধরা পড়া নানা সাপ ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন চিড়িয়াখানার শোভা বর্ধন করত। তখন ওরা সংখ্যায় ওরা কম, রোজগার বেশ। পায় কে? আনন্দে উল্লাসে দিন কেটেছে। রাত্রে শোবার সময় যার ঘরে কয়েকঝুড়ি কেউটে আছে—তার চিন্তা কী? ভবিষ্যতের চিন্তায় নিরানন্দ থাকতে ওরা রাজী নয়। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এরই দুয়েকজন কিছু টাকা সঞ্চয় করে গৃহাদি নির্মাণ করে নেয়, সন্তান-সন্ততিদের স্কুলে পাঠায়। বেশভূষায় যুগোপযোগী হয়। রুক্ষ বন্ধুর জীবযাত্রায় স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়। বারুইপুরের স্থানীয় জনসাধারণের সাথে, বিশেষত নিম্নবিত্তদের সঙ্গে, অবাধ মেলা-মেশার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, নিম্নবিত্ত দু'একঘর বাসিন্দা আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত হয় অনিশ্চিত জীবন বেছে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বর্ণহিন্দু ননী রায়ের বেদে গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ্য। বেদে তরুণদের মধ্যেও কয়েক জনকে পেশা ত্যাগ করে গৃহস্থ জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে আগ্রহী দেখা যায়।

ষাটের দশকের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ কিন্তু এই বেদে সম্প্রদায়কে একেবারে নাড়া দিতে পারে নি। এই দশকেই, শেষের দিকে, সরকারী নির্দেশে স্বাধীনভাবে বিষ ও সাপের রপ্তানী বন্ধের সূচনা হয়। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সাপুড়িয়া যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের পেশা সামগ্রিকভাবে বদলে নিতে পারল না।

এই দশকেই অবশ্য বেশ কিছু বেদে আবার নিজেদের পেশা ত্যাগ করে ছোটখাট কারখানায় চাকুরী নেয়। মিস্ত্রী বা দিনমজুরের কাজও বেছে নেয়। বেসরকারী পরিবহন ব্যবস্থায় ড্রাইভার, কন্ডাক্টর হিসেবেও যোগ দেয়। মূল পেশা থেকে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও এরা এদের সমাজ ত্যাগ করেনি। মূলস্রোত চলে যথারীতি পুরাতন খাতেই।

সত্তরের দশকে আর্থিক অস্থিরতার, অশিক্ষা, অতিরিক্ত মদ্যপান ও ব্যভিচার ইত্যাদির ফলে বারুইপুরের বেদে সমাজে নেমে আসে অন্ধকার। ১৯৭৩-এ সরকারী নির্দেশে বাইরে সাপ, সাপের বিষ ও চামড়া রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ হয়। সারা ভারত জুড়ে যে কয়েক সহস্র বেদে বা সাপুড়ের এটাই একমাত্র জীবিকা—তাদের বদলী কর্মসংস্থান করল না কেউ। প্রতি বছর এই ভারতে গড়ে দশ থেকে বিশ হাজার লোক সাপের কামড়ে মারা

হয়। বেদেদের হাতে মোট কত লক্ষ সাপ ধরা পড়ে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। যারা যুগ যুগ ধরে মানুষের মন থেকে সর্পভয় দূর করছে—তাদের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার যদি তাদের প্রয়োজনীয় বিষটুকুও এদের থেকে সংগ্রহ করে তাহলে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বেদেরা সাপ না ধরলে সারা ভারত জুড়ে বিষাক্ত সাপের যে হারে সংখ্যা বৃদ্ধি হবে তার হাত থেকে গ্রাম-ভারতকে রক্ষার উপায় কী? ব্যাঙের ব্যবসা লাভজনক বলে এক শ্রেণীর লোক মাঠে, ঘাটে, বনে বাদাড়ে, ব্যাঙের বংশ নির্মূল করে বেড়াচ্ছে। সাপ ধরে পেট ভরে না বলে যদি বেদেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকে—সাপের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে ও খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় যা পাবে তাতেই কি দাঁত বসাবে না সাপ? এতে কোন সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় নেমে আসবে না তো? মনে রাখার মতো বিষয় হল, সাধারণত বিষাক্ত সাপেরা প্রতিবার দশ থেকে চল্লিশটি ডিম পাড়ে। চন্দ্রবোড়া একেক বারে অনধিক চল্লিশ থেকে আশিটি বাচ্ছা প্রসব করে।

বারুইপুরের বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত বেদেদের মধ্য বর্তমানে বাঁটুল, হাসেম জিয়াদ, আমজেদ, মোজাহেব গাজী, লিয়াকত আলি, আদু, কালাচাঁদ ছাড়া আর কেউ সাপ ধরতে যায় না—কারণ সাপ ধরে পেট ভরে না, সংসার চলে না, সাপ ধরে আনলে সাপ কেনার লোক নেই, বিষ কেনার খরিদ্দার নেই।

বিষাক্ত সাপ ধরার পর শত শত চেষ্টাতেও সাধারণত তিন চার মাসের বেশী জীবিত রাখা যায় না। বিষদাঁত না ভেঙ্গে সাপ খেলাতে নিয়ে যাওয়া যায় না—সাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে। বিষদাঁত ভাঙার পর বিষাক্ত সাপকে দশবারো দিনের বেশী খেলানো যায় না। সাপ ক্রমশই নির্জীব হয়ে পড়ে ও মারা যায়। এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই সাপ ধরার চেয়ে সাপ খেলানের দিকে ও মাদুলি বিক্রীর দিকে ওরা সরে যাচ্ছে। দুঃখ কাটাতে সবাই বসে বসে তেলেভাজার সঙ্গে চোলাই বা বিশুদ্ধ বাংলা মদ খায়। এভাবে প্রতিদিন একটি সম্প্রদায় ক্রমশ ভয়াবহ ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে—এদের রক্ষা করতে যদি এখনই এগিয়ে না আসা যায় তবে এর পরিণতিতে শুধু বেদেরা নয় আমরা সবাই বিপন্ন হব।

দেখতেও ভাল লাগে, এরা এখনও গোষ্ঠীবদ্ধ। ওরা বেদে এবং ওদের মোড়লেরা ওদের বিশ্বাসভাজন। এখনও ওরা ওদের সমাজের বিধান মেনে চলে। নিজেদের বিবাদ,, বিসংবাদ নিজেরাই সালিশীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করে নেয়। স্থানীয় প্রশাসনকে ওরা বিগত পঞ্চাশ বছরে কোন বড় রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করেনি। অনেক বারই ওরা নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিগত প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় ওদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায়, স্থানীয় লোকদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর সাপকে বাধ্য হয়ে বাক্সবন্দী অবস্থায় জলে ডুবিয়ে মারতে হয়। ওরা আজ অবধি কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। ওদের আশা, সরকার ওদের মূল সমস্যার সমাধানের সচেষ্ট হবেন। ওরা ওদের বংশগত পেশায় থেকে দলবদ্ধভাবে পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। প্রয়োজন শুধু

যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায়, স্থানীয় লোকদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর সাপকে বাধ্য হয়ে বাক্সবন্দী অবস্থায় জলে ডুবিয়ে মারতে হয়। ওরা আজ অবধি কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। ওদের আশা, সরকার ওদের মূল সমস্যার সমাধানের সচেষ্ট হবেন। ওরা ওদের বংশগত পেশায় থেকে দলবদ্ধভাবে পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনা আর দুবেলা দুমুঠো খাবার। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ওদের কাম্য। বেদে ঘরেই একটি মেয়ে নিজের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স গ্রাজুয়েট হয়ে বর্তমানে এক ব্যাঙ্কে চাকরি করে। এক-আধজন ছেলে মাধ্যমিক অবধি লেখাপড়া করলেও ওদের শিক্ষার হার খুবই কম। পেটের দায়ে গান গেয়ে আর সাপখেলা দেখিয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানো মুস্কিল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও লক্ষ করার বিষয়, ওদের গানগুলি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য-আশ্রিত এবং ওদের নিজেদের গায়ন-রীতিতে গাওয়া হয়। পল্লীগীতির সুরের মধ্যেও ওদের এক নিজস্ব সুর পাওয়া যায়।

সাপের কথা

কথায় আছে 'গল্পের গরু গাছে চড়ে'। আর গরুর স্থানে যদি সাপ হয় তবে তো কথার আর শেষ নেই। সাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন গাল-গল্প সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। শুধু গাল-গল্প কেন, সাপ নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত আছে বহু পৌরাণিক কাহিনী, লোককথা। ভারতেও মহাভারতে, মনসামঙ্গলকাব্যে, মনসা পুঁথিতে, কালিয়মর্দন কাব্যে ছড়িয়ে আছে সাপের নানা কাহিনী। মিশরের ও গ্রীকদেশের পৌরাণিককাব্যেও সাপ তার স্থান করে নিয়েছে। বাইবেলেও সাপের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মানবজীবনের প্রথম থেকেই মানুষ সাপকে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা ও অজ্ঞাত ক্ষমতার কারণে সমীহ করত। গাল-গল্পের রেশ ধরে ধারাবাহিকভাবে সাপ ধর্মে, কাব্যে, শিল্পে নিজের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

বাস্তবে এই রহস্যময় প্রাণীর বিষয়ে একটু খোঁজখবর নিলে বিপরীত চিত্রই পাওয়া যাবে। বির্বতনের মাধ্যমে আদিম সরীসৃপ থেকে বর্তমানের শল্কধারী (আঁশযুক্ত) সাপ এসেছে ধাপে ধাপে বিভিন্ন অবয়বের মাধ্যমে, প্রায় তিরিশ কোটি বছরে। মানবজন্মের অনেক দিন আগে থেকে সাপের এই পৃথিবীতে বিচরণ।

তিরিশকোটি বছরের প্রাচীন সরীসৃপের বংশধর হলেও বর্তমান সাপকে ক্রেটাসিয়াস্ যুগের প্রাণী (দশ কোটী বছর আগের) হিসাবেও গন্য করা যায়। এই যুগেই সাপ অন্যান্য সরীসৃপ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বৈচিত্র্যময় এক পৃথক জাতিতে পরিণত হয়।

সাপ আড়াই থেকে তিন হাজার প্রজাতিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে শতকরা পনেরো ভাগ মাত্র বিষাক্ত। মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বিষযুক্ত প্রজাতির সংখ্যা দু'শোরও কম অর্থাৎ ছয় থেকে আট ভাগ মাত্র। ভারতে প্রায় দু'শো দশ রকম প্রজাতির সাপ দেখা যায়। এদের এক-তৃতীয়াংশ বিষাক্ত গোষ্ঠীর হলেও মানবজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সাপের প্রজাতির সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সাধারণত সাপও অন্যান্য সরীসৃপের মতোই খাদ্যের খোঁজ করে, শত্রু থেকে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে যতটুকু চলাফেরা প্রয়োজন ততটুকু করতে ভালবাসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে এদের দেহের গঠন বৈচিত্র্য ও চলাফেরারর রকমফের জানা দরকার। এদের খাদ্য ও খাদ্য আহরণের ও গ্রহণের প্রক্রিয়া জানা প্রয়োজন। সাপের কামড়, কামড়ের বিষ ও তার চিকিৎসার আলোচনা হবে তারও পরে।

দেহের গঠন বৈচিত্র্য

সাপের দেহের বিশেষ গঠনবৈচিত্র এককে অন্যান্য সরীসৃপ থেকে পৃথক করেছে। পাখীর মতোই সাপের দেহ তার জীবনধারণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাহার ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাপের দেহে অন্যান্য সরীসৃপের তুলনায় হাড়ের সংখ্যা অনেক কম। হাত পা'র কোন স্থান নেই—একমাত্র পাইথন—জাতীয় কিছু আদিম সাপের দেহে এককালে হাত-পা থাকার শেষ চিহ্ন বা অবশেষিত পা দেখতে পাওয়া যায়। করোটি (মাথার খুলি) ব্যতীত সাপের দেহের ছোট ছোট হাড়গুলি একে অপরের সাথে খুবই আল্গাভাবে যুক্ত। মাড়ী, হনুর হাড় ও মাংসপেশী বিশেষভাবে গটিত যাতে প্রয়োজনে প্রতিটি অংশই পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে নড়াচড়া করতে পারে। হাড়ের ও অন্যান্য কঠিন উপাদানের সল্পতা সাপের দেহে এনেছে অতিরিক্ত নমনীয়তা। হাড়ের অপ্রতুলতার জন্য দেহের মাংসপেশী পৃথক পৃথক কাজের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। অন্য প্রাণীদের তুলনায় সাপের মাংসপেশী সুগঠিত ও সুসংহত। দেহগঠনে হাড় ও অন্যান্য ভারী জিনিষের উপাদানের স্বল্পতা সাপকে দিয়েছে চকিতে নড়াচড়ার অতিরিক্ত ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা। সাপের দেহকে করোটি ও মুখমণ্ডল, দীর্ঘ দেহাংশ এবং ক্ষুদ্র লেজের অংশ—এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

শল্ক

সাপের সারাদেহই সারিবদ্ধ আঁশ বা শল্কে মোড়া। আঁশ বা শল্কের সাথে হাড়ের কোনো যোগাযোগ নেই। সাপের শল্ক মাছের আঁশের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনেরও গঠনের। সাপের শল্কগুলি কখনই এলোমেলোভাবে ছড়ানো বা ছিটানো নয়, সুনির্দিষ্টভাবে লাগানো। শল্কের সাহায্যেই সাপ চলাফেরা করে। শল্কই শীতল রক্তের প্রাণী সাপকে বাইরের গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। শল্কের নক্সার পার্থক্যে বিভিন্ন সাপকে চেনা যায়। সাপ বিষধর কিনা তাও জানা যায় শল্কের আকৃতি দেখে। শল্কগুলি খুবই শক্ত, মসৃণ এবং পিছন দিকে উঁচুভাবে থাকে। সাপ খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রাণী। শল্কগুলি ভেজা বা পিচ্ছিল নয়। বুকের ও পেটের শল্কগুলি সরলভাবে সাজানো, কিন্তু পিঠেরগুলি জটিলভাবে সাজানো। শল্ক ও চামড়ার ভাঁজ মিলেমিশে দেহের চামড়া খুবই নমনীয় ও পেলব হয়ে থাকে। প্রয়োজনে শল্ক ও চামড়ার সাহায্যে সাপের দেহ বড় আকার ধারণ করতে পারে (বিসারিত)। মাথার ও দেহের শল্কের গঠনবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে সাধারণত সাপের প্রজাতি ভাগ করা হয়। বিষধর সাপের পেটের শল্ক তুলনামূলকভাবে বড় হয়

এবং আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে। বিষহীন সাপের পেটের শল্ক পিঠের শল্কের মতোই ছোট এবং কোন অবস্থাতেই আড়াআড়িভাবে সারা পেট জুড়ে থাকে না।

খোলস

শল্কের উপরভাগ খুব পাতলা খোলসে ঢাকা থাকে। এই খোলস সর্পদেহে সর্বদাই গঠিত হচ্ছে। নতুন খোলস তৈরী হলে সাপ বাইরের পুরানো খোলস ত্যাগ করে। খোলস ছাড়ার সময় সাপ মুখ ঘসতে ঘসতে মুখের অংশের খোলসের মুখ খুলে ফেলে তারপর ঘসটাতে ঘসটাতে খোলসের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ দেহ বার করে আনে। খোলস সাপের চেহারার প্রতিচ্ছবি। অধিকাংশ সাপই সমগ্র খোলস একসাথে ত্যাগ করে। কোন কোন সময় দুই তিন অংশে বিভক্ত অবস্থায়ও খোলস পড়ে। যেহেতু খোলস সাপের চেহারার একপ্রতিচ্ছবি এবং খোলসে ফুটে ওঠে সাপের হুবহু ছবি, খোলস দেখেও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষত বেদেরা, সাপের প্রজাতি চিনতে পারে। বুঝতে পারে সাপের উপস্থিতি। খোলস ছাড়ার সময় সাপ অলস হয়ে পড়ে। এই সময় সাপকে কিছুটা সাদাটে দেখায়। দুটি পাতলা সাদা খোলসে দেহ মোড়া থাকার জন্য সাপের নিজস্ব রংও ফ্যাকাসে দেখায়। খোলস খুবই পাতলা, ভঙ্গুর এবং সাদাটে; অনেকটা রসুনের খোসার মতো। এই খোলস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। খোলস ছাড়ার পর প্রথম কদিন সাপের রং খুব উজ্জ্বল দেখায়। সাপ গড়ে বছরে ৪-৫ বার খোলস পাল্টায়। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সাপের খোলস ছাড়ার হার কমে যায়। প্রজাতি, স্বাস্থ্য, বয়স ও পরিবেশের উপর এই খোলস ছাড়ার হার নিয়ন্ত্রিত হলেও গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সাপ বেশী খোলস ছাড়ে। কোন কোন সাপ, যেমন আমাদের দেশে চন্দ্রবোড়া, জন্মের তিনদিনের মধ্যেই প্রথম খোলস ছাড়ে।

করোটি

আহারের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ ব্যতীত সাপের করোটি মোটুমুটিভাবে শক্ত সুদৃঢ় বলা চলে। অন্যান্য সরীসৃপের তুলনায় সাপের মগজ অনেকাংশে মজবুত খুলি দ্বারা সুরক্ষিত। বড় শিকার গলাধঃকরণের সুবিধার জন্যই হয়ত মগজকে রক্ষার প্রয়োজনে এই বিশেষ সুবন্দোবস্ত। মগজকে রক্ষা করা ছাড়াও করোটির সামনের দিকের অংশগুলি, বিশেষ করে নাকের হাড়, চোখ, জ্যাকবসন্ ইন্দ্রিয় (বিশেষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়), পিট (তাপচক্ষু) ও অনান্য সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের সম্ভাব্য আক্রমণ বা বাধা থেকে রক্ষা করে। সাপের চোয়াল এবং তৎসংলগ্ন হাড় শিকার গলাধঃকরণের মূল যন্ত্র, অন্যান্য প্রাণী থেকে খুবই পৃথক ধরনের। সাপের নীচের চোয়াল অন্যান্য প্রাণীর মতো চিবুক বা থুতনির সাথে যুক্ত নয়। নীচের চোয়ালের দুটি অংশ আলগাভাবে মুখের মাংসপেশীর সাথে নমনীয় তন্তু দ্বারা যুক্ত। প্রয়োজনে নীচের চোয়ালের দুই প্রান্ত যথেষ্ট সরে গিয়ে তুলনামূলকভাবে সাপকে বড় শিকার গেলার ব্যবস্থা করে দেয়। নীচের চোয়ালের দুই প্রান্ত নমনীয়তা ছাড়াও সাপের চোয়ালের হাড় ও করোটির মাঝে নাড়াবার মতো দুটি স্থান আছে। উপরের চোয়াল ও মাড়ির হাড় পরস্পর এবং করোটির সাথে খুবই

হাল্কাভাবে গ্রথিত; প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে পারে। এতসব বিশেষত্বের লক্ষ্য একটিই—বৃহৎ শিকার ধরা ও গলাধঃকরণ করা। উপরের ও নীচের চোয়ালের দাঁত ছাড়াও সাপের তালুর দুটি হাড়ের দাঁত আছে। পাইথনজাতীয় সাপের শুয়োরের মতো নাকের নীচে প্রলম্বিত দাঁতও দেখা যায়। সাপের দাঁত চোয়ালের সাথে পরপর হাল্কাভাবে লাগানো থাকে। অনেক সময় কামড়াবার সময় দাঁত ভেঙে যায়। সাপের সাধারণ দাঁত নিরেট ও ছুঁচোলো দাঁত। শিকার ধরা ও টেনে আনার কাজ করে। সাপের দাঁতের কাজ চিবানো নয়। প্রজাতি অনুযায়ী দাঁতের সংখ্যা ও আকৃতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শিকার ধরা ও আটকে রাখার জন্য জাতিনির্বিশেষে সাপের দাঁত ধারালো ও মুখের ভেতর দিকে বাঁকানো। কিছু কিছু প্রজাতির (বিশেষত্ ব্যাঙ যাদের মূল খাদ্য) সাপের উপর-চোয়ালের শেষ দাঁত কয়টি বড় ও শক্ত থাকে—ব্যাঙের পেট ফুটো করে ভেতরের বায়ু বের করে গেলার উপযোগী আকৃতিতে আনার জন্য। সাপের দাঁতও অন্যান্য প্রাণীর মতোই আবার গজায়।

একমাত্র বিষধর সাপদেরই উপরের চোয়ালে দুটি করে বিষদাঁত আছে। অন্যান্য দাঁতের মতো বিষদাঁতও আবার গজায়। দাঁত পড়ে গেল পাশ থেকে নূতন দাঁত গজায়। বিষদাঁত ভেঙ্গে গেলে সাধারণত এক থেকে দেড়মাসের মধ্যে নূতন দাঁত ওঠে। বিষদাঁত ভাঙা অবস্থাতেও সাপ শিকার গিলবার সময় তার গায়ে বিষনালী থেকে বিষ এনে মাখায় ও শিকারকে মারতে সচেষ্ট হয়। বিষদাঁত অন্য দাঁতের চেয়ে আকারে বড় হয়। বিষদাঁত সাধারণ দাঁতের পিছনে থাকে। এরা কামড়ের সাথে সাথে বিষদাঁত থেকে বিষ ঢালতে পারে না। কিন্তু এরাও শিকারকে মুখে আটকে রাখা অবস্থায় শিকার গেলার সময় বিষ ঢেলে দেয়। মানুষের পক্ষে এরা তত বিপজ্জনক নয়।

(খ) কেউটে, গোখরো, মাম্বাজাতীয় বিষধর সাপের বিষদাঁতের উপরে নীচে দুটি ছিদ্র আছে। উপরের সরু ছিদ্র দিয়ে কামড়ের সাথে শিকারের গায়ে বিষ ঢালে—নীচের ছিদ্রটি নালিপথে বিষথলির সাথে যুক্ত। এই প্রকার সাপের বিষদাঁতের মাঝে ইন্‌জেকসনের সূচের মতো ভিতরে ফুটো থাকে, কামড়ের সাথে সাথে যার মধ্য দিয়ে বিষথলি থেকে (বিষদাঁতের মধ্য দিয়ে) বিষ শিকারের ক্ষত স্থানে আসে। ছোবল বা কামড় মারার সময় পেশীর চাপে বিষগ্রন্থি সংকুচিত হয়ে তীব্রবেগে বিষ বার করে দেয়।

(গ) চন্দ্রবোড়া ও অন্যান্য ভাইপার সাপের বিষদাঁত তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বড় এবং উপবের চোয়ালে অবস্থিত। এদের বিষদাঁতের গায়ে নালী কাটা; এই নালীপথে কামড়ের সাথে সাথে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ তীব্রগতিতে শিকারের ক্ষতস্থানে এসে পড়ে।

তাপচক্ষু বা পিট (তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়)

বেশ কিছু প্রজাতির সাপের, বিশেষত র‍্যাটল্ সাপ ও অন্যান্য পিট ভাইপারদের নাক ও চোখের মাঝে একটি করে গর্ত থাকে। এই গর্তটি এদের তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়বিশেষ। অজগর (পাইথন) ও বোয়া জাতীয় সাপদের এরকম গর্ত সারিবদ্ধভাবে

চোয়ালের শেষে অবস্থিত। এই গর্তের বা পিটের সাহায্যে তাপ গ্রহণ করে এবং তাপের সংবাদ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পাঠায়। ঠাণ্ডা বা গরম যে-কোন বস্তুর বা প্রাণীর উপস্থিতি বা অবস্থান ও তাপের পার্থক্য বেশ কয়েক ফুট দূর থেকেও এই পিটযুক্ত সাপেরা পায়। রাত্রে শিকার ধরার কাজ সাপকে খুবই সাহায্য করে এই পিট।

নাক ঃ সাপের নাক বেশ বড়। মুখের ওপরতলে থাকে দুটি ছিদ্র বিশিষ্ট সাপের এই স্নায়ু-ইন্দ্রিয়। সাপের নাকের এক পরিমণ্ডিত অংশের নাম জ্যাক বসন ইন্দ্রিয়। নাকের নীচে তালুর ঠিক উপরে অর্ধবৃত্তাকৃতি এই ইন্দ্রিয় থাকে। চলার পথে জিভের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্য থেকে সাপ গন্ধবস্তুর কণিকা সংগ্রহ করে এই ইন্দ্রিয়তে মাখিয়ে দেয়; নাকও একই কাজ সরাসরি করে। এই কারণেই সাপের জিভকে সব সময় লক্‌লকে্ দেখা যায়। এই জ্যাকবসন্ ইন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাপ পরিবেশের সাথে পরিচিত হয় এবং শিকার বা শত্রুর উপস্থিতি টের পায়।

জিভ

সাপের জিভ সামনের দিকে চেরা। মানুষের জিভের মতো সাপের জিভের নিজস্ব স্বাদ-গ্রহণ ক্ষমতা নেই। কোন বিষও নেই। কিন্তু বিষাক্ত সাপের লালাতে বিষ থাকে। সামনের দিকে চেরা থাকার জন্য জিভ-কোন কিছু চেটে খাবার সুবিধা করতে পারে না, আর খেতে সাহায্যও করে না। সাপ সর্বদাই গিলে খাবার খায়; চেটে বা চিবিয়ে খাবার খায় না, তাই জিভের ব্যবহার খুব সীমিত। সাপের জিভের প্রধান কাজ কম্পন অনুভব করা ও পরিবেশ ও বাতাস থেকে বস্তুর গন্ধকণা সংগ্রহ করে জ্যাকবসন্ ইন্দ্রিয়ে মাখিয়ে দেওয়া। ফলে, ঘ্রাণের সাহায্যে জিভ সাপকে অনেক শত্রু, শিকার, পরিবেশ ও অদেখা সঙ্গীর নৈকট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে। সাপের জিভ হলুদ, সবুজ, লাল, কালো প্রভৃতি নানা রঙের হয়।

চোখ

সাপের চোখে কোন পাতা (পলক) নেই। ফলে, চোখ সর্বদা খোলা থাকে। পলক পড়ার প্রশ্ন নেই। চোখের ওপরভাগ (বাইরের দিকের) ব্রিলে (স্বচ্ছ আবরণে) ঢাকা থাকে। প্রতিবার খোলসের সাথে সাথে এই ব্রিলও পাল্টায়। চলাফেরার সময় পথের বাধা, ঘাস-পাতা থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্যই সম্ভবত এই আবরণ। বেশীর ভাগ সাপের চোখ মাথার বেশ পিছনে থাকে, ফলে দৃষ্টিসীমা খুবই সীমিত। চোখদুটির সাহায্য সাপ একটা বড় এলাকাকে মোটামুটিভাবে দেখতে পায়। কিন্তু প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট রূপ দেখতে পায় না। চোখের তারা গোল ও হলদেটে রঙের। কিছু গেছোসাপের চোখে ফভিয়া (fovia) থাকার ফলে সাপেদের মধ্যে এরাই তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন। কোন সাপের চোখে কোন সম্মোহন শক্তি নেই। সাপের চক্ষুগোলক প্রজাতি ও পরিবেশানুযায়ী নানা মাপের ও নানা কাজের উপযোগী হয়। যেমন, দিনচর সাপেরা চোখে উজ্জ্বল আলো সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। ভাইপারজাতীয় নিশাচর সাপদের চক্ষুগোলক বিড়ালের চক্ষুগোলকের মতো

ইলিপটিকাল ধরণের হয়। সাপের স্থিরদৃষ্টির অভাবের জন্য শিকার স্থির হয়ে দাঁড়ালে সাপের আশু আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সাপকে তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হয়।

কান

সাপ কানে শুনতে পায় কিনা এটা আজও বিতর্কের বিষয়। বহিঃকান না থাকায় ও কানের ফুটো না থাকায় বায়ুতরঙ্গ থেকে শব্দ আহরণ করার ক্ষমতা সাপের নেই। মাইক বাজিয়েও দেখা গেছে বায়ুতরঙ্গবাহিত উচ্চ শব্দ গ্রহণ করার ক্ষমতা সাপের কানের নেই। বাঁশীর শব্দ নয়, বাঁশীবাদকের নড়াচড়ার কম্পনেই সাপের মাথার দুলুনী ও ফোঁস-ফাঁস। কানে না শুনলেও সাপ মাটিতে মৃদু কম্পন বা স্পন্দনও উপলব্ধি করতে পারে।

অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি

সাপের দেহের অন্তঃস্থ অন্যান্য অংশের গঠন অন্যান্য সরীসৃপের মতোই। সাপের দেহের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে নানাবিধ বোধেন্দ্রিয় আছে। সুদীর্ঘ শিরদাঁড়া (শিরদাঁড়ার হাড়গুলি অনেকটা বল-বিয়ারিংয়ের মতো একে অপরের সাথে যুক্ত) খুবই নমনীয়। সুদীর্ঘ খাদ্যনালীর শেষে পাকস্থলির এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্র গিয়ে মিলিত হয়েছে মলদ্বারে (cloaca) সাপের যকৃৎ বড় কিন্তু শরীরের সাথে তাল রেখে লম্বাটে এবং কয়েকটি পেশীতে বিভক্ত। অধিকাংশ সাপের দেহেই একটি মাত্র ফুসফুস (শরীরের ডানদিকে অবস্থিত)। পাইথন, বোয়া প্রভৃতি আদিম সাপের দেহের বাঁদিকে ছোট আর-একটি ফুসফুস দেখতে পাওয়া যায়। সাপের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থার একটি বৈচিত্রময় দিক হল ঃ এর শ্বাসরন্ধ্রমুখের ভেতরে চারপাশে ছোট ছোট মাংসপেশী পরিবৃত, যাতে প্রয়োজনে শিকার মুখে আটকে রাখলেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা না হয়। সাপের মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ও খুবই লম্বা, দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি অপরটির উপর সাজানো এবং গুহ্যদ্বারের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী-সাপের ডিম্বাশয় এবং পুরুষ সাপের অণ্ডকোষও সাপের লম্বাটে দেহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুহ্যদ্বারের সঙ্গে যুক্ত।

পুরুষ ও স্ত্রী সাপেরা অন্যান্য প্রাণীদের মতো সংগ্রাম করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ সাপই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসে মেয়ে সাপের থুতনীতে নিজের থুতনী ঘষে; স্ত্রী-সাপের লেজের উপর নিজের লেজ তুলে দিয়ে গায়ে গা ঘষতে থাকে। পুরুষ সাপের জননাঙ্গ দুটো। সাপের সংগম ঘন্টাখানেক ধরে চলে। সাপেরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শীতকালে কোন গর্তে বা নিরাপদ আশ্রয়ে শীতঘুম দেয়। শীতঘুমের পরই সাপকে সংগমরত অবস্থায় বেশী দেখা যায়। স্ত্রী-সাপেরা একেকবারে বেশ কয়েকটি ডিম প্রসব করে। বিষাক্ত সাপেরা সাধারণত প্রতিবার দশ থেকে চল্লিশটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-সাপেরা দেহে পুরুষ সাপের শুক্র বৎসরাধিক কাল সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রজননের প্রয়োজনে স্ত্রী-সাপ ঐ শুক্র ব্যবহার করতে পারে। নির্জন স্থানে পুরুষ-সঙ্গী না পেলেও স্ত্রী-সাপ এর দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে।

চলন ও গতি

সাপের হাত-পা না থাকায় লম্বা দেহ কিলবিল করে এঁকে বেঁকে এগোয়। চলার ভঙ্গি

লক্ষ করলে দেখা যায় এরা পাঁচটি ভঙ্গিতে চলেঃ

(ক) পার্শ্বতরঙ্গায়িত ভঙ্গী—দেহকে ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়ে অনেকগুলি 'S'এর মতো অকৃতি তৈরী করে পার্শ্বিক তরঙ্গে এগিয়ে যায়। দেহের পেশীর সাহায্য চলে। বেশীর ভাগ সাপ অধিকাংশ সময় এইভাবে এগোয় বলে একে সর্পিল গতিও বলে।

(খ) সরল গতি (কনসার্টিনা)—কিছু প্রজাতির সাপ বিষেত যাদের দেহ ভারী ও প্রকৃতি অলস যেমন পাইথন বোয়া ইত্যাদি, মাটির শক্ত অংশে শল্ক আটকে পেশীর সাহায্যে দেহকে এগিয়ে দেয় সামনের দিকে—সরলভাবে দেহ এগিয়ে গেলে শল্ক আবার সামনের নূতন জায়গায় আটকে নিয়ে গলা থেকে লেজ পর্যন্ত এইভাবে সরলরেখায় ছন্দায়িত ঢেউয়ের মতো এগোয়। একইভাবে, সামনে অসুবিধা দেখলে সাপ পিছোতেও পারে।

(গ) পেঁচিয়ে চলা বা বেয়ে ওঠা এইভাবে ওঠার জন্য লম্বা দেহ ও সবল মাংসপেশীর প্রয়োজন। গাছের গুঁড়িতে সাপ প্রথম নিজের দেহকে পেঁচিয়ে নেয়। তারপর মাথার দিকে এগিয়ে কিছু উঁচুতে শক্ত করে পেঁচিয়ে গিঁট দেয়; তারপর নীচের গুঁড়ির প্যাঁচে ঢিলে দেয় এবং উপরের প্যাঁচের উপর ভর দিয়ে নীচের অংশকে টেনে তোলে। এইভাবে গিঁটের পর গিঁট দিয়ে সাপ গাছে চড়ে অনেকটা মানুষের নারকেল গাছ বাওয়ার মতো। খুব কম সাপই এভাবে গাছ বাইতে পারে। অধিকাংশ গোছো সাপই তাদের পেটের শল্কের সাহায্যে গাছের ডালের অমসৃণতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্বতরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে বা সরলগতিক (কনসার্টিনা) অথবা উভয়ভাবেই সাবধানে ধীরে ধীরে এগোয় যতক্ষণ না নাগালের মধ্যে গাছের ডালপালা পাচ্ছে।

(ঙ) পাশে ঠেকো দিয়ে এগানো—নরম জমি, ড্রেন, নালা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাবার সময় সাপ দেহের সামনের অংশ বাঁকিয়ে পাশে ঠেকা দেয় ও দেহের পিছন অংশকে সংকুচিত করে টেনে আনে; এরপর লেজের অংশ দ্বারা পাশে ঠেকা দিয়ে দেহের সামনের অংশকে এগোয়। মসৃন জমিতে অথবা পাশে দেয়াল থাকলেও সাপকে এভাবে দেখা যায়।

পাঁচটি পদ্ধতির যে কোন একটিতে সাপকে চলাফেরা করতে হলেও সাপ প্রধানত প্রথম দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। তৃতীয় পদ্ধতিটি শঙ্খচূড় প্রভৃতি বিশেষ শক্তিশালী সাপেরাই ব্যবহার করে।

সাপের গতি গড় ঘন্টায় দুই মাইল মাত্র। আফ্রিকান মাম্বা সাপের গতি ঘন্টায় ৫-৬ মাইল অবধি, শোনা যায়। ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী হওয়ায়, দেহের তাপমাত্রা কম থাকায় বেং দুর্বল হৃৎপিণ্ডের অধিকারী বলে সাপ দ্রুত ছুটতে পারে না; অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চকিতে ছোবল মারার জন্য সাময়িকভাবে তেড়েফুঁড়ে এলেও সীমিত গতির সাপের পক্ষে বেশী দৌড়ঝাঁপ রা সম্ভব নয়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

সমস্ত জলসাপের গায়ে লেজের মূলে গন্ধগ্রন্থি থেকে তীব্র গন্ধ বের হয়। প্রজনন ক্রিয়ার

সময়ে অন্যান্য সাপও এই নিঃসরিত গন্ধের সাহায্যে যৌনসঙ্গীকে আকর্ষণ করে। শোনা যায়, খড়খড়ি সপা (যে সাপের লেজের শেষে কয়েকটি শৃঙ্গীয় অংশ রয়েছে, ফলে লেজের প্রান্ত জোরে নাড়লে খড়খড় শব্দ হয়) আক্রান্ত হলে তিন-চারফুট দূর অবধি গন্ধ ছিটিয়ে দেয় এই গন্ধগ্রন্থি থেকে। কিছু কিছু প্রজাতির এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও জলসাপ ব্যতীত অন্য সাপের গা থেকে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। সাপের গায়ে কোন ঘর্মগ্রন্থি নেই। কারও পক্ষে দূর থেকে গন্ধ পেয়ে সাপের উপস্থিতি উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং অবাস্তব।

দৈর্ঘ্য

সাপ নানা দৈর্ঘ্যের হয়। সবচেয়ে ছোট সাপ হল সূঁচের মতো ক্ষুদ্র সিরিয়ার সূতো-সাপ—আর দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে লম্বা হয় পাইথন (আমাদের ভাতে স্থানীয় নাম অজগর, ময়াল)। ২৮ থেকে ৩০ ফুট অবধি দৈর্ঘ্যের পাইথনের কথা শোনা গেলেও ১৪ থেকে ২০ ফুটই এদের সাধারণ দৈর্ঘ্য।

বিষাক্ত সাপদের মধ্যে শঙ্খচূড় সাপই (King Cobra) সবচেয়ে লম্বা হয়। ১৮ ফুট অবধি লম্বা শঙ্খচূড়ের কথা শোনা যায়। এই সাপ সাধারণত গভীর জঙ্গলে গাছের খোঁদলে থাকে। লোকালয়ে সচরাচর এই সাপকে দেখা যায় না।

খাদ্য

সাপ মাত্রই মাংসাশী। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে শূকর, হরিণ অবধি গলাধঃকরণ করলেও প্রজাতি অনুযায়ী এদের খাদ্যের পছন্দ-অপছন্দ আছে। অধিকাংশ সাপেরই প্রিয় খাদ্য ইঁদুর, ব্যাঙ ও ছোট ছোট পাখী ও কীটপতঙ্গ। কিছু কিছু প্রজাতির সাপ আবার সাপ খেয়েই জীবনধারণ করে। স্ত্রী-চন্দ্রবোড়া এক সাথে ৪০ থেকে ৮০টি বাচ্ছা প্রসব করে। ক্ষুধার্ত হয়ে সেই বাচ্ছাই ধরে ধরে খাওয়া শুরু করে। কেউটে জাতীয় বিষাক্ত সাপরা নির্বিষ ও বিষাক্ত সর্প অক্লেশে ভক্ষণ করে। সাপেরা পরিমাণমতো খাবার খেলে তাদের ছয় সাত দিন পর আবার খেলেও চলে। পাইথন সাপ পনের-কুড়ি দিনে একবার খাবার গ্রহণ করে। বড় শিকার গলাধঃকরণ করলে দু-তিন মাস না খেলেও পাইথনের খুব অসুবিধা হয় না। সামুদ্রিক সাপ ও জলসাপেরা শীতল রক্তের প্রাণী ছাড়া কিছু গ্রহণ করে না। ডাঙায়-চলা ও গেছো সাপেরা পছন্দ করে পাখী ও ছোট ছোট স্তন্যপায়ী। সাপের আহার খুবই অনিয়মিত। এরা অলস ও ভীরুপ্রকৃতির প্রাণী। খাদ্য হিসেবে বেছে নেয় এমন প্রাণী যা শিকার করতে বেগ পেতে হয় না। খুব বড় সাপেদের পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে বড় শিকার ধরতে হয়। বড় সাপ শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসবন্ধ করে মারে ও গিলে খায়। তারা শিকারকে পেঁচিয়ে ধরলেও হাড়গোড় চুরমার করতে পারে না। আগেই আলোচিত হয়েছে সাপের মুখগহ্বর বড় করার প্রণালী। কিছু কিছু সাপ শিকারের গায়ে বিষ ছিটিয়ে দিয়ে তাকে অবশ করে, তারপর ভক্ষণ করে।

প্রাণীজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের মাধ্যমেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়; সবল

দুর্বলকে এবং দুর্বল দুর্বলতরকে হত্যা ও উদরস্থ করে প্রাণধারণ করে। আত্মরক্ষার জন্য, শত্রুর দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করার জন্য, খাদ্যের প্রয়োজনে দুর্বলতরকে আক্রমণ করার জন্য লুকোচুরি ও প্রতারণা সহজ ও স্বাভাবিক কৌশল। সাপও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্যান্য প্রাণীদের মতোই, সাপকেও বিভিন্ন কৌশল করে থাকে। শিকারের আশায় অসীম ধৈর্যসহকারে নিঃশব্দ শ্লথগতিতে সাপের এগোনো, আশপাশের ডালপালার সাথে গায়ের রং মিনিয়ে আত্মগোপন করা, পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে একই প্রজাতির সাপের বিভিন্ন রং ধারণা করা—একথাই প্রমাণ করা।

ঈগল, বাজ, ময়ূর প্রভৃতি বড় বড় নখযুক্ত পাখী সাপের শত্রু এবং এই অসম যুদ্ধে সাপই পরাস্ত হয়। সাপের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে চিহ্নিত হয়ে আছে বেজী। ধারালো নখের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণে এই ক্ষুদ্র প্রাণী কেউটে, গোক্ষুর, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি বিষাক্ত সাপকেও নাস্তানাবুদ করে। এছাড়া বনমোরগ, গোসাপের কবল থেকে রক্ষা পেতে সাপকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। কিছু প্রজাতির সাপ আবার সাপ খেয়েই জীবনধারণ করে।

চামড়া, বিষ ও চর্বির প্রয়োজনে শিকারী ও বেদেদের হাতে প্রতি বছর বহু সাপ নিহত হয়। চীন, মালয়েশিয়া এবং কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশেও কিছু প্রজাতির সাপের মাংস সুস্বাদু খাদ্যরূপে পরিগণিত হয়।

আত্মরক্ষা বা আহারের প্রয়োজন মেটাতে অদ্ভুত কৌশলে সাপ শত্রুর বা শিকারের শরীরে দাঁত বসায় বা নিজের শরীর দিয়ে শিকার পেঁচিয়ে ধরে। আপাতদৃষ্টিতে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মেন হলেও কাচটা সাপেরা করে বংশানুক্রমিক সংস্কারবশেই। এ ক্ষমতা তাদের অভ্যাস করতে হয় না। জন্ম থেকেই পিতামাতার সান্নিধ্য-বঞ্চিত সাপেদের এই সংস্কারমূলক কৌশলের উদাহরণ প্রকৃতিজগতে প্রচুর আছে।

সর্পদশংন

বিষাক্ত সাপের দংশনে মৃত্যুর হার আমাদের গ্রামদেশে অধিক। কারণ, চিকিৎসার অভাব এবং সাপ সম্বন্ধে ভীতি ও অজ্ঞতা।

অধিকাংশ সাপ নির্বিষ হলেও নির্বিষ সাপের কামড়েও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রোগী হার্টফেল করতে পারে। অনেক সময় নির্বিষ সাপের কামড়েও টিটেনাস বা গ্যাসগ্র্যাংগ্রীনে আক্রান্ত হতে পারে।

সর্পদংশনের চিকিৎসা শুরু করার আগে, সম্ভব হলে, নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার— দংশন বিষাক্ত সাপের কিনা। বিষাক্ত সাপকে নির্বিষ সাপ থেকে নিশ্চিতভাবে পৃথক করা খুব সহজ নয়। সাধারণতভাবে কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা যায় ঃ

ক. বিষাক্ত সাপ চেনা যায় লেজের নীচের শল্ক দেখে, গলার অংশ তুলনায় সরু দেখে;

খ. বিষাক্ত সাপের ফণা থাকতেও পারে—না-ও থাকতে পারে; লেজের অংশ গোল নয়, চ্যাপ্টা এবং ক্রমশ সরু হতে থাকে । লেজ তুলনায় ছোট।

গ. বিষাক্ত সাপের বুকের ও পেটের শল্ক তুলনায় বড়, চওড়া এবং আড়াআড়িভাবে সাজানো থাকে।

ঘ. বিষাক্ত সাপের কামড়ে অন্য দাঁতের তুলনায় বিষ-দাঁত দুটির চিহ্ন গভীরতর হয়ে ফুটে ওঠে। এ চিহ্ন দুটি ক্ষতস্থানের দুই শীর্ষে অবস্থিত দেখা যায়। নির্বিষ সাপের কামড়ে শুধু থাকে কয়েকটি অগভীর চিহ্ন। অবশয তাড়াহুড়ার কারণে বা দাঁত ভাঙা অবস্থায় থাকলেও চিহ্ন অগভীর হতে পারে বা সারিবদ্ধ না-ও হতে পারে। ঠিকমতো দাঁত না বসাতে পারলে দংশন-চিহ্নও ঠিকমতো ফুটে ওঠে না।

বিষাক্ত সাপ সবসময় বিষদাঁত ব্যবহার করতে পারে না বা করে না। বিষদাঁত ব্যবহার করেও পরিমাণমতো বিষ ক্ষতস্থানের রক্তের সংস্পর্শে না এলে প্রাণের ভয় তাকে না। উভয়ক্ষেত্রেই উপযুক্ত চিকিৎসা না হলেও রোগীর প্রাণসংশয় ঘটে না।

রক্তে বিশেষ কয়েকটি উপাদানের উপস্থিতির কারণে নির্বিষ সাপেরাও বিষাক্ত সাপের বিষ বেশ পরিমাণে সহ্য করতে পারে।

সর্প বিষ

প্রজাতিভেদে সাপের বিষের তীব্রতা কম-বেশী হয়। পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। ঋতু পরিবর্তনের কারণেও বিষের পরিমাণ ও তীব্রতার তারতম্য দেখা গেছে; গ্রীষ্মে পরিমাণ বেশী হলেও তীব্রতা কম হয়, শীতে পরিমাণ কম হলেও তীব্রতা বেশী থাকে।

বিষাক্ত সাপের লালাও কমবেশী বিষাক্ত। সর্পবিষ হ'ল ঘন হয়ে ওঠা পরিপাচক রস। অক্ষত ত্বকের ওপর বিষের কোনো ক্রিয়া নেই। অধিকাংশ প্রজাতির সাপের বিষ স্বচ্ছ। কোনো কোনো উগ্র বিষাক্ত সাপের (চন্দ্রবোড়া) বিষ হলদেটে হতেও দেখা যায়। সাপের বিষের স্বাদ তিক্ত ও কষায়। শরীরের অভ্যন্তরে কোনো ক্ষত বা 'আলসার' না থাকলে সাপের বিষ পান করলেও কোন ক্ষতি হয় ন।

বিষাক্ত সাপের বিষথলিতে জন্মের প্রথম দিন থেকেই, পরিমাণে কম হলেও বিষ থাকে।

বিষক্রিয়া

গোক্ষুর, কেউটে, মাম্বাজাতীয় সাপের কামড়ে শ্বসনিক ব্যর্থতায় মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি ভাইপার-জাতীয় সাপের কামড়ে রক্তসঞ্চালনে ব্যর্থতা ও ঘন ঘন রক্তপাত এবং ব্যাপক পচনে মৃত্যু ঘটে। প্রথমোক্ত সাপদের বিষ মূলত স্নায়ুতন্ত্র ও শ্বসনকেন্দ্র আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয়োক্ত সাপের বিষ রক্ত ও আধারতন্ত্র বিষনাশ করে। কোনো বিষই আবার সম্পূর্ণ স্নায়ুনাশক বা রক্তনাশক নয়, উভয় বিষে মিশ্রক্রিয়াও দেখা যায়। শঙ্খচূড়, কেউটে, গোক্ষুর প্রভৃতি উগ্রবিষ সাপ কামড়ানোর সাথে সাথে ক্ষত্রস্থান জ্বালা (পোড়া)ও

তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে। ছয় থেকে আষ্ট মিনিটের মধ্যে প্রতিক্রিয়া—শারীরিক আক্ষেপ শুরু হয়, বমিও হতে পারে। আধ ঘন্টার মধ্যে ঘুম-ঘুম ভাব, কিছুটা নেশগ্রস্তের মতো চলন-বলন দেখা দেয়, লালা গড়াতে শুরু করে। কয়েক ঘন্টা বাদেও জ্ঞান থাকে কিন্তু বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যায়। শ্বসনক্রিয়া ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বিষের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুযায়ী (চিকিৎসাবিহীন অবস্থায়) রোগীর আধঘন্টা থেকে দু'তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে থাকে।

শাঁখামুটি, কালাজ (শিয়রচাঁদা) প্রভৃতি ক্রেইট—প্রজাতির উগ্রবিষ সাপ কামড়ালে প্রতিক্রিয়া হয় অনেকটা শঙ্খচূড়—জাতীয় সাপের কামড়ের মতো; শুধু ক্ষতস্থানে পোড়া-জ্বালা থাকে না, আক্ষেপও হয় মৃদু। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর মূত্রে অ্যালবুমেনের উপস্থিতি দেখা যায়।

চন্দ্রবোড়া বা ভাইপার-জাতীয় বিষাক্ত সাপের কামড়ে ক্ষতস্থানে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হয় কামড়ের সাত-আটমিনিটের মধ্যেই। ক্ষতস্থান ও তার চারপাশ লাল হয়ে ফুলে ওঠে, ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয় ক্ষতস্থান থেকে—দেহ অবশ হয়ে পড়ে। বমি হয়, ঘাম হয় এবং দেহত্বক শীতল হয়ে আসে। শরীরের নানা স্থানে কালসিটে দেখা দেয়, ক্ষতস্থানে পুঁজ হয় এবং মাংস খাে পড়তে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগীর রক্ত বিষিয়ে যায় এবং মৃত্যু ঘটে।

সর্পদংশনের চিকিৎসা

সর্পদংশনের রোগীর চিকিৎসা প্রথম পদক্ষে হলো রোগী মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে তা'র ব্যবস্থা করা ও তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া। প্রাথমিক চিকিৎসার পর যতশীঘ্র সম্ভব নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পাঠানো অবশ্যকর্তব্য।

প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে এখনও ক্ষতস্থানের অল্প উপরের স্থান দড়ি, রুমাল বা কাপড়ের পার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। দড়ির পরিবর্তে রবারের নল ব্যবহার করলে ভালো হয়। রক্ত চলাচল বন্ধ করতে পারার মতো শক্ত করে বাঁধতে হবে—কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এককালীন বিশ মিনিটের বেশী এইভাবে বেঁধে রাখা চলবে না; দশ মিনিট অন্তর এই বাঁধন ঠিলে করে দিতে হবে। বাঁধার পরই ক্ষতস্থান পরিষ্কার জলে বা হালকা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশনে ধুয়ে বিষদাঁতের ক্ষত দুটি নতুন ব্লেড বা পরিষ্কার ছুরি ফুটন্ত জলে 'স্টেরিলাইজ' করে নিয়ে এক সে.মি. দীর্ঘ ও এক মি.মি. গভীর করে চিরে দিতে হবে। ব্লেড বা ছুরি চালাতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই যেন রক্তবাহী ধমনী কাটা না পড়ে তা খেয়াল রাখতে হবে।

দশমিনিটের মধ্যে রোগীর শরীরে কোনো বিষক্রিয়া দেখা না গেলে ধরেই নেওয়া চলতে পারে—দংশনটি নির্বিষ সাপের, অথবা বিষাক্ত সাপ পরিমাণমতো বিষ ঢালতে পারে নি। এক্ষত্রে রোগীকে এ.টি.এস. অথবা টেটভ্যাক—জাতীয় ইনজেকশন দিয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

কোন অবস্থাতেই রোগীকে মাদক দ্রব্য খেতে দেওয়া চলবে না। ওঝা, গুণিন বা হাতুড়ে চিকিৎসকের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া চলবে না কারণ এঁদের অধিকাংশের চিকিৎসাই বাহ্যিক আড়ম্বর ও ভোজবাজী-নির্ভর। এঁদের অসাফল্যের হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না—এর কারণ নির্বিষ সর্পদংশনের ঘটনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার পর—কোন্ প্রজাতির বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে নির্ধারিত হলেই নির্দিষ্ট অ্যান্টিভেনম-এর সাহায্যে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে রোগীকে সযত্ন পর্যবেক্ষণ রাখাও প্রয়োজন।

অ্যান্টিভেনম সাপের বিষ থেকেই তৈরী হয় এবং এই 'টীকা'র প্রয়োগপদ্ধতিও বসন্তের টীকার অনুরূপ। অ্যান্টিভেনম-এর কাযকরী স্থায়িত্ব খুব দীর্ঘ হয় না।

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা নগর ও অপেক্ষাকলত বড় শহরগুলিতেই থাকার ফলে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত ওষুধের (এক্ষেত্রে অ্যান্টিভেনম) অভাব ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই অনুন্নত ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সর্পদংশনের মৃত্যুর হার বেশী।

সাপ নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী ও প্রবাদের সত্যতা

সাপ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ভুল ধারণা আছে। সর্পভীতিকে জিইয়ে রাখা হয়েছে বহু যুগ-প্রচলিত কাব্য-কল্পনা-লোকগাথা ধর্মীয় আচার-আচরণের সাহায্যে। আমাদের দেশের মানুষ-যাঁরা অনেকেই সাপের সঙ্গে ঘর করেন—তাঁরাও এই প্রতিবেশী প্রাণী সম্পর্কে ভীতি অনুভব করেন—কিন্তু কৌতূহলী হন না—এও কম বড় অশিক্ষার পরিচায়ক নয়!

সাপের গোঁফ-দাঁড়ি; মাথায় মণি; ঘর্মগ্রন্থি না থাকার কারণে সাপের গোঁফ-দাড়ি গজায় না—গজাতে পারে না। এ-সব কথা অবাস্তব কল্পনামাত্র। আর সাপের মাথায় যদি মণিই থাকবে—তাহলে সাপুড়ে-বেদেরা চিরদরিদ্রের জীবন-যাপন করতে না।

বাঁশীর সুরে সাপ নাচে ঃ কোনো সময়েই সাপ বাঁশীর শব্দ শুনতে পায় না—কারণ তাদের বহিঃকানও কানের ফুটো নেই। সাপ নাচে বাঁশীবাদকের দুলুনির তালে তালে, তাকে চোখে দেখে ও তার নড়াচড়ার কল্পনানুভূতিতে।

সাপের দৃষ্টিতে সম্মোহন ক্ষমতা আছে ঃ এও কল্পনামাত্র। সম্মোহন ক্ষমতা কেন, অধিকাংশ সাপের স্থিরদৃষ্টিও নেই।

সাপ শত্রু চিনে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সক্ষম ঃ সাপের মতো দুর্বল-মস্তিষ্কের প্রাণীর পক্ষে কাউকে চিনে রাখা সম্ভব নয়। এরা প্রতিহিংসাপরায়ণও নয়; পক্ষান্তরে ভীত-সন্ত্রস্ত, পলায়নপটু প্রাণী।

সাপা তাড়া করে শিকার ধরে ঃ দুর্বল-হৃৎপিণ্ডের অধিকারী এবং শীতল-রক্তের প্রাণী হওয়ায় সাপ অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বেশিদূর তাড়া করার ক্ষমতা এদের নেই।

অফ্রিকার মাম্বা সাপ কিছুদূর পর্যন্ত তাড়া করলেও—তাদের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কেউটে, শঙ্খচূড়, দাঁড়াশ, গোক্ষুর, প্রভৃতি চকিত ছোবল মারলেও তাদের গতি ঘন্টায় দু'তিন মাইল মাত্র।

দুধ কলা সাপের প্রিয় খাদ্যঃ দুধ বা কলা—কোনটিই সাপের খাদ্য নয়। জীবিত প্রাণী ছাড়া আহার করে না।

সাপেরা গরুর বাঁট থেকে দুধ খায়ঃ অসম্ভব কথা। বাঁট চুষে দুধ কেন—কোন কিছু চুষে খাবার ক্ষমতা নেই সাপের।

শিয়রচাঁদা সাপ (কালাজ) মানুষে ঘাম চেটে খেনে নেয় ঃ চুষে খাবার ক্ষমতা যেমন নেই তেমনি চেটে খাবার ক্ষমতাও নেই সাপের, কারণ এদের জিভ চেরা তাছাড়া জিভের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতাই নেই।

দু'মুখো সাপ ঃ এ-রকম সাপ হয় না। সামনে-পিছনে উভয়দিকে চলতে পারার ক্ষমতা থাকায় এবং ভোঁতা লেজবিশিষ্ট হওয়ার কারণে কোনো প্রজাতির সাপকে দেখে এ-রকম ভুল ধারণা হতে পারে। প্রকৃতির খেয়ালে কখনো দু'মুখো সাপ দেখা গেলেও তার দু'টি মাথা দেহের একদিকেই থাকবে— কোন অবস্থাতেই দু'দিকে নয়।

উড়ন্ত সাপ ঃ কালনাগিনয়ী, বেতআছড়া সাপ শরীর ভাসিয়ে (glide করে) এক ডাল থেকে আরেক ডালে যায় তাদের নমনীয় শারীরিক কৌশলে। সাপেরা উড়তে পারে না।

শঙ্খ লাগা ঃ দুটি যুযুধান সাপ পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে দু'তিন ফুট অবধি খাড়া হয়ে উঠেছে—দেখা যায়। সাধারণ মানুষ এব অবস্থাকে সাপের সংগম বলে মনে করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু এ-ধারণা ভুল। দুটি পুরুষ সাপের (ভিন্ন প্রজাতিরও হতে পারে) জায়গা দখলের লড়াই এটি। সংগমরত অবস্থায় সর্পযুগলের পক্ষে এরকম ভঙ্গীতে খাড়া হয়ে ওঠা শারীরিক গঠনের কারণেই প্রায় অসম্ভব।

আমার দেখা কয়টি বিষাক্ত সাপ

বারুইপুরে থাকলে, সময় পেলে আমি বেদেদের পাড়ায় যেমন যাই, তেমনি অন্য কোথাও সাপখেলা হচ্ছে দেখলেও থমকে যাই। সাপ ও বেদেদের সম্বন্ধে জানা আমার একটা বাতিক। বেদেপাড়ার মুখে বসে থাকি বিক্রির জন্য আনা সাপ দেখার জন্য। বেশির ভাগই সাধারণ সাপ তবু ভালো লাগে দেখতে। দৈবাৎ ভাগ্যে জুটে যায় সহজে যা চোখে পড়ে না তেমন কিছু। অবশ্য আজকাল বারুইপুরের বেদেদেরও সে জৌলুস নেই। আগের মতো দূরদূরান্তে সদলবলে সাপ ধরতে যায়ও না তারা।

শঙ্খচূড় (King Cobra)

বেশ কয়েক বছর আগে গ্রীষ্মের এক ছুটির দুপুরে বারুইপুর হাসপাতালের মাঠের বটগাছের শীতল ছায়ায় বসে দলবেঁধে রাজা-উজীর মারছি অর্থাৎ আড্ডায় মশগুল—এরকম সময় বেদেপাড়ায় সোরগোল শুনে এগিয়ে যাই। শুনতে পেলাম, মিহিলাল

সাপুড়িয়া ও হেরেমত সাপুড়িয়া উড়িষ্যা থেকে সাপ ধরে ফিরেছে। উড়িষ্যার পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এক বিশাল শঙ্খচূড় সাপ ধরে এনেছে। দৈর্ঘ্যে ষোল ফুট। বনে এক বিশাল আমগাছের খোঁদল থেকে সাপটি পাওয়া গেছে। যে-কোন লোকের চেয়ে প্রায় তিন গুণ লম্বা এই সাপ খালিহাতে ওরা কৌশলে ধরেছে। আজ মিহিলাল ও হেরেমত দুজনের কেউ জীবিত নেই। কিন্তু সেদিনের সেই সুবিশাল শঙ্খচূড়ের দৃশ্য যখনই মানসপটে ফুটে ওঠে, তখনই ঐ দুই সাপুড়িয়ার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। সাপটি যখন সাত-আট ফুট উঁচু ও প্রায় দেড় ফুট চওড়া কুলোর মতো ফণা ফোঁস করে দাঁড়িয়েছিল, তখন প্রকৃতির এই আজব সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বুকের রক্ত হিম হবার উপক্রম। ভয়ে বেশ কিছুটা পিছনে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। পরবর্তীকালে এই সাপটি মাদ্রাজ সর্পউদ্যানে রক্ষিত হয় ও একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়।

কথায় বলে, সাপের রাজা শঙ্খচূড়। হিন্দী ভাষায় শঙ্খচূড়কে রাজনাগ ও নাগরাজা বলে, গুজরাটী ও মারাঠীরা বলে রাজসাপ। এই শঙ্খচূড় পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আসাম, উড়িষ্যা ও নীলগিরির দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে এর দেখ মিলতে পারে। লোকায়তের বাইরে বনে ও পাহাড়ী অঞ্চলে বিচরণ করে বলে এদের কামড়ে মৃতের সংখ্যাও নগণ্য। এই সাপ অন্য সাপ (বিষাক্ত নির্বিষ), পাখি, গিরগিটি খেয়ে বেঁচে থাকে। এর ফণা কেউটে বা গোক্ষুররের মতো চওড়া না হয়ে কিছুটা গোলাকৃতি হয়। গায়ের রঙ বাদামী বা সবুজাভ হাল্কা কালচে হয়। সারা দেহে নানা রকম ছোপ নক্সা আছে। গলায় মাত্র ১৭-১৯টি শল্ক থাকলেও বুক-পেট মিলিয়ে হিংস্র এই সাপের বিষের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কেউটে সাপের চেয়ে অনেক বেশী। কেউটে সাপের কামড়ের চিকিৎসায় যে অ্যান্টিভেনম কার্যকরী, শঙ্খচূড়ের সেই এ্যান্টিভেনমের সাহায্যে চিকিৎসা করতে হয়। বর্ষাকালে শঙ্খচূড় সংগমে লিপ্ত হয় ও পরবর্ত্রী এপ্রিল মাসে ডিম পাড়ে।

চন্দ্রবোড়া (Russells Viper)

বর্ষাকাল। সারারাত জুড়ে ঝড়-বৃষ্টি। সকালে সুয্যিঠাকুর উঠবেন কিনা দোটনায়। রবিবারের সকাল। ঘুমটাকে যতটা লম্বা করড়া যায় তার চেষ্টা করছি। এরকম সময় উট্‌কো উৎপাতের মতো বিকট কড়া নাড়ার আওয়াজ। অলস শরীরে ঘুম-চোখে বাধ্য হয়ে সদর দরজা খুলে দেখি—ভীত, সন্ত্রস্ত এক প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে। শুকনো মুখ কেন, জিজ্ঞাসা করতেই হাত দিয়ে বাড়ীর পাশের ফল-বাগানের একটি কাঁঠাল গাছ দেখালো। দূর থেকে দেখি, সাত-ফুট উঁচু এক ডাল জড়িয়ে মুখটি দেহের প্যাঁচে গুঁজে বর্ষার আমেজে এক চন্দ্রবোড়া। আমার ছুটির সকালের দফারফা; তাড়াতাড়ি প্রতিবেশীকে পাহারায় রেখে (মহাশয়ের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বলে) বেদেদের কাছে খবর পাঠালাম। বেদেরাও যতশীঘ্র সম্ভব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে হাজির। যন্ত্র বলতে ফুট-চারেক লম্বা একটি লাঠি এক প্রান্তে গর্ত খোঁড়ার জন্য লোহার পাত বসানো, একটি লম্বা সরু বাঁশ, কেটি বড় বস্তা ও কিছু দড়ি। ওরা সর্তকতার সাথে ডালটির তিনদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

লম্বা সরু বাঁশটির সাহায্য আম পাড়ার মতো সাপটিকে খোঁচা দিয়ে ঠেলে ফেললো অপরজন শূন্যেই ওটিকে বস্তায় ভরে সাবধানে বস্তার মুখ বেঁধে বস্তাটি শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমায় বলে গেল, বিলেকে ওর বিষ-দাঁত ভঙবে—যেন দেখ যাই। বস্তার মধ্যের একটানা ফোঁস-ফোঁসানি আর হিস-হিসানি এখনও কানে বাজে।

সারা ভারত জুড়েই চন্দ্রবোড়ার বিচরণভূমি। লম্বায় পাঁচ-ছয় ফুট উজ্জ্বল বাদামী বা চন্দন-হলুদ রং-এর হয়। এর গায়ে তিনসারি প্রায় গোল চাকা চাকা দাগ ঘিরে কালো বেড় দেখতে পাওয়া যায়। পেটে চাকা চাকা চিহ্নের বদলে সাদার উপর ছোট ছোট কালো ছোপও দেখা যায়। এই ছোপ বা চিহ্ন খুবই উজ্জ্বল এবং দেখতে নিখুঁত বাটিকের কাজের মতোই সুন্দর। মোটাসোটা শরীর, চ্যাপ্টা ত্রিকোণ মাথা ও শরীরের নক্‌সা দেখে সহজেই চেনা যায়। তামিল ভাষায় 'মান্ডালি', হিন্দীতে 'কান্দের', গুজরাটীতে 'চিতল' এবং মারাঠী ভাষায় 'গোলস্' বলে। চন্দনবোড়া, উলুবোড়া রক্তছোটে ইত্যাদি চন্দ্রবোড়ার আঞ্চলিক নাম। চন্দ্রবোড়ার মাথার উপরের শল্ক খুবই ছোট ছোট হয়। ফণাহীন, খুবই অলসপ্রকৃতির সাপ নিজে থেকে কাউকে আক্রমণ করে না। ভয় পেলে বিরক্ত হয়ে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়াতে ওস্তাদ। কামড়ে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। প্রতি বছরই চন্দ্রবোড়ার কামড়ে বেশ কিছু লোক মারা যায়। পাথুরে জায়গায় বা ঝোপ-ঝাড়ে পরিবেশের সাথে গা মিশিয়ে লুকিয়ে থাকে। এই সাপ নিশাচর—রাত্রে বেরোয় শিকারের সন্ধানে। ঈষৎ বিরক্তিতেই এর ফোঁস-ফোঁসানী বা হিস-হিসানি অনেকক্ষণ ধরে অনেক দূর থেকে শোনা যায়। চন্দ্রবোড়া সাপের বিষদাঁত অন্যান্য বিষাক্ত সাপের বিষদাঁতের চেয়ে অনেক বড়—দৈর্ঘ্যে ১/২ ইঞ্চির মতো এর বিষদাঁত হয়। কোন কোন প্রজাতির দেহে তাপচক্ষুও দেখা যায়—তাপচক্ষুর সাহায্যে তিন-চার ফুট দুর থেকে শিকার বা শিকারীর উপস্থিতি টের পায়। প্রয়েজনে দেহ কিছুটা গ্লাইডও করতে পারে। ইঁদুর, ব্যাঙ ও ছোট-ছোট পাখী এর প্রিয় খাদ্য। জুলাই মাসে সংগমে লিপ্ত হয়ে পরের বছর জুন মাস নাগাদ ৩০-৪০টি বাচ্চা প্রসব করে। প্রায় চার বছর চন্দ্রবোড়ার আয়ু। মুখের ঘা হল চন্দ্রবোড়ার প্রধান রোগ। গলা ও মাথায় পুঁজ হয়ে এদের মারা যেতে দেখা যায়। চন্দ্রবোড়ার কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণা হলেও চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

শাঁখামুটি (Banded Krait)

ময়দানে মনুমেন্টের পদাদেশে বেদে সাপখেলা দেখাচ্ছে— এ এক পরিচিত দৃশ্য। একদিন এক পরিচিত বেদে খেলা দেখাচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। খেলা দেখানোর আগে লোক জড়ো করার জন্য ডুগডুগি বাজিয়ে বক্তৃতা করছে। সহকারী একের পর এক মাটিলেপা বেতের ঝাঁপি খুলে সাপ দেখাচ্ছে। একটি ঝাঁপি থেকে শাঁখামুটি বা শঙ্খিনী বের করে ময়দানে ঘাসের উপর রেখে দিল। এক ভদ্রলোক এসে বেদেকে বলল, 'ভাই, এটি তো বিষহীন সাপ, আমা বাড়ীতেও একটি আছে। আমার বাড়ীর লোকেরা ওর আশেপাশে গেলেও কিছু বলে না।' চতুর বেদে নিজমুখে কিছু না বলে আমায় দেখিয়ে বলল, 'ঐ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।' আমায় বাধ্য হয়ে বলতে হল 'প্রচণ্ড বিষধর সাপ এই

শাঁখামুটি।' তখন ঐভদ্রলোকের ভয় ও অসহায়তা দেখার মতো। অনেক বলে কয়ে বেশ কিছু টাকার প্রলোভনে বেদেটিকে রাজী করালো সাপটি ধরে আনার জন্য। সাধারণত দৈর্ঘ্য ৪-৫ ফুট লম্বা শাঁখামুটিকে সহজেই চেনা যায়—তার সারা দেহ জুড়ে থাকা দেড়-দুইঞ্চি চওড়া কালো আর হলুদ ডোরা বা পটি পরপর সাজানো থাকার জন্য। লেজের শেষাংশ চ্যাপ্টা। শাঁখামুটির আঞ্চলিক নাম রাজসাপ, রানাসাপ (মেদিনীপুর) পানিচিতা। হিন্দীতে আহিরাজ বা রাজসাপ নামেও পরিজিত। ভারতে এই সাপ—আসাপ, নেফা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখত্র যায়। সম্পূর্ণ নিশচর এই সাপকে দিনের বেলায় নির্জীব পড়ে থাকতে দেখে বিষহীন মনে করলে ভুল করা হবে। বৃষ্টির পর এই সাপ প্রায়ই বাইরে বার হয়। অন্য সাপ, ইঁদুর ও ব্যাঙ এর খাদ্য। ভীরু ও শান্ত মেজাজের জন্য সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না। এপ্রিল মাসে ডিম পাড়ে এবং জুন-মাসে ডিম ফুলে বাচ্ছা বের হয়। এসাপের কোন ফণা নেই।

কালাচ (Common Krait)

বছর সাতেক আগে সারাদিনের দাহন শেষে সূর্য যখন পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার কথা চিন্তা করছে, এরকম এক গ্রীষ্মের বিকালে মথুরাপুর হাতপাতালে পুকুরের ধারে কয়েকজন বেদে-বেদেনীকে খুব সন্ত্রস্ত হয়ে সতর্কতার সঙ্গে খুব মন দিয়ে কিছু খুঁজতে দেখলাম। ওরা আমার পরিচিত হওয়ায়, জানতে চাইলাম—এত আঁতিপাঁতি করে কোন্ হারানো মানিকের সন্ধান করছে তারা। উত্তর শুনে রক্ত হিম হবার জোগাড়। একটি দাঁত না-ভাঙ্গা কালাচ অসর্তক মুহূর্তে ঝাঁপির মায়া ত্যাগ করে সরে পড়েছে। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমান বাইরের আলোবাতাসের মায়া ত্যাগ করে আবার বন্দী হয়ে ঝাঁপিতে ফেরৎ এসে সবার স্বস্তির কারণ হয়। এত চিন্তার কারণ সাপটি কালাচ বলেই। এই কালাচ সমগ্র এশিয়ায় সবচেয়ে মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। মসৃণ ও পালিশ করা ১৫-১৭ সারি শল্কধারী এই কালাচ সাপের বিষের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তীব্র। কালাচের গায়ের রং ইস্পাত-নীল, কালো, কালচে নীল বা গাঢ় খয়েরী হয়। গোল মাথা ও রোগাটে দেহধারী এই সাপ লম্বায় বড়জোর ৩-৪ ফুট। হিন্দীতে একেই 'করাইত' সাপ বলে। ডোমনা, ডোমাচিতি, শিয়রচাঁদা, শিখরচাঁদা, কালোচিতি, চিতিবোড়া, গোদাচিতি এর আঞ্চলিক নাম। কালাচের প্রচুর উপ-প্রজাতিও দেখা যায়; সেইজন্য স্থান ও নামের পার্থক্যানুসারে এদের কিছু কিছু বৈষম্য দেখা যায়। কালাচের সাথে ঘরচিতি বা কোঠাচিতির গোলমাল (চেহারার সৌসাদৃশ্যাহেতু হতে পারে। ঘরচিতি বা কোঠাচিতি সম্পূর্ণ নির্বিষ; ঘরচিতি বা কোঠাচিতি রাগী ধূসর রঙের সাপ এবং আকারেও ছোট। কিন্তু উভয়েই নিশাচর ও লোকালয়ে থাকতে পছন্দ করে। কালাচ সারাদিন অলসভাবে দিন কাটিয়ে রাত্রে জোড়ে (স্ত্রী-পুরুষ) বেরোয় খাবারের সন্ধানে। আকারে ছোট হওয়ায় সর্বত্র অবাধ গতি। প্রিয় খাদ্য ইঁদুর ও ান্য ছোট ছোট সাপ।

এ্যান্টি-ভেনমের সাহায্য সময়মত চিকিৎসা শুরু না করলে কালাচের কামড়ে মৃত্যু অবধারিত। এর কামড়ে প্রথমে খুব জ্বালা যন্ত্রণা না হলেও ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঝিমুনী

ও ঘুম ঘুম ভাব আসবে। রাত্রে কালাচ খুবই ক্ষিপ্র। সাধারণত এপ্রিল মে মাস নাগাদ এক সাথে ৮-১০টি ডিম পাড়ে এবং ৪৫-৬০ দিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। কালাচ সাপের বিষদাঁত অন্যান্য বিষধর সাপের তুলনায় ছোট এবং এই সাপ কামড়ালে কুকুরের মতো কামড় দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে থাকে।

গোক্ষুর, গোখরো (Common Cobra) এবং কেউটে (Indian Cobra)

বছর দুয়েক আগে শীতের সকাল। বেলা দশটা নাগাদ এক বেদে এল। আমার পূর্বপরিচিত। অনেকদিন আগে ওকে বলেছিলাম, সাপ আর বেজীর খেলা দেখাতে। এতদিনে সময় হল। একটি ইঁটের সাথে লম্বাদড়ি (সুতলি ধরণের) দিয়ে বেজীটিকে বেঁধে একটি গোখরো এবং একটি সাপকে ছেড়ে দিল উঠানে। দুটি বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে দুদিকে, মাঝে লোমখাড়া করে বেজীটি। যতবারেই যেকোন সাপ ফোঁস করে ফণা তুলে ছোবল মারে বেজী দ্রুত পালিয়ে যায় সাপের আওতার বাইরে, আবার আসে সাপের আওতার মধ্যে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর দেখি, গোখরোটি নেতিয়ে পড়েছে। কেউটেটি পরিশ্রান্ত। বেদে গোখরো সাপটি তুলে দেখালো, ওর গলা রক্তাক্ত। বেশ কয়েকবারই বেজী পালাবার সময় সাপের কামড় এড়িয়ে সাপের গলায় তীক্ষ্ন নখের আঁচড় বসিয়ে দিতে পেরেছে।

(ক) গোখরো

এই সাপের ফণার উপর গরুর খুরের মতো চিহ্ন আছে বলে 'গোখরো' বা 'গোক্ষুর' নামকরণ। আসাম ও চীনে গোখরোর ফণার কালো মতো বালাও দেখা যায়। লম্বায় ছ-সাত ফুট অবধি হয়। পুরুষ গোখরো সাপের ফণা লম্বা থেকে চওড়া বেশী হয়। ফণার উল্টো পিঠে দুটি কালো গোল টিপ মতো দেখা যায়। সাধারণত হলুদ, বাদামী, লালচে এবং কালো রং-এর গোখরো দেখা যায়। গোখরো সাপ অঞ্চলভেদে খরিশ, তম্প, কালীগোখরো নামে পরিচিত। গোখরোর ঘাড়ের নীচে কয়েকটি কালো পটি বা ব্যাণ্ড দেখা যায়। গোক্ষুর অতি সজাগ সাপ। এর বিষও অতি তীব্র। প্রতি বছরই ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ও চীনে বেশ কিছু লোক এই সাপের কামড়ে মারা যায়। গোক্ষুরের প্রিয় খাদ্য ইঁদুরের খোঁজেই গোখরো বসতবাটীতে এসে ওঠে। বিরক্ত বা ভীত হলে গলার পঞ্জরগুলি বিস্তারিত করে গলা ফুলিয়ে ফণা ধরে। বর্ষাকালে পুরুষ-গোখরো স্ত্রীগোখরোর সাথে মিলিত হয়। এপ্রিল মাসে ডিম পাড়ে। গোখরো সাপের বিষ মূলত স্নায়ুকে বিষাক্ত করে। কামড়ে খুব যন্ত্রণা হয়, কামড়ের স্থান ফুলে উঠে। শ্বসনে ব্যর্থতা এসে মৃত্যুর কারণ হয়। একমাত্র নির্দিষ্ট এন্টিভেনম ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করলে রুগী আরোগ্যলাভ করতে পারে।

(খ) কেউটে

কেউটে সাপ ও গোখরো সাপ একই প্রজাতির সাপ হওয়ায় উভয়ের মধ্যে অনেক চারিত্রিক মিল দেখতে পাওয়া যায়। লম্বায় পাঁচ-ছয় ফুট অবধি হয়। গায়ের রং কালো,

খয়েরী বা হলদে হয়। ফণার নীচে গোল কালো ফুটকি দেখতে পাওয়া যায়। আঞ্চলিক নাম পদ্মকেউটে, আলাদ মাকড়াকেউটে, আলকেউটে! এ সাপও গোখরোর মতোই রাগী এবং চকিতে ফণা তোলে। সাধারণত এরা ধানক্ষেতে ইঁদুরের খোঁজে, খানা-ডোবায় ব্যাঙের সন্ধানে ঘোরে। গোখরোর মতো যখন তখন ঘরে না এলেও হাটে, মাঠে, ঘাটে, সর্বত্রই এদের দেখতে পাওয়া যায়।

সাপের রক্তসঞ্চালন ও অভিকর্ষ

সাপ যখন কোন কিছু বেয়ে ওঠে বা ফণা তোলে, তখন তার কার্ডিও ভাসকুলার সিস্টেম অবশ্যই তীব্র চাপ প্রতিরোধ করে। একটি সামুদ্রিক সাপের থেকে একটি গোছো সাপের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা ভিন্ন হতে বাধ্য অভিকর্ষের প্রভাবে।

অভিকর্ষ হল পৃথিবীর এক সর্বব্যাপী শক্তি। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই নানাভাবে অভিকর্ষের সাথে মানিয়ে চলে। অস্বাভাবিক উঁচু বৃক্ষকে (৩৬০-৩৬৫ ফুট) উপর দিকের শাখা-প্রশাখায় সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত করিতে হয় অপর দিকে সমুদ্রের গভীর তলদেশে (১৯০০০ ফুটের ও বেশী) থাকা প্রাণীরা কিভাবে বেঁচে আছে যেখানে জলস্তম্ভের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৮৮০০ পাউন্ডেরও বেশী? যুগ যুগ ধরে অভিকর্ষের সাথে অভিযোজনের এই দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল উদ্রেক করে।

স্থলজ পরিবেশের প্রাণীদের কার্ডিও ভাসকুলার প্রণালীর উপর বিশেষ অভিঘাত থাকে, এবং যেসব প্রজাতি ভার্টিকাল ওরিয়েন্টেশন অবলম্বন করে তাদের ক্ষেত্রে স্বভাবতই অভিকর্ষের প্রভাব তীব্র হবে। কোন প্রাণীর কার্ডিওভাসকুলার প্রণালীর নকশা তার জীবনধারার এবং অভিকর্ষর দ্বারা প্রভাবিত হয় বলিয়া কোন কোন প্রাণী সার্কুলেটরী রেগুলেশন অধ্যয়নের মূল্যবান উদারহরণ হিবেবে বিবেচিত হয়। সমস্ত মেরুদন্ডীয় প্রাণীদের মধ্যে অভিকর্ষ ও কার্ডিও ভাসকুলার প্রণালীর ব্যাপরে মানিয়ে নেওয়ার এবং বৈচিত্রের হিসাবে সাপ অন্যসব প্রাণীদের টেক্কা দেয়—এবং জিরাফ ও এরকম অপর এক প্রাণী। জিরাফের হৃদপিন্ড থেকে মাথা এতই উঁচুতে যে এর মস্তিষ্ক রক্ত সঞ্চালনের জন্য অস্বাভাবিক রকম বেশী চাপের প্রয়োজন।

সাপেরা লক্ষ্য করার মতো সুন্দরভাবে মানিয়ে নেওয়া প্রাণী। দশকোটি বছরের অধিককাল বিস্তৃত এদের বির্বতনের ইতিহাস এরা সফলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রজাতিতে এবং পূর্ণ করেছে এক বিশাল বৈচিত্রময় পরিবেশগত শূণ্যতা। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ১৬টি পরিবারভুক্ত ২৭০০ প্রজাতির সাপ দেখা যায়। তাদের মধ্যে দেখা যায় বহু দেহাকৃতি। তারা থাকে নানান পরিবেশে তাদের আচরণেও ব্যাপক বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। কিছু সাপ থাকে পুরোপুরি জলে, অন্যেরা থাকে স্থলে আর বেশ কিছু থাকে গাছে।.

এমন সব বৈচিত্র সম্ভব হয়েছে সাপেদের বিস্মিত করে দেবার মতো কার্ডিও ভাসকুলার প্রণালী থাকার জন্য যার সাহায্যে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে সাপেরা রক্ত-সঞ্চালন করতে

পারে। উদাহরণ স্বরূপ একটি 'কর্ণস্নেক' অরক্ষিত পাখীর বাসায় ডিমের সন্ধানে অক্লেশে গাছে গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে। আবার একটি গোছো বোয়া সাপ কোন গাছে শিকারের সন্ধানে মাথা নীচ দিয়ে ঝুলে থাকতে পারে। এরা উভয়েই এমন আচারণ প্রদর্শন করছে যা অনুভূমিক অবস্থান থেকে ভিন্ন অবস্থানের দেহে যথাযথ রক্ত সঞ্চালন রক্ষার জন্য অকির্ষ জনিত চাপ সেইসব বৃহত্তর প্রাণীদের উপর চরম অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে যারা এই চাপ সহ্য করার মতো শারীরিকভাবে তৈরী নয়। কোন প্রাণী সঞ্চালন প্রণালীর নিম্নতম রক্তনালীতে বর্দ্ধিত চাপ সব রক্তকে একত্র করার প্রবণতা সৃষ্টি করে ঃ এতে রক্তনালীর দেওয়ালগুলি স্ফীত হয় এবং কৈশিক নলগুলি চুঁইয়ে প্লাজমা বেরিয়ে পড়তে পারে। রক্ত দেহের নিম্নাংশে জমা হতে থাকে বলে কেন্দ্রীয় রক্ত চাপ হ্রাস পায় এবং অবশেষে মস্তিষ্কের মতন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গাদিতে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। যদি ছোট সাপ ছাড়া অন্য সব সাপ রক্ত সঞ্চয়নে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতো, তবে তারা জলজ বা অনুভূমিকআচরণে বাঁধা পড়ে যেতো। কিন্তু স্পষ্টতই বিষয়টা তেমন নয়। সামুদ্রিক সাপ যারা জল পরিবেষ্টিত কার্যত অভিকর্ষের প্রভাব মুক্ত, স্থলজ বেয়ে না ওঠা সাপ, যারা মাটির উপর থাকে এবং সাধারণত অনুভূমিক অবস্থায় থাকে; আর গেছো সাপ যারা গাছ বেয়ে উপর নীচ করে বলে প্রায়ই উলম্ব অবস্থায় থাকে।

সামুদ্রিক সাপ মাত্রই প্রচণ্ড বিষাক্ত (গোক্ষুর এবং প্রবাল সাপের নিকট আত্মীয়)। প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল জুড়ে থাকে এবং অষ্ট্রেলিয়ার চারপাশের প্রবাল প্রাচীরগাত্রে এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়, সহজেই হাত জালে এদের ধরাও যায়। মহাসাগরের নোনা জলে (ঘনত্ব প্রায় রক্তের সমান) এদের জীবন ধারনে কোন অসুবিধা হয় না। জলের ওজনে ভেসে থাকা সাপেরা তাদের ফুসফুসের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে তারা প্রায় মহাশূণ্যে ভাসমান বস্তুর মত কার্যত ওজনহীন হয়ে যায়। তত্ত্বমাফিক, এইসব সাপেদের রক্তসঞ্চালন খুবই সামান্যই অভিকর্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয় রক্তনালীর উলম্ব চাপের নতিমাত্রা চারপাশের জলের অনুরূপ চাপের নতিমাত্রা দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ফলে রক্তনালীর দেয়ালে স্ফীতকরার কোন প্রবণতা অভিকর্ষ বলের মধ্যে থাকে না এবং ওরিয়েন্টশন যাই হোক না কেন রক্তবন্টন প্রায় একই রকম থাকে। সামুদ্রিক সাপেরা এসেছে তাদের স্থলজ পূর্ব-প্রজাতি থেকে যারা এক বৈচিত্রপূর্ণ শারীরিক কলা কৌশলের সাহায্যে যার দ্বারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সাপের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বাভাবিক ডেরা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। গোছো সাপের খাঁড়া অবস্থায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলনায় অন্য সাপের থেকে বেশী। পরিবেশের সাথে সাথে সাপের রক্তচাপ পরিবর্তিত হয়। গোছো সাপের ব্লাড পুলিং জলজ এবং গাছে না চড়া স্থলজ প্রজাতির সাপের থেকে অন্তত ৩০ শতাংশ কম। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় গেছো সাপের উর্দ্ধশির অবস্থানে দেহের মধ্যবিন্দুতে রক্তচাপ নেমে যায়। ব্লাড পুলিং হৃদপিন্ডে ফিরে যাওয়া রক্তের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং এর দ্বারা সহজেই কার্ডিয়াক আউটপুট কমিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় রক্তচাপ নামিয়ে দেয়। সাপের মাথা শক্ত ক্রমিয়ামের

খোলসের মধ্যে সুরক্ষিত থাকার জন্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এর রক্ত পুলিং হয় নগণ্য।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপ ও বেদে

সাপ সম্বন্ধে অনেক কথা না হোক, বেশ কিছু কথা অনেকদিন ধরে লিখেছি। সাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে নতুন করে দুই-এক কথা বলা একটু মুস্কিল। নানা পণ্ডিতজন সাপকে নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে নানা চিন্তাভাবনা করছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপের প্রয়োজনীয়তা ও সাপকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে কথা আলোচনা করা প্রয়োজন, ক্রমে আমরা তা বুঝতে পারছি। কেবল চিড়িয়াখানায় বন্দী সাপ ও মিউজিয়ামে সাপের মৃতদেহ দেখে সাপ সম্বন্ধে ভয়ভীতি বাড়তে পারে কিন্তু সাপ সম্পর্কে খুব বেশী জানতে পারা যায় না। যেহেতু, অধিকাংশ সাপই নির্বিষ (প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ) এবং বিষাক্ত সাপেদের এক বৃহৎ অংশই মানবজীবনহানিকর নয়, তাই সর্বত্র এই অবাধ সর্পনিধন যজ্ঞ (দেখলেই নির্দ্ধিধায় জাত-পাত বিচার না করে বধ করা) বন্ধ করার আশু প্রয়োজন। প্রকৃতির পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই বিশ্বে সাপেরে বেঁচে থাকার প্রয়োজন। কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়, ঘোড়ার বিষ্ঠা ধনুষ্টাঙ্কর রোগ-জীবাণু বহন করে। বিড়ালের জন্য হয় শিশুদের ডিপ্‌থেরিয়া তবু তো আমরা ওদের দেখলেই মেরে ফেলি না। এমন কি বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ প্রকল্প হচ্ছে—প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। জমিতে কীটনাশক রাসায়নিক ব্যবহারে পোকামাকড়ের সাথে সাথে সাপ, ব্যাঙও মারা যাচ্ছে, এদের জীবনীশক্তিও কমে যাচ্ছে। বেদেদের কাছ থেকে জানা যায় গেছে, বর্ধমান জেলার সাপের জীবনীশক্তি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, শুধুমাত্র বহুল পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারের জন্য।

সাপকে বাঁচানো প্রয়োজন

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই শুধু নয়, সাপ প্রতিবছর এই ভারতবর্ষেই এক-চতুর্থাংশ ইঁদুর ধ্বংস করে, যে ইঁদুর আবার শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ শস্য নষ্ট করে। বিষাক্ত সাপের বিষ থেকেও অনেক দুরারোগ্য রোগের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত হয়। সাপের শরীরে চামড়া থেকে প্রতিটি অংশই নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। সাপের মাংস শুধু আদিবাসীদেরই প্রিয় খাদ্য নয়, চীন, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও খাদ্য হিসাবে প্রিয়।

সাপ সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি দূর করার জন্য বিদ্যালয়ে সাপ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য ছাত্রদের ছাত্রাবস্থাতেই জানানো প্রয়োজন। চাষের প্রয়োজনে নির্বিষ সাপের প্রজনন-হার বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। প্রয়োজনে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেদে সম্প্রদায়গুলিকে কাজে লাগাতে হবে। বেদেরা সাপ ধরতে ওস্তাদ। ওরা সাপ চেনে ও সর্পচরিত্র জানে। এই প্রসঙ্গের রম হুইটেকার দ্বারা গঠিত মাদ্রাজে ইরুলা বেদে সম্প্রদায়ের সমবায়ের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো যেতে পারে। সাপকে গবেষণার বিষয় করে

বাক্সবন্দী না রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকারী জীব হিবেবে পরিণত করতে হবে। আমাদের শস্যক্ষেত্রের ও শস্য-গুদামের পাহারাদার হিসেবে কিভাবে সাপকে ব্যবহার করা যায় সে-বিষয়েও ভাবতে হবে। শস্য ক্ষেত্রে মূল্যবান কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে সুলভ নির্বিষ সাপকে ব্যবহারের ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যবস্থা বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় ও স্বদেশী বেদের ডাল-ভাতের জোগাড় করতে পারে। সারা ভারতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেদেদের দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল গোষ্ঠীগত ভাবে ভবঘুরে জীবন যাপন করা কষ্টসাধ্য। আদিম যুগ থেকেই বেদে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নানা সময়ে নানা কারণে বেদেরা নানাস্থানে ডেরা বেঁধেছে। এইভাবে গড়ে উঠেছে স্থায়ী বেদে গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে সমাজের নীচুস্তরের সম্প্রদায়গুলির সাথে সামাজিক লেনদেনের মাধ্যমে ওরা বর্তমান সমাজে, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজে—ওদের আসন প্রায় পাকা করে নিয়েছে। একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে ধীরে ধীরে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এদের কাজে লাগালে সারা ভারতের অনেকগুলি আদিবাসী সমাজেরও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ আসবে। কোন রাজ্য সরকারের পক্ষেই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে এই বৃহৎ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার তার পরিবেশ দপ্তর বা বনদপ্তর বা আদীবাসী কল্যাণ দপ্তরের যে কোন একটির উপর ভার দিতে পারেন। করণীয় কাজ হবে সাপের প্রকল্পে সাপের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে সর্পোদ্যান করা। লোকালয় থেকে যাবতীয় বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ ধরে এনে সর্পোদ্যানে জড়ো করা। সর্পোদ্যান থেকে বিষাক্ত সাপদের গবেষণাগার ও ভেষজগারে প্রেরণ করতে হবে। এরপরের কাজ হল সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন প্রজাতির বিষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাপের মুখ থেকে বের এনে এ্যান্টিভেনম তৈরীর জন্য সিরাম তৈরী করা। সমবায় পদ্ধতিতে ক্ষেতে-খামারের নির্বিষ সাপকে ছড়িয়ে দেওয়া পোকা-মাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য। সাপের চামড়া নিয়ে সমবায় বা পৃথক কোন সমবায়ের মাধ্যমে কুটির শিল্প গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনে উদ্বৃত্ত মাংস ও চর্বি এই সমবায়গুলিই উপযুক্ত স্থানে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রী করবে। প্রথমে ব্যয়বহুল মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোলে আর্থিক ও সামাজিক লাভ হবেই। দেশের মধ্যেই সর্পোদ্যানে সাপ ধরে আনলে যদি উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় তবে কে সাপের চামড়া চোরা বাজারে বেচতে যাবে? অনুকূল পরিবেশে গড়ে তোলা মূলত সাপ ও বেদেদের বেঁচে থাকার বাহ্যিক উপায় তো বটেই, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক ফলপ্রসূ ব্যবস্থাও এটাই।

বারুইপুর সঙ্গীতের সেকাল-একাল

নরনারায়ণ পূততুণ্ড

লেখাটি শুরু করার আগে কৃতজ্ঞতা জানাই বারুইপুর পৌরসভার পরিচালক মণ্ডলীকে। কারণ, আমার মত একজন সাধারণ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীকে এই গুরুতর বিষয়টির ওপর লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। ওঁরা আমাকে গর্বিত করেছেন । জানি না, কাজটা কতটা করতে পেরেছি তবে চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। এত অল্প সময়ে এমন একটা কাজে হাত দেয়াটাই দুঃসাহস কিন্তু বারুইপুর পৌরসভা আমাকে সেই দুঃসাহসী হবার সাহস জুগিয়েছেন।

এত অল্প সময়ে ২১৪.৫ বর্গ কিমি এলাকা চষে ফেলা সহজসাধ্য নয়, হয়ওনি। ১৩৭টি মৌজায় প্রায় দুই শতাধিক গ্রাম এই বারুইপুর থানা অঞ্চলে। এর মধ্যে আউলিয়াপুর, চকআলানপুর, তুলারবাদা, কুমারখালি ও ধনখোলা মৌজাগুলো ১৯৭০ সালেও জনশূন্য ছিল। বর্তমানে দু-একটি বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। খোঁজখবর করতে গিয়ে এমন অনেক গ্রাম পেয়েছি যেসব গ্রামে সংগীতের কোন চর্চা ছিল না, নেইও। আবার কিছু গ্রাম পেয়েছি যেখানে এই প্রজন্ম সবে গানবাজনার চর্চা শুরু করেছে। গ্রাম ধরে ধরে এ বিষয়টা আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এখানে ততটা স্থান সংকুলান হবার সম্ভাবনা নেই বলেই বারান্তরে এ নিয়ে ভাবা যাবে।

দুই শতাধিক গ্রামের প্রায় ২৫০ জন মানুষ (তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য সংগীত জগতের নন) ও প্রায় শতাধিক সংগীতশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের কথার সারাৎসারই এই লেখার বিষয়বস্তু। সংগতি রক্ষার জন্য কখনও কখনও সংগীতের বাইরের দু-একটি বিষয় হয়ত আনতে হয়েছে কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় নয়। পৌরসভার গাইড লাইন ধরেই সব সময় লেখার চেষ্টা থাকছে। ইতিহাস অনুসন্ধানী পাঠক হয়ত একটু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন কিন্তু এই প্রতিবেদকের এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই।

সেকালঃ

কালের পরিধি বড়ই গোলমেলে। সেকাল বলতে যদি অতীত বোঝায় তবে গতকালও অতীত। আবার অতীত বলতে সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক যুগও অতীত। আবার চর্যাগীতির কালও অতীত। বেদগান তো প্রাচীনতম গান। এখন সেই সময় বারুইপুরের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সব অন্য গবেষণার বিষয় । তাই সেকাল বলতে আমি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের কালকেই চিহ্নিত করতে চাইছি। যদিও খৃষ্টিয় চতুর্দশ শতকে বাংলার বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা প্রথম শুরু হয়। মহাপ্রভুর আগমন ১৪৮৬ সালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং তিরোধান ১৫৩৩ সালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে। তাঁর প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাব জগতের এক স্বপ্নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 'কৃষ্ণনাম' দিয়ে জগত মাতালেন তিনি। তারই প্রভাবে ভাবসংগীত ব্যাপ্তি লাভ করলো। উনবিংশ শতাব্দী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক স্বর্ণযুগ। শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা আগেও ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই সংগীত যেভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল

তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সংগীত অনেকটাই অনুভূতির ব্যাপার। তাই কালভেদে এই অনুভূতিতে ধাক্কা লাগতে পারে। তবুও সময় নির্ধারণ একটা বিশেষ ব্যাপার। তাই সংগীতের সেকাল বলতে আমি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টাকেই নিচ্ছি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বারুইপুরে কীর্তনখোলার কাছে আদিগঙ্গার তীরে একবার পা রাখেন। তাঁর পদস্পর্শে ধন্য বারুইপুর কৃষ্ণনামে মজে যাবে, এ আর নতুন কথা কি! এবং হয়েছিলও তাই। আজও বারুইপুর থানা অঞ্চলে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে সংগীতের চর্চা আছে অথচ কোন কীর্তনীয়া নেই। ভালো গান করেন কি খারাপ, তা আমার বিবেচ্য নয়। মনের আনন্দেই তিনি বা তাঁরা গেয়ে চলেছেন হরিনাম। অসংখ্য দল-উপদল আছে হরিনামের, কীর্তনের, সমগ্র বারুইপুর জুড়ে।

বারুইপুরের আর একটি ভৌগোলিক গুরুত্ব আছে। রেললাইন চালু হবার আগে আদিগঙ্গা দিয়ে নৌকোতেই যাতায়াত করতে হতো। সড়ক পথ তখন সুগম ছিল না। সুন্দরবনের একটা গভীর ছায়া পড়েছিলো বারুইপুর-এর উঠোনে। আজ বারুইপুর-এর শহর অঞ্চল দেখলে বোঝা যাবে না ৫০০ বছর আগেকার এর ভৌগোলিক অবস্থান। এর অরণ্যসম্পদের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে বলবেন –'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,' কিন্তু কবির কথায় কান না-দিয়ে অরণ্য এখন আশ্রয় নিয়েছে মাতলা নদীর অনেক গভীরে। তাই আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগের সেই মনসার পাঁচালী, মানিকপীরের গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন শুধু অশীতিপর বৃদ্ধ মাধবপুরের অনন্ত হালদার, বেগমপুরের সুদীন মণ্ডল, সূর্যপুর-এর হারান মণ্ডল প্রমুখ লোকশিল্পী। প্রায় ২৫০ বছর আগে মধ্যসীতাকুণ্ডুর দ্বিজপদ মণ্ডল এই সব পাঁচালী, পীরের গান রচনা করেন। বারুইপুর থানা এলাকায় শুধু নয়, সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাতেও প্রথম যাত্রাপালা তাঁরই লেখা। অর্থাভাবে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর শিষ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুখে মুখে এই সনদ প্রচলিত হয়ে হয়ে আজও অমর হয়ে আছে। তাঁর সহস্তে লিখিত এই সব পাঁচলী, পীরের গাথা, যাত্রাপালা, কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজও রক্ষিত আছে তাঁরই ভাইপো জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। সম্প্রতি মুক্তকানন অঞ্চলে তাঁর একটি আবক্ষমূর্তি বসানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গর্ব বারুইপুর-এর দ্বিজপদ মণ্ডল এর ভাবধারা অনুসরণ করে যাঁরা সসারি, রামনগর প্রভৃতি এলাকায় এই সব ঠাকুর দেবতার গান করতেন তাঁদের আর কোন সন্ধান নেই । বংশ পরম্পরার এই সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে।

কীর্তন আর বাউলের গান বাংলার অতি প্রাচীনগান। এর পাশাপাশি টপ্পা, গজল কিংবা কবিগান, তরজা, যাত্রাগানও বারুইপুর এলাকার এক সম্পদ। এছাড়া আছে গোষ্ঠগান, চড়কগান। তবে এসব গান আজকাল আর প্রায় হয়ই না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠ গানের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কল্যাণপুরের কাছে কালিকাপুরে এখনও অবশ্য তিনদিন ধরে গোষ্ঠগান হয়। তবে সেই কৃষ্ণের লীলা খেলা নিয়ে যে গোষ্ঠ তা আধুনিক হিন্দী ছায়াছবির চাপে মূলস্রোত থেকে সরে গেছে। চিনে গ্রামে অভিজিৎ মণ্ডল (খাঁদা), কুলবেড়িয়ার কাদম্বিনী নস্কর (কাদা) মধ্য বিংশ শতাব্দীতেও চুটিয়ে মনসার গান করতেন নানা অঞ্চলে । এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাওড়া গ্রামে প্রকাশ বারিক পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার

বারুইপুর থানা অঞ্চলের একমাত্র তরজাগানের প্রতিনিধি। প্রকাশ বারিক অবশ্য আকাশবাণীতেও দীর্ঘদিন ধরে তরজাগানের শিল্পী হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। লোকসংস্কৃতি প্রচারে ও প্রসারে তাঁর একটা ভূমিকা আছে। গোষ্ঠগানে কুলবেড়িয়ার ভরত মণ্ডল, পালান নস্কর তো ইতিহাস হয়ে গেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে এলেন সাউথ গরিয়ার অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি অবিস্মরণীয় নাম। ছোটবেলা থেকেই যাঁর সংগীতের ঝোঁক। চমৎকার বাঁশি বাজাতেন। নাটক লেখা, অভিনয় করা; কি করেননি তিনি! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গতিপথ পাল্টে চলে আসেন রামায়ণ গানে। আকাশবাণীতে দীর্ঘদিন তিনি রামায়ণ গান পরিবেশন করেছেন। চম্পাহাটির ঈশানী চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিবেশন করতেন কীর্তন। নড়িদানার আশুতোষ অধিকারী এখনো করে চলেছেন নামসংকীর্তন। আশি ছুঁই ছুঁই দ্বিজেন্দ্রনাথ গুইন-এর ভগবৎ পাঠ সাউথগরিয়া ছেড়ে সমগ্র থানাতেই প্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ সবই চৈতন্যপ্রভাবে প্রভাবিত এবং অনেকখানিই এর ধর্মীয় গন্ধযুক্ত।

বারুইপুর থানা অঞ্চলের পদ্মজলা, ধপধপি দক্ষিণেশ্বর, সসারি, উত্তরভাগ, নাচনগাছা, কুন্দরালি, ভুরকুল, টগরবেড়িয়া, মামুদপুর, তেগাছি প্রায় সব জায়গাতেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হিসেবে কীর্তন, ভগবত পাঠ, হরিনাম, পীরের গান, বিবিমার গান ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরেই। প্রায় ৪০০ বছর চলে আসছে। তবে এই চলে-আসাটা বর্তমানে পরিবারিক উৎসব-এর রূপ নিয়েছে । তাই এই শিল্পীদের এখন আর দিন নেই প্রায়। কথা হচ্ছিল বেগমপুরের সুদীন মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি দ্বিজপদবাবুর লেখা মানিকপীরের গান, শীতলার পাঁচালী, মনসার গান গেয়ে দিন গুজরান করেন। পরিষ্কার জানালেন,ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখছে, এসবে তাদের বিশ্বাস নেই। এই মনসা কিংবা শীতলা সেজে নাচগানকে ওরা আজকাল ছোট কাজ ভাবে। এটা যে একটা শিল্প তা আজকাল ওরা মানতে চায় না। দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর ধরে যে প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ধারা আমরা টিকিয়ে রাখছি তা দূরদর্শন ও মিডিয়ার প্রভাবে, পরিচর্যার অভাবে, অপুষ্টিতে ভুগতে ভুগতে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হতে বসেছে। এখনও মানুষ ভ্যান চালাতে চালাতে, চাষ করতে করতে, বেড়া বাঁধতে বাঁধতে, টিউব-ওয়েল বসাতে বসাতে এই সব প্রাচীন লোকসংস্কৃতিমূলক গানের একটা-দুটো কলি যে ভাঁজেন না এমন নয়। চর্চা নেই, তাঁরা গান নিজের মনের আনন্দেই করেন ।

৫০ থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মলয়পুর, মহেশপুকুর, সৈয়দপুর, চাঁদখালি, খাসমল্লিক, কমলপুর, আগনা, মির্জাপুর, পেটুয়া-ভবানীপুর এলাকার অন্তত জনা তিরিশেক মানুষ বেশ হতাশ হয়েই যেন বললেন —আমাদের ছোটবেলায় কেমন যাত্রাপালা, তরজাগান, গোষ্ঠগান হতো; এখন তেমন আর হয় না। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই মানুষের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফললাভ হতে শুরু হয়েছিল। রাজা রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর যতই সতীদাহ রদ বা বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য সচেষ্ট হোন ততটাই সচেষ্ট-হওয়া অন্যকোন মহাপুরুষের এই লোকসংস্কৃতিকে সচল রাখার আন্দোলন করা দরকার ছিল। যা হয়নি। এখন স্বাভাবিক ভাবেই রুটি-রুজির জন্য এই ধরনের গান মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারছে না।

সমস্ত দিক থেকে নানা মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেকালের গান বলতে আমি যেসব গানের কথা বোঝাতে চাইছি তা ক্রমশ বিলীন হচ্ছে। তার কারণ তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী সাজালে এমন হয় – (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি, (২) যুক্তিবাদী মন তৈরী, (৩) দূরদর্শন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সুযোগ কম, (৪) সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন, (৫) অর্থাভাব, (৬) জীবন ও জীবিকার জন্য অন্যপথ বেছে নেয়া।

একালঃ

বাংলাগানের সেকাল-একালে বিভেদ করা খুবই শক্ত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমি বেছে নিয়েছিলাম লোকসংস্কৃতিমূলক গান ও শাস্ত্রীয়সংগীতকে সেকালের গান এবং বাকী যে সব গান তা-ই একালের। যদিও শাস্ত্রীয়সংগীতকে তেমনভাবে ভাবা যায় না। কারণ, শাস্ত্রীয় সংগীত সব সময়েই আছে, ছিল এবং থাকবেও। শাস্ত্রীয়সংগীত বা উচ্চাঙ্গসংগীত ছাড়া কণ্ঠকে তৈরী করা সম্ভব নয়, তবে দেবদত্ত কিছু কণ্ঠ থাকেই। অস্বীকার করা যায় না। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনায় শাস্ত্রীয়সংগীতশিল্পীরাও এসে যেতে পারেন।

মূলত, শাস্ত্রীয়সংগীতের রমরমা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। বিষ্ণুপুর ঘরানা সবচেয়ে প্রাচীন সংগীত ঘরানা। এই ঘরানারই শিল্পী ও শিক্ষক যদুভট্ট, যাঁর কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তালিম নিয়েছেন, ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামশংকর ভট্টাচার্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী সংগীতশিল্পী ও শিক্ষকগণ।

পরবর্তিকালে এলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সজনীকান্ত, রজনীকান্ত এবং তারও পরে এলেন হেমন্ত-দ্বিজেন-শ্যামল-সলিল-মান্না প্রমুখ শিল্পী। এঁদের পূর্বসূরিগণ নিজেরাই গান লিখতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন। নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) টপ্পা তো একসময় সংগীত জগতকে রীতিমত মাতিয়ে রেখেছিল। পরবর্তিকালে আটের দশকের শেষ পাদে আবার ফিরে এলো নিজেরই কথা ও যুরে গান গাইবার প্রবণতা। তো এইসব দিক-এর কথা ভেবে একালে গানকে কয়েকটা স্তরে বা বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে আলোচনার সুবিধার্থে। (১) উচ্চাঙ্গসংগীত এবং (২) লঘুসংগীত।

উচ্চাঙ্গসংগীতের মধ্যে আবার ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান গানগুলোকে যেমন রাখা যেতে পারে লঘুসংগীতের মধ্যেও তেমনি রবীন্দ্র-নজরুল ইত্যাদি, আধুনিক, লোকগীতি, গণসংগীত, জীবনমুখীগান এবং বাংলাব্যান্ড যেমন আছে তেমন আছে ছায়াছবির গানও। আমি সাধ্যমত বারুইপুর থানা অঞ্চলের একালের গানের একটা তথ্য ভিত্তিক ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

(১) উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতঃ শ্রীচৈতন্যদেব যখন বারুইপুরে এসেছিলেন তখন বারুইপুরের জনপদ কটি ছিল ? কতজন মানুষ ছিলেন ? সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ তা ভাবুন। সে সংখ্যা যাই হোক, তা যে খুবই কম, তা নিশ্চিন্তে বলা যায়। তারপর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এলো। ডায়মণ্ডহারবার এর রূপোর ফসল ওরা ঘরে তোলার জন্য স্থাপন করলো রেললাইন। তৈরী হলো বারুইপুর রেলস্টেশান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে শুরু হলো

বসতি এবং ব্যবসা। গড়ে উঠলো নতুন নতুন বাড়ী; এলো নানারকমের মানুষজন। এতোদিন যেসব এলাকায় জমিদারদের রমরমা ছিল খর্ব, হতে শুরু করলো তাঁদের অস্তিত্ব।

এতোদিন সংগীতচর্চা ছিল জমিদারদের নাচঘরে বন্দী। এবার তা মুক্তি পেতে শুরু করলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বেই জমিদার, জোতদার ও ধনী মানুষজনের মনোরঞ্জনের জন্য, প্রমোদের জন্য একধরনের কালোয়াতি গান, শাস্ত্রীয় গান এবং মজলিসি গান-এর প্রচলন ছিল। বারুইপুর রাসমাঠ অঞ্চলের জমিদারগণ কিংবা সাউথ গরিয়ার জমিদারগণ তখন নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য বসাতেন গানের আসর। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঈজী এনে নাচগানের আসর বসাতেন। সাধারণের সংগীতচর্চা সেসময় তেমন ছিল না। কালেকালে জমিদারদের সেই ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হতে লাগলো। মানুষ সচেতন হতে শুরু করলো এবং সুস্থ সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে এই গ্রামাঞ্চলের মানুষও শাস্ত্রীয়সংগীতের দিকে ঝুঁকলো। চর্চা শুরু হলো।

১৮৭৫ সাল। বারুইপুর থানা অঞ্চলের ত্রিপুরানগর গ্রাম। জমিদারদের লাঠিয়াল হিসেবে যাঁরা বেঁচেছিল সেই 'সরদার'দেরই এক বংশধর দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত শুরু করলেন গান-বাজনার চর্চা। শুরু কিছুদিন আগেই করেন কিন্তু মানুষের দরবারে পৌছন ১৮৭৫সালে যে মানুষটি, তাঁর নাম আশুতোষ সরদার। বারুইপুর অঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক ও 'সংগীত অংকুর' নামের গ্রন্থপ্রণেতা অশীতিপর বৃদ্ধ টংতলার স্বরাজ সিংহ, যখন মাত্র সাত বছর বয়স তখন থেকেই তিনি আশুতোষ বাবুর কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। পরবর্তিকালে স্বরাজ সিংহ অনেক নামীদামী শিল্পী ও শিক্ষকের কাছে তালিম নিয়েছেন' তালিম দিয়েছেন বহু প্রখ্যাত শিল্পীকে। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় একদা বারুইপুর কাছারী বাজারের বুকে গড়ে উঠেছিল 'অনিলাদেবী স্মৃতি সংগীত সম্মিলনী' ১৯৮০ সালে। তারপর ১৯৮৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তৈরী হয় 'এম.এন.স্মৃতি ফাইন আর্টস্ সেন্টার' এবং সেখানে ক্লাশ শুরু হয় ৩রা জানুয়ারী ১৯৮৬ থেকে। সঙ্গে সহযোগী ছিলেন তাঁরই ছাত্র বর্তমানে সংগীতশিক্ষক বিশ্বনাথ ঘোষ।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে শাস্ত্রীয়সংগীতচর্চা একটু ব্যাপ্তি লাভ করে । চর্চা শুরু হয় সাউথ গরিয়া, চম্পাহাটিতেও । সাউথ গরিয়ার ঁপুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার বংশে জাত হলেও তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির রুচিসম্পন্ন এবং সৃষ্টিশীল মানুষ ছিলেন। শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের গান, যাত্রাগান এবং নিজেই সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়ে সাউথ গরিয়ার বুকে সেই সময় বহু অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর বেশকিছু ছাত্র পরবর্তিকালে সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর কথা ও সুরে গান গেয়েছেন বহু মানুষ। তার মধ্যে বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম, যদিও বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোকোদা) তেমনভাবে গুরু ধরে শেখার মত কোনদিন গান শেখেননি। তিনি শ্রুতিধর। একবার শুনলেই গান তাঁর কণ্ঠে ভর করতো। অপূর্ব সুরেলা গলা। একবার বারুইপুরে নিখিলভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি শাস্ত্রীয়সংগীতে প্রথম হয়েছিলেন। সংগীত ঘরানার মানুষ তিনি। বাবা বেহালা বাজাতেন। দাদা বাজাতেন এস্রাজ। একসময় যাত্রার 'বিবেক' মানেই ছিলেন ছোকোদা।

সাউথ গরিয়ার অদূরেই চম্পাহাটি। যার নামকরণ নিয়েও একটা সংগীতের ব্যাপার আছে। কথিত যে, সেকালে জমিদাররা 'বাঈজী' এনে নাচগান করতেন। তাঁদের মনোরঞ্জনের উপাদানই ছিল সুর আর সুরা। তো তেমনই এক জমিদার 'চম্পাবাঈ' নামে এক বাঈজীকে এখানে আনেন এবং তাঁকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয় ঈর্ষাবশত অর্থাৎ ঐ গান আর অন্য কাউকে শুনতে দেয়া হবে না, তিনি একাই তা উপভোগ করবেন। পরে মনঃকষ্টে তিনি তাঁর জমিদারীর ঐ অংশটির 'চম্পাবাঈ'-এর নামে নামকরণ করেন চম্পাহাটি। ব্যাপারটাতে দ্বিমত আছে । সেদিকে আমরা যাবো না। আসলে জমিদারী কাল থেকেই সংগীতের একটা যে চল চম্পাহাটিতেও ছিল সেটাই আসল। প্রথাভেঙে প্রথম সংগীত চর্চা শুরু করেন কমলপুর গ্রামের অধীর নস্কর। তাঁর ভাই গুলি নস্কর তবলা বাজাতেন। সেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ।

বারুইপুর থানা অঞ্চলের বেশকিছুটা অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত। একসময় মুসলিম প্রাধান্য ছিল, তা কিছু এলাকার নামধাম দেখলেই বোঝা যায়। তেমনই একটি রাস্তা সাজাহান রোড। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নারকেলবেড়িয়া থেকে এলেন নিত্যগোপাল দেবনাথ মহাশয়। জীবন ও জীবিকার খোঁজে তিনি সাজাহান রোডে আস্তানা গাড়লেন। বারুইপুর শহর অঞ্চলে তিনিই প্রথম শাস্ত্রীয়সংগীতকে বশ মানিয়ে ছড়িয়ে দিলেন ভুবনময়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'চারুকলা একাডেমী' আজও সুনামের সঙ্গে সংগীতপ্রসারে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে আছে। বর্তমানে যে সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীতশিক্ষক বারুইপুরে আছেন যাঁদের বয়স ষাটোর্ধ বা ছুঁই ছুঁই তাঁরা প্রায় সবাই এই নিত্যগোপালবাবুর ছাত্র ছিলেন একদা। আজ তাঁর সুযোগ্যপুত্র রাজেন্দ্রনাথ দেবনাথ (খোকাদা) এই প্রতিষ্ঠানটির দেখাশুনা করছেন।

নিত্যগোপালবাবুর পরেই বারুইপুরের শাস্ত্রীয়সংগীত-এর প্রচার ও প্রসারে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা অনেকেই প্রয়াত। আরও একটি মজা আছে, এঁরা অনেকেই কণ্ঠশিল্পী নন কিন্তু সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন। আগে একটা রেওয়াজ এমন ছিল; যাঁরা তবলচি, সারেঙ্গি কিংবা কোন তারের যন্ত্রে পারদর্শী তাঁরা উচ্চাঙ্গসংগীত তালিম দিতেন। কণ্ঠ তাঁদের ভালো ছিল না কিন্তু ছিল রুচিবোধ এবং সুর জ্ঞান। এমন অনেক শিল্পী শিক্ষক বর্তমানে আছেন যাঁরা নিত্যগোপালবাবুর কাছে শাস্ত্রীয়সংগীত শিখে আবার ॅ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছেও পরবর্তিকালে তালিম নিয়েছেন অথচ ॅ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকৃত ভাবে কণ্ঠশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সংগীতের জ্ঞান অসামান্য ছিল ফলে মানুষ আকৃষ্ট হয়েছেন। ॅ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সমকালীন এবং একটু পরে পরে বারুইপুর অঞ্চলে শাস্ত্রীয়সংগীতের অনেক যশস্বী শিল্পী এসেছেন। যেমন – শৈলেন্দ্রনাথ পাঠক (বারুইপুর), বাসুদেব পাঠক (বারুইপুর), শান্তি ভট্টাচার্য (গোলপুকুর), জ্যোতিপ্রকাশ ভট্টাচার্য (ভট্টাচার্যপাড়া), সুপ্রকাশ ভট্টাচার্য (ভট্টাচার্যপাড়া) প্রমুখ শিল্পী ও শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব ঘরানাতেই তালিম দিয়েছেন। তৈরী করেছেন বহু ছাত্রছাত্রী। অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকই কেউ কেউ শিখিয়েছেন।

সত্তর ছুঁই ছুঁই দত্তপাড়ার আনন্দ নন্দীর কণ্ঠ আগের মত কথা বলে না, কথা বলে তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। সূর্যপুর-এর নিমাই মণ্ডল এখন ষাটের কাছাকাছি। প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি সূর্যপুর অঞ্চলে গান বিশেষ করে শাস্ত্রীয়সংগীতচর্চা শুরু করেন। তাঁর ছেলে

শুভেন্দু মণ্ডল, আনন্দনন্দীর ছাত্র হিসেবে এবং একই সঙ্গে নিমাই মণ্ডলের পুত্র হিসেবে এলাকাকে গর্বিত করছে।

ঁ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সুযোগ্যা ছাত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায় দোলতলার স্বপ্ননীড়ে প্রায় জনা ষাটেক ছাত্রছাত্রীকে তালিম দিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের এই শিক্ষিকার অবসর বিনোদন-এর একমাত্র পথ এই সংগীত। মল্লিকা ভদ্র সম্পর্কে ঁ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাগ্নী। 'নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ' প্রবাদটিকে সার্থক রূপ দিতে বর্তমানে মল্লিকা, ইমান বাগানীর চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। রাজনীতির সাথে সাথে শাস্ত্রীয়সংগীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-নজরুল মায় আধুনিক গণসংগীত প্রভৃতি সব ধরনের গানই তার রুটিরুজি।

১৯৩০ সালে টেঁকা গ্রামে প্রথম সংগীতচর্চা শুরু করেন ঁ প্রভাস মণ্ডল মহাশয়। আত্মভোলা প্রভাসবাবু সংগীত প্রতিপালনে সচেষ্ট ছিলেন না। নিজের মনেই গান করতেন। কিন্তু তাঁরই অনুপ্রেরণায় সংগীত জগতে আসেন নিমাই মণ্ডল। যিনি সূর্যপুর হাট থেকে শুরু করে কলকাতার শ্যামবাজার, হাওড়ার বালিতেও যান শিক্ষকতা করতে।

বারুইপুর শহর অঞ্চলের আশেপাশে শাস্ত্রীয়সংগীতচর্চা কিন্তু থেমে থাকেনি। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তিকালে ললিত রায়চৌধুরী (রাসমাঠ) সুশান্ত চক্রবর্তী (ঘোষপাড়া) লক্ষ্মী সেনগুপ্তা (খোদারবাজার), মীনা ব্যানার্জী (শাসন), অনন্ত পুরকাইত (পুরন্দরপুর), জহর দাস (মদারাট) পঞ্চানন চক্রবর্তী (বারুইপুর), ঁ দুলাল সৎপতি (শাসন), নিশিকান্ত ঘরামী (সীতাকুণ্ডু), সনৎ পূততুণ্ড (সাজাহান রোড), সনৎ ব্যানার্জী (শাসন), দেবজ্যোতি রায় (বেলিয়াঘাটা), সৌমেন খাসনবীশ ও দীপ্তি ভট্টাচার্য (মল্লিকপুর) প্রমুখ শিক্ষক ও শিল্পী এলাকাকে সমৃদ্ধ করতে তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী সচেষ্ট। বারুইপুরকে সংগীত জগতের দিক থেকে এঁরা গর্বিত করেছেন।

গ্রামাঞ্চলেও শাস্ত্রীয়সংগীতের যে চর্চা ছিল না তা নয়। দক্ষিণ দুর্গাপুরের ঁ লক্ষ্মীপদ বিশ্বাস তেমনই একজন শিল্পী। যিনি প্রচারের আলোয় না-এসে ছাত্র তৈরীতে মগ্ন ছিলেন সেই ১৯৩২ সাল থেকে। এখন তাঁরই সুযোগ্যপুত্র অজয় বিশ্বাস সেই কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন শ্রী বিশ্বাস। আর একজন প্রতিভাধর শিল্পী কল্যাণপুরের তপন চট্টোপাধ্যায় । শাস্ত্রীয়, পুরাতনী গানে অবিচল আস্থা রেখে তিনি ছাত্র তৈরীতে মগ্ন । অবশ্য এটাই তাঁর জীবিকা। সংগীতকে পেশা হিসেবে নেয়া আজ থেকে ৫০ বছর আগে ভাবা সত্যিই কষ্টকর ছিল, অন্তত গ্রাম অঞ্চলে। কিন্তু তপনবাবু সেই ঝুঁকি নিয়ে সফল। তাঁর সুযোগ্যশিষ্য দোলতালার 'ভুবন' নামে পরিচিত প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ওষুধ বিক্রির অবসরে সংগীতশিক্ষকতা করছেন। অনুষ্ঠান করছেন শাস্ত্রীয় ও পুরাতনী গানের। তেমনি বৃন্দখালী অঞ্চলে সংগীতচর্চা ও প্রশিক্ষণে একামেব অদ্বিতীয়ম্ হলেন হেমন্ত পান্ডা। তালদির গগন নস্কর-এর প্রভাবও কিন্তু আছে বৃন্দাখালী, উত্তরভাগ অঞ্চলে।

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর / তাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর' ঠিক তেমনি একজায়গার সংগীতচর্চার সুগন্ধ অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বারুইপুর শহর অঞ্চল থেকে ক্রমশ সংগীত ছড়িয়ে পড়লো গ্রামাঞ্চলে । তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি।

পরিবহন একটা বিরাট সমস্যা ছিল সে সময় যা বর্তমানে অনেকটাই দূর হয়েছে। ফলে, মানুষ ইচ্ছে করলেই গ্রাম থেকে শহরে এসে সংগীতশিক্ষা করতে পারছে। অর্থনীতি এবং ইচ্ছা বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে তো কোন কথাই নেই। তেমনই ইচ্ছা সঙ্গে নিয়ে নাজিরপুরের গৌতমচন্দন যাচ্ছেন কলকাতায় রসিদ খাঁর কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতচর্চা করতে। ঘোষপুরের কানাইলাল কর্মকার, কৌশিক কর্মকার, মলয় চক্রবর্তী তালিম নিয়েছেন ওস্তাদ বিশ্বনাথ বসু, পণ্ডিত কুমার বোস ও সাগিরুদ্দীন সাহেবের কাছে তবলায়। এমন কত শত আছে শিক্ষনবীশ পর্যায়ে। শাঁখারিপুকুরের মিনা সরদার, বেগমপুরের দেবদাস মণ্ডল অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা করে আসছেন।

বারুইপুর-এর জমিদারদের পাশাপাশি সাউথ গরিয়াতেও একটা জমিদারী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এবং স্বাভাবিক ভাবেই সংগীতের একটা আভিজাত্য বোধ জন্ম নিয়েছিল সাউথ গরিয়ায়। ৺অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদারী মেজাজকে হারিয়ে বিংশ শতাব্দীতে সাউথ গরিয়ার সংগীত যেন প্রাণ পেয়েছিল কিছু মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টায়। ১৯৩৮ সালে ৺প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড় পাঁচুবাবু) মহাশয়ের দোতলা ঘরে বসে প্রথম শাস্ত্রীয়সংগীতের আসর। অসামান্য সংগীত পরিবেশন করেন রামকিষণ মিশির, সঙ্গে সারেঙ্গী বাজান ওস্তাদ ছোটে খাঁ। ১৯৪০ সালে বুদ্ধিবাবুর বাড়ীর দোতলায় সংগীত পরিবেশন করতে আসেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তবলা বাজান হীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (হিরুবাবু)। এই আসরে আকৃষ্ট হয়েই কিছু তরুণ সংগীতপিয়াসী হয়ে ওঠেন। যন্ত্র এবং কণ্ঠ দুটিই প্রাধান্য পেতে থাকে। সৃষ্টি হয় দিবাকর চক্রবর্তী (নীলু), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (তপুদা), দুলাল মুখোপাধ্যায়, বৈজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সনৎ চট্টোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা কিন্তু সাউথ গরিয়ার বুকে বোমা ফেলতে পারেনি। সংগীত চলছে চলবে। তাই ১৯৪২ সালে এলেন সেতারবাজিয়ে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। তাঁর অপূর্ব বাজনায় মোহিত হয়ে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা ৺অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) এলেন সেতার জগতে, পার্বতী হালদার শিষ্য হয়ে গেলেন কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের। ১৯৬২তে প্রতিষ্ঠিত হোল 'আঞ্চলিক সংগীত সংস্থা'। চম্পাহাটি, সাউথ গরিয়ার সংগীতপ্রিয় মানুষ যুক্ত হলেন আসরে। চম্পাহাটির অসিত নাগ, অজিত রায়; কালিকাপুরের বেণীমাধব মুখার্জী প্রমুখ যোগ দিলেন সংস্থায় এবং চলল প্রতিবছর বার্ষিক অনুষ্ঠান, সঙ্গে মাসিক সভা। কে আসেননি এই আসরে? পণ্ডিত ভি.জি.যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, এ.টি.কানন, ওস্তাদ মোস্তাক হোসেন, রবি কিচলু থেকে হাল আমলের পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। সমস্ত গুণিজনই এখানে সংগীত পরিবেশন করেছেন। মাঝে আটের দশকে সংস্থাটির হাল ধরেন যুগ্মভাবে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র যিনি আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সেতার পরিবেশন করছেন, যাঁর পুত্র প্রণব মণ্ডল আকাশবাণী ও কলকাতা দূরদর্শনে নিয়মিত সেতার বাজাচ্ছেন সেই দেবপ্রসাদ মণ্ডল ও নরনারায়ণ পূততুণ্ড। সঙ্গে সৌমেন্দ্র ঘোষাল, রূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোকন মণ্ডল প্রমুখ। তবে এই ধারাটি বর্তমানের চাপে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছে মনে হয়। শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। অল্পবয়সীরা তো শিখতে আসছেই না। অভিভাবকরাই

তাদের ক্যারিয়ারিস্ট হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। শৈশব তো নেই-ই শিশুদের। তবুও এরই মধ্যে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, মলয় চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য(হালদার), তুফা মুখার্জী, তবলায় রেবণ ভট্টাচার্য, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র ঘোষাল, অলক নস্কর, শিশির নস্কর, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, রুপঙ্কর মুখোপাধ্যায় এঁদের সহযোগিতা করছেন।

কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও হতাশ নয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ বছরের তপুদা তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'সর্বক্ষেত্রে যে অবক্ষয় বর্তমানে নেমে এসেছে, তা শাস্ত্রীয়সংগীতকে নির্মম ভাবে গ্রাস করেছে দেখতে পাচ্ছি। গুরু পরম্পরা, ঘরানা, বন্দেজ সবই প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে বললেই চলে। কেউ কিছু মানে না, শিখতে চায় না। তবুও আশা করছি সুদিন আসবে এবং সংগীতের প্রাচীন উজ্জ্বল ঐতিহ্য আবার স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে। ঠিক কথাই তো– নইলে বারুইপুরের বিশ্বনাথ সেনগুপ্তের কন্যা সঞ্চারী ২০০৩ সালে জাতীয় বৃত্তি পান হিন্দুস্থানী সংগীতে ? শুধু তাই নয়, সঞ্চারী এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রীয়সংগীতে এম.এ করছেন। সাহাজান রোডের দেবজিৎ পূততুণ্ড ২০০০ সালে সল্টলেক সংগীত উৎসবে তবলায় প্রথম হন। সারা ভারত শিশু প্রতিভা অন্বেষণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্ধকারের মাঝে এগুলোই তো আলোর দিক।

(২) লঘুসংগীত ঃ- এই পর্যায়ে শাস্ত্রীয়সংগীত ছাড়া প্রায় সব ধরনের গানকেই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবুও টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি গানকে এই লঘুসংগীতের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। সাধারণত যাঁরা উচ্চাঙ্গসংগীত করেন তাঁরা কীর্তন বাদে প্রায় সবাই এইসব গান গেয়ে থাকেন। তাই এগুলো ছাড়া অন্য যেসব গান আছে; যেমন রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, আধুনিক ইত্যাদি গানগুলোকেই এই পর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং বারুইপুর থানা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এই লঘুসংগীতের কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক) রবীন্দ্র-নজরুল ইত্যাদি ঃ আর্টিকেলটির শিরোনাম দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যুগটির কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধ থেকে এই যুগের শুরু। যে সময় অনেক মানুষই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। নজরুল বা দ্বিজেন্দ্রগীতির প্রশ্নও তেমন ভাবে দেখা দেবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সমসাময়িক অতুলপ্রসাদ, সজনীকান্ত, রজনীকান্ত প্রমুখও ছিলেন অধরা। মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের বদান্যতায় রবিবাবুর গান জনসমক্ষে আসতে শুরু করে। এবং দেশাত্মবোধের আগুনে জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে – নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ। বারুইপুর অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। শ্রদ্ধেয় পংকজকুমার মল্লিক তাঁর মুক্তি ছায়াছবিতে দুটি রবিবাবুর গান ব্যবহার করেন প্রথম। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে প্রকাশ হতে শুরু করে।

শাস্ত্রীয়সংগীতের পীঠস্থান সাউথগরিয়া থেকেই যদি ধরা যায় দেখা যাবে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা সেভাবে কেউই করছেন না। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নজরুলের গান এবং কিছু আধুনিক গান শেখাচ্ছেন ত্রিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র কল্যাণ দাস এবং দিলীপ

দাস মহাশয়ের ছাত্র পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। এবং এরা দুজনই স্বাধীনতা পরবর্তিকালের সন্তান। সেই হিসেবে চম্পাহাটি কিছুটা এগিয়ে। ১৯৫৫ সালে লঘুগানের শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন দিলীপ দাস মহাশয়। ৬৫ বছরের দীর্ঘকায় দিলীপবাবু শ্যামল মিত্র মহাশয়ের ছাত্র, আকাশবাণী দিল্লী থেকে আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং সদ্য চাকরী খোয়ানো মানুষটি ঐ সময় চম্পাহাটিতে এসে সংগীতকেই পেশা হিসেবে বেছে নেবার যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাকে বাহবা দিতেই হয়। সঙ্গে ছিলেন সত্যরঞ্জন দত্তবণিক (তবলিয়া); একটু পরে পাশে পেয়েছিলেন পরিমল মুখার্জীকে, যিনি নজরুল-এর গানে যথেষ্ট পারদর্শী।

এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি এলেন শেখর শী, সঙ্গে সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শাস্ত্রীয়সংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র-নজরুল-এর গান শেখানো শুরু হলো। কিন্তু শেখর শীর জেলা জুড়ে খ্যাতি অবশ্য আধুনিক গানে। এখন সবরকম গান শেখানোই তাঁর জীবিকা।

সত্তরের দশক চম্পাহাটি এলাকার রবীন্দ্র-নজরুল-সংগীতের সাফল্যের দশক। এখন এইসব গানের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তা এঁদের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় শুধুমাত্র ঘোষপুরের নরনারায়ণ পূততুণ্ড-র জন্য। 'রবীন্দ্রসংগীত যে এত সহজে হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে, সাইকেলে যেতে যেতে এমন স্ফূর্তিতে গাওয়া যায় নরনারায়ণ পূততুণ্ডই তা আমাদের প্রথম দেখিয়েছেন'; বলেছিলেন, প্রতিভাশালী এক তরুণ গল্পকার নড়িদানার রঞ্জন দত্তরায়। সত্তর দশকে এবং আশীর দশকে ধর্মতলা জাগ্রত সংঘ ও ঘোষপুর শক্তি সংঘের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন প্রভৃতি নৃত্যনাট্য এবং বিভিন্ন রবিকাহিনী অবলম্বনে সাগরিকা, সামান্যক্ষতি, কচ ও দেবযানী। এছাড়া ঋতুরঙ্গ তো ছিলই, সবই নরনারায়ণ পূততুণ্ডের পরিচালনায় এবং বারুইপুর থানা অঞ্চলের শিল্পীদের নিয়ে তিনি মঞ্চস্থ করিয়েছেন। সংগীতে সহযোগিতা পেয়েছেন কৃষ্ণা মুজমদার, লিলি দাস, অঞ্জলি রায়, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের। সঙ্গতে দেবপ্রসাদ মণ্ডল, তরুণ মুখোপাধ্যায়, উত্তম কুণ্ডু, শংকর মুখোপাধ্যায়, অলোক কর্মকার, সুকুমার কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর 'রবীন্দ্রসংগীত তত্ত্ব পরিক্রমা' ও 'কথায় কথায় রবীন্দ্রগান' গ্রন্থদুটি রচনাই নয়, রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার এবং প্রসারের জন্য ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি নিয়মিত তাঁর বাড়ীতে প্রভাতী রবীন্দ্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠান করে আসছেন জোড়াসাঁকোর ঢঙে। শহর কলকাতা থেকে শিল্পীরাও এসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে যান। অবশ্য এই ধরনের অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবে করেন সাউথ গরিয়ার তপেন ভট্টাচার্য এবং চম্পাহাটির মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যিনি ১৯৮৭ সালে কলকাতা থেকে এসে কমলপুরে বাস করছেন। রবীন্দ্রসংগীতই মূলত শেখান এই যাটোর্ধ মানুষটি। সঙ্গে নজরুল, ভজন, ভক্তিগীতি সবই আছে। সম্প্রতি আধুনিক গানের একটি ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর সংস্থা 'গীতিকুঞ্জ' রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করছে দীর্ঘদিন। সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রচর্চা প্রসার এবং প্রচারে এই এলাকায় আরও যাঁরা কৃতিত্ব দাবী করতে পারেনই শুধু নয়, রীতিমত এই ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ, তাঁরা হলেন কবি স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়,

সঙ্গে আছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষ্যরচনা থেকে ভাষ্যপাঠে এঁদের জুড়ি সমগ্র থানায় মেলা ভার।

১৯৬০ সালে তৈরী হয় 'চম্পাহাটি সাংস্কৃতিক চক্র'। উদ্যোক্তা সত্যরঞ্জন দত্তবণিক, অশোক ঘোষ, দিলীপ দাস, পরিমল মুখার্জী, অসিত নাগ, শেখর শী প্রমুখ। সংস্থাটি এখন আর নেই। ৯-এর দশকে তৈরী হয় 'চম্পাহাটি কালচারাল সেন্টার'। সেটিরও আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। 'দক্ষিণায়ন' নামে সৌমেন্দ্র ঘোষাল একটি সংস্থা তৈরী করেন চিনের মোড়ে, তারও অস্তিত্ব বিপন্ন। আঞ্চলিক সংগীত সংস্থা, সাউথ গরিয়ার অনুকরণেও চম্পাহাটিতে একটি সংস্থা গঠিত হয় ৯-এর দশকে কিন্তু সেটিরও বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। চম্পাহাটি কালচারাল সেন্টার অবশ্য চিত্রাঙ্গদা, কচ ও দেবযানী এবং নদী ও মানুষ নামে তিনটি অনুষ্ঠান করে কিন্তু বাকীগুলো অংকুরেই বিনষ্ট হয়। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে কিছু তরুণ এইসব সংগঠন তৈরী করেছিলেন নানা কারণেই তা শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। কিন্তু বাংলাভাষা ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে নরনারায়ণ পূততুণ্ডের 'ছুটি' সংস্থা বিগত ১০ বছর ধরে ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করে আসছেন চম্পাহাটি বালিকা বিদ্যালয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গুণিজন সম্বর্ধনা 'ছুটি' সংস্থার অনুমোদিত একটা কাজ।

রবীন্দ্র-নজরুলের পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশন ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নাজিরপুরের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। জাড়দহের অমল মণ্ডল অবশ্য সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, সজনীকান্তের গানও শেখান। মল্লিকপুরের শিশিরেন্দু ভৌমিক দীর্ঘকাল ধরেই আকাশবাণীতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন। বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্য সবকটাই বারুইপুর থানা অঞ্চলের বাইরে, তিনি গান শেখাচ্ছেন। স্থানীয় ভাবে সংগীতশিক্ষা দিচ্ছেন মল্লিকপুরের আর একজন শিল্পী ও শিক্ষক দেবু সেনগুপ্ত।

উচ্চাঙ্গসংগীত শতাধিক বছরের পুরোনো হলেও রবীন্দ্র-নজরুল-চর্চা বারুইপুরে শত বছরের কমই হবে। বছর ষাটেক বয়সের ৭৭'র পল্লীর রথীন দত্ত জানালেন —কত আর হবে? বছর ষাটেক ধরে রবীন্দ্রচর্চা চলছে। তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। সংগীত প্রশিক্ষণই তাঁর পেশা। একমাত্র পুত্র সাগরময়ও ভালো গান করছেন। সম্প্রতি ২০০2 সালে রথীনবাবু ও তাঁর পুত্র সাগরময় কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরীর পাশে একটি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন। কে. জি. দাস রোডে আছেন কালিদাস কবিরাজ। কালিদাসবাবু শাস্ত্রীয়-সংগীতের পাশাপাশি নজরুলের গান শেখাচ্ছেন দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর। ব্যাঙ্কের চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি সপরিবারে সঙ্গীতকেই উপজীব্য করবেন জানিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী উমা কবিরাজ রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞা। কন্যা পাপড়ি রবীন্দ্রভারতীতে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট করছেন। নজরুল ঘরানায় এমনটি বড় একটা দেখা যায় না।

কাছারী বাজারের বিশ্বনাথ ঘোষ, পেশায় স্কুলের কর্মী। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদে তাঁর অবাধ গতি। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বরাজ সিংহের এই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ছাত্রটি জনা চল্লিশেক ছাত্রছাত্রীকে তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। সাজাহান রোড-এর রাজেন্দ্র নাথ দেবনাথের কথা অগেই বলা হয়েছে কিন্তু সেখামকারই সনৎ পূততুণ্ড প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্র -

নজরুল-অতুল-দ্বিজেন্দ্র গীতি শিখিয়ে যাচ্ছেন রুচিরুজির জন্য। তাঁর ছোট ভাই অমল পূততুণ্ড আকাশবাণীতে তবলায় বি-হাই শিল্পী। বারুইপুরের বুকে এমন সংগীতময় বাড়ী খুব কমই আছে। পরিবারের সকলেই সংগীত নিয়ে চর্চা করছেন।

মদারাট এলাকায় রবীন্দ্রচর্চাকে একটা অন্যমাত্রা এনে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন 'কৃষ্টি' নামে একটি সংস্থার জনক অনিলকুমার ঘোষ। মধ্যবয়সী শ্রী ঘোষের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রচর্চায় এক বড় আঘাত। দোলতলায় সুভাষ চট্টোপাধ্যায় কর্মজীবন থেকে অবসরের প্রান্তে। গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে তাঁর সুললিত কণ্ঠে নজরুলের গান যেন প্রাণ পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর কোন ছাত্রছাত্রী নেই।

ষাটের দশক থেকে আকাশবাণীতে সংগীত পরিবেশন করেছেন দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর, সুদূর কলকাতা থেকেও যাঁর কাছে সংগীত শিখতে আসতেন ছাত্রছাত্রীরা। ষাটোর্দ্ধ সেই শিক্ষক-শিল্পীর নাম শ্যামল অধিকারী। বৈষ্ণবপাড়ায় নিবাস। কিন্তু চরিত্রে বৈষ্ণব নন। শান্ত মানুষটির গলায় এখনো কি গভীর ব্যঞ্জনা। গানের জন্য তিনি সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু বর্তমানে কিছুটা অর্থ সংকটে আছেন বলেই মনে হয়। কথায় একটা হতাশা ফুটে উঠছিল যেন। অভিভাবকদের সংগীতচর্চায় সন্ততিদের না ইনসিষ্ট করায় তাঁর যেন কেমন একটা ক্ষোভও ঝরে পড়লো কণ্ঠে।

বিশালাক্ষ্মীতলায় সুবলসখা চক্রবর্তী, বারুইপুরের জয়া মিত্র, রবীন্দ্রভবনের কাছে সুস্মিতা কর্মকার, কাকলী চক্রবর্তী, সুতপা সাহা এঁরা দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা করছেন। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ফুলতলা ৪নং গেটের কাছে তেমনই আছেন মিসেস্ জে. মল্লিক।

রামনগরের দুর্গা পাল, বেগমপুরের বিশ্বনাথ কয়াল, কামরার সুরেশ মণ্ডল, চম্পাহাটির অলোক সেনগুপ্ত, কুমারহাটের সায়রা বানু, রাণার নিখিলকুমার নস্কর, মীরপুর-এর শম্ভু মণ্ডল, বেলিয়াঘাটার হেমকুমার পুরকাইত, গঙ্গাদুয়ারার বিমলচন্দ্র নস্কর, বৈদ্যপাড়ার উৎপল দত্ত, টেঁকার শুভেন্দু মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা করছেন। এঁরা এই প্রজন্মের শিল্পী, কেউ কেউ মাত্র পাঁচ-সাত বছর শিক্ষকতা করছেন। বস্তুত এঁদের অনেকেরই বংশে কোন সংগীতচেতনা ছিল না। এঁরাই প্রথমপুরুষ হিসেবে সংগীতচর্চা করছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে জয় করেই এঁরা সংগীতসাধনা করে চলেছেন।

খ) আধুনিক ঃ বাংলাগানের একটা উজ্জ্বল দিক হলো এই বিভাগটি । সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হবার একটা আন্দোলনের ঢেউ এসেছিল কল্লোল যুগে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা উত্তর কালে রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাবমুক্ত কিছু সংগীতসাধক এসেছিলেন। তাঁদের কথা লিখতেন একজন, সুর করতেন অন্যজন এবং শিল্পী ছিলেন তৃতীয় জন। এই শিল্পীদের মধ্যে সাড়া জাগানো মানুষ রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, মৃণাল চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র-শ্যামল-ধনঞ্জয়-সতীনাথ প্রমুখ শিল্পী । ১৯৩৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'মুক্তি'তে পংকজ মল্লিক রবীন্দ্রনাথের দুটি

গান ব্যবহার করেছিলেন। তখন অনেকেই ‘কান পেতে রই’ বা ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ গান দুটিকে আধুনিক গান বল্লে ভুল করেছিলেন। কেউ কেউবা রবিবাবুর গানও বলেছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে সেই ভুল আর কেউ করেননি এই সমস্ত দিকপাল শিল্পীদের অসাধারণ পরিবেশনায় এবং প্রচেষ্টায়।

অন্যান্য গ্রাম এলাকার তুলনায় রবীন্দ্র-নজরুলের চর্চায় বারুইপুর একটু পিছিয়ে থাকলেও আধুনিক গানের জগতে বারুইপুর প্রকৃতই পথপ্রদর্শক। প্রথমেই যাঁর নামটি মনে আসে, তিনি আর কেউ নন, এক এবং অদ্বিতীয় চঞ্চল সরকার। বেলিয়াঘাটার এই সদাহাস্য মানুষটি আধুনিকগানের জগতে নিজেকে যে উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছেন তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। পেশায় নরসুন্দর নেশায় সংগীতশিল্পী। দীর্ঘকাল আকাশবাণীতে আধুনিক গান গেয়েছেন । মান্নাদের গান এখনও এই সত্তর ছুঁই ছুঁই মানুষটির কণ্ঠে অন্যরকম ভাষা পায়। শুধু আধুনিক গানই নয়, নিজস্ব কথায় এবং সুরেও তিনি বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর যোগ্য সঙ্গী আর এক দিকপাল শিল্পী রথীন প্রামাণিক বর্তমানে সরকার । বারুইপুর পুরোনো বাজারে শোহাউস সিনেমার দুই প্রান্তে ফ্যান্সী ও বিউটি সেলুনের মালিক এই দুই শিল্পী ষাটের দশক থেকেই বারুইপুর অঞ্চল মাতিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে চঞ্চল সরকারের ছেলে রঞ্জন এবং রথীনবাবুর মেয়ে পাপিয়া সেই ঐতিহ্য বজায় রাখায় সচেষ্ট থাকছেন। কিন্তু সারা বাংলায় যেমন একসঙ্গে উচ্চারিত হতো হেমন্ত-মান্না ঠিক তেমনি দক্ষিণবঙ্গের এই দুই শিল্পীরও খ্যাতি বিরাজমান। পরবর্তী প্রজন্ম কতদূর এগোবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সালেপুর-এর দক্ষিণ রায়পল্লীর গোরাচাঁদ মিত্র আধুনিক গানের আর এক যশস্বী শিল্পী ও শিক্ষক। প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি সঙ্গীতসাধনা করে চলেছেন। বারুইপুর-এর দীলিপ গণ ঠিক তেমনই একজন সাধক শিল্পী। খালি গলাতেও তাঁর গানে মধু ঝরে । মদারাট অঞ্চলের অতীন প্রামাণিক, আটঘরার সুরেশ মণ্ডল। সিতকূপ রোডের অভিজিৎ মুখার্জ্জী, বারুইপুর এর দীলিপ সরকার, শিবানীপীঠের পাপিয়া চক্রবর্তী চেষ্টা করছেন আধুনিক গানে জগত মাতাতে।

আধুনিক গান সেই অর্থে মূলত শুরু করেন ১৯১০ সালে বেলিয়াঘাটার ˚ প্রিয়নাথ সরকার। তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র চঞ্চল সরকার। ১৯২৫ সালে রাসমাঠের কাছে নিবাসী নবকুমার রায়চৌধুরীও লঘুসংগীত পরিবেশন করতেন।

চম্পাহাটি - সাউথ গরিয়া অঞ্চলের আধুনিক গান শুরু মূলত ৬০-এর দশকে। হাড়াল গ্রামের মহাদেব মণ্ডল, চম্পাহাটির শেখর শী, সাউথ গরিয়ার ˚ সুপ্রিয়া ব্যানার্জী (তুফানদি), ঘোষপুরের গৃহবধূ শ্যামলী কর্মকার (নস্কর), নড়িদানা নতুনপুকুরের ˚ ভাস্কর রায়, চিনের পাড় এর রণজিৎ মজুমদার, বাওড়া গ্রামের সঞ্জয় পাত্র, সাউথ গরিয়ার সলিল ঘোষাল দীর্ঘদিন ধরেই আধুনিক ও ছায়াছবির গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন এবং করছেন। এর মধ্যে এই প্রজন্মের চম্পাহাটির মিতালী গায়েন প্রথম আকাশবাণীতে আধুনিক গান পরিবেশন করেন ৮-এর দশকের শুরুতে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে কমলপুরের দেবদাস মণ্ডল, সাউথ গরিয়ার রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপা শর্মা, দেবাশিস্ বর্গী, বেগমপুরের

শ্যামল মুখাৰ্জ্জী, তেগাছির স্বপন নস্কর, পশ্চিম ঘোষপুরের রঞ্জিত নস্কর নানা ধরনের আধুনিক গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এদের সকলকে ছাপিয়ে যিনি এখনো সংগীতসুধা ঢালছেন তাঁর নাম না-করলে ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি আর কেউ নন, স্বনামধন্যা শিল্পী সাউথ গরিয়ার সংগীতা বর্গী, বিবাহসূত্রে তিনি সংগীতা পাল। চিনের পাড়ে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংগীত সাধনা করে চলেছেন। বর্তমানে আধুনিক গানের সঙ্গে জীবনমুখী গানও তিনি গাইছেন।

গ) লোকগীতি ঃ বাংলা ও বাঙালীর শুধু নয়, সমস্ত মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষদেরই প্রাণের গান তাঁদের মাটির সুর। আঞ্চলিক কথা ও সুরেই চাষী চাষ করেন, শ্রমিকরা শ্রম দেন এমনকি ভ্যানচালকেরা সেই প্রাণের গানই গাইতে গাইতে ভ্যান চালান। তাঁরা কেউই হয়ত প্রথামাফিক গান শেখেননি কিংবা গান গাইতেও জানেন না, তবুও গুনগুন করেন। এই মাটির মানুষের গান লোকগীতি তারই অঙ্গ। সমাজের কুসংস্কার, দেহতত্ত্ব এবং আধুনিকতার বিরুদ্ধে যেন একটা জেহাদ ফুটে ওঠে এই সব গানে। প্রাচীন কাল থেকেই এই গান সমানে চলছে। লোকগীতির এই সুর যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তেমনি আধুনিক সুরকারেরাও। অমর পাল, গোষ্টগোপাল দাস, পূর্ণচন্দ্র দাস, এঁদের উত্তরসুরি হিসেবে বারুইপুর থানা এলাকার শিল্পীরা পিছিয়ে নেই লোকগীতি ক্ষেত্রে। চৌমাথার রমাকান্ত মণ্ডল-এর সুযোগ্য ছাত্র জয়ন্ত দাস পিয়ালী এলাকার একমাত্র লোকগীতিশিল্পী। লোকগীতি প্রচারে এবং প্রসারে চম্পাহাটির দেবব্রত মণ্ডল অন্যতম। তিনি গত ৪০ বছর ধরেই লোকগীতির চর্চা ও পরিবেশন করে আসছেন। সাথী আছেন সুভাষ কর্মকার, বেলিয়াঘাটার হেমকুমার পুরকাইত, নড়িদানার নিতাই নস্কর, দোলতলার সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রাণ ঢেলেই লোকগীতির প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। সম্প্রতি সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। মধ্য সীতাকুণ্ডুর সুনীল বর্গী আর একজন শিল্পী। যিনি জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল-এর সহযোগিতায় লোকসংগীত চর্চা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা সংগ্রহশালা করার কথা ভাবছেন। বস্তুত, লোকগীতির কোন ক্ষয় নেই। আবহমান ধরেই এর চর্চা চলবে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে। কারণ, এটা মাটির গান, মানুষের প্রাণের গান, নিজেকে উদ্দীপ্ত করার গান। তার মানে এই নয় যে, অন্যগান মানুষকে উদ্দীপ্ত করে না। আসলে লোকগীতি মানুষ মনের টানেই গায়। না-শিখেই গাইতে পারে এখানেই লোকগীতির জয়। কো-অপারেটিভের পরেশ বণিক লোকগীতির সঙ্গে আধুনিক গাইতেন। সংগীত প্রসারের জন্য তিনি 'হিন্দোল' নামে চম্পাহাটিতে একটি স্কুলও তৈরী করেন, ১৯৭০ সালে।

ঘ) গণসঙ্গীত ঃ স্বাধীনতার পূর্ববর্তিকালে যাকে বলা হতো দেশাত্মবোধক গান, চল্লিশের দশকে যা ছিল নবজীবনের গান, স্বাধীনতার পরে তাইই রূপ পেলো গণসংগীতে। এর প্রকৃত রূপকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রচারক দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর প্রমুখ।

দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিশলো গণচেতনা, অধিকার সচেতনতা, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং মিশলো বিদেশীসুর ও অর্কেস্ট্রা । একা নয়, দলবদ্ধ ভাবে গাওয়া হতে লাগলো 'কারা

মোর ঘর ভেঙ্গেছে', 'হেঁই সামালো ভাই হো, কাস্তেতে দাও সানহো' প্রভৃতি গান। মূলত বামপন্থী গণসংগঠনগুলো শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের হাতিয়ার করে নিলো এই গণসংগীতকে। আই.পি.টি.এ. এর মূল প্রবক্তা। বারুইপুরেও এর ঢেউ এসে লাগলো। সুকান্ত সহকর্মী সজল রায়চৌধুরী , রেবা রায়চৌধুরী, প্রদ্যুৎ রায়চৌধুরী প্রমুখ প্রতিবাদী মানুষ শুরু করলেন এই গণসংগীত। মধ্যকল্যাণপুরের সুভাষ চট্টোপাধ্যায় (খোকাদা) এবং পল্টু চক্রবর্তী গ্রামেগঞ্জে রানার, অবাক পৃথিবী গানগুলোকে ব্যালে করে পরিবেশন করতে লাগলেন সত্তর দশকে। ঢাকুরিয়া থেকে সত্তর দশকে চম্পাহাটিতে আসা সদ্যপ্রয়াত শংকর মল্লিক হলেন চম্পাহাটি এলাকার গণসংগীত প্রবক্তা। তাঁর এবং পান্নালাল মিস্ত্রি, প্রণব মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নস্কর, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস প্রমুখের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে একটি গণসংগীতের দল। পরে যোগ দেন দিলীপ দাস, রিংকু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা নস্কর, মলয় মুখোপাধ্যায়, সাধন ঘোষ প্রমুখ ।

এই সত্তর দশকেই জন্ম নিয়েছিল সাউথ গরিয়ার 'অবহি'। পরেশ ধর-এর সুরে ও কথায় বহুগান তারা সলিল ঘোষালের নেতৃত্বে এবং বহু শিল্পীর সহযোগিতায় পরিবেশন করেছে গ্রামেগঞ্জে । এখন অবশ্য 'অবহি' আর নেই। সলিল ঘোষাল নিজস্ব সংস্থা 'স্বরলিপি'র মাধ্যমে এই গান গাইছেন। রামনগরের 'মৈত্রী', সাউথ গরিয়ার 'আনন্দম্', চম্পাহাটির 'নব-আনন্দম' তেমনই কটি সংস্থা । এর মধ্যে আনন্দম ও নব-আনন্দম্ এখন আর নেই। চম্পাহাটির স্ফুলিংগ শাখা, বারুইপুর-এর গণনাট্যসংঘ এখন এই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সাউথ গরিয়ায় 'আনক' সেই ৬০-এর দশক থেকেই গণসংগীত পরিবেশন করতো। কিন্তু তাদের মূল গাইয়ে তপন ভট্টাচার্য কলকতা চলে যাওয়ায় বিষয়টার মাঝে একটু খামতি পড়েছিল। আবার কিছু তরুণ যোগ দেয়ায় এই 'আনক' এখনো তাদের গণসংগীত প্রচার করতে পারছেন।

ঙ) জীবনমুখী ঃ জীবনের বাইরে কোন গান হয় না। আসলে নতুন নামে পুরোনো পদ্ধতিরই একটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। নিজের কথায় ও সুরে গান, কখনো গীটার, ম্যান্ডোলিন, কিংবা অন্য কিছুকে সঙ্গত হিসেবে নিয়ে গাওয়া গান। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কেন সেই সময়ের অন্য স্রষ্টারাও নিজের কথা ও সুরেই গান করতেন, সেগুলোও জীবন থেকেই নেয়া। যদি আধুনিক কবিতার গীতিরূপ হয়, তবেও তা অনেক প্রাচীন। কারণ, প্রায় ৫০-এর দশক থেকেই ঋষিণ মিত্র, একটু পরে অজিত পান্ডে বহু সাহিত্যবাসরে এই আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করতে করতে এটাকে একটা আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সত্তর দশকেও প্রতুল মুখোপাধ্যায় একই কাজ করেছেন। পরবর্তিকালে সুমন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা, শিলাজিৎ, অঞ্জন দত্তরা যা করছেন তাই যদি জীবনমুখী গান হয়, তবে রবীন্দ্রযুগের সমসাময়িকগণও এই জীবনমুখী গানই করতেন। আসলে গান পরিবেশন করার ফর্মটাতেই নতুনত্ব। দাঁড়িয়ে, কখনও নাচতে নাচতে গীটার বাজিয়ে গান। তবে কথাতে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, সমাজের অবক্ষয়ের নানা দিক। তো রবীন্দ্রনাথ-নজরুল এই সময়ে জন্মালে এমনই লিখতেন।

১৯৭৫ সালে প্রতুল মুখোপাধ্যায় 'অবহি'র একটি অনুষ্ঠানে এই ধরনের গান প্রথম পরিবেশন করেন বারুইপুর থানা অঞ্চলের মধ্যে। এটা গর্বেরই বিষয় বারুইপুরের। আজ চারিদিকে নচিকেতা, শিলাজিৎ অথচ সত্তরের দশকেই বারুইপুর তথা সাউথ গরিয়া এমন একটি সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিয়েছিলো। তাঁরই প্রভাবে সাউথ গরিয়ার দাশরথি মণ্ডল, শান্তি মণ্ডলরা এই গান আজও গেয়ে চলেছেন। হারমোনিয়াম ছাড়াই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনুকরণে তাঁরা গান করেন। জীবনমুখী গানের প্রচার করছেন সলিল ঘোষাল কিংবা সংগীতা পালও। ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে পিয়ালীর খোলাঘাটার বিতান পুরকায়স্থ গাইছেন জীবনমুখী গান। সম্প্রতি তাঁর দুটি ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে। গত কয়েক বছর ২০০টি গ্রামের মধ্যে এই গান শোনার প্রবণতা বেড়েছে কিন্তু সক্রিয় ভাবে আর কেউ এই গান তেমন গাইছেন না।

চ) বাংলাব্যান্ড ঃ একসময় ছিল অর্কেস্ট্রা পার্টি। ট্রিপল্, জাজ ইত্যাদি নিয়ে দলবদ্ধভাবে স্বনামধন্য শিল্পীদের বাংলা-হিন্দী গান গেয়ে স্টেজ মাতানো। এখন তারই আধুনিক রূপ বাংলাব্যাণ্ড। তফাৎ শুধু, এঁরা গান নিজেরা লেখেন, নিজেরাই সুর করেন এবং যন্ত্রপাতি একটু কমিয়ে নিয়েছেন, সমগ্র বারুইপুর থানা এলাকায় বহু তরুণ এই গান শুনছেন কিন্তু এখনো তেমন কোন সংস্থা গড়ে ওঠেনি। অথচ অনেক অর্কেস্ট্রার দল একসময় বারুইপুর এলাকায় ছিল। বারুইপুর থানা অঞ্চলের বহু যুবক কলকাতার বিভিন্ন অর্কেস্ট্রাতে গীটার, সিনথেসাজির ইত্যাদি বাজান। কেউ কেউ গানও করেন কিন্তু এলাকায় নিজস্ব ব্যাণ্ড তৈরী করেননি। আসলে এই ধরনের ব্যান্ড চালাতে গেলে একাত্মতা, ধৈর্য, ত্যাগের প্রয়োজন আজ তরুণদের মধ্যে তার খুবই অভাব। অভিভাবকগণও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্যারিয়ারিষ্ট তৈরীর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। শিশু তার শৈশব হারাচ্ছে। হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। নষ্ট হচ্ছে সুকুমার চিন্তা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধ। সর্বাত্মক ডেডিকেশান নিয়ে যাঁরা ঝাঁপাচ্ছেন তাঁরাই এই বাংলাব্যাণ্ডকে টিকিয়ে রাখতে পারছেন এবং পারবেন। আমাদের দুঃখ, তেমন কোন সংগঠন সেভাবে তৈরী হলো না বারুইপুর থানা অঞ্চলে।

নিবন্ধীকরণভুক্ত কিছু সংগীতালয় বারুইপুর থানা অঞ্চলে আছে। যেগুলোর ঠিকানা দেখলেই বোঝা যাবে বর্তমানে বারুইপুর-এর সংগীত জগত কোন কোন এলাকায় প্রবহমাণ। অবশ্য অনেক সংগীতশিক্ষকই আছেন যাঁরা নিজেরা কোন প্রতিষ্ঠান গড়েননি। পরীক্ষা বা সেই ধরনের কোন বিষয়ের জন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান একদা বর্তমান ছিল। আজ আর তাদের অস্তিত্ব নেই।

i) অনিলাদেবী স্মৃতি সংগীত সম্মিলনী — কাছারিবাজার (এখন নেই)

ii) এম. এন. স্মৃতি ফাইন আর্টসেন্টার — কাছারিবাজার (এখন নেই)

iii) মঞ্জুশ্রী সংগীত একাডেমী — কাছারী বাজার

iv) কৃষ্টি — মদারাট

v) নিক্কণ — মদারাট

vi) নূপুর – মদারাট

vii) চারুকলা একাডেমী – সাজাহান রোড

viii) সুর ও সংগীত – সাজাহান রোড

ix) স্পন্দন – উকিলপাড়া

x) ঐকতান সংগীত সংস্থা — দোলতলা

xi) শিশু ছন্দম্ – দোলতলা

xii) গোল্ডেন মিউজিক কলেজ – বৈষ্ণবপাড়া

xiii) সঞ্চারী মিউজিক্যাল সেন্টার – বারুইপুর

xiv) পূরবী শিক্ষায়তন – বারুইপুর

xv) সংগীতাঞ্জলি — বারুইপুর

xvi) সত্যম্ শিল্পী গোষ্ঠী — সীতাকুণ্ডু

xvii) ভীমার্জুন স্মৃতি সংগীতায়তন – ঢেঁকা

xviii) সুচেতনা – গঙ্গাদুয়ারা

xix) সঙ্গীতাঞ্জলি মিউজিক কলেজ — চম্পাহাটি

xx) হিন্দোল – চম্পাহাটি (এখন নেই)

xxi) হৈমন্তী সংগীত কলেজ – সোলগোহালিয়া- চম্পাহাটি

xxii) বলাকা সংগীত শিক্ষা নিকেতন – চম্পাহাটি

xxiii) আলাপন সংগীত বিদ্যালয় – চম্পাহাটি

xxiv) গীতিকুঞ্জ – কমলপুর

xxv) সাগর সংগীতালয় — ৭৭-এর পল্লী

xxvi) পরম্পরা – সাউথ গরিয়া

xxvii) সংগীতাঞ্জলি মিউজিক কলেজ – পিয়ালী (এখন নেই)

xxviii) নৃত্য-গীত-ছন্দ — কো-অপারেটিভ (এখন নেই)

xxix) সংগীত সাধনা — বেগমপুর (এখন নেই)

xxx) কিন্নর কলাকেন্দ্র — মদারাট

xxxi) সঙ্গীতায়ন — ফুলতলা

এছাড়া নিবন্ধনভুক্ত নয় এমন কিছু কিছু সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো এখানে লেখা হলো না। এই কাজ চলার সময় এবং পরেও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিবন্ধনভুক্ত হতে পারে। সেগুলো এখানে দেওয়া গেল না। দুঃখিত।

এত দীর্ঘ পথ একা হাঁটা দুঃসাধ্য। তবু হাঁটতে চেষ্টা করেছি। যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো না, তাঁরা ক্ষমা করবেন। সময় সুযোগ পেলে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করবো।

।। কৃতজ্ঞতা স্বীকার।।

(১) অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, (২) মনোরঞ্জন পুরকাইত, (৩) মানিক সরকার, (৪) বিশ্বনাথ ঘোষ, (৫) ভ্যালেন্টিনা সরকার, (৬) সৌমেন্দ্র ঘোষাল, (৭) ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৮) সময় কাটানো পত্রিকার ১-১২-৯৬ সংখ্যাটি, (৯) ভারতীয় সংগীতের কথা – প্রভাতকুমার গোস্বামী, (১০) বারুইপুর পৌরসভা, (১১) যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, (১২) মৃণাল মিত্র (১৩) গোপালচন্দ্র সাউ।

বারুইপুরের নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলন

রথীন দেব

নাট্যচর্চা বলতে আমরা থিয়েটার চর্চাকেই বুঝি। যদিও 'যাত্রা' লোকনাট্য। কিন্তু এই বাংলার গ্রাম-শহরে যাত্রার পরিচিতি 'পালা' রূপে এবং এই যাত্রাপালার বিষয় এতখানি ব্যাপ্ত যে এই থিয়েটার চর্চার সঙ্গে একই সঙ্গে তা এই নিবন্ধের সল্প পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তাই মূলতঃ বারুইপুরের থিয়েটার চর্চা ও থিয়েটার আন্দোলন এই নিবন্ধে আলোচনার বিষয়।

বারুইপুরের থিয়েটার চর্চা ও থিয়েটার আন্দোলনের বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমাদের দেশের থিয়েটার চর্চার শুরুর কিছু কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার।

ইউরোপীয়রা এদেশে আসার পর নিজেদের দেশীয় আদলে তৈরী করে নিতে চাইল ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। কৃষিতে, শিল্পে তথা অর্থনৈতিক কাঠামোতেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটাল তারা এবং তার প্রভাব পড়ল এদেশের সমাজ জীবনে। তৈরী হল নতুন সামাজিক শ্রেণী। অর্থাৎ প্রায় ইউরোপীয় ধাঁচে তৈরী হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এঁদেরই প্রেরণায় ও উদ্যোগে তৈরী হল থিয়েটার। এই থিয়েটার হল ইউরোপীয় প্রভাব সঞ্জত। এই বাংলাদেশে, প্রধানত কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল এই থিয়েটার চর্চা। যদিও এই প্রসেনিয়ম থিয়েটারের মতো চারদেওয়াল ঘেরা 'রঙ্গমঞ্চ' ও মঞ্চে যবনিকা (Curtain) র ব্যবহার আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন লিপিবদ্ধ রয়েছে 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' ও 'অভিনয় দর্পণ' গ্রন্থের নানান নিবন্ধে। খ্রীষ্টীয় তিনশ শতকের কিছু আগে বা পরে রচিত হয়েছিল এই 'ভরত নাট্যশাস্ত্র।'

বাংলা ভাষায় থিয়েটার চর্চার স্বাদ প্রথম পাইয়ে দিলেন অনুবাদ নাটক 'সংবদল' অভিনয়ের মাধ্যমে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশীসাহেব হেরাসিম লেবেদেফ। প্রাগ-স্বাধীনতা পর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর আজকের সময় পর্য্যন্ত দু'শ বছর অতিক্রান্ত বাংলা ভাষায় থিয়েটার চর্চা। একটা সময় পর্য্যন্ত থিয়েটার চর্চা ছিল শুধুই আনন্দ বিনোদনের জন্য। তখন থিয়েটারে সমসাময়িক জীবন ও সমাজের কোন প্রতিফলন ছিল না। যখন রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ অবসান আন্দোলনে মেতে উঠল এই বঙ্গীয় সমাজ তখন এই সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দানা বাঁধতে থাকল স্বাদেশিকতার আন্দোলনও। এই সব আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তখনকার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীগণ।

তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার প্রতিরোধে প্রথম নাটক লিখলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় 'দি পার্সিকিউটেড। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল বারুইপুর থানার নবগ্রাম-এ।

কলকাতায় থিয়েটার তখন ইউরোপীয় কর্মজাত ধারায় হলেও দেশীয় ধারা অর্থাৎ সংস্কৃত

নাটক ও নাট্যকর্ম অনুসরণে নাটক রচনায় পথিকৃৎ হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভি গ্রামের রামনারায়ণ তর্করত্ন। দুটি সামাজিক নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব ও 'নবনাটক' লিখে সেই সময় খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'। তারপর মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' শুধুই ব্যঙ্গে নাটক নয় তাতে রয়েছে সুপ্ত ইংরেজ বিরোধিতা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এক বলিষ্ট দৃষ্টান্ত।

থিয়েটারে এইভাবে উঠে এল সমসাময়িক সমাজের বিষয়। থিয়েটার চর্চা পর্যায়ক্রমে থিয়েটার আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকল। আন্দোলন অর্থাৎ নতুন চিন্তা নতুন ভাবনাকে আশ্রয় করে নতুন পথে চলা– আলোড়ন সৃষ্টিকরা। ১৯৪৪-এ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' থিয়েটার চর্চায় আলোড়ন সৃষ্টি করল। নাট্য প্রয়োগে এল নতুন শিল্প চেতনা। পর্যায়ক্রমে এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নত আজকের এই আধুনিক থিয়েটার।

থিয়েটার চর্চার এই বিবর্তন ধারায় ঢেউ আদিগঙ্গার তীরস্থ কলকাতার সন্নিহিত জনপদ ছুঁয়ে এসে লেগেছে বারুইপুরের থিয়েটার চর্চাতেও। তখন বারুইপুর আজকের মত শহর ছিল না, ছিল প্রায় পরিপূর্ণ গ্রাম। সে সময় আনন্দ -বিনোদনের জন্য গ্রামের মানুষের হৃদয়ের অনেকখানি দখল করেছিল আমাদের লোকসংস্কৃতি 'যাত্রাপালা'। আজও বারুইপুরের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের কাছে এই যাত্রাপালার কদর কমেনি। যাত্রাপালার কথা উঠলে সর্বাগ্রে প্রয়াত সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করতে হয়। কমবেশী ৩০ খানি পালা রচনা করেছিলেন। নাট্যকার (যাত্রা) হিসাবে তাঁর খ্যাতি যাত্রাপাড়া কলকাতার চিৎপুর তথা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্লাসিক 'উপন্যাসের পালা' রচনার পথ প্রদর্শক তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহের নাট্যরূপ রূপনগরের মেয়ে, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল। মহিষাসুর, আত্মাহুতি, ব্যথার পূজা, পলাশীর পরে, মাটির মা, রক্তবীজ, নতুন জীবন, চক্রছায়া, মাটির মানুষ, রাজা রামমোহন, ধর্মবল, শাপমুক্তি, ভক্ত প্রহ্লাদ, ভক্ত হরিদাস,জনশক্তি, যুগাবতার প্রভৃতি তাঁর রচনা। এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে শিশুপাঠ্য 'মুকুন্দ রায়' ও মোহনলাল এবং কিছু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। যাত্রাপালার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। রামনগরের বিশিষ্ট নট ও পরিচালক সুশীল ঘোষ তাঁকে প্রতাপাদিত্য নাটকে কল্যানীর চরিত্রে অভিনয় করান। অপরেশচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চ নাটকের যাত্রারূপায়নের দুর্যোধন হয়ে আসরে হৃদয় জয় করেছিলেন। নিজের পালায় নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে অভিনয় করেছেন। জন্ম ৬ নভেম্বর ১৯০০, মৃত্যু ১ অক্টোবর ১৯৯৮। পৈতৃক ভিটা রামনগর গ্রামে। পরবর্তীকালে বারুইপুর পুরাতন বাজারে বসবাস করতেন। শিক্ষাকতা করতেন বারুইপুর হাইস্কুলে।

তাঁর পরে আরও একজন বারুইপুরের মানুষ নাট্যকার (যাত্রা) হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন তিনি হলেন প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁর পিতৃনিবাস শাসন গ্রামে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুরানো বাসভবনেই তাঁদের এখন বসবাস। জন্ম ৩ মার্চ ১৯৩০। তাঁর রচিত প্রথম পালা 'মসনদ কার?' হলেও নাট্যকারের (যাত্রা) স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা এনে দেয়

দ্বিতীয় পালা প্রথম পাণিপথ। তারপর থেকে প্রায় ৪০ বৎসর ধরে তিনি পৌরাণিক , ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক প্রচুর যাত্রাপালা সমান দক্ষতায় রচনা করেন। নামী দামি প্রায় সমস্ত যাত্রা দলেই অভিনীত হয়েছে, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে, দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় জয় করেছে সেই সব যাত্রা পালা। তারমধ্যে বাঁশেরকেল্লা, রিক্তা নদীর বাঁধ, দীপ চায় শিখা, রিক্সাওয়ালা, হেডমাস্টার, মেজদি, পৃথিবীর পাঠশালা, রামায়নের আগে, নরনারায়ন, সিরাজদ্দৌলা, কালা শের প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যেমন মেজদি পালার জন্য প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার, সিরাজদ্দৌলার জন্য নটরাজ পুরস্কার, যাত্রা উৎসব কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পালাকারের পুরস্কার ও সম্মান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সামগ্রিক বিচারে নাট্য আকাদেমী পুরস্কার (২০০০) তিনি পেয়েছেন। এছাড়া শ্রী দর্পন (ছদ্মনাম) নামে অনেক একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। তারমধ্যে রক্তে বোনা ধান, ক্ষুধার জ্বালা, মর্জিনা আবদাল্লা, অ্যাটম বোমা, রামদার রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। যাত্রাপালা ছেড়ে এখন ভিন্ন স্বাদের পৌরাণিক উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এই নতুন প্রচেষ্ঠার প্রথম ফসল পৌরাণিক উপন্যাস 'নৃসিংহ অবতার'। শৈশবে ও যৌবনে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই এবং তারপর কঠিন ও কঠোর পরিশ্রম করে এই জায়গায় পৌছাতে পেরেছেন প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এতদঞ্চলের যাত্রার ঐতিহ্যের হাত ধরেই এগিয়ে ছিলেন তিনি।

কলকাতার অরুণ অপেরার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামনগরের অরুণ মণ্ডল। সে সময়ে বিখ্যাত ছিল অরুণ অপেরা। দরাজ গলায় বিবেকের গান গাইতেন যাত্রায় অরুণ মণ্ডল। রামনগরের দুদনই-সর্দারপাড়া অঞ্চলে বসবাস করতেন যাত্রার অভিনেতা রাইমোহন নস্কর। রঞ্জন অপেরা, ভান্ডারী অপেরা, গনেশ অপেরার অভিনয় করতেন। দক্ষিণ দুর্গাপুরের পালান নস্কর যাত্রাপালার অভিনেতা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা, রিক্তানদীর বাঁধ, সম্রাট ও সতী প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে খ্যাত হন। ভান্ডারী অপেরা, ক্যালকাটা অপেরা, গণেশ অপেরায় ও অন্যান্য নামী দামি অপেরায় অভিনয় করেছিলেন।

বারুইপুরের থিয়েটার চর্চায় জোয়ার এলেও যাত্রার জনপ্রিয়তা কোন অংশেই কমেনি। বারুইপুরের অধিকাংশই গ্রাম, তাই বারুইপুরের অধিবাসীদের বৃহৎ অংশই কৃষিজীবী। থিয়েটার এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন পৌছায়নি। সেই জায়গা দখল করে আছে এই লোকসংস্কৃতি যাত্রাপালা, থিয়েটার চর্চা শুধু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

থিয়েটার চর্চা এই বারুইপুরে ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল বলা কঠিন। বারুইপুরের নিমচাঁদ মিত্র 'শরৎকুমারী ' নাটক রচনা করেছিলেন আনুমানিক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। শাসন নিবাসী ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ঠাকুরপো প্রহসন' নাটক রচনা করেন। প্রজাপতি ছদ্ম নামে রচনা করেন। 'ঠাকুরপো প্রসসন', ' মা এয়েছেন' সহ পাঁচখানি নাটক রচনা করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লোকান্তরিত হলে তাঁর রচিত 'মায়া কানন' নাটকের শেষাংশ ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে কথিত আছে। (তথ্যঃ সমাজসেবী ও

গবেষক হেমেন মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩২৫) রামনগর কালী বাড়িতে, 'রামনগর বান্ধব সম্মিলনী' অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল' ও 'হাসির মেলা' নাটকের একটি ছাপা প্রচার পত্র এই প্রতিবেদকের হাতে এসেছে। (প্রচার পত্রটি গবেষক অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)। এই নাটকের আগে আর কোন নাটক অভিনীত হওয়ার এমন লিখিত (ছাপা) নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও গবেষক অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন 'তাপস সংহার বা সিন্ধুবধ' নাটক ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কালী বাড়ীতেই অভিনীত হয়েছিল সুশীল ঘোষের পরিচালনায়। জমিদার তনয়, রামনগরেরই সন্তান এই সুশীল ঘোষের মুখ থেকেই তিনি শুনে ছিলেন এই নাটক 'অভিনয়' হওয়ার কথা। এই সুশীল কুমার ঘোষ দক্ষ পরিচালক ও সুঅভিনেতা ছিলেন। উপরোক্ত 'বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র রুপে নির্মিত হয় টালিগঞ্জে।

বারুইপুরের সাউথ গরিয়ার জমিদার তনয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২০ সালে কলকাতার স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালের ৩০ জুন তিনি বিকর্ণের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন কর্ণার্জ্জুন নাটকে এবং প্রশংসিত হন। পরবর্তীকালে এই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে শক্তিশালী অভিনেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। পূর্বের নাম দুর্গাচরণ। নিজ গ্রামে নাট্য সংগঠন ও ' প্রসারপিন ক্লাব' প্রতিষ্ঠা ও পরিবারের বাধা ও বন্দীত্ব অতিক্রম করে 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

বারুইপুরের থিয়েটার চর্চার সঙ্গে বাংলার নাট্যজগতের আরও অনেক বিখ্যাত ও প্রতিভাবান ব্যক্তির নাম জড়িয়ে আছে। তাঁদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। নাট্যকার, পরিচালক, মঞ্চও চলচ্চিত্রের অভিনেতা সজল রায়চৌধুরী বারুইপুরের থিয়েটার চর্চার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন একসময়। নাট্যকাররূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দীনবন্ধু' পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর রচিত বহু নাটক বারুইপুর ও সোনারপুরে অভিনীত হয়েছে। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ গণনাট্য কথা গণনাট্য আন্দোলনের একটা দলিল। একই সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী রেবা রায়চৌধুরী ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় টিমের অভিনেত্রী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে দক্ষ ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন রেবা রায়চৌধুরী। 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী। বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে তাঁর জন্ম। জন্ম ১মে, ১৯২২, মৃত্যু ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

নাট্যকার হীরেণ ভট্টাচার্য ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বেশ কিছু কাল বারুইপুরে বসবাস করেছেন। বারুইপুরের গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রতভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারের সীত নাট্য অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত হন (পুতুল নাটকের জন্য)। তাঁর রচিত বহু নাটক বারুইপুর গণনাট্য সঙ্গে অভিনীত হয়।

বিখ্যাত নট, নাট্যকার, পরিচালক ও বহু চলচ্চিত্রের অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃনিবাস বারুইপুর থানার শঙ্করপুর গ্রামে। ষাটের দশকের শেষের দিকে বারুইপুরে এসেছিলেন 'ফরিয়াদ' নাটকের রিহার্সাল করাতে পদ্মপুকুরে সমর দাসের

বাড়ীতে (সংবাদ দিলীপ সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)। পদ্মপুকুরের 'কলরব' নাট্য সংস্থা শেখর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ফরিয়াদ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। পদ্মপুকুরের আর এক নাট্যসংস্থা 'হলিডে ক্লাব'-এ অভিনয় করতেন বর্তমানে চলচ্চিত্র অভিনেতা সুনীল মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম অন্নপূর্ণা' ছবিতে অভিনয় করা থেকে তাঁর উত্থান।

এছাড়া, বারুইপুর বন্ধুসংঘের বেশকিছু নাটকে কলকাতার অনেক বিখ্যাত শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন রবীন মজুমদার (কবি নাটকে), নিভা নন্দী (প্রফুল্ল), মাধবী মুখার্জী(উল্কা), কেতকী দত্ত (মিশর কুমারী), ঠাকুরদাস মিত্র, (মিশর কুমারী) গীতা দে (মন্ত্রশক্তি), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা বড়াল (রাণী রাসমণি) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্ত্রশক্তি) এবং রঙমহল খ্যাত অশ্রু ভট্টাচার্য (মহারাজ নন্দকুমার)।

বাংলার শক্তিশালী নাট্যকার ও বাংলা মঞ্চ নাটকে অবদানের জন্য যিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দশকের প্রথম দিক থেকে এই বারুইপুরে বসবাস করে আসছেন। এ জন্য বারুইপুর বাসী গর্ব করতে পারেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি জন্মদিন, তখন বিকেল, গ্যালিলিওর জীবন, বিপন্ন বিষ্ময়, মুষ্টিযোগ, তোতারাম, ভূত প্রভৃতি সহ বহু নাটকই তিনি এই বারুইপুরে রচনা করেছেন। বারুইপুরের সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিগণ ও নাটকর্মীগণ বা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত যে কোন ব্যক্তি সব সময়ই তাঁর কাছ থেকে সুপরামর্শ, শিক্ষা ও সাহায্য পেয়ে আসছেন। বারুইপুরের থিয়েটার চর্চাকে সক্রিয় রাখতে অনেক সেমিনার ঘরোয়া বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত নাটক বিপন্ন বিষ্ময়, তোতারাম, ভূত, মুষ্টিযোগ বারুইপুরে অভিনীত হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গীত নাট্য আকাদেমী পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত।

বারুইপুরের আরও একজন কৃতি সন্তান সাহিত্যিক শিশির বসুর নাম এই থিয়েটার চর্চা সম্পর্কে অবশ্যই উল্লেখনীয়। তিনি 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। যৌবনে সাংবাদিক রূপে একাধিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একটি নাটক ও রচনা করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান বারুইপুর স্টেশন রোড (পশ্চিম)। জন্মঃ ১৯৩২ সাল, মৃত্যু ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সাল।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্য্যন্ত বারুইপুরের থিয়েটার চর্চার একটা রূপরেখা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদের ভিত্তিতে ।

নাট্য সম্প্রদায় বা নাট্য সংগঠনের থিয়েটার চর্চা ঃ

রামনগর কালীবাড়ীতে নাটক অভিনয়

আনুঃ- ১৯০৪ সালে রামনগর কালীবাড়ীতে অভিনীত হয় তাপস সংহার বা সিন্ধুবধ নাটক। নাটকের পরিচালক সুশীল কুমার ঘোষ। অভিনয়েঃ সুশীল কুমার ঘোষ (অন্ধমুনি), ননীগোপাল চক্রবর্তী ও অন্যান্য। তখন পেট্রোম্যাক্সের আলোয় অভিনয় হত। মিউজিক ব্যবহারে যাত্রার প্রভাব দেখা যেত। মঞ্চ সজ্জায় তেমন চিন্তা ভাবনার ছাপ থাকতো না।

রামনগর বান্ধব সম্মিলনী

১৯১৮ সালে (বাংলা ১৩২৫) রামনগর কালীবাড়ীতে 'রামনগর বান্ধব সম্মিলনীর 'বিল্বমঙ্গ ল' নাটক অভিনয় (২৬ শে আশ্বিন রবিবার)। একই সঙ্গে 'হাসির মেলা' নাটক ও অভিনীত হয়। তখন সারা রাত্র ব্যাপী অভিনয় হত।

রামনগর কৈলাস ভবনে অভিনয়

১৯৩২ সালে (আনুঃ) কবি মুকুন্দ দাস এই কৈলাস ভবনে অভিনয় করেন 'দুইভাই' ও 'ব্রতচারিনী' নাটকে। (সংবাদ গবেষক অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ধপধপি শেরপুরে (মল্লিকপুর) অভিনয়

অনু ঃ ১৯৩৪-৩৫ সালে ধপধপি শেরপুর মল্লিকপুরে 'দেবলাদেবী' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

রামনগর কৈলাস ভবনে অভিনয়

অনুঃ ১৯৪২-৪৪ সালে রামনগর 'কৈলাস ভবনে' চন্দ্রগুপ্ত, কর্ণার্জুন, সাজাহান, টিপুসুলতান নাটক অভিনীত হয়। প্রথম তিনটি নাটক পরিচালনা করেছিলেন সুশীল কুমার ঘোষ (শকুনি) , অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (দুর্যোধন), শৈলেন মিত্র(নিয়তী), নিশিকান্ত মিত্র (পদ্মা), কালিদাস চক্রবর্ত্তী (কুন্তী), মন্মথ ঘোষ (ভীষ্ম), বগলা দত্ত (কৃপাচার্য), পুলিন বোস (দ্রোণাচার্য) সাজাহান নাটকে ঃ সুশীল ঘোষ (সাজাহান) , অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (ঔরঙ্গজেব), ধীরেন ঘোষ ও শচীন ঘোষ অভিনয় করেন।

টিপুসুলতান নাটকে ঃ সুশীল কুমার ঘোষ (হায়দরালী) , অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (মুঁশিয়ে লালী) এই সময় রামনগরের জমিদার তনয় সুশীল কুমার ঘোষ একজন প্রতিভাবান নাট্য শিল্পী ছিলেন। নিজেদের বাড়ী 'কৈলাস ভবনে' নিজের পরিচালনায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে একেরপর এক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। যথাক্রমে ঃ 'হরিরাজ', পৃথ্বীরাজ, শিরীফরাদ,হরিশচন্দ্র, আলিবাবা, জনা, শ্রীকৃষ্ণ, সরলা, বিল্বমঙ্গল, প্রতাপাদিত্য, বঙ্গের বর্গী, জয়দেব প্রভৃতি।

মিলনী সংঘ (বারুইপুর রেল কোয়ার্টারের পিছনে)

আনুঃ ১৯৪২ সালে মিলনী 'সংঘের প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থা প্রযোজনা করে 'প্রাণের দাবী', বিশ বছর আগে, মাটির ঘর প্রভৃতি নাটক। পরিচালনা করেন জিতেন বিশ্বাস । অভিনয়ে ঃ জিতেন বিশ্বাস, কানাই মুখার্জী, শচীন চক্রবর্তী, সনৎ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, কালিপদ ভদ্র।

দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘ ,সাউথ গড়িয়া

১৯৪৩ সালে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নট-নায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হওয়ার পর স্থানীয় কয়েকজন নাট্য পিপাসু যুবকের ঐকান্তিক প্রয়াসে দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘের জন্ম হয় ১৯৪৫ সালে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - হৃষিকেশ চক্রবর্তী, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্ঘের প্রথম নাট্য নিবেদন সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'পার্থ সারথী'। নাট্যকার

উৎপলেন্দু সেনগুপ্ত। তারপর সময়ান্তরে তাদের প্রযোজনা 'গৈরিক পতাকা', 'কারাগার', 'ফেরারী ফৌজ', বিসর্জন, আজব দেশ প্রভৃতি নাটক। পরিচালনা সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনাগুলি গ্রাম-শহরে সমানভাবে আদৃত হয়েছে। এরপর সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁরই যোগ্য শিষ্য হৃষিকেশ চক্রবর্তীর পরিচালনায় অভিনীত হয় 'সাজাহান' 'মমতাময়ী' 'হাসপাতাল', বারোঘন্টা, 'ফেরারী ফৌজ ' প্রভৃতি নাটক এবং একটি যাত্রাপালা 'পলাশীর পরে' রচনা সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। এর পরবর্তীকালে নবনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাবে নাট্য চর্চা শুরু। ১৯৬৭ সালে হৃষিকেশ চক্রবর্তীর পরিচালনায় অভিনীত 'অভিনয় নাটক' একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে স্বর্ণপদক লাভ করে। এরপর নবীন শিল্পীদের নিয়ে তপেন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ক্রমাগত অভিনয় 'সূর্যনেই স্বপ্ন আছে' 'একটি অবাস্তব গল্প' 'অরুনোদয়ের পথে,' তবুও প্রত্যয় আছে,' ট্যাঙ্কি সাফ', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'খরগোশ' প্রভৃতি। প্রযোজনাগুলি খুবই প্রশংসিত হয়। সঙ্ঘের প্রথম পর্বে শিল্পী ছিলেন সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই পরম্পরাকে সচল রাখেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অলোক মণ্ডল প্রভৃতি শিল্পীগণ।

সঙ্ঘের বেশিরভাগ নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অলোক মণ্ডল।

নাট্য উপাদানের সংগ্রহভূমি শুধু স্বদেশ নয়। প্রয়োজনে বিদেশী উপাদানেও স্বদেশ উপকৃত হয়, এই বিশ্বাসে 'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট' এর 'দ্য এক্‌সেপশন এণ্ড দি রুল' অবলম্বনে 'ব্যতিক্রম' নাটক দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের একটি প্রশংসনীয় প্রযোজনা। বর্তমানে তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'মোহন রাকেশের' 'আষাঢ়ের একদিন' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পথে।

দীর্ঘ ৫৮ বছরের জীবনে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে যেমন দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘ যুক্ত থেকেছে, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্তকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শিল্পী দুর্গাদাসের জন্মশতবর্ষ উদযাপন। বর্ষব্যাপী বিভিন্ন আলোচনা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৯২–১৯৯৩ সালে এই জন্ম শতবর্ষ উদযাপিত হয়। এই জন্মশতবর্ষ সমিতিতে ছিলেন ডঃ পবিত্র সরকার, সজল রায়চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মত শিল্পী ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব।

বারুইপুরের থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘ একটি উজ্জ্বল নাম। (তথ্য ও সংবাদ সাহিত্যিক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

বন্ধুসঙ্ঘ , বারুইপুর

আনুঃ ১৯৪৫ সালে সমর দাস, শৈলেন দাস ও সনৎ দত্ত এই তিন নাট্যানুরাগী যুবকের উদ্যোগে রেশমী রুমাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটক অভিনীত হয় পদ্মপুকুরে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সমর দাস, শৈলেন দাস, তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, কমলাক্ষ

নন্দ ও লীলাময় দত্ত। নাটক পরিচালনা করেছিলেন সনৎ দত্ত। পরবর্তীকালে এই দলটি থেকে জন্মলাভ করে বারুইপুর 'বন্ধু সংঘ'।

১৯৪৬ সালে বারুইপুরের নাট্যশিল্পী সমন্বয়ে গঠিত 'মিলন সঙ্ঘ' 'রঘুবীর' নাটক মঞ্চস্থ করে। এই প্রযোজনা থেকে সংগৃহীত অর্থ নোয়াখালীর দাঙ্গাপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই নাটক পরিচালনা করেছিলেন অমল মিত্র (নরেশ মিত্রের ভাইপো) তৎকালীন বারুইপুর থানার দারোগা। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন অমিয় ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, কৃষ্ণগোপাল দাস, বিমল বোস, সুধীর দত্ত, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সুশীল ঘোষাল, হরেন মিত্র প্রমুখ। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সনৎ দত্ত, সুধীর মিত্র ও ধীরেন দে। এই সম্মিলিত প্রয়াসে 'বন্ধু সঙ্ঘ' যুক্ত ছিল।

আনুমানিক ১৯৪৯ সালে 'পথের শেষে' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বারুইপুর 'বন্ধু সংঘের যাত্রা শুরু। তারপর এই সংঘের ধারাবাহিক প্রযোজনা রামের সুমতি, চন্দ্রগুপ্ত, মাটির ঘর, সাজাহান, কেদার রায়, মহারাজ নন্দকুমার, টিপু সুলতান, কর্ণার্জ্জুন, মিশর কুমারী, মন্ত্রশক্তি, উল্কা, দুই পুরুষ, চরিত্রহীন, বাংলার মেয়ে, মঞ্জরী অপেরা, লৌহকপাট, কাবুলিওয়ালা, আলিবাবা, চন্দ্রশেখর, দুর্গেশনন্দিনী, কবি প্রফুল্ল, কঙ্কাবতির ঘাট, রাণী রাসমনি প্রভৃতি নাটক। এই পর্যায়ের অধিকাংশ নাটক পরিচালনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। কালিপদ ভদ্র ও বেশ কিছু নাটক পরিচালনা করেছিলেন। তিনি শম্ভু মিত্রকেও পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করতেন। কলকাতার 'স্টার' মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম, রঙমহলে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলি বন্ধুসংঘের প্রযোজনার জন্য মনোনীত করা হত। ঐ সব রঙ্গালয়ে, খ্যাতিমান শিল্পীরাও বন্ধুসংঘের প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বারুইপুরে তখন বন্ধু সংঘের প্রযোজিত নাটকগুলি সমাদৃত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শম্ভুমিত্রের অনুপস্থিতিতে বন্ধুসংঘের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দীপক মিত্র। দীপক মিত্রের পরিচালনায় বন্ধুসংঘে অভিনীত হয় 'ঝিনুকে মুক্ত', বুড়ো শালিকের ঘাঁড়ে রোঁ, বিসর্গ, আলিবাবা, ভঙ্গুর (নাট্যকার শিশির বসু), ইতিহাস কাঁদে, এক যে ছিল চোর , এ পেয়ালা কফি, টিনের তলোয়ার প্রভৃতি নাটক। এই নাটকগুলির অভিনয়ের সময়কাল সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের শেষের দিক পর্য্যন্ত। এই সময় থেকেই বন্ধুসঙ্ঘের নাট্য প্রযোজনায় ভাঁটার টান শুরু হয়। তবে বারুইপুরের নাট্যমোদীদের কাছে বন্ধু সঙ্ঘের নাট্য প্রযোজনার খ্যাতি আজও অম্লান।

বন্ধু সংঘের সু অভিনেতা হিসাবে আজও যাঁদের নাম উজ্জ্বল – শম্ভুমিত্র, কালিপদ ভদ্র, সমর দাস, শৈলেন দাস, সুকুমার ঘোষ, ধীরেন ব্যানার্জী, কানাই মুখার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, দীপক মিত্র, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, সমীর চ্যাটার্জী, অসিত সরকার, প্রশান্ত চক্রবর্তী, হরেন সরকার , বাসুদেব চক্রবর্তী প্রমুখ। ধীরেন ব্যানার্জী 'ব্যাডো' নামে পরিচিত ছিলেন।

অভিনেতা ও পরিচালক শম্ভু মিত্র বারুইপুরের নাট্যমোদীদের কাছে এক উজ্জ্বল নাম। ছাত্র জীবনে ভালো আবৃত্তি করতেন। যৌবনের নাট্যানুরাগ তাঁকে অভিনয় জীবনে টেনে আনে।

সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেব , কর্ণাজ্জুর্নে বি-কর্ণ ও শকুনি, মিশর কুমারীতে আবন ও চরিত্রহীনে শুশোভন চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব অনেক সময় চরিত্রকে ছাপিয়ে অন্য মাত্রায় পৌছে দিত। তাঁর পরিচালনায় মহারাজ নন্দ কুমার ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পুরস্কারে ভূষিত হন শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্রের পরিচালিত নাটকে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করেন।

বন্ধু সংঘের পরিচালক ও অভিনেতা দীপক মিত্র শিশির বসুর অনুপ্রেণায় রবীন্দ্রভারতী থেকে ড্রামায় এম.এ করেছিলেন। বন্ধুসংঘের নাট্যচর্চায় গভীরতা আনার লক্ষ্যে এই নাট্যশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়েছিলেন।

বন্ধু সং.ঘর প্রযোজনায় সাধারণত মিউজিক প্রয়োগ করতেন সুনীল বরণ, মেক-আপ্ দিতেন অনিল ওঝা ও সেট সেটিং-এ বি ব্রাদার্স।

ধপধপি বান্ধব সমিতি

ধপধপি গ্রামের এটর্নি হরিপদ দত্ত ও বিষ্ণুপদ দত্ত কলকাতার শ্যামবাজারের বঙ্গীয় নাট্য পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অভিনয় করতেন (আনুঃ ১৯২০-৪০ সাল পর্য্যন্ত)। তারপর পৈতৃক নিবাস ধপধপি গ্রামে ফিরে আসেন এবং কিছুকালের মধ্যেই তাঁরা ধপধপি বান্ধব সমিতির মাধ্যমে নাট্য চর্চায় ব্রতী হন। হরিশচন্দ্র, সাজাহান, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। নাটক পরিচালনা করেছিলেন বিষ্ণুপদ দত্ত। তিনি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং নৃত্য ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন বিষ্ণুপদ দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ সিং, শচীন বোস, সত্যদাস দত্ত এবং স্ত্রী চরিত্রে কালী চক্রবর্তী। তাদের অভিনয় ঐ গ্রামের মানুষের খুবই প্রশংসা পেয়েছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বারুইপুর শাখা

১৯৪২ সালে ঢাকায় এক মিছিলে নিহত হন তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মিলিত হয়েছিলেন প্রগতিশীল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মানুষেরা । সেই সভা থেকেই গঠিত হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ। তার ঠিক এক বছর পরে ১৯৪৩ সালে বোম্বাই (মুম্বাই) সম্মেলনে জন্ম হয় 'ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশনের'। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর 'পিপলস থিয়েটার' আইডিয়া থেকে এই নাম করণ। তারপরই ১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আই.পি.টি.এ) কলকাতায় অভিনয় করল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক। এই নাটক নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে নিয়ে এলো নতুন শিল্প চেতনা। চল্লিশের দশকের গোড়ায় যুদ্ধ কালোবাজারী, মন্বন্তর, দাঙ্গা প্রভৃতি সামাজিক অপক্রিয়া মনুষ্য জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও সংকট সৃষ্টি করল তার প্রতিবাদ উঠে আসতে শুরু করল নাটকের ভাষায় যা প্রভাবিত করল এই বারুইপুরের সমাজ সচেতন ও সংস্কৃতি মনস্ক মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষদের। কিছুকালের মধ্যেই এই বারুইপুরের ধপধপি গ্রামে শুরু হল গণনাট্য সঙ্ঘের প্রস্তুতি পর্ব দেবু সিংহ, ভবানী সিংহ, গুরুদাস দত্ত, রাধাকান্ত

দত্ত, বেণী মাধব ভট্টাচার্য , প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায়। এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী। ধপধপিতে তাই তিনি নিয়মিত আসতেন গানের স্কোয়ার্ডের রিহার্সাল করাতে (১৯৪৯)। তারপর ১৯৫৩ সালে শো-হাউস সিনেমা হলে প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বারুইপুর শাখার জন্ম হয়। এই সম্মেলনে 'গণনাট্য' সংঘের জেলার টিম 'রাহুমুক্ত' যাত্রাপালা পরিবেশন করে। পুরাতন বাজারে নতুন বাড়ীর মাঠে এই পালার অভিনয় দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল। সংঘের প্রযোজনায় শুরু হয় ধারাবাহিক নাটক অভিনয় দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা', ক্ষিরোদ প্রসাদের 'কুমারী' , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', রথের রশি ও বিসর্জন, এছাড়া মহেশ ও গৃহপ্রবেশ। মহেশ নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন উমা দত্ত (আমিনা), পঞ্চানন ঘোষ (গফুর), কালিদাস দত্ত (জমিদার), গুরুদাস দত্ত (তর্করত্ন), মন্মথ জানা ও বিষ্ণু চক্রবর্তী। এই সময় অন্যান্য নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন বেনী মাধব ভট্টাচার্য, গুরুদাস দত্ত, বাসুদেব চক্রবর্তী, গান্ধী অধিকারী, রবিরাম দাস, রণেন চক্রবর্তী, সজল রায়চৌধুরী, অবনি চক্রবর্তী, শৈলেন পাঠক, দীপালি (মায়া) রায়চৌধুরী, গৌরী রায়চৌধুরী, জহর দত্ত, জীবন ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, সবিতা মিত্র। বেশির ভাগ নাটকই পরিচালনা করেছিলেন রাধাকান্ত দত্ত এবং বাকি নাটক পরিচালনা করেছিলেন বিষ্টুপদ দত্ত। বারুইপুরের নাট্যচর্চায় গণনাট্য সংঘ (বারুইপুর শাখা) নিয়ে এল নতুন ধারা। মঞ্চ ভাবনা, আলো, সঙ্গীত অভিনয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। সমস্ত কাজই গণনাট্যের শিল্পীরা নিজেরাই করতেন। প্রমট্ ছাড়া অভিনয় গণনাট্য সংঘই প্রথম শুরু করে। এই পর্যায়ে গণানাট্য সংঘ ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত সক্রিয় ছিল।

সরবেড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক ও গণনাট্য আন্দোলনের নেতা ও নাট্যকার হীরেণ ভট্টাচার্য ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বারুইপুরে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি এবং মিলন দে গণনাট্যের আদর্শে 'মুক্তধারা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন বারুইপুরের বেশ কিছু নাট্যনুরাগী যুবক-যুবতীদের নিয়ে। তাঁরা হলেন সমর চ্যাটার্জী, স্বরাজ রায়চৌধুরী, রত্না ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজিত নাটক 'সংশপ্তক' ও 'বাস্তাবশাস্ত্র'।

১৯৬৬ সালে সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক অন্দোলনের নেতা হেমেন মজুমদারের উদ্যোগে এই মানুষগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আবার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বারুইপুর শাখা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই উদ্যোগ সফল করে তুলতে পরে এগিয়ে এসেছিলেন শান্তিগোপাল ব্যানার্জী, স্বপন চক্রবর্তী, জীবন ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, রীতা রায়চৌধুরী, রূপলী রীত (শিশু), বারীন মুখার্জী, কল্যান কর্মকার, সন্ধ্যা মজুমদার, শ্যামলী রীত, ইতি মজুমদার (দাস), চন্দন লাল বসু, জহর বসু, মোহন বসু, পাঁচু মারিক প্রমুখ। এ পর্যায়ের শুরতে প্রযোজিত হয় 'দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক' ও 'সংশপ্তক' – নাট্যকার মিলন দে, 'বাস্তব শাস্ত্র' নাট্যকার হীরেণ ভট্টাচার্য এবং 'মৃত্যুর অতীত' নাট্যকার উৎপল দত্ত।

নাট্যকার হীরেণ ভট্টাচার্যের বহু নাটক অভিনয় করে বারুইপুর গণনাট্যের শিল্পীরা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর রচিত 'ভুলব না' নাটক ও অমর শ্রীকান্ত ছায়া পালার অকল্পনীয় সাফল্য।

অমর শ্রীকান্ত পালার কাহিনী কার হেমেন মজুমদার।

দুই পর্যায় মিলিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বারুইপুর শাখা ৫০ বছর ধরে নাট্য প্রযোজনা করে চলেছে। এই সংঘের প্রযোজিত অন্যান্য নাটক 'ইতিহাসের পাতা থেকে' ঝাঁটা দর্পন', উড়ো খৈ, 'হংসবদনের রোগ মুক্তি, 'আনন্দ সংবাদ', খাদ্য চোর, শ্রীমুখের মলাট, খন্ডন, মুক্তিবাবুর ঠিকানা, বলরাম, জননী, বুনোহাঁস, খাঁচা থেকে আকাশ। এই নাটকগুলির নাট্যকার হীরেণ ভট্টাচার্য।

ভজহরি লঙ্কেশ্বর, বাঘের খেলা, সনাতন কৌশল, আগন্তুক, কমপেলেন ও করালী, বয়কট - ৮১, রচনা-বনদীপ বসু(শঙ্কর ঘোষ)। 'বদলা চাই,' বেইমান রচনা - সজল রায়চৌধুরী। 'ক্ষোভ', আজও হায়নারা' রচনা - অশোক দত্ত।

এছাড়া গণনাট্য সংঘের (বারুইপুর)অভিনীত নাটক 'আজও ইতিহাস', একটি আত্নহত্যার গল্প', বীরেনবাবুর সংসার, গণপত কাহার, অগ্নিগর্ভ লেনা, দি পার্সিকিউটেড, একটি দীপ শত প্রদীপ, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, গায়েন, যোগী বুড়ো, অকাল বোধন, ক্রীতদাস, মড়া, নাটকের নাটক, ক্ষমতা, জেলেপাড়ার গান, গাঁওসে শহর তক্, হল্লা আসছে ভাগো, জমিদার দর্পন, প্রথম পাঠ, খড়ির চিকে, রাজেন্দ্র ঢাকীর গল্প।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বেশির ভাগ নাটকই পরিচালনা করেছেন স্বরাজ রায়চৌধুরী। দীর্ঘদিন তিনি গণনাট্য সঙ্ঘের (বারুইপুর) নাটক দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছেন। তাঁর পরিচালিত অধিকাংশ নাটকই প্রশংসিত হয়। তিনি একজন দক্ষ ও শক্তিশালী অভিনেতা। তাঁর সহধর্মিনী রীতা রায়চৌধুরী সমান দক্ষতায় গণনাট্য সংঘ সহ বারুইপুরের বিভিন্ন নাট্য সংস্থায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া, তাঁর পূর্বে ওপরে যাঁরা গণনাট্য সংঘে নাটক পরিচালনা করেছিলেন – হীরেন ভট্টাচার্য, মিলন দে, রত্না ভট্টাচার্য, সজল রায়চৌধুরী, গোরাচাঁদ মণ্ডল, অশোক দত্ত।

পরবর্তীকালে আরো যাঁরা গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনয় করেছিলেন এবং এখনো নাটক করছেন ঃ আশুমুখার্জী, ব্রজ চক্রবর্তী, চন্দ্রচূড় ঘোষ, অসিত গড়গড়ি, সুখদেব মণ্ডল, বেরা রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ রাহা, বিজয় দত্ত, বাবলু সরকার, সামসুদ্দিন সিপাই, সুভাষ চ্যাটার্জী, প্রদ্যোত রীত, সুখেন ব্যানার্জী, রীনা ব্যানার্জী, আলো দাস, স্বপন ভারতী, অশোক নস্কর, সর্বানী গড়গড়ি , রীতা মণ্ডল, প্রতাপ রীত, ইউসুফ মোল্লা, প্রদীপ রীত, মঙ্গল মণ্ডল, অশোক দাস, প্রবীর চক্রবর্তী, সঞ্জীব ঘরামী, রথীন দেব, অনিমা সরকার, প্রদীপ মুখার্জী, অনিল ভট্টাচার্য, রঞ্জিত মণ্ডল, মৃন্ময় বোস, রাজেন দেবনাথ, বিবেকানন্দ সরকার, নির্মল ব্যানার্জী, কনকেন্দু মুখার্জী, অশোক দত্ত, অনাথবন্ধু দত্ত।

গণনাট্যই বারুইপুরের একমাত্র নাট্যদল যে দল শহরের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গন্ডি অতিক্রম করে বারুইপুরের প্রায় প্রতিটি গ্রামে পৌঁছেছে তাঁদের নাটক নিয়ে কৃষক, ক্ষেতমজুরের কাছে তাদের জীবনবোধকে সজাগ করে তুলতে ।

শাসন যুব সমিতি

আনুঃ ১৯৪৪-৪৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানে নাট্যচর্চা শুরু হয় 'বঙ্গের বর্গী' নাটক অভিনয়ের

মাধ্যমে। নাটক পরিচালনা করেছিলেন সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ডঃ কিশোরীমোহন ব্যানার্জী, হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দয়াময় চ্যাটার্জী, কিশোরী মোহন ব্যানার্জী, পঞ্চানন ব্যানার্জী, সুকুমার চ্যাটার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী।
এই শাসন যুব সমিতির জন্ম আনুমানিক ১৯২৮ সালে। এই প্রতিষ্ঠানের ইংরাজী নাম শাসন ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ 'সায়মা'। খেলাধূলা ও সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়। শাসন যুব সমিতির অধীনে একটা পাঠাগার ও পরিচালিত হয়। পাঠাগারের নাম 'শাসন বান্ধব পাঠাগার'। পুস্তকসম্ভারও যথেষ্ঠ। এই সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হল থিয়েটার চর্চা। সময়ান্তরে অভিনীত পরের নাটক যথাক্রমেঃ 'পথের শেষে' , মাটির ঘর, পরিচালনা সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। পার্থ সারথি, সাজাহান পরিচালনা কিশোরী মোহন বৈদ্য। ক্যাম্প থ্রি, সংক্রান্তি সম্রাটের মৃত্যু, পরিচালনা ধীরেণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যান্ডো)। উল্কা পরিচালনা কিশোরী মোহন বৈদ্য। অনর্থ , কর্ণাজ্জুন পরিচালনা শম্ভু মিত্র। দুই বিঘা জমি, পূজারিনি (রবীন্দ্রনাথের) নাট্যরূপ ও পরিচালনা শান্তিগোপাল ব্যানার্জী। পূজারিনিতে কেবল মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন। পুরাতন ভৃত্য পরিচালনা উত্তম দাশ। বউকথা কও, ডাকঘর, মুক্তির উপায় (মেয়েদের অভিনীত) , ফাঁস, মিছিল পরিচালনা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মেঘে ঢাকা তারা, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পরিচালনা রামপ্রসাদ হালদার। হারানের নাতজামাই পরিচালনা দেবদাস চ্যাটার্জী।

এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে অভিনয় করে ছিলেন ঃ বীরেশ্বর ব্যানার্জী, ইন্দুভূষণ ব্যানার্জী, অমর নাথ ঘোষ, পঞ্চানন দত্ত, গিরিজা প্রসন্ন চ্যাটার্জী, গোপাল চ্যাটার্জী, গোবিন্দ ব্যানার্জী, সত্যদাস চ্যাটার্জী, অনিল ব্যানার্জী, রজনী চ্যাটার্জী, শচীনন্দন রায়চৌধুরী, ধর্মদাস চ্যাটার্জী, সুকুমার ব্যানার্জী, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, বিজয় ব্যানার্জী, বিজয় হালদার , প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ঘোষ, অরবিন্দ সতপথি, অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই কয়াল।

ধীরেন ব্যানার্জী (ব্যান্ডো), শান্তি গোপাল ব্যানার্জী, সুশীল চ্যাটার্জী, রামপ্রসাদ হালদার, দেবব্রত ব্যানার্জী, কল্লোল ব্যানার্জী, গৌতম ব্যানার্জী, স্বপন মুখার্জী, দেবদাস চ্যাটার্জী, প্রবীর চ্যাটার্জী, সমীর চ্যাটার্জী, মধুমালতী চ্যাটার্জী, বিভাস ব্যানার্জী, তাপস ব্যানার্জী, বিদিশা ব্যানার্জী, গুরু দাস চ্যাটার্জী।

উক্ত অভিনেতাদের মধ্যে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, অমরনাথ ঘোষ, শচীনন্দন রায়চৌধুরী, সুকুমার ব্যানার্জী, পঞ্চানন ঘোষ, অরবিন্দ সৎপথি ।

মঞ্চসজ্জা ও পোষাক ঃ বি-ব্রাদার্স, মিউজিক ঃ সমরনাথ ঘোষ ও বেহালায় ঃ কেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য অংশ নিতেন।

বারুইপুর দত্তপাড়ায় অভিনয়

আনুঃ ১৯৫৩ -৫৪ সালে বারুইপুর দত্ত পাড়ায় (মোড়ল পাড়া) কর্ণার্জ্জুন নাটক অভিনীত হয়। নাটক পরিচালনা করেছিলেন দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। বিকর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শিবদাস ভট্টাচার্য।

উকিল পাড়ায় অভিনয়

আনুঃ ১৯৫২ -৫৩ সালে উকিল পাড়ায় মেয়েদের সম্মিলিত প্রয়াসে 'জয়দেব' নাটকের অভিনয়। নাটক পরিচালনা করেছিলেন সমর দাস। নাটকে মেয়েদের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল।

সান্ধ্য সম্মিলনী নাট্যসমাজ ঃ

আনুঃ ১৯৫৫-৫৬ সালে 'মোগল পাঠান' নাটক শো-হাউস সিনেমায় (রাত্রে) অভিনীত হয়। পরিচালনা করেছিলেন দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে ছিলেন শিবদাস ভট্টাচার্য (আদিল শাহ) , দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (শেরশাহ), পান্নালাল ঘোষাল এবং স্ত্রী চরিত্রে রাধানাথ দাস।

ভট্টাচার্য পাড়ায় নাটক ঃ

আনুঃ ১৯৫৫-৫৬ সালে ভট্টাচার্য পাড়ায় 'মীরাবাঈ' নাটক অভিনীত হয়। এ নাটকে কেবল মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন। নাট্যরূপ ও পরিচালনা শৈলেন দাস।

বিশালাক্ষী নাট্যচক্র

আনুঃ ১৯৫৬-৫৭ সালে বিশালাক্ষী নাট্যচক্রের প্রযোজনায় 'রামের সুমতি' নাটক অভিনীত হয়। পরিচালনা করেছিলেন শিবদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে ঃ শিবদাস ভট্টাচার্য (নীলমনি ডাক্তার) , প্রশান্ত রায়চৌধুরী (রাম), ভূপতি রায় /মাঝি (নারায়নী) 'কৃষ্ণ রায়বর্মন প্রভৃতি।

অভিনেত্রী সংঘ। বারুইপুর

আনুঃ ১৯৫৫-৫৬ সালে বারুইপুরে নাট্য শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'অভিনেত্রী সংঘ' গঠন করে বিসর্জন ও কর্নাজুর্ণ নাটক অভিনীত হয় ভৌমিক বাড়ীর মাঠে। নাটক পরিচালনা করেছিলেন শৈলেন দাস।

খেয়ালী সংঘ , বারুইপুর

আনুমানিক ১৯৫৬ - ৫৭ সালে খেয়ালী সংঘের প্রযোজনায় মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা' নাটক অভিনীত হয়। এ নাটকের নাট্যকার ও পরিচালক - শিবদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে শিবদাস ভট্টাচার্য (শকুনী), প্রশান্ত রায়চৌধুরী (অভিমন্যু), জ্ঞানেন সাহা (অর্জুন), শান্তিগোপাল ব্যানার্জী (কৃষ্ণ)। এই সঙ্ঘের অন্যান্য প্রয়োজনা আজকাল, বারোঘন্টা, শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বাংলার রামপ্রদাস, ফেরারী, তরনী সেন।

এছাড়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অভিনীত হয়। এ নাটকের নাট্যকার ও পরিচালক - শিবদাস ভট্টাচার্য । নাটকে অভিনয় করেছিলেন পূর্ণদাস বাউল, গীতা প্রধান ও সায়ন্তিনী।

শিবদাস ভট্টাচার্য বারুইপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হত দর্শকবৃন্দ। তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন। তাঁর সংগ্রহে আছে পুরানো দিনের বহু নাটকের গান।

হলিডে ক্লাব । বারুইপুর

আনুঃ ১৯৫৬-৬০ সালে এই হলিডে ক্লা ব গড়ে ওঠে পদ্মপুকুরের কিছু নাট্যপিপাসু যুবকের প্রচেষ্টায়। এই নাট্যদলের প্রথম নিবেদন মেশ নাম্বার 49 । তারপর সময়ান্তরে রূপালী চাঁদ এক পেয়ালা কফি, সত্য মারা গেছে, ফেরারী ফৌজ, টিপু সুলতান, বিজয় নগর প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এই ক্লাবের নাটক পরিচালনা করেছিলেন সমর দাস, শৈলেন দাস ও শিশির চ্যাটার্জী। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ, ভোড্ডি, মৃন্ময় বোস (কানু), প্রদীপ মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, হীরক গাঙ্গুলী সমীর চ্যাটার্জী, অন্নপূর্ণা মুখার্জী, সুনীল মুখার্জী।

উক্ত প্রযোজনা গুলির মধ্য দিয়ে এই নাট্য সংস্থা সুনাম অর্জন করেছিল।

পদ্মপুকুরে নাটক ঃ

আনুঃ ১৯৫৯ – ৬০ সালে বারুইপুর পদ্মপুকুর অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নাট্য চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বাণী কাঞ্জিলাল। তাঁদের প্রথম নাট্য নিবেদন ঝাঁসির রাণী। নাটকটি যুব উৎসবে ও অভিনীত হয়। এই নাটক পরিচালনা করেছিলেন অমর চক্রবর্তী ও সহযোগিতায় ছিলেন বাণী কাঞ্জিলাল। পরের নাটক 'শেষ রক্ষা' পরিচালনা করেন রাধাকান্ত দত্ত (জদুদা) তারপর শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, ডাকঘর, জুতা আবিষ্কার, রোগীর চিকিৎসা পরিচালনা করেন বাণী কাঞ্জিলাল।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দীপালি ব্যানার্জী, নীতা চ্যাটার্জী, ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী, পাপিয়া মুখার্জী, কাজলী মুখার্জী, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, অসীম চ্যাটার্জী, তপন ভট্টাচার্য, তপন ব্যানার্জী, পার্থ দাস প্রমুখ।

ঝাঁসিরানী নাটকে দীপালি ব্যানার্জী লক্ষীবাঈ ও নীতা চ্যাটার্জী গঙ্গাবাঈ চরিত্রে অভিনয় করেন। বানী কাঞ্জিলাল বারুইপুর রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বারুইপুরে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

পিপলস্ থিয়েটার। বারুইপুর পুরাতন বাজার

আনুঃ ১৯৬০ সালে বারুইপুর পুরাতন বাজারের কিছু নাট্যনুরাগী যুবকের প্রচ্যেটায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই নাট্য দলের প্রযোজিত নাটক 'ঘন্টাফটক', বৃষ্টি, বৃষ্টি, বিসর্জন, প্রভৃতি। প্রথম নাটক ঘন্টাফটক পরিচালনা করেছিলেন বেলা অর্ণব। পরের নাটক দুটি পরিচালনা করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ ঘোষ, শঙ্কর নন্দী, স্বপন ভট্টাচার্য, সরল ব্যানার্জী, অমিতাভ দত্ত, দীপালি রায়চৌধুরী, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, প্রতিমা ভট্টাচার্য, কল্যান দাস। প্রযোজনা গুলি সাফল্য লাভ করেছিল।

কলরব। বারুইপুর পদ্মপুকুর

আনুঃ ১৯৬০ সালে পদ্মপুকুরের কিছু নাট্যপ্রেমী যুবকের প্রচেষ্টায় 'কলরব' নাট্য সংস্থার

জন্ম হয়। নাট্য নিবেদন 'তালবেতাল' নাট্যকার স্বপন বুড়ো' 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তে রোঁয়া ধান - রবীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং 'ফরিয়াদ'শেখর চট্টোপাধ্যায় । শেখর চট্টোপাধ্যায় পদ্মপুকুরে সমরদাসের বাড়ীতে (বন্ধুসঙ্ঘের অভিনেতা) এসে 'ফরিয়াদ' নাটকের রিহার্সাল করিয়ে ছিলেন। নাটকগুলিতে অভিনয় করেছিলেন দিলীপ সরকার, সমীরণ দাস, অনুপ দাস, দিলীপ গাঙ্গুলী, প্রদীপ সরকার, বাণী কাঞ্জিলাল, আরতী দাস, নীতা চ্যাটার্জী প্রভৃতি। প্রযোজনা গুলি প্রশংসিত হয়।

দ্বি-মুখ। বারুইপুর

আনুঃ ১৯৬২ সালে 'নীলকণ্ঠের বিষ' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে এই সংস্থার নাট্য চর্চায় প্রবেশ। পরের প্রযোজনা 'পাহাড়ী ফুল', 'বায়েন'। পরিচালনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র এবং বাসুদেব চক্রবর্তী। সে সময় তরুনদের মধ্যে বাসুদেব চক্রবর্তী অভিনেতা ও পরিচালকরূপে বারুইপুরের নাট্য মহলে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি রক্তকরবী (অংশ) ও ওথেলো (অংশ) প্রযোজনা করেছিলেন। নিজে 'রাজা'ও 'ওথেলো' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি এরকম অনেক সংগঠনে নাট্য পরিচালনা ও অভিনয় করেছিলেন।

খেয়ালী নাট্যচক্র । পুরাতন বাজার

আনুঃ ১৯৬২ সালে শো-হাউস সিনেমার নাট্যনুরাগী কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। খেয়ালী নাট্যচক্রের অভিনীত নাটক যথাক্রমে ঃ মহারাজ নন্দ কুমার, রাণী ভবানী সংকেত প্রভৃতি। নাটক পরিচালনা করেছিলেন শিবদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তরুণ রায়চৌধুরী, অমিতাভ দে, রঞ্জন রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

মিলন সংঘ। বারুইপুর

আনুঃ ১৯৬২ সালে বারুইপুরের কয়েকজন নাট্য পিপাসু তরুণ গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন এই নাট্যপ্রতিষ্ঠান মিলন সংঘ। সেই তরুণদের পুরোভাগে ছিলেন অসিত গড়গড়ি। 'কৃপনের ধন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের বারুইপুরের নাট্যজগতে প্রবেশ। তারপর থেকে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধারাবাহিক নাট্য প্রযোজনা করে আসছে এই মিলন সংঘ'। বারুইপুরের গণ্ডি অতিক্রম করে পরবর্তীকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নাট্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে এই মিলন সংঘ। সময়ান্তরে তাদের প্রযোজনা যথাক্রমে 'কেরাণীর জীবন' , হারানের নাত জামাই, তাজমহল, তিতুমীর, যাত্রাবদল, সংক্রান্তি, অগ্নিগর্ভ লেনা, নরকগুলজার, চাকভাঙা মধু, আলিবাবার পাঁচালী, সাজানো বাগান, বিলাসী, প্রতিশ্রুত অভিমন্যু, ছায়া নাটক - শৃঙ্খলিত জন্মভূমি, কৃষ্ণ গোবর্ধন, একমুঠো ভাত, সকাল হয়ে এল, বিপ্লবী মন, গুণধরের অসুখ, যদি আমরা সবাই, ইতিহাসের পাতা থেকে, রাজদর্শন, গাব্বুখেলা, আমারা কবরে যাবো না, উদোর পিন্ডী বুদোর ঘাড়ে, ছেঁড়া মুখোশ, রামযাত্রা, ফুলওয়ালি।

অসিত গড়গড়ির পরিচালনায় মিলন সংঘের প্রযোজনাগুলি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। অভিনেতা ও পরিচালকরূপে বারুইপুর নাট্যমহলে অসিত গড়গড়ির সুনাম ছড়িয়ে আছে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়ও তা প্রসারিত। শৃঙ্খলিত জন্মভূমির নাট্যরূপ (ছায়া নাটক) দিয়েছেন অসিত গড়গড়ি এবং উদোর পিন্ডী বুদোর ঘাড়ে' ও ছেঁড়া মুখোশের রচয়িতা তিনি। তিনি এই সংগঠনে শক্তিশালী অভিনেতা রাধাবল্লভ দাসকে পাশে পেয়েছেন।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে আরো যাঁরা মিলন সংঘের প্রযোজনাকে সফল করে তুলে ছিলেন তাঁরা হলেন স্বপন মুখার্জী, সর্বাণী গড়গড়ি, অশোক দত্ত, বিবেকানন্দ সরকার, অনিমা দত্ত, রূপালী রীত (দত্ত) , প্রদ্যোৎ রীত, স্বপন ভট্টাচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী, জিতেন চক্রবর্তী, সুচেতনা গড়গড়ি, দেবদাস চ্যাটার্জী, সুকুমার রায়, কল্লোল ব্যানার্জী, কনকেন্দু মুখার্জী, মোহন বসু, গৌতম ঘোষ, সুব্রত মুখার্জী, কুমকুম মিত্র।

শিল্পীবৃন্দ । বারুইপুর পুরাতন বাজার

আনুঃ ১৯৬৩ সালে বারুইপুর পুরাতন বাজারের কয়েকজন নাট্যানুরাগী 'যুবক গণনাট্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'শিল্পী বৃন্দ' নামে এই নাট্যসংস্থা গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে বসন্ত ঘোষ, রবিরাম দাস, অনাথ বন্ধু দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'শিল্পীবৃন্দের' প্রথম নিবেদন 'অভিশপ্ত ক্ষুধা' একটি সময়োপযোগী সাহসী ও বলিষ্ঠ সূচনা। সময়ান্তরে পরবর্তী প্রযোজনা স্বপ্নশেষ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না (১৯৬৬) , আবাদ (৬৭) কালের মৈনাক (৬৯), দ্বান্দিক (৬৮), ভিয়েতনাম(৬৯), চেতনা (৭৩), সমুদ্র সন্ধানে (পুরস্কার প্রাপ্ত), দিন বদলায়, ইস্পাতের আগুণ (৭৪), জমিদার দর্পন, শিকল ছেঁড়া সংলাপ (৭৫), মুক্তধারা (৭৪), পথের দাবী (৭৬), ভিয়েতনাম (নাট্যকার - বিভাস চক্রবর্তী), আফ্রিকা (৭৬), মারীচ সংবাদ (৭৬), আলো ফুটছে (৮২), জগৎবাবুর জ্বালা (৯২), কথা কাঞ্চন মালা (৯৪), অধিকার (৯৫), মারীচ সংবাদ (পুনঃ নির্মান ৯৮)

শিল্পীবৃন্দের ধারাবাহিক প্রযোজনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের প্রযোজনাগুলিতে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন ঘটেছিল। বারুইপুরের বিভিন্ন গ্রামে ও শহর এলাকায় ৩৫ বছর ধরে এই নাট্যসংস্থা নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছিল।

প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত এই নাট্য সংস্থায় পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাধাকান্ত দত্ত (জাদুদা) ও সন্তোষ ভট্টাচার্য। রাধাকান্ত দত্ত বারুইপুর গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বারুইপুরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তাঁর ভূমিকা উজ্জ্বল। অভিনেতা ও পরিচালকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল বারুইপুরের গ্রাম শহর তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। একজন দক্ষ সংগঠক ও ছিলেন।

পরবর্তীকালে এই সংগঠনে পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী। তাঁর রচিত অনেক নাটক এই সংস্থার শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। সেই নাটকগুলি যথাক্রমে ঃ শিকল ছেঁড়া সংলাপ, পথের দাবী, আফ্রিকা, আলো ফুটছে। পরিচালনা করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী নিজেই।

১৯৭৬ সালে 'মারীচ সংবাদ' নাটক পরিচালনা করেছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্য্যন্ত শিল্পীবৃন্দ কোন নাট্য প্রযোজনা করেনি। আবার ১৯৯২ সালে প্রযোজনা শুরু হয়। এই সময় 'জগতবাবুর জ্বালা' কথাকাঞ্চন মালা ও অধিকার নাটক অভিনীত হয়। নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন রথীন দেব। তারপর 'মারীচ সংবাদ' নাটক পুনরায় অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন রথীন দেব।

শিল্পীবৃন্দ প্রযোজিত নাটকগুলিতে অভিনয় করেছিলেন, বসন্ত ঘোষ, রবিরাম দাস, অনাথবন্ধু দত্ত, নির্মল ব্যানার্জী, শান্তিগোপাল ব্যানার্জী, সনৎ ব্যানার্জী, সজল ব্যানার্জী, সমীর চ্যাটার্জী, বিনয় ঘোষ, জীবন ভট্টাচার্য, সুশান্ত ভট্টাচার্য, রতন সাহা, গুরুদাস চ্যাটার্জী, অজয় পাল, শম্ভু দত্ত, বিশ্বজিৎ দত্ত, সরল ব্যানার্জী, রণজিৎ মজুমদার, রথীন দেব, রণজিৎ মিত্র, বিপ্লব ভট্টাচার্য, সজল চ্যাটার্জী, বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, দীপেন মজুমদার, তরুণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু নাথ, অলোক ঘোষ, আব্দুল খালেক ঢালী, সুভাষ পণ্ডিত, সাধনা বসু, ছায়া ভট্টাচার্য, আরতী ঘোষ, মুক্তি চক্রবর্তী, মধুমালতী চ্যাটার্জী, স্বপ্না বসু, তপতী মজুমদার, জয়িতা মজুমদার, অভিনন্দা দেব, অভিরূপ দেব, পাপিয়া ঘোষ, ডলি ঘোষ সনৎ দত্ত, কাশীনাথ ভট্টাচার্য,

আবহ সঙ্গীত ঃ অজিত চক্রবর্তী, শৈলেন পাঠক,

আলো ঃ দ্বিজেন মজুমদার, সত্য চক্রবর্তী,

মঞ্চঃ বি বোস।

মিতালী সংঘ । মদারাট

আনুঃ ১৯৬৩ সালে মিতালী সংঘ নাট্য চর্চা শুরু করে কয়েকটি প্রযোজনা করে। যথাক্রমেঃ অন্তরীন, নীলদর্পন, কেদার রায় প্রভৃতি নাটক। নাটক পরিচালনা করেছিলেন, গোরাচাঁদ মণ্ডল। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অসীম চ্যাটার্জী, শ্যামল মুখার্জী, সমর মুখার্জী, অনাথ চ্যাটার্জী, স্বরাজ রায়চৌধুরী, রীতা রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

সান্ধ্য বৈঠক । মদারাট

আ নুঃ ১৯৬৪সাল। 'কাঞ্চন রঙ্গ' নাটক অভিনয় করে সান্ধ্য বৈঠক। পরিচালনা করেছিলেন স্বরাজ রায়চৌধুরী। অভিনয়ে ঃ অসীম চ্যাটার্জী. শ্যামল চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

বৈঠকী। বারুইপুর কাছারিবাজার

আনুঃ ১৯৬৪ - ৬৫ সালে 'বৈঠকী ' নামে নাট্য দল গড়ে উঠেছিল বারুইপুর কাছারিবাজার এলাকায়। এই দলের প্রযোজনা যথাক্রমে ঃ 'জীবন রঙ্গ', দুর্গেশ নন্দিনী, পথের শেষে, শেষ থেকে শুরু প্রভৃতি নাটক। পরিচালনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র ও সীতাংশু চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন মৃণাল মজুমদার, দিলীপ বোস, অসিত সরকার, দিলীপ দাস, প্রবীর চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি দাস, সীতাংশু চক্রবর্তী, শিবদাস ভট্টাচার্য, ভীম ভদ্র।

বঙ্কিম চন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাস রচনা শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দুর্গেশ নন্দিনী নাটক (ডি.এল.রায়) অভিনয় করেছিল এই 'বৈঠকী' নাট্য সংস্থা।

শাসন বালক সঙ্ঘ

আনুঃ ১৯৬৫ সাল থেকে শাসন বালক সংঘ কয়েকটি নাট্য প্রযোজনা করে। নাটকগুলি যথাক্রমে 'রাজজোটক', এতটুকু বাসা, মেঘে ঢাকা তারা, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি। পরিচালনা করেছিলেন রামপ্রসাদ হালদার। অভিনয় করেছিলেন স্বরাজ রায়চৌধুরী, কৃষ্ণ রায়বর্মন, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় হালদার , রামপ্রসাদ হালদার, রীতা রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

নানারঙ । রামনগর

আনুঃ ১৯৬৫ সালে রামনগরে 'নানারঙ' নাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অত্যন্ত নাটক প্রিয় মানুষ প্রশান্ত সরকার। তিনি দক্ষ অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় এই নাট্য সংস্থার প্রযোজনা গুলি যথাক্রমেঃ গৃহপ্রবেশ, বিসর্জন, দুইমহল, লৌহকপাট ও টিপু সুলতান। প্রযোজনাগুলি সে সময় রামনগর গ্রামের অধিবাসী তথা বারুইপুরের বিশ্লিষ্ট নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা পেয়েছিল। অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ-সঙ্গীত সহ সামগ্রিক প্রয়োগ নৈপুন্য প্রযোজনাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। মঞ্চসজ্জায় ছিল বি.ব্রাদার্স এবং আলো প্রক্ষেপণে ছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মানু)।

অভিনয়েঃ প্রশান্ত সরকার , অচিন্ত সরকার, অভয় চক্রবর্তী, তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, সলিল ঘোষ, উমাপদ চক্রবর্তী, মুরারী ঘোষ, অনিল মিত্র, অখিল মিত্র, সুশীল পাত্র, পালান পাত্র, শিবু চক্রবর্তী, রণজিৎ মিত্র, রথীন দেব, রবীন মাহাতা, মতিলাল চক্রবর্তী, কানাই মুখার্জী (বন্ধুসঙ্ঘের অভিনেতা)

ইউথস্ কর্ণার (পদ্মপুকুর)

আনুঃ ১৯৬৫ সালে পদ্মপুকুর ব্যানার্জী পাড়ায় নাট্যনুরাগী দিলীপ দাসের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক 'আশ্রম পীড়া' (নাটিকা) অভিনয়ের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যজগতে আবির্ভাব। পরের প্রযোজনা যথাক্রমে 'অঙ্কুর' 'আগাছা', বায়েন, চাকভাঙা মধু, অমৃতস্য পুত্রা, ক্যাম্প থ্রী, টেরোড্যাকটিল প্রভৃতি নাটক।

এই প্রতিষ্ঠানের নাটক পরিচালনা করেছিলেন বাসুদেব চক্রবর্তী, সীতাংশু চক্রবর্তী, দীপক মিত্র ও দিলীপ দাস। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন শুভেন্দ চ্যাটার্জী, মনোজ মুখার্জী, দিলীপ গাঙ্গুলী, দিলীপ দাস, শেখর ঘোষ, গোলক মণ্ডল, অমল রায়, সুবীর ব্যানার্জী, পুতুল গাঙ্গুলী, রীতা রায়চৌধুরী।

পুরন্দরপুর মঠ মিলনী

আনুঃ ১৯৬৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। নাট্যপ্রযোজনা 'চাকভাঙা মধু' ও 'বায়েন'। নাটক পরিচালনা করেন গোলক মণ্ডল ও দিলীপ দাস।

বারুইপুর দেপাড়ায় নাটক

আনুঃ ১৯৬৫ সালে দে পাড়ায় দ্বিজেন ঘোষের উদ্যোগে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্য নাটক ও 'রামের সুমতি' নাটক অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন দ্বিজেন ঘোষ। অভিনয় করেছিলেন অসীম দেব, সমীর দেব, সুনীল দেব, দীপক মিত্র, ঝর্ণা মিত্র, সজল ঘোষ, অর্চনা মিত্র ও স্ত্রী চরিত্রে সত্য ঘোষ।

রামনগরে নাটক (মেয়েদের অভিনীত)

আনুঃ ১৯৬৬ সালে রামনগরে অভিনেতা ও পরিচালক প্রশান্ত সরকারের উদ্যোগে স্থানীয় মেয়েরা নাটকে অভিনয় করে। প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ও দ্বিতীয় নাটক (১৯৭৪ সালে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষ রক্ষা'। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন প্রশান্ত সরকার। প্রথম নাটকে অভিনয় করেছিলেন মঞ্জু দেব, মমতা সরকার, রিক্তা বোস, হেনা দেব, কিত্তা বোস, কৃষ্ণা সরকার, রীণা দেব প্রভৃতি। দ্বিতীয় নাটকে অভিনয় করেছিলেন শোভা পাত্র, কৃষ্ণা সরকার, যুথিকা ঘোষ, ইতিকণা ঘোষ, রাধা বোস, জপমালা চক্রবর্তী, কাকলী সরকার ও স্বপ্না মাহাতা। দুটি নাটকেরই অভিনয় প্রশংসিত হয়।

বিবেক সঙ্ঘ । নতুনপাড়া বারুইপুর

আনুঃ ১৯৬৯ সালে নতুন পাড়ায় কয়েকজন নাট্য পিপাসু যুবকের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল এই সংঘ। নাট্য প্রযোজনা যথাক্রমে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অশান্ত বিবর' রতন ঘোষের 'সকালের জন্যে', 'ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না' ও রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক (নাটিকা) 'ছাত্রের পরীক্ষা'। পেটে ও পিঠে , ক্ষ্যাতির বিড়ম্বনা, এবং অরুন মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ'। পরিচালনা করেছিলেন শ্যামল বসু। অভিনয় করেছিলেন শ্যামল বসু, অশোক বোস, রবীন চ্যাটার্জী, অলোক ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র দাস, সুনীল প্রভৃতি।

পঞ্চমুখী। বারুইপুর পুরাতন বাজার

অনুঃ ১৯৭০ সালে এই নাট্য সংস্থা গড়ে উঠে ছিল। 'শিল্পী চাই', সারি সারি পাঁচিল, ঢেউ, মহেশ, সবরী ও ডেথ ট্র্যাপ প্রভৃতি নাটক এই সংস্থা প্রযোজনা করে। নাটক পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণ রায়বর্মন ও বাসুদেব চক্রবর্তী। অভিনয় করেছিলেন প্রভাত চক্রবর্তী, স্বপন চক্রবর্তী, সুখেন ব্যানার্জী, জগবন্ধু চক্রবর্তী, সমীর চ্যাটার্জী, রাম দত্ত, সবিতা চক্রবর্তী (চট্টোপাধ্যায়), বাসুদেব চক্রবর্তী, কৃষ্ণ রায়বর্মন প্রভৃতি।

কৃষ্ণ রায়বর্মন বারুইপুরে সু-অভিনেতা রূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সিরিও কমিক অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বারুইপুরের বহু নাট্য সংস্থায় অভিনয় করেছেন। কলকাতার পেশাদার মঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্ত, রাম চৌধুরী, নৃপতি চ্যাটার্জী, রাজা মুখার্জীর মত অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। রামকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন এবং এই চরিত্রে বহু অভিনয় করেন। অভিনয় জীবনে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি কয়েকটি নাটক ও রচনা করেছেন।

তরুন সংঘ। মদারাট

আনুঃ ১৯৬৯-৭০ সালে এই নাট্য সংস্থায় জন্ম। 'দুটি পাতা একটি কুড়ি', জালিয়ানওয়ালা বাগ, রক্তাক্ত আসাম, হয়তো নয়তো, কিং ক্যানিউট, 'এক যে ছিল চোর', প্রভৃতি। পরিচালনা করেন সুভাষ চ্যাটার্জী, কল্যান নাগ। অভিনয় করেন সুভাষ চ্যাটার্জী, কল্যান নাগ, পার্থ প্রতিম মুখার্জী, আদিত্যনারায়ণ মুখার্জী, শ্যামল কর্মকার, রীনা মুখার্জী, মৌ কর্মকার, বাসুদেব মণ্ডল, অয়ন ব্যানার্জী, প্রতাপ মুখার্জী, আশিস নাগ, অরবিন্দ মুখার্জী প্রমুখ।

থিয়েট্রিক । বারুইপুর

এই সংস্থার জন্ম হয় ১৯৭[illegible] সালে। নাট্য প্রযোজনাঃ 'ভোরের মিছিল' পরিচালনা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কালি[illegible] পরিচালনা ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যান্ডো) অভিনয়ে ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমীরণ রায়চৌধুরী, শিবদাস ভট্টাচার্য, সুকুমার ঘোষ, গীতা দে, জয়শ্রী সেন, শাশ্বতী রায়, অসিত সরকার, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রণজিৎ মজুমদার, কৃষ্ণ রায় বর্মন, স্বরাজ রায়চৌধুরী, রীতা রায়চৌধুরী।

তির্যক বারুইপুর

আনুঃ ১৯৭৪ সালে এই নাট্য সংস্থার জন্ম। আজও ইতিহাস, অগ্নিগর্ভলেনা, স্পার্টাকাস, রাহুমুক্ত প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনা। প্রতিটি নাটকের অভিনয় প্রশংসিত হয়। নাটক পরিচালনা করেছিলেন স্বরাজ রায়চৌধুরী। অভিনয় করেছিলেন সুশান্ত পূততুণ্ড, প্রবীন পাল, উত্তম পাল, অসীম চ্যাটার্জী, অমর মুখার্জী, দিলীপ কর্মকার, শিশির চ্যাটার্জী, প্রদীপ মিত্র, প্রণব মিত্র, দিলীপ গাঙ্গুলী, চন্দ্রনাথ বরাট, কাজল, সুজিত সরকার, কনকেন্দু রায়চৌধুরী, রীতা রায়চৌধুরী, জ্যোৎস্না দেবনাথ প্রভৃতি।

সবুজ সংঘ । রামনগর

আনুঃ ১৯৭৭ সালে তিমির আদিত্য, শ্যামল চক্রবর্তী, চঞ্চল চক্রবর্তী, তাপস চক্রবর্তী, মানস চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন নাট্য পিপাসু যুবকের প্রচেষ্টায় রামনগরে এই সবুজ সংঘ নাট্য সংস্থার জন্ম হয়। শৈলেস গুহ নিয়োগীর 'ফ্লু' নাটকের অভিনয় দিয়ে সূচনা। তারপরে প্রযোজনা 'সত্যি ভূতের গল্প' , চিকিং ফাঁক, মড়া ,পদক্ষেপ, নকল আদালত প্রভৃতি নাটক। নাটকের পাশাপাশি গণসঙ্গীত চর্চা ও সমাজ সেবামূলক কাজ করে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান। নাটক পরিচালনা করেছেন রথীন দেব। উপরের নাটকগুলির মধ্যে রথীন দেব (আমি) রচনা করেছেন চিকিং ফাঁক, পদক্ষেপ, লকল আদালত। এই প্রতিষ্ঠানের নাটকগুলি বারুইপুরের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে অভিনীত হয় এবং প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী, চঞ্চল চক্রবর্তী, তিমির আদিত্য, মানস চক্রবর্তী, প্রণব মিত্র, তাপস চক্রবর্তী, আশিস চক্রবর্ত্তী, গোপাল মণ্ডল, উদয় নস্কর, মাধবেন্দ্র চক্রবর্তী, গোবিন্দ মণ্ডল, অখিল মিত্র, হিমাংশু সরকার, গদাধর চক্রবর্তী, কল্লোল চক্রবর্তী, ভাস্কর আদিত্য ও রথীন দেব।

সান্ধ্য মজলিস। বারুইপুর (ডাকবাংলোর পাশে)

আনুঃ ১৯৮০ সালে প্রফুল্ল রায়, গুরুদাস ভারতী, প্রবীর ধর, মনোরঞ্জন পুরকাইত প্রমুখ কয়েকজন তরুনের নাট্যানুরাগ থেকে সান্ধ্য মজলিস সংস্থার জন্ম। 'সাজাহান' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যচর্চা শুরু। পরবর্তী প্রযোজনা যথাক্রমে 'কান্না ঘাম রক্ত', ময়ূর মহল, ঝিনুকে মুক্ত, গোলাপে রক্ত, কেয়া কুঞ্জ, কেনারাম বেচারাম, পাহাড়ী ফুল, প্রভৃতি নাটক। নাটক পরিচালনা করেছিলেন শৈলেন দাস ও দেবী হালদার।

'সাজাহান' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই সংস্থার দুঃসাহী সূচনা বন্ধু সঙ্ঘের প্রথিতযশা শিল্পী (নট ও পরিচালক) শম্ভু মিত্রের প্রশংসা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে শম্ভুমিত্র ও পরিচালনা করেছিলেন এই সংস্থার প্রযোজিত নাটক। অন্যান্য প্রযোজনা গুলিও সমাদৃত হয়েছিল স্থানীয় জনমানসে।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দেবী হালদার, প্রফুল্ল রায়, গুরুদাস ভারতী, প্রবীর ধর, মনোরঞ্জন পুরকাইত, মনোরঞ্জন চ্যাটার্জী, বিভূতি দত্ত, কানাই মণ্ডল, দুলাল ভট্টাচার্য অজিত সিংহ, গোকুল ঘোষাল, ললিত মণ্ডল, সুকান্ত চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, মনোজ মুখার্জী, মুরারী ভদ্র, সন্ধ্যা দে, ঝুনু চক্রবর্তী, মল্লিকা চ্যাটার্জী জ্যোৎস্না, রীতা রায়চৌধুরী।

অঙ্কুর । পুরাতন বাজার, বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮২ সালে এই নাট্য সংস্থার জন্ম। সময়ান্তরে এই সংস্থার প্রযোজনা যথাক্রমে গেরিলা স্কোয়ার্ড, মড়া, গাব্বুখেলা প্রভৃতি। নাটক পরিচালনা করেছেন অসিত গড়গড়ি। অভিনয় করেছেন স্বপন চক্রবর্তী, অনুপ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, শুভ্র চক্রবর্তী।

দিশারী । পুরাতন বাজার, বারুইপুর

আশির দশকের প্রথম দিকে এই নাট্য সংস্থায় নাট্যচর্চা শুরু হয়। প্রযোজনা যথাক্রমে বিচারক, খ্যাতির বিড়ম্বনা, সংস্কার , একটি সমুদ্রের পাখী, নেমকের দারোগা। এছ. ড়াশ্রুতি নাটব 'মুসলমানী' গল্প, অপরিচিতা, 'রক্তকরবী'। 'একটি সমুদ্রে পাখী' ও নেমকের দারোগা'র নাট্যরূপ দেন ও পরিচালনা করেন সজল রায়চৌধুরী ।

অভিনয় করেছিলেন সত্যব্রত চক্রবর্তী, শেখর চক্রবর্তী, দীপেন মজুমদার, শান্তনু রায়চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, গুরুদাস চ্যাটার্জী, বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, আনন্দ বক্সী, তাপস চক্রবর্তী, মানস ভট্টাচার্য, তরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামা রায়চৌধুরী, অরুন্ধতী মজুমদার।

গণচেতনা । বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮০ সালে এই সংস্থায় নাট্য চর্চা শুরু। সৌখিন নাট্যচর্চা নয় সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা থেকে নাট্যনুরাগ ও নাট্য চর্চা। প্রযোজনা যথাক্রমে ছোট বকুলফুলের যাত্রী, 'একটি অবাস্তব গল্প', এক নয়, মুক্তি বাবুর ঠিকানা, মোহনায় , প্রশ্নকরুণ, সুক্ষ্ম বিচার, মারীচ সংবাদ, কেনা কুসুমের কথা, মেশিন, দর্পনে বিক্ষত ছবি, ব্যারিকেড, চিত্রাঙ্গদা (নৃত্য নাট্য), মায়ার খেলা (নৃত্যনাট্য),সাধারণ মানুষ ও রবীন্দ্রনাথ (গীতিনাট্য), রক্তকরবীর (অংশ) ও সক্রেটিসের জবানবন্দী।

এই সংস্থার উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেডের' মত নাটকের দুঃসাহসিক প্রযোজনার সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সমস্ত নাটকেই পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন শ্যামল বসু। অভিনয় করেছেন রবিরাম দাস, শংকর দত্ত, দেবীদাস চক্রবর্তী, বসন্ত ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত সাহা, দীপক নন্দী, পঞ্চানন ঘোষ, সমীরণ রায়চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনুপ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামল বসু, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, অলোক ঘোষ, স্বপন ভারতী, বিশ্বজিত দত্ত, বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দত্ত, মনোজ বিশ্বাস, শমীক বসু, সৌমেন সাহা, মৃদুল দত্ত, মানস মুখার্জী, সহদেব লাহা, দিব্যেন্দু রক্ষিত, গৌরিশঙ্কর সাহা, সুখেশরঞ্জন মণ্ডল।

মঞ্চ ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত,

সাজসজ্জা -- বি. ব্রাদার্স, আলো ঃ মলয় বসু, স্বপন দত্ত। ধ্বনি ঃ শেখর দাশ।

ইউনিক থিয়েটার। রামনগর

আনুঃ ১৯৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। প্রযোজনা - শতাব্দীর পদাবলী, ঘটৎকচ, তেঁতুলগাছ। পরিচালক দিলীপ মাহাতা। অভিনয়ে গণেশ কর্মকার, মৃত্যুঞ্জয় নস্কর, মুরারী ঘোষ, কমল সর্দার, টুলু মাহাতা ও মালা ঘোষ প্রভৃতি।

আর্টথিয়েটার । বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮৫ সালে নাট্যশিল্পী দিলীপ কর্মকারের উদ্যোগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দিলীপ কর্মকারের পরিচালনায় 'স্পার্টাকাস' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে এই সংস্থার নাট্যচর্চা শুরু। এই প্রযোজনার সাফল্য অসাধারণ। প্রগতিশীল নাট্যচর্চার আদর্শ অবলম্বন করে তাঁদের যাত্রা শুরু। স্পাটাকার্স নাটকের কাহিনী হওয়ার্ড ফার্স্ট ও নাট্যরূপ অরুণ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী প্রযোজনা যথাক্রমে আজও ইতিহাস রচনা - সুদীপ সরকার, মা ও দানব রচনা - হীরেণ ভট্টাচার্য, নীলদর্পণ (নির্বাচিত অংশ) রচনা - দীনবন্ধু মিত্র, ঝড়ের খেয়া রচনা - চন্দন সেন (পুরস্কার প্রাপ্ত প্রযোজনা), পৃথিবীর জন্য, মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন রচনা - চিররঞ্জন দাস, কর্তার ভূত নাট্যরূপ (রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প) দিলীপ কর্মকার। এছাড়া শৃঙ্খল, নতুন দিনের আলো, মন্দির, ফাঁসির মঞ্চে বেঞ্জামিন, দস্তাবেজ, স্টেনগান, রক্তে রাঙা হাত, আতঙ্ক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সম্পর্ক, জনতার আদালত নাটকের রচয়িতা দিলীপ কর্মকার। বের্টোল্ট ব্রেখট-এর নাটকের বাংলা রূপান্তর 'যে ব্যবস্থা নেওয়া হল', 'সমাধান' ও 'জেলে বউ' প্রযোজনা করে। সমস্ত নাটকই পরিচালনা করেছেন দিলীপ কর্মকার। অভিনেতারূপে থিয়েটারে তাঁর প্রবেশ। পরবর্তীকালে এই 'আর্ট থিয়েটার' গঠন। নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ও নাট্য রচনায় আগ্রহী হন। তাঁর প্রযোজনাগুলিকে সফল করে তোলার জন্য নিজেই অনেকটা আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছেন অনেকক্ষেত্রে। তাঁর পরিচালনায় এই সংস্থার কয়েকটি নাটক কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। যেমন আতঙ্ক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সম্পর্ক ও সমাধান নাটক।

উক্ত প্রযোজনা গুলিতে অভিনয় করেছেন ঃ-

দিলীপ কর্মকার, সুমিত গাঙ্গুলী, মৃন্ময় বোস(কানুদা), অমর মুখার্জী, গোলাম কুদ্দুস বৈদ্য, সুব্রত মিত্র, অমল সরদার, প্রশান্ত পাঠক, তপন পুরকাইত, সঞ্জয় মালিক, সুদীপ্ত কাহালী,

বিশ্বজিৎ নস্কর, উত্তমপাল চন্দ্রনাথ বরাট, বিবেক, রথীন দেব, দিলীপ দাস, মল্লিকা কর্মকার, মনিকা চ্যাটার্জী, প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, রাজীব মিত্র, অভিজিৎ ব্রহ্মচারী, শেখর মুখার্জী, জ্ঞান সাহা, দুলাল ভট্টাচার্য, সোমা দাস, নন্দিতা কর্মকার, সুবীর চক্রবর্তী, অমরনাথ উপাধ্যায়, কাকলি নস্কর, অনিমেশ ভট্টাচার্য, কালাম বৈদ্য, তপন চ্যাটার্জী, আলমবারি, আজিজুল সেখ, চৈতালী ভুঁইয়া। অভিনেতা মৃন্ময় ঘোষ (কানুদা) বারুইপুরের বিভিন্ন নাট্য সংস্থায় অভিনয় করেন। 'স্পার্টাকাস নাটকে সবক্ষেত্রে 'ড্রাবার' চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাত হন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

এই সংস্থা আতঙ্ক 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' সম্পর্ক ও সমাধান নাটক প্রযোজনার জন্য নাট্য আকাদেমির অনুদান পেয়েছিল। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' ও সম্পর্ক নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেন মনু দত্ত এবং আলোর পরিকল্পনা করেন জয় সেন। সুর ও আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ করেন কল্যান সেন বরাট।

নাট্যচক্র । বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮৫ সালে নাট্যচক্রের থিয়েটার চর্চা শুরু। প্রযোজনা যথাক্রমে ঃ মিলহারা ছন্দ, জীবন রঙ্গ, সাগর মোহনা, একটু সুখ, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, আমি, ঠিকানা, বিন্দুর ছেলে, দহন প্রভৃতি। পরিচালনা করেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল 'দহন' পরিচালনা করেন শ্রীপর্ণা সরকার। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বহু দিন অভিনয় করছেন। বারুইপুরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নাটক পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন।

এই সংস্থার প্রযোজনা গুলিতে অভিনয় করেছেন ঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা সরকার, পরেশ বিশ্বাস, নিত্যানন্দ রায়, স্বপন সরকার, জয়দেব হালদার, দীপঙ্কর দাসও মাধব চ্যাটার্জী।

স্ফুলিঙ্গ । ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের চম্পাহাটী শাখা

প্রযোজনা ঃ মোহভঙ্গ , রাজা কা বাজা, হল্লাবোল, রাজদর্শন, স্বপ্ন প্রভৃতি নাটক। পরিচালক চিন্ময় ব্যানার্জী।

সোনালী সঙ্ঘ। উকিলপাড়া, বারুইপুর

এই সংস্থার জন্ম ১৯৮৪ -৮৫ সালে। নাটক, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্র ভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়ের চর্চা হয় এই সংগঠনের মাধ্যমে। তাছাড়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করে এই সংস্থা। দুর্গোৎসবের বিজয়া সম্মিলনীতে খেয়া, অথঃ স্বর্গ বিচিত্রা, কেয়া কুঞ্জ, মহাবিদ্যা প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে। দুর্গোৎসব ছাড়া অন্যান্য সময় প্রযোজিত নাটক যথাক্রমে ঃ চার অবতার, নলজাতক, পাকে বিপাকে, পরীক্ষা পাশের মন্ত্র, ভূতের মুখে রামনাম, অরুনোদয়ের পথে, ক্ষ্যাতির বিড়ম্বনা, সাজানো বাগান প্রভৃতি। সমস্ত নাটকই পরিচালনা করেন স্বপন বিশ্বাস। কেবল 'সাজানো বাগান' নাটক পরিচালনার সময় স্বরাজ রায়চৌধুরী সাহায্য করেছিলেন। অভিনয়ে জগবন্ধু সরদার, স্বপন বিশ্বাস, অলোক অর্ণব, স্বপন ময়রা, সৌম্য বসু, অশোক মণ্ডল, মলয় রায়চৌধুরী, অসিত সেন, সুবীর মণ্ডল, সৌমেন দে, পিন্টু ঘোষ, নিতাই রায়, রীণা মণ্ডল, সৌম্যশ্রী দে।

মেয়েদের অভিনীত নাটক । উকিল পাড়া

আনুঃ ১৯৮১-৮২ সালে 'দুইবোন' (অগ্রাদত । গরীবের মেয়ে নাটক অভিনীত হয় কেবলমাত্র

স্থানীয় মেয়েদের অংশগ্রহণে। নাটক পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণা মণ্ডল। সহযোগিতা করেছিলেন স্বপন সাঁপুই। অভিনয় ঃ ঝুনু সাহা, রীণা মণ্ডল, শঙ্করী হালদার, শ্যামলী হালদার, টুনি হালদার, কেয়া মণ্ডল, শ্যামা রায়, রমা পাল,রমা রায়।

ওরিয়েন্ট ক্লাব । উকিলপাড়া

আনুঃ আশির দশকে এই সংস্থার জন্ম। প্রথম নাটক রক্তের আলপনা। পরিচালনা প্রণবেন্দ্র মণ্ডল। পরবর্তী প্রযোজনা পরবাস, ভূতনাথের ভূত, গোলকপতির নরকযাত্রা। পরিচালক- অসিত গড়গড়ি, ডাঃ দেবাশিস রায়। অভিনয়ে ঃ ডাঃ দেবাশিস রায়, স্বপন ময়রা, স্বপন বিশ্বাস, জয়দীপ মুখার্জী, বাবলু পাল, স্বপন ভারতী, স্বপন মণ্ডল, প্রদীপ রায়, ঝুমা সিংহ।

সুচেতনা । পুরাতন বাজার, বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮৭ সালে এই নাট্য সংস্থার জন্ম। প্রযোজনা যথাক্রমে ‘প্রভাত ফিরে এসো’ (মনোজ মিত্র), ‘প্রণামী থালায় দিবেন’ (সমীরণ আচার্য), কফিন (প্রেমচাঁদ মুন্সী), ‘জামগাছ’ (কিষাণ চন্দ), সাত ভাই চম্পা (wordsworth এর We are seven অবলম্বনে), হাউসফুল (প্রদীপ দাস) যোগীন যখন যজ্ঞেশ্বর, অলকানন্দার পুত্র কন্যা (মনোজ মিত্র) প্রভৃতি নাটক। নাটক পরিচালনা করেন প্রদীপ দাস। অভিনয় করেছিলেন অভিজিত ব্যানার্জী, কৃষ্ণেন্দু নাথ, পিন্টু বৈরাগী, সুদীপ দত্ত, শান্তনু সান্যাল, গৌতম মজুমদার, পাপিয়া ঘোষ, ডলি ঘোষ, সুতপা সাহা, সুমনা সান্যাল প্রভৃতি।

বারুইপুর মিলন সিনেমার (সকালে) ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’ নাটক অভিনীত হয় (আনুঃ১৯৯০ - ৯১ সাল)। ঐ দিন বারুইপুরের দুই বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক সজল রায়চৌধুরী ও শম্ভুমিত্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

লিটিল স্টার ড্রামা ইউনিট। বারুইপুর

আনুঃ ১৯৮৭ সালে এই নাট্য সংস্থার জন্ম। এই সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে মনোরঞ্জন পুরকাইতের সাহচর্যে গড়ে ওঠে। নাট্য প্রযোজনা-যথাক্রমে, ‘কালবিহঙ্গ’ (মনোজ মিত্র), আক্রান্ত (মনি মুখোপাধ্যায়), ‘বাস্তব শাস্ত্র’ (হীরেণ ভট্টাচার্য), দুঃখ সুখের গল্প (সমরেশ বসু), র‍্যাগিং (কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়), ‘ঝালাপালা’ (সুকুমার রায়), অবাক জলপান (সুকুমার রায়), কাবুলিওয়ালা, পেটে ও পিঠে, ‘সম্পত্তি সমর্পন’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), চিকন সুতোর বাঁধন, মেথরের ছেলে, ক্রীতদাস। নাটক পরিচালনা করেন মনোরঞ্জন পুরকাইত ও বিশ্বনাথ রাহা। অভিনয়েঃ তপনকুমার ভারতী, অরিন্দম ব্যানার্জী, অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিত ভট্টাচার্য, রাজপ্রসেনজিৎ মিত্র, তনুকুমার ভারতী, সঞ্জয় পাল, শম্ভু ঘরামী, রত্না মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা ভারতী, অরুনাভ ব্যানার্জী, মুনমুন নস্কর, দেবদুত ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সরদার।

নাটুকে । রামনগর

আনুঃ ১৯৯০ সালে জন্ম। নাট্য প্রযোজনা যথাক্রমে ঃ ‘ঘটৎকচ’ (অমল রায়), ‘তেঁতুলগাছ’ (মনোজমিত্র), শতাব্দীর ‘পদাবলী’ (রাধারমণ ঘোষ), রাজদর্শণ (মনোজ মিত্র), বিসর্জন (রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর), কাজল রেখা (সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)। নাটক পরিচালনায় দিলীপ

মাহাতা এবং অভিনয়ে ঃ মৃত্যুঞ্জয় নস্কর, মহাদেব পাল, বিপ্লব মুখার্জী, দিলীপ মাহাতা, মৃত্যুঞ্জয় দাস, সজল চট্টোপাধ্যায়, মৌ ঘোষ, দুর্গা মহাতা প্রভৃতি।

ভাঙাগড়া । সাউথ গড়িয়া

নাট্য প্রযোজনা ঃ মুক্তির কণ্ঠ। দর্পণে বিক্ষত ছবি, ট্যক্সি সাফ, কেয়াকুঞ্জ, প্রাপ্তি , পরবাস প্রভৃতি নাটক। পরিচালক প্রদীপ চক্রবর্তী।

উন্মেষ । কালিকাপুর

এই সংস্থার জন্ম ১৯৯১ সালে। এলাকায় নাটকের পরিমণ্ডল গঠনের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলায় ব্রতী এই নাট্যসংস্থা। এই সংস্থার প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে 'ছাপা বইয়ের নটক ও নিজস্ব পাণ্ডুলিপিতে পরীক্ষা মূলক নাটক। যথাক্রমে ঃ বিশল্যকরণী (নাটক অমিতাভ ঘোষ), পরিচালনা অলোক মণ্ডল। শার্দূল (শ্যামলতনু দাশগুপ্ত) পরিচালনা নিতাইচন্দ্র মণ্ডল। সম্পর্ক (দীপক সেন) পরিচালনা-প্রবীর মণ্ডল। দিল লাগকে দেখো (আশিস সরদার), যখন যুদ্ধ (আশিস সরদার) অরাজনৈতিক (আশিস সরদার), রেঁনেশাস (আশিস সরদার) পরিচালনা-আশিস সরদার। ধর্ষিতা (জ্যোৎস্নাময় ঘোষ) পরিচালনায় পঙ্কজ চক্রবর্তী। এক অক্ষরের গল্প (রাজু দেবনাথ), গ্রহের চিত্র (রাজু দেবনাথ) পরিচালনা রাজু দেবনাথ। এছাড়া ছোটদের জন্য বেশ কিছু নাটক (নিজস্ব পাভুলিপি) প্রযোজিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের নাটক ও ছোটদের জন্য অভিনীত হয়।

এই সংস্থা প্রযোজিত নাটকগুলিতে অভিনয় করেন ঃ প্রবীর মণ্ডল, আশিস সরদার, গোবিন্দ সরদার, বিশ্বজিৎ দাস, যুগোলকিশোর মণ্ডল, মন্টু দাস, টুলু, রেজ্জাক, হারু দাস, রফিক সরদার, শচীন নস্কর, সুজিত মণ্ডল, অসীমা মণ্ডল, চন্দনা মণ্ডল, শান্তনু মণ্ডল, তুলসী সোম, সুদর্শন মণ্ডল, রাজুদেবনাথ, রাজু চক্রবর্ত্তী, চঞ্চল মুখার্জী, শান্তি সরদার, পঙ্কজ চক্রবর্তী, ভাস্কর পাল, পূজা চক্রবর্তী, রাজা বটব্যাল, প্রভাস মণ্ডল, রমেশ মণ্ডল, তথাগত চক্রবর্তী, সঞ্জিত দাস, সৈকত দে, অনিমেষ দাস, দেবদাস মণ্ডল, দীপক প্রধান, সোমনাথ সরদার, সব্যসাচী মণ্ডল, নবকুমার নস্কর, রিঙ্কু মণ্ডল, দীপালি দেবনাথ, ইন্দ্রানী সরদার, অর্পিতা রায়, ডলি সরদার, সঙ্গীতা রায়, সোনালী মণ্ডল, গৌরী মণ্ডল, জয়া দাস, টুটু নাইয়া, কাকলি ধাড়া, মুসারফ মণ্ডল, উজ্জ্বল মুখার্জী, রাজেশ মণ্ডল, রাজু মণ্ডল, গোপাল মণ্ডল, আসিফ্ প্রভৃতি।

পি. এন.টি (পিপলস্ নারিস থিয়েটার। পুরাতন বাজার)

নাট্য প্রযোজনা ঃ মোহনায়, গরম ভাত, বাতিঘর।
পরিচালক ঃ সোমনাথ দত্ত।

প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী । রামনগর

এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম নব্বুইয়ের দশকের প্রথমে। প্রযোজনা সুখীবদন, মল্লভূমি, ইপাতিয়া (কাজল দে), ভূত -ভবিষ্যৎ (কাজল দে)। নাটক পরিচালনা করেন অশোক সেন। কেবল ভূত-ভবিষ্যৎ নাটকটি পরিচালনা করেন কাজল দে। অভিনয় করেন ঃ প্রদীপ পাত্র, বাসুদেব

ব্যানার্জী, হারু দেব, সজল চ্যাটার্জী, গোপাল ঘোষ, বুদ্ধদেব দে, পার্থ ঘোষ, তীর্থ চক্রবর্তী, গোপা চৌধুরী, স্বপ্না ঘোষ, শান্তি দে।
অশোক সেনের পরিচালনায় 'ইপাতিয়া' নাটক পশ্চিবঙ্গ সরকারের যুব-উৎসবের (১৯৯৮) জেলার (দঃ ২৪ পঃ) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে পুরস্কৃত হয় এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান গোপা চৌধুরী।

কিছুক্ষণ নাট্য গোষ্ঠী। দক্ষিণ দুর্গাপুর

নব্বুইয়ের দশকের প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। নাট্যপ্রযোজনা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' এবং শিশিরকুমার দাসের 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' নাটক পরিচালনা করেন সত্যরঞ্জন পুরকাইত, কিরিটী হালদার। অভিনয় করেন ঃ ইন্দিরা চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন পুরকাইত, কিরিটী হালদার প্রমুখ।

মুকুর। পিয়ালী টাউন (দুধনই)

জন্ম নব্বইয়ের দশকে। প্রযোজনা ঃ 'অবশেষ' , চোর পুলিশ, 'নানা রঙের দিন', এই তো উঠে এসো প্রভৃতি নাটক। পরিচালক স্বপ্নেশ ভট্টাচার্য।

মনন নাট্যগোষ্ঠী। পুরাতন বাজার (বিশালাক্ষীতলা)

এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৯৯৪ সালে। প্রযোজনা ঃ ভোরের মিছিল, 'একটু সুখের জন্য' । নাটক পরিচালনা করেন কৃষ্ণ রায়বর্মন, বিমল চক্রবর্তী ও পরবর্তীকালে রথীন দেব। অভিনয় করেন ঃ বাসুদেব পাল, বৈদ্যনাথ সাঁতরা, অরুণ চ্যাটার্জী, সমীর সান্যাল, সুতপা সাহা, সুলতা সাহা, প্রাণকুমার গুহ প্রভৃতি।

থিয়েটার লেবার। চম্পাহাটী

এই সংগঠনের জন্ম নব্বুইয়ের দশক। নাট্য প্রযোজনা রূপকথা নয়, চরিত্রের সন্ধানে, দিল লাগকে দেখো, তবুও স্বপ্ন, নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন আশিস সরদার। 'রূপকথা নয়' পুরস্কার প্রাপ্ত নাটক।

বেঙ্গল থিয়েটার। ভট্টাচার্য পাড়া, বারুইপুর

এই নাট্য সংস্থার জন্ম আনু ঃ ১৯৯৪ সালে। নাট্য প্রযোজনা ঃ চাইনি এমনটা, আড়াল থেকে, সবুজ অধিকার, বর্ণপরিচয়ের মিছিল। নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন ইমান বাগানী। অভিনয় করেন ইমান বাগানী, পিনাকী ভট্টাচার্য, অমিত মারিক, তপন চ্যাটার্জী, দীননাথ পাল, শিখা, রেখা প্রভৃতি।

খেয়ালী নাট্যসংস্থা। রামনগর

এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৯৯৬ সালে। নাট্য প্রযোজনাঃ একদিন সেই দিন, নেপথ্যে পরিচালনা পার্থপ্রতিম সরকার। সদর দরজা, আপনার কথা ভেবেই ও দাহন পরিচালনা- সৈকত চৌধুরী। অভিনয় ঃ কল্লোল সরকার, বুদ্ধদেব দাস, সঞ্জয় দাস, রাজীব মিত্র, কৌশিক সরকার, গোপাল

ঘোষ, দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত, পার্থপ্রতিম সরকার, রণজিৎ মিত্র, পার্থ ঘোষ, দেবু মণ্ডল, সুব্রত মিত্র, সুস্মিতা গাঙ্গুলী, টুসি প্রামাণিক, অনিতা সরকার।

দর্পন । মদারাট

এই নাট্যসংস্থার জন্ম ১৯৯৮ সালে। নাট্যপ্রযোজনা গুলশন (শ্যামাকান্ত দাস) ,ইপাতিয়া(কাজল দে) যম রাজত্ব, উপলব্ধি প্রভৃতি নাটক। প্রথম তিনটি নাটকের পরিচালক অশোক সেন এবং শেষের নাটকটির পরিচালক সামসুদ্দিন সিপাই। অভিনয়ে ঃ শ্যাম চক্রবর্তী, রতন ভাণ্ডারি, বাঙময় মিত্র, নওসৎ রেজা, চন্দন সরকার, শুভময় মিত্র, তপতি মিত্র, নসরৎ খাতুন, দেবলিনা বিশ্বাস ও সেখ রহিম।

মৈত্রী নাট্যসংস্থা। সীতাকুণ্ডু (আটঘরা)

এই নাট্যসংস্থার জন্ম ২০০০ সালের পরে। নাট্যপ্রযোজনা ঃ 'জীয়ন কন্যা' রচনা তিমির বরণ রায়, 'স্বাধীনতার খোঁজে রচনা শুধাংশু বৈদ্য, অমার্জণীয় রচনা দীপক সেন, 'কথা কাঞ্চনমালা রচনা রথীন দেব। পরিচালনা করেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ সাঁফুই, দেবকুমার মণ্ডল, দেবাশিস মণ্ডল, প্রকাশ সরদার, নয়ন সরদার, নমিতা সরদার, বসির লস্কর, গোবিন্দ সরদার, চন্দ্রকান্ত দাশ, দিলীপ নস্কর, সুব্রত প্রমুখ।

ফ্রেন্ডস্ ইউনিট। মদারাট

এই সংস্থা প্রথম নাট্য প্রযোজনা করে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাধু সাবধান' ২০০১ সালে। একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে করতে এই সংস্থার সদস্যদের অনেকেরই নাটকে অভিনয় করার আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয় এই সাধু সাবধান' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে। তাঁদের পরবর্তী প্রযোজনা শ্যামাকান্ত দাসের 'পরশমনি'। এই দুটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই নাটক পরিচালনা করেন অশোক সেন। অভিনয়ে গোলাম কুদ্দুস বৈদ্য, অমর নাথ উপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন মুখার্জী, রাধাবল্লভ দাস, সমীর দাস, তিমির মুখার্জী, জয়ন্ত নাগ, আশিস ব্যানার্জী, আশিস পাল, অমরেন্দ্র দাস, সনৎ দে, তাপস ব্যানার্জী, দুলাল বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, অরিজিৎ সেন, পৃথুল দাস, সৌরভ ব্যানার্জী, অভিজিত রায়; অমিত ঝাঁ, শান্তনা ঘোষ, সোমা ব্যানার্জী, শিখা সাহা, অপর্ণা বিশ্বাস, ভ্রান্তি নাগ, রুনু দাস, অমিতা দাস, নসরৎ খাতুন, পূর্ণিমা সেন, কেকা দত্ত, রঞ্জন বাগচী, সুমনা চ্যাটার্জী।

অলো ঃ দীপক কর, আবহ সঙ্গীত ঃ রবীন দাস। মঞ্চ ঃ প্রতাপ ডেকরেটার্স।

এছাড়া, আরো কিছু সংস্থা নাট্য প্রযোজনা করেছে সেগুলি যথাক্রমে মদারাটের 'শরৎ স্মৃতি সংঘ', ডিহি-মেদনমল্লের 'মত্তর্ণ ক্লাব', মদারাটের 'চতুর্মুখ' , থিয়েটার পয়েন্ট (শাসন), সাউথ গড়িয়ার ' আনবিক', ও 'আনন', খোদার বাজারের তরুণ সংঘ, রামনগরের 'বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব' বারুইপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী, মাস কমুনিকেশন, প্রভৃতি সংস্থা।

মেলা -উৎসব, সভা-সমিতি, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বারুইপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় নাটক অভিনয় ঃ

রাসমেলা উপলক্ষ্যে পুরাতন বাজারের চৌধুরী বাড়িতে প্রতিবছর দ্বিতীয় রাসের দিন সারারাত নাটক অভিনয় হত। পরিবারের সদস্যরাই অভিনয় করতেন। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও পৌরানিক নাটক ও অভিনীত হয়। সজল রায়চৌধুরী পরিচালনা করতেন এবং কখন বা যৌথ পরিচালনায় অভিনয় হত।

ধপধপিতে প্রতিবছর ১লা বৈশাখে (গোষ্ট মেলায়) থিয়েটার হত। পাঁচের দশকে 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে অম্বর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দক্ষ অভিনেতা ও পরিচালক নির্মলকুমার ঘোষ (শিবু মাষ্টার)। রামনগর নিবাসী সুশীলকুমার ঘোষের সুযোগ্য পুত্র। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর পরে' এবং তাঁর অন্যান্য অনেক পালায় অভিনয় করেন নির্মলকুমার ঘোষ। তিনি যাত্রাপালার দক্ষ পরিচালক ও যাত্রা সঙ্গীতের অসাধারণ সুরকার ছিলেন। তাই তিনি খ্যাত ছিলেন শিবু মাষ্টার নামে।

বারুইপুর হাইস্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে (১৯৫৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটক অভিনীত হয়। নাটক পরিচালনা করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী। সেই সময়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে (১৯৬১) রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে 'ডাকঘর' অভিনীত হয়। অভিনয় করেছিলেন রবীন দত্ত, শ্যামল বসু, মৃন্ময় বোস (কানুদা), মঞ্জু ঘোষ ইত্যাদি।

ধপধপি স্কুলের শতবর্ষে 'কেদার রায়' নাটক অভিনীত হয়।

ধপধপি স্কুলে (আনুঃ ১৯৬৯-৭০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় অংশগ্রহণ করেছিলেন স্কুলেরই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। পরিচালনা করেছিলেন গুরুদাস দত্ত। অভিনয় করেন গুরুদাস দত্ত, দেবব্রত গিরি, মীরা ঘোষ, নির্মলেন্দু ছন্দগী, আব্দুল মজিদ মল্লিক প্রমুখ। রঘুপতি করেছিলেন গুরুদাস দত্ত।

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবর্ষ (১৯৭২) উপলক্ষ্যে ভৌমিক বাড়ির মাঠে (কোর্টের পাশে) নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছিল 'গণনাট্য সংঘ বারুইপুর শাখা। গণনাট্য সংঘ ও মিলন সংঘের যৌথ প্রযোজনায় 'স্পার্টাকাস' (অরুণেষ মুখোপাধ্যায়), বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদের (সোনারপুর) কুলীন কুল সর্বস্ব (রামনারায়ণ তর্করত্ন), বারুইপুর বন্ধু সঙ্ঘের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (মাইকেল মধুসূদন), এবং দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের (সাউথ গরিয়া) একটি 'এক্সটেম্পো' নাটক অভিনীত হয়।

বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার (পুরাতন বাজার)-এর উন্নতি কল্পে (আনুঃ১৯৭২) 'নীল দর্পন' নাটক অভিনীত হয়েছিল। পরিচালনা করেছিলেন সজল রায়চৌধুরী এবং অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস ভট্টাচার্য, প্রিয়ঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,

বিশ্বনাথ ঘোষ, নির্মল ব্যানার্জী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সনৎ ব্যানার্জী, অনাথবন্ধু দত্ত, উমা দত্ত, পুতুল দত্ত (চ্যাটার্জী), প্রতিমা ভট্টাচার্য, সাধনা বসু, শুক্লা ঘোষ, (দত্ত) পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রবীন্দ্র জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে (১৯৭২) 'অচলায়তন' নাটক অভিনীত হয়েছিল শো-হাউস সিনেমায়। পরিচালক গোরাচাঁদ মণ্ডল এবং অভিনয়ে, স্বরাজ রায়চৌধুরী, শ্যামল বসু, মৃন্ময় বোস (কানুদা), অনাথবন্ধু দত্ত, বারীণ মুখার্জী প্রমুখ।

বারুইপুর হাইস্কুলে উন্নতি কল্পে তিনদিক ঘেরা মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর পরে' ও অন্য একটি নাটক 'দিগ্বিজয়ী'। পরবর্তী পর্যায়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'মাটির মা'। পরিচালক শিবদাস ভট্টাচার্য এবং অভিনয়ে ছিলেন শম্ভু মিত্র, রাধাকান্ত দত্ত (জাদুদা), শিবদাস ভট্টাচার্য , বিপ্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বারুইপুর 'রবীন্দ্রভবনে' সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে (আনুঃ সত্তর দশক) তাঁরই রচিত নাটক 'রাজা রামমোহন' অভিনীত হয়। পরিচালক শিবদাস ভট্টাচার্য এবং অভিনয়ে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রামমোহন), শম্ভু মিত্র, রাধাকান্ত দত্ত (জাদুদা) ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

চৈত্রমেলা শতবার্ষিকী উৎসবে (দুইপর্ব ১২-১৩ এপ্রিল ও ১–২ মে ১৯৭৫) নাটক অভিনীত হয়। ১ম পর্বের ১৩ এপ্রিলে অভিনীত হয় চৈত্রমেলা শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পন' ও মদারাট 'অগ্রনী সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি'। ২ পর্বের ১লা মে বারুইপুর পুরাতন বাজারের 'শিল্পীবৃন্দ' নাট্য সংস্থা কর্তৃক সজল রায়চৌধুরী 'শিকল ছেঁড়ার সংলাপ' এবং ২রা মে বারুইপুর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কর্তৃক গোর্কির 'মা' অভিনীত হয়।

শরৎ শতবর্ষ কমিটি, পদ্মপুকুর (১৯৭৬) শরৎচন্দ্রের 'অভয়া' নাটক অভিনয় করেছিল। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শুভেন্দু চ্যাটার্জী।

বারুইপুর পুরাতন বাজারে নতুন বাড়ীর মাঠে দুর্গোৎসব কমিটি প্রতিবছর লক্ষ্মীপুজোর দিন নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে থাকে। উক্ত কমিটি বিগত ২৫ বছর ধরে এই নাট্যানুষ্ঠান করে আসছে। অভিনীত নাটক যথাক্রমে শহুরে মামা, ভাড়াটে চাই, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, বারোভূতে, সকালের জন্য, সম্রাটের মৃত্যু প্রভৃতি। অভিনয়ে নির্মল ব্যানার্জী, কৃষ্ণ রায়বর্মন, কল্যান দাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, অনাথবন্ধু দত্ত, বাসুদেব চক্রবর্তী, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, রবিরাম দাস, সঞ্জীব দত্ত, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সধনা বোস, দীপালি রায় চৌধুরী, সুনীল চক্রবর্তী ও শিবদাস ভট্টাচার্য।

বারুইপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে ১৯৭৮ সালে শিক্ষক সমিতির (এ.বি.টি.এ) সম্মেলনে বারুইপুরের 'শিল্পীবৃন্দ' নাট্যসংস্থা 'মারীচ সংবাদ' (অরুণ মুখোপাধ্যায়) নাটক অভিনয় করে। এই নাটকের পরিচালক ছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন নির্মল ব্যানার্জী, রথীন

দেব, বসন্ত ঘোষ, রবিরাম দাস, সজল ব্যানার্জী, সরল ব্যানার্জী, অলোক ঘোষ, সুভাষ পণ্ডিত, সমীর চ্যাটার্জী, অনাথবন্ধু দত্ত, আব্দুল খালেক ঢালি, রণজিৎ মিত্র প্রমুখ। ঐ দিন আমার পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় শ্মশানে দাহন ক্রিয়া সম্পন্ন করে এসেই আমাকে 'মারীচ' চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল নাটকের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য।

মিলন সংঘের নাট্যোৎসব (১৯৭৮-৭৯) ৩য় ভৌমিক বাড়ীর মাঠে (কোর্টের পাশে)। এই নাট্যোৎসবে অভিনীত হয় যাত্রিকের 'গঙ্গা তুমি বইছো কেন', নাট্যায়নের সত্যি ভূতের গল্প, ক্যালকাটা গ্রুপথিয়েটারের 'গুমটি ঘর' ও প্রত্যয়ের শিশু নাটক আবার রাজা হব। নাট্যোৎসবে সংগৃহীত অর্থ বন্যাত্রাণে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এরপর ১৯৮১ সালেও মিলন সংঘ আবার নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে অভিনীত হয় মিলন সংঘ কর্তৃক চাকভাঙা মধু (মনোজ মিত্র) ও কলকাতার 'সায়ক' কর্তৃক 'দুই হুঁজুরের গপ্পো'।

বারুইপুর পদ্মপুকুর (বেলতলা) ও কোর্টের মাঠের গ্রামীণ কৃষি মেলায় (আনুমানিক আশির দশকের শুরু থেকে এই মেলার সূচনা) প্রতিবছর নাটক অভিনয় হয়েছে। এখন সীতাকুণ্ডু গ্রামীণ কৃষি মেলায় ও নাটক অভিনয় হয়।

রামনগর 'কৈলাশ ভবনে' সুশীল স্মৃতি নাট্যোৎসব হয় ১৯৮০ সালে। এই উৎসবে অভিনীত নাটক যথাক্রমে 'আমরা কজন' (হরিনাভি) কর্তৃক 'সাজানো বাগান' (মনোজ মিত্র), এষণা (জয়নগর) কর্তৃক 'কয়েটি স্বপ্ন কয়েকটি মুক্ত (সুভাষ বসু) এবং উৎসব কমিটি কর্তৃক 'চাকভাঙা মধু' (মনোজ মিত্র) উৎসব কমিটির এই নাটক যৌথভাবে পরিচালনা করেন প্রশান্ত সরকার ও রথীন দেব। অভিনয়ে প্রশান্ত সরকার, রথীন দেব, সলিল ঘোষ, কালাম সেখ, মুরারী ঘোষ, হিমাংশু সরকার ও মধুমালতী চ্যাটার্জী।

রামনগর কর্মী সংঘ রামনগর 'কৈলাস ভবনে' প্রায় প্রতিবছর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ দিন ধরে প্রতিযোগিতা চলে এবং নাটক দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এখানে রামনগর 'নেতাজী সঙ্ঘ' ও কয়েক বছর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা করে।

মিলন সংঘের (বারুইপুর) উদ্যোগে বারুইপুর পিপলস্ থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৮৩ থেকে ৮৫ পর্যন্ত এই এ্যাসোসিয়েশানের ব্যানারে অনেক নাটক অভিনীত হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মদারাট তরুণ সঙ্ঘ, তির্যক, বন্ধু সংঘ, মিলন সংঘ, শরৎ স্মৃতি সংঘ প্রভৃতি নাট্যসংস্থা। মিলন সংঘ অভিনয় করে গাব্বু খেলা, আলিবাবার পাঁচালী, ফুলওয়ালি। তরুণ সংঘ অভিনয় করে রাইফেল ও দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। বন্ধু সংঘ অভিনয় করে ঝিনুকে মুক্ত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, টিনের তলোয়ার।

বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যানুষ্ঠান ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বিগত আশির দশক থেকে হয়ে আসছে।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৩ সালে বারুইপুর বড়কুঠি প্রাঙ্গণে (বর্তমান নিউ ইন্ডিয়ান গ্রাউন্ডের

পাশে) 'পঞ্চক' মঞ্চ উদ্বোধন হয়। পাঁচজনে মিলে এই নাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন শিবদাস ভট্টাচার্য, প্রিয়ঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গণেশ রায়চৌধুরী, রাইমোহন নস্কর ও বিপ্লব ভট্টাচার্য। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন প্রখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধন করেন নাট্যকার মন্মথ রায় এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন সজল রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, সুশীলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তারপর থেকে এই মঞ্চে বেশ কিছুকাল নাটক অভিনয় হয়েছে। বর্তমানে এই 'মঞ্চ' অস্তিত্বহীন।

ভট্টাচার্যপাড়া (বারুইপুর) রক্ষী বাহিনীর নাট্য প্রযোজনা (১৯৮৫–৮৬) শ্রীমতী ভয়ঙ্করী। পরিচালক শিবদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে শিবদাস ভট্টাচার্য, সুনীল চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ রায়বর্মন, কল্যান দাস, অরুণ ভট্টাচার্য, মায়া (দীপালি) রায়চৌধুরী (ভয়ঙ্করী) , শিপ্রা চক্রবর্তী প্রভৃতি। অভিনয় হয় নিউ ইণ্ডিয়ান মাঠে।

বারুইপুরের শিল্পী সমন্বয়ে জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটক ' শো-হাউস' সিনেমা হলে অভিনীত হয় (১৯৬৭-৬৮)। পরিচালনা করেন কৃষ্ণ রায়বর্মন এবং তাঁকে ,সাহায্য করেন প্রশান্ত সরকার। অভিনয় করেন কৃষ্ণ রায়বর্মন, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, রবীন মাহাতা, নির্মল চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত সরকার।

লোকসভা, বিধানসভা, মিউনিসিপ্যালিটি পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হয়।

বারুইপুর অমৃতলাল কলেজ প্রাঙ্গণে শিল্প মেলায় প্রতিবছর নাটক অভিনীত হয়। বারুইপুরের বিভিন্ন নাট্য সংস্থা ও জেলারও কোন কোন নাট্যসংস্থা এই মেলার নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

দক্ষিন দুর্গাপুর 'উদয়ণ সংঘের' পরিচালনায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে।

ফ্রেন্ডস্ ইউনিট (মদারাট) এর পরিচালনায় প্রতিবছর সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ৫ থেকে ৭ দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলে।

বারুইপুর পৌরসভার উদ্যোগে বারুইপুরের বিভিন্ন থিয়েটার সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত দুর্গাদাস জন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক দুর্গাদাস জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৫, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩ 'রবীন্দ্রভবন' পেক্ষাগৃহে 'দুর্গাদাস মঞ্চে' । এই অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়েছিল 'দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘ' কর্তৃক 'তবুও প্রত্যয় 'আছে ; গণনাট্যসংঘ বারুইপুর শাখা কতৃক চুক্তিপত্র', সোনালী সংঘ কর্তৃক ' কেয়াকুঞ্জ' , বারুইপুর 'শিল্পবৃন্দ' কর্তৃক 'কথা কাঞ্চনমালা' (প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর) তারপর বারুইপুর মিলন সংঘের 'সকাল হয়ে এল' থিয়েটার পয়েন্টের ' ছোটদের আলিবাবা', লিটিল স্টার ড্রামা ইউনিটের 'র‍্যাগিং' , বন্ধু সঙ্ঘের (বারুইপুর) সাজাহান (অংশ), দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। ২০ ডিসেম্বর অভিনীত হয় বারুইপুর আর্ট থিয়েটারের 'আতঙ্ক'।

মহান নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখটের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলা নাট্য উৎসব হয় ২৮ শে জুন থেকে ৪ জুলাই ১৯৯১ বারুইপুর 'রবীন্দ্রভবনে'। নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন যশস্বী নট ও পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

বারুইপুর মিলন সংঘের পরিচালনায় সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয় ২০০০ সালে মদারাট পপুলার আকাডেমী প্রাঙ্গনে 'ক্ষীরোদ প্রসাদ উন্মুক্ত মঞ্চ'-এ। সপ্তাহ ব্যাপী চলে এই প্রতিযোগিতা।

রামনগর 'কেলাশ ভবনে' প্রশান্ত সরকার স্মৃতি (২০০০–০১) এবং তিমির আদিত্য স্মৃতি (২০০২ এ) সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন স্বাদের নাটক অভিনীত হয়। এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে নাট্য বিষয়ে 'সেমিনার'-র আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রশান্ত সরকার স্মৃতি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল রামনগর কর্মী সংঘ। এই প্রশান্ত সরকার ছিলেন রামনগরের বিশিষ্ট নট ও পরিচালক। তিমির আদিত্য ছিলেন নাট্যকর্মী, সমাজসেবী ও পঞ্চায়েত প্রধান (রামনগর ২নং)

বারুইপুর 'পেয়ারা উৎসব' শুরু হয়েছে ২০০২ সাল থেকে। এই উৎসবেও নাটক অভিনীত হয়। বারুইপুরের বিভিন্ন নাট্য গোষ্ঠী একানে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৮৯ সালে সফদর হাশমির মৃত্যুর পর ১২ই এপ্রিল তাঁর জন্ম দিনটিতে 'পথ নাটক 'দিবস' পালন করে আসা হচ্ছে সারা দেশে ১৯৮৯ সাল থেকেই। বারুইপুরেও প্রতিবছর এই ১২ এপ্রিল দিনটিতে 'পথ নাটক দিবস' পালন করা হচ্ছে। স্থানীয় বিভিন্ন নাট্যগৌষ্ঠী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে 'পথনাটক' পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক গণনাট্যসংঘ। বারুইপুর শাখা।

বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৫ সালে বারুইপুরের আর্ট থিয়েটার নাট্যোৎসবের আয়োজন করে নিউইন্ডিয়ান গ্রাউন্ডে। এখানে অভিনীত হয় কলকতার 'সায়কের' জনপ্রিয় নাটক 'দায়বদ্ধ' ও আর্ট থিয়েটারের 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' এবং 'সংস্তবের' (কলকাতা) একটি সফল নাটক 'মুষ্টিযোগ'। অনুষ্ঠান হয়েছিল তিন দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত জেলা বইমেলায় (বারুইপুরে ১৯৯৭ সালে) এবং বারুইপুর বুক লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বইমেলায় নাটক অভিনয় হয়। বারুইপুর 'বুকলাভার্স এ্যাসোসিয়েশনের 'বইমেলা শুরু হয় ১৯৯৮ সাল থেকে। অভিনীত নাটক যথাক্রমে ঃ কৃষ্টিসংসদ (সোনারপুর) এর 'দূরবীণ', কলকাতার সংস্তরের 'ভূত' রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্লেমেকার্স (কলকাতা) এর 'বিপন্ন বিস্ময়' রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সমীক্ষণ (কলকাতা) এর 'তোতারাম' রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া বারুইপুরের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিবছর এই মেলায় তাদের প্রযোজিত নাটক উপস্থাপনা করে থাকে।

বারুইপুরের ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ উৎসবে ডাকবাংলো মাঠে কোন কোন বছর নাটক অভিনয়

হয়। ১৯৯৮ সালে অভিনীত হয় হোমিওপ্যাথি, ১৯৯৯ সালে হয় 'মুক্তির উপায়' এবং ২০০০ সালে হয় 'বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রোঁ' । পরিচালনা করেন দীপক মিত্র। অভিনয়ে পূর্ণেন্দু ভৌমিক, সুকুমার ঘোষ, স্বরাজ রায়চৌধুরী, রূপালী দত্ত প্রভৃতি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বারুইপুর শাখার ৪০ বৎসর পূর্তি উৎসব হয় জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে এবং ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব হয় সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে, ডাক বাংলোর মাঠে। এই উভয় পূর্তি উৎসবেই নাটক অভিনয় হয়। ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবে অভিনীত হয় গণনাট্য সংঘ, বারুইপুর শাখার 'রাজেন্দ্র ঢাকীর গল্প'। এবং গড়িয়ার লোক ও শিল্পী শাখার 'গ্রাউন্ড জিরো'।

সুভাষগ্রাম, কোদালিয়ার 'সময়' নাট্যগোষ্ঠী ১৯৯৩ সাল থেকে বারুইপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউটের মঞ্চে' নিয়মিত নাট্যাভিনয় করে। বেশ কয়েকবছর তাঁরা এই প্রচেষ্টা চালান। প্রযোজনা যথাক্রমে সন্ধ্যা সকাল, আপনজন, মানুষ এবং মানুষ। নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন রতীন চক্রবর্তী। অভিনয়েঃ রতীন চক্রবর্তী, দিলীপ দাস, রতীন গোস্বামী, জয়ন্ত সোম, সুব্রত তলাপাত্র, সপ্না চক্রবর্তী, পিয়াসা চক্রবর্তী (শিশু), শুভ্রা দাস, পুরুশোত্তম হালদার, আনন্দ মণ্ডল।

বারুইপুরে নাট্যাভিনয়ের জন্য মঞ্চ ঃ

সাধারণত বারুইপুরে নাট্যাভিনয় হত এবং এখনও হয়ে আসছে স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের মঞ্চেই। স্থায়ী মঞ্চ বলতে যেমন স্থাপিত ছিল ধপধপিতে দত্ত বাড়ীর মঞ্চ, মদারাটে মুখার্জী বাড়ীর মঞ্চ , বারুইপুরে রায়চৌধুরী বাড়ির 'রাজবল্লভ মঞ্চ' ও নিউইন্ডিয়ান গ্রাউন্ডের পাশে 'পঞ্চক' (স্থাপিত ১৯৭৩)। বর্তমানে এই মঞ্চগুলি অস্তিত্বহীন। এছাড়া অভিনয় হত 'শো হাউস' ও মিলন সিনেমায়।

পরবর্তীকালে সত্তরের দশকের শেষের দিকে তৈরী হয় 'রবীন্দ্র ভবন'। তখন পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ললিতমোহন রায়চৌধুরী। মদারাট পপুলার একাডেমী প্রাঙ্গণে 'ক্ষীরোদ প্রসাদ উন্মুক্ত মঞ্চ' স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালে নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ স্মরণে। মদারাট স্কুলের ট্রাস্ট্রী ভূধর মুখার্জীর জামাই ছিলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। বারুইপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সইটিটিউটে (পদ্মপুকুর) একটি 'মঞ্চ' স্থাপিত আছে। এই সব মঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি বারুইপুর ডাকবাংলো মাঠ, রামনগর 'কৈলাস ভবন', ভৌমিকবাড়ির মাঠ (কোর্টের পাশে), পুরাতন বাজারে 'নতুনবাড়ির মাঠ', নিউইন্ডিয়ান মাঠ, বারুইপুর স্টেশনের পাশে 'রেল ময়দান' (ক্ষিরিশতলা) প্রভৃতি স্থানে (অস্থায়ী) 'মঞ্চ' তৈরী করে বেশির ভাগ নাটকই অভিনীত হয়।

বারুইপুরে একটিমাত্র নাট্য পত্রিকা 'কৃষ্টিমন' প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। পত্রিকার সম্পাদক রথীনদেব , কার্যনির্বাহী সম্পাদক গোপেশ পাল এবং সভাপতি রামরমণ ভট্টাচার্য।

বারুইপুরের এই একশ বছরের 'নাট্যচর্চা' পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে পঞ্চাশের

দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন নাট্য সংস্থার জন্ম হয়েছে। সেই সঙ্গে পুরানো সংস্থা গুলি থেকেছে ক্রিয়াশীল। ফলে এই সময়েই বারুইপুরের নাট্যচর্চায় এসেছিল জোয়ার। কিন্তু তারপর থেকে এই একবিংশ শতকের শুরু পর্য্যন্ত নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভাঁটার চান লক্ষ্য করা যায়।

দেশের এই আর্থ সামাজিক অবস্থায় থিয়েটার পেট ভরায় না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির জন্য সামাজিক কাঠমোর দ্রুত পরিবর্তন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রভাব এবং বিশ্বায়ন সে জন্য কতখানি দায়ী তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ, নাটক জীবন্ত শিল্পকলা যা কিনা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার সহায়ক সুস্থ সংস্কৃতির বিনিময়ে। অপরদিকে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও ফিল্মে সম্প্রচারিত ব্যবসায়ীদের কুরুচিকর সংস্কৃতি সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করে। সুতরাং এই নাট্যশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে তার অগ্রগতি ঘটানো একান্তভাবে জরুরী।

থিয়েটার বা নাটকের সঙ্গে যুক্ত বারুইপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদের ভিত্তিতে বারুইপুরের থিয়েটার বা নাট্যচর্চার একটা রূপরেখা উপস্থাপনা করা সম্ভব হল এই নিবন্ধে। আমার এই সংগ্রহের মধ্যে কোন নাট্যপ্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় অথবা কোন নাট্যশিল্পীর কথা যদি না উঠে এসে থাকে আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত। তবে তাঁরা যদি যোগাযোগ করেন তাঁদের কথা এই নিবন্ধে পরবর্তী পর্যায়ে সংযোজন করে নেব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রাধাকান্ত দত্ত (জাদুদা), হেমেন মজুমদার, বেনীমাধব ভট্টাচার্য, গুরুদাস দত্ত, প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী, স্বরাজ রায়চৌধুরী, সুকুমার ঘোষ, সমর দাস, শৈলেন দাস, দীপক মিত্র, শিশির চ্যাটার্জী, শিবদাস ভট্টাচার্য, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, কৃষ্ণ রায়বর্মণ, গোপেশ পাল, শান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীণ মুখার্জী, শ্যামল বসু, অসিত সরকার, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় দি লীপ সরকার, দিলীপ দাস এবং মনোরঞ্জন পুরকাইত।

এছাড়া সাহায্য নিয়েছি ঃ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ২০০০ (জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা) , স্মারক পত্রিকা ১৯৯৩ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বারুইপুর শাখা) নাট্যচিন্তা (১৯৯১) ও 'কৃষ্টিমন' পত্রিকা (বারুইপুর)।

বারুইপুরের যাত্রাপালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

বীরেন্দ্রকুমার

যাত্রা বাংলার সংস্কৃতিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার আছে। জনশ্রুতি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম যাত্রাপালা/ গানের সূচনা করেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণের গুনকীর্ত্তন একই গায়কের মুখে শ্রুতিমধুর লাগতো না। তাই বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন লোককে সাজিয়ে পদকীর্ত্তন পরিবেশন করতে লাগলেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলানাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন- 'যাত্রাপালা উৎসব উপলক্ষে যে নাট্যগীতের অনুষ্ঠান হইত তাহাই যাত্রা বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে।' যাত্রা শব্দের উৎপত্তি (যা+এ+ভাবে অপে) সুতরাং যাত্রা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ গমন করা বা প্রস্থান করা।

যাত্রাপালাগান শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জন বা বিনোদনের জন্য নয়। শ্রীরমকৃষ্ণদেবের কথায় যাত্রাপালা লোকসংস্কৃতি, লোকশিক্ষা ও মহামিলনের পরিমণ্ডল বলে বিবেচিত হয়েছে। যুগে যুগে যাত্রাপালা বিবর্তনশীল, প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে বিনোদনের উপকরণ হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে আসছে।

যাত্রাপালা লোকরঞ্জন বিনোদন ও লোকলিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। বাংলার ঘরে ঘরে ঘোষিত হয়েছে যাত্রাপালার জয়গান। ১৫৪২ সালে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে উল্লেখ আছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব যে যাত্রাপালার দল করেছিলেন মহাপ্রভু নিজে প্রথমে রুক্মিনী পরে আদ্যাশক্তির শ্রী রাধিকার ভূমিকায় পরে আবার শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেন।

যাত্রাশিল্পের পালাগান চারিদিক ঘুরে ঘুরে মানুষকে শোনানো হয়। যাত্রাগানে থাকে জীবন্ত যন্ত্রসঙ্গীত, বিবেকের সুকণ্ঠ, নৃত্য-সঙ্গীত, পোষাক ও পরিচ্ছদের ঘটা, আলোর কারুকার্য সংলাপ বলা গতি ও গতিময় ছন্দ। তাই অন্যান বিনোদনের চেয়ে যাত্রাপালা একটু আলাদা তারতম্য পূর্ণ।

একদিন এই যাত্রা শিল্প, যাত্রা অপেরা ছিল গ্রামবাংলা ও বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত ভারতের কোটি কোটি মানুষের শুধু লোকশিক্ষার বিনোদন নয় এই শিল্প ছিল কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মহামিলনের অঙ্গন।

বারুইপুর লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বারুইপুরের গ্রামে গ্রামে এবং শহরতলীতে একসময় বিনোদনের মাধ্যম ছিল যাত্রা। শুধু বিনোদন নয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে যাত্রাপালা মানুষের সাথে মানুষের একাত্মতা তৈরী করতে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত যাত্রাপালা নিটোল সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

এই লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে আমরা কিছু প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তির স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি এবং

হচ্ছি।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯০৭ সালে রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা - কিরণ শশী দেবী।

বারুইপুরের সুস্থ সংস্কৃতির পথ প্রদর্শক, কবি - সাহিত্যিক সর্ব শ্রেষ্ঠ সঙ্গাত ও যাত্রাপালাকার ও যুগান্ত বিপ্লবী পার্টির সদস্য, স্বদেশীকতার প্রবক্তা স্বাধীনতা সংগ্রামী সৌরীন্দ্রমোহন আধুনিক যাত্রাপালাকার হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। পেশায় তিনি ছিলেন শিক্ষক। গোবিন্দপুর ও বারুইপুর হাইস্কুলের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রামনগরের সুশীল ঘোষের অনুরোধে প্রতাপাদিত্য নাটকে 'কল্যানী' স্ত্রীচরিত্রে ও ডি.এল.রায়ের চন্দ্রগুপ্তের এন্টিগোনাস, এবং শ্রীকৃষ্ণমধ্ধ যাত্রায় দুর্যোধন রূপে অবতীর্ন হয়ে যাত্রামোদী দর্শকদের হৃদয় জয় করেন। তিনি চিৎপুর যাত্রাপাড়ায় বিভিন্ন দলে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

তিনি মোহন ভাণ্ডারী অপেরার জন্য প্রথম পৌরানিক পালা রচনা করলেন ধর্মবল, মহিষাসুর পরে রক্তবীজ, ব্যথার পূজা, চক্রছায়া, আত্মাহুতি। রঞ্জন ও সত্যম্বর অপেরার জন্য বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক পালা রচনা করেন যেমন - পলাশীর পরে, মীরকাশিম, রাজারামমোহন প্রভৃতি। কাল্পনীক ও সামাজীক যাত্রাপালা নতুন জীবন, এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের ক্লাসিক উপনাস্যের তিনি যাত্রাপালার রূপ দিয়েছিলেন যেমন রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল। পশ্চিবঙ্গ সবকার ও পশ্চিমবঙ্গ যাত্রাসম্মেলনে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রষ্ঠা যুগ প্রবর্তক পালাকার কবি হিসাবে সম্বর্ধনা পান।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ঃ- বাংলা নাটক বা যাত্রাপালার ধারক বা বাহক যাঁরা আছেন তাদের মধ্যে পালাসম্রাট প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ সেকথা বাঙালী মাত্রেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। বাংলা ১৩৩৬ সালের ১৯শে ফাল্গুন বারুইপুরের শাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারে সীমাহীন দারিদ্র এবং পিতার সামান্য রোজগারের ফলে উচ্চশিক্ষা সম্ভব হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা ও নাটকের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল অপরিসীম। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ হওয়ার জন্য যাত্রাজগতে প্রবেশ করেছিলেন অতি সহজে। ১৪ বৎসর বয়সে তার নাট্যচর্চা শুরু। এই সময় তিনি নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং ছদ্মনামে নাটক রচনা আরম্ভ করেন। সৌরীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে নাটকের সংলাপ ও গান রচনার পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। অন্য আর এক শিক্ষক রণজিৎ কুমার মজুমদার তাকে আর্শীবাদ ও অনুপ্রেরনা দেন। নাটকে এবং যাত্রাপালায় কত রকমের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেই দৃশ্যমান জীবন্ত চরিত্রগুলি সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে জীবনের উত্থান-পতন, ভয়ংকর অথবা রোমান্টিক বিচিত্র চিত্রনে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীল ভাবে বলার আর্টকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তার নাট্যরচনা সম্ভার রস সমৃদ্ধ স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, যা এক কথায় ক্লাসিক সৃষ্টি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য শুধু বারুইপুর বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার নয় বাংলা সাহিত্যের গর্ব। প্রায় ১৫০০ টি যাত্রাপালা এবং ১০০ টির

বেশী নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পালাকার শ্রী প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এমন কিছু কিছু দেশাত্মবোধক যাত্রা পালা রচনা করেছিলেন, সেগুলি দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক। সেই জন্যই ভারত সরকার তাঁকে শ্রেষ্ঠ পালাকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ইংরাজী ১৯৮৬ সালে সিরাজদৌল্লা পালা রচনার জন্য বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতির পক্ষে বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম মহাশয় প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ পালাকার হিসাবে 'নটরাজ পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে পরপর দুবছর কলকাতা রবীন্দ্রকানন যাত্রা উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মানে ভূষিত করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি : রামায়ণের আগে - ১৯৫৯, নরনারায়ণ - ১৯৭৮, ক্ষুধা ১৯৭০, মহিষমর্দিনী - ১৯৭৯, কুরুক্ষেত্রের কান্না - ১৯৫৯, সারথি থামাও রথ - ১৯৮৪, বন্দিনী সীতা - ১৯৮৪, মহাসতী দ্রৌপদী - ১৯৭৬, ভক্ত ও ভগবান - ১৯৬২, ভক্ত ধ্রুব - ১৯৭৫, পূজারী দানব ১৯৮১, গঙ্গার পুত্র ভীষ্ম - ১৯৭১, থামাও অগ্নিযুদ্ধ - ১৯৭৬, নরকের ভগবান ১৯৯২, সম্রাট বৃত্রাসুর - ১৯৮০, জননী কৈকেয়ী ১৯৭৮, গান্ধারী জননী ১৯৭৯, বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ - ১৯৮৫, বিদ্রোহী ভগবান - ১৯৮৪, বিদ্রোহী অভিমন্যু - ১৯৮৫, থামাও ধ্বংসযুদ্ধ - ১৯৭৭, কুরুক্ষেত্রে কাঁদে - ১৯৯৪, জয়দেবীচামুণ্ডা - ১৯৯৪, অভিশপ্ত অযোধ্যা - ১৯৮৪, সত্যের সিংহাসন - ১৯৮৪, ভক্তিমূলক শ্রীকৃষ্ণ নিমাই - ১৯৮৩, লক্ষ হীরা - ১৯৮০, দেবী বিপত্তারিণী - ১৯৮২, রক্তাক্ত মন্দির - ১৯৭৪, মায়ের পায়ে রক্তজবা ১৯৮৭, বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ ১৯৯০, মসনদ কার? ১৯৫৭, প্রথম পানিপথ ১৯৫৮, বালাজী বাজীরাও - ১৯৬০, সূর্যতারণ - ১৯৫৯, রোহিলা ফৌজ - ১৯৬৩, শেষ অংক - ১৯৫৯, বাঁশের কেল্লা - ১৯৬১, কে দেবে জবাব? - ১৯৬২, বিদ্রোহী বান্দা - ১৯৬৩, রক্ত দিয়ে কিনলাম - ১৯৬৩, ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা - ১৯৬২, স্বপ্ন সমাধি - ১৯৬৩, নেভাও আগুন - ১৯৬৩, রক্ত পলাশ - ১৯৬২, মল্লাদের দরবার - ১৯৬৪, রক্তে রাঙা মসনদ - ১৯৬২, রক্তাক্ত মসনদ - ১৯৬২, সাহারার কান্না ১৯৬০, পূজা ও নমাজ - ১৯৮০, সেলাম শহীদ - ১৯৬৩, শয়তান - ১৯৬৪, মোগলহাটের সন্ধ্যা - ১৯৬২, জলদস্যু - ১৯৬৩, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত - ১৯৬১, রোশনী মহল - ১৯৬৬, অশান্ত ঘূর্ণি - ১৯৬৭, একফোঁটা রক্ত - ১৯৬৭, অভিশপ্ত হারেম - ১৯৬০, হারেমের কান্না - ১৯৬০, সম্রাট ও সতী - ১৯৮০, কেন এই রক্তপাত? - ১৯৮০, রাজা বিক্রমাদিত্য - ১৯৮৪, মহব্বতের ইনাম - ১৯৮৫, বেহেস্তের ফুল - ১৯৮২, কালাশের - ১৯৮১, ভুখা তলোয়ার - ১৯৯২, শাহী লুটেরা - ১৯৯৩, বারুদ নিয়ে খেলা - ১৯৭২, সেলাম দিল্লীর মসন্দ - ১৯৯১, ওমর খৈয়াম - ১৯৮৯, প্রেয়সী আনারকলি - ১৯৮৪, থামাও রক্তপাত - ১৯৭৬, শাহাজাদীর তরবারি - ১৯৮১, সিরাজদ্দৌলা - ১৯৮৬, সন্ন্যাসী শাহাজাদা - ১৯৮৬, আমার হাতিয়ার - ১৯৭৬, কবরের নীচে - ১৯৭৫, লাল রাজপথ - ১৯৬৬, রক্তাক্ত নূপুর - ১৮৭০, সোনারকেল্লা - ১৯৭৩, সেলাম চিতোর - ১৯৮৬, মালিম সিংহের মাঠ - ১৯৬৫, রক্তরাগ - ১৯৭০, শিসমহল - ১৯৭১,

ফেরারী বাদশা - ১৯৬৯, অনেক রক্ত মাড়িয়ে - ১৯৬৪, রক্তে রাঙা গোলাপবাগ - ১৯৬২, জল্লাদের চোখে জল - ১৯৯৫, রক্তলোভী কসাই - ১৯৯৬, রিক্তানদীর বাঁধ - ১৯৯৯, দীপ চায় শিখা - ১৯৬০, কাঁকনতলার মেয়ে - ১৯৬২, সীমান্তের বলি - ১৯৫৯, বিদায় সন্ধ্যা - ১৯৬০, রক্তের ঋণ ১৯৬০, রক্তাক্ত উদয়গড় - ১৯৬৪, রক্তমাখা প্রভাত - ১৯৬২, কালবৈশাখী - ১৯৬৫, মানুষ কেন কাঁদে? - ১৯৮০, ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম - ১৯৬০, ৪২-এর বিপ্লব - ১৯৭৬, ১৩৫০ ১৯৭৭ রক্তাক্ত বিপ্লব - ১৯৬২, কালীনাথের সংসার - ১৯৬২, রিকসাওয়ালা - ১৯৬১, মেজদি - ১৯৮০, হেডমাস্টার ১৯৬৯, পৃথিবীর পাঠশালা ১৯৮০, সাহেব - ১৯৮২, পেটের জ্বালা - ১৯৭২, যৌতুক - ১৯৭৩, কুমারী মায়ের কান্না - ১৯৯২, লাঞ্ছিতা - ১৯৮১, অন্ধকারে সূর্য - ১৯৮২, সোনার প্রতিমা - ১৯৮৩, কলংকিনী - ১৯৭৩, স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র - ১৯৮৯, অহল্যার ঘুম ভাঙছে - ১৯৮৮, বাসরে বিধবাবধূ - ১৯৮৫, একপয়সার সিঁদুর - ১৯৮৬, সতী সীমন্তিনী - ১৯৭৪, নাগরদোলা - ১৯৬০, স্বামী খুনের বদরলাচাই - ১৯৯৩, আনন্দ আশ্রম - ১৯৮৪, কাঁদিতে জনম গেল - ১৯৭৪, কাঞ্চনকন্যা - ১৯৭৫, শ্যামলী - ১৯৭৫, মহুয়া বসন্ত - ১৯৭৮, বিধবার গায়েহলুদ - ১৯৯৩, মানুষ পেলাম না - ১৯৭৯, এযুগের সাবিত্রী - ১৯৮০, রঙ্গা বিল্লার ফাঁসী - ১৯৮৩, অভিমান - ১৯৮৬, বোবা কান্না - ১৯৮৭, একফোঁটা অশ্রু - ১৯৭২, সাধু শয়তান - ১৯৬৫, সুরা নারী নিয়তি - ১৯৭০, নীড় ভাঙার ঝড় - ১৯৭২, আমি যারে চাই - ১৯৬৪, সূর্য্য আলো দাও - ১৯৬৫, রাজাসাহেব - ১৯৮০, বঙ্গিনীবধূ - ১৯৮১, কথার দাম - ১৯৮০, সোনাডাঙার মেয়ে - ১৯৭২, সধবার পাকাদেখা - ১৯৯০, দেবদাস (নাট্যরূপ) - ১৯৯০, নীল আকাশের নীচে - ১৯৭৫, রক্তে বোনা ধান, ক্ষুধার জ্বালা, এ্যাটম বোমা, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, আমি শিক্ষিত হতে চাই না, রামদার রেস্টুরেন্ট, শরীক, রক্তপিপাসু হায়না, জানোয়ার, ওয়াগান ব্রেকার, ব্লাক মার্কেট, পথের ছেলে, দেশের শত্রু, দেশদ্রোহী, নিষ্পাপ খুনী, বেকার কেন মরে?, পরাজিত নায়ক, বন্দী বিচারক, মহাজনের মেয়ে।

<u>যাত্রাপালার পেশাদারী অভিনেতাগন</u>

পালান নস্কর ঃ- আজ থেকে ৮৬ বৎসর আগে অর্থাৎ বাংলা ১৩২৪ সনের ভাদ্রমাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপরের গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পল্লিগ্রামের অতিসাধারন পরিবারে লেখাপড়ার করার সুযোগ ছিলনা, তাই ১০/১২ বৎসর বয়সে তৎকালিন পেশাদারী অভিনেতা দুর্গাপুরের বাগদার হরেন মুখার্জীর হাত ধরে কতকাতায় চিৎপুরে অরুন অপেরায় প্রথম হাতেখড়ি হয়। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময় নাচ গানের চলছিল। প্রথমে সখী সেজে নাচগানের মধ্যে যাত্রা জয়যাত্রা শুরু করেন পালান নস্কর। ধীরে ধীরে পাকাপাকি ভাবে পেশাদারী যাত্রার দলে স্থান করে নেয় গনেশ, নবরঞ্জন, বীনাপানী অপেরায় সিরাজদ্দৌলা পালায় নবাবহিসাবে তার অভিনয় আজো বাংলার মানুষের মনে গাঁথা আছে। তিনি ১৫০০টির বেশি পালায় অভিনয় করেন। তিনি নিজের গ্রামে ও বারুইপুরের বহু এ্যামেচার ক্লাবে যাত্রার নির্দেশনা দেন।

<u>বিষানেন্দু হালদার</u> ঃ- কাঁঠাল বেড়িয়া গ্রামে বাংলা ১৩৬ সনে ১২ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সুজিৎ পাঠকের হাত ধরে চিৎপুরের প্রভাষ অপেরা প্রথম স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় সুরুকরেন। সেই সময় যাত্রাপালায় পুরুষরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করতেন। বিষানবাবুর মহিলার চরিত্রে অভিনয় আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। বহু পেশাদার দলে দীর্ঘদিন যাবৎ অভিনয় করেন।

গোলাপ হালদার ঃ- বারুইপুরের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ১৩৫৩ সনে ধোপাগাছিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় আজো মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। বিশেষ করে খলনায়ক চরিত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। শ্রী গোপাল নাট্য কোম্পানী নামে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। এই দলে অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবী সহ চলচিত্রে বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করেন।

এছাড়া যাঁরা পেশাদারী যাত্রাদলে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন ঃ- অশোক মণ্ডল, প্রদীপ দত্ত, রঞ্জন কুমার, পঞ্চানন সন্নদার, শিশির চ্যাটার্জী, রাজীব মুখার্জী, প্রদীপ মিত্র, প্রাণতোষ রায়, বিজয় হালদার, বুদ্ধদেব মণ্ডল, তপন সরদার, জলদ কুমার, মেঘনাদ মণ্ডল, লোকনাথ মণ্ডল, বাবলু নস্কর, প্রভাত চক্রবর্তী, প্রবীর হালদার, রাইমোহন নস্কর, সন্দীপন বর্মন, ও বীরেন্দ্রকুমার প্রমুখ।

পেশাদারী মহিলা শিল্পী ঃ- বর্ণালী ব্যানার্জী, বীনা দাস, জ্যোৎস্না হাজরা, চৈতালী গোস্বামী, মল্লিকা চ্যাটার্জী, দীপ্তি বর্মন, রীতা ভট্টাচার্য, উষারানী হালদার ও রীতা রায়চৌধুরী প্রমুখ

বারুইপুরের এ্যামেচার অভিনেতারা ঃ- পালান মণ্ডল, রণজিৎ চ্যাটার্জী, অজিত হালদার (ঘোতন), প্রদীপ মুখার্জী, অনিল সাঁফুই, ভোলা ব্যানার্জী, অসিত গড়গড়ি, অসিত গড়গড়ি, চনীলাল পুরকাইত, দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়, প্রতাপ মণ্ডল, স্বপন দাস, কুমার দীপঙ্কর, তরুন মুখার্জী (গোরা)।

বারুইপুরের বিশিষ্ট অভিনেতাদের নাম ঃ- দুলাল পুরকাইত, রঞ্জন পুরকাইত, রথীন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ রাহা, দীপক মিত্র, রঞ্জন নস্কর, মদন পুজারী, কনক নস্কর, স্বপন নস্কর, অজয় মণ্ডল, গুরুপদ হালদার, দিলীপ কর্মকার, মিলন মৈত্র, স্বরাজ রায়চৌধুরী, সদানন্দ মুখার্জী, নিরঞ্জন মণ্ডল, জয়ন্ত মণ্ডল, গৌতম নস্কর, শম্ভু গায়েন, নিমাই মণ্ডল, গোবিন্দ মণ্ডল, শুভঙ্কর নস্ক", দীবাকর নস্কর, স্বপন মণ্ডল, রাজু পুরকাইত, পালান সরদার, রবীন্দ্রনাথ নস্কর, কালীপদ নস্কর, সুকুমার নস্কর, স্বপন চক্রবর্ত্তী, রাধারমন দাস, সুবল মণ্ডল, সুধীর সাঁফুই।

কিছু বিশিষ্ট অভিনেত্রীদের নাম ঃ- বীনা দাস, সন্ধ্যা দে, রীতা হালদার, পদ্মা মণ্ডল, শ্রাবনী পাত্র, বাসন্তী তরফদার, অঞ্জু ভট্টাচার্য্য, অনিমা চ্যাটার্জী, ললিতা মণ্ডল, ঊষা চক্রবর্ত্তী, লক্ষী দাস, দ্বীপ্তি বর্মন, আশা হালদার, রেণুকা শাসমল, শ্রীপর্ণা সরকার।

বারুইপুর থানার অন্তর্ভুক্ত কিছু এ্যামেচার যাত্রাদল ঃ- রামনগর - বারুইপুর - বসন্ত স্মৃতি সংঘ, রামনগর - বারুইপুর - ইউনিক থিয়েটার , টগরবেড়িয়া - বারুইপুর - বিশালাক্ষী যাত্রা ইউনিট, দক্ষিণ দুর্গাপুর শিল্পী মহল, শসাড়ী যুব জাগরণ নাট্যসংস্থা, নিউতারা মা অপেরা - ধনবেড়িয়া, মনসা যাত্রা ইউনিট - ইন্দ্রপালা, নিউ তরুণ নাট্য সংস্থা - ধোপাগাছি, রক্ষাকালী নাট্য সমাজ - বিড়াল, নাট্যচক্র শিবানী পীঠ, বিবিমাতা যাত্রা ইউনিট-দক্ষিণ কল্যান পুর

নবজাগরন নাট্য লোক - গোহাল বেড়িয়া, যশোদা নাট্য কোম্পানী - আটঘরা - মদারাট, শ্রী শ্রী মনসা নাট্য সমাজ - মল্লিকপুর, নারায়নী নাট্য সংস্থা - চন্দনপুকুর, যুগবানী যাত্রা ইউনিট - মধ্য কল্যানপুর, রক্ষাকালী মাতা নাট্য সমাজ - শিবসুতি শাসন, নিউ বিবিমাতা নাট্য সংস্থা - বলবন - ফুলতলা, কালীমাতা যাত্রা ইউনিট - শিখর বালী ১নং, জাগরনী নাট্য সমাজ - শংকর পুর হাট, শাসন যুবক সমিতি - শাসন, বাকদেবী নাট্য সমাজ - মদারাট।

এছাড়া হয়তো আরো কিছু অভিনেতা, অভিনেত্রী ও যাত্রাদলের বলা হলো না। পরবর্তি সংস্করনে তা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা রইল। শুধু চাই আপনাদের সহযোগিতা।

বারুইপুরের সমবায়

প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুর একটি অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কেন্দ্র। বারুইপুরের আদিগঙ্গা দিয়ে গৌরাঙ্গদেব তাঁর পুরীযাত্রার সময়ে কীর্তনখোলাতে তাঁর স্মৃতি রেখে গেছেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু তাঁর কর্মজীবনের কিছু সময় এখানে থেকে গেছেন। তাঁর স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই এখানে এখন ঋষি বঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি বারুইপুর জেলা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে ঘোষিত হয়েছে, কাজও এগিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় এখানকার প্রাচীন পৌরসভার পক্ষ হতে চেষ্টা চলেছে সমগ্র বারুইপুর এলাকাকে কেন্দ্র করে একটা প্রামান্য তথ্য-পুস্তক রচনা করা হবে। সেই সংগ্রহের অন্যতম উপাদান হিসাবে বারুইপুর সমবায় সম্বন্ধে কিছু প্রতিবেদন রাখার দায় আমার উপর দেওয়া হয়েছে।

এই দায় অত্যন্ত দুর্বহ। মানুষের জীবনে ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে মন্দিরে-মসজিদে-সার্বজনীন উৎসবে সর্বত্র মানুষের সমবেত উদ্যোগ আয়োজন সবাই মিলে আনন্দে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা। কিন্তু অর্থের সাধনায় মানুষ একক, সবাইয়ের থেকে পৃথক ভাবে তার সাধনা। বারুইপুরের সমবায় অর্থে প্রধানত বারুইপুরের কৃষক অঞ্চলে সমবায়ের আন্দোলন বা সমবায়ের বর্তমান অবস্থা প্রধান আলোচ্য হয়ে দাঁড়ায় আবার বারুইপুর গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমবায় অর্থে সমগ্র রাজ্যের বা জেলার গ্রামাঞ্চলের সমবায় থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। গ্রামাঞ্চলে অনেক আগে থেকেই ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানার যে রেওয়াজ সেখানে জমির মালিক তার একক সাধনায় তার জীবিকা সংগ্রহ করে, এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বেষ, সংঘাত, বিভেদ জীবনে প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্বহ করে তোলে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্যই সমবায়। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন – আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্ম শ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্ব সাধারণের জন্য লাভ করা। একেই বলে সমবায় নীতি। 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামক প্রবন্ধে তাঁর দার্শনিক অভিমত এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে অর্থের উৎপাদন ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে– এইখানেই তার আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক। এইখানেই তার ভাবটা একলা মানুষের ভাব। এইখানে তার নৈতিক দায়িত্ব বোধ ক্ষীণ। এই চিরন্তন মানসিক দুর্বলতা থেকে উত্তরণের জন্যই সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক বিপ্লবের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর ঠিক এইখানটাতেই ঘাটতি আছে বলেই আমাদের দেশে সমবায় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিপদে বাধা আসছে। বারুইপুরও তার ব্যতিক্রম নয়।

বারুইপুরে সমবায় বলতে প্রধানত দুই ধরনের সমবায় উল্লেখ করা যায়। পৌর এলাকায় ক্রেতা সমবায় সমিতি আর গ্রামাঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি। এদের মধ্যে কৃষি উন্নয়ন সমবায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর এইখানটাতেই ত্রুটি অনেক বেশী। আমরা জেনেছি যে, একদিন

সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কমবেশী ৪৫০টি কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে শতখানেক এখনও টিকে আছে। বারুইপুর এলাকায় ৩০টি কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২০টি এখন টিকে আছে কিন্তু ঠিকমত কাজ করছে এখন মাত্র দুটি। তিনটি সমিতি হয়ত লিকুইডেসানে যাবে। হাড়দা কৃষি সমবায় মোটামুটি কাজ করছে, কদমপুর দমদমা কাজ করার চেষ্টায় আছে আর বাকীগুলো খাতায় কলমে বেঁচে আছে। প্রধান ত্রুটি এই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লোনের টাকা শোধ হয়নি অনেক সোসাইটিতে ঠিকমত অডিট হয় না অনেকগুলোতে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পতনের কারণ হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় এই কৃষি সমবায়গুলো আছে তারা হলো হরিহরপুর, কালিকাপুর, বেলেগাছি, কদমপুর দমদমা, ছায়ানী মাঝেরহাট, পারুলদহ, কুড়ালি, মদনপুর জেলের হাট, ধপধপি, সাউথ গড়িয়া, বিনোদপুর, টগরবেড়িয়া, নোড়, রামনগর, শঙ্করপুর, চিত্রশালী, সাহাপুর-হাড়দা, হরিমূল। মল্লিকপুরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কো-অপারেটিভ আছে। পৌর এলাকায় দুটো ক্রেতা-সমবায় ঋষি বঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং জনপ্রিয় মার্কেটিং সোসাইটি,। মদারাটে একটা ক্রেতা সমবায় –'মদারাট ইউনিয়ন পিপলস কো-অপারেটিভ'। একটা থানা মার্কেটিং সোসাইটি আছে। একমাত্র জনপ্রিয় মার্কেটিং বাদে আর সমস্ত সোসাইটিগুলো এই বারুইপুর থানা লার্জ স্কেল মার্কেটিং সোসাইটির এ শ্রেণী সদস্যভুক্ত। 'এ' শ্রেণীর সমস্ত সোসাইটিগুলোর কো-অর্ডিনেটর এবং গাইড হিসাবে এই থানা মার্কেটিং সোসাইটির অস্তিত্ব। এই সোসাইটির 'এ' সদস্যগুলো বাদে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে সমবায়ের ব্যাপারে উৎসাহী মানুষ হিসাবে আর ১৫ জন সদস্য আছেন – তাঁরা 'বি' শ্রেণীভুক্ত। এরপর আছে সরকার নিজে 'সি' শ্রেণীভুক্ত সদস্য। থানা মার্কেটিং সোসাইটি নিজস্ব ব্যবসার জন্য সরকারী টাকা লোন হিসাবে নিয়ে ফুলতলাতে একটা গুদাম করেছেন – বারুইপুর মেন রোডের উপর এই সমিতির নিজস্ব অফিস এবং প্রসাশন ভবনের তলায় নিজস্ব দোকান আছে। থানা মার্কেটিং সোসাইটির মূল লক্ষ্য কৃষি সমবায় গুলোকে পুষ্ট হওয়ার পথে সাহায্য করা সেইখানটাতে ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। এক সময়ে সরকারী উদ্যোগে সব্জীর ব্যবসা আরম্ভ হয়, লক্ষ্য ছিল কৃষকদের কাছ থেকে টাটকা সব্জী নিয়ে শহরে হাসপাতাল-হাউসিং কমপ্লেক্সগুলোতে সরবরাহ করা। এখন এই সব ব্যবসায় কিছুটা ভাঁটা এসেছে। আসল কারণ, এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারী এবং প্রাইভেট ঠিকাদাররা প্রচণ্ড অপচেষ্টা করে নিজেদের ও পরিকাঠামোগত দুর্বলতা আছে। কিন্তু সার ব্যবসা অর্থাৎ চাষীদের সার বন্টনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ফুলতলা গোডাউন তৈরী হয়েছিল – সেইখানেই ঘাটতি কারণ, সরকারী যে ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এখানে সার আসবে, কীটনাশক আসবে, সেই গোড়াতেই গলদ থেকে গিয়েছে যাকে এককথায় বলা যায় প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং ব্যর্থতা। সরকারের নীতি-বাজেট বরাদ্দ সব ঠিক আছে কিন্তু প্রশাসনের মধ্য দিয়ে কাজ হওয়ার সময় এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, সেখানে সাধারণভাবে কিছু করা যায় না। সম্প্রতি থানা মার্কেটটি সরকারের মিড-ডে-মিল প্রকল্পের মধ্যে চাউল ব্যবসা করছে, এক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ মত শহরাঞ্চলের মধ্যেই চালটা বিতরণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। গ্রামে কেন এই চাল আসবে না, তার কোন সদুত্তর নেই। মিউনিসিপ্যাল এলাকায়

দুটো এবং মদারাটে একটা ক্রেতা সমবায় খামার মোটামুটি চলছে। এই ক্রেতা সমবায় চালাতে গিয়ে বর্তমান প্রতিবেদকের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে, সমবায়ে বিক্রয়যোগ্য ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী সাপ্লাইয়ের অপ্রতুলতা এবং প্রাইভেট ব্যবসাদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিন্তু যে ক্ষেত্রটিতে সমবায়ের প্রসার দরকার অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বারুইপুরে কৃষির উন্নতি সেইখানে আসল কাজ হচ্ছে না। বারুইপুরে সংগৃহীত মধু থেকে ভালো মধুর ব্যবসা চলেছে। বারুইপুরের ফল থেকে জ্যাম, জেলী এই সব করা যায় – এখানে সমবায়ের একটা ভূমিকার প্রয়োজন আছে। সমগ্র দক্ষিণ ২৪পরগণার কৃষির দিকে লক্ষ্য করে কৃষকদের লোন দেওয়ার জন্য বারুইপুরে যে সমবায় ব্যাংক তৈরী হয়েছে সেখানে আশাপ্রদ ছবি মিলবে না। অধিকন্তু খবর এই যে, সমবায়ের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয় এই কথা স্বীকার করছেন। বোঝা যায় একটা স্তরে আত্মসমালোচনা আরম্ভ হয়েছে। সমবায়ের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এর বেশী বিবরণের মধ্যে না যাওয়াটাই ভালো। এখন আশার কথা এই যে, রাজ্য সরকারের নূতন কৃষিনীতিতে সমবায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে – সমবায়ের কি প্রয়োজন নেই– অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোকে সংকুচিত করছেন – এখানেও সেই রকম কিছু করা হবে। গতির চক্র সামনেই চলবে- পেছনে ঘুরলে গতি থেমে যায়। সুতরাং নিশ্চয়ই কিছু ভাবতে হয়।

বর্তমান যুগের যুগন্ধর নেতা মহান লেলিন রাশিয়ার জন্য তাঁর সমবায়ের পরিকল্পনা রেখেছিলেন। ১৯২০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি এই ব্যাপারে একটা প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ-
It is one thing to draw up fantastic plans for building socialism through all sorts of workers associations and quite another to learn to build socialism in practice in such a way that every small peasant could take part in it. A number of economic financial and banking privildges must be granted to the Co-operatives. This is the way our socialist state must promote the new principle on which the population must be organised. But this is the only the general outline of the task; it does not define and depict in detail the entire content of the pratical task."

আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ লেনিন নির্দেশিত পথে হাঁটছেন বা চেষ্টা করছেন কিন্তু সাধারণ মানুষকে এখনও ঠিক মত organised করা যায় নাই। বরঞ্চ তৃণমূলে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে গেছে। আসুন, আর একবার দেখি কার্য্যকরী পন্থা হিসাবে লেনিন কি বলে গেছেন।

Two main tasks confront us, which constitutes the epoch-to orgaise one machinery of State which we took over in its entirety from the

proceeding epoch our second task is educational work among the peasants, and the economic object of this educational work among the peasants is to organise the latter in Co-operative societies. But the organisation of the entire peasantry in Co-operative Societies presupposes a standard of culture among the peasants that cannot, in fact, be achieved without a cultural revolution.

আজ আমরা যারা সমবায় নিয়ে আলোচনা করি, 'সমাজতন্ত্রে লক্ষ্যে সমবায়' এই প্রাথমিক কথাটি মনে রেখে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণাটা ভাবনার মধ্যে আনতে হয়। চিন্তাটা এই ভাবে, ইতিবাচক ভাবে থাকা উচিত যে, কৃষকদের লোন, সার, কীটনাশক পাওয়ার পথে অহেতুক বা অযথা প্রশাসনিক বিড়ম্বনা বা বিলম্ব হবে না– বিপরীত ক্রমে কৃষকরা তাঁদের লোনের টাকা শোধের ব্যাপারে অযথা বিলম্ব করবেন না বা কারুর কথাতে লুব্ধ হয়ে বিড়ম্বিত হবেন না। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের দাম যাতে লাভজনক ভাবে পান সরকার যে ব্যাপারে যথোচিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন - মার্কেটিং সোসাইটিগুলো এই ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। Food for work এর শস্যদানা নির্ধারিত মানের হবে, পথের মধ্যে বস্তা পাল্টে দিয়ে অখাদ্য বস্তু বন্টনের চেষ্টা হবে না। আজ মিডডে মিলে যে চাল দেওয়া হচ্ছে – তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হবে। অনেকে বলবেন, এ সব হচ্ছে দুর্নীতি সুনীতির ব্যাপার, এর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নেই। তাঁদের বোধির জন্য বলা দরকার যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তি শিক্ষা ও কলার চর্চাই যদি সংস্কৃতির লক্ষণ হয় তাহলে গরীব অল্পশিক্ষিত লোকগুলোকে অসংস্কৃতি বলতে হয়। তাদের দুর্নীতিমুক্ত জীবনের কোন মূল্য থাকে না। আমরা বলি ধনী হউক, শিক্ষিত হউক বা মূর্খ হউক পরিচ্ছন্ন দুর্নীতি মুক্ত জীবনই আমাদের কাম্য। এই হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম পাঠ। তাব সঙ্গে আধুনিক যুগের দাবী অনুসারে উৎপাদনের সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে। সমাজের সত্য কথা এই যে, উৎপাদনপদ্ধতিই উৎপাদকদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শিল্প ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হবে – সে ক্ষেত্রে সমবায় অবশ্য প্রয়োজন। ব্যক্তি স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে সমবায় গঠন ও গণতন্ত্রের বিকাশ সবটাই একটা সুষ্ঠু ভাবে বিপ্লবের উপর নির্ভর করে – এইখানেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব। ছাত্রদের পাঠ্যসূচীতে সমবায় তথা পঞ্চায়েতকে বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দুয়ের সমন্বয়ে কিভাবে দেশকে এগিয়ে দেওয়া যায় তারজন্য সিলেবাস তৈরী চিন্তা করা যেতে পারে।

তবে সবটাই নির্ভর করছে দক্ষ নেতৃত্বের উপর। সেই নেতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে এই প্রতিবেদন রাখলাম।

বারুইপুরের বিচার ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন বিশেষ অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস সমগ্র দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার অংশ। তাই কোন অঞ্চলে একটি আদালতের অবস্থান কোন ভাবেই সেই এলাকার বিচার ব্যবস্থাকে সূচিত করে না। সেই বিশেষ অঞ্চলে আদালত স্থাপন সমগ্র দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতিফলনমাত্র। তাই বারুইপুরের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস জানতে গেলে সমগ্র দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সমগ্র দেশের বিচারব্যবস্থার ক্রমবিকাশের এবং অগ্রগতির সাথে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই একদিন বারুইপুরে আদালতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমগ্রদেশের বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বারুইপুরের বিচার ব্যবস্থার বা বারুইপুরের আদালত স্থাপন ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে জানা সম্ভব নয়।
ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে বাংলার শাসক ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। দিল্লীর মোগল বাদশাহের দুর্বলতার সুযোগে প্রকৃত অর্থে দীর্ঘ ২১ বৎসর তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলার শাসন পরিচালনা করেছিলেন এবং ঐ সময়ে মোগল বিচার ব্যবস্থাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। ১৭৪০ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতাচ্যুত করে আলিবর্দি বাংলায় শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌল্লা বাংলার মসনদে বসেন।

বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের প্রথম যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল বাদশাহের অনুমতিক্রমে জমির মালিকের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয় করে বাংলার মাটিতে পা রাখার জায়গা পায়। ১৭১৭ সালে ঐ তিনটি গ্রাম সংলগ্ন আরো ৩৮ টি গ্রাম মোঘল বাদশাহের অনুমতিক্রমে ক্রয় করেও বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর বিরোধিতার জন্য গ্রামগুলি দখল করতে পারে না। ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে সন্ধির দ্বারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ওই গ্রামগুলি দখল করে। পলাশির যুদ্ধে ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সিরাজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবার পর ইংরেজরা মিরজাফরকে বাংলার নবাব হিসাবে গ্রহণ করল আর উপঢৌকন হিসাবে পেল মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকা যা হুগলী চাকলার অন্তর্গত ছিল। চব্বিশটি পরগণা হুগলী থেকে আলাদা করে নেওয়া হোল।

১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর নবাব মিরজাফর আলি খান এক পরোয়ানা বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই চব্বিশটি পরগণা জমিদারি স্বত্ব বন্দোবস্ত দিয়ে দিলেন। নাম হোল জমিদারি ২৪ পরগণা। পরগণাগুলি হোল (১) কলিকাতা (২) আকবরপুর, (৩) অমিরপুর (৪) আজিমাবাদ (৫) বালিয়া (৬) বারিদ হাটী (৭) বাঁশদাড়ি (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (১০) হাতিয়াগড় (১১) ইকতিয়ারপুর (১২) খরিজুরি (১৩) খাসপুর (১৪) মেদন মল্ল (১৫) মাগুরা (১৬) মানপুর (১৭) ময়দা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পাইকন (২০) পেচাকুলি (২১)

মাতল (২২) সাহানগর (২৩) সাহাপুর (২৪) উত্তরপরগণা। ১৭৫৯ সালের ১৩ই জুলাই দিল্লীর বাদশা এক জায়গীর সনদ ঘোষণা করে রবার্ট ক্লাইভকে জমিদারী ২৪ পরগণা নিষ্কর ভূমিস্বত্ব দান করেন। যে ২৪ পরগণা জেলা আজকে আমরা দেখছি ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ থেকে সে ২৪ পরগণা উত্তর এবং দক্ষিণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ শুরু করে, এই হচ্ছে তার পূর্ণ ইতিহাস।

এদেশে আধুনিক বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ইতিহাসে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জনগণের উপর কোম্পানির ইংরাজ রাজ কর্মচারীদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনীতে বিব্রত হয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট এই আইন পাশ করেন। এই আইনের বলেই প্রথম কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৪ সালের ২৬শে মার্চ এবং ১৮৬২ সালে কলকাতার হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট চালু ছিল। এইভাবে কলকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠার পর জেলাগুলিতে দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ পর্যন্ত বিশেষ পরিবর্তন ছাড়াই বিচার ব্যবস্থার এই গঠনতান্ত্রিক পরিকাঠামো অক্ষতই আছে।

এদেশে আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাসে ১৭৭৩ সালের পর ১৭৯০ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর লেখায় মোগল বাদশাহের প্রবর্তিত ইসলামের আইনের দোষত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলির উল্লেখ করে এই আইনের সংস্কারের কথা বলেন। কর্ণওয়ালিসের লেখার ফলে ১৭৯০ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলার সরকার একটি আইনের দ্বারা কর্ণওয়ালিসের আদেশগুলি গ্রহণ করেন। এরপর ১৭৯৩ সালের ১লা মে ঐতিহাসিক কর্ণওয়ালিস কোড চালু হয় । বাংলার অন্যান্য এলাকাতে ১৭৯৬ সাল থেকে রাজস্বজেলা, ম্যাজেষ্ট্রেসি, সিভিল কোর্ট চালু হয় এবং নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আমরা যে বিচার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করছি তার সূত্রপাত এখান থেকেই হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে মোগলবাদশাহ্ দ্বারা প্রবর্তিত নিজামত আদালতগুলির বিলোপসাধন হোল না। ম্যাজেষ্ট্রেসি এবং সিভিলকোর্টের পাশাপাশি নিজামত আদলতও চালু ছিল। এককথায় বলা যায় এদেশে আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাস কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাই দেখি ১৯৫৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় নগর দেওয়ানি আদালত ও দায়রা আদলতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ফণিভূষণ চক্রবর্তী বলেছিলেন " Whatever evil might have resulted from the long occupation of this country by a foreign power, it had for the first time brought an organised judicial system. The maintenance of the rule of law was a gift of inestimable value which the British had left"

সমগ্র দেশের সাথে চব্বিশ পরগণার ক্ষেত্রেও এটা শুরু হয় ১৭৯৩ সাল থেকে রেগুলেশন II IV এবং IX এর মাধ্যমে এবং চলে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা , বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হয় তখন এই অঞ্চলগুলিতে মোগল বাদশাহের প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল। মোগল শাসন ব্যবস্থায় প্রতিটি নগর

এবং বড় গ্রামগুলিতে স্থানীয় কাজীরা ফৌজদারী এবং অন্যান্য বিরোধের বিচার করতেন। এই কাজীরা প্রধান কাজীর দ্বারা নিযুক্ত হতেন। (J.N. Sarkar - Moghal Adm...27) মোগল শাসন ব্যবস্থায় জমিদারদের কোন ফৌজদারি বিচারের অধিকার ছিল না।কিন্তু নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে জমিদাররা নিজেদের স্বার্থপূরণ এবং সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালানর জন্য। (Back ground of Indian Criminal Law T. K. Banerjee - P.27) এবং এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিটি জেলায় এই জমিদাররাই সন্দেহাতীতভাবে প্রকৃতপক্ষে বিচারকের ভূমিকাই পালন করেন যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বারুইপুর বা সন্নিহিত অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থার কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না তথাপি উপরোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সম্ভবত এখানকার বিচারও ঐ সময়ে জমিদাররাই করতেন। কারণ, ঐ সময়ের গুমঘরের কথা লোকমুখে শোনা যায় যেখানে অপরাধীদের শাস্তিবিধান করা হোত নানাভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই জমিদারেরাই নিঃসন্দেহে তাদের এলাকাধীন প্রতিটি জেলায় প্রকৃতপক্ষে বিচারক হিসাবে কাজ চালাতেন (ঐ পৃঃ ১৪১)

১৭৭৬ সালে এক আদেশবলে বাংলা এবং বিহারে দেখা যাচ্ছে ২৩টি জেলায় প্রতিটিতে একটি করে ফৌজদারি আদালতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ২৩টি জেলার মধ্যে হুগলী, যশোর ও কালিঘাটের নাম দেখা যাচ্ছে। এর আগে আমরা ১৭৫৭ সালে ২০শে ডিসেম্বর যে ২৪ টি পরগণার কথা বলেছি তাতে কলকাতা, সাহানগর এবং সাহাপুরের নাম দেখেছি। কিন্তু এই সময়েও আমরা পৃথক জেলা হিসাবে ২৪ পরগণার নাম দেখি না। ১৭৭৬ সালের ৮৫ বছর পরে ১৮৬১ সালের ১৮ই মার্চ ২৪ পরগণা জেলা গঠনের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন হিসাবে সূচিত হয়ে থাকবে। ঐদিন জমিদারি ২৪ পরগণা এবং বারাসাত ম্যাজিস্ট্রেসি যা ১৮৩৪ সালে নদীয়া এবং যশোরের রাজাদের কিছু জমিদারি এলাকা সংযোজিত করে গঠিত হয়েছিল তার অধীনের এলাকা মিশিয়ে ২৪ পরগণা জেলা হিসাবে কাজ শুরু করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৬১ আগেই ১৮৫৮ সালের ২৯শে অক্টোবর বারুইপুর মহকুমা অফিসের কাজ শুরু হয়। ১৮৬১-র সালের ১৮ই মার্চ পুনর্গঠিত ২৪ পরগণা জেলার মহকুমা এলাকাও পুনর্বিন্যাস করা হয়। জেলাকে যে ৮টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয় তার মধ্যে বারুইপুর ছিল অন্যতম মহকুমা।

১৮৫৮ সালে যে কটি মহকুমা সৃষ্টি হয় বারুইপুর সমেত সেগুলি ছিল রাজস্ব বিভাগের বিভাজন, Fiscal Division, রাজস্ব আদায় যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং এর জন্য এখন যেমন জেলা কালেক্টারের পদ আছে তখন প্রত্যেক মহকুমায় একজন করে মহকুমা কালেক্টার ছিলেন। বারুইপুরে ঐ বছরই স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী কালেক্টর নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে প্রকাশিত Hunter's Gazette থেকে জানা যায় বারুইপুর মহকুমা প্রতিষ্ঠার সময়েই বারুইপুরে ক্রিমিনাল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Hunter's Gazette P224) কিন্তু ১৮২১ সালের Regulation IV অনুযায়ী collector of revenue কে দেখা যাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয় (ঐ পৃঃ ১৮১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৮ সালের মহকুমা কালেক্টার যার উপর রাজস্ব আদায়-এর ক্ষমতা দেওয়া হয় সম্ভবতঃ তার উপরেই ঐ Regulation

IV অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ১৮৫৮ সালে বারুইপুরে যে ক্রিমিনাল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় সম্ভবত ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহকুমা কালেক্টারই হয়ত ঐ কোর্টের বিচারক ছিলেন।

বারুইপুরের দেওয়ানি আদালত কবে কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোন প্রামাণ্য সরকারী রেকর্ড নেই। ১৯৮৪ সালের বারুইপুরের কোর্টের শতবার্ষিকী উৎসবের আগে পর্যন্ত এতদ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি ছিল বারুইপুরের প্রথম আদলত বসে বারুইপুরের বর্তমান সাবডিভিসানাল পোষ্ট অফিসের পিছনে পৌরসভা ও ডাক্‌বাংলোর পুরান বাড়ীর একটি একতলা বাড়ীতে। যে বাড়ীটি পুরান পোষ্ট অফিস হিসাবে মানুষ জানে, সেই বাড়ীটিতে। ঐ ঘরের মধ্যে একটা বসার বেদীও অনেকে দেখেছেন যেটাকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিচারকের বসার আসন হিসাবে। ঘরটির পিছনে লম্বা কুঠুরি। কুঠুরির উত্তর দেয়ালে আজো দেখা যাবে জেলখানার গরাদের মতো লম্বা লম্বা জানালা। ঐখানে পুরান কোর্টের অবস্থানের বিশ্বাসের পিছনে আরো একটি ঘটনা কাজ করেছে, তা থেকে ঐ ঘরটির পিছনে উকিলপাড়া এবং প্রচলিত ধারণা কোর্টের পেছনেই ছিল উকিলদের বাসস্থান এবং সেরেস্তা এবং ঐ অঞ্চলেই ছিল জেলখানা। ঐ নিদর্শনগুলি যা আজও বর্তমান, প্রবল জনশ্রুতি এতদঅঞ্চলের মানুষের এই বিশ্বাসকে সৃষ্ট করে এসেছে।

এই বিশ্বাসই হয়ত সত্যে পরিণত হোত যদি ১৯৮৪ সালে বারুইপুর বার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শতবার্ষিকী উৎসবের সময় আলিপুরের জেলা জজের রেকর্ডরুমে বারুইপুর কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রী মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য এবং বারুইপুরের ইতিহাস এবং প্রাচীনত্বের সম্পর্কে অন্যতম গবেষক শ্রী অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গবেষণার ফলে বারুইপুর আদালতের ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান কথা আবিষ্কৃত না হোত। ঐ গবেষণার ফলে একটি নথিতে দেখা গেল বারুইপুর কোর্টের সীলমোহর যাতে লেখা ছিল 'মানিকতলার মুনসেফী বিচারালয় বারুইপুর ১৮৬২'। ১৮৬২'র আগের সীলমোহর যুক্ত কোন নথি যেহেতু রেকর্ডরুমে পাওয়া যায় নি তাই নিশ্চিন্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বারুইপুর আদালত নিশ্চিতভাবেই ১৮৬২ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোন গবেষক বা অন্যকোন সরকারী নথিতে বারুইপুর আদালতের এই প্রতিষ্ঠার বৎসর নিয়ে কোন বিকল্প তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেন নি সেইহেতু সংগৃহীত তথ্য ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে ১৮৬২ সালকেই বারুইপুর আদালতের প্রতিষ্ঠকাল হিসাবে ধরতেই হবে।

বারুইপুর আদলতের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর এবার আমাদের সামনে ঐ নথি থেকে বারুইপুর কোর্টের অবস্থান সম্পর্কেও একটা হদিস পাওয়া গেল। উক্ত সীলমোহরে 'মানিকতলা মুনসেফি বিচারালয় বারুইপুর ' থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বারুইপুরে আদলত বারুইপুরের মানিকতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শ্রী অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী এতদ্‌অঞ্চলের বহু বয়স্ক প্রবীণ মানুষজনের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে, মানিকতলা ছিল বর্তমান ব্যানার্জী পাড়ায়। প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্বর্গত ডাঃ অর্ধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের পৈতৃক বাসভবনটি এখনও বর্তমান আছে, ঐ বাড়ীটিতেই প্রথম বারুইপুর আদালত অবস্থিত ছিল

বলে অনুমান করা হয়। স্থানটি কুলপীরোড ও আমতলা রোডের জংশন থেকে দক্ষিণ দিকে ডানদিকের গলির ভিতর। সুতরাং উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বারুইপুরের পুরান পোষ্ট অফিসে বারুইপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম আদলত প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রচলিত বিশ্বাস ও জনশ্রুতিটি বিশ্বাস করার আর কোন ভিত্তি থাকে না। তবে পুরান পোষ্ট অফিসের বড় বড় গরাদগুলি দেখে এই অনুমান করা যায় সম্ভবত ঐ স্থানে কয়েদখানা বা লক-আপ এবং পরবর্তী সময়ে তা আদালতের অবস্থানের জনশ্রুতিতে পরিণত হয়।

১৮৬২ সালে বারুইপুরের আদলতের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সীলমোহর পাওয়া গেলেও ঐ সময়ে কোন মামলার নথি উদ্ধার করা যায় না। তাই ঐ সময়ে কে প্রথম বিচারক ছিলেন বা পক্ষে বিপক্ষে উকিলবাবু কারা ছিলেন তাঁদের নামও জানা যায় না। প্রথম যে নথিটি আলিপুরের রেকর্ডরুমে পাওয়া যায় সেটি ১৮৬৬ সালের। ঐ নথি থেকে জানা যায় বারুইপুরের ঐ সময়ে প্রথম মুন্সেফি আদালতে হাকিম ছিলেন শ্রী পিয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়। এর পর যে একটি ঐতিহাসিক নথি উদ্ধার করা হয় সেটি হোল ১৮৬৭ সালের। কেস নং ৫৬০/১৮৬৭। বাদী - কার্তিক মণ্ডল বনাম বিবাদী নবীনচন্দ্র ঘোষ। বাদীপক্ষে উকিলবাবু ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল আর বিবাদীপক্ষে রামগোপাল চক্রবর্তী মুনসেফ হরিনারায়ণ রায়। এবং মামলার প্রত্যয়িত নকলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে সই করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঐ মামলাটি ছিল হরিনাভি অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার নবীনচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে রায়ত কার্ত্তিক মণ্ডলের মামলা যা তিনি করেছিলেন জমিদার কর্তৃক তার জলপথ বন্ধ করার বিরুদ্ধে। সবচাইতে যা উল্লেখযোগ্য তা হোল ঐ সময়ের এক বিচারক ঐ মামলার সরেজমিনে তদন্ত করে জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তের পক্ষে রায় দেন। পাঠকের অবগতির জন্য ঐ ঐতিহাসিক রায়টির অনুলিপি নীচে দেওয়া হোল।

Miscellaneous procuding No. 30/1. Reight of water way under enapler XXII procedure code. Kartic Mondal Vs Nabin Ch. Ghosh and others.

Order

The dispute for a right of water way I personally visited the spot and found there undeulitable tracy of the existance of a water course through the second Partijs land which has evidently been recently stopped. I direct under section 320 of the procedure code that Nobin Chandra Ghosh shall not retain such exclusive pos.......... of the land as to present the water from Kartic Mondal's abad from flowing through that of Nabin Chandra Ghosh file the question is determined by order of competent court.

Dt. Bankim Chandra Chatterjee

Dupty Magestrate.

উপরের নথি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৬৭ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতে ছিলেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। ১৮৭৭-এ এ্যাডিসানাল মুন্সেফ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও ১৮৭৮এ দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতে ছিলেন পিয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯০ থেকে ১৮৯১ সালে প্রথম মুন্সেফি আদলতে ছিলেন অশ্বিনীকুমার গুহ । ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় মুন্সেফি আদালতে ছিলেন মহিমচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯০-৯১ সালে এ্যাডিশানাল মুন্সেফী ছিলেন শশিভূষণ বসু। ঐ সময়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর এক বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বারুইপুর আদালতে এ্যাডিশান্যাল মুন্সেফ হিসাবে কাজ করে গেছেন। এই সময়ে বিভিন্ন নথিতে ঐ সময়ের বারুইপুর আদলতে ওকালতি ব্যবসায় নিযুক্ত উকিলবাবুদের নাম পাওয়া গিয়েছে। রামগোপাল চক্রবর্তী, গগনচন্দ্র চক্রবর্তী, মহেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য , গিরীশচন্দ্র মুখার্জী, ভূপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, মহেন্দ্রনাথ দেব, রামতরন চৌধুরী, রামকুমার মিত্র, গিরীশচন্দ্র নন্দী, দেবনারায়ণ দত্ত, পরশুরাম বিশ্বাস, সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়। উকিলবাবুদের অধিকাংশই বারুইপুরের এবং তার আশেপাশের অধিবাসী ছিলেন। তবে সম্ভবত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মপুকুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

এই সময়ের বারুইপুর আদালতের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল, যা বারুইপুরের আদলতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, বারুইপুরের মানিকতলার আদলতে বাংলার নবজাগরণের দুই মহান ব্যক্তিত্ব সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্ঠা মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সাক্ষাৎকারের কাহিনী। নবজাগরণের এই দুই মহানায়কের মহামিলন ঘটেছিল ১১৬—১১৮ বছর আগে বিচারকের আসনে আগে বঙ্কিমচন্দ্র আর তাঁর আদালতে ব্যারিষ্টার হিসাবে সওয়াল করছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ এক ঐতিহাসিক মহামিলনের দৃশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ সালের ৫ ই মার্চ খুলনা থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বদলি হয়ে বারুইপুর আদালতে যোগদান করেন। ঐ বছরই ২৪শে অক্টোবর বারুইপুর থেকে ডায়মণ্ডহারবার বদলি হয়ে আবার ১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ বারুইপুরে ফিরে আসেন এবং ১৮৬৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বারুইপুর থেকে বদলি হয়ে আলিপুরে চলে যান। ১৮৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর আলিপুর থেকে আবার বারুইপুরে ফিরে আসেন এবং ঐ বছরের ১৫ই ডিসেম্বর বারুইপুর ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ চলে যান । বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের মোট কার্যকাল ছিল ৫ বছর ৯ মাস ৯ দিন। ঐ সময়ে বারুইপুর মানিকতলা আদালতে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলার বিচার হোত । বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিচারক পাওয়ার ফলে ঐ আদালত এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব পায়। এবং ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু রায় বাংলার বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক নজীর হিসাবে আজও স্বীকৃত। ঐ সময়ের একটি রায় যা সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকার ১৮৬৫ সালের ১২ই মে'র সংস্করণে প্রকাশ পেয়েছিল তা পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি।

"প্রত্যক্ষদর্শীর বারুইপুর দর্শন ঃ বারুইপুর আদালতে একটি ডাকাতি মকদ্দমার রোমাঞ্চকর রায়পর্ব সমাধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐ রায়টিকে রোমাঞ্চকর আখ্যা দিবার কারণ হইতেছে, ঐ ডাকাইতি মকদ্দমায় ধৃত ডাকাইতটির সহিত ডাকাইতটি যাহার নেতৃত্বে ধৃত হইয়াছিল সেই পুলিশ পুঙ্গবটিরও সমুচিত শাস্তি বিধান হইয়াছে। উক্ত পুলিশপুঙ্গব ধৃত ডাকাইতটিকে অন্যায়ভাবে প্রচণ্ড পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলনে। অভিযোগ সপ্রমাণ হওয়ায় স্বনামধন্য ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অভিযুক্ত পুলিশপুঙ্গবের সমুচিত শাস্তিবিধানে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।" আধুনিক ভারতবর্ষে মানবাধিকার আন্দোলনের যে প্রধান দাবী যে নানা লকআপে পুলিশ কোন অভিযুক্তকে দৈহিক পীড়ন করতে পারে না ঐ ঐতিহাসিক রায়ে সেই দাবীটির যথার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে একই সঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, রেজিষ্টার ও পুলিশের অধিকর্তার কাজ করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করেন দেবচন্দ্র কর। ১৮৮৩ সালে বারুইপুর মহকুমার বিলুপ্তি ঘটে এবং বারুইপুরকে আলিপুর মহাকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং বারুইপুরে কেবল থেকে যায় বারুইপুর মুন্সেফি আদালত। বারুইপুর অঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং বিচার প্রার্থী মানুষের সুবিধার জন্য দেওয়ানি আদালতের পাশাপাশি ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য বারুইপুরে মহকুমা ফৌজদারী আদালত স্থাপনের দাবী ক্রমশ জোরদার হতে থাকে এবং যখন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্রের সভাপতিত্বে গঠিত প্রশাসন সংস্কার কমিশন বারুইপুরে পুনরায় মহকুমা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন তখন এইদাবী বাস্তবায়িত হবার সম্ভবনা দেখা দেয় এবং ১৮৮৩ সালে অবলুপ্ত বারুইপুর মহকুমা একজন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নিয়ে ১৯৯২ সালের ৭ই আগষ্ট থেকে পূর্ণাঙ্গ মহকুমা হিসাবে আবার কাজ শুরু করে। বর্তমানে মহকুমা অফিসে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চালু হয়ে গেছে এবং পূর্ণাঙ্গ মহকুমা ফৌজদারী আদালতের গৃহনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়ে এখন মাত্র সরকারী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে উদ্বোধনের জন্য। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রধানত বারুইপুর সিভিল কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতার ফলে ১৯৮৭-সাল থেকে বারুইপুরে সাবজজ আদালত স্থাপিত হয় এবং বর্ত্তমানে বারুইপুরে তিনটি সিভিলজজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদলত ও একটি সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিসন) এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সহকারী জেলা জজের ক্ষমতাসহ একটি First Track Court আদালত চালু আছে। পূর্ব্বে এগুলিকে যথাক্রমে মুনসেফ আদলত ও সাবজজ আদালত বলা হত। বারুইপুর মহকুমার অধীনে বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর, কুলতলি ও ভাঙ্গর এই পাঁচটি থানা আছে।

বারুইপুরের বিচার ব্যবস্থার অতীত ও বর্ত্তমানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এই ১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে আদলতে যাঁরা বিচারকের আসনে সমাসীন থেকেছেন এবং যাঁরা আইনবিদ্ হিসাবে বিভিন্ন বিচারপ্রার্থী মানুষের হয়ে মামলা পরিচালনা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু না ব য। বারুইপুর আদলতের মুন্সেফের কাজ করে যোগ্যতার গুণে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। সবাইয়ের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি যে কয়েকজনের পেরেছি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে

হয় মাননীয় বিচারপতি শ্রীননিগোপাল চৌধুরীর নাম। ইনি ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে বারুইপুর আদালতে প্রথম মুন্সেফ হিসাবে যোগদান করেন, এই প্রসঙ্গে এনার পূর্বসুরী আরো দুজন মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচাপতির নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা বারুইপুর আদালতে তাঁদের কর্মজীবন শুরু করে ছিলেন। তাঁরা হলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরুণকুমার দাস ও শ্রী অমিয়প্রসাদ দাস। শ্রী অরুণকুমার দাস ১৯৫৩ সালে বারুইপুর আদালতে মুন্সেফ হিসাবে যোগাদান করেছিলেন। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন যারা বারুইপুর আদালতে মুন্সেফ হিসাবে কার্যকাল শুরু করে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা আদালতে জেলা জজের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে বারুইপুর আদালতের কয়েকজন কর্মরত উকিলবাবুদের নাম উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাদের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখানে পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে যে কয়েকজন স্বনামধন্য আইনজীবি যাঁরা পেশাগত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে দুচারকথা বলে এই বারুইপুরের বিচারব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান প্রবন্ধটি শেষ করব। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলবাবুদের মধ্যে ছিলেন জয়নগরের অমৃতলাল চক্রবর্তী ও রজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। জানা যায় যে, রজনীবাবু পদার্থবিদ্যার একজন কৃতী অধ্যাপক ছিলেন এবং ডঃ সি.ভি. রমন তাঁর ছাত্র ছিলেন। বারুইপুরের উকিলবাবুদের মধ্যে এই যুগে যিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তিনি হলেন শ্রী হরেন্দ্রনাথ পাঠক। হরেন পাঠক কেবল আইনজীবি ছিলেন না। বারুইপুরের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও অংশগ্রহণ করতেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও বারুইপুর কোর্টের উকিলবাবুদের ভূমিকা ছিল। ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের আগমন উপলক্ষে বারুইপুর আদলতের বিপরীত দিকে মারিকবাবুদের বাড়ীর সামনে যে মহতীসভা হয় সেই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বারুইপুর কোর্টের উকিল ময়দা গ্রাম নিবাসী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর আদলতের উকিল হরেন পাঠক, অমৃতলাল মারিক। এরপর ১৯০৯ সালে 'মদারাট পপুলার একাডেমীর' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বারুইপুর আদালতের উকিলবাবুদের ভূমিকা ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানে বারুইপুর কোর্টের আইনজীবিদের মধ্যে অনেকে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সেবা করেছিলেন। বারুইপুর কোর্টে আইনজীবিদের মধ্যে আরো ছিলেন বীরূপাক্ষ্য ভট্টাচার্য্য যিনি অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বারুইপুর আদলতে আইনজীবী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আরো যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যত্ম ছিলেন গোবিন্দপুরের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় যাঁর নামে গোবিন্দপুর রত্নেশ্বর বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তাঁদের মধ্যে বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারের শৈলেন রায়চৌধুরী, নগেন চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মিশ্র, বীরেন ভট্টাচার্য্য, কুন্তলকৃষ্ণ মজুমদার, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বারুইপুরের উকিলবাবুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারুইপুরের এক প্রাক্তন মুন্সেফ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় একটি লেখায় বলেছেন, 'রজনীবাবু, নগেনবাবু, হরেনবাবু, রত্নেশ্বরবাবুর মতো দিক্‌পাল এককথায় Intallectural Giants রা যে কেন বারুইপুরে রয়ে গেলেন তা বুঝি না। এঁরা উচ্চতর আদলতে সুনামের সঙ্গে ওকালতি করার যোগ্যতা ধরতেন।

বারুইপুরের বিচার ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি বারুইপুর আদলতে এবং সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে মুহুরীবাবুদের সম্পর্কে কিছু বলা না হয়। আদালত আছে, উকিলবাবু আছেন, বিচারক আছেন—মুহুরী নেই এই অবস্থা কল্পনা করা যায় না। কারণ, তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে আমাদের বিচারব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মুহুরী বাবুরা। কোর্টে মামলা দাখিল করা থেকে তার নিষ্পত্তি পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ে মূল আইনের লড়াই নিঃসন্দেহে উকিলবাবুরাই লড়েন কিন্তু তার খুঁটিনাটি ব্যাপার মামলাকে বাঁচিয়ে রাখা, তার প্রতিটি স্তরে মামলা সম্পর্কে উকিলবাবুকে অবহিত করা, প্রতিটি মামলার ডায়েরী রাখা প্রভৃতি সমস্ত কাজটাই মুহুরীবাবুরাই করেন। কিন্তু প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো মামলার ব্যাপারে মুহুরীবাবুদের এই অবদানের কথা অন্ধকারেই থেকে যায়। মামলার রেকর্ডে কোন অবস্থাতেই মুহুরীবাবুদের কোন স্বীকৃতি থাকে না। বারুইপুরের আদালতের শতাধিক বছরের যে নথিগুলি পাওয়া যায় তার থেকে আমরা উকিলবাবুদের সম্পর্কে জানতে পারি অর্থাৎ কোন মামলার বাদীপক্ষের হয়ে কে ছিলেন অথবা বিবাদীর পক্ষে কে ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত নিষ্পত্তির পেছনে যে মুহুরীবাবুরা নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু জানা যাবে না। বর্তমানে আইনের পরিবর্তন হয়েছে। মুহুরীবাবুরা এখন ল'ক্লার্কস। কিন্তু তবু বলব আমাদের ব্যাপক গ্রামীণ সমাজের কাছে মুহুরীবাবুরা বোধ হয় ল' ক্লার্কের চেয়ে অনেক আপনার জন। গত ১০০ বছরের বারুইপুর আদালতে মুহুরীবাবুদের নাম সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। তবে যে কজনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁরা সবাই বারুইপুর মদারাট এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোক। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যাঁদের নাম তাঁরা হলেন, তারকচন্দ্র মণ্ডল, নবকুমার মণ্ডল, ভোলানাথ নন্দী, ননীগোপাল বিশ্বাস, গুরুপদ বিশ্বাস, তুলসীচরণ মণ্ডল ও চুনী নিয়োগী। সবচাইতে আনন্দ ও গর্বের কথা এই সমস্ত মুহুরীবাবুদের মধ্যে অনেকের সন্তান-সন্ততি আজ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হিসাবে পেশাগত কাজে নিযুক্ত আছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গটি বারুইপুরের বিচারব্যবস্থা তথা বারুইপুর আদালতের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে জানার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা মাত্র। এখনও বহু অজানা কথা নিশ্চয়ই আছে যা আগামীদিনে এই সম্পর্কে আরো গবেষকরা উদ্ধার করবেন। কারণ, একমাত্র নিরলস অনুসন্ধান ও গবেষণার মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসকে জানতে পারি এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

পৌর আইনের বিবর্তন ও পৌরপ্রশাসন

হাফিজুর রহমান

১লা এপ্রিল ১৮৬৯ সালে বারুইপুর পৌরসভার জন্ম, (ঐ একই ঐতিহাসিক দিনে সুয়েজ খালের দরজা বিশ্বের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। ইংল্যান্ডের রাজকীয় সনদবলে ১৬৮৭ সালে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন জন্ম নেয়। এটি ভারতবর্ষের প্রথম পৌরপ্রতিষ্ঠান। ১৭২৬ সালে তিনটি ঐ একই রাজকীয় সনদ বলে পুনর্গঠিত হল 'মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন' এবং প্রথম গঠিত হল 'কলকাতা' এবং 'বোম্বে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন', পূর্বে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে তিনটি ছিল প্রেসিডেন্সি টাউন, মূলত আর্থ রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ সব পৌরপ্রতিষ্ঠান, ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল রাজকোষের উপর আর্থিক চাপ কমানো, ইংরাজ সৈনিকদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে কর আদায় করে, পৌরপ্রশাসনকে সচল রাখা এবং ইংরাজ রাজত্বের উপর আনুগত্য ঠিক রাখা ইত্যাদি। এই নীতির উপর ভর করেই অনেকটা স্বদেশের পৌর প্রশাসনের আদলে ভারতবর্ষে পৌরপ্রশাসন চালু করতে উদ্যোগী হয়েছিল – 'ব্রিটিশ সরকার'। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ তথা স্থানীয় উন্নয়ন এগুলি ঐ ব্রিটিশ সরকারের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। কোনো ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর চিন্তাভাবনায় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটলেই ওরা রাতারাতি স্বদেশে ফেরার জাহাজে তাহাকে তুলে দিত।

১৮৬৯ সালে বারুইপুর পরীক্ষামূলক ভাবে সার্ভে এবং জনগণনা করা হয়। দেখা যায় যে, বারুইপুরের জনসংখ্যা ছিল ৩২৩১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬৬৫ জন এবং মহিলা ১৫৬৬ জন। বারুইপুরের মাপসুরত ৩৪৭১ একর বা ৫.৪২ বর্গমাইল। ৭৩৪ বাড়ী গড়ে ৪.৪০ জন বাড়ী পিছু বসবাস করেন এবং ১ বর্গ মাইলে ৫৯৬ জনের বসবাস। ইনকাম বা আয় ১৮৪ জলার ২ শিলিং ৪ পেন্স এবং খরচ ১৬৯ জলার ১ শিলিং এবং ০ পেন্স। ঐ সময়ে একজন হেডকনস্টেবল ও ১০ জন লোক নিয়ে একটি থানা তৈয়ারী করা হয়। ১৮৭২ সালে। যেটি বর্তমানে পুরাতন থানা হিসাবে পরিচিত। উক্ত বারুইপুর সাবডিভিশান কোলকাতার ১৬ মাইল দক্ষিণে ২২ ডিগ্রি অক্ষাংশে দক্ষিণ পূর্বে মজা গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

রেভিনিউ সার্ভেয়ারের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, এখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট্র সাহেব, লবণের কালেকটর সাহেবের এবং একজন ডাক্তারবাবুর বাংলোও ছিল। ৬-৭ শত লোকের জন্য একটি চার্চও ছিল, ১৮৫৭ সালে ৩৪টি পাকা বাড়ী ছিল। পরে সেগুলিকে সিভিল স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয়। বারুইপুরের অবস্থান যাহার অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮ ডিগ্রি ২৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। রাজকীয় সনদের শর্ত ছিল ৩০০০ জন সংখ্যার ঊর্ধ্বে এবং ২/৩ অংশ মানুষজন কৃষিকার্যের বাইরে অন্য উপায়ে উপার্জন করবে। ১৮৬৯ সালে ৩২৩১ জন স্ত্রী/পুরুষ নিয়ে তৈরী হয়েছিল বারুইপুর পৌরসভা। পরবর্তিকালে জনসংখ্যা বিবর্তন নিম্নরূপ ঃ

সাল	জনসংখ্যা
১৮৮১	৩৭৪২
১৮৯১	৩৯২২
১৯০১	৪২১৭
১৯১১	৬৩৭৫
১৯২১	৫১১৪
১৯৩১	৬৪৮৩
১৯৪১	৭১৩০
১৯৫১	৯২৩৮
১৯৬১	১৩৬০৮
১৯৭১	২০৫০১
১৯৮১	২৬২২৯
১৯৯১	৩৭৬৫৯
২০০১	৪৪৯৬৪

১৯১১–১৯২১ সাল ১২৬১ জন মানুষ কোথায় গেলেন ? মহামারী বা দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনো কারণে এমনভাবে জনসংখ্যা হ্রাস হল তার হিসাবনিকাশ ও সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২০০১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যায় যে, ৬ বৎসর পর্যন্ত বালকের সংখ্যা ১৭৭৯ জন এবং বালিকার সংখ্যা ১৭৮৬ জন অর্থাৎ মোট বালকবালিকার সংখ্যা ৩৫৬৫ জন, বিবর্তনের ক্ষেত্রে বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও নজর কাড়ে।) শিক্ষার হার ৯৩.৬৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৮৯.৪৫ শতাংশ নারী মোট ৯১.৬১ শতাংশ শিক্ষার হার বারুইপুর পৌরসভা এলাকার প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিতে বারুইপুরের জনগণ শান্তিপ্রিয় ও উন্নত। গড় আয় ১৯০১–১৯০২, ৪৭০০ টাকা এবং ব্যয় ৪৫০০ টাকা। ১৯০৩ – ১৯০৪ সালের গড় আয় ৬৯০০টাকা এবং ব্যয় ৭২০০ টাকা অর্থাৎ ঘাটতি ৩০০ টাকা কিন্তু মানুষ পিছু আয় ৩০০০ টাকা।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, উক্ত প্রেসিডেন্সি টাউনের বাইরে জেলায় মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের উদ্যোগ ১৮৪২ সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। ১৮৪২ সালে এই আইনে (দি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৮৪২) সরাসরি কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের অনীহা ও ঔদাসীন্যে এটি বলবৎ করা যায়নি।

কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিষেবামূলক ব্যবস্থার সংস্থান ছিল এই আইনে। এই আইনে সেই সময়

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ কি বয়ানে শপথ গ্রহণ করতেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

শপথ করিতেছি যে, আমি শ্রী/শ্রীমান ভারতেশ্বর, তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণের বিশ্বস্ত থাকিব ও তাঁহাদের প্রকৃত আনুগত্য স্বীকার করিব এবং যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করিব। আরও দেখা যায় যে, উক্ত শপথ হিন্দী, আরবী এবং ইংরাজী ভাষাতেও করা যেত। বর্তমান কমিশনার বিবর্তনে কাউন্সিলার হিসাবে পরিচিত হইয়াছেন। বর্তমান শপথের বয়ান নিম্নরূপ ঃ

"আমি ক খ .... পৌরসভার.......................... ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলার নির্বাচিত হইয়া সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভারতের সংবিধানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং আনুগত্য রাখিয়া কাজ করিব এবং আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সততার সহিত পালন করিব।" ৫০ ক ধারা শপথ গ্রহণের বিবর্তন দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত পন্থায় গোপনীয়তার শপথ গ্রহণের পর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের কোন সদস্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন,এই রকম বয়ানে ঃ– "আমি কখ শপথ পূর্ব্বক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার নিকট পেশকৃত কোন বিষয় অথবা চেয়ারম্যান / ভাইস চেয়ারম্যান / চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে জ্ঞাত কোন বিষয় আমার কর্তব্য সম্পাদনা প্রয়োজন ব্যাতীত কখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিব না। "১৮৪২ সালের আইনের উদ্দেশ্যে তৈরী বিভিন্ন পৌরবিষয়ক আইনের মধ্যে ক্রমানুসারে যে যে আইনগুলি উল্লেখযোগ্য তাহা হল ঃ–

১) <u>The improvement of Town Act 1850</u>

এই আইনে টাউন কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে , ঐ কমিটির মূল কাজ কি তাও বলা হয়েছে। সেগুলি হল ঃ (ক) রাস্তা (খ) নর্দমা (গ) জলাশয় তৈরী সংস্কার (ঘ) সাফাই (ঙ) আলোকিত করণ (চ) দেখভাল ও ন্যাক্কারজনক কাজকর্ম বন্ধ করা (ছ) সেই শহর বা শহরতলীর নানাবিধ উন্নয়ন ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ কর আরোপের কারণে এই আইনটি কিছুক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছিল। আমাদের শহরে যে যে জলাশয়গুলি এখনও বিদ্যমান তাহার বেশীরভাগ ঐ সময়ের পর থেকেই তৈরী করা হয়েছিল আবার মজাগঙ্গার অনেকাংশে পাড় বেঁধে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং প্রায় সেখান থেকেই এলাকার নাগরিকগন পানীয় জলের সমস্যা মেটাতেন, কিছু জায়গায় কিছু পুকুর বা জলাশয় 'কলপুকুর' নামে আজও খ্যাত এবং জলাশয় তৈরীর কাজকে পুণ্য কাজ বলে নাগরিকরা মনে করতেন, কারণ, জলের আর এক নাম 'জীবন'।

২) <u>The District Mucicipal Act 1864</u>

১৮৬৩ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার আর্মি স্যাঙ্কসান কমিশান নামে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই আইনটি রচিত হয়েছিল। মুখ্যত বৃহত্তর পৌরসভাগুলির জন্য রচিত হয়েছিল এই আইন।

৩) **The District Town Act 1868**

ভারতবর্ষের ছোট পৌরসভাগুলি এই আইনের ফলশ্রুতি। এই আইনেই আংশিক হলেও জনগণদ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পৌরপ্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এদের মুখ্য কাজ ছিল আরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা, নর্দমা, জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সাফাই পরিষেবা ইত্যাদি। ১৮৭৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় এই আইনের পরিচালনায় পৌরসভার সংখ্যা ছিল ১৮৪ টি। বর্তমান বিভক্ত বাংলায় পৌরসভার সংখ্যা ১২৫টি। এছাড়া কর্পোরেশনের সংখ্যা ৬ টি।

৪) **The Birth of death Registration Act 1873**

পৌরআইন বিবর্তনে ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটির গুরুত্ব অপরিসীম। Local self Government বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কথাটি এখানে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তাবে পৌরপরিষেবার উন্নয়নেই শুধু গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, রাজ্যস্তর থেকে পৌরস্তর পর্যন্ত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি উদঘাটিত করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসরণ করেই ১৮৬৪ সালে পৌরআইনটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে, ১৮৭৬ সালের নূতন একটি পৌরআইন প্রণীত হয়। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল – (ক) পৌরসভার মোট সদস্যের ২/৩ অংশ জনগণদ্বারা নির্বাচিত হবেন (খ) পৌরসভার আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধির জন্য নূতন কর স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান; (গ) পৌরসভাগুলির শ্রেণী বিন্যাস যথা ক, খ, গ এবং ঘ ; (ঘ) ওয়ার্ড কমিটি গঠন। এর থেকে দেখা যায় যে, পৌর আইনের বিবর্তনে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাবটি এককথায় যুগান্তকারী এবং সেজন্য একে বলা হয়েছে "Magnacharta of Municipal Administration in India"

এই প্রস্তাবের মুখ্য বিষয়গুলি হল ঃ

১) নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি (২/৩ অংশ করদাতা সদস্যদ্বারা নির্বাচিত) ২) নির্বাচিত সভাপতি / সহ-সভাপতি ৩) আভ্যন্তরীণ নয় কিন্তু বাহ্যিক সরকারী নিয়ন্ত্রণ, ৪) আর্থিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতার আবশ্যিক বিকেন্দ্রীকরণ ৫) আরক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত ইত্যাদি ও বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা।

২) **The Bengal Municipal Act 1884**

লর্ড রিপন প্রস্তাবিত বিষয়গুলি মুখ্যত এই আইনে বিধিবদ্ধ আছে। পৌর আইনের আধুনিকীরণের এই প্রয়াস বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয় লর্ড কার্জনের আমলে। বিকেন্দ্রীকরণের বদলে কেন্দ্রীয়করণই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এর প্রভাবে প্রশাসন চূড়ান্তভাবেই আমলাতান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁকে। পৌরআইনের বিবর্তনে ১৯০৭ সালে গঠিত হয় 'রয়্যাল কমিশন', বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন নামে যার পরিচিতি। তার সুপারিশগুলিও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড সংস্কারগুলি গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি একটি হস্তান্তরিত বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ের মন্ত্রী হন শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৪ সালের পৌর আইনটির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে

১৯২৩ সালে যে বঙ্গীয় পৌরআইনের খসড়া তিনি রচনা করেছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর তৎকালীন স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় বি.পি.সিং মহাশয়ের উদ্যোগে আইনে রূপান্তরিত হয়। The Bengal Municipal Act 1932 এই আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল চ্যাপ্টার ১ থেকে চ্যাপ্টার ২৭ পর্যন্ত এবং ধারাদি ১– ৫৫৭টির মধ্যে ঃ-

১) নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি।

২) মনোনীত চেয়ারম্যান প্রথার রদ।

৩) নির্বাচন বিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যাহার মধ্যে নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, সকল করদাতা ও লাইসেন্স প্রাপককে ভোটাধিকার প্রদানের অধিকার ইত্যাদি।

বিলেতের অনুকরণে ভারতেও রাজকীয় সনদের বলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তিকালে বিলেতে এই কর্পোরেশনগুলি পরিচালিত হতো। The Municipal Corporation Act 1835, The Municipal Corporation Act 1882 The Local Government Act 1933 দ্বারা কিন্তু ১৯৭৪ সালের থেকে লণ্ডন শহরের বাইরে কোনো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে বিলেতে স্থানীয় সায়ত্তশাসন, বিভাজিত জেলা কাউন্সিল, কাউন্টি কাউন্সিল, বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল এবং লণ্ডন শহরের জন্য সাধারণ কাউন্সিল এগুলির গঠন ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত করে।

The Bengal Municipal Act 1932

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। এঁর সম্বন্ধে শ্রী বি. আর. নন্দা সঠিকভাবে বলেছিলেন যে, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘপথের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'স্যার তাঁর নামের আগে যুক্ত হয়েছিল বটে কিন্তু স্বদেশপ্রেমের তীব্র আকুতি ও প্রেরণায় তিনি ভারতীয় জাতির জন্য তাঁর কর্মজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি কোলকাতার বিভিন্ন প্রদেশে শাখাসহ ইন্ডিয়া এ্যাসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমকালীন রাজনীতিতে তিনি ভারতীয় দাবিদাওয়া নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। রিপন পরবর্তী ব্রিটিশভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি. পথচারী, মন্দগতির সমতুল্য হয়েছিলেন। লর্ড ডাফরিল এর কল্পনা শক্তি ছিল কিন্তু তিনি বৈদেশিক সম্পর্কের সহিত অধিক মাত্রায় জড়িয়ে ছিলেন। লর্ড এলগিন্ ছিলেন বর্ণহীন, গ্লাডস্টোনীয় শাসনকর্তা আর ল্যান্স ডাউন ও কার্জন ছিলেন রক্ষণশীল। এদের পাল্লায় পড়ে শাসনক্ষেত্রে সর্বত্র ক্ষুদ্রতম পৌরসভা থেকে ভারত সচিব পর্যন্ত , দক্ষতাবৃদ্ধি, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শগ্রহণের নীতি গৃহীত হতে থাকে এবং শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে একটি বিল বিধানসভায় উপস্থিত করা হয়। ১৮৬৩/১৮৭৬ সালে আইন দুটিতে স্বীকৃত নীতির আমূল পরিবর্তন নীতির সুপারিশ করা হয়।

১৮৯৯ সালের কর্পোরেশন আইন নামে পরিচিত ম্যাকেঞ্জিএ্যাক্ট এটি কর্পোরেশনের ক্ষমতার পক্ষে বিস্তার অসম্ভব করে দেয়। পক্ষ দুটির ছেদন করে। চেয়ারম্যান ও জেনারেল কমিটি

বিপুল শাসন বিভাগীয় ক্ষমতাকে লাভ করে এই প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদগামী আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেজিসলেটিভ কাউন্সীলের অন্দরে ও বাহিরে এমন প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন যাহা ভারতের পৌর আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরবরে স্থান অধিকার করে আছে। কোলকাতা কর্পোরেশনের সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অধিকরণে ভারত সরকারের বক্তব্যকে সুরেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের সমকালীন নজির তুলে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। তাহা আইনি সভায় বিধৃত থাকে যে,

শহরের নাম	জনসংখ্যা	পৌরপিতাদের সংখ্যা
গ্লাসগো	৭০৫০৫২জন	৭৮ জন
এডিনবার্গ	২৭৬৫১৪ জন	৪১ জন
ম্যানচেষ্টার	৫২৯৫৬১ জন	১০৪জন
বার্মিংহাম	৫০১২৪১ জন	৭২ জন
লিভারপুল	৬৩২৫১২ জন	৬৪ জন
শেফিল্ড	৩৪৭২৭৮ জন	৬৪ জন
লীডস	৪০২৪৪৯ জন	৩৪জন

উপরোক্ত সব শহরগুলির জনসংখ্যার তুলনায় কলিকাতার জনসংখ্যা অধিকতর (৬৫০০০০) এবং নিঃসন্দেহে অনেক বেশী মিশ্র প্রকৃতির। কাজেই কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা আইনের কৃত্রিম মারপ্যাচে হ্রাস করা অনভিপ্রেত বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৮৭৬ সালে লেঃ গভর্নমেন্ট স্যার রিচার্ড টেম্পস এই সংখ্যা হ্রাসে সম্মত হননি বরং তিনি কোলকাতায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির জন্য আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯১৯ সালে ভারত সরকার-এর স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ ঐ বিল পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর রচিত আইনের খসড়া ১৯২৩ সালের পৌরসভার আইন বা সুরেন ব্যানার্জীর আইন নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভোটারদের যোগ্যতার মাপকাঠি ১৯২৩ সালের আইনে কিছুটা সহজ সরল করা হয়। ভোটার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। পৌরনির্বাচনে পূর্বতন আইনের বিধানে এক ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী একই ওয়ার্ডে সর্বাধিক এগারোটি ভোটের অধিকার লাভ করতে পারতেন। ভোটগুলি তিনি একই ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারতেন। এরূপ ব্যবস্থা ১৯২৩ সালের আইনে রদ করা হয়।

১৯২৩ সালের আইন আরো একটি মৌল পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বতন আইনে চেয়ারম্যান, কর্পোরেশন ও অন্যান্য কমিটিগুলির সভায় সভাপতিত্ব করতেন। এবং স্পীকারের মত দায়দায়িত্ব পালন করতেন। এবং কর্পোরেশনের মুখপাত্র হিসেবে কাজকর্ম করতেন।

বিকেন্দ্রীকরণ কমিটির সুপারিশ মেনে কার্যাদি পালনের জন্য চীপ একসিকিউটিভ অফিসার চেয়ারম্যানের পদ লুপ্ত করা হয়, কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে।

পৌরসভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদিগের উপর দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়। একসিকিউটিভ অফিসার ও ফিনান্স অফিসারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৯২৩ সালে আইন ভোটদানে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর ভোটদান ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার স্বীকার করে। নারীর ভোটদানের অধিকারের সপক্ষে সেই সময় দাবী প্রবল ছিল না। ১৯২৩ সালের আইন জনকল্যাণকর কতকগুলি কাজকর্মের দায়দায়িত্ব যথা ড্রেনেজ, সোয়ারেজ, আলো এবং জল ইত্যাদি পৌরসভার হাতে অর্পণ করে। দরিদ্রশ্রেণীর সকল নাগরিকদের জন্য উক্ত পরিষেবা দেবার বিধি প্রণয়ন করা হয় এবং সমস্ত ব্যয়ভার পৌরভাণ্ডার থেকে করবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৮২ সালের লর্ড রিপনের প্রতিবেদন তদানুসারে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় পৌরআইনের একটি উন্নততর সংস্করণ হিসাবে বিবেচ্য হয়। ১৯৮৪ সালের আইন পৌরসভাগুলির সংগঠন কাজকর্ম ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে কতকগুলো মৌল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

Bengal Municipal Act 1932 বা এ্যাক্ট ১৫৩২ নামে যার পরিচিতি ছিল, তার ১৯৫৫ ও ১৯৮০ সালে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পরিবর্তন সাধন করা হয়। প্রথমত প্রাগ্রসর পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে তিনি ৩/৪ অংশ কিছু বেশী সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয়ত তিনি ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ঘটান। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং পৌরকরদাতা বা লাইসেন্সধারী হলেই সবাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন এবং পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি নারীর ভোটাধিকারের পথিকৃৎ ছিলেন।

তৃতীয়ত উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল সত্ত্বেও তিনি পৌরসভাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের বিশৃঙ্খলতা ও স্বৈরতান্ত্রিক অবসান ঘটিয়ে দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ ও সংশোধণ মূলক কার্যক্রম গ্রহণের পথনির্দেশ করেছিলেন।

চতুর্থত পৌরকর ব্যবস্থার সংস্কারের তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ব্যক্তির উপর আরোপিত কর তিনি বিলোপের ব্যবস্থা করেন। সম্পত্তির মূল্য নির্ধারনের দায়িত্ব তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে নির্বাচিত পক্ষপাতহীন সম্পত্তিকরের অযৌক্তিকতার অভিযোগ শুনানীর জন্য তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান, একজন পৌরপিতা ও সরকারের মনোনীত একজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি গঠনের বিধান লিপিবদ্ধ করেন, বর্তমানে যাহা 'রিভিউ কমিটি' নামে পরিচিত।

পঞ্চমত বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে তিনি শুধু রাস্তাঘাট, নর্দমা, নালা, অট্টালিকা, বস্তী ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আলো ও জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্প্রসারণ শুধু নয়, রোগ ও মহামারী সংক্রমণ রোধ, পৌরবাজার নির্মাণ, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নথিভুক্তিকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ঔষধ ও দুগ্ধ সরবরাহ, কসাইখানা স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা করেন, পৌরসভাগুলির ঐচ্ছিক কাজকর্মের তালিকা

থেকে পৌরআদালত ও গনণপ্রয়োজন চরি ...খ করবার সংগঠন স্থাপনের ব্যয়বহুল ক্রিয়াকর্ম বিমুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিক ভাবে পরিলক্ষিত হত না। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ১২০টির মত পৌরসভা চালু হল। ৮০ দশকের শেষে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ন্যাশানাল কমিশন অব আরবানাইজেশন তাদের প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন যে, urban India is in a Mess.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭ দশকের শেষভাগে পৌরউন্নয়নের জন্য আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি গঠন করেন। ঐ কমিটির সুপারিশগুলি হল ঃ–

ক) কোলকাতা ও কোলকাতার বহির্ভূত পৌরাঞ্চলে মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবধান সথাসম্ভব কমিয়ে এনে পৌরউন্নয়নে আন্তঃআঞ্চলিক সমতা বিধান।

খ) পৌরউন্নয়নে আঞ্চলিক সম্পদের যথাসম্ভব অধিকতর ব্যবহার।

গ) দরিদ্র ও দুর্বলতর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অগ্রাধিকার।

ঘ) উন্নয়ন কর্মসূচীর বিকেন্দ্রীকরণ।

ঙ) নগর পরিষেবা ও নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব পৌরসভাতেই ন্যস্ত করা, নগর উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সি.এম.ডি.এ. এলাকাভুক্ত পৌর অঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্ব পৌর বিষয়ক বিভাগের উপর ন্যস্ত করা। বিবর্তনে সি.এম.ডি.এ. – কে, এম.ডি.এ-তে পরিবর্তিত হয়েছে।

চ) পৌরনির্বাচকের নিম্নতম বয়স ২১ বৎসরের পরিবর্তে ১৮ বৎসর করা (পরবর্তিকালে সর্বভারতীয় নির্বাচনে নির্বাচকের বয়স অনুরূপ করা হয়।

ছ) নতুন নতুন পৌর আইন রচনা ও পুরানো পৌরআইন ও নিয়মাবলীর নিয়মিত সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন, এই পর্যায়ে প্রণীত আইনগুলি হল ঃ

ক) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ আইন ১৯৭৮ বর্তমানে যাহা পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ হিসাবে সংশোধিত।

খ) কলকাতা মিউনিসপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০।

গ) হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০।

ঘ) শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০।

ঙ) চন্দনগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০।

চ) চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০।

ছ) দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৯৪।

জ) পশ্চিবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৩।

ঝ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন ১৯৯৩।

ঞ) পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি এবং দেখভালের জন্য Directorate of Local Bodies.

ট) পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিত কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত Municipal Engineering Directorate প্রতিষ্ঠা।

ঠ) পৌরপ্রতিষ্ঠানের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং কর্মচারীবৃন্দের নিয়মিত শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা ও পৌর বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কর্ম ও তথ্য সংগ্রহ পরিচালনার জন্য Institute of Local Government and Urban Studies

ড) দারিদ্র্য দূরীকরণ রূপায়ণের জন্য রাজ্যস্তরে State Urban Development Agency ও জেলাস্তরে District Urban Development Agency গঠন ইত্যাদি।

৭৪তম সংবিধান সংশোধন ঃ- সর্বভারতীয় পৌর ইতিহাসের বিবর্তনে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। ১৯৮৮ সালে ন্যাশনাল কমিশন অন আরবানাইজেশন তাঁদের প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় পৌর নৈরাজ্যের চিত্রটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বেও ঐ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন করেন ১৯৯২ সালে।

ভারতীয় সংবিধানে ৭তম তপশীলে রাজ্য তালিকায় (তালিকা -২) পঞ্চম স্থানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে অর্পিত হয়। সংবিধানের ৩য় অধ্যায়ে ১২নং ধারায় স্টেট বলতে কেবলমাত্র কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে বোঝানো হয়নি। মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা, পঞ্চায়েত বা বিধিবদ্ধ অন্য ধরনের স্থানীয় সংস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

আমার ধারণা – পৌরসভাগুলি স্বশাসিত রাজ্য হিসাবে ভারতীয় জাতীয় অশোকচক্র ব্যবহার করার সাংবিধানিক অধিকার অর্জন করেছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় কি অভিমত পোষণ করেন তা জানার আগ্রহ রইল। সংবিধানের ২৪৩ আর অনুচ্ছেদের ২ ধারায় রাজ্য সরকার আইন দ্বারা প্রতিনিধি হিসাবে যাদের নাম সুপারিশ করবেন পৌরপ্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে, ১) সেই সমস্ত মানুষজন যারা পৌরপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ। ২) হাউস অফ পিপলসের এম.পি. সদস্য এবং এম.এল.এ. যারা সেই পৌর কেন্দ্রের অংশত বা পূর্ণত অধিকারী। ৩) কাউন্সিল অফ বোর্ডের সদস্য এবং লেজেসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য যাদের নাম ঐ পৌরএলাকাভুক্ত এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত আছে। ৪)২৪৩ এস (৫) ধারায় গঠিত কমিটির চেয়ারপার্সন অধিকন্তু ১ নং ধারায় উল্লিখিত ব্যাক্তিগণের পৌর মিটিং-এ ভোটাধিকার থাকবে না। তিনি উপস্থিত থাকিবার মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। এই যুগান্তকারী বিবর্তনের ধারায় এম.পি., এম. এল.এ ল্যাড-এর টাকায় পৌরএলাকায় উন্নতি সাধন হয় কিন্তু সংবিধানের অধিকারী রাজ্য সরকার অদ্যাবিধি কোন আইনপ্রণয়ন করেননি তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ বিষয়ে মাননীয়

রাজ্যপাল, মাননীয় রাজ্য সরকার ও সংবিধান বিশেষজ্ঞগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৭৪তম সংবিধানের সুপারিশ মেনে দারিদ্রাসীমার নীচে বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ বিশেষ প্রকল্পগুলি গৃহীত হয়েছে সেগুলি হল– ১) শহরে বস্তির পরিবেশ উন্নয়ন (ই.আই.ইউ.এস) প্রকল্প, ২) খাটা পায়খানার অপসারণ ও স্বল্পমূল্যে পায়খানা নির্মাণ, ৩) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, ৪) মৌল নূনতম পরিষেবা, ৫) জাতীয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, ৬) আই. পি. পি.-৮, সি.এম.ডি.এ. এলাকা, ৭) বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, ৮) শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।

সার্বিক পৌরউন্নয়নের জন্য গৃহীত পৌরপ্রকল্পগুলি হল ঃ–

(১) সি.এম.ডি.এ. (বর্তমানে কে.এম.ডি.এ.) এলাকাভুক্ত পৌরউন্নয়নের জন্য মেগাসিটি প্রকল্প। ২) পানীয় জল সরবরাহ, ৩) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের উন্নয়ন, ৪) শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে রাস্তাঘাট মেরামত সম্প্রসারণ ও উন্নতকরণ, ৫) নতুন রাস্তা নির্মাণ, জলনিকাশী, রাস্তার আলো, বাজার, পার্ক, বাস ট্রাম স্ট্যান্ড ইত্যাদির উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত মুক্ত অনুদান (যাহা বর্তমানে ২ বৎসর বন্ধ থাকার ঘোষণা মন্ত্রী মহাশয় করিয়াছেন) । ৬) হাডকোর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অতিবর্ষণ ও বন্যাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটের বিশেষ সংস্কার ও উন্নয়ন। ৭) উন্নয়ন কর্মসূচীতে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকল্প ৭৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে পৌরসভার হাতেই রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পৌরসভার তহবিলে জমা করা। ৮) বিদেশী অর্থ ও কারিগরী সহায়তায় উন্নয়ন, দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ১৯৯৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে সমগ্র ভারতের পৌরঅঞ্চলেই ভারতে স্বর্ণজয়ন্তীবর্ষে (স্বর্ণজয়ন্তী রোজগার যোজনা) চালু হয়েছে ৩ টি প্রকল্পের মাধ্যমে।

১) দরিদ্রের জন্য পৌর মৌল পরিষেবা প্রকল্প, ২) নেহেরু রোজগার যোজনা, ৩) প্রধানমন্ত্রীর সুসংহত পৌর দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্প। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত ১) মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন ২) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন। বারুইপুর পৌরসভা ও বিষয়ে প্রথম পাড়াগোষ্ঠী, বস্তিসমিতি, সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ৫ লক্ষাধিক টাকা অনুদান পেয়েছে, সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে সি.ডি.এস. মহিলাগণ লক্ষাধিক টাকা জমা করেছেন, ডাকুয়া গ্রুপ গঠনের মধ্য দিয়ে প্রথম দরিদ্র মহিলাদের উপার্জনের রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। এটি একটি বৈপ্লবিক বিবর্তন বলে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। বিবর্তনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়।

বিংশ শতাব্দীতে এই প্রকল্পের সাহায্যে পৌরাঞ্চল থেকে খাটা পায়খানার ব্যবহার ও সাফাই কর্মীর সাহায্যে মল পরিবহনের মত ন্যক্কারজনক একটি প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে – কেন্দ্রীয় সরকারকৃত ১৯৯৩ সালে Employment of Mannual Ser Vengers and Construction of Dry Latrine আইন প্রণয়ন করেন।

আমাদের বারুইপুর পৌরসভা থেকে ঐ আইন বলে খাটা পায়খানা প্রথার অবসান ঘটানো

হয়েছে, আরও প্রকাশ থাকে যে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান পৌরবোর্ড বিশেষ করে সর্বপ্রথম মহিলাদের জন্য শৌচালয় স্থাপন করে এবং পুরুষদের জন্য শৌচালয় স্থাপন করে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে শহরাঞ্চলের মানুষদের জন্য বৈপ্লবিক প্রশাসনিক উন্নয়নের সাক্ষ্য রেখেছেন। পঃ বঃ সরকার গ্রুপ ডি এবং ই পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে প্রশাসন উন্নততর করার জন্য সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল প্রথা রদ করেন এবং বিবর্তনের পথে যে আইনটি প্রণয়ন করেন। প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াবার জন্য তাহার বর্তমান নাম হল স্ট্যান্ডিং কমিটি পৌরএলাকায় পৌরসভাগুলি নাগরিকদের কি কি পরিষেবা দেবে তা আইনে বিশদভাবে বলা আছে। কাজগুলিকে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দুইভাগে ভাগ করা আছে। আবশ্যিক তালিকার কাজগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) জল সরবরাহ ২) জলনিকাশী ৩) শৌচাগার ৪) রাস্তা, সেতু, উড়ালপুল, সুড়ঙ্গ পথ তৈরী ৫) রাস্তার নাম দেওয়া ও বাড়ীর নম্বর দেওয়া ৬) জনসাধারণের জায়গা ও রাস্তার আলো দেওয়া ৭)রাস্তার ধারে গাছ লাগানো ৮) বাজার কসাইখানা তৈরী ও দেখাশুনা ৯) স্মৃতি স্তম্ভের দেখাশোনা ১০) আগুন নেভানোর জন্য জলের ব্যবস্থা ১১) জঞ্জাল ও আবর্জনা সংগ্রহ এবং তরল ও কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ১২) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা ১৩) খাল ও গৃহস্থালীতে জল সরবরাহ ১৪) কূয়া / পুকুর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ১৫) মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ১৬) মৃতদেহ সৎকারের উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা ১৭) বে-ওয়ারিশ মৃত দেহ ও মৃত জন্তু জানোয়ারের দেহ সৎকারের ব্যবস্থা ১৮) অনিষ্টকর কুকুর ও পশু পাখি থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা ১৯) খাটা পায়খানা তুলে দিয়ে সেনিটারী পায়খানা তৈয়ারী ২০) খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করার লক্ষ্যে যথেষ্ট শৌচাগার তৈরী ২১) শহর পরিকল্পনা ও শহরের সীমান্ত পরিকল্পনা ২২) বস্তি উন্নয়ন ২৩) বাড়ীঘর নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা ২৪) জনসাধারণের জন্য পার্ক বাগান ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা ২৫) জনবসতির জন্য নতুন এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন ২৬) ইতিহাস অথবা শিল্পমূল্য জড়িয়ে আছে এমন স্মৃতিস্তম্ভ বা জায়গার রক্ষণাবেক্ষণ ২৭) শহরকে সুন্দর করার জন্য জলের ফোয়ারা বা মূর্তি বসানো, নদীর ধার সাজানো ২৮) বাড়ীঘরের সমীক্ষা ও মানচিত্র তৈরী করা ২৯) শহরের বে-আইনী ও জবরদখল সরানো ও বে-আইনী নির্মাণ ভাঙ্গা। ৩০) পুরএলাকার সীমানা চিহ্নিত করা ৩১) পুরসভার কাজকর্মের উপর প্রতিবছর প্রতিবেদন তৈরী করা ও তথ্য সংগ্রহ করে একজায়গায় করা ৩২) পুরসভার সম্পত্তি রক্ষা ও উন্নতি করা ৩৩) দমকলের আইন মেনে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা ৩৪) পুরকর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ও লোক পরিষেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা ৩৫) জাতীয় উৎসবের দিন পালন করা ইত্যাদি।

ঐচ্ছিক তালিকায় যে কাজগুলির কথা বলা আছে পৌরসভা ইচ্ছা করলে সেই কাজগুলি আংশিক বা পুরোপুরিভাবে করতে পারে। তা হল ১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যকারণে দুর্গত মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা ২) লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, কমিউনিটিহল, বাজার, দোকান, ধর্মশালা, খেলাধুলার কেন্দ্র, সাঁতার কাটার পুল, স্নানের জায়গা ও দুর্গতজনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা

৩) অসুস্থ / অনাথ শিশু ও বৃদ্ধদের দেখাশোনার জন্য বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি তৈরী ও দেখাশোনা ৪) মা ও শিশু কল্যাণের জন্য হাসপাতাল তৈরী ও ব্যবস্থাপনা ৫) নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য যন্ত্রচালিত যানবাহনের ব্যবস্থা করা ৬) বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করা ৭) সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বাড়ী তৈরী ৮) পুরকর্মীদের জন্য বাড়ী তৈরী ৯) প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুদের জন্য ক্রেস তৈরী ১০) সমাজে শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ইত্যাদি ১১) সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ১২) সভা, সেমিনার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জনচেতনা বাড়ানো ১৩) পত্রপত্রিকা প্রকাশ ১৪) গরু ইত্যাদির খোঁয়াড় তৈরী ১৫) অপরিশোধিত জল সরবরাহ (যা গাড়ীতে ব্যবহার হবে না) ১৬) বায়োগ্যাস ও অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারের প্রসার ১৭) বর্জ্য পদার্থ দিয়ে সার তৈরী ১৮) ধোঁয়া দূষণ রোধে ব্যবস্থা ১৯) দুধের ডেয়ারী অথবা ক্রিম তৈয়ারী করে দুধ ও দুধের তৈরী জিনিষ যোগান দেওয়া, তবে খাটাল বসানো চলবে না ২০) রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা, ২১) সম্মানীয় নাগরিকদের সম্বর্দ্ধনা জানানো ও এরূপ মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সম্মান জানানো বা মূর্তি ও ছবি বসানোর ব্যবস্থা ২২) মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ২৩) শিল্প প্রদর্শনীর কক্ষ ইত্যাদির ব্যবস্থা ২৪) গাড়ী রাখার গ্যারেজ অথবা শেড তৈরী ও দেখাশোনা ২৫) সমাজ কল্যাণের পক্ষে আশ্রমের ব্যবস্থা স্বেচ্ছাসেবীর কাজের মধ্যে সমন্বয় ২৬) সমবায় গঠন বিশেষ করে সমবায় আবাস তৈরীতে উৎসাহ দেওয়া ২৭) নিরাশ্রয়ের জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা ২৮) বাড়ী ঘর তৈরীর মালমশলা তৈরী ও নায্য দামে বিক্রি ২৯) পতিত জমি উদ্ধার করে সামাজিক বনসৃজন ৩০) সবুজায়নের লক্ষ্যে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ফুল , সব্জি চাষ ও গাছ লাগানো ৩১) শহরে ফুল চর্চায় উৎসাহ দেওয়া ৩২) গোপালন মুরগীর খামার, কৃষি, মাছ চাষ ও গাছ লাগানো ৩৩) ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পকে সাহায্য, হরিজনদের পুনর্বাসন ৩৪) সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করার ব্যবস্থা ৩৫) সমষ্টির উপকারে আসবে এমন তথ্য সংগ্রহ ৩৬) জেলা আঞ্চলিক পরিকল্পনার সাথে শহর পরিকল্পনা সংযুক্ত করা ৩৭) নাগরিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও কাজ।

অর্থসংস্থানের জন্য পৌরসভার আয়ের উৎসগুলি হল ঃ

১) পৌরসভার ধার্য নির্ধারিত কর, কর মাশুল, শুল্ক ইত্যাদি ২) কোন নির্দিষ্ট পরিষেবায় কি নিয়মে পৌরসভা ফি নিতে পারে ৩) দোকানঘর, বাজার, হলঘর, ট্যুরিস্ট লজ, ইত্যাদি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ যদি পৌরসভা করে তবে সেই সূত্রে আয় ৪) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ও কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা ঋণ। ৫) কোন দান থেকে সংগৃহীত অর্থ।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে পৌরসভা পুরাতন আইনে মানুষের উপর কর ধার্য করতেন কিন্তু বর্তমানে বিবর্তনে জমি বাড়ীর উপর ধার্য করেন অবশ্য সাধারণভাবে কোন ক্ষেত্রেই সম্পত্তির উপর জমি ও বাড়ীর বাহ্যিক মূল্যে শতকরা চল্লিশ ভাগের বেশী হবে না। রাজ্য সরকার প্রয়োজন মনে করলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে করের হার নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন

কিন্তু পাঁচ বছরে একবারের বেশী করা যাবে না। যে সব বাড়ী ব্যবসাবাণিজ্য অথবা বসবাসের জন্য ব্যবহার হয় না, সেই রকম বাড়ীর উপর ধার্য কর ছাড়াও সারচার্জ নেওয়া যায়। ইহার হার বাড়ীর উপর ধার্য মোট করের কুড়ি শতাংশ কম অথবা পঞ্চাশ শতাংশের বেশী হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপর কর বসানো যাবে না। অবশ্য ১৯৯৩ সালে পৌর আইন তৈরীর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব সম্পত্তির কর ছিলো সেই সব সম্পত্তির উপর কর ধার্য করতে কোন বাধা নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বা সেবা ব্যয় আদায় করা যায়। এ বিষয়ে বাহ্যিক মূল্য কিভাবে ঠিক করা হয় তাহা সূত্রটি নিম্নে দেওয়া হলো।

১) যখন বাহ্যিক মূল্য (এ.ভি.) ১০০০টাকার কম (এ.ভি. + ১০) শতাংশ x এ. ভি.

২) যখন বাহ্যিক মূল্য ১০০০ টাকার বেশী (এ.ভি. + ২২) শতাংশ x এ.ভি. অর্থাৎ ধরা যাক কোথাও বাহ্যিক মূল্য ৫০০ টাকা, সেখানে করের হার হবে (৫০০ + ১০) / ১৫ / ১০০ x ৫০০ = ৭৫ টাকা। ধরা যাক বাহ্যিক মূল্য (এ.ভি.) ৫০০০ টাকা, বাহ্যিক কর ৫০০০ +২২ / ১০০০ = ২৭/১০০ x ৫০০০ = ১৩৫০ টাকা। করের সর্বাধিক হার হবে বাহ্যিক মূল্যের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। পূর্বের মূল্যায়ন পর্ষদ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ করের মাত্রা বা মূল্যায়ন ঠিক করে দেন। পৌরনাগরিকগণ যদি মনে করেন ঐ করের মাত্রা বেশী হয়েছে তাহলে নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পৌরপ্রধানের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং পাঁচজনের রিভিউ কমিটি সেটি বিবেচনা করে চূড়ান্ত রায় দেন এবং সেই মত কর সংগ্রহ করেন আমাদের ট্যাক্স কালেকটরগণ। বিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বশাসিত পৌর সংস্থাগুলির শ্রেণী বিভাজনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। পৌরসভাগুলির শ্রেণী বিভাজনের উপরেই আর্থিক অনুদান ও ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতি ঠিক করা হয়। পৌরসভার আওতাভুক্ত প্রাথমিক ও মূল স্তম্ভ এটাই। পৌরনিগম কিংবা এ.বি.সি.ডি.ই. প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার এ ওয়ান কিংবা শুধু এ অথবা বি তালিকাভুক্ত করে আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি গুরুত্ব বিভাজন করা হয়েছে। ১৮৬৬ সালে গঠিত মেদিনীপুর পৌরসভাকে এখনও 'সি' এবং বারুইপুর পৌরসভাকে 'ডি' ক্যাটিগরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ পার্শ্ববর্তী পৌরসভা রাজপুর সোনারপুর শ্রেণী বিন্যাসে এ তালিকাভুক্ত এমনকি মহেশতলা পৌরসভা এ ক্যাটাগরীতে। বাস্তব ঘটনা হলো, জেলার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বারুইপুর রীতিমত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ বিষয়ে বঞ্চনা বিবর্তনের তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো ঃ ১৯৯১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠাবর্ষ শ্রেণী বিভাজন মোট জনসংখ্যা ২০০১।

সারণি – ১

১৯৯১ এবং সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত পৌরসংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠাবর্ষ সহ শ্রেণী বিভাজন এবং মোট জনসংখ্যা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নাম	প্রতিষ্ঠাবর্ষ	শ্রেণীবিভাজন	মোটজনসংখ্যা	
১ ২	৩	৪	৫	
			১৯৯১	২০০১
১) কলকাতা পৌর নিগম	১৭২৬	পৌরনিগম	৪৩৯৯৮১৯	৪৫৮০৫৪৪
২) হাওড়া পৌরনিগম	১৮৬২	পৌরনিগম	৯৫০৪৩৫	১০০৮৭০৪
৩) বালি	১৮৮৫	বি	১৮৪৪৭৪	২৬১৫৭৫
৪) উলুবেড়িয়া	১৯৮২	বি	১৭৩৫৫৫	২০২০৯৫
৫) বাঁশবেড়িয়া	১৮৬৯	সি	৯৩৫২০	১০৪৪৫৩
৬) হুগলি-চুঁচুড়া	১৮৬৫	বি	১৫৫০৯৬	১৭০২০১
৭) চন্দননগর পৌরনিগম	১৯৫৫	পৌরনিগম	১২০৩৭৮	১৬২১৬৬
৮)ভদ্রেশ্বর	১৮৬৯	সি	৭৯৯৬৩	১০৫৯৪৪
৯) চাঁপদানি	১৯১৬	সি	১০১০৬৭	১০৩২৩২
১০)বৈদ্যবাটি	১৮৬৯	সি	৯০০৮১	১০৮২৩১
১১)শ্রীরামপুর	১৮৪২	সি	১৩৭০২৮	১৯৭৯৫৫
১২)রিষড়া	১৯৪৪	সি	১০৬৮১৫	১১৩২৫৯
১৩)কোন্নগর	১৯৪৪	ডি	৬২২০০	৭২২১১
১৪)উত্তরপাড়া - কোতরং	১৯৬৪	সি	১৩২০৪৬	১৫০২০৪
১৫)কাঁচড়াপাড়া	১৯১৭	সি	১০০১৯৪	১২৬১১৮
১৬) হালিশহর	১৯০৩	সি	১১৪০২৮	১২৪৪৭৯
১৭) নলহাটি	১৮৬৯	বি	১৭২৫৪০	২১৫৪৩২
১৮) ভাটপাড়া	১৮৯৯	এ	৩৮৪০৪৪	৪৪১৯৫৬
১৯)গারুলিয়া	১৮৯৬	সি	৮০৯১৮	৭৬৩০০

২০) উত্তর ব্যারাকপুর	১৮৬৯	সি	১০৪৯৩৬	১২৩৫২৩
২১) ব্যারাকপুর	১৯১৬	সি	১৩৩২৬৫	১৪৪৩৩১
২২) টিটাগড়	১৮৯৫	সি	১১৪০৮৫	১২৪১৯৮
২৩) খড়দহ	১৮৬৯	সি	৮৮৩৫৮	১১৬২৫২
২৪) পানিহাটি	১৯০০	এ	২৭৫৯৯০	৩৪৮৩৭৯
২৫) কামারহাটি	১৮৯৯	এ	২৬৬৮৮৯	৩১৪৩৩৪
২৬) বরানগর	১৮৬৯	এ	২২৪৮২১	২৫০৬১৫
২৭) বারাসাত	১৮৬৯	বি	১৭৪৪৪৫	২৩১৫১৫
২৮) মধ্যমগ্রাম	১৯৯৩	সি	১০৬৯১৪	১৫৫৫০৩
২৯) নিউ ব্যারাকপুর	১৯৬৫	ডি	৬৩৭৯৫	৮৩১৮৩
৩০) উত্তর দমদম	১৮৭০	বি	১৪৯৯৬৫	২২০০৩২
৩১) দমদম	১৯২৯	সি	৪০৯৬১	১০১৩১৯
৩২) দক্ষিণ দমদম	১৮৭০	এ	২৩২৮১১	৩৯২১৫০
৩৩) বিধাননগর	১৯৮৯	সি	১১৯০৪৮	১৬৭৮৪৮
৩৪) রাজারহাট-গোপালপুর	১৯৯৩	বি	১৬২৪৬৪	২৭১৭৮১
৩৫) বজবজ	১৯০০	বি	৭২৯৫১	৭৫৪৬৫
৩৬) রাজপুর-(সোনারপুর)	১৮৭৬	এ	২২৯৪১৬	৩৩৬৩৯০
৩৭) মহেশতলা	১৯৯৩	এ	৩০৮০০০	৩৮৯২১৪
৩৮)বারুইপুর	১৮৬৯	ডি	৩৭৬৫৯	৪৪৯৬৪
৩৯) পূজালি	১৯৯৩	ই	৩০০০০	৩৩৮৬৩
৪০) কল্যাণী (নোটিফায়েড)	১৯৯৫	ডি	৫৫৫৭৯	৮১৯৮৪
৪১) গয়েশপুর (নোটিফায়েড)	১৯৯৫	ডি	৫৫৫৭৯	৮১৯৮৪
কলকাতা মহানগর বহির্ভূত				
৪২) কোচবিহার	১৯৪৬	ডি	৭১২১৫	৭৬৮১২
৪৩) দিনহাটা	১৯৭৩	ডি	৩৪৩৭৫	৩৪৩০৩
৪৪) তুফানগঞ্জ (টাউন)	১৯৮৩	ই	১৬৪১৮	১৯২৯৩

৪৫) মাথাভাঙা	১৯৮৬	ই	১৭৩৩৬	২১১১০
৪৬) মেখলিগঞ্জ	১৯৮৩	ই	৮২০৫	১০৮৩৩
৪৭) হলদিবাড়ি	১৯৮৩	ই	১৩৩৭০	১৩১৭০
৪৮) জলপাইগুড়ি	১৮৮৫	সি	৯০৮২৫	১০০২১২
৪৯) আলিপুরদুয়ার	১৯৫৭	ডি	৬৫২৪১	৭৩০৪৭
৫০) ম্যাল	১৯৯০	ডি	২৯০৩৫	২৩২১২
৫১) দার্জিলিং	১৮৫০	এ	৭৩০৬২	১০৭৫৩০
৫২)কার্শিয়াং	১৮৭৯	ডি	২৬৭৫৮	৪০০৬৭
৫৩)কালিম্পং	১৯৪৫	সি	৩৮৮৩২	৪২৯৮০
৫৪)মিরিক	১৯৮৪	ই	৭০২২	৯১৭৯
৫৫) শিলিগুড়ি পৌর নিগম	১৯৯৪	পৌরনিগম	৩৭৬৪৯২	৪৭০২৭৫
৫৬)রায়গঞ্জ	১৯৫১	বি	১৫১০৪৫	১৬৫২২২
৫৭)ইসলামপুর	১৯৮১	ডি	৪৫২৪০	৫২৭৬৬
৫৮) কালিয়াগঞ্জ	১৯৮৭	ডি	৪৩৭৬৫	৪৭৬৩৯
৫৯)বালুরঘাট	১৯৫১	সি	১১৯৭৯৬	১৩৫৫১৬
৬০)গঙ্গারামপুর	১৯৯৩	ডি	৪৭০০০	৫৩৫৪৮
৬১)ইংলিশবাজার	১৮৬৯	সি	১৩৯২০৪	১৬১৪৪৮
৬২)পুরনো মালদহ	১৯৬৯	ডি	৪১৭০৮	৬২৯৪৪
৬৩)সিউড়ি	১৮৭৬	ডি	৫৪২৯৮	৬১৮১৮
৬৪)রামপুরহাট	১৯৫০	ডি	৪৩২৭৫	৫০৬০৯
৬৫) বোলপুর	১৯৫০	ডি	৫২৭৬০	৬৫৬৫৯
৬৬)দুবরাজপুর	১৯৭৫	ডি	২৬৯৮৩	৩২৭৫২
৬৭) সাঁইথিয়া	১৯৮৭	ডি	৩০০২৪	৩৯২৪৪
৬৮)কৃষ্ণনগর	১৮৬৪	সি	১২১১১০	১৩৯০৭০
৬৯)নবদ্বীপ	১৮৬৯	সি	১২৫০৩৭	১১৫০৩৬
৭০)শান্তিপুর	১৮৫৩	সি	১০৯৯৫৬	১৩৮১৯৫

৭১)রানাঘাট	১৮৬৪	ডি	৬২৫৩২	৬৮৭৫৪
৭২) বীরনগর	১৮৬৯	ই'	২০০১৫	২৬৫৯৬
৭৩) চাকদহ	১৮৮৬	ডি	৭৪৭৬৯	৮৬৯৬৫
৭৪) তাহেরপুর	১৯৯৩	ই	১৮৬৫৪	২০০৬০
৭৫) কুপার্স ক্যাম্প	১৯৯৭	ই	১৫৫৫২	১৭৭৫৪
৭৬) বনগাঁ	১৯৫৪	সি	৭৯৫৭১	১০২১১৫
৭৭) গোবরডাঙা	১৮৭০	ডি	৩৫৯৩৯	৪১৬১৮
৭৮) বাদুড়িয়া	১৮৬৯	ডি	৪১৭৬২	৪৭৪১৮
৭৯) বসিরহাট	১৮৬৯	সি	১০১৪০৯	১১৩১২০
৮০) টাকি	১৮৬৯	ডি	৩০৪২১	৩৭৩০২
৮১) অশোকনগর-কল্যাণগড়	১৯৬৮	সি	৯৬৭৪৪	১১১৪৭৫
৮২) হাবড়া	১৯৭৯	সি	১০৫৮২৩	১২৭৬৯৫
৮৩) জয়নগর-মজিলপুর	১৮৬৯	ই	২০২১৭	২৩৩১৯
৮৪) ডায়মণ্ডহারবার	১৯৮২	ডি	৩০২৬৬	৩৭২৩৮
৮৫)মেদিনীপুর	১৮৬৫	সি	১২৪৫৯৮	১৫৩৩৪৯
৮৬) তমলুক	১৮৬৪	ডি	৩৮৬৮৮	৪৫৮২৬
৮৭) ঘাটাল	১৮৬৯	ডি	৪৩৭৭০	৫১৫৮৬
৮৮) চন্দ্রকোণা	১৮৬৯	ই	১৬৮০৪	২০৪০০
৮৯) রামজীবনপুর	১৮৭৬	ই	১৪৯০৪	১৭৩৬৩
৯০) খিরপাই	১৮৭৬	ই	১২১৯৯	১৪৫৪৫
৯১) খড়ার	১৮৮৮	ই	১০৩১০	১১৫৮০
৯২)খড়গপুর	১৯৫৪	বি	১৭৭৯৮৯	২০৭৯৮৪
৯৩) এগরা	১৯৯৩	ই	২০৭৮৬	২৫১৮০
৯৪) কন্টাই	১৯৫৮	ডি	৫৩৪৮৪	৭৭৪৯৭
৯৫) ঝাড়গ্রাম	১৯৮২	ডি	৪২০৯৪	৫৩১৫৮
৯৬) হলদিয়া	১৯৮৩	সি	১৩৪৬৮৩	১৭০৬৯

৯৭) বাঁকুড়া	১৮৬৯	সি	১১৪৮৭৬	১২৮৮১১
৯৮)বিষ্ণুপুর	১৮৭৩	ডি	৫৬১২৮	৬১৯৪৩
৯৯)সোনামুখী	১৮৮৬	ই	২৪৬৪০	২৭৩৪৮
১০০)পুরুলিয়া	১৮৭৬	সি	৯২৩৮৬	১১৩৭৬৬
১০১) ঝালদা	১৮৮৮	ই	১৭২১৭	১৭৮৭০
১০২) রঘুনাথপুর	১৮৮৮	ই	১৯১৮৭	২১৮১২
১০৩) বর্ধমান	১৮৬৫	এ	২৪৫০৭৯	২৮৫৮৭১
১০৪) কালনা	১৮৬৯	ডি	৪৭২২৯	৫২১৭৬
১০৫) কাটোয়া	১৮৬৯	ডি	৫৫৫৪১	৭১৫৭৩
১০৬)দাঁইহাট	১৮৬৯	ই	২০৩৪৯	২২৫৯৩
১০৭)রানীগঞ্জ	১৮৭৬	সি	৮২৩৫২	১২২৮৯১
১০৮) আসানসোল	১৯৯৪	পৌরনিগম	৪৭৫১১৯	৪৮৬৩০৪
১০৯)গুসকরা	১৯৮৮	ই	২৬৯৯৫	৩১৮৬৩
১১০) দুর্গাপুর পৌরনিগম	১৯৯৬	পৌরনিগম	৪২৫৮৩৬	৪৯২৯৯৬
১১১)কুলটি	১৯৯৩	এ	২৫০২৮০	২৯০০৫৭
১১২) মেমারি	১৯৯৫	ডি	২৯০০০	৩৬১৯১
১১৩) জামুরিয়া	১৯৯৫	সি	১১৮০০	১২৯৪৫৬
১১৪) আরামবাগ	১৮৮৬	ডি	৪৫২১১	৫৬১২৯
১১৫) তারকেশ্বর	১৯৭৫	ই	২২৬৩২	২৮১৭৮
১১৬) বহরমপুর	১৮৭৬	সি	১১৫১৪৪	১৬০১৬৮
১১৭)মুর্শিদাবাদ	১৮৬৯	ডি	৩০৩২৭	৩৬৮৯৪
১১৮)জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	১৮৮৬	ডি	৪২১০৪	৪৭২২৮
১১৯) কান্দি	১৮৬৯	ডি	৩৯৬৫২	৫০৩৪৫
১২০) জঙ্গিপুর	১৮৬৯	ডি	৭৮১৯৬	৭৪৪৬৪
১২১)ধুলিয়ান	১৯০৯	ডি	৬১১৩৭	৭২৯০৬
১২২) বেলডাঙা	১৯৮১	ই	২০২৪৯	২৫৩৬১

১২৩)নলহাটি	২০০০	ডি	—	৩৪০৫৮
১২৪) ধূপগুড়ি	২০০১	ডি	—	৩০০১০
১২৫) পাঁশকুড়া	২০০১	ডি	—	৫০০৩৮
১২৬) ডালখোলা	২০০৩	ই	—	২৯৭৭০

সারণি – ২

২০০১ জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার তুলনায় শহরবাসীর শতকরা হার অনুযায়ী জেলাগুলির স্থান নির্ণয়

	জেলা	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শহরে জনসংখ্যার শতকরা হার		স্থান	
		১৯৯১	২০০১	১৯৯১	২০০১
১।	দার্জিলিং	৩০.৪৭	৩২.৪৪	৬	৬
২।	জলপাইগুড়ি	১৬.৩৬	১৭.৭৪	৮	৮
৩।	কোচবিহার	৭.৮১	৯.১০	১৭	১৫
৪।	উত্তর দিনাজপুর	১৩.৩৪	১২.০৬	১০	১২
৫।	দক্ষিণ দিনাজপুর	২৩.৩৫	১৩.০৯	৯	১০
৬।	মালদা	৭.০৭	৭.৩২	১৮	১৮
৭।	মুর্শিদাবাদ	১০.৩৪	১২.৪৯	১২	১১
৮।	বীরভূম	৮.৯৮	৮.৫৮	১৫	১৬
৯।	বর্ধমান	৩৫.০৯	৩৭.১৮	৪	৪
১০।	নদিয়া	২২.৬৩	২১.২৭	৭	৭
১১।	উত্তর ২৪ পরগনা	৫১.২৩	৫৪.৩০	২	২
১২।	হুগলি	৩১.১৯	৩৩.৪৮	৫	৫
১৩।	বাঁকুড়া	৮.২৯	৭.৩৭	১৬	১৭
১৪।	পুরুলিয়া	৯.৪৪	১০.০৭	১৪	১৪
১৫।	মেদিনীপুর	৯.৮৫	১০.৪৯	১৩	১৩
১৬।	হাওড়া	৪৯.৫৮	৫০.৩৯	৩	৩
১৭।	কলকাতা	১০০.০০	১০০.০০	১	১
১৮।	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১৩.৩০	১৫.৭৭	১১	৯

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৩-এ মোট ধারার সংখ্যা ৪৪২টি যা ভারতীয় সংবিধানে ৪০০

অনুচ্ছেদ ধারার থেকে বেশী (যে যে বিষয়) ধারা ও নিয়মাবলী প্রাথমিকভাবে সকলের জেনে রাখা প্রয়োজন। সেগুলি হলো ঃ- ১) পৌরসভার গঠন সংক্রান্ত ৩-৮, ২) পৌরকর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ১২-২৫, বিশেষ করে ধারা ১২, ১৫, ২৩ এবং ওয়ার্ড কমিটি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ৩) পৌরসভা পরিচালনা ও পৌরঅফিস সংক্রান্ত ধারা ৫০ বি, ৫১,৫১ক , ৫২, ৫৫, ৬০, ৬০ক, বিশেষ করে সভা পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ৪) ক্ষমতা ও কর্মসূচী সংক্রান্ত ধারা ৬৩-৬৬ দ্বাদশ তপশীলের সহরা দারিদ্র্য মোচনের (ক্রমিক নং১১) বিষয়টি অনুপস্থিত, ৫) পৌরতহবিল ধারা ৬৭ ৭৩, ৬)পৌরসম্পদ সংক্রান্ত ধারা ৭৪,৭৫,৭৬,৮০,৮১, ৭) বাজেট হিসাব ও অডিট ধারা ৮২-৯২ বিশেষ করে ৮২,৮৪,৮৭,৯২ এবং হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ, ৮) কর, ফি, টোল ইত্যাদি - পৌরপরিষেবা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পৌরআইনে পৌরসভার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত আছে তা পালন করতে প্রয়োজনীয় অর্থের অনেকটা আসে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে। এছাড়া কেন্দ্র, রাজ্য বা অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লোকাল অথোরিটি লোন অ্যাক্ট ১৯১৪ সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য পৌরতহবিলকে সমৃদ্ধ করতে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার হিসাবে বিভিন্ন কর, ফি, টোল ইত্যাদি আদায় করতে পারে। এগুলি হল - ১) জমি ও বাড়ীর উপর সম্পদ কর ও কর চার্জ ধারা ৯৬,৯৭, ২) বিজ্ঞাপনের উপর কর (খবরের কাগজ বাদে) ধারা ১২৩, ৩) যানবাহন (মটোর চালিত নয়)-এর উপর কর। ৪) অন্যান্য যানবাহনের উপর কর ধারা ১২৩, ৫) খেয়া ও সেতুর উপর টোল ধারা ১৩৪,১৩৯, ৬) তীর্থ, মেলা, উৎসব, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদিতেও আসা যাত্রী ও গাড়ীর উপর ফি ৯৪, ৭) দর্শনীয় স্থান দেখতে আসা যাত্রী ও গাড়ী পিছু ফি ধারা ৯৪ ক, ৮) আইন অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স-এর জন্য ফি ধরা ১১৮, ৯) বাড়ি তৈরীর নক্সা অনুমোদনের জন্য ফি ধারা ১৩১, ১০) বিশেষ জমায়েতের স্থান, জঞ্জালমুক্ত রাখার জন্য ফি ধারা, ১১) ভূমি/জমি হস্তান্তরের উপর অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটির আকারে সারচার্জ আদায় ধারা ১১৭, ১২) বিশেষ কোন পরিষেবা প্রদানের জন্য ফি, এছাড়া পৌরবাজার, দোকানঘর, অতিথিশালা প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি ভাড়া বাবদ আয় যে কোন রাজ্যের আইনেই কম বেশী এ রকম ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে অর্পিত হয়েছে। উদাহরণ ঃ কেরালা পৌর আইন ১৯৬০, কেরালায় প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষমতাটি হল ঃ জমির চরিত্র বদলের উপর সেস্ । এ প্রসঙ্গে আগের পৌরবোর্ড রেজোলিউশান করে পৌর আয়ের উৎস বৃদ্ধি করেছেন আয় বিবর্তনের এক মূল্যবান সংযোজন। কর এবং ফি মুখ্য পার্থক্য হল, কর পরিষেবা নির্বিশেষে আদায়যোগ্য, ফি সাধারণভাবে পরিষেবা প্রদানের খরচসংকুলানের সঙ্গে সংযুক্ত। কর আদায় সংক্রান্ত ধারা ১৪৭,১৪৮,১৪৯,১৫২,১৫৯,১৬৫। গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত ধারা ১৯৯,২০০,২০১,২০৩,২০৪, ২০৭, ২০৮, ২১০,২১৫,২২০,২২৩ । বিশেষ করে দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (বিল্ডিং) রুলস্, ১৯৯৬। জননিরাপত্তা ও জনবিরোধ সংক্রান্ত ধারা ৩২৭,৩২৮,৩২৯,৩৩১,৩৩৬,৩৩৭,৩৩৮,২৪১,৩৪৪,৩৪৬,৩৫০। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারা ৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৫৯। জন্মমৃত্যু সংক্রান্ত ধারা ৩৬৩, ৩৬৭,৩৬৮,৩৬৯, ৩৭৭। পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা ও কর্তব্য সংক্রান্ত ধারা ৪০৯,৪১০। নিয়মাবলী সংক্রান্ত

ধারা ৪১৭,৪১৯,৪২২,৪২৪। রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অর্পণ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ধারা ৪২৫,৪২৬,৪২৮,৪২৯,৪৩০,৪৩১। নাগরিকেঁ অংশগ্রহণ ধারা ৪৩৩। শহরি সংক্রান্ত ধারা ৪৪০,৪৪২। আইনী অসুবিধা দূরীকরণ ধারা ৪৪২। জেলা পরিকল্পনা আইনি ১৯৯৪, মহানগরী পরিকল্পনা আইন১৯৯৪ এবং নিয়ক্ষচাল

৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের ২৪৩ ডবলিউ অনুচ্ছেদ-এ পৌরএলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুবিধার সুবিচারের জন্য পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষমতা আইনে পৌরসভাকে অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে। আবার ২৪৩ জেডডি অনুচ্ছেদ পৌরাঞ্চল ও মহানগরীতে জেলা/মহানগরী ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা (খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা) করার আইনি ক্ষমতা অর্পণের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত দুটি আইন এবং তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী এই উদ্দেশ্যেই রচিত । Bottom up plannin এ ভাবেই আবশ্যিকতা করণ করা হয়েছে।

The West Bengal Town & Country Planning & Development Department Act 1974.

পশ্চিমবঙ্গের নগর এবং পল্লী এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই ১৯৭৯ সালে এই আইনটি রচিত হয়েছিল। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

১) রাজ্য নগর ও পল্লী পরিকল্পনা উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন ধারা ৩।

২) পশ্চিমবঙ্গের যে কোন এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা বলে ঘোষণা করা ধারা ৯ ।

৩) প্রতিটি ঘোষিত পরিকল্পনা এলাকার জন্য একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অথবা উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ গঠন, যে কোন বিধিবদ্ধ অথবা অ-বিধিবদ্ধ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (পৌরপ্রতিষ্ঠান সহ) বা রাজ্য সরকারের কোন আধিকারিককে পরিকল্পনা কতৃপক্ষ বা উন্নয়ন কতৃপক্ষ রূপে ঘোষণা করা যেতে পারে ধারা, ১১।

৪) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মূল কাজগুলি হল ঃ

ক) ভূমি ব্যবহারের বর্তমান মানচিত্র প্রস্তুত (জি.আই.এস) খ) আউট লাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুত ও কার্যকরা করণ। গ) ডিটেল ডেভলপমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুত ও কার্য্যকরা করন। ঘ) ভূমি ব্যবহারের ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করন, ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণ, চ) সরকারে বিভিন্ন বিভাগ, পৌর ও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন ইত্যাদি ধারা ১৩।

৫) কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং এলাকার জন্য ১৯৭২ সালের আইনে গঠিত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি রূপে কাজ করবে ধারা ১৭।

৬) প্রতিটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের অব্যবহিত পরে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হবে, ধারা ১৫।

৭) কলকাতা মেট্রোপলিটান কতৃপক্ষ কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণে নির্দেশদান, নজরদারি করা বা প্রয়োজনে যে কোনও উন্নয়নের কাজ নিজেই রূপায়িত করতে পারবে ধারা ২৪, ২৫।

৮) Out line Development Plan অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ধারা ৩১।

৯) Detailed Development Plan অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ধারা ৩২।

১০) যে কোন উন্নয়নমূলক কাজ বা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বা ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি আবশ্যিক। ধারা ৪৫, ৪৬।

১১) অনুমতিবিহীন যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ ও ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটালে অভিযুক্ত ব্যক্তি জেল, জরিমানা বা উভয়েই দণ্ডিত হবেন। ধারা ৫২।

১২) অনুমোদিত উন্নয়নমূলক কাজ ও ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বন্ধ করার ক্ষমতা। ধারা ৫৪।

১৩) উন্নয়ন প্রকল্প রচনায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা। ধারা ৫৭।

১৪) উন্নয়ন প্রকল্প গেজেট প্রকাশিত হবার পর সেই এলাকায় যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজেই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি আবশ্যিক, ধারা ৬৫।

১৫) উন্নয়নমূলক কাজ বা ভূমি ব্যবহারের জন্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের Development Charge আরোপের ক্ষমতা। ধারা ১০২।

১৬) প্রতিটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর একটি নিজস্ব তহবিল থাকবে যাতে জমা পড়বে –

ক) রাজ্য সরকার থেকে অনুদান, ঋণ, অগ্রিম ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ,

খ) সমস্ত Development Charge বা অন্যান্য ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ,

গ) অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ।

১৭) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ, ধারা ১৩৫।

১৮) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভেঙে দিতে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা। ধারা ১৪১।

কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ

সাম্প্রতিককালে ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তাঁর এক আদেশে, দেশের সমস্ত পৌরসভাগুলিকে বর্জ্য পদার্থ থেকে জেব সার, গ্যাসসহ অন্যান্য পদার্থ তেরী করে নাগরিক জীবনকে সমস্ত রকম দূষণ থেকে বাঁচাবার জন্য এক বৈপ্লবিক রায় দিয়েছেন। সেইমত ২০০৩ সাল পর্যন্ত সকল পৌরপ্রধান, মহানাগরিক ইত্যাদি গণ সহ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গণ যদি ঐ আদেশ অমান্য করেন এবং জৈব পদার্থকে সার, গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত না করেন এবং দূষণমুক্ত সমাজ তেয়ারীতে সাহায্য না-করেন তাহলে তাদের ১ বৎসর পর্যন্ত জেল এবং এক লক্ষাধিক টাকা জরিমানা হতে পারে।

আমাদের চেয়ারম্যান ইরা চট্টোপাধ্যায় ঐ আদেশের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে কাজ করতে তৈরী হয়েছেন। তারা আমাদের কয়েকদিন আগে সি.পি.ইউ., আসনানী সাহেবকে আমাদের পৌরসভায় পরিদর্শনও করেছেন। তিনি নিজে সব জায়গায়, বর্জ্য ফেলার জায়গা ইত্যাদি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নোট পৌরদপ্তরে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যে কমিটি তৈরী করেছেন তিনি তাঁর একজন সম্মানীয় সদস্যও বটে। আমার বিশ্বাস এমন দিন আসছে, নাগরিকগণ ঐ বর্জ্যগুলোকে আর

বাইরে নিক্ষেপ না-করে ফ্রীজের মধ্যে জমা করবেন এবং তার দাম চাইবেন। এই বিবর্তন ও চিন্তাধারা কৃষকসহ নাগরিকগণের মধ্যে বৈপ্লবিক বিবর্তন তৈরী করছে যা মানবজাতির কল্যাণে আসবে। বর্জ্য পদার্থ থেকে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থা, আরো বেশী জমি ঐ সম্পদ সংরক্ষণ না-করা হলে আবার মহামারী, প্লেগ ইত্যাদি মহাব্যাধি ফিরে আসার সম্ভবনা আছে বলে জনগণকে সতর্কবার্তা পৌঁছে দিলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার / তথ্য সংগ্রহ ঃ

১) ভারতীয় সংবিধান

২) রবীন্দ্রনাথ দত্ত (চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যাল কমিশন)

৩) পৌর দিগন্ত, প্রথম সংখ্যা ১৯৮৮সহ সকল সংখ্যা।

৪) ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৫) ইলগাস লাইব্রেরী

৬) Suprim Court Judgement on Patna Model - 16.1.1995

৭) Magic Formula Raises Revenue
The Statesman, 2nd January 1994

৮) Booklets of State Level Seminar on Property Tax & Municipal Accounting Practices Reforms, 2004 Kol.

৯) The Bengal Municipal Act. 1842 & 1876

১০) The Bengal Municipal Act. 1432, 1993, 1997

১১) Booklets on Distict Municipal Act. 1864

১২) Booklet on Proposal of Lord Ripon - 1882

১৩) শ্রী অরূপ ভদ্র - এম.এল.এ.

১৪) শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু - এম.পি.

১৫) শ্রীমতী ইরা চট্টোপাধ্যায়
মিলু গুহঠাকুরতা
তপতী নস্কর
সুপ্রভা ব্যানার্জী
ইলা বসু

শ্রী মনোরঞ্জন পুরকাইত
" স্বপন মণ্ডল
সুদেব রায়চৌধুরীসহ
সকল কাউন্সিলরবৃন্দ

"An Institution is like a tune it is not Constitued by Individiuel Sounds but by the Relations between them"
--- Peter F Drucker

খেলাধুলায় ফেলে-আসা দিনগুলি

অমল কবিরাজ

বারুইপুর পৌরসভা বারুইপুর ইতিহাস নামক পুস্তিকা প্রকাশনায় যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা প্রশংসনীয় এবং এই কর্মকাণ্ডে আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা প্রতিপালনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রাখব। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার অতীত দিনগুলির কথা, যা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া ফেলে-আসা দিনগুলির অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাই পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপস্থাপিত করার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে এবং অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করাও অপরাধ। তবুও আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। যদি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমার আশা রাখছি। আজ আমি শুরু করলাম। এই লেখা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে সঠিক তথ্য হিসাবে আগামী দিনে জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হবে। আমার লেখার বিষয়বস্তু কিন্তু বারুইপুর থানা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব উদ্যোক্তাদের ইচ্ছানুসারে।

খেলাধুলার কথা বলতে গেলেই প্রথমে উঠে আসবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার খেলাধুলার কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার ইতিহাস। খেলাধুলাকে সংগঠিত আকারে রূপদানের রূপকার ছিলেন সুশীলকৃষ্ণ দত্ত যিনি নাদুদা নামে আমাদের কাছে খ্যাত। ১৯৪৭ সালে মাঠগুলি পর্যবেক্ষণ করে তার মনে উদয় হয়েছিল একটি খেলাধুলার সংগঠন গড়া, যার মাধ্যমে সুসংগঠিত আকারে পরিচালিত হবে বিভিন্ন খেলাধুলা। কাজে নেমে পড়লেন তিনি। বিভিন্ন ক্লাবকে আহ্বান জানান হল, কিন্তু দুবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। পরবর্তী চেষ্টায় যাঁরা এলেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হল 'বারুইপুর ক্রীড়া ও ব্যায়াম সংঘ' '৫ই ডিসেম্বর' ১৯৪৮ সাল। কেন্দ্রীয় সংস্থা পরিচালনার জন্য দরকার একজনের সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তখন বারুইপুরের সুপ্রতিষ্ঠিত কমলা ক্লাবের সম্পাদক শিবদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সংঘের সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রথমে রাজী নাহলেও কয়েকটি শর্তে তিনি রাজি হন। প্রধান শর্ত হল সংঘের নাম হবে 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা ক্রীড়া ও ব্যায়াম সংঘ' এবং এলাকা হবে আলিপুর সদর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা নিয়ে। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালের অধিবেশনে নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে গঠিত হল অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি। শিবদাস মুখোপাধ্যায় সভাপতি (কমলা ক্লাব), রাধাশ্যাম নন্দী (সবুজ সংঘ), সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (শাসন যুবক সমিতি), ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু (সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন), সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, সম্পাদক (আর.সি.এস.সি), কমলেন্দু রায়চৌধুরী (নিউ ইন্ডিয়ান ক্লাব), মুকুন্দদেব চক্রবর্তী (ব্রতী সংঘ), রামরতন বসু (ধপধপি যুব সংঘ)।

তারপর শুরু হল জেলা ক্রীড়া সংঘের অনুমোদন লাভের চেষ্টা। আবেদন জমা পড়ল ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল। সোদপুরে অবস্থিত জেলা ক্রীড়া সংঘের দক্ষ সংগঠকদ্বয় শিব প্রসন্ন ঘোষাল ও ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় সংঘের স্বীকৃতি পেল ৫ই জানুয়ারী,

১৯৪৯ সাল। তখন থেকে শুরু হল সংগঠিত আকারে খেলাধুলার আসর। সভাপতির নির্দেশে অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৯ বাড়ানো হল। এই সময়ে প্রতি রবিবার দল বেঁধে বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সংঘ গড়ার কথা এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হল। ৩১শে মার্চ, ১৯৪৯-এর অধিবেশনে যোগ দিল আরও বেশী ক্লাব। প্রথম কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ গঠিত হল নিম্নলিখিত দলের প্রতিনিধি নিয়ে, যথা শিবদাস মুখার্জী– সভাপতি, সুশীলকৃষ্ণ দত্ত – সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, কমলেন্দু রায়চৌধুরী, দ্বিজেন চট্টোপাধ্যায়, রাধাশ্যাম নন্দী, নীলকান্ত মিত্র, রমেন মুখার্জী, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, রামরতন বসু, প্রভাতকুমার ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী ও এস.কে.দে । তারপর থেকে শুরু হয় ফুটবল লীগ বিভিন্ন মাঠে। বিভিন্ন খেলাধুলা পরিচালনা করার জন্য গঠিত হল রেফারী বোর্ড। বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন মলিনকুমার রায়চৌধুরী, শৈলেন দত্ত, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, সুশীল দত্ত, ফণিভূষণ নাগ, নরেন দত্ত, নরেন চক্রবর্তী, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও কমলেন্দু রায়চৌধুরী । তারপর গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী তৈরী করা হল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র অনুধাবন করে ও স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিবেশ বিবেচনা করে। গঠনতন্ত্র কার্যকর হয় ১লা এপ্রিল, ১৯৫০ সালে। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫০ সালে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচনে সভাপতি হলেন অমর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক সুশীলকৃষ্ণ দত্ত ও সহকারী সম্পাদকদ্বয় ভবানী সিংহ ও লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে উল্লিখিত সদস্যগণ দীর্ঘদিন ধরে এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের পরামর্শ, চিন্তাভাবনা, পরিশ্রম এই সংগঠনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

প্রথমে সংঘের নিজস্ব ঘর ছিল না। তাই শচীন চক্রবর্তীর বাইরের ঘরটা দেবেন মিশ্রের সুলভ ফার্মেসি ও কমলা ক্লাবের ঘর ব্যবহার করা হত। এবার চাই কাজ করার নিজস্ব ঘর। কারণ, খেলাধুলার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে দেখা দিল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পৌরসভার তৎকালীন পৌরপ্রধান শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই সংঘকে একখণ্ড জমি প্রদান করেন এবং এই বছরই ২৬শে ডিসেম্বর সংঘসভাপতি অমরনাথ ভট্টাচার্য সংঘভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সাংগঠনিক দক্ষতায় ও আন্তরিকতায় প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ২শে এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন জেলা শাসক বি. আর. গুপ্তা I.A.S. সংঘের দ্বার উদঘাটন করেন। সুষ্ঠভাবে বিভিন্ন খেলাধুলা পরিচালনার জন্য পৃথক রেফারীসংঘ গঠিত হয়। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল সংঘের বিভিন্ন কর্মধারা। পরবর্তীকালে সংঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ভবানী সিংহ, লাবণ্য চ্যাটার্জী, দিলীপ সরকার, অতীন মিত্র, সজলজীবন ঘোষ, বঙ্কিমবিহারী ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিত চ্যাটার্জী, সমর দে, শ্যামল পাল প্রভৃতি।

প্রথম যুগে যে অনুপাতে ফুটবল টীমের ও খেলার সংখ্যা বেড়েছে অথচ রেফারীর সংখ্যা তদনুরূপ বাড়েনি। সে সময় শৈলেন দত্ত, মলিন রায়চৌধুরী, অজিত সেন, প্রসাদচন্দ্র দে, রণজিত বসু, দীনেশ রায়, ভবানী মল্লিক, মণিভূষণ নাগ প্রভৃতি রেফারীগণ কোন যানবাহন ভাতা না-নিয়েও যে পরিশ্রম করেছেন তা স্মরণীয়। পরবর্তিকালেও রেফারী, আম্পায়ার, স্পোর্টস অফিসিয়াল প্রভৃতির নিকট ক্রীড়া সংঘ কৃতজ্ঞ। সংঘভবনেই রেফারী সংঘের অফিসের

কর্মকাণ্ড মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। এঁরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও রেফারী, আম্পায়ার প্রভৃতির প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও সদস্য তালিকাভুক্তি সম্পন্ন করেন।

১৯৮৬ সালে সুবিস্তীর্ণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সুবাদে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা পৃথক জেলা ঘোষিত হওয়ায় সংঘের জীবনে ঘটল পুনর্জন্ম। নতুন নামে ও নতুন কলেবরে। ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জন্য স্থাপিত হল জেলা ক্রীড়া সংঘ। এই স্থাপনের মধ্যে দিয়ে খেলাধুলার ক্ষেত্রে সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায় আর সূচিত হল নবদিগন্ত। এই নতুন জেলা ক্রীড়া সংঘের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, তদানীন্তন জেলাশাসক অরুণ ভট্টাচার্য মহাশয়, শিবপ্রসন্ন ঘোষাল, ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রমোহন রায়, চণ্ডীচরণ দাস, সুকুমার পাল (স্পোর্টস্ অফিসার) কান্তি গাঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন মজুমদার, সন্ন্যাসী ব্যানার্জী ও স্থানীয় সংগঠকবৃন্দ। প্রথম বছর কোন নির্বাচন নয়, সর্বসম্মতিক্রমে গড়া হল পরিচালকমণ্ডলী। যার সভাপতি হলেন জেলাশাসক, কার্যকরী সভাপতি ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু, সহকারী সভাপতি ভবানী সিংহ, সন্ন্যাসী ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক অমল কবিরাজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সরকার ও পঙ্কজেন্দু ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সনৎ কর ও সম্পাদক হলেন বাবুল দত্তচৌধুরী , সমর দে, ভোলানাথ মারিক, প্রশান্ত ব্যানার্জী। ১৯৫৫ সালে নির্মিত ভবনের ছাদের সংস্কার ও জিলা সংগঠনের স্থানাভাব এই দুই চাহিদাকে উপলব্ধি করে পরিচালকমণ্ডলী সংঘভবন দ্বি-তল করার প্রয়াস রাখেন। শিবদাস ভট্টাচার্য সভাধিপতি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও তদানীন্তন বারুইপুরের বিধায়ক হেমেন মজুমদারের সহযোগিতায় আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকার অনুদান অনুমোদিত হয় এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় দ্বিতল গৃহ নির্মিত হয়। ২৭শে মার্চ ১৯৯২ সালে মাননীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় নব-নির্মিত দ্বিতীয় তলটির উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া সংঘের প্রথম যুগে দুইটি নজীর-বিহীন কাজ করা হয়েছিল। প্রথমটি – একটি Sports Library প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র খেলাধুলা সংক্রান্ত পুস্তক বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সংঘ প্রদত্ত একটি আলমারিতে সংরক্ষিত ছিল সংঘভবনের হলঘরে। উদ্বোধন করতে এসেছিলেন কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক বি. এস.কেশবন। প্রধানত লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে সংঘের শুভার্থী বন্ধুদের দান এই বইগুলি। লাবণ্যদার নিজের দান ছিল কয়েকটি বই এবং 'Sports and Pas-time' পত্রিকার কয়েক বৎসরে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি নিজব্যয়ে কয়েকটি খণ্ডে বাঁধিয়ে দেওয়া অবস্থায়। দুর্ভাগ্যবশত পাঠকের সংখ্যা বেশী ছিল না। যাঁরা বই নিতেন তাঁদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ 'Book Keeping'-এ সিদ্ধহস্ত। ফলে বই-এর সংখ্যা কমতে কমতে এক সময় লাইব্রেরী অচল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনা – 'সঙ্ঘম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ । সম্পাদক R.C.Sporting Club-এর সজল রায়চৌধুরী এবং কার্যাধ্যক্ষ D.Y.S.-এর লক্ষ্মীদাস দত্ত। এই পত্রিকায় সংঘের সমস্ত সংবাদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য কিছু প্রধান খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং দুই-একটি রম্যরচনাও প্রকাশিত হতো। যথেষ্ট বিজ্ঞাপনের অভাবে সংঘের তৎকালীন আর্থিক অবস্থায় এই পত্রিকা দীর্ঘায়ু হয়নি।

এবার আসব আমি ক্লাবভিত্তিক আলোচনায়।

আর. সি. এস. সি. খুবই পুরাতন ক্লাব, যারা ইতিমধ্যে শতবর্ষের গণ্ডী পার হয়ে দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছে। এই ক্লাব কেবল খেলোয়াড় তৈরী করেনি, দক্ষ সংগঠক ও ক্রীড়া পরিচালক তৈরীর মধ্য দিয়ে ক্রীড়া সংঘকে সঠিক পরিচালনায় সহযোগিতা করেছে। এই ক্লাবের সান্নিধ্যে এসে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছেন বা ক্রীড়া পরিচালক হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, ললিত রায়চৌধুরী, নীরদলাল রায়চৌধুরী, সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, মলিন রায়চৌধুরী, সুরেশ চক্রবর্তী, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, শচীন চক্রবর্তী, নিশীথ রায়চৌধুরী,সজল রায়চৌধুরী, গৌরদাস ব্যানার্জী, অলোক রায়চৌধুরী, দীপক রায়চৌধুরী, সমীরণ রায়চৌধুরী, নিখিলেশ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, রবীন রায়চৌধুরী , রবি মিত্র, দীপ্তিলাল নাগ, বিকাশ নন্দী, বিধান পাল, বিপ্রদাস পাল, আনোয়ার হোসেন, সুশান্ত দত্ত, আপন ভট্টাচার্য, অষ্টম হাজরা, শান্তনু রায়চৌধুরী, শক্তি রায়চৌধুরী, অমল দত্ত, মানিক বোস, স্বপন রায়চৌধুরী, দুখিরাম পুরকাইত, শান্তনু চক্রবর্তী, কুন্তল মজুমদার, মহঃ সেলিম, প্রদীপ অধিকারী, পার্থসারথী ঘোষ প্রভৃতি। অতীত দিনে কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী ২৪ পরগণা জেলা ফুটবল দলের অধিনায়ক হয়ে I.F.A. শীল্ড ও আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কমলা ক্লাব ঃ বারুইপুরের একটি বিশিষ্ট ক্লাব। শতবর্ষের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধশালী। ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ক্লাব ঘরের সংস্কারের মধ্য দিয়ে আর্থিক অবস্থাকে সম্প্রসারিত করে খেলাধুলায় উন্নতি করার প্রচেষ্টা করছেন। ১৯২০ সালে প্রথম যাঁরা ক্লাব ফুটবল দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন জীতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস মারিক, জীতেন্দ্র ব্যানার্জী, কৃষ্ণপদ মারিক, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কে. রায়, ডি.কে. চ্যাটার্জী, শরৎচন্দ্র দাস, নীলকৃষ্ণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অবনী দাশগুপ্ত এবং অতিরিক্ত খেলোয়াড় হলেন সৌরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস মুখার্জী, পি. মুখার্জী, বিজয়বিহারী বসু, সুধীর সরকার, এইচ.পি. নাথ, প্রফুল্লচন্দ্র বুস, ডি.এন.দাস প্রভৃতি। তার পরবর্তিকালে যাঁরা খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা হলেন স্বপন মুখার্জী, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, নির্মল ঘোষ, মিঠু দত্ত প্রভৃতি। নীতা মুখার্জী এ্যাথলেটিক্‌সে সম্মান অর্জন করেছিলেন। লীলী চ্যাটার্জী ও ইলা মুখার্জী সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে লীলা চ্যাটার্জী একজন দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। আর্থিক সহযোগিতা না পাওয়ায় তাঁর ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রের ঐকান্তিক প্রয়াসে মদারাট এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁরা এই ক্লাবের হয়ে খেলাধুলা করেছেন তাঁরা হলেন নীলকান্ত পাল, সুরেশ পাল, কমলাকান্ত পাল, সমীরকুমার ব্যানার্জী, ডঃ জ্যোতি মারিক, প্রীতিময় মারিক, মনমোহন দাস, লক্ষ্মীকান্ত দাস, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, সন্তোষ মুখার্জী, অমল দাস, ডাঃ পঙ্কজকুমার দাস, অসিত ব্যানার্জী, শঙ্কর ব্যানার্জী, রঘু নন্দী, তারকনাথ দে, অরুণ মণ্ডল, মনীষ পাল, প্রাণবল্লভ দাস, বিমল দে, সুনীল নাগ, পুলক ব্যানার্জী । তবে বিগত দিনগুলিতে ফুটবলের পাশাপাশি এ্যাথলেটিক্‌সে সমান দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সমীরকুমার ব্যানার্জী, সুভাষ মারিক, ডাঃ জ্যোতি মারিক,

অসিত ব্যানার্জী, শঙ্কর নন্দী, রঘু নন্দী, রূবী নন্দী, সুধী নন্দী, পূর্ণিমা দাস, জগদীশ দাস। তারকনাথ দে ফুটবল, ভলিবল ও এ্যাথলেটিক্সের সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এবং পরবর্তিকালে ক্রীড়া পরিচালক ও সংগঠক হিসাবে দক্ষতা দেখিয়ে রেফারী সংঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত দাস পরবর্তিকালে ফুটবল খেলোয়াড় তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেন। অমল দাস ও ডাঃ পঙ্কজ দাস ক্রীড়া সংঘের বিভিন্ন পদে কাজ করেছিলেন। আব্দুল আজিজ লস্কর ভাল ফুটবল খেলতেন ও জেলা রেফারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন । মনীষ পাল দক্ষ ফুটবল রেফারী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। সমরকুমার দে ফুটবল ও ক্রিকেটে সমান পারদর্শী ছিলেন। চাকুরীজীবনে এ্যাথলেটিক্সেও সাফল্য পান। তিনি ফুটবল রেফারী এবং বিশেষ করে ক্রিকেটে C.A.B.-এর আম্পায়ার হয়ে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছেন। দীপক নন্দী ও দিব্যেন্দু নাগও এ্যাথলেটিক্সে চর্চা করতেন। তবে দীপক নন্দী ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করতে না-পারলেও এই গ্রামের বহু ছেলেমেয়েদের এ্যাথলেটিক্সে এনে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিমিরবরণ দাস রাজ্য পর্যায়ের এ্যাথলেট হলেও আজও পর্যন্ত এই চর্চা তিনি রেখেছেন এবং ভেটার‍্যান্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চলেছেন। অমিত ঘোষ ভলিবল খেলতেন এবং পরবর্তিকালে দক্ষ ভলিবল রেফারী হিসাবে আবির্ভূত হন।

ধপধপি যুব সংঘের হয়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে অতীত দিনে বহু খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সর্বাগ্রে নাম করব রামরতন বসু যিনি অসাধারণ ফুটবল খেলতেন। তারপর আসেন রঞ্জিত বসু, ভবানী সিংহ, দেবু সিংহ, অনাথবন্ধু দাস, শান্তনু মল্লিক, প্রবীর কর প্রমুখ। দক্ষ ক্রীড়া পরিচালক ও সংগঠক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কালিকৃষ্ণ বসু, চণ্ডী বসু, লক্ষ্মীদাস দত্ত, কালিদাস দত্ত। ভবানী সিংহ চার দশক ধরে ক্রীড়া সংঘ ও রেফারী সংঘের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন এবং তাঁর ভাই দেবু সিংহও এই সংঘের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রঞ্জিত বসু গড়ের মাঠে নিয়মিত ফুটবল ও ভলিবল পরিচালনা করেছিলেন এবং রেফারী সংঘে দীর্ঘদিন নানান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন।

কল্যাণ সংঘের অতীত দিনে ফুটবল খেলায় খ্যাতি আছে। এই সুখ্যাতি অর্জনে যাঁরা ধারাবাহিক ভাবে ঘাম ঝরিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন ভবেন পাল, সৌমেন মুখার্জী, শ্যামল চ্যাটার্জী, তারাপ্রসন্ন মুখার্জী, কৃষ্ণদাস মুখার্জী, দেবেন চ্যাটার্জী, মৃণাল ভদ্র, নকুল সর্দার, বিকাশ দাস, হিমাংশু আঢ্য, অসিত ভট্টাচার্য প্রমুখ । ক্রীড়া সংঘের প্রথমদিকে ক্রীড়া পরিচালক হিসাবে দামোদর মুখার্জী ও রমেন মুখার্জী দায়িত্ব পালন করেন এবং রেফারী সংঘেরও কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

অতীত দিনে শাসন ইয়ং মেনস্ এসোশিয়েশান -এর খেলাধুলায় বিশাল ভূমিকা ছিল। ক্লাবের হয়ে যাঁরা খেলাধুলায় দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন তাঁরা হলেন গোপী দাস চ্যাটার্জী, মণ্টুমোহন চ্যাটার্জী, সোমনাথ ব্যানার্জী, সুভাষ রায়চৌধুরী, সমীর চ্যাটার্জী, সব্যসাচী রায়চৌধুরী, অশোক চ্যাটার্জী, উত্তম দাস ও অশোক ব্যানার্জী প্রভৃতি।

চাঁদোখালি যুব সংঘের হয়ে ঘোষ ভাইদের ফুটবলে দারুন প্রতিপত্তি ছিল। মৃণাংশু ঘোষ ফুটবল খেলেছেন, ফুটবল কোচিং করেছেন, ফুটবল রেফারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি ক্লাব সংগঠন থেকে এসে ক্রীড়া সংঘের কর্মপরিষদে থেকে নানান সাংগঠনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করেছেন। তাঁর ভাই অমলেন্দু ঘোষ ও সুবোধ ঘোষ ভাল ফুটবল খেলতেন। আয়নাল খাঁন একজন দক্ষ গোলরক্ষক ছিলেন। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধারাবাহিকভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করে বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বোন গীতা ঘোষ অতীত দিনে প্রখ্যাত এ্যাথলেট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবু তাহের মণ্ডল, নিরাপদ নস্কর, ঋষিকেশ নস্কর যাঁরা জাতীয় পর্যায়ে অনেক সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছিলেন।

সাউথ গড়িয়া এ্যাথলেটিক ক্লাব -এর অভেদানন্দ রায় I.F.A.শীল্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৪ পরগণা জেলা দলের হয়ে। গৌরাঙ্গ ব্যানার্জীর ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে কৃতিত্ব ভারতবর্ষের ফুটবলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাছাড়া তিনি ফুটবলের প্রশিক্ষক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছেন। চাম্পাহাটীর আশেপাশে যে সব ফুটবল খেলোয়াড় উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন অজিত নস্কর, তন্ময় চক্রবর্তী, অনিল মণ্ডল, সুশীল মণ্ডল, সমর মণ্ডল, নিখিলেশ সর্দার, রবীন্দ্রনাথ দাস, আশীষ মিত্র, বাবলু মিত্র, বিশ্বজিৎ মজুমদার, আলী রেজা প্রমুখ। চাম্পাহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক ক্রীড়া সংসদের মাধ্যমে খেলাধুলা সুষ্ঠু রূপায়ণে সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন মণিমোহন ব্যানার্জী, ডাঃ অনিলকুমার রায়, রথীন্দ্রকুমার মণ্ডল, নারায়ণ মুখার্জী, সুনীল রায়, অবনীভূষণ মণ্ডল প্রভৃতি । তাছাড়া দীনেশ রায় ক্রীড়া পরিচালক ও সংগঠক হিসাবে বিভিন্ন কাজ করেছিলেন।

পল্লী সংঘ -এর হয়ে খেলাধুলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন শ্যামল ব্যানার্জী, রঞ্জিতকুমার মণ্ডল, বিমলকুমার দাস, ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মনোমোহন ব্যানার্জী, ওস্কার ব্যানার্জী, লোকনাথ ব্যানার্জী ও কেদারনাথ ব্যানার্জী। অধিকাংশ খেলোয়াড় ফুটবল ও ভলিবলে সমান দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন। ক্রীড়া পরিচালক হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্যামল ব্যানার্জী, মনোমোহন ব্যানার্জী, মুরারী ব্যানার্জী ইত্যাদি।

আটঘরা ক্রীড়া সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৭১ সালে অপূর্ব মজুমদার জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ব্যাক স্ট্রোক-এ প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন ঘোষ ক্লাবের ফুটবল থেকে ময়দানের ফুটবলে অংশগ্রহণ করে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। অনাথবন্ধু ঘোষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে ফুটবল রেফারী হয়েছিলেন এবং সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি রেফারী সংঘের সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন ছিলেন। সৌম্য ঘোষ জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অজান্তা মিলন মন্দির -এর হয়ে যাঁরা অতীত দিনে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন তাঁরা হলেন শেখ সাওকৎ, আলী শেখ, ইসমাইল মোল্লা। সৈয়দ খসরু তাইজুল ইসলাম, কানন তোষ অধিকারী, সমীরণ সাহু, আমীর হোসেন, মোক্তর হোসেন, আমজাদ হোসেন ও মুজিবর হোসেন। সৈয়দ খসরু তাইজুল ইসলাম মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সম্প্রতিকালে মহঃ মুসা

ও মেহতাব হোসেন খেলোয়াড়ী দক্ষতায় অনেকের মনকে স্পর্শ করেছেন। ভূপাল মণ্ডল ভাল ফুটবল খেলতেন। বর্তমানে রাজ্য থ্রো-বলে দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। থ্রো-বলে এ পর্যন্ত আমাদের জেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন অরূপ রায়, রানা দাস ও মিনু দাস।

অভিযাত্রী ক্লাব রবীন দত্তের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি একজন ভাল ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। অমিত দাস যার নাম এখন বারুইপুর অধিবাসীদের মুখে মুখে ঘোরে। তিনি গড়ের মাঠের তিন প্রধান দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে অনেক আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করে বারুইপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আরও উল্লেখ থাকে যে, বাসুদেব মণ্ডল খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় এই ক্লাবের হয়ে খেলতেন। বাবলু দত্তচৌধুরী ও শ্যামল পাল দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকের ভূমিকা পালন করছেন।

সাগর সংঘ অনেক পরে খেলাধুলা আরম্ভ করলেও এ্যাথলেটিক্সে সুনাম অর্জন করেছে। খ্যাতিসম্পন্ন এ্যাথলেটরা হলেন প্রতাপ মণ্ডল, মহঃ ঈশাক আব্দুর রসিদ নস্কর, রঞ্জিত ঘোষ, সঞ্জয় পাল, গোপাল মণ্ডল , রাজীব দাস, ইসমাতারা সর্দার, রত্না নস্কর, অর্চনা মণ্ডল যাঁরা রাজ্যস্তর থেকে জাতীয়স্তরে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ফুটবলে মিলন প্রামাণিক মোটামুটি ভাল খেলতেন। এই ক্লাবের মাঠে সারা বৎসরব্যাপী এ্যাথলেটিক্সে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করা হয়। তপন প্রামাণিক ও দীপক লস্কর দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকের ভূমিকা পালন করছেন।

হরিহরপুর জাগৃতি সংঘ ক্রীড়া সংঘের অন্তর্ভুক্তি লাভের জন্য খ্যাতনামা গোলরক্ষক সমীর কুমার দে প্রচেষ্টা রাখেন এবং উচ্চতর বিভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর খেলোয়াড়ী কৃতিত্ব আমাদের সকলের জানা আছে। এই এলাকার সুনীল দে, সীতানাথ ঘোষাল, অশোক বসু ফুটবল খেলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে সঞ্জীব কুমার দে, বিশ্বজিৎ ধর, দীপঙ্কর দে, দেবকুমার দে এই ক্লাবের হয়ে খেলে দর্শকদের মন জয় করেছেন।

বারুইপুর ইয়ং ম্যান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ফুটবল খেলে সুনাম অর্জন করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন পাল, গুরুদাস পাল ও চিন্তামণি পাল। এই অঞ্চলে এ্যাথলেটিকসের চর্চা ছিল। তাই যাঁরা জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন অজিতকুমার দাস, নির্মলকুমার খাঁ, বাসুদেব পাঠক, গোপালচন্দ্র দে এবং মহিলা বিভাগে কিংকরী বিশ্বাস, চন্দ্রাবলী সরকার, ক্ষমা রায়, ঝর্ণা বাগীশ, দীপা খাঁ, মহামায়া দাস ও আলো মাহাতো প্রমুখ।

বিশালাক্ষ্মী স্পোর্টিং এ্যাণ্ড কালচারাল ক্লাব পরে আবির্ভূত হলেও খেলাধুলায় ইতিমধ্যে অনেক সাফল্য তাদের করায়ত্ত। এই ক্লাব ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির সারা বৎসরব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে। ক্লাবের হয়ে যারা ভাল ফুটবল খেলেছেন তারা হলেন বিশ্বনাথ বিশ্বাস, তপন মিত্র, সাবীর আলী, সালাউদ্দীন, মহিদুল ইসলাম ও ক্রিকেটে সৌরভ

দাস, সৌম্যদীপ দাস, এবং হকিতে দশরথ সাহা, জাফর আলী সেখ, খোকন আলী সেখ, গৌতম নন্দী ও মহিলা বিভাগে ইন্দিরা চক্রবর্তী প্রভৃতি। সূর্যকান্ত ঝা ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবলে সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নিউ ইন্ডিয়া ক্লাব পুরাতন দিনের ক্লাব। এই ক্লাবের হয়ে বিগত দিনগুলিতে যাঁরা ফুটবল ও ক্রিকেটে খেলায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন মেহেবুব হোসেন, হিমাংশু ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, ভবতোষ দাস, হরিপদ দাস (প্রাক্তন কমিশনার), নিটুল পতিতুণ্ড, শিবু দাস, নিতাইপদ হালদার, বলাইচাঁদ ঘোষ, হরিমোহন ভট্টাচার্য, উমা প্রসাদ ভট্টাচার্য, আশীষ দাস, দীপক ভট্টাচার্য, অমিত ভট্টাচার্য, মানস রুদ্র, মলয় রুদ্র, সন্তোষ দাস, রতন সরকার, অসিত দাস, নিখিল দাস প্রভৃতি। অতীতদিনে ক্রীড়া সংঘের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন কমলেন্দু রায়চৌধুরী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, নৃপেন রায়চৌধুরী, জ্ঞানেন চক্রবর্তী ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য। বর্তমানে তাঁদের মাঠে নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হচ্ছে।

সন্তালী সংঘ ক্রীড়া সংঘে অনেক পরে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ক্লাবের মাঠে সব থেকে বড় সারা বৎসরব্যাপী এ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার মাধ্যমে জেলার এ্যাথলেটিক্স -কে সমৃদ্ধশালী করেছে। এছাড়া এই ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য পেয়েছেন যাঁরা তাঁরা হলেন রাজু দত্ত, তরুণকান্তি মজুমদার, তুষার দাস, আইজুল হক, আলাউদ্দিন মোল্লা, বাবুল সর্দার, সন্টু সর্দার, মিঠু সর্দার, জন্মেজয় প্রামাণিক, নুর মহম্মদ সর্দার, নুর কাসেম সর্দার প্রমুখ। নুর ইসলাম সর্দার দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকের ভূমিকা পালন করছেন।

দুর্গাপুর উদয়ন সংঘ খেলাধুলার সাথে সাথে গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্য অনেক সামাজিক দায়িত্ব প্রতিপালন করেছে। ক্লাব ঘরে ব্যাঙ্ক বসিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। এই ক্লাবের হয়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে ফুটবলে মনোময় পুরকাইত, নরেশচন্দ্র পুরকাইত এবং এ্যাথলেটিক্সে তপনকুমার দাশ ও সুশান্ত পুরকাইত বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া মধুসূদন পুরকাইত স্কুলের খেলাধুলা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেগমপুর প্রগতি সংঘ ঃ বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামেরই কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ১৯৫৪ সালে গড়ে ওঠে 'বেগমপুর প্রগতি সংঘ' দঃ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংঘ গঠনের শুরু থেকেই নিয়মিতভাবে ফুটবল লীগ-এ অংশগ্রহণ করে আসছে, অনেক ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে ৯৮-৯৯ বর্ষে 'বি' ডিভিসনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সংঘের মাঠে শীতকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

সূর্যপুর স্পোর্টিং ক্লাব ঃ বারুইপুর থানায় সূর্যপুর বাজার সংলগ্ন কেয়াতলা গ্রামে অবস্থিত সূর্যপুর স্পোর্টিং ক্লাব। জেলা ক্রীড়া সংঘ পরিচালিত ফুটবল লীগ-এ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। অর্থনৈতিক অনগ্রসর এলাকায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে ফুটবল লীগে ১৯৮৬

সালে 'বি' ডিভিসন এবং ১৯৯৫ সালে 'এ' ডিভিসনে উন্নীত হয়। এছাড়াও সংঘ গরীবদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং একটি কো অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করে।

শঙ্করপুর নূতন সংঘ ঃ শঙ্করপুর নূতন সংঘ ১৯৫১ সালে এলাকায় খেলাধুলা এবং সমাজসেবা মূলক কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে জেলা ক্রীড়া সংঘ পরিচালিত ফুটবল ও ভলিবল লীগে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। এছাড়া সংঘের মাঠে শীতকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগার চালানো হয়।

মাতৃসংঘ ঃ বারুইপুর থানায় সীতাকুণ্ডু গ্রামের কয়েকজন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলাক্রীড়া সংঘ পরিচালিত ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও এ্যাথলেট বিভাগে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এছাড়াও সংস্কৃতি এবং সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয়।

যুবপ্রতিভা ঃ বারুইপুর থানার কল্যাণপুর অঞ্চলের মলয়া-চণ্ডীপুর গ্রামে ১৯৫৬ সালে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই জেলা ক্রীড়া সংঘ-এর পরিচালিত প্রতিটি বিভাগে অংশগ্রহণ করে আসছে। খেলাধুলার প্রসার ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সহিত যুক্তবিশেষ করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পিছিয়ে-পড়া মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ করে।

এছাড়া কিছু কিছু জাতীয়স্তরের এ্যাথলেটদের সাফল্যের তথ্য হস্তগত হওয়ায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের গোচরে আনার চেষ্টা করছি। রুবী নন্দী মদারাটের অধিবাসী। ১৯৫৯ সাল থেকে তাঁর এ্যাথলেটিক্স জীবন শুরু হয়। সাফল্যের সোপান বেয়ে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জাতীয় স্তরের বিজয়মাল্য তাঁর গলায় বহুবার শোভিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘলম্ফন, ১০০ মিটার দৌড় ও ৪ x ১০০ মিটার রিলে দৌড়ে বহুবার প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে জাতীয় আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড় ১২.৯ সেকেন্ডে ও দীর্ঘলম্ফন ৫.২০ মিটার অতিক্রম করে তিনি জীবনের সেরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর যোগ্যতার নিরিখে ইন্দো-জার্মান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

মিনতি দাসের সাফল্য ১৯৭০ সাল থেকে বিকশিত হয়। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নানান জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। তারপর আসছি মল্লিকা দাসের কথায়। বাবা অজিতকুমার দাসের অনুপ্রেরণায় ও প্রশিক্ষক সুজিত সিনহার তত্ত্বাবধানে জেলা থেকে রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় এক খ্যাতনামা এ্যাথলেট হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৮০ সালে রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চলম্ফে ১.৪২ মিটার এবং দীর্ঘলম্ফনে ৪.৮৫ মিটার অতিক্রম করে জুনিয়ার বিভাগে রাজ্য রেকর্ড করেন। তাই ১৯৭৯-৮০ বর্ষে কলিকাতা স্পোর্টস্ জার্নালিষ্ট কর্তৃক সেরা এ্যাথলেট মনোনীত হন। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মস্কো অলিম্পিক্সে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়।

১৯৮০ সালে জাতীয় জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় দীর্ঘলম্ফনে ৫.৩৬ মিটার অতিক্রম করে রেকর্ড স্পর্শ করেন এবং দীর্ঘদিন দীর্ঘলম্ফনের রাজ্য রেকর্ড ৫.৪৪ মিটার তাঁর নামের পাশে ছিল। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য সরকারী বৃত্তিমূলক অনুদান বার্ষিক নয়শত টাকা করে দুই বৎসর অর্জন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ (SAF) গেমসে অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মদনমোহন দে একজন পোলভল্টার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জেলাস্তর থেকে রাজ্যস্তরের সোপান রেখে তিনি ১৯৭৯ সালে National Games-এ অংশ গ্রহণ করেন এবং ৩.৩০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এ্যাথলেট হিসাবে চাকুরী পেয়ে ১৯৮৪ সালে All India Ordinance Athletic Meet-এ ৩.৭০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারতী ছাটুই অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অদম্য উৎসাহে কঠোর ও কঠিন প্রচেষ্টায় খেলাধূলার অঙিনায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৭১ ও ৭৫ সালে জাতীয় ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১৯৭৫ সালে রেলওয়েতে চাকুরী পেয়ে তাঁর জীবন নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। তাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় মেয়েরা খেলাধূলার আসুক, এই আন্তরিক প্রত্যাশা নিয়ে আজও সংগঠনের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে চলেছেন।

আমাদের জেলায় অনেক পরে হকি ও বাস্কেটবল খেলার প্রচলন শুরু হলেও আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছি। এই খেলা চালু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জয়ন্ত হোমচৌধুরী ও দিব্যেন্দু নাগ। এই খেলায় সাহায্য করে রাসমণি বালিকা বিদ্যালয় ও বারুইপুর হাইস্কুল তাঁদের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। বাস্কেটবলে মূলত রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে এবং তাঁদের স্কুলের মধ্যে একটি বাস্কেটবলের কোর্টও আছে। আমাদের মেয়েদের দল অনেক শক্তিশালী এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে। সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল ২০০২ সালে জুনিয়ার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। বাস্কেটবলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন কাকলি গাড়ু, অর্পিতা গুহঠাকুরতা, মহুয়া পাল প্রমুখ।

জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে বারুইপুরে এ্যাথলেটিক্সের চর্চা অতীতে বেশী ছিল, এখনও বেশী আছে। অতীতে যারা এ্যাথেলেটিক্সে শুধু এই জেলার নয়, সারা রাজ্যে সেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে হৃষিকেশ, মঞ্জু (ধপধপি) নিরাপদ নস্কর (বেলেঘাটা) সঞ্জয় পাল (পুরাতন বাজার), কিঙ্করী দাস, দীপা খাঁ, মল্লিকা দাস (দত্তপাড়া), রুবী নন্দী, সুবী নন্দী, মল্লিকা দাস, পূর্ণিমা দাস, মিনতি দাস, (মদারাট), রসিদ লস্কর (খোদার বাজার), শিবেন্দ্রনারায়ণ (মল্লিকপুর), প্রতাপ মণ্ডল, আবু তাহের (রামনগর) নাম উল্লেখযোগ্য। সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনায় যে সব প্রশিক্ষক বর্তমানে আন্তরিক প্রচেষ্টা রেখেছেন, তাঁরা হলেন সঞ্জয় পাল, নিরাপদ নস্কর, মহঃ ঈশাক, প্রদীপ পাল, গফুর সর্দার ও আরো অনেকে।

তৃপ্তেষ মণ্ডলের সহযোগিতায় শরৎ স্মৃতি সংঘের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত যোগাসনচর্চা হয়। এহ

যোগাসনে এ পর্য্যন্ত যাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন সুধা সরদার ১৯৮৭ সালে ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়ন, মৌমা কয়াল ১৯৯২ সালে রাজ্যে প্রথম হয় এবং ১৯৯৮ সালে জেলাতে প্রথম হয় অভয়পদ গুই।

বারুইপুরের সংগ্রাম সংঘ ও কিশোর সংঘ প্রবল উৎসাহ নিয়ে ভলিবল শুরুর মাধ্যমে ভলিবলে গুণগত মানের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু আজ সেই আন্তরিকতা অনেক কমে গেছে। তবে এই ক্লাবগুলির হয়ে ভলিবলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাঁরা দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন শিবশঙ্কর সরকার, সুদীপ সেনগুপ্ত, তুরণ নস্কর, সঞ্জয় মণ্ডল মানস সাহা, গৌরীশঙ্কর সরকার, সমীর সাহা ও দুলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। ভলিবল ম্যাচ পরিচালনায় দক্ষতা ও যোগ্যতায় সম্মান অর্জন করেছেন অমিত নস্কর।

এবার আসছি খেলার মাঠ প্রসঙ্গে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্লাবের প্রচেষ্টায় আগের থেকে অনেকগুলি বড় মাপের মাঠ বারুইপুরে তৈরী হয়েছে। বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স গড়ার সংকল্প নিয়ে একটি ফুটবল মাঠ ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে এবং গ্যালারীর কয়েকটি ধাপ হলেও বর্তমানে কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না। সাগর সংঘের মাঠে জেলা ক্রীড়া সংঘের সহযোগিতায় জেলা স্টেডিয়াম করার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, যেখানে থাকবে ৪০০ মিটারের এ্যাথলেটিক ট্রাক। সরকারী অনুদান আমরা পেয়েছি। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই ব্যাপারে প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ সুজন চক্রবর্তী যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বারুইপুরের অনেকগুলি ক্লাব মাল্টিজিম পেয়েছে। মদারাটের সুইমিং পুলের জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর হয়েছে। বর্তমান বিধায়ক অরূপ ভদ্র মহাশয় মদারাট মাঠে ৪০০ মিটার এ্যাথলেটিক ট্রাক করার জন্যও সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। হরিহরপুর জাগৃতি সংঘ, ধপধপি যুব সংঘ ও আটঘরা ক্রীড়া সংঘ – এদের মাঠের সম্প্রসারণের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। তাছাড়া তিনি শাসন বালকসংঘের জন্য একটি মালটিজিমেরও ব্যবস্থা করেছেন। নিউ ইন্ডিয়া ক্লাবের মাঠে O.N.G.C. চলে যাবার পর মাঠটায় আবার খেলাধুলা সংগঠিত হচ্ছে, তবে মাঠটা আরও একটু বাড়ানো দরকার। আর.সি.এস.সি.-এর মাঠে বহুদিন থেকে খেলাধুলা চলে আসছে এবং এখন মাঠের অবস্থান একই রকম আছে। বিশালাক্ষ্মী স্পোর্টিং এ্যাণ্ড কালচারাল ক্লাবের মাঠ আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হলেও আর একটু বাড়াতে পারলে ভাল হয়। হরিহরপুর জাগৃতি সংঘের সদস্যরা নিজগ্রামের মানুষের সহযোগিতায় একটি মাঠ করেছেন। এছাড়াও চাঁদখালী যুব সংঘ ও সন্তালী সংঘের মাঠ আছে। তাছাড়া অনেক ক্লাবের ছোট ছোট মাঠ আছে। আবার অনেক ক্লাব তাদের মাঠকে সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। তবে খেলার মাঠ বাড়ছে ও সাজসরঞ্জাম অল্প হলেও আসছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে ছেলেমেয়েদের মাঠে আনা যাচ্ছে না। তবে এই ব্যাপারে ক্রীড়ামোদী অভিভাবকদেরও ভাবতে হবে।

বারুইপুরের অমিতাভ মিত্র ক্রিকেট খেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমাদের জেলার সব থেকে বড় সম্মানের অধিকারী হলেন সত্যেন ভট্টাচার্য যিনি রঞ্জি ট্রফিতে অংশ - গ্রহণ করে নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুকুমার সেনগুপ্ত কবাডী ও

এ্যাথলেটিক্সে ক্রীড়া পরিচালক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং রেফারী সংঘ ও ক্রীড়া সংঘের বিভিন্ন পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্যামল চক্রবর্তী ভলিবলে জাতীয় পর্যায়ের একজন দক্ষ রেফারী হিসাবে সম্মান অর্জন করেছিলেন।

বারুইপুরের হোমিওপ্যাথির ইতিহাস

ডাঃ বিভা কাঞ্জিলাল

ইতিহাসের শেষ বলে কিছু নেই। কোন ইতিহাসই স্বল্পদিনে বা একক প্রয়াসে পূর্ণতা পায় না। তাই অবচেতনভাবে প্রকাশ পায় না কিন্তু পরবর্তীতে তদা প্রকাশ পায় ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়।

আমাদের জানা মতে বারুইপুরের হোমিওপ্যাথির ইতিহাস বারুইপুরেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সারা দক্ষিণ ২৪ পরগণারই ইতিহাস; কারণ, বারুইপুরকে কেন্দ্র করেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বারুইপুরের সংগঠকেরাই হোমিওপ্যাথির প্রচার প্রসারে দক্ষিণ ২৪ পরগণা হোমিওপ্যাথদের সংগঠিত করেছিলেন।

এই অঞ্চলের হোমিওপ্যাথির ইতিহাস নিয়ে কোন কথা বলতে হলে প্রথমেই যাঁদের নাম শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করতে হয় তাঁরা হলেন ডাঃ জলধর পূততুণ্ড ও ডাঃ শরৎচন্দ্র বিশ্বাস। তাঁরা প্রচণ্ড অস্বচ্ছলতার ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সেদিনের হোমিওপ্যাথি-বিরূপ সমাজে নীতি নির্ভর হয়ে হোমিওপ্যাথি প্রয়োগ করে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তদানিন্তন খ্যাতনামা এ্যালোপ্যাথ ডাঃ পুলিনবিহারী রায়চৌধুরী মনে করতেন, শিশুদের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই শ্রেয়। তাই তিনি শিশুদেরকে চিকিৎসার জন্য ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দিতেন যা, বিপিনবাবুকে জনমানসে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এরফলে, দক্ষিণবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের চিকিৎসাক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে ও আস্থা অর্জন করতে সাহায্য করে।

পরবর্তিতে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিপিনবাবুর উদার আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও বারুইপুরের ডাঃ সনৎকুমার ঘোষ, ডাঃ বলরাম রায়চৌধুরী, ডাঃ খায়রুল আনম্, ডাঃ অনিল আচার্য, ডাঃ নিরঞ্জন সরদার, ডাঃ চন্দ্রভূষণ ব্যানার্জী, ডাঃ সূর্যকান্ত সরদার, ডাঃ নন্দলাল নস্কর, ডাঃ নরেশচন্দ্র দাস, ডাঃ মণিন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ডাঃ এম.এ. গণি, বজবজের ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মগরাহাটের ডাঃ কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ডায়মণ্ডহারবারের ডাঃ এন. ব্যানার্জী, রায়দীঘির ডাঃ ভূপেন মান্না এবং উকিলেরহাটের ডাঃ অভিমন্যু নায়েক প্রভৃতি চিকিৎসকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগণা হোমিওপ্যাথিক এ্যাসোসিয়েশন। এপ্রিল ১৯৬৯ সালে তৈরী হল 'ডাঃ বিপিনবিহারী হল'। সংগঠিতভাবে হোমিওপ্যাথদের কাজকর্ম চালানোর জন্য সংগঠনের নিজস্ব ঘর – যার আয়োজক ছিলেন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ। দ্বারোদঘাটন করেন তৎকালীন মেটেরিয়া মেডিকার প্রখ্যাত শিক্ষক ডাঃ হরিমোহন রায়চৌধুরী। এই ঘরেই তদানিন্তন স্ব-শিক্ষিত হোমিওপ্যাথদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। যা তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি (রেজিস্ট্রেশন) পেয়ে পূর্ণোদ্যমে

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার সুযোগ করে দেয়। এখানে বিনা পারিশ্রমিকে একমাত্র হোমিওপ্যাথির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষকতার কাজ করেন ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ বলরাম রায়চৌধুরী এবং ডাঃ বিভা কাঞ্জিলাল (ঘোষ)।

১৯৭০ সালে বারুইপুর হাই স্কুলে সফল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের রাজ্য সম্মেলনে ১৩০০ প্রতিনিধি এসেছিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এই সম্মেলনে ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ-আহ্বায়ক সমিতির সভাপতি, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্মেলন সম্পাদক ও ডাঃ বিভা কাঞ্জিলাল (ঘোষ)–কোষাধ্যক্ষা ছিলেন। এই সম্মেলনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ জে. এন. কাঞ্জিলালের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনের সফলতা আজও দক্ষিণ ২৪ পরগণার চিকিৎসকদের মনে বিশেষ স্থান লাভ করে আছে।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারুইপুরের হোমিওপ্যাথিক সংগঠকদের নেতৃত্বে সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা সংগঠিত হ'ল দক্ষিণ ২৪ পরগণার হোমিওপ্যাথিক এ্যাসোসিয়েশেন-এর ছত্রছায়ায়। পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক ফেডারেশনে যুক্ত হয়। এবং অবশেষে এই সংগঠন ১৯৭৫ সালে 'হোমাই' সংগঠনে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতির নিয়মে নদীতে যেমন জোয়ার আসে তেমনই ভাটাও আসে। 'হোমাই'-ও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনই সময় ডাঃ প্রণয়কুমার পান, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায় ও ডাঃ তপন কাঞ্জিলালের সহযোগিতায় সংগঠনের হাল ধরেন ডাঃ বিভা কাঞ্জিলাল। এবং সগঠনের আসে জোয়ার। প্রবীন চিকিৎিসক ডাঃ সনৎকুমার ঘোষের আন্তরিক সহযোগিতা তরুন চিকিৎসকদের পথ চলতে উৎসাহিত করে।

১০ই এপ্রিল ১৯৯০ সালে ডাঃ প্রণয়কুমার পান, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ নিরঞ্জন সরদার ও ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইতের উদ্যোগেও বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের সহযোগিতায় ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়। হোমিওপ্যাথির স্রষ্টা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের আবক্ষ মূর্তি বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার অঙ্গনে স্থাপিত হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গে মহাত্মা হ্যানিম্যানের দ্বিতীয় আবক্ষ মূর্তি। এর আবরণ উম্মোচন করেন ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে তৎকালীন বিধায়ক হেমেন মজুমদারসহ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বারুইপুর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান ললিতকুমার রায়চৌধুরী, পঞ্চানন ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথ না হয়েও হোমিওপ্যাথিক সংগঠনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। অধুনা রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন গৃহে বারুইপুর পৌরসভার উদ্যোগে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা আশা ভরসার স্থল ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ বলরাম ঘোষ। কিন্তু কোনএক অজানা ও অদৃশ্য কারণে তা বন্ধ করে সেখানে একটি সুন্দরবন সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। এবং সাধারন মানুষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

পুরাতন বাজারের কাছে বারুইপুর হাই স্কুল, চৌধুরী বাড়ি এবং রবীন্দ্রভবনে বিভিন্ন সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্মেলন হয়েছে। 'হোমাই' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার দক্ষিণ ২৪ পরগণার সভাপতি ডাঃ নিমাই মাইতি, ডাঃ প্রণয়কুমার পান, সম্পাদিকা ও সম্পাদক হিসাবে ডাঃ বিভা কাঞ্জিলাল এবং মনোরঞ্জন পুরকাইত হোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিক সংগঠনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও ডাঃ তপন কাঞ্জিলাল – 'হোমাই' কেন্দ্রীয় কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জেনারেল, ডাঃ প্রণয়কুমার পান– রাজ্য 'হোমাই'-এর সহসভাপতি এবং ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায় রাজ্য 'হোমাই'-এর বিজ্ঞান উপসমিতির সম্পাদক ছিলেন।

মঙ্গলা হোমিও ফার্মেসী এই অঞ্চলের প্রথম হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান। বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সরবরাহ করার জন্য ডাঃ সনৎকুমার ঘোষ মহাশয়কে উৎসাহিত করেন ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ বলরাম রায়চৌধুরী প্রমুখ চিকিৎসকবৃন্দ। মূলত এঁদেরই উৎসাহে এই দোকানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই অঞ্চলের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন –ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ চন্দ্রভূষণ ব্যানার্জী, ডাঃ বিমল নস্কর, ডাঃ রজনীকান্ত বর ও ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। ইংরেজী ও বাংলায় বেশ কিছু বই লেখেন বিভা কাঞ্জিলাল ও তপন কাঞ্জিলাল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েও বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ডাঃ মনোরঞ্জন পুরকাইত।

বারুইপুরের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুফল মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ ভোগ করে আসছেন। যখন যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল চরম ঠিক সেই সময় থেকেই অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ মহাত্মা হ্যানিম্যানের নীতি নিষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে আর্ত মানুষের সেবা করে এসেছেন। এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ঘোষ প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব।

তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তিকালে যাঁরা এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বারুইপুর তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কল্লোলিনী করেছেন তাঁরা হলেন -

ডাঃ বিজনবিহারী গাঙ্গুলী, ডাঃ বিমল নস্কর, ডাঃ দেবকীদুলাল দত্ত, ডাঃ হরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ডাঃ মিহির বিশ্বাস, ডাঃ সুকুমার সাহা, ডাঃ নরেশচন্দ্র দাস, ডাঃ অনিল সরদার, ডাঃ বিজন পুরকাইত, ডাঃ বিজনবিহারী দাস, ডাঃ কৈবল্য ব্যানার্জী, ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ডাঃ অনুপ দত্ত, ডাঃ অনিলকুমার দাস, ডাঃ রমাপ্রসাদ খাঁন, ডাঃ বিদ্যুৎ পুরকাইত, ডাঃ গিরিজা পাহাড়ী, ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ কুমুদরঞ্জন মণ্ডল, ডাঃ চন্দ্রভূষণ হালদার, ডাঃ আই. ফার্ণাণ্ডেজ, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী, ডাঃ নাসিম আলি, ডাঃ সুকুমার দাস, ডাঃ বিশ্বনাথ দাস, ডাঃ প্রদীপ দাস, ডাঃ সত্যেন মহাত্মা, ডাঃ নিমাইচন্দ্র মণ্ডল, ডাঃ প্রশান্ত কুণ্ডু, ডাঃ উদয় রায়, ডাঃ নাসিরুদ্দিন, ডাঃ অনিল সরদার, ডাঃ প্রশান্তকুমার ঘোষ, ডাঃ জয়ন্তকুমার ঘোষ,

ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ডাঃ অমল পুরকাইত, ডাঃ গৌতমকুমার ঘোষ, ডাঃ অরবিন্দ বৈদ্য, ডাঃ দেবাশিষ চক্রবর্তী, ডাঃ আশরাফ আলি মোল্লা, ডাঃ সুকুমার সরকার, ডাঃ জাফর আহমেদ, ডাঃ দীপঙ্কর দাস, ডাঃ দীপঙ্কর প্রামানিক, ডাঃ জয়ন্ত ঘোষ, ডাঃ সমীর দাস, ডাঃ প্রভাতকুমার দাস, ডাঃ স্বাতী রায়চৌধুরী, ডাঃ চন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ তরুনা নস্কর, ডাঃ রুহুল আমিন, ডাঃ অরিজিৎ সরকার, ডাঃ শিবনাথ গায়েন, ডাঃ স্বর্ণালী সরকার, ডাঃ মতিয়ার রহমান, ডাঃ সলিল সরকার, ডাঃ জাহাঙ্গীর, ডাঃ মধুছন্দা ঘোষ, ডাঃ কাবেরী ব্যানার্জী, ডাঃ কাজল ব্যানার্জী, ডাঃ শ্যামল ব্যানার্জী প্রমুখ।

বারুইপুর থানায় হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় - ১) সীতাকুণ্ডু দাতব্য চিকিৎসালয়, ২) শিখরবালী দাতব্য চিকিৎসালয়।

বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটি কেন্দ্র আছে।

বারুইপুরের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র – ১) মঙ্গলা হোমিও ফার্মেসী, ২) তারা হোমিও ফার্মেসী, ৩) রেনুকা হোমিও ফার্মেসী, ৪) এ. এম. হোমিও ফার্মেসী, ৫) দাস হোমিও ফার্মেসী, ৬) ঘোষ হোমিও ফার্মেসী, ৭) রবিনসন হোমিও ফার্মেসী, ৮) হ্যানিম্যান হল, ৯) পাল হোমিও ফার্মেসী, ১০) হোমিও সেন্টার, ১১) লক্ষ্মী হোমিও ফার্মেসী, ১২) বিজলী হোমিও ফার্মেসী, ১৩) মধুছন্দা হোমিও সেন্টার।

বারুইপুরের রাজনৈতিক চালচিত্র

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর মুখোপাধ্যায়

বারুইপুরের অবস্থান বর্তমান কলকাতার খুব কাছে। এর আয়তন প্রায় ১২৫ বর্গ কিলোমিটার। এই এলাকা মূলত কৃষি প্রধান। মনসামঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ আছে। আদিগঙ্গার একটি ধারা এই বারুইপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। সেইভাবে উভয় তীরেই গ্রাম ও জনপদ গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সভ্যতার ক্রমবিকাশে আদিগঙ্গার সেই ধারা আজ বিলুপ্ত প্রায়। সুতরাং মানুষজনও বেশীরভাগ শহরমুখী। আলোচনার বিষয় ইংরাজ আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বারুইপুরের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের ভারত শাসন এবং শোষনের ঢেউ সমগ্র ভারতবর্ষে যখন আছড়ে পড়েছিল, বারুইপুরেও -এর ক্ষীণ রেখা এই অঞ্চলকে আন্দোলিত করে। স্বভাবতই এই শাসন এবং শোষনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হলেও শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোন আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। স্বভাবতই বারুইপুরের মানুষও এই স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচার, বেনিয়াদের শোষণ সুদূর গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তাঁতীদের আন্দোলন এর সবকটি সংগ্রামের উত্তাপে তেমন উত্তপ্ত ছিল না বারুইপুর। আগে বারুইপুর থানার অবস্থান ছিল বারুইপুর পুরাতন বাজারের নিকটে। সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় তৎকালীন সিপাহীরা সিপাহী বিদ্রোহে প্রভাবিত হয়ে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম করতে অস্বীকার করেন। লাল বাজারের ইতিহাসে-এর উল্লেখ আছে। সেদিনকার স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁদের দেখা গেছে তাঁরা সবাই উচ্চবর্ণের মানুষ। তারা পরাধীনতার গ্লানি যেভাবে অনুভাব করেছিলেন সমাজের নীচুতলার মানুষ ততখানি করেনি। নিম্নবর্গের মানুষের মুখে "শুধু দুটি অন্ন ঘুঁটি, কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় পচাইয়া"। সুতরাং সংগ্রামের ময়দানে নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি যতসামান্য।

বারুইপুরের মানুষের তখন ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়নি। যখন ১৮২০ সালে গীর্জায় পাদ্রীরা ব্যাপকভাবে নিম্নবর্গের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে তখনই সাধারণ মানুষের চোখ খুলে যায়। এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপক ঝড় ওঠে। শোনাযায় এক ব্রাম্মণকে ধর্মান্তরিত করা হল এবং তার স্ত্রীকে গীর্জার মধ্যে আটকে রেখে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয়। এই ঘটনায় মানুষ আরও সচেতন হয়ে ওঠে। স্থানীয় জমিদার রাজা রাজবল্লভ রায়চৌধুরী সেদিন ঐ পাদ্রীদের পিটিয়ে ঠান্ডা করেছিলেন। ঐ পাদ্রীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা শুরু হয়। মামলা রুজু হয় এবং তৎকালীন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট পাদ্রীদের বিরুদ্ধে রায় দেন। নীলকর সাহেবদের – দক্ষিণের হেড কোয়ার্টার বা প্রধান কার্য্যালয়– যেটি বড়কুঠি নামে সমধিক পরিচিত – বর্তমান রবীন্দ্রভবনের সম্মুখস্ত মাঠসহ বাড়ী। ঐ বাড়িটি তৈরী করেন প্রিন্স দ্বারোকানাথ ঠাকুর লবনের ব্যবস্থা করার জন্য। পরবর্তীকালে রাজকুমার রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ঐ বাড়ী কিনে নেন।

নীলকর সাহেবেদের কার্য্যালয় ছিল বারুইপুর হাইস্কুল সংলগ্ন একটি ঘর। নীলচাষ হত বারুইপুর হাই স্কুলের সম্মুখস্ত মাঠে। তাই ওই মাঠকে বলা হত নীলক্ষেত। ঐখান থেকেই নীলচাষ ছড়িয়ে পড়ে বেগমপুরে, শাঁখারীপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে । বাংলার কোন চাষী স্বেচ্ছায় নীলচাষ করেনি। ইতিহাস সেই কথাই বলে। অথচ এই নীলচাষ এবং ধর্মান্তকরণ নিয়ে অন্য এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হলেও খোদ বারুইপুরে এধরনের সংঘর্ষের কোন খবর নেই।

১৮৬৪ সনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর মুন্সেফ আদালতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হয়ে খুলনা থেকে এলেন। তিনি থাকতেন ঐ বড় কুঠিতে। অসমাপ্ত দুর্গেশনন্দিনী বইটি ১৮৬৫ সালে তিনি প্রকাশ করে ফেলেন। এরই মধ্যে হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলার আয়োজন হল রাসমাঠে। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বজাতীয়দের মধ্যে সমভাবাপন্ন মনোভাব স্থাপন করা। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে রাসমাঠে অনুষ্ঠিত হল সেই যুগান্তকারী 'হিন্দুমেলা'। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সফল হচ্ছিল। বারুইপুরের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটছিল।

এই হিন্দু মেলার উদ্বোধনী সংগীত "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" – সংগীতের এই কলি বহুকাল এই যুগের লোকের মুখে শোনা গেছে। জাতীয় সংগ্রামের পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এই হিন্দুমেলাই সমোধিক পরিচিত। এই জাতীয় সংগঠনগুলি ছিল ভারতের চেতনা প্রকাশের সমধিক পরিচিত সংগঠন। এর সংগঠক ছিলেন উচু মাপের নেতারা। প্রখ্যাত মারাঠী বিপ্লবী সখারাম গনেশ দেউস্কর হিন্দু মেলার পরিবর্তে এই সংগঠনের নাম 'ভারত মেলা' করার প্রস্তাব দেন। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন ঘিরে সারা বাংলায় আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। এই আন্দোলনে বারুইপুর-এর যুব-ছাত্রদল হাতে হাত মিলিয়ে মিছিল করে এই আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বারুইপুর কোর্টের উকিল সুশীল ঘোষ মহাশয়। মুখে তাদের ছিল রবীন্দ্র সংগীতের কলি –

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল" —

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পুরাতন বাজার বা হাটে প্রবেশ করলে সামন্ত প্রভুদের লাঠিয়ালবাহিনী এই স্বেচ্ছাসেবকদের উপর আক্রমণ করে। এখানেই প্রতিবাদ সভা হওয়ার কথা ছিল। সভার শেষে আরম্ভ হবে-বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বান। এই আন্দোলন পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উকিল সুশীল ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে বারুইপুর রাসমাঠে একটি মহতী জনসভা করা। কিন্তু রাসমাঠে সভা হওয়ার ব্যাপারে তিনি খুব ভরসা পেলেন না। অথচ সভা করতেই হবে। এই অবস্থায় সভা স্থানান্তরিত হল বর্তমান বারুইপুর কোর্টের বাইরে কুলপী রোড সংলগ্ন স্থানে। প্রচার ছিল বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ সপার্ষদ ঘোড়ার গাড়িতে করে আসবেন। ব্রিটিশ বিরোধী এই জনসভার তারিখ ছিল ১২ই এপ্রিল ১৯০৮ সাল। জনসভার সভাপতি বারুইপুর কোর্টের উকিল মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল ও পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতাদের উপস্থিতিতে সভা সম্পন্ন হবে। অন্য প্রখ্যাত উপস্থিত নেতৃবৃন্দের নাম হল – ডাঃ সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর বসু, হরিকুমার চক্রবর্তি, নরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই নরেন ভট্টাচার্য-ই হলেন এম. এন. রায়। স্বেচ্ছাসেবকরা ছিলেন কোদালিয়ার

কালিচরণ গুহ, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল হরেন্দ্রনাথ পাঠক, উকিলপাড়ার অমরনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ সমাজসেবীবৃন্দ। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা করেছিলেন ইংরাজীতে। এরকম মহতী জনসভায় বাংলা না বলতে পারার অক্ষমতা থেকে লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। ইংরাজী বক্তব্যের বাংলা তর্জমা করেন বিপিনচন্দ্র পাল। অমরনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায় আমাদের বয়স তখন অল্প। গেরুয়া রঙের বসনে ভূষিত করে মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী বেধে লাঠি হাতে মঞ্চের দুপাশে আমাদের দাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোক হয়েছিল হাজার তিনেকের মত। তখনকার কথায় বলতে গেলে লোকসংখ্যা ভালই হয়েছিল। পরবর্তিকালে দু-একটা বইতে অরবিন্দের এই বক্তৃতা ছাপাও হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা কি? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কি শেষ কথা? বারুইপুরের বক্তৃতা সেরে তিনি সোজা চলে যান হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়। কিছুদিনের মধ্যে ঐ বছরের শেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অমানবিক অত্যাচার করা হয়। অভিযোগ– বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের।

বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের মত মহান বিপ্লবীরা বারুইপুরে তাঁদের পদধূলি রেখে পবিত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন। এতে তৎকালীন বারুইপুরবাসীরা নিজেদের গর্বিত বোধ করেছিলেন। এবং এখনও বারুইপুরবাসী সেই স্মৃতিকে রোমন্থন করে গর্ববোধ করেন।

অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় নতুনভাবে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যানবাটীতে স্থাপন করলেন মদারাট পপুলার একাডেমী। বারুইপুরের উকিলবাবুরা বিনাবেতনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলেন।

বারুইপুর, শাসন, কল্যাণপুর, সাউথ গড়িয়া, রামনগর, ধপধপি কুমোরহাট প্রভৃতি গ্রামের যুবকবৃন্দ তেরঙ্গা পতাকা হাতে নিয়ে বারুইপুরের আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। সবভারতীয় বড় মাপের নেতা বারুইপুরে জন্মাননি ঠিকই, কিন্তু, মাঝারি মাপের বহুনেতা বারুইপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডাঃ সাতকড়ি ব্রন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বিপ্লবী বললে ভুল হবে- তিনি ছিলেন সমাজসেবী ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে খ্যাত। তাঁকে তদানিন্তন মানুষরা বলতেন 'সাত দা'। চেম্বারে রোগী এলে সাতদা বলতেন, 'বাপু মায়ের শেকলটা আগে কাটো দেখি তাহলেই ওসব রোগ-টোগ পালিয়ে যাবে। মায়ের হাতে বড় ব্যথা'।

রোগীরা এসব তত্ত্বকথা কেউ বুঝতো আবার কেউ বুঝতো না। এইভাবেই সাতদা স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনার কথা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতেন। লোকে এটা বুঝতে পারলো যে একজন সত্যিকারের মানুষ এসেছেন। ভেঙে পড়া মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো। সাতদা-র দলে ছিলেন সালেপুরের অমূল্য মুখার্জী, মদারাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজয় বোস। এছাড়াও ছিলেন ফণী মুখার্জী, নলিনী মুখার্জী, নলিনী হালদার এবং মদারাটের ডাঙপিটে ছেলে দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র। যিনি দেবেন মিশ্র নামে সমোধিক পরিচিত। এঁদের নিয়ে আলাদা গোপন বৈঠকে করতেন সাতদা। এদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন উকিল অমৃতলাল মারিক।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন দেবেন মিশ্র। মদারাট গ্রামের তুলসী

পাল প্রেসিডেন্সী জেলে তিনমাস কারাভোগ করার পর যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। নারায়ন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী জেলে ছয় মাস কারাবরণ করেছিলেন। শাসনের বাসিন্দা অধ্যাপক রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় তিনমাস প্রেসিডেন্সী জেলে কারাবরণ করেছিলেন। এছাড়া শাসন গ্রামের পূর্ণ ব্যানার্জী- বহরমপুর জেলে ছয় মাস; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বিরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছয়মাস করে জেল হয়। গ্রাম বারুইপুরের সতীশ দাস- দত্তপাড়া; হিজলী জেলে ছয়মাস এবং নফরচন্দ্র দাসও কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি পরে বৈষ্ণব ভক্তবাবাজী উপাধি গ্রহণ করেন। অপূর্ব দত্ত, মহম্মদ বাবুর আলি ও তাঁর পুত্র এম. আব্দুল্লা এরাও পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেন। এছাড়া মামুদপুরের বঙ্কিম বৈদ্য, কল্যাণপুরের বিষ্ণুপদ নস্কর, জ্যোতির্ময় রায়, নিহাটার অনুকূল মণ্ডল, প্রতাপ মণ্ডল এবং খগেন্দ্রনাথ নস্কর প্রমুখ ব্যক্তিগণ আইন অমান্য আন্দোলন ও বিভিন্ন কর্মসুচীতে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। খগেন্দ্রনাথ নস্কর রিপন কলেজে ছাত্রাবস্থায় কিছুকাল যুগান্তর পার্টিতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। টংতলার পুলিন নস্কর ও বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় সি.ডি. মুভমেন্টের জন্য ছয়মাস করে জেল খাটেন। সাউথ গড়িয়ার বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মন্মথ বাবু কর্মীদের কাছে 'মণি-দা' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে দল গঠনের জন্য সারা বাঙলায় ঘুরতে হয়েছে এবং এইসময়ে বহু বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এইগ্রামের আন্নাকালী দাস ও তাঁর ভাই হরিপদ দাস ছিলেন সেইসময়ের বিখ্যাত ফুটবলার। তাঁরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষাল, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাপতি মুখোপাধ্যায়, গৌর ঘোষ, যতীন ব্যানার্জী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, হারান অধিকারী, মহাদেব নাথ, প্রিয়নাথ প্রামানিক, অজিত ব্যানার্জী, ডাঃ যজ্ঞেশ্বর আচার্য প্রমুখ নামের সঙ্গে মিশে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তঝরা কাহিনী।

ধপধপির প্রদ্যুৎ ঘোষ— ইনি কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেন হত্যার অন্যতম আসামী। ডঃ সুনীতি চৌধুরী, জীতেন ঘোষ (বটুদা) সম্বন্ধে শোনা যায় তাঁরা কোন-না কোন সময়ে ইংরেজদের নিগ্রহ করে ফেরার হয়েছিলেন। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও বটুদার নাগাল পায়নি। পরবর্তিকালে জীতেন ঘোষ ও প্রদ্যুৎ ঘোষ কারাবাসের মধ্যেই কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ধপধপি এলাকার জনশ্রুতি বারুইপুরের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সংগঠক এঁরা দুজন। যদিও এঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। রামনগরের সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-নাট্যকার ও শিক্ষক -সাতদার নেতৃত্বে কিছুকাল কাজ করেন। তবে এঁর বিপ্লবী মঞ্চের দীক্ষা আদিশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে। রামনগরের নিশিকান্ত সরকার লবণ আইন ভঙ্গ করে হিজলী জেলে ছয়মাস কারাবাস ভোগ করেন।

ছয়ানির মাঝেরহাট একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। এই গ্রামের যুবক পাঁচুগোপাল রায় (সরদার) উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতার কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্ত করতে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পাঁচুগোপাল বাবু সমাজ সংস্কার ও দেশগঠণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাস্তা, স্কুল নির্মাণসহ নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক

কাজে এলাকার তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছিলেন।

শ্রী সুশান্ত সরকার (নিতাই) ছিলেন একজন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতবিপ্লবী। ইংরেজ সরকার সমস্তরকম নৌকা, বজরা সারা বাংলাদেশে আটক করার নির্দেশ দেন। নৌজীবীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই অবস্থার অবসান কল্পে উত্তরভাগ ঘাটে ও পিয়ালীতটে অরুণ মণ্ডল ও নিতাই সরকারের যুগ্ম নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের পুলিশের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে নৌজীবীদের বহু নৌকা আটক মুক্ত হয়। এরজন্য নিতাই সরকার ও অরুণ মণ্ডলকে পুলিশী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

বিপ্লবী ললিত সিংহের নিবাস ছিল ক্যানিং ডক ঘাঠে। ইনি ছিলেন দেবেন মিশ্রের সহকর্মী। ওয়াটসন হত্যা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্সী জেলে কারাভোগ করতে হয়। দেবেন মিশ্রের অন্য সহকর্মীদের নাম বঙ্কিম বৈদ্য, দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীল চ্যাটার্জী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, তাঁর ভাই সুশীল ভট্টাচার্য ও মিলন মৈত্র।

লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন থামাতে পুলিশের অত্যাচার কোন কোন স্থানে সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করেন। পুলিশ কোথাও পাল্টা আঘাত পায়নি। উলেখযোগ্য ঃ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বারুইপুরের যে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল তা মূলত অহিংস। শুধু ব্যতিক্রম নিতাই সরকারের নৌকা আটকের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধ এবং সাফল্য লাভ।

এখন দেশ স্বাধীন। স্বাধীনতাত্তোর যুগে সারা ভারতে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রাধান্য থাকে। ভারতবর্ষেও স্বাধীনতার পরবর্তি যুগে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশটি। যারা ১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। এদের নাম হল – ইউ.সি.পি.আই., সি.পি.আই., ফরোয়ার্ড ব্লক, এস.এস.পি. (১৯৬২), ডি.এস.পি., আর.সি.পি.আই., সি.পি.আই.(এম.এল.), পি.এস.পি., ওয়ার্কার্স পার্টি, এস.সি.আই., আই.এন.সি., অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, লোকসেবক সঙ্ঘ, সংযুক্ত বিপ্লবী পরিষদ, বাংলা কংগ্রেস, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি, মুসলিম লীগ, প্রগ্রেসীভ মুসলিম লীগ, গোর্খা লীগ, গোর্খা ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট, সোসালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি। ১৯৬২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং সি.পি.আই এবং সি.পি. আই.(এম) ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অসীম চট্টোপাধ্যায় সন্তোষ রাণা সি.পি.আই. (এম.এল.) নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

দেবু সিংহ বারুইপুরের সেই সময়ের গোপনীয় বিপ্লবী শক্তির সংগঠক, অন্যান্য নেতারা, হরিধন চক্রবর্তী, কংসারী হালদার, খগেন রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। আর ছিলেন সাতগাছিয়ার বুড়ুল থেকে কাকদ্বীপের বুদাখালি পর্যন্ত একডাকে যার নাম চেনা যেত, তিনি পলাশ প্রামানিক। প্রচার আলোকের ঝলসানি বাদেও কৃষকদের মনে ছিল তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল ছিল ধপধপি। সবুজ ধানের ক্ষেতে ভরা মদনপুরে। বারো জাতের গ্রাম্য কুকুরগুলো ডাক দিয়ে সতর্ক করে দিত বাইরের কেউ গ্রামে ঢুকলে। ওরা সবুজ ক্ষেত, জলাশয় ভেঙ্গে

পগাড় পার হতেন ওলবেড়ে, তেউরহাট, খরমপাড়া পার হয়ে উঠতেন শকুনতলায়। তারপর এককভাবে আত্মগোপন করতেন জয়নগর থানার চালতাঁবেড়ে ও প্রসিদ্ধ তিলপি গ্রামে। একবার তিলপি ঢুকলে ওদের ধরে কে? ঢোঁসার খাল পার হলে চন্দনেশ্বর, বামে মহিষমারি ফেলে সামনে ইটখোলা বাজার, ক্যানিং, জয়নগর সংযোগস্থল।

জনগণের সাথে মিশে রাজনীতি করার ব্রত ও আদর্শের বিশ্বাস নিয়ে এলেন '৫২ সালের পর একদল স্থায়ী রাজনৈতিক কর্মী শংকর মজুমদার, রাধাকান্ত দত্ত, রাস ব্যানার্জী, নিশীথ ব্যানার্জ্জী, শংকর বোস, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা আর চা, চায়ের ব্যবসায়ী শংকর মজুমদার সাইকেলে চড়ে চা বিক্রী করেন আর তার সাথে কম্যুনিষ্ট লিটারেচার পড়তে দেন বিনা পয়সায় ফেরত নেওয়ার শর্তে, আদর্শ এবার প্রচার হতে লাগল জনসাধারনে।

১৯৫২ সালে বারুইপুরের দ্বৈত নির্বাচন ক্ষেত্র ছিল। নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে আব্দাস সুকুর ও সি.পি.আই.-এর পক্ষে ললিত সিংহ।

সজল রায়চৌধুরী কলকাতায় গেল গণনাট্যের মহড়ায়। যাদু দত্ত সরকারী চাকুরীতে রেলে। শংকরবাবুর প্রচারের নীট লাভে কৃষককূলের ছেলে বর্তমানে আইন ব্যবসায়ী আক্রামূল হক্ ও মৃণাল চক্রবর্তী। তার পরে পরে ৫০ এর দশকের শেষে হেমেন মজুমদার, অশোক চ্যাটার্জী, শচীন্দ্র ঘোষ, মানিক দাস, শচীন দাশগুপ্ত, অনাথ দাস প্রমুখেরা। মুরারী মোহন দাশ, তপন ভট্টাচার্য আরোও পরে।

৩৮-৩৯ সালে হরিকুমার চক্রবর্তী ও সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রেরণায়, দেবেন মিশ্রকে, কেন্দ্র করে উদীয়মান সীতাংশু চট্টোপাধ্যায়, (মানে বিলু দা), নকুল ঘোষ, মুরারী দাশ, নিতাই সরকার (সুশান্ত) অরবিন্দ ঘোষ, শিশির বোস, আসাদ আলি প্রমুখ র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্টরা চাকুরী নিয়ে কলকাতায়। বিলু দা, আসাদ আলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। তখনকার হেডঅফিস মিশন রোড-এ। সরকারী চাকুরীরতদের ছিল রাজনীতিতে মানা। বিলু দার সম্পাদনায় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পত্রিকা পরিচালনা হত।

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সাইনবোর্ডটা দীর্ঘদিন টাঙানো ছিল কাছারি বাজারে ৪৮সালে পার্টি উঠে যাওয়ার পরেও। দেবেনদা আমাদের অতীতকালের গল্প শোনাতেন। সমাজসেবী ডাঃ অনুকুল মণ্ডল সহ বেশ কিছু ভদ্রলোক এম. এন. রায়ের ছিল অনুরক্ত। এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার সাথে সুভাষ বসুর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিল আকাশ পাতাল প্রভেদ, তবে র‍্যাডিক্যালরা কোনও সময়েই সুভাষ চন্দ্রকে অসম্মান করেন নি।

১৯৫৪ সালে বারুইপুর এর সংঘ ভবনে সুশীল ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষামুলক বিস্ফোরণ এর জন্য নিন্দা ও প্রতিবাদ সভা হয়। যাতে অগ্রনী ভূমিকায় ছিলেন সর্বদলের সমাজ কর্মীরা।

১৯৫৬ সালে বাংলা-বিহার-সংযুক্তির বিরোধী আন্দোলন। বারুইপুরেও এই আন্দোলনের জোয়ারে, এখানে একটি কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ-দুয়েক স্থানীয় যুবক বাদল ভট্টাচার্যের দুর্গামন্ডপে। ভাষণ দেন লোকায়ত দর্শন-এর লেখক সুপন্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন অপূর্ব দত্ত, সুশীল দত্ত,

এছাড়াও অমর ভট্টাচার্য, ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, সজল রায়চৌধুরী, যতীন ব্যানার্জ্জী প্রমুখদের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে। এই সভায় বারুইপুর থানা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হন দেবু সিংহ ও কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জী।

১৯৫৭ সালের সি.পি.আই.-এর গঙ্গাধর নস্কর এবং খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই দ্বৈত নির্বাচন ক্ষেত্রে বিজয়ী হন। মধুরাপুর লোকসভাভুক্ত বারুইপুরের এম. পি. ছিলেন কংসারী হালদার। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর শাসনকালে সমগ্র ভারতে প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আনার ব্যবস্থা হয় (পি.এল.৪৮ চুক্তির মাধ্যমে) কিন্তু জনবিক্ষোভের চরম অবস্থা দেখা দেয় ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সারা পশ্চিমবাংলার অভুক্ত নর-নারীরা বামপন্থীদের নেতৃত্বে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। এই মিছিলের কয়েক হাজার নর-নারীকে গুলি চালিয়ে এবং লাঠি পেটা করে নির্ম্মভাবে হত্যা করে। বহুলোক নিঁখোজ হয়। তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই অমানবিক অত্যাচারের আলোচনা বিধানসভাতে শুরু হলে বিধানসভা মুলতুবি ঘোষনা করা হয়। এর মধ্যে এসে যায় চীন-ভারত যুদ্ধের খবর, সরকার আরও নির্মম হয়ে ওঠে। বামপন্থী রাজনীতি বিপদের ডি.আই.আর.-এ কারারুদ্ধ করেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য। রাজনৈতিক অশান্তি আরোও বেড়ে চলে, এই অবস্থায় ১৯৬২ সালের পর পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বারুইপুর কেন্দ্রে শক্তি সরকার নির্বাচিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে। সোসালিষ্ট আন্দোলনের জোয়ারে শ্রমিক সংগঠণের ভিত্তি পেল বারুইপুর। পূর্বেই লোকনাথ কটন মিলে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেছিল কমিউনিষ্টরা। যে সংগঠণের কর্মকর্তারা ছিলেন হেমেন মজুমদার, শংকর মজুমদার, রঞ্জন নস্কর, বাদল দাস।

পিয়ালী শিল্প স্টেটে শ্রমিক আন্দোলনের পত্তন করলেন সোসালিষ্ট কর্মীরা, পাঁচটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে। বসন্ত প্রাণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পাওয়ার লুম মজদুর ইউনিয়ন ও আরও একটি সার্ভেয়ার এ্যাপ্লায়ানসেস ইনষ্ট্রুমেন্ট ইউনিয়ন। সংগঠনের নেতারা ছিল দিলীপ ঘোষ, তপন ঘোষ, নিরঞ্জন ছাঁটুই, রঞ্জিত নস্কর, হামিদ ঢালি, অনাদি চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিল আলু মন্ডল, বিশালক্ষীতলার গোলাপ মোল্লা ও পালান দাসের রিক্‌সা ইউনিয়ন।

শ্রমিকদের ছিল অত্যন্ত স্বপ্ল মজুরী। শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরীর দাবীতে বসন্ত প্রান কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। ২৭ দিন ধর্মঘট চালিয়ে রণক্লান্ত শ্রমিকদের মধ্যে নিরঞ্জন ছাঁটুই ও অনাদী চক্রবর্তীকে বলিদান করে শ্রমিকেরা পুর্ণবহাল হল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেন মালিকরা। সেই দুইজন শ্রমিকই আজ মৃত। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগঠকদের উপর পুলিশী নির্যাতন নেমে আসে। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা আরোও করুণ হয়ে যায়। এই করুণ অবস্থার মধ্যে ১৯৬৭ সালে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বামপন্থী রাজনীতিবিদরা যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ন হয় এবং যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এস. এস. পি. পার্টির কুমুদরঞ্জন মণ্ডল বিজয়ী হন। মুখ্যমন্ত্রী হন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়িতে যে আন্দোলনের

সূত্রপাত এবং গোড়ার দিকে যে আন্দোলনের প্রতি সি.পি.আই.(এম)-এর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল তিন মাসের মধ্যে সি.পি.আই.(এম)-এর সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ি, খড়িবারি, ফাঁসিদেওয়া। ১৯৬৯-এর নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিতে থাকেন চারু মজুমদার ও তাঁর অনুগামীরা। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অজয় মুখোপাধ্যায় সরকারকে পুরো একবছরও কাজ করতে দেয়নি। এ সরকারেরও পতন হয়। আবার রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ণ নেমে আসে। রাজ্যপাল এই সরকার ভাঙ্গনে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করেন। প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার পুণরায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আদেশ দেন। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সি.পি.আই.এম.-এর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পুনরায় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হন অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। এ সরকারও স্থায়ী হয়নি, পশ্চিমবাংলার রাজনীতি চরম অশান্তির আকার ধারণ করে। নাজেহাল ও ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় অবশেষে এক ঘটনা ঘটান সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে যার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেই নেতৃত্বাধী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তিনি অসভ্য ও বর্বর সরকার হিসাবে অভিহিত করেন এবং অতঃপর রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমবর্ধমান অবনতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কলকাতার কার্জন পার্কে ১৯৬৯ সালের ১ ডিসেম্বর অবস্থান ও অনশন শুরু করেন - যা চলে কয়েকদিন ধরে। ডিসেম্বর মাসে অজয় মুখোপাধ্যায় যখন কার্জন পার্কে অনশনে বসেন তখনই রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকবে না। অতএব ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর বেতার ভাষণে রাজ্যবাসীকে তাঁর পদত্যাগ করার খবর জানান তখন কেউই বিস্মিত হননি এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর রাজ্য জুড়ে যে স্বতঃস্ফুর্ত ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল এবার জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন ক্ষোভ দেখা যায় নি। কারণ তাঁদের কাছে এ ছিল এক অনিবার্য ঘটনা। পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের আদেশ দেন। ১৯৭১ সালে বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলে সি.পি.আই. (এম) সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন বিমল মিস্ত্রি । কিন্তু রাজ্যপাল সি.পি.আই.(এম) কে সরকার গঠন করতে আহ্বান করে না। অন্য শক্তিগুলির সাহায্যে অজয় মুখার্জী পুনরায় সরকার গঠণ করেন। কিন্তু সে সরকারও স্থায়ী হয় নি। আবার রাষ্ট্রপতি শাসন। এবার পশ্চিমবাংলায় নিযুক্ত হন কেন্দ্রীয় তদারকি মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। এই রাষ্ট্রপতি শাসনে ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়। এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়-এর নেতৃত্বে ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকার হয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই সরকার স্থায়ী হয়। বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি নির্বাচিত ললিতমোহন গায়েন। ১৯৭৫ সালে ২৬শে জুন আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে সমগ্র ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। খবরের কাগজের উপর কঠোরভাবে সেন্সারশিপ আইন প্রয়োগ করা হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়। এরমধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট জোট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ন হয়।

এই নির্বাচনে বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে হেমেন মজুনদার সি.পি.আই.(এম)-এর পক্ষে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং বামফ্রন্ট জোট সরকার গঠন করে। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু।

১৯৭৭-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বিধানসভার প্রতিনিধি ছিলেন হেমেন মজুমদার। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন জাতীয় কংগ্রেসের (ইন্দিরা) পক্ষে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে নির্বাচিত হন সি.পি.আই.(এম) নেতা ডঃ সুজন চক্রবর্তী। ২০০১ সালে বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অরূপ ভদ্র তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচিত হন। বারুইপুরবাসী না হয়েও কমল মুখার্জী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুজন চক্রবর্তী সক্রিয়ভাবে বারুইপুরের রাজনীতির সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়েছেন।

এবার আসা যাক বারুইপুরের অঞ্চল নেতাদের কথায় ঃ

কল্যাণপুর অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় ডাক্তার অনুকূল মন্ডল আর আমাদের বহু পরিচিত মহঃ আবদুল্লা সাহেবকে। যারা স্বাধীনতার আন্দোলনের সমসময়ে এবং উত্তর স্বাধীনতা যুগে নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী এছাড়া বহুল পরিচিত সমাজ কর্মী যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন জনসাধারণের কল্যানে। ডাঃ মন্ডলকে কেন্দ্র করে একদল কর্মী বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী। সতিষ গায়েন হারু ব্যানার্জী। শিবপদ দাস, তারাপদ মন্ডল, আবদুল্লা মান্নান প্রমুখেরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতেন। ছিল অনন্ত মন্ডল কিন্তু অল্প বয়সে বিগত, এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় চারন কবি বিশ্বনথ হালদারকেও। স্বাধীনতা উত্তরকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে জেলে যান ১৯৫৭ সালে। তাকে কেন্দ্র করে একদল সাংস্কৃতিক কর্মী সৃষ্টি হয়েছিল। আর এক ভাগ্নে প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় নস্কর, নকশাল আন্দোলনে বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ঐ এলাকায় ছিল গণতন্ত্রের উপাসক কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী, যিনি মাষ্টার মশাই নামে নামে পরিচিত, শুভঙ্কর মণ্ডল, সুদীপ্ত মণ্ডল, মনোরঞ্জন নস্কর প্রমুখ।

কল্যাণপুরের পাশাপাশি রয়েছে হরিহরপুর উত্তর স্বাধীনতা কালে প্রধান অমলেন্দু ঘোষাল কংগ্রেস নেতা ও কর্মী। পরবর্তী কালে এই পরিবারে প্রণবেশ ঘোষাল ছিল বিশিষ্ট সমাজসেবক। বৈকুন্ঠপুরেরের ডাঃ বিজয় দাস, কাজি পাড়ার আঙুর দি (কর্মকার) রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে শ্রদ্ধারযোগ্য । রাজনীতি অপেক্ষা এদের সমাজসেবাই ছিল মুখ্য। আবদার সুকুর সাহেব ছিলেন উপমন্ত্রী । এছাড়াও পার্থপ্রতিম মজুমদার, অনাথ মাইতি, ইকবাল আহমেদ, গণেশচন্দ্র ধর, হবিবুর রহমান বৈদ্য, সৈয়দ ফিরোজ তাজিরুল ইসলাম, দিলীপ চৌধুরী, সুব্রত মুখার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, তিমির চ্যাটার্জী, বিধান চন্দ্র, সুভাশীষ সাউ, কমল মুখার্জী। শাকিলা খাতুন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী।

মদারাট অঞ্চলে ঃ- স্বাধীনতার উত্তর যুগে প্রধান বিশ্বনাথ পালকে যিনি ছিলেন প্রকৃতই কংগ্রেস কর্মী। এবং বিশাল প্রতিপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। হেমেন মজুমদার, পঞ্চানন দাস, মানিক দাস, শঙ্কর ঘোষ, অধ্যাপক অশোক চ্যাটার্জী, মুরারী দাশ, বিজন পাল, আশুতোষ পাল, পালান মোল্লা, রণেশ্বর দাস, অনাথ দাশ, বাদল দাস ছিলেন লোকনাথ কটন মিলসের শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম কর্মী।

এবার আসা যাক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাউথ গড়িয়ায় উত্তর স্বাধীনতা যুগে ৫৭ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধান নির্বাচিত হন হেমন্ত দা। মানে হেমন্ত কয়াল বেগমপুরে নিবাস, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিজেকে পৌণ্ড্র সমাজের সেবক মনে করতেন। অঞ্চলটা ছিল সম্প্রদায় ও বর্ণের যুপকাষ্ঠে। মুসলীম সমাজে প্রতিনিধিত্ব করতেন কমলপুরের বাসীরা । চাম্পাহাটির বটতলায় খ্রীষ্টান সমাজের অধিবাসীরা। চাম্পাহাটির উত্তর দিকে বামন, কায়েতের নিবাস যাদের দুর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল সমগ্র অঞ্চলে । একসময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী লবন সত্যাগ্রহের আন্দোলনকারী মন্মথ ব্যানার্জ্জী ছিলেন ২৪ পরগণা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এদের যুগ শেষ হতে বামপন্থী আন্দোলনের সেবা কর্মী জিতেন দা (মিস্ত্রি) , যার ছেলে বিমল মিস্ত্রি কম্যুনিষ্ট কর্মী নেতা। এম. এল. এ হয়েছিলেন দু জায়গায়। সর্বজন শ্রদ্ধেয় বটে। জগাই সর্দ্দার, অশোক চ্যাটার্জ্জী, শিশির চ্যাটার্জ্জী অন্নদা চ্যাট্যার্জ্জী কমলপুরের নেতা জলিল গাজী। নড়িদানার বিজয় রায় ও চিত্ত মণ্ডল, গোপাল দাস, অনন্ত মণ্ডল, শুভ্রাংশু মিত্র, প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল, শ্যামল চ্যাটার্জী, শিখা চক্রবর্তী, মহাদেব মণ্ডল, চুনীরাম মণ্ডল, ললিত মণ্ডল, ফাল্গুনি চক্রবর্তী, সোমনাথ ভট্টাচার্য।

রামনগর অঞ্চলের সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের পরিচয় ঃ রাধাকান্ত ছাটুই, মকবুল ঢালী, নির্মল ছাঁটুই, নিরঞ্জন ছাঁটুই, ও অনাদি চক্রবর্তী, হামিদ ঢালি, লতিফ মিস্ত্রী। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (কালু) মোবারক লস্কর, খালেক ঢালি, দীপক বিশ্বাস, আবু তাহের সরদার, মানিক মণ্ডল, অজয় মাইতি, অজয় রায়, রঞ্জিত মিত্র, প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী, অজয় মণ্ডল, তিমির আদিত্য, মজিদ সরদার, নিতাই সরকার, ডাঃ সুশীল লস্কর।

ধপধপি অঞ্চল ঃ বারুইপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠস্থান। বামপন্থী তথা কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত তথা তেভাগা আন্দোলনের নেতা দেবু সিংহের কর্মস্থল। জীবনে প্রহৃত ও নিগৃহীত হয়েছেন বহুবার। গুরুদাস দত্ত, শ্রদ্ধেয় ভবানী সিংহ, নিভা সিংহ, পীয়ার আলি খান (পীরু খাঁ), ইসমাইল বৈদ্য, মৃনাংশু ঘোষ, আব্দুল হালিম, ওঙ্কেশ সরদার, দেবেন নস্কর, শৈলেন বসু, ইউনিস নস্কর, ফরাদ দেওয়ান। আর ছিলেন প্রাক স্বাধীনতা যুদ্ধের কংগ্রেস কর্মী সুনীল দা (বসু) আরও ছিলেন সুর্যপুরের বিশ্বনাথ হালদার, গোপাল সরদার, ও ডাক্তার জুব্বার আলি নস্কর, পঙ্কজ ঘরামী, গোপাল ঘরামী।

শিখরবালি অঞ্চল ঃ নেপাল ভট্টাচার্য, সোমেন বৈদ্য, ব্রজেন রায়, দুলাল ঘোষ,অমরকৃষ্ণ মণ্ডল, অধীরচন্দ্র মণ্ডল, মালেক বারি, জয়দেব ঘোষ, জওহরলাল বিশ্বাস, অনাথবন্ধু চ্যাটার্জী, অসিতলাল নাগ।

শংকরপুর অঞ্চল ঃ ভবসিন্ধু নস্কর, আফসার আলি লস্কর, চন্দ্রকান্ত নস্কর, ভোলানাথ হালদার, নজরুল মোল্লা, আহমেদ মণ্ডল, মইনুদ্দিন চৌধুরী, পরেশ অধিকারী ও সীরাজ, দিলীপ বিশ্বাস, বাদল গায়েন, আহাদ আলি লস্কর, রামপদ নস্কর।

বেলেগাছি অঞ্চল ঃ ছপের মোল্লা, অখিলেশ শর্মা।

হাড়দহ অঞ্চল ঃ পাঁচুগোপাল রায়, রুহুল আমিন, জবেদ আলি মোল্লা।

নবগ্রাম অঞ্চল ঃ অজিত দাস, মদন দাস, মণিরুল ইসলাম।

বৃন্দাখালি অঞ্চল ঃ সুধাকর বাগ, হারান সরদার, বীরেন সরদার, এবাদ মোল্লা।

বারুইপুর পৌরসভা ঃ কংগ্রেসের নেতৃত্বে আছেন দিলীপ চক্রবর্তী, রাখাল রায়, রবীন সেন, মনীষ নাগচৌধুরী, হরিপদ দাস, দুলাল হালদার, রাজেন পাল, রামকৃষ্ণ সরকার, গোবিন্দ পাল। সি.পি.আই. (এম.)-এর নেতৃত্বে আছেন হেমেন মজুমদার, মৃণাল চক্রবর্তী, নির্মল পাল, সুধীর সরকার, তপন ভট্টাচার্য, অসীম চ্যাটার্জী, তপন চক্রবর্তী, শক্তিপদ মিত্র, মাখন চক্রবর্তী, সৌমেন মুখার্জী (গোপাল) প্রবীর চক্রবতী, দিলীপ চক্রবর্তী, চিত্ত গাঙ্গুলী, বিকাশ দাস, শংকর ঘোষ, জ্ঞানেন সাহা, অশোক ভট্টাচার্য, তপন দে। সি.পি.আই.-এর নেতৃত্বে আছেন প্রদ্যুৎ রায়চৌধুরী, দেবেশ সাহা, গণেশচন্দ্র কর, প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল, নির্মল দাম, পার্থ দাশগুপ্ত। আর.এস.পি.-এর দায়িত্বে আছেন প্রশান্ত অধিকারী। ফরওয়ার্ড ব্লকের দায়িত্বে আছেন বিষ্ণু চ্যাটার্জী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আছেন অরূপ ভদ্র, শক্তি রায়চৌধুরী, সুজয় মজুমদার (নাডু), তপন ঘোষ, সুশান্ত মুখার্জী, হাফিজুর রহমান, গৌতম দাস, দুর্গাচরণ দাস, স্বপন মণ্ডল প্রভৃতি। এস.এস.পি-এর নেতৃবৃন্দ - সৌমেন চক্রবর্তী, অজিত সিংহ, পার্থ বন্দোপাধ্যায়, প্রভাত চক্রবর্তী, তপন দাস, গুরুদাস ভারতী, অজয় রায়, স্বপন দত্ত। এস.ইউ.সি.-এর নেতৃবৃন্দ আমিনউদ্দিন আখন্দ, ইলা আখন্দ, প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী।

ষাট-এর দশকের পর থেকে বিকল্প তৃতীয় শক্তির সন্ধানে কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বারুইপুরের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা হলেন- তপন মিত্র, সরোজ ভট্টাচার্য, তপন গায়েন, মৃত্যুঞ্জয় নস্কর, সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, প্রদীপ দে, সুনীল দাস, সুবিমল ভট্টাচার্য, অসিত গুহঠাকুরতা, শেখর রায়, শুভাশিস ঘোষ প্রমুখ।

স্বাধীনোত্তর যুগে বারুইপুর শহরে কিছু মহিলা নেতৃত্বও উঠে এসেছেন যথাক্রমে- সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, মুক্তি মজুমদার, ইরা চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, রেখা চক্রবর্তী, অদিতি মুখার্জী, তপতী নস্কর, মিলু গুহঠাকুরতা, রুবী ঘোষ প্রমুখ।

সুতরাং, বলা যায় যে বারুইপুর থানার রাজনৈতিক চালচিত্রে বহু বাঁক ও মোড়ের অস্তিত্ব দেখা গেছে। এই চালচিত্র রচনায় বহু তথ্য ও নাম সংগ্রহের তালিকা দেওয়া হলেও এর পরেও যদি কিছু বাদ থেকে যায় আশাকরি পরে যে তথ্যসম্বলিত রচনা প্রকাশিত হবে, সেখানে এই ফাঁক পূরণ করা হবে।

তথ্যসূত্র ঃ ১) ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বারুইপুর – অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ২) বারুইপুর হিন্দু মেলা – গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ৩) স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ – সম্পাদক তারাপদ পাল ১৯৭২, ৪) মাতৃ আশীর্বাদে বিশ্বাস – কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বঙ্গের রত্নমালা, ১৩১৭।

গণশক্তি প্রেস ১৯৯১ এবং 'কালান্তর' (দৈনিক সংবাদপত্র)-এর লাইব্রেরীর বিভিন্ন বই থেকে প্রাপ্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হেমেন মজুমদার, বনমালী মুখার্জী (আচার্য), লক্ষ্মীদাস দত্ত, সুশান্ত সরকার (নিতাই), শক্তি রায়চৌধুরী, সুভাশিষ ঘোষ, অজয় ঘোষ।

(কোন স্থানের রাজনৈতিক চালচিত্র একটি সংবেদনশীল বিষয়। সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য 'বারুইপুরের রাজনৈতিক চালচিত্র' কয়েকজন লেখকের লেখাকে তাঁদের সম্মতিক্রমে একত্রিকরণ করা হয়েছে। — সম্পাদক)

Baruipur Speech

(A Swadeshi meeting was held at Baruipur, a Subdivision of the district of 24 Parganas, on Sunday, the 12th April 1908. Srijut Bepin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh with a few other prominent nationalist workers of Calcutta were invited on the occasion)

Sj. Shyamsunder Chakravarty having finished his Speech, Srijut Aurobindo Ghosh rose to address the audience. He began with an apology for being under the necessity of addressing a Bengali audience in a foreign tongue specially by one like himself who had devoted his life for the Swadeshi movement. He pointed out that through a foreign system of education developing foreign tastes and tendencies he had been senationalised like his Country and like his Country again he is now trying to renationalise himself.

Some people tell us that we have not the strength to stand upon our own legs without the help of the aliens and we should therefore work in co-operation with and also in opposition to them. But can you depend on God and Maya at the same time? The first thing that a nation must do is to realise the true freedom that His within and it is great the forces are that stand in your way God commands you to be free and 'you must be free.

Do not think that anything is impossible when miracle are being worked on every side. If you are true to yourself there is nothing to be afraid of. There is nothing unattainable by truth, love and faith. This is your whole gosple which work out miracles. Never indulge in equivocations for your Ease and Safety. Do not invite weakness, Stand upright. The light of Swadesi is growing brighter through every attempt to crush it. People say that there is no unity among us. How to create Unity? Only through the Call of our mother and the voice of all her sons and not by any other unreal means. The voice is yet weak but is growing. The might of God is already reveoled among us, its work is spreading over the Country. Even in West-Bengal it has begun its work in **Uttarpara and Baruipur.** It is not our work but that of something mightier that compels us to go on until all bondage is a swept away and India Stands free before the world.

বারুইপুরের স্মরণীয় ও বরণীয় সন্তানগন

মনোরঞ্জন পুরকাইত শক্তি রায়চৌধুরী

যাঁদের সৃজনশীল প্রতিভা জ্ঞানের জগতকে আলোকিত করেছে, যাঁদের নিরলস কর্মকাণ্ড বারুইপুর এলাকার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে, প্রবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার আকাঙ্খায় সীমাহীন পীড়ণ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন, এতদঞ্চল-এর শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখে গেছেন, যাঁদের দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা ও সাধনায় বারুইপুরের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্প, সঙ্গীত ও খেলাধুলার জগৎ আলোকিত হয়েছে-এমন অনেক মানুষ জন্মেছিলেন আমাদের বারুইপুরে তাঁরা আজ আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়।

অনন্ত আচার্য ঃ- শ্রী চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত পদ কল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা। বারুইপুরে আটিসারা গ্রামে অনন্ত আচর্যের গৃহে ৯১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যদেব এক রাত্রি বসবাস করেনে এবং নাম সংকীর্ত্তন ও করেন। আজও আটিসারা (বর্তমান বারুইপুর পৌরসভায় ৮নং ওয়ার্ডে শাঁখারীপাড়া) স্থল মহাপ্রভু কষ্টিপাথরে নির্মিত মুর্তি অনন্ত আচার্যের গৃহে পুজিত হন।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ঃ- চন্দ্রকান্ত বাগচীর পুত্র অনন্দাপ্রসাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার শিখরবালী গ্রামে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। বাংলার প্রথম শিল্প বিদ্যালয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল অফ আর্টসে শিক্ষান্তে এখানকার শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন, এচিং, এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রোফের কাজে তিনি ছিলেন সে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী। সমকালীন বহুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কন করে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। ''শিল্পপুষ্পাঞ্জলী'' নামে শিল্প বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৪.৬.১৮৮৫), বঙ্গীয় কলা সংসদের সভাপতি হন। অন্নদাপ্রসাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি বউবাজার ষ্ট্রীটে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রতিষ্ঠা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরোলক গমন করেন।

অবিনাশ বন্দোপাধ্যায় ঃ- ১৫ই জানুয়ারী ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার দক্ষিণ গড়িয়ার পুর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর পুত্র অবিনাশ জন্মগ্রহণ করেন। সমাজসেবি, সাহিত্যিক অবিনাশ। ম্যাট্রিক পাশ করে রেল অফিসে কাজ নেন। বিপ্লবের গান রচনা করে ও গান গেয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হন। ব্যঙ্গকৌতুক শিল্পী, তিনি ভালো সেতার ও বাঁশী বাজাতে পারতেন। ছোটদের ও বড়দের অনেক পত্রিকার লেখক ছিলেন। রচিতগ্রন্থ; ''পেলাম যাদের দেখা'' ''বেদপরিচয়'', ''তন্ত্র পরিচয়'', ''বিবেকানন্দ'' ''স্বাধীন বাংলার সংগীত ষড়োশী'' প্রভৃতি। ''সত্যবান'' ও ''নতুন দাদু'' তাঁর ছদ্মনাম।

অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ঃ- ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। বারুইপুর উকিলপাড়ায় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী কেদারনাথ ভট্টাচার্যে জ্যেষ্টপুত্র অমর নাথ ভট্টাচার্য বারুইপুরের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এবং উজ্জ্বল নাম, তিনি খেলাধূলায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে

সুযোগ্য রেফারী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বারুইপুর কমলা ক্লাবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। এই ক্লাবের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রূপে, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রূপে বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্রীড়াসংঘের সভাপতি হিসাবে এই সংঘ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে এই সংঘের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। তিনি দীর্ঘদিন রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে শিক্ষার প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, বারুইপুর পৌরসভায় নির্বাচিত কমিশনার হিসাবে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৮১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমৃতলাল মারিকঃ- ১২৬৮ সালে ২৪শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছাপুর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে মারিকপাড়া পল্লীতেছিল অমৃতলালবাবুর আদি নিবাস। তাঁর পিতা ছিলেন ঈশানচন্দ্র মারিক। আনুমানিক একশত কুড়ি বছর আগে অমৃতলাল মারিক মহাশয় বারুইপুর আসেন। বারুইপুর মুন্সেফ কোর্টে তিনি আইন ব্যবসায় নিযুক্ত হন এবং অচিরে এতদ্ঞ্চলের দক্ষ আইনজীবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষ তাঁহারই গৃহ প্রাঙ্গণস্থলে অধিবাসীদের সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯০৯ সালে মদারাট পপুলার একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৫ সালে গঠিত কমিটিতে তিনি ছিলেন সহসভাপতি। ঐ পদ থেকে ১৯৩৬ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৩৪৭ সালের ১৪ই ভাদ্র তাঁর মৃত্যু হয়।

অর্দ্ধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ- আনুমানিক ১৮৯২ সালে পদ্মপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। হরিনাভি স্কুল থেকে ম্যাটিক পাস করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ থেকে ১৯২২ সালে সৈন্যবাহিনির চাকুরি ছাড়িয়া বারুইপুরে এসে ডাক্তারী শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠিত ব্যানার্জী ফার্মেসী বারুইপুর পুরাতন বাজারে অবস্থিত ছিল, তিনি বারুইপুর পৌরসভার মেডিকেল অফিসার ছিলেন, বারুইপুর রাজপুর ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৭০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ- বারুইপুর মুন্সেফ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুরে নারীশিক্ষার প্রসারে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেই বিদ্যালটির সাফল্যের স্বপ্ন দেখতেন। বারুইপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের অভাবের বেদনা তাঁর মনে অনেক দিনই ছিল। রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় তার সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ। একটানা ২৭ বছর সম্পাদক ও ২০ বছর সভাপতি, মোট ৪৭ বছর ধরে নিজের জীবনের সঞ্চিত অর্থ, শ্রম দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়। ১৪ই জুন ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

অকিঞ্চন বন্দোপাধ্যায় ঃ- (নীহারবালা) জন্ম ও বাসস্থান শাসন গ্রাম। মুক্তির দাবী, যুগের ডাক নামে রাজনৈতিক উপন্যাস ও বিদায় বেলা নামক একটি সামাজিক উপন্যাস প্রণয়ন করেন। সরকারী চাকুরীয়া হিসাবে নিজের নাম ব্যবহারে সরকারী কোপের ভয়ে পরে 'নীহার বালা' নাম দিয়ে বইগুলি প্রচারিত হয়।

অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ- জন্ম সালেপুরে। বিপ্লবী আন্দোলনে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। 'আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা' (২য় খণ্ড) ও 'শাস্ত্রমন্থন' নামে দুটি পুস্তক লিখেছেন। এঁর সংগ্রহে বিরাট সংখ্যক তান্ত্রিক পুঁথির সংগ্রহ ছিল।

ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল ঃ- বাংলার ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র (ইংরাজীর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানায় কল্যাণপুর অঞ্চলের নিহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যয়ন প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে কোটালপুর মধুসূদন এম.ই. স্কুল ও তার পরে বারুইপুর হাইস্কুলে। পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নানারকম কর্মযজ্ঞে যোগদান, কোলকাতায় প্রথম কংগ্রেসের কনফারেন্স, এই সভায় সাহায্যকারী ভলেন্টিয়ার হিসাবে শুরু, তারপর ১৯২৭ সালে লবন আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কুলপী থানায় করঞ্জলী গ্রামের জমিদার ঘোষ বাবুদের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় ট্যাংরার হাট নামক সমুদ্রচড়ে লবন আইন অমান্য করে লবন তৈরী করা হয়। শেষ পরিণতি হলো ইংরাজ বাহিনীর অত্যাচার এবং সর্বশেষে খণ্ডযুদ্ধের সম্মুখীন। আর কোন রকমে জীবন রক্ষার জন্য আত্মগোপন করা। ১৯২৯ সালে বারুইপুর পুরাতন বাজারে মহদেব যোগীর অন্দরমহলে গোপন কংগ্রেসের অফিস খোলা হয়। অনুকূল মণ্ডল হলেন সহঃসম্পাদক,।গোপনে বসে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী ওই তিনমাথার মোড়ে বিদেশী প্যান্ট, কোর্ট জড়ো করে পোড়ানো হল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের সাথে মতভেদ হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে গড়া র‍্যাডিক্যাল পার্টিতে যোগ দেন। কয়েকদিন পরে মূল স্রোতে অর্থাৎ কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৫৯ সালে কল্যাণপুর অঞ্চলে পঞ্চায়েতের প্রথম নির্বাচন হয়। এই নির্বিচনে জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হবার আগে পযন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি সুনামের সাথে পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন। ১৯৮৭ সালের ২৮শে এপ্রিল এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী পরলোকগমন করেন।

আব্বাস সুকুর ঃ- ১৯০১ সালে ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফজরুদ্দীন আহমেদ, বসবাস করতেন মাতামহীর মল্লিকপুর বাসভবনে,।নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রেরণায় রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৫২ সালে বারুইপুর থেকে নির্বাচিত হন বিধানসভার সদস্য হিসাবে এবং রাজ্যের মন্ত্রী হন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, সমবায়িকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি দান করেন। ৩০ বছর একাধিক্রমে হরিহরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, পরে অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬২ সালে ২০শে জানুয়ারী তাঁর ইন্তেকাল হয়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ- পদ্মপুকুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে তাঁকে বারুইপুর স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরে তিনি কৃষক

পত্রিকায় সঙ্গে যুক্ত হন। কিছুকাল এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকরণের জন্য তিনি নানা চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড) ঃ- জন্ম ১৮১৩ সালে ২৪শে মে বারুইপুর থানায় 'নবগ্রাম' গ্রামে। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছাত্র কৃষ্ণমোহন পরীক্ষায় ভাল ফল করায় বৃত্তি পেতে থাকেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ডেভিড হেয়ারের সাহায্য পান। "ইয়ংবেঙ্গলদের" মত ডিরোজিও-র প্রভাব তাঁকেও প্রভাবিত করে। কলেজের শিক্ষা ছাড়াও দশটি ভাষায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তবে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। ১৮৩২ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফের নিকট তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। হেদুয়ার নিকট দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গীর্জা "খ্রীষ্টান চার্চ"-এর প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন রেভারেণ্ড ব্যানার্জী। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদন তাঁর কাছ থেকেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। বিশপ্‌স কলেজে অধ্যাপনাও তিনি করেছেন। ১৮৬৪ সালে ৪ঠা জুলাই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিলেতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন সেযুগে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতির কথা ঘোষনা করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গনিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় তিনি তের খণ্ডে "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রকাশ করেন। এই মহান মণীষী ১৮৮৫ সালের ১১ই মে মৃত্যুবরন করেন।

জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ- বারুইপুর ধপধপিতে ১৯১০ সালে জীতেন্দ্রনাথ ঘোষের জন্ম। পিতা অম্বিকাচরণ ঘোষ। যুগান্তর দলের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে ১৯৩২ সালের ৮ই এপ্রিল প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হন। ১৯৩৪ সালের ১৬ই মে পাবনায় আবার গৃহবন্দী হন। ১৯৩৫ সালের ৩রা জুন ৫০০ টাকার নগদ জামিনে মুক্ত হন। ১৯৩৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নিঃশর্তে মুক্তি পান।

তুলসীচরণ পাল ঃ- বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট গ্রামে বাংলা ১২৯৬ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে তৎকালীন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক কলেজ ড্যানহ্যাম হোমিও কলেজে ডাক্তারী পড়তে যান। যৌবনে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করে রোগীর শুশ্রষা, দেশবাসীর হিতসাধন করে জীবনে দেশবাসীর প্রাণের লোক হন। তিনি 'অগ্নিশিখা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবাসীর স্বদেশপ্রিয়তা, দেশের প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেন। ১লা শ্রাবন ১৩৩৭ সালে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চার-পাঁচ মাস কারাভোগের পর গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্তানুযায়ী তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুরন্ত যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন এবং নয়মাসকাল রোগভোগের পর ১২ই পৌষ ১৩৩৮ সালে সোমবার রাত্রি ১২টার সময় তিনি পরলোক গমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রঃ- ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার মদারাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা বৈদ্যনাথ মিশ্র ছিলেন কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশানাল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। এখানেই প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমপ্রভা মজুমদারের সংস্পর্শে

আসেন এবং তাঁর "দক্ষিণহস্ত" হয়ে যান, তারপর তার জীবনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গলাভ হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পুর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রবসুর নির্দেশে পদাতিক বাহিনীকে প্যারেড করানোর ভার পড়লো তার উপর। ১৯২৯ সালে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন, এই সময় সাতকড়ি বাবুর ডাক্তার খানা খোলেন বারুইপুরের পুরনো পোষ্টঅফিসের কাছে মসজিদের ঠিক বিপরীত দিকে। ক্রমে এটি স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। শুধু কেন্দ্রভুমিই নয়, পরে এটি বা রুইপুর কংগ্রেসের কার্য্যালয় হয়। ১৯৩১ সালে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বারুইপুর কোর্টের মাঠে প্রকাশে চরকা রঞ্জিত জাতীয় পতকা উত্তোলন করেন। পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ড হুংকার দিয়ে ছাপিয়ে পরলেন পুর্বোক্ত কংগ্রেস কার্য্যালয়ে। তার আগেই ঘর খালি করে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয় বারুইপুর পুরাতন বাজারে মহাদেব যোগীর অন্দরমহলে গোপন কংগ্রেস কার্য্যালয় খোলা হয়। দেবেন্দ্রনাথ হলেন দলের সাধারন সম্পাদক। এ স্থানে বসে গোপনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী ওই তিন মাথার মোড়ে বিদেশী প্যান্ট, কোর্ট জড়ো করে পোড়ানো হল। এবং এখানকার কংগ্রেসের সবাই হাতে তৈরী খাদি পোশাক তৈরী করেন, ১৯৩৭ সালে সম্ভবত গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গড়া র‍্যাডিক্যাল পার্টিতে যোগ দেন, পরে মূল স্রোতে অর্থাৎ কংগ্রেসে ফিরে গিয়ে কাজ করেন, বিপ্লবী হেমপ্রভা মজুমদার, ডাঃ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও নেতাজী সুভাষচেন্দ্রর যোগ্য সহকর্মী দেবেন মিশ্র ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৮ সালে পরলোক গমন করেন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ- সাউথ গড়িয়া গ্রামে জমিদার তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দুর্গাদাস ১৮৯৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাউথ গড়িয়ার ব্যোমকেস ইনষ্টিটিউশনে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপর ইন্ডিয়ান আর্টস স্কুল থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে তিনি অভিনয়কে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে নির্বাক চলচ্চিত্রের বর্ণনা লেখার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম আঁধারে আলো চলচ্চিত্রে একটি গৌণ চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত মোট ২২টি নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, এর মধ্যে "দুর্গেশনন্দিনী" চলচিত্রে ওসমানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু চলচ্চিত্রে নয়, নাট্য জগতে দুর্গাদাস বাবু যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন নাটকে বিকর্নের ভূমিকায়; এবং "চিরকুমার সভা" নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছিলেন। ৪৬টি নাটকে ও ১৬টি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ৩০শে জুন এই মহান অভিনেতার মৃত্যু হয়।

দেবু সিংহ ঃ- ১০ই অক্টোবর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবু সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ। তিনি বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৭২ সালে রাশিয়ার যান মার্কসবাদ

শিক্ষার জন্য ও কমিউনিস্ট শাসন প্রত্যক্ষ করতে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বহু সামাজিক সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি (সি.পি.আই)-এর কার্যনির্বাহ কমিটির সদস্য ছিলেন।

দুর্গাদাস রায়চৌধুরী ঃ- বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর সভাপতিত্বে রাসমাঠে একটি জনসভা হয়। উক্ত সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার বক্তব্য রাখেন, ফলস্বরূপ ইংরেজদের কোপে পরে তিনি আত্মগোপন করেন বারানসীতে। পরে তিনি বারুইপুরে ফিরে আসেন১৯০৮ সালে। তখন থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বারুইপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ঃ- শিশুপুত্রের মৃত্যুতে দুটি শোক কবিতা পুস্তক রচনা করেন বিদগ্ধ হৃদয় ও বিদগ্ধ জীবন।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯৩১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। বারুইপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে আই.কম.-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে। এই সময় এম.এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডে মোক্রেটিক পার্টির সদস্য হন। ১৯৫০ সালে দলের মুখপত্র র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পত্রিকায় সোমদেব শর্মা ছদ্মনামে লেখা শুরু করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মার্ক্সীয় চিন্তা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এম.এন. রায়ের নিউহিজিনিজি সিয়াম তার কাছে সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছিল। গান্ধীবাদও যেন সব কিছুর উত্তর নয়। এমন এক আদর্শের সঙ্কট সময় সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর ঘনিষ্ট সাহচর্য তাঁর হৃদয়ে শান্তির বার্তা এনে দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এমার্জেন্সীর সময় তিনি রাষ্টীয় সয়ং সেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। অসংখ্য ছাত্র তার কাছ থেকে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যায়ণ করে আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিরলস অধ্যায়ণ ও অধ্যাপনাই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাজ। সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশুনা করে তিনি জীবনানন্দ অনুভব করতেন। অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী নিপাট ভদ্রলোক, আদর্শ শিক্ষক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৫ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম অনুকূল চট্টোপাধ্যায়, বারুইপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস করেন। ১৯২৭ সালে লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে করঞ্জলী যান। সেখানে লবন আইন অমান্য করে লবন তৈরী করেন। শেষ পরিনতি হিসাবে ইংরাজ বাহিনীর অত্যাচার এবং সর্বশেষে এক খণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে কোনক্রমে জীবন রক্ষার জন্য

আত্মগোপন করেন। পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করেন, ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে কাজ করেন। কিছুদিনের জন্য দেরাদুন চলে যান। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি সুনামের সহিত ডাক্তারী করেন বারুইপুরে। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি 'দানী ডাক্তার' নামে খ্যাত হন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

দ্বিজপদ মণ্ডল ঃ- ১৮৭২ সালে বারুইপুর থানার সীতাকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রতি একটা সতর্কীকরণ নোটিশ জারী করা হয়েছিল, তাঁর লেখা পালাগান এতদ্ অঞ্চলে খুবই পরিচিতিলাভ করেছিল। ১৯৭৭ সালে পরলোক গমন করেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায় ঃ- বারুইপুর সুবুদ্ধিপুরের মুখার্জী বাড়ির সুযোগ্যপুত্র দামোদর মুখোপাধ্যায়। তিনি 'মেজদা' নামে বারুইপুরের মানুষের কাছে পরিচিত। বিনয়ী মিষ্টভাষী এই ব্যক্তিত্ব বারুইপুরের বিভিন্ন কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসাধারনের সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি এই রকম তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে কল্যাণ সংঘ, রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় ও বারুইপুর পৌরসভার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বারুইপুর পৌরসভায় অন্যতম সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। কল্যাণ সংঘের সাথে তাঁর একটি ভালবাসার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র ছিল। তিনি নিজগৃহে পরলোকগমন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকার ঃ- আনুমানিক ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার ধোপাগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুরে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট উৎপাদন শিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন ধীরেন্দ্রনাথ কর্মকার, তিনি নিরক্ষার না হলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন কিছু ছিল না। তিনি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ নস্কর ঃ- বারুইপুর ইন্দ্রপালা গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ নস্কর জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুরে নারীশিক্ষার ইতিহাস তাঁর নাম চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে। নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণকল্পে বারুইপুর রেলগেট সংলগ্ন জমি দান করেন। ১৯৫৮ সালের ১৬ই মার্চ বারুইপুরে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন, কারণ এই দিনে "বারুইপুর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ধীরেন্দ্রনাথ নস্করের স্বর্গতা জননীর নামানুসারে "রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়" নামে অভিহিত হয় এবং জনসাধারনের ইচ্ছা স্বীকৃতি লাভ করে। ১৩.১২.১৯৫৮ তারিখে এই নাম পরিবর্তন সরকারী অনুমোদন পায়, বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

ননীবালা ঘোষ ঃ- ধপধপি গ্রামের রাম রাখাল ঘোষের বাটির বধু। 'আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ'নামে। (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) একটি ভ্রমণ কাহিনী লেখেন।

নিমচাঁদ মিত্র ঃ- ১৮৭৩ সালে 'শরৎকুমারী' নাটক প্রকাশ করেন। এতে নারী লাঞ্ছনা লাম্পট্যের চিত্র আছে।

নিকুঞ্জবিহারী দাস ঃ- বারুইপুরের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি 'আশ্রয় প্রার্থী কল্যাণ সমিতি'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯৬৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন বারুইপুর পৌরসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। বারুইপুর কংগ্রেসের অন্যতম নেতা নিকুঞ্জবিহারী দাস তার নিজ অর্থব্যয়ে কেনাজমিতে সুবুদ্ধিপুর অঞ্চলে তাঁর মায়ের নামাঙ্কিত 'সুভাষিনী উদ্বাস্তু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'-টি প্রমাণ করে বারুইপুরের সমাজজীবনে তাঁর অবদানের কথা।

নীরোদলাল রায়চৌধুরী ঃ- স্থানীয় জমিদার পরিবারের নীরোদলাল রায়চৌধুরী এই আপাত গম্ভীর নামের মানুষটি সমস্ত দম্ভ ও আভিজাত্যের সংকীর্ণ বাধাকে কঠিন বেদনায় অতিক্রম করে তিনি কাজ করেছেন মানুষের মাঝে। এই মানুষটি জীবনব্যাপী সাধনা, ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মব্রতই তাকে সাধারন মানুষের কাছে সদাহাস্যময় পরমপ্রিয় গর্বিত পরিচয়ে ধন্য করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি বারুইপুর সাধারন পাঠাগার, আর.সি. স্পোর্টিং ক্লাব, বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের, বারুইপুর সার্বজনীন পূজা ও উৎসব সংঘের দায়িত্বশীল বন্ধু ও সংগঠক। তিনি বারুইপুর পৌরসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিও হয়েছিলেন। এই আত্মপ্রচারের দিনে তাঁর মত নীরব নিরলস সংগঠক বিরল ও দক্ষ পরিচালকের ১৯৭৫ সালে ২৮শে এপ্রিল মাত্র ৫৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ ঃ- ক্ষেত্রনাথের পুত্র প্রদ্যোৎকুমার বারুইপুরের ধপধপিতে ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যুগান্তর বিপ্লবী হিসাবে ১৯৩২ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হন। ১৯৩৩ সালের ২১শে এপ্রিল বেরহামপুর ক্যাম্পে তাঁকে পাঠানো হয়। ১৯৩৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার রাজৌরে গৃহবন্দী হন। ১৯৩৭ সালের২২শে সেপ্টেম্বর ৩০০ টাকার নগদ জামিনে মুক্তি পেলেও ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী নিঃশর্তভাবে ছাড়া পান।

পতিতপাবন কর্মকার ঃ- ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার ধোপাগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধীরেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসুরীরূপে তিনি সার্জিকাল শিল্পটিকে বারুইপুরে বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বারুইপুর থানায় সার্জিকাল শিল্পের স্থপতি ও গুরু। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় একটি ব্লাকস্মিথ ট্রেনিং সেন্টারের স্থাপন করেন। বাংলায় ১৩৮০ সালের ৮ই কার্ত্তিক তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী ঃ- দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারাদাস রায়চৌধুরী। বারুইপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। চক্ষু চিকিৎসক রূপে গৌহাটিতে খ্যাতিলাভ করেন। সেখানে আর্য নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর সহধর্মিনী ডাঃ তিলোত্তমা ছিলেন অসমের বিশিষ্ঠ গান্ধীবাদী নেতা ডাঃ হরিকৃষ্ণ দাসের

কন্যা, স্ত্রী এবং শ্বশুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিনাপয়সায় গরীব রোগীদের চিকিৎসা করতেন অসম ও সমগ্র বাংলায়। ১লা জুলাই ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরোলকগমন করেন।

পুলিন রায়চৌধুরী ঃ-জন্ম স্থানীয় রায়চৌধুরীর পরিবারে। তিনি চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন এবং 'কলেরা চিকিৎসা' নামে (২য় খণ্ডে সমাপ্ত) একটি বই লেখেন। বারুইপুরে প্রথম প্রদর্শনী তাঁর চেষ্টায় 'রাসমাঠে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পূর্ণেন্দু ভৌমিক ঃ- ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মল্লিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়শিক্ষক-এর সম্মান লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন গোবিন্দপুর রত্নেশ্বর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বারুইপুর সোনারপুর থানার সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি ক্রিয়াকর্মের সাথে ছিল আন্তরিক যোগসূত্র। বসুমতী, দৈনিক গনশক্তি, সাপ্তিক, সংবীক্ষণ, ছড়া দিলেম ছড়িয়ে, ছোটদের সোনারকেল্লা, আদিগঙ্গা, আলপথ প্রভৃতি পত্রিকায় তার মূল্যবান লেখা পাঠক সমাজে সমাদৃত। তিনি প্রথমে গড়িয়া থেকে পরে বারুইপুর থেকে অন্বীক্ষা পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বারুইপুর বইমেলার তিনি প্রতিষ্ঠাতা কার্যকরি সভাপতি ছিলেন। ২০০১ সালের ৮ই অকটোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য ঃ- ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার মামুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে মাহিনগরের বিখ্যাত বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ করেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সম্পাদক "আলফ্রেড ওয়াটসন" তার পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচার ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে ওয়াটসন মসগুল ছিলেন, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ষ্ট্র্যান্ড রোডের হেস্টিংস অঞ্চলে মণি লাহিড়ী, অনিল ভাদুড়ী ও বঙ্কিম বৈদ্যের গুলিতে ওয়াটসন গুরুতর আহত হয়ে ধরাশায়ী হন, এই ষড়যন্ত্রের নেতা-সুশীল চট্টোপাধ্যায়-এর যাবৎজীবন দীপান্তর হয়। বাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে বঙ্কিম বৈদ্যের কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে এই বন্দী অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অনুমতি পেয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের দেউলি জেলে তাকে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘ আট বছর তাঁকে এই জেলে থাকতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরে তিনি দুর্গাপুর কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় গড়ে তোলেন। পরবর্তি জীবনে তিনি শিক্ষকতা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন।

বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত ঃ- জন্ম ও বাসস্থান বারুইপুর থানার নবগ্রাম অঞ্চলে। তিনি বারুইপুরের প্রথম ব্যক্তি- যাঁর বই ১২৩১ সালে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়। বইটির নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী-র অনুবাদ। বইটির অনুসন্ধান মেলে সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১ম খণ্ডে ৮৮৬ পৃষ্ঠায়।

বিচারপতি বঙ্কিমচন্দ্র রায় ঃ- ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বারুইপুর থানার শংকরপুর অঞ্চলে কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুলটি প্যারিমোহন বিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজ থেকে ইন্টারামিডিয়েট পাশ

করেন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে থেকে, একই জায়গা থেকে এম. এ. পাশ করেন ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশকরেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে ১৬ই জুন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইনজীবী হিসারে অন্তরভুক্ত হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ৭ বৎসর চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ সময় অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সরজমিনে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে সাগরে যান ও তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মে তিনি কলিকাতার উচ্চ আদালতের বিচারপতি হন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সর্বোচ্চআদালতের (সুপ্রিমকোর্ট) বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২১শে ভাদ্র ১৪০৮ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ ঃ- ১৪ই এপ্রিল ১৯০০ সালে বারুইপুর থানার শিখরবালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাবুলচন্দ্র ঘোষ "দক্ষিণের হ্যানিম্যান" হিসাবে ডাঃ ঘোষ পরিচিত ছিলেন। বহু দুরারোগ্য রোগী তাঁর চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করেছেন। তিনি হোমিও কাউন্সিলের সদস্য ও পরীক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বারুইপুর 'হোমাই ইউনিট'-এর আজীবন সভাপতি ছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদের নিয়ে ডাক্তারী বিষয়ে আলোচনা ও অপরিণত ডাক্তারদের হাতে কলমে ডাক্তারী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বিপিনবিহারী হল'। স্ত্রী যমুনাবালা ঘোষের মৃত্যুর পর তিন নিজগ্রামের পঞ্চায়েত ভবন ও স্বাস্থকেন্দ্রের জন্য ভূমিদান করেন স্ত্রী-র স্মৃতির উদ্দোশে। তিনি শেষজীবনে বারুইপুর শহরে ডাক্তার খানা ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। বারুইপুর সাধারণ পাঠাগারের সম্মুখে মহাত্মা হ্যানিম্যানের আবক্ষমূর্তি স্থাপন করে জীবনের শেষইচ্ছাও পূরণ করেন। ১৯৯১ সালের ২৯শে জুলাই এই মহান চিকিৎসক, সমাজসেবী ও দাতা পরলোকগমন করেন।

ডাঃ বিধুভূষণ সানা ঃ- চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি বারুইপুর রাজপুর শাখার আই.এম.এ.-এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। সহৃদয় চিকিৎসক হিসাবে পরিচয়টুকুই তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রকাশ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তিনি ঐতিহ্যপূর্ণ বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সম্পাদক ছিলেন,। এছাড়া পুরন্দপুর সাধন সমর মধ্য বিদ্যায়তন, দুর্গাপুর বিদ্যালয়, জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠ, রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি বারুইপুরের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদক বা সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন। বারুইপুরে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়।

ডাঃ বিপ্রেন্দ্রকুমার মুখার্জী ঃ- ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে M.B পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে শাসনে মামা বাড়ীর সুবাদে বারুইপুর পুরাতন বাজারে একখানি ছোট ঘর নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। পরে বারুইপুর রেলগেট-এ বসতবাটী নির্ম্মাণ করে ডাক্তারখানা স্থানান্তরিত করেন। ডাক্তার মুখার্জী ছিলেন বারুইপুরে I.M.A.-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম সভাপতি। পঞ্চাশের দশকে ১ টাকা এবং ষাটের দশকে ২ টাকা মাত্র ছিল যার ফি সেই

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষের কাছে ভগবান সমান মানুষটি চিরদিনের জন্য বারুইপুর ত্যাগ করে ১৯৬২ সালে মার্চ মাসে পরলোক গমন করেন।

বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গয়াতে মায়ের পিণ্ডদানের পর তিনি আর সংসারে ফিরে আসেন নি, গুরুদেবের কাছে ১৯৪৯ সাল অবধি। কাব্য ও শাস্ত্র শাস্ত্রের উপাধি গ্রহণ করেন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ডিগ্রি নিয়ে রেঙ্গুনে যাত্রা করেন, জাপান যখন রেঙ্গুনে বোমা ফেলতে শুরু করেছিলো, তখন তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পিতার নামানুসারে ব্রজেন্দ্র ঔষধালয় স্থাপন করেন এবং এখান থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেন। মিত্র ইন্সটিটিউশনে তের বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ সালে ২রা জানুয়ারী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পদ্মপুকুরের শঙ্করদাস ব্যানার্জীর সাথে পুরন্দরপুর গ্রামের শ্মশানে আসেন। তাঁর গুরুর নাম নিয়ে ১৯৬৪ সালে থেকে পুরন্দরপুর গ্রামে শ্মশানে থাকার মনঃস্থির করেন। এই সময় বারুইপুরে কল্যাণপুর স্টেশনের পাশে কোটালপুর মধুসুদন হাইস্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে যোগদেন। তখনথেকেই কল্যাণপুর পুরন্দরপুরসহ বৃহৎ এলাকার মানুষের কাছে তিনি পণ্ডিতমশাই নামে অভিহিত হন। তাঁর জীবনের সমস্ত অর্থ ও প্রচেষ্টা দিয়ে এক এক করে গড়ে তুললেনপোষ্ট অফিস, লাইব্রেরী, বেবী ক্রেজ, বুনিয়াদী প্রাইমারী স্কুল, ক্লাব, যোগব্যায়াম কেন্দ্র, শুরু হল তার কর্মযজ্ঞ, বিরাট জঙ্গল জনমানব শূন্য শ্মশান সংস্কার করে তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান, পুরন্দরপুর মঠ সাধনসমর নারী শিক্ষায়তন মেয়েদের স্কুল, ছেলেদের স্কুল ও বারুইপুর কলেজ গড়ে তোলার কাজে মন দেন। তার ইচ্ছে ছিল একটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ। যিনি ৩৬ বছর বয়স থেকে সামান্য ছাতু আর পাউরুটি খেয়ে জীবন কাটালেন, জীবনের সমস্ত উপার্জিত সঞ্চয় ও নিজের জীবন উৎসর্গ করে অন্ধকারময় জগত থেকে আলোক বর্তিকায় নিয়ে এলেন, সেই পণ্ডিত মহাশয় ১৪ই অক্টোবর ২০০০ সালে পরলোকগমন করেন।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ- বারুইপুর থানার শাসন গ্রামে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষারম্ভ বারুইপুরের মিশনারী স্কুলে। বারুইপুর হাই স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকেই মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি বাইশ বছর "সংবাদ প্রভাকর" " পত্রিকায় চাকরী করেন। তাছাড়াও সাংবাদিক হিসাবে 'বসুমতী', 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'বিদুষক', 'পূর্ণশশী', 'জন্মভূমি' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় বারুইপুর থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিদুষক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আজীবন নিরলস সাহিত্যসেবী "ভুবনচন্দ্রের" গ্রন্থের সংখ্যা মোটেই অল্প নহে। তিনি কাব্য, গল্প, উপন্যাস, সামাজিক নকশা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী - এককথায় বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগে কিছু না কিছু লিখেছেন। এই কারণে তাঁকে দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায় বলা হয়। তাঁর রচনা ভঙ্গী ছিল সরল ও সুন্দর। অনুবাদেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট, ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ইংরাজীর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ভবতারণ বসু ঃ- ধপধপি গ্রামের অধিবাসী। তাঁর 'যুগের দাবী' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়।

মন্মথ সিংহ ঃ- (নস্কর) টংতলা গ্রামের অধিবাসী। তিনি 'ডারি' ও 'শয়তান ঠাকুর' নামে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন।

এম আব্দুল্লাহ ঃ- ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোদার বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এম আব্দুল্লাহ। পিতা নাম মৌলনা বাবর আলি ও মাতার নাম রাহিলা বিবি। বারুইপুর থানা এলাকার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট এম আব্দুল্লাহ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে জীবনযাত্রা শুরু করেনছিলেন। পরে সংগঠনিক দক্ষতার জোরে ১৯৬৮ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তারও পরে ৭২ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত সহঃসভাপতি হিসাবে সমগঠন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু রাজনৈতিক ব্যাক্তি হিসাবেই নয় সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারেও তাঁর অবদান সমান অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তার আমৃত্যু সংগ্রাম, অন্যায় আর অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্র এই গ্রহণযোগ্য বাক্তিত্ত্বর ১৯৯২ সালের ৭ই জানুয়ারী ইন্তেকাল হয়।

মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ- দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাউথ গড়িয়া গ্রামে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম কেশব বন্দোপাধ্যায়, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রশংসনীয় ফলাফল করার পর বঙ্গবাসী কলেজ ভর্ত্তি হন। কলেজে পড়ার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-এর ফলশ্রুতিতে বৃটিশ শাসক তাঁকে বারংবার কয়েদ করে, ফলে লেখাপড়ায় ছেদ হয়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার জন্য দীর্ঘকাল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর বহু জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ও জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব পূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে ২৪ পরগনায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কেন্দ্র থেকে বিধানপরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীকেপরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ১৫ই আগষ্ঠ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিতে "তাম্রপত্র" দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৭৮ সালে ১২ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

মহেশ ঘোষ ঃ- ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে সমাদৃত হন। তিনি বারুইপুর পৌরসভার প্রথম কমিশনারদের মধ্যে একজন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে বসবাস করেন। সেই সময় বঙ্কিমের ঘনিষ্ট যে কজন হয়েছিলেন মহেশ ঘোষ তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ- সাউথ গড়িয়ার বর্দ্ধিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রকাশিত নাটক 'অকাল বোধন' 'কবিতা' ও 'শেষ পুস্তক' প্রশংসা পায় তিনি কবিরত্ন ছিলেন।

রাজারাম দাস ঃ- বারুইপুর থানার শিখরবালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 'ধর্মের পাঁচালী', 'নারায়নী মঙ্গল' ও 'সত্যপীরের গীত' রচনা করেন। তার 'ধর্মের পাঁচালী' রচনার সময়কাল ''পক্ষ পক্ষ রস মহীশক অর্থাৎ ১৬২২ শকাব্দ বা ১৭০০ খৃষ্টাব্দ।

রাজবল্লভ রায় ঃ- ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে 'মেদনমল্ল' ও পেচাঁকুলি পরগনার জমিদারী পরোয়ানা লইয়া রাজপুর থেকে বারুইপুরে চলে আসেন এবং রাসমাঠের কাছারিবাড়িতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে বসাবাস করেন। রাজবল্লভ রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রার সময়ে বাংলার জমিদারদের তরফ থেকে পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য যে আবেদনপত্র নিয়ে যান তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি বারুইপুরে জনপদ তৈরী করেছিলেন। সম্ভবত তার হাতেই সর্বপ্রথম এই জেলার ইংরেজ লাঞ্ছনা হয়েছিল।

রাজকিশোর রায়চৌধুরী ঃ- স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম হিন্দুমেলা হয় বারুইপুর রাসমাঠে তাঁর উদ্যোগে। ইহা সম্ভবত এই জেলায় প্রথম স্বদেশী চিন্তা বিষয়কসাংগঠনিক পদক্ষেপ । ১৮২১ থেকে ৭৪ পর্যন্ত এই মেলা হয়। এই মেলায় মনমোহন বসু বক্তব্য রাখেন। মেলায় উদ্দিষ্ট দেবী -- 'উন্নতি'।

রাজকুমার রায়চৌধুরী ঃ- ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ রোধ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন রাজকুমার রায়চৌধুরী। তিনি বারুইপুর স্কুল ও পৌরসভা গঠনের উদ্যোগী হয়েছিলেন নিজেদের জমি দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরের মহাকুমা শাসক ছিলেন তখন তিনি রাজকুমারের বাড়িতে বসে দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন। তিনি বারুইপুর পৌরসভায় প্রথম পৌরপ্রধান হন।

রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় ঃ- বারুইপুর থানার শাসন গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এস.সি. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি. পাস করেন। পুরুলিয়া গভঃ কলেজের অধ্যাপক হন। পরে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হয়ে আসেন। এই সময় থেকে দেশের জন্য তিনি কাজ শুরু করেন। মদারাট পপুলার একাডেমীর সভাপতি থাকাকালীন ১৩৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হন। এই সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ- ১৫ই মে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯৪০ সালে ফলিত গনিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬০ সালে পি.এইচ.ডি. করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৪১ সালে ফরিদপুর জেলার রাজেন্দ্র কলেজ ও

রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন পরে কলকাতায় সিটি কলেজ ও ১৯৫৬ সাল হইতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেন পরবর্তী সময় তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটির ডীন পদে অধিষ্ঠিত হন ১৯৭৯ সালে তিনি কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্রথম সভাপতি হন। পরে স্টেটপ্লানিং বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদের ডাকে সাড়া দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালের ৮ই মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রণজিৎকুমার মজুমদার ঃ- ১২ই এপ্রিল ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা অন্যদিকে কবি, শিক্ষক এবং বাগ্মী। কবিতার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা সবই তিনি ব্যক্ত করে গেছেন। শেষ জীবনে সক্রীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে যুক্ত হয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

ললিতকুমার রায়চৌধুরী ঃ- আধুনিক বারুইপুরের রূপকার ললিত রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে ১৯১৫ সালে ১৫ই এপ্রিল। তিনি বারুইপুর স্কুলের একজন কৃতি ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক হন। আইন ব্যাবসাতেও সু-প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ছিলেন পৌরপ্রধান। এই সময় তিনি সি.এম.ডি.এ.-এর সদস্য মনোনিত হন। এই সময় থেকে বারুইপুরে বহু পীচের রাস্তা, পাকা ড্রেন, ইটের রাস্তা করেন। বারুইপুর গ্রামীন হাসপাতালকে দ্বিতল গৃহে রূপান্তরিতকরণ, বারুইপুরের সংস্কৃতিবান মানুষদের জন্য রবিন্দ্রভবন নির্মাণ ও কলিকাতা শহরের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যোগাযোগের জন্য E.M.বাইপাসের রাস্তার সুপারিশসহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ সি.এম.ডি.-এর সদস্যরূপে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ বারুইপুর তথা জেলায় উন্নয়নে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুবছর জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হন। বারুইপুর কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। নিজ ভবনে তিনি ২রা আগষ্ট ২০০০ সালে পরলোকগমন করেন।

শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম শশাঙ্কদেব চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক শিক্ষক, প্রথমে বহড়ু বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষকরূপে দীর্ঘদিন কাজ করেন। পরে বারুইপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমৃত্যু সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। নির্ভিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই ছোটখাট মানুষটি ছিলেন জ্ঞানের আকর। তার সময়ে তিনি বারুইপুর স্কুলকে একটি সার্থক ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। তিনি সমাজসেবায় ব্রতী ছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি আমৃত্যু পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি পৌরপ্রধান ছিলেন। একদিকে দক্ষ প্রশাসক, অপরদিকে আদর্শ শিক্ষক, নারী শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার দিন থেকে তার সার্থক রূপায়ণে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সুখ-

দুঃখের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি একান্তভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস ঃ- ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর শরৎচন্দ্র বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন বারুইপুর হাইস্কুল থেকে ১৬ বছর বয়সে বাংলা ভাষায় 'ভি' পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। ১৯২৪/২৫ সালে তিনি বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের উৎসাহে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। সাতকড়ি বাবুর উৎসাহে তিনি 'কালবৈশাখী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই সময় কবি নজরুল ইসলাম, অরুন গুহ, চারু রায়, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সহিত তাঁর পরিচয় হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় তার প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বসুমতী, সোনার বাংলা উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৩৫ সালে আশুতোষ হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৯৩২ সালে শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের চিকিৎসালয়ে বারুইপুর হোমিও মেডিকেল বোর্ড গঠিত হয়। ডাঃ বিশ্বাস এই বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ডাঃ শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় বারুইপুরে ২৪ পরগনা জেলা হোমিওপ্যাথি সম্মেলন দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ১৬ই এপ্রিল ১৯৩৮ , দ্বিতীয়টি ৮ই এপ্রিল ১৯৫৫। ৯ই মে ১৯৭৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ঃ- বাংলায় ১৩০৮ সালে ২রা বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে। তাঁর পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী দুর্গাদাস রায়চৌধুরী বারুইপুর স্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তখনকারদিনে ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। এরপর আইন পরেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ, এল.এল.বি (গোল্ডমেডেলিস্ট)-এর সাফল্য পান তিনি। বারুইপুর কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই আদালতের সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম বারুইপুর পৌরসভায় সরকার মনোনীত কমিশনার হন। ১৯২৭ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি পৌরসভায় ৩নং ওয়ার্ড (বর্তমান ৬ নং ওয়ার্ড) থেকে কমিশনার নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় পৌরপ্রধান ছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন বারুইপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সম্পাদক। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠণ আর.সি. স্পোর্টিং ক্লাবের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। এই সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রথম থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্রীড়া সংঘের পরিচালিত ক্রীড়া উৎসবে তিনি অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে এবং প্রচেষ্টায় বারুইপুর পৌরসভা সংঘগৃহ নির্মাণকল্পে জমি দান করেন। শুধু খেলাধূলার প্রসার নয় সঙ্গে পড়াশুনার ব্যাপারে এলাকার মানুষ যাতে উৎসাহি হন তার জন্য সাধারণ পাঠাগার নির্মাণকল্পে জমি দান করে সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্ হিসাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এতদঞ্চলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৩৬২ সালের ১৩ই মাঘ বারুইপুর পৌরসভায় পৌরপ্রধান শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী দীর্ঘ ৩২ বছরে পৌরসভার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে পরলোকগমন করেন।

শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ- ১৯২৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুরের স ি ।

ও সংস্কৃত জগতে একটি উজ্জ্বল নাম শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি গান্ধীবাদের প্রবক্তা হন। তিনি 'লোকস্বরাজ পত্রিকা' দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করেন। 'শতাব্দীর সাধনা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। নানা শাস্ত্রবিদ্যার অধিকারী ও ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাবান বেদ, উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা এবং সুবক্তা, প্রাজ্ঞ গবেষক ও পণ্ডিত শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায় ৩০শে মে ২০০৪ সালে পরলোকগমন করেন।

শিবসুন্দর দেব ঃ- ১৮ই আগষ্ট ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ এদেশে লিথোগ্রাফির কাজে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হন। তিনি ধানবাদে স্কুল অব সায়েন্সে ডেমনস্ট্রেটর কাজ করেন, পরে লেকচারার হন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি D.S.C. লাভ করে ১৯৩৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিভাগের নতুন শাখা Applied Geology বিভাগে কাজ করেন। পরে যাদবপুর National Council Of Education এর Engineering Geology-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ফলিত ভূতত্ত্ববিভাগের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের পরেও উষ্ণ প্রস্রবন বিষয় গবেষণা চালিয়ে বহু নূতন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। ১৯৪৬-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেন।

শিশিরশুভ্র বসু ঃ- ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের ধপধপি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সত্যযুগ পত্রিকায় যোগ দেন। পরে দৈনিক বসুমতী ও যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে বাংলা থিয়েটারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণাধর্মীয় লেখা 'একশ বছরে বাংলা থিয়েটার' নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর এই বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন।

শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ঃ- ১৮৭৯ সালে জন্মেছিলেন । তিনি Phyvencial small cause court act নামে একটি আইনের ইংরাজী বই লেখেন। তিনি পৌরপ্রধান ছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঃ- ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, যৌবনে অধুনা বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। আমৃত্যু তিনি এই দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে বারুইপুর স্টেশন রোডে রক্ষাকালী মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ণে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে তিনি 'আশ্রয়প্রার্থী কল্যাণ সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই

সমিতির উদ্যোগে বারুইপুর স্টেশন অঞ্চলে জি বোস কলোনিটি গড়ে ওঠে। অপর আরও একটি কলোনি স্থাপিত হয় বারুইপুর গোলপুকুর অঞ্চলে নতুনপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী। বারুইপুর 'ঋষি বঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতির' তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

শরৎচন্দ্র মণ্ডল ঃ-জন্ম ১৩০৭ সন। চীনে গ্রামের অধিবাসী এবং স্থানীয় পাঠশালা বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। ত্রিপদী ও পয়ার বহুল 'মর্ত্যে মহাপূজ' ও 'মঠের মাহাত্ম্য' (চিত্রশালী নন্দিকেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত) নামক দুটি বই লিখেছেন।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ঃ- বিখ্যাত নাট্যকার ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী সৌরীন্দ্রমোহন ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাউথ সাবার্বন স্কুল থেকে পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এম.এন.রায়ের হিউমানিস্ট আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যাত্রাপালাকে তিনি প্রথম আধুনিক কাব্যনাটকে পরিবেশন করেন। দশ-বারো ঘন্টার যাত্রাকে তিনিই প্রথম তিন ঘন্টায় বেঁধে দিলেন। তাঁর 'রূপনগরের মেয়ে' পালা-র জন্য। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৯৮ সালে ৯৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

সতীশচন্দ্র দে ঃ- ১৯১১সালে ১লা আগষ্ট বারুইপুরে দত্তপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নগেন্দ্রনাথ দে। বারুইপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন কলেজে পড়ার সময় তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২৮ সালে ২৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে মেদিনীপুরে হিজলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বারুইপুরে আসেন। বারুইপুরে কংগ্রেস দলের সংগঠন গড়ার কাজ করতে থাকেন। পদ্মপুকুর প্রাইমারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে মদারাট পপুলার একাডেমীতে শিক্ষকতা করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ও একই কারাবাসের বন্ধু, পরে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তার সাংসারিক অসচ্ছলতার খবর পেয়ে তাঁর ছেলেকে চাকরি দেবার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আমৃত্যু তিনি কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তিনি পরলাকগমন করেন।

সুকুমার ঘোষ ঃ- ৭ই ডিসেম্বর ১৯২০ সালে বারুইপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্রের কারণে পঞ্চম শ্রেণীর বেশি স্কুলে পড়া হয়নি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে নবগঠিত হনং মোহিনী মিলে তিনি অ্যাপ্রেনটিস নিযুক্ত হন। ঘটনাচক্রে তিনি কমিউনিষ্ট পাটির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোহিনী সুতাকল ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছরই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। অসুস্থতার কারণে ছাড়া পেয়ে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায় কারখানার শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভ্য ও

১৯৫৪ সালে তিনি বি.পি.টি.ইউ.সি.-এর কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন, ২৬শে আগষ্ট ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

সুশীলকৃষ্ণ দত্ত ঃ- ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী বারুইপুর বৈদ্যপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নটবর দত্ত। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম. পাশ করেন। স্থানীয় আর সি. স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় পরে সাধারণ সম্পাদক আরও পরে সভাপতি সুশীলকৃষ্ণ দত্ত-র নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু মানুষের উৎসাহে জেলা ক্রীড়াসংঘ গঠন হয়। এই ক্রীড়াসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুশীলকৃষ্ণ দত্ত। বারুইপুরসহ সমস্ত জেলায় খেলাধূলার প্রচার ও প্রসারে অগ্রনী ভূমিকা ও দক্ষক্রীড়া সংগঠকের স্বীকৃতি প্রদান করেন রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ১৯৯১ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী। শুধু খেলাধুলায় দক্ষ সংগঠকই নন, তিনি ঋষি বঙ্কিম ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠনেও অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হলে তিনি হন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ২০০০ সালে এই সমবায় সমিতির ২৫ বৎসর পূর্ত্তি উৎসবে নিজে হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ২০শে নভেম্বর ২০০১ সালে পরলোকগমন করেন।

সজল রায়চৌধুরী ঃ- ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐতিহাসিক বনেদী পরিবার বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বারুইপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, মামার বাড়ি খুলনায় দৌলতপুর হিন্দু অ্যাকাডেমিতে আই.এ. পড়ার সময় ছাত্রআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৯ খ্রীঃ যশোহর জেলার পাঁজিরার অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। চারের দশকে নাগপুর ও পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্রসম্মেলনের প্রতিনিধি। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রসংসদের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পার্টি সেল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৮ ও ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি এম.এ.বি.টি পাশ করে ১৯৫০ সাল থেকে রাজপুর বাংলা স্কুলে শিক্ষকতার সহিত যুক্ত হন। প্রায় ৫০ বছর তিনি রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেছেন।। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখায় তিনি সম্পাদক ছিলেন। প্রায় ৪০ টি পুর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের রচয়িতা তিনি। তাঁর প্রায় সবকটি নাটক-ই শহরে, বন্দরে, গ্রামেগঞ্জে অভিনীত হয়েছে। তাঁর দুটি নাট্যসংকলন 'গণনাট্য কথা' ও নট-নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য নাট্য আকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত। দীনবন্ধু পুরস্কারেও তিনি পুরস্কৃত। ১৩ই ডিসেম্বর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুশীলকুমার ঘোষ ঃ- ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে সুশীলকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারুইপুর থানার প্রথম থিয়েটারের প্রবর্তক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ষ্টার থিয়েটারে অমর দত্ত, সুরেন ঘোষ (দানিবাবু) কুসমকুমারী প্রমুখ বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সাথে অভিনয় করেন। 'তাপস সংহার' নাটকে তার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতাগণ তার কাছে অভিনয়ের প্রথম শিক্ষালাভ করেন।

ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ঃ- ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাভি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজ থেকে এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবন শুরু পোর্ট কমিশনার্সে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারি চাকরি নিয়ে খুলনা সদর হাসপাতাল, দার্জিলিং সদর হাসপাতাল, ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকরি ছেড়ে বারুইপুরে স্বনির্মিত গৃহে চিকিৎসক হিসাবে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করেন। নানা বিষয়ে বিশেষত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপর তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বারতীয় গণনাট্য সংঘের ২৪ পরগনা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একসময় সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। রচিতগ্রন্থ ঃ 'রবি প্রদক্ষিণ'। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী ঃ-ঊনবিংশ শতকে শেষার্দ্ধে (?) ব্রহ্মসংগীত নামে কবিতা বা সংগীত পুস্তক রচনা করেন।

ডাঃ সুশীল লস্কর ঃ-মদারাট পপুলার একাডেমি থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে L.M.F. পাশ করে চিকিৎসা শুরু করেন। পরে আর.জি.কর কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাস করেন। তিনি এলাকার সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকহিসাবে সুনামের সহিত ধনী দরিদ্র সকলের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে, বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। ১৯৭০ সালে নিজের গৃহে সীতাকুণ্ডু বিদ্যায়তন গঠন করেন। ফুলতলা থেকে সীতাকুণ্ডু পর্যন্ত বাস চালানোয় তার অবদান স্বীকার করা হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আঞ্চলিক পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। আই.এম.এ.-এর বারুইপুর শাখার সম্পাদক হয়েছিলেন। হুমায়ুন কবীর, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখার্জীর স্নেহধন্য ডাঃ সুশীল লস্কর জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদন্দিতা-ও করেছিলেন। ৭ই মার্চ ২০০২ তাঁর মৃত্যু হয়।

সৌরীন বসু ঃ- ধপধপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলেন। তাঁর 'বাউল গানের' একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

হরেন্দ্রনাথ পাঠক ঃ- ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে 'ল' পাস করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯১২ সালে কর্মজীবন শুরু করেন মদারাট পপুলার একাডেমিতে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে পরে বারুইপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। এই কোর্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত উকিল হিসাবে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে আইনী ব্যবসা করেন। তিনি বারুইপুর পৌরসভায় পৌরপ্রধান হয়েছিলেন -- ১৯৩২ -৩৬, ৩৯ -- ৪২ , ৫৬ -- ৫৮ মোট তিনবার ৯ বছর। ১৯৮১ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শিশিরশুভ্র বসু, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, বিমল পাল,
সুবর্ণ দাস, সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান (সাহিত্য সংসদ),
রত্নমালা- প্রভাত ভট্টাচার্য্য, স্মরণীয় ব্যক্তি - গণেশ ঘোষ

"সকলে বলে আমাদের মধ্যে একতা নেই, একতা কেমন করে সৃষ্টি করা সম্ভব? কোন রকম অবাস্তব উপায়ে নহে, একমাত্র আমাদের মায়ের আহ্বানে এবং তার সমস্ত সন্তানের মিলিত কণ্ঠস্বরেই তা সম্ভব। এই শক্তি আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত এবং তার কাজ সারা দেশে ব্যপ্ত হচ্ছে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপাড়া এবং বারুইপুরে তার কাজ শুরু হয়েছে।

– শ্রী অরবিন্দ (১২. ০৪. ১৯০৮)

বারুইপুরের লেখকগণের রচিত গ্রন্থ্

বিদিশা দাস

বারুইপুর আজ মহকুমা শহর। দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শহর থেকে গ্রাম সম্মোহিত। সেই নতুন প্রযুক্তির ঢেউ এসে লেগেছে মুদ্রণ শিল্পে। এঁদো ঘরের লেটার প্রেস এখন ইতিহাসের উপাদানের দলে চলে যাচ্ছে। ঝকঝকে তকতকে পরিবেশে কম্পিউটার এবং অফসেটে ছাপা বই, পত্র-পত্রিকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। সেকাল আর একালের মুদ্রণ শিল্পের মধ্যে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। একসময় তালাপাতা ও তুলোট কাগজে লেখার চল্ ছিল। লেখা হতো পুথি। পুথি থেকে আজ অফসেটে ছাপা বই। বারুইপুরের কবি-সাহিত্যিকগণ সেদিন থেকে আজ বিভিন্ন রচনার নিরলস সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এ-এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। সেই পরিক্রমার কুশী-লব ও তাঁদের সৃষ্টি-সম্ভারের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছি।

তথ্যানুসন্ধানে যা উঠে এসেছে তা হলো – বাংলা ১২৩১ সনে বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত রচিত 'দুর্গা সপ্তশতী' বারুইপুর থানার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ্।

বিনীতভাবে স্বীকার করি নিশ্চয়ই বারুইপুরের লেখকদের প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের সন্ধানপাওয়া যায়নি। বহু অনুসন্ধানেও বহু লেখকের গ্রন্থ্ এবং তা প্রকাশকালের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। কোন কোন গ্রন্থের নাম সংগৃহীত হলেও বিষয় এবং প্রকাশকাল পাওয়া যায় নি। কারণ, মূলত সংরক্ষণের অভাব এবং অনেক লেখকের অসহযোগিতা। যা পেয়েছি তার তালিকা পেশ করা হলো। যা পাওয়া যায়নি তার জন্য তথ্য সরবরাহ করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করি।

লেখক	গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রকাশকাল
বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত	• দুর্গা সপ্তশতী	অনুবাদ গ্রন্থ্	বাং ১২৩১
সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	• রূপনগরের মেয়ে	যাত্রাপালা	
	• শেষপ্রণাম	যাত্রাপালা	
	• পলাশীর পরে	যাত্রাপালা	
	• মাটির মা	যাত্রাপালা	
	• রক্তের টান	যাত্রাপালা	
	• রক্তবীজ	যাত্রাপালা	
	• ব্যথার পূজা	যাত্রাপালা	
	• শাপমুক্তি	যাত্রাপালা	
	• চক্রছায়া	যাত্রাপালা	
	• কৃষ্ণকান্তের উইল	নাট্যরূপ	
	• রাজা রামমোহন রায়	নাটক	
	• সূর্যকন্যা তপতী	নাটক	

লেখক	গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রকাশকাল
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	• পেলাম যাদের দেখা		
	• বেদ পরিচয়		
	• তন্ত্র পরিচয়		
	• বিবেকানন্দ		
	• স্বাধীন বাংলার সংগীত		
	• ষোড়শী		
নফরচন্দ্র দাস	• শ্রীশ্রী অনন্তআচার্য্যের জীবনচরিতকথা ও কীর্তনমালা	জীবনচরিত	১৯৮১
স্বরাজ সিংহ	• সঙ্গীত অঙ্কুর (প্রথম খণ্ড)	প্রবন্ধগ্রন্থ	বাং ১৩৯৩
	• সঙ্গীত অঙ্কুর (দ্বিতীয় খণ্ড)	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯৩
পাঁচুগোপাল রায়	• রক্ত চাই	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৬
	• রক্তের আলপনা পথে পথে	বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে কাব্যগ্রন্থ	১৯৭২
	• পার্কের বেঞ্চিটা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৫
	• কবিতার প্রেম	কাব্যগ্রন্থ	২০০৫
সন্তোষকুমার দত্ত	• চেনামুখ অচেনা মন	গল্প গ্রন্থ	১৯৬১
	• দ্বিধারা	উপন্যাস	১৯৬৪
	• প্রবাহের বিপক্ষে	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৮৬
	• উজান পথে রামমোহন সমীক্ষা	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯১
	• বিভূতি ভূষণ ঃ স্বকাল ও একাল	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৩
	• প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ বিদূষণ	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৩
	• তারাশঙ্করের সাহিত্য ও গান	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৭
	• নিঃসঙ্গ পথিক মোহিতলাল	প্রবন্ধ গ্রন্থ	২০০০
ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য	• রবি প্রদক্ষিণ	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৩৭২
	• চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস	প্রবন্ধ সংকলন	২০০৪
ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ও হেমেন মজুমদার	• দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অতীত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	সম্পাদিত প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৯
শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়	• শতাব্দীর সাধনা	সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন	
সজল রায়চৌধুরী	• গণনাট্যকথা	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯০
ড. পূর্ণেন্দু ভৌমিক	• তৃতীয় প্রহর	উপন্যাস	১৩৭২
	• বিনিদ্র রজনী	উপন্যাস	১৯৯৭
	• নির্বাচিত গল্প	গল্প সংকলন	১৯৯৭

উত্তম দাশ	• যখন গোধূলি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৬
	• লৌকিক অলৌকিক	কাব্যগ্রন্থ	১৯৭৫
	• জ্বালামুখে কবিতার	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮০
	• রুণুকে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮২
	• এ জন্মের প্রত্যাহার চাই	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৩
	• ভারতবর্ষের একজন	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৪
	• ভুল ভারতবর্ষ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	• নির্মাণে এসেছে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
	• রাত্রির স্থাপত্য	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯২
	• ভ্রমণের দাগ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৫
	• কাব্যনাট্য ও কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
	• একালের মঙ্গলকাব্য	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
	• কবিতা সমগ্র	কাব্যগ্রন্থ	২০০৪
	• বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৬৫
	• বাংলা সাহিত্যের সনেট	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৭৩/১৯৮৯
	• কবিতার সেতুবন্ধ	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮০
	• বাংলা ছন্দের কূটস্থান	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৫
	• হাংরিশ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৬/২০০২
	• বাংলা কাব্যনাট্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৯/২০০৩
	• বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯২
	• ক্ষুধিত প্রজন্ম ও অন্যান্য গ্রন্থ	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯৭
	ঃ সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ		
	• কবিতা ঃ ষাটসত্তর	কবিতা সংকলন	১৯৮২
	• গল্প ঃ ষাট সত্তর	গল্প সংকলন	১৯৮৭
	• আধুনিক প্রজন্মের কবিতা	কবিতা সংকলন	১৯৯১
	• শতাব্দীর বাংলা কবিতা	কবিতা সংকলন	২০০১
পরেশ মন্ডল	• অদূরে জলের শব্দ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৩
	• প্রতিবিম্ব	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৭
	• মানমন্দির	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৯
	• ৪৪৪	কাব্যগ্রন্থ	১৯৭২
	• পেন্ডুলাম	কাব্যগ্রন্থ	১৯৭৯
	• লোডশেডিং ১৯৮৩	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৪
	• হাত	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৬

	• শেষ এবং শুরু	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৯
	• নির্বাচিত কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৬
	• নিজস্ব বলয়	কাব্যগ্রন্থ	২০০১
	• বিদ্রোহী ক্রীতদাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৫
ডঃ কুমুদরঞ্জন নস্কর	• Bharater Sundarbans O Mangrove Udvid	সুন্দরবন বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ	
	• An Ecological Perspective & Manual of Indian Mangrove	সুন্দরবন বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ	
	• Mangrove Swamps of Sundarbans	সুন্দরবন বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ	
	• Ecology and Biodiversity of Indian Mangroves	সুন্দরবন বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ	
আব্দুল মজিদ মল্লিক	• সময়ের হাত ধরে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮
	• সকাল বেলার পাখি	ছড়ারগ্রন্থ	১৯৯৯
	• ছোট্ট তারার ঝিকিমিকি	ছড়ারগ্রন্থ	২০০২
রণজিৎ পাল	• অথচ তুমি নেই	গল্পগ্রন্থ	১৯৮৬
	• মুসাফিরের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৯
	• দুপুর বেলার রূপকথা	একাঙ্ক নাটক	১৯৯১
	• অসংলগ্ন	উপন্যাস	১৯৯৪
	• অচেনা পাখির ডাক	গল্পগ্রন্থ	১৯৯৫
	• ভালবাসার রূপকথা	একাঙ্ক নাটক	১৯৯৬
	• প্রেমের গল্প	গল্প গুচ্ছ	১৯৯৬
	• ত্রিধারা তিনটি নাটিকা	নাটকগুচ্ছ	১৯৯৮
	• শতাব্দীর সঞ্চয়	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• সাবেকি আয়না	উপন্যাস	২০০৩
কৃষ্ণকালী মন্ডল	• দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ ১ম সংস্করণ	আঞ্চলিক ইতিহাস ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব তাম্রলিপি, লোক সংস্কৃতি	১৯৯৭
	২য় সংস্করণ	ঐ	১৯৯৭
	• দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বিস্মৃত অধ্যায়	প্রত্ন ইতিহাস লোকসংস্কৃতি	১৯৯৯
	• দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা (১ম পর্ব)	লৌকিক দেবদেবী মূর্তিভাবনার	২০০১

লেখক	গ্রন্থের নাম		প্রকাশকাল
	• দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল	ক্রমবিকাশ চারটি নতুন প্রত্নস্থল গোবর্দ্ধনপুর, উঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ তিলপী ও বিড়াল	ঐ
	• নীল সাগরকে বলি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮
	• চব্বিশ পরগণা প্রত্নইতিহাস সম্মেলন স্মরনিকা ২০০২ বারুইপুর	সম্পাদিত প্রত্ন ইতিহাস সংকলন	২০০২
	• সাগরদ্বীপের অতীত	প্রবন্ধ	২০০৩
	• দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুরাকথা	প্রবন্ধ	২০০৩
	• প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর	প্রবন্ধ	২০০৩
বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র	• Hand book of information for Primary School Teachers	Information Compilation of Govt. Orders, Rules, Circulers etc with notes	১৯৮৮
	• Hand book of Information of on Pention and P. F. for the employees of Educational institutions	Do	১৯৯৬
	• Hand book of Information on Leave Rules for Secondary School teachers	Do	১৯৯৯
মৃত্যুঞ্জয় সেন	• ঐতিহাসিক কন্ঠস্বর	কাব্যগ্রন্থ	১৯৭৭
	• লেট লতিফের গল্প ও অন্যান্য কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	• দ্বিতীয় প্রার্থনা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৮
	• উড়োকথা, সঙ্গোপনে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯১
	• তিনি ছুঁলে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৩
	• মানুষ হয়েছি বলে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
	• বুলুদি ও আমি	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
	• পারাপারের জলছবি	কাব্যগ্রন্থ	২০০১

	• অনাবৃত অপেক্ষা	কাব্যগ্রন্থ	২০০১
	• অনাবৃত অপেক্ষা	ছোটগল্প	১৯৯১
	• একটা পাহাড়	ছোটগল্প	১৯৯৬
	• আশ্চর্য পরদেশী	ছোটগল্প	২০০১
	• ধাঁধা লোক	ছোটগল্প	২০০১
	• সাহিত্য চিন্তায় এলোমেলো	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৯
	• রঙ্কুর স্বপ্নপুরী	কিশোর উপন্যাস	২০০২
	ঃ সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ		
	• কবিতা ঃ ষাট-সত্তর	কবিতা সংকলন	১৯৮২
	• গল্প ঃ ষাট-সত্তর	গল্প সংকলন	১৯৮৫
	• আধুনিক প্রজন্মের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯১
	• মুখোমুখি সুনীল	(সুনীল গঙ্গোপাধ্যাব্দয়ের সাহিত্য ও জীবন)	১৯৯৪
	• আঞ্চলিক ভাষার কবিতা	কাব্য সংকলন	১৯৯৪
	• দ্য গোল্ডেন লিভস্	(বাংলা কবিতা সংকলন, ইংরাজী অনুবাদ)	
	• দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা	নির্বাহী সম্পাদক	১৯৯৭
	• দুই বাংলার কবিতায় মা	নির্বাহী সম্পাদক	১৯৯৭
	• আমার ছেলেবেলা	(জীবনীগ্রন্থ)	১৯৯৮
	• ভারতীয় ভাষার গল্প	(প্রতিবেশী রাজ্যের গল্প অন্যের সৃষ্ট)	১৯৯৮
	• এ শতকের বাংলা কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
	• সহস্রাব্দের প্রেমের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	২০০১
	• রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা	রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• ভালোলাগা কবিতা ১৪০৮	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• ভালোলাগা গল্প ১৪০৮	গল্পগ্রন্থ	২০০২
	• ভালোলাগা প্রবন্ধ ১৪০৮	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০২
	• বাংলা ভাষার লেখক অভিধান	অভিধান	২০০৩
	• নির্বাচিত কবিতা ঃ মৃত্যুঞ্জয় সেন	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
	• জেলা ইতিহাস ঃ জলপাইগুড়ি	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০৩
	• জেলা ইতিহাস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরঃ	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০৩
	• শতাব্দীর কবিতা পরিচয়	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
শিশির বসু	• একশ বছরের বাংলা থিয়েটার	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৭৩
	• আপুর ছড়া	ছড়া	১৯৯৭

সৌরেন বসু	• আয় বৃষ্টি ঝেঁপে	ছড়া	১৯৯৬
	• ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না	ছড়া	১৯৯৭
মানিকচন্দ্র দাস	• হনুমান চল্লিশা ও	হিন্দি থেকে	
	• সঙ্কট মোচন	কাব্যানুবাদ	১৯৯৪
	• অপরিচিতা	গল্প সংকলন	১৯৯৭
	• সুখের লাগিয়া	গল্প সংকলন	২০০১
ড. শঙ্করপ্রসাদ নস্কর	• হারিয়ে গেছি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৪
	• সেদিন বিকেলে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৬
	• কিছুই যাবে না ফেলা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৬৮
	• সাম্প্রতিকী	প্রবন্ধ সংকলন	১৯৬৮
	• বঙ্কিম বিচার	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৭৪
	• শরৎ প্রতিভার সীমারেখা	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯৫
তপন ভট্টাচার্য্য	• অনিবার্য বিষাদ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৮
	• পুবে সমকোনে বেঁকে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	• দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঃ সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০৩
নির্মল ব্যানার্জী	• একমুঠো লজ্জা দাও	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
	• জল দাও ছায়া দাও প্রাণে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
	• ছন্দে ছড়ায়	ছড়া ও কবিতা	২০০১
	সম্পাদিত গ্রন্থ		
	• অন্বীক্ষা দশ বছরের কবিতা	কাব্য সংকলন	২০০৪
সজল ভট্টাচার্য	• সাপ ও বেদে	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৮৮
	• শূণ্য পদতল	কাব্যগ্রন্থ	বাং-১৩৯৩
	• ভ্রামরী মিত্রতা	দ্বিভাষিক কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
	• সাগরে যাবো না	কাব্যগ্রন্থ	বাং-১৩৯৯
	• বাড়রী গঙ্গাটিয়া	দুটি পরিবারে কাহিনী	বাং-১৪০৩
পরিমল রায়	• কালনেমীর পালা	নাটক	বাং - ১৩৮৭ সাল
কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়	• স্বাস্থ্য রক্ষায় মধু	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০২
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	• আঁধারের আলোতে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৭
	• সীমানা পেরিয়ে	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
	• আঁকছে খোকা আকাশ নদী	ছড়া গ্রন্থ	১৯৯৯
	• বালক দুখু	ছড়া আলেখ্য	১৯৯৯

[illegible]	[illegible]		[illegible]
	• তুমি	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• কতো দিন দেখিনি রোদ্দুর	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• ধস্ত মানুষের মুখ	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
	• দিচ্ছে পাড়ি রেলের গাড়ি	ছড়াগ্রন্থ	২০০৩
ড. কালিচরণ কর্মকার	• কল্যাণপুরের কল্যান মাধব	মন্দির বিষয়ক গ্রন্থ	১৯৯৩
	• বারুইপুর সার্জিকাল শিল্পের ইতিহাস	শিল্পের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	১৯৯৮
	• মৌন মুখর	আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়কপ্রবন্ধ সংবাং	১৪০৫
ড. দেবব্রত নস্কর	• চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা	লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৯
ড. সনৎকুমার নস্কর	• মধ্যযুগ ঃ নির্বাচিত নিবন্ধ	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সং	১৯৯৩
	• কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কালকেতু পালা)	একটি প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা সমৃদ্ধ সম্পাদনা	১৯৯৪
	• মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য ঃ • আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার	মধ্যযুগের সাহিত্যের উপর গবেষনা সন্দর্ভ	১৯৯৫
	• একেই কি বলে সভ্যতা ?	মধুসূদনের একটি প্রখ্যাত প্রহসনের সম্পাদনা	২০০১
	• প্রসঙ্গ ঃ বাংলা সাহিত্য বিবিধ ও সংস্কৃতি	সাহিত্য ধারার আঠারেটি প্রবন্ধের সংকলন	২০০২
বাঁশরীমোহন হালদার	• ক্যাসেট সহযোগে বর্ণমালায় একে তিন	শিশুপাঠ্য	১৯৯০
	• ক্যাসেট সহযোগেThree in One in English Alphabet	শিশুপাঠ্য	২০০৩
	• প্রাক-প্রাথমিক অঙ্কমালা	শিশুপাঠ্য	১৯৯৫
	• পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষা বিজ্ঞান	শিক্ষণপদ্ধতি বিষয়ক	২০০৫
বিনায়ক	• রাঙা মাটির পথে পথে	ভ্রমণকাহিনী	বাং-১৩৯৭
জয়কৃষ্ণ কয়াল	• নাভিমূল	গল্পগ্রন্থ	বাং-১৪০০

	• বারণাবত	গল্পগ্রন্থ	বাং-১৪০৪
	• জার্মানিতে রবীন্দ্রবীক্ষা	গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ	বাং-১৪০৫
কৃষ্ণচন্দ্র নস্কর	• অনির্বাণ দীপশিখা	ছোটগল্প	১৯৮৮
	• কথা ও কল্পনা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮০
শিখর রায়	• এই সব ভেড়াগুলো আর রক্তচোষারা	ছোটগল্প	বাং-১৩৮৩
রত্নাংশু বর্গী	• খণ্ডচিত্রমালা সাঁফুইপাড়া	কাব্যগ্রন্থ	
	• সুন্দরবন	প্রবন্ধগ্রন্থ	
	• অন্তরসার	উপন্যাস	
	• এখনো সেখানে রক্ত গড়ায়	নাটক	
	• স্মৃতির মিনার	কাব্যগ্রন্থ	
	• কার্পেটে ধুলো	কাব্যগ্রন্থ	
	• প্রান্ত ছুঁয়ে আছি	কাব্যগ্রন্থ	
প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	• দুই কারিগর	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৫
	• তিনফর্মা ছড়া	ছড়াগ্রন্থ	২০০৩
মমতা সেন	• আশাপথ	গল্পগ্রন্থ	২০০৩
স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়	• নৈঃশব্দ দীর্ঘ হলে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৬
	• বস্তুতঃ আমাকে ছিঁড়েছে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮
	• রাহুল আনন্দে করতোয়া নদী	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
নরনারায়ণ পূততুণ্ড	• রবীন্দ্রসংগীত তত্ত্ব পরিক্রমা	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯২
	• কথায় কথায় রবীন্দ্রগান	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০০
	• রবিবার	উপন্যাস	১৯৯৭
	• গল্প এক	গল্প	২০০৩
হান্নান আহসান্	• ছড়ার গাড়ি	ছড়া গ্রন্থ	১৯৯০
	• ঝিকির ঝিকির	ছড়া গ্রন্থ	২০০২
	• ছুটির পাড়ি	ছড়া গ্রন্থ	২০০০
মনোরঞ্জন পুরকাইত	• আছে দুঃখ আছে স্মৃতি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯১
	• সবুজ বনে হলুদ পাখি	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৩
	• আয় ছুটে আয়	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৪
	• আগডুম বাগডুম ঘোকডুম	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৫
	• এসো গল্প বলি	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৭
	• দাঁড় ছপ ছপ নৌকো	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৭
	• নদী শঙ্খচিলের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮

	• সবুজ দেশের কথা	ছড়া আলেখ্য	১৯৯৯
	• একটি ছুটির দিন	ছড়া আলেখ্য	১৯৯৯
	• চিঠির ঝাঁপি	ছড়াগ্রন্থ	২০০০
	• আমার বাড়ি সোঁদরবনে	ছড়াগ্রন্থ	২০০২
	• সুন্দরবন ঃ শিশু সাহিত্যের আকরভূমি	প্রবন্ধ গ্রন্থ	২০০২
	• বর্ণমালায় সোদরবন	ছড়াগ্রন্থ	২০০৩
	• ছন্দে ছড়ায় লৌকিক দেবদেবী	ছড়াগ্রন্থ	২০০৪
তপন গায়েন	• বিজয়ী প্রেমের সঙ্গীত	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৭
	• খেটে খাওয়া মানুষের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৭
আনসার উল হক	• চিরন্তন	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৬
	• কু ঝিকঝিক রেলের গাড়ি	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৭
	• আইকম বাইকম	ছড়াগ্রন্থ	১৯৯৭
	• যাদুকরের মেয়ে	গল্পগ্রন্থ	২০০১
	• তেপান্তরে চাঁদের বুড়ি	ছড়াগ্রন্থ	২০০১
	• ধুমধাড়াক্কা	ছড়াগ্রন্থ	২০০২
	ঃ সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ		
	• আলোর ফুলকি	গল্প-কবিতা	২০০১
	• এপার বাংলা ওপার বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্প	গল্প সংকলন	২০০৩
আমিনুদ্দিন বৈদ্য	• নীল আকাশের পাখি	ছড়াগ্রন্থ	২০০২
	• বনবেড়ালের ছানা	ছড়াগ্রন্থ	২০০৩
বিশ্বনাথ রাহা	• নিধু খুড়োর ঢাক	ছড়াগ্রন্থ	বাং-১৪০০
	• টুনটুনির পাঠশালা	ছড়া-ছবির এ্যালবাম	১৯৯৭
	• জব্দ হুলো	ছড়া-ছবির এ্যালবাম	১৯৯৯
জয়দীপ চক্রবর্তী	• ক্রান্তদর্শী সুকুমার	প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৯৯৫
	• চতুরাশ্রম	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৭
	• স্তব্ধ মায়াক্রশিং	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
	• হরিণ বিষয়ক পংতি মালা	কাব্যগ্রন্থ	২০০১
	• কথার পিঠে যে কথাগুলি	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়			
	• সিঁদুর	উপন্যাস	১৯৯২
	• জীবনকাব্য	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৫
	• টেরাকোটার দ্বীপে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯

লেখক		গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রকাশকাল
তীর্থ ব্যানার্জী	•	কাঁচা রঙ	উপন্যাস	১৯৭৩
রথীন দেব	•	জীবন কুসুম	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
মীর মিজানুর রহমান	•	বর্তমান সমাজ ও মূল্যবোধ	প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯১
	•	মূল্যায়ন	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
শান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়				
	•	কাকভোরে আবির ছুঁড়ো না	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
	•	অন্যজনে বলে মানুষ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
	•	ভিন্নস্বাদের গল্প	গল্প (স্কুঃ পাঃ)	২০০২
	•	যে আলো নেভেনি আজও	গল্প জীবনী	১৯৮০
	•	অনির্বাণ দীপশিখা	গল্প জীবনী(স্কুঃপাঃ)	২০০১
	•	জ্ঞানের জগৎ	সাঃ জ্ঞান	১৯৯৫
	•	সাহিত্য পাঠ	গল্পকবিতা (স্কুঃপাঃ)	২০০০
	•	বিশ্বের বাতায়নে	সাঃ জ্ঞান (স্কুঃপাঃ)	২০০১
শ্যামলী সেন লাহা	•	ঢাকো মুখ লজ্জায়	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮
দেবাশীষ ঘোষ	•	হারিয়ে যাওয়া	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৭
আব্দুল হালিম সেখ	•	সংখ্যায় সংখ্যায় অজুতুরে অঙ্ক	গণিত	২০০৩
	•	গণিত অভিধান	গণিত	২০০৩
রামকৃষ্ণ নস্কর	•	মাটির স্বপ্ন	কাব্যগ্রন্থ	২০০১
	•	ইঙ্গিত	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
রবিন কর	•	উত্তরপথ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৮
প্রশান্ত সরদার	•	কাগজের নৌকো	গল্পগ্রন্থ	১৯৯৮
আশিস সরদার	•	কিছু অন্ধকার অনেক মানুষ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৫
আশীষ ভারতী	•	স্থির বিন্দু	কাব্যগ্রন্থ	বাং ১৪০৫
	•	কুটুম কুটুম ছুটুম ছুটুম	ছড়া	২০০৩
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়	•	কবিতার রেলিং ধরে	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৩
	•	নিরোর বেহালা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	•	ভৈরবী ও শ্মশান ভস্ম	যৌথ কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
	•	সালভাদোর দালির নীল	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৪
	•	নিপাঃ একদিন, অন্যসময়	গল্পগ্রন্থ	১৯৯৬
	•	রাত্রিমাতা	কাব্যগ্রন্থ	২০০০
	•	বর্ষাকালীন ছাতা হারানোর দুঃখ	যৌথ গল্পগ্রন্থ	২০০২
	•	নুন সংলাপ	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
রঞ্জন দত্ত রায়	•	ক্যাকটাস ও অন্যান্য	গল্পগ্রন্থ	২০০১

লেখক	[illegible]		
রাজাগোবিন্দ ঘোষাল	• শেষ এ্যাম্পি থিয়েটার	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৪
	• নিঃশব্দ যুঁই	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
অংশুদেব	• শব্দের ক্রীতদাস	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	• বন্দী আমি, মুক্ত অনিন্দ্য	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯০
	• একটা শূন্যতার চারপাশে	অনুগল্প	১৯৯৫
	• বোবা অরণ্য	গল্পগ্রন্থ	১৯৯৯
	• লোনা মাটির রাত	গল্পগ্রন্থ	২০০৩
সুধীর সরকার	• এক পৃথিবী, মাটি ও শৈশব	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৮
কালীপদ মণি	• সংকট সূর্য সংকল্প	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
	• জেবোনটা ঝালাপালা	ছড়াগ্রন্থ	২০০৩
সৌম্যদীপ দাশ	• মেঘের সাথে প্রেম করেছি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৬
বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়	• অনুরণন	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৯
চন্দ্রচূড় ঘোষ	• পথ হাঁটি	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৮
	• জিরাফ বুড়ো	গল্প	১৯৯৬
উৎপল দত্ত	• যন্ত্রণায় অনুভবে সুখ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৫
	• এখন প্রার্থনা	কাব্যগ্রন্থ	১৯৮৬
	• মান্দাস	গল্পগ্রন্থ	১৯৮৬
	• মানুষের মুখ	কাব্যগ্রন্থ	১৯৯৫
	• নির্বাচিত গল্প	গল্প সংকলন	২০০৪
বীরেন্দ্র কুমার	• রাজনর্তকী রূপা	নাটক	১৯৯৭
	• অম্লমধুর	নাটক	২০০০
	• আমাদের বিশ্বাস (একাঙ্ক)	নাটক	২০০০
	• অন্তর্দাহ (পূর্ণাঙ্গ)	নাটক	১৯৯৯
	• নাট্য সংগ্রহ ৭টি একাঙ্ক	নাটক	২০০০
ইন্দ্রাণী ঘোষাল	• মহামিছিল থেকে	গল্পগ্রন্থ	২০০৩
	• বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস	প্রবন্ধ গ্রন্থ	২০০৪
ড. গৌতমকুমার দাস	• ভারতীয় সুন্দরবন পরিবেশ পরিচয়	প্রবন্ধ গ্রন্থ	২০০৩
ডাঃ নারায়ণ নাইয়া	• অঞ্জলী	কবিতা ও গান	১৯৯৮
	• অর্পণ	কবিতা ও গান	১৯৯৯
	• নীলাঞ্জনা	কবিতা ও গান	১৯৯৯
	• নীলোৎপল	গীতি নাটক	২০০০
	• শ্যামাঙ্গিনী (১ম খণ্ড)	শ্যামাসঙ্গীত	২০০০
	• শ্যামাঙ্গিনী (২য় খণ্ড)	শ্যামাসঙ্গীত	২০০২

ডাঃ নলিনীরঞ্জন রায়	• বাংলা প্রবাদমালা	সংকলন গ্রন্থ	২০০৩
অঞ্জনকুমার দত্ত	• দঃ ২৪ পরগণার	সম্পাদিত	
	কবি ও কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	২০০৩
সুবর্ণ দাস ও			
বিপদবারণ সরকার	• দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্যের চালচিত্র	সম্পাদিত	
		প্রবন্ধগ্রন্থ	১৯৯৯

মনোরঞ্জন পুরকাইত সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

	• এসো বসো চোদ্দোশ	ছড়া সংকলন	১৯৯৩
	• ছুটির ছড়া	ছড়া সংকলন	১৯৯৩
	• গাঙ্গেয় পদাবলী	বারুইপুরের কবিদের	
		জীবনীসহ কবিতা	
		সংকলন	১৯৯৭
	• শেষ দশকের কবিতা	কবিতা সংকলন	
	প্রথম পর্ব	ঐ	১৯৯৭
	দ্বিতীয় পর্ব	ঐ	১৯৯৮
	তৃতীয় পর্ব	ঐ	১৯৯৯
	• পান্না হীরা চুনী	ছড়া সংকলন	২০০০
	• দৈত্যভূতের সত্যি গল্প	গল্প সংকলন	১৯৯৭
	• হীরের কুচি	ছড়া সংকলন	২০০২
	• দ্বাদশ দীর্ঘ কবিতা	কবিতা সংকলন	২০০২
	• ছন্দে ছড়ায় নজরুল	ছড়া সংকলন	১৯৯৮
সুনীল দাস	• একটি মৃত্যু না জন্মান্তরের গান	কাব্য গ্রন্থ	১৩৮৪
	• কংক্রীটের সাঁকো	কাব্য গ্রন্থ	১৩৮৯
	• সে সব ছবির মতো	কাব্য গ্রন্থ	১৯৯৯
ক্ষিতিপ্রসাদ দাস	• ভারতবর্ষের স্বাধীনতা		
	বিপ্লবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা	প্রবন্ধ গ্রন্থ	২০০৩
তপতী ব্যানার্জী	• জীবনের ঝরাপাতা	প্রবন্ধ এবং	
		কবিতা সংকলন	২০০০
কাশীনাথ ভট্টাচার্য	• আবৃত্তির ক্লাস	আবৃত্তিযোগ্য ছড়া,	
		কবিতা সংকলন	২০০৪
প্রদীপ মারিক	• চাঁদ নেমেছে তালপুকুরে	ছড়া গ্রন্থ	২০০৩
অভিষেক ঘোষ	• মনন	সম্পাদিত	
		কাব্য সংকলন	১৯৯৮

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ডাঃ সুনীলকুমার সরদার ●	বাতাসে ছাতিম ফুলের গন্ধ	গল্পগ্রন্থ	১৯৯৯
ডাঃ পঙ্কজকুমার দাস ●	রোগটা যখন বিপজ্জনক	চিকিৎসা বিষয়কগ্রন্থ	২০০৪
ডা. পুলিনবিহারী মণ্ডল ●	অর্ঘ	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
●	অতসী	কাব্যগ্রন্থ	২০০৪
গালিব ইসলাম ●	পুড়ছ জানি নিজের ভিতর	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
●	রজঃস্বলা নষ্ট চাঁদ	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
●	চির প্রণম্য স্বপ্ন	কাব্যগ্রন্থ	২০০২
গহর চৌধুরী ●	কৈশোর ও দিনলিপি	কাব্যগ্রন্থ	
●	ওখানে কোন দুঃখ নেই	কাব্যগ্রন্থ	
তাজউদ্দিন আহমেদ ●	স্বপ্ন ভেঙে যায়	কাব্যগ্রন্থ	
সহিদুল নস্কর(প্রেমরাজ) ●	প্রেমের গোলাপ	কাব্যগ্রন্থ	
রণজিৎকুমার মজুমদার ●	অস্তিত্বে নিহিত থেক	কাব্যগ্রন্থ	১৯৭৫
দেবপ্রসাদ ঘোষ ●	আষাঢ় অমল	কাব্যগ্রন্থ	
●	জার্নাল ও অন্যান্য কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	
সরোজ দাস ●	নাকছাবি যার হারিয়ে গেছে	কাব্যগ্রন্থ	
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ●	সোনালী ডাঙার চিল	কাব্যগ্রন্থ	
●	সমুদ্রের দিকে	কাব্যগ্রন্থ	
●	আমি একা এবং সে	কাব্যগ্রন্থ	
●	সুখ দুঃখের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	
●	সাঁঝ বিহান	কাব্যগ্রন্থ	
●	নাকছাবি	গল্পগ্রন্থ	
●	অগস্ত্যের নাভি	গল্পগ্রন্থ	
●	মানুষেরা	উপন্যাস	
●	সমুদ্র সন্তান	উপন্যাস	
●	ইছরি সোয়াই	উপন্যাস	
●	আগন্তুক	পদশব্দ	
●	জলপ্রপাত	কাব্যনাটক	
●	চারণ পাখি	কাব্যনাটক	
●	জলের বাঁশী	কাব্যনাটক	
প্রদীপ দাস ●	দৌড়পথ	গল্পগ্রন্থ	১৯৮৭
সাগর চট্টোপাধ্যায় ●	দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি	প্রবন্ধগ্রন্থ	২০০৫

বারুইপুর নানা কারণে সম্পদশালী। এখানকার মৃত্তিকা, জল, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি

ও সাহিত্য বহু প্রাচীনকাল থেকে উর্বরতার স্বাক্ষ্য বহন করে। সব কিছুর মতো সাহিত্য চর্চার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস সুবিদিত। বারুইপুরের লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পদ মূলত গ্রন্থরাজির একটি তালিকা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। ক্ষেত্রানুসন্ধান ও শ্রদ্ধেয় লেখকদের আন্তরিক সহযোগিতা স্বত্বেও এই তালিকা সম্পূর্ণ নয় — বিনম্র চিত্তে একথা স্বীকার করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ডঃ কালিচরণ কর্মকার, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নরনারায়ণ পূততুণ্ড, গালিব ইসলাম, শক্তি রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ রাহা, পার্থ দাশগুপ্ত, মানস চক্রবর্তী, আনসার উল হক্, বিনয় সরদার, প্রদীপ দাস, বিপদবারণ সরকার, চঞ্চল নস্কর।